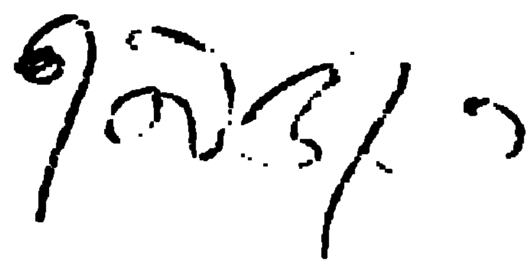

চাষা (কবিতা)	শ্রীমতী হৈমবতী দেবী ...	৩৪৩
ছোটনাগপুরের হো (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় বি, এ, এম, আর, এ, এস, ...	২০৮
জর্ম্মাণ সম্রাট	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, ...	১৫১
জাতীয় অস্তিত্বে প্রয়োজন	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল	৩২৭
জাপানের সেক্ষপীয়র	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় ...	৭
জামাই ষষ্ঠী (গল্প)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	২৭৭
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবন চরিত (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী ...	৩৩[illegible]
ঠিক কথা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা	৫৫
ত এর রাজত্ব	শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় বি, এ, এম, আর, এ, এস, ...	৩৮০
তান্ত্রিক উপাসনা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ...	৩৫০
তিনটী টপ্পা	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ...	২৮৬
তিব্বত অভিযান (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত বি, এ, বি, এস সি,	৯, ৩৯, ৭৫, ১০৮, ১৩৭, ১৭০, ২০০, ২৪২, ২৬৬, ২৯১, ৩৩১
তিব্বতে মোসলমান সৈন্য	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত ...	৫৭
তুমি স্বপ্রকাশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৬০
তৃণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ...	১১০ ✓
তৈল মর্দ্দন	কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন ...	৩১৩
দশরথ জাতক	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এল, ...	১৩৬
দিব্য দৃষ্টি (গল্প)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	১৮৭
দিশা হারা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৮৯
দীর্ঘজীবন লাভের উপায়	শ্রীযুক্ত— ...	২৮২
দুঃখের সাথী (গল্প)	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, ...	৬১
ধরণী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র রায় ...	১৪২
নবযুগের অবতার	শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ দত্ত রায় ...	১৫৭
নব্য জামাতা (নক্সা)	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস সি, ...	৩৮৩
নর-সেবা (গল্প)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, ...	৩০৭
নারায়ণে রুচি-বিকার	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, ...	৩৫৩
নিবেদন	... ...	৩৮
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	১৮৭
নিমেষ (কবিতা)	শ্রীমতী বিভাবতী সেন ...	১৮৩
নীলিমা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ঘোষ ...	২৩৭
পণ পরিশোধ (গল্প)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	২৬
পত্রের পাঠ	শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু ...	১৭৭

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পরিণাম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	...	৩৩৫
পুচ্ছবিশিষ্ট মানব (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়	...	২২
পুত্রলাভ (গল্প)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	২৫৩
পুষ্পক-রথ	মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ,	...	১
পূর্ণানন্দ গিরি	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	৫৫
পূর্ব্ব ময়মনসিংহে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি	...	৯৪
প্রমাণ না বিশ্বাস	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম, এ, বি, এল,	...	১৪৪
প্রলয়	ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	...	২১৪
প্রাচীন বঙ্গীয় রাজগণের মুদ্রা (সচিত্র)	Mr. H. E. Stapleton M. A. B. SC.	...	১৬৫
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীমতী বিভাবতী সেন	...	৮৮
বড়শী শিকারী (গল্প)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	১৫৮
বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলন (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	২২৪
বর্ষবরণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী	...	১৯৯
ব্যর্থ জীবন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	২৭৭
ব্যর্থ সাধনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা	...	১৫৪
বাঙ্গালা ভাষায় প্রাদেশিকতা	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল,	...	৩৪১
বাঙ্গালীর অন্তঃপুর	শ্রী ...	...	১৬০
বাঙ্গালী সমাজে বীমা	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	...	২৭০
বানর-তত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল,	...	৩৫৯
বামনের দেশ	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়	...	২৩
বিদায় ১৩২১ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী	...	১৯৭
বিরহের সুর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী	...	২৯৭
বৈষ্ণব দর্শন	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	২৫৯
৺ব্রতের স্মৃতি (সচিত্র)	শ্রীমতী	...	২৫৭
ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান	শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত	...	৩৪৩
ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব	শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত	...	৩১৬
ভক্তি ও ভক্ত	শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত	...	২৪০
ভারতে পারদ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম, এ,	...	১১২, ১৬২
ভুষণ্ডীর যুদ্ধবার্ত্তা	... ...	...	২৮৯
মনে রেখো (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস	...	৩৭৮
মনে রেখো (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	...	৩৭
মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের কোষ্ঠি	রাজা শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র সিংহ	...	৮৫
মা (গল্প)	শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,	...	৭৮

মানবকৃত ভৌগলিক পরিবর্ত্তন	অধ্যাপক-শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল,	...	২০৪
মায়ার আরসি (রূপক)	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ,	...	১২২
মুদ্রার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া যায় কি না ?	শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রকুমার চৌধুরী	...	৩৫৬
মুসলমানদের সংস্কৃত শিক্ষা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	...	৮৮
মোসলমান বীরাঙ্গনা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	...	২৩৮
যাচ্না (কবিতা)	শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা	...	১১৬
যাত্রা (গল্প)	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন সরকার তত্ত্বনিধি	...	৩৭৩
যায় দিন চলরে মোকাম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায় মৌলিক	...	৩৮০
রহস্য-ভেদ (গল্প)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল,	...	৩৬৩
রামগতির টপ্পা	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	...	৪৮
রামায়ণী যুগের রাজ্য শাসন	সম্পাদক	...	১৪৭
রামু সরকার	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	...	১১৭
শহুরে ভদ্রতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	...	৩৭৪
শান্তি (কবিতা)	শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা	...	১৫৭
শান্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী	...	২১৭
শ্রাবণে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী বি, এ,	...	৩৫১
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনাকাল	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্তরত্ন সাংখ্যতীর্থ	...	১৭৩
শ্রীবিক্রমপুর	শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু	...	৮১
শ্রীহট্টেরই রঘুনাথ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,	...	১৩৪
সমর প্রসঙ্গ (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	২৪
সমস্যা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা	...	২২৮
সমাজ ও সমর	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল	...	২২৯
স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রকিশোর সেন	...	১৫৪
স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল (কবিতা)	শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ	...	১৯৪
স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখেল	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	১৯৪
স্বর্গীয় মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ (সচিত্র)	... ...	...	২৯৮
স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত	..	১৮৩
স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন	...	১২
সাহিত্য সংবাদ	... ...	...	২৫৮, ২৯০, ৩৯০
সাহিত্য সেবক	... ...	...	১০২
সে কালের কথা	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর সেন	...	২৫০, ২৭৪
সোণার ছবি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	...	১৬
সৌরভ (কবিতা)	শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী	...	১০৩
সৌরভ (কবিতা	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ,	...	·১
স্ত্রী শিক্ষা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ,	...	১৭
হিরালী	শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির নাথ	...	৩২১
হোটেলবাস (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৩৮৯

চিত্র সূচী।

১ বসন্ত-জাগরণ (ত্রিবর্ণ) মিঃ ললিতকুমার হেস অঙ্কিত
২ দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ইশার্খাঁর কামান
৩ গিয়াংসী দুর্গের ডিহ্ন ও তাহার পার্শ্বচরগণ
৪ ইংরেজ শিবিরে তিব্বতীয় রাজ কর্ম্মচারী
৫ স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন
৬ পুচ্ছ বিশিষ্ট মানব (পশ্চাৎ ভাগ)
৭ ঐ (পার্শ্ব ভাগ)
৮ অষ্ট্রীয়ার সম্রাট
৯ সার্ভিয়ার রাজা
১০ জর্ম্মাণ সম্রাট
১১ রুষিয়ার সম্রাট
১২ ইংলণ্ডেশ্বর
১৩ ফরাসী রাষ্ট্র নায়ক
১৪ ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন
১৫ গিয়াংসীতে বৃটীশ পতাকা
১৬ জেনারেল মেকডনেল্ড ও তাঁহার ষ্টাফ
১৭ তিব্বতীয় অশ্বারোহী সৈন্য
১৮ ইশার্খাঁর দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ—এগারসিন্দু
১৯ ইশার্খাঁর পরিখা – জঙ্গলবাড়ী
২০ দেবীর কারাগারে আবির্ভাব
২১ ইংরেজ শিবির—গিয়াংসী
২২ খারো গিরি সঙ্কট
২৩ খারো গিরিসঙ্কটে ইংরেজ সৈন্যের অভিযান
২৪ ইশার্খাঁর নাম খোদিত কামান
২৫ বৃটীশ সমর সচিব লর্ড কিচেনার
২৬ বৃটীশ সেনাপতি ফ্রেঞ্চ
২৭ ফরাসী সেনাপতি জফ্রে
২৮ রুষ সেনাপতি রেণেক্যাফ
২৯ জর্ম্মাণ সেনাপতি মণ্টকে
৩০ অষ্ট্রীয় সেনাপতি হগেনডরফ্
৩১ পর্ব্বতোপরি গিয়াংসী দুর্গ
৩২ গিয়াংসী দুর্গদ্বার
৩৩ ইংরেজ সৈন্যের গিয়াংসী প্রবেশ
৩৪ নেপেন্থেস্ বেল্ফোরিয়ানা
৩৫ নেপেন্থেস চেলসনি এক্সলেন্স
৩৬ নেপেন্থেস্ ভেন্ট্রিকোসা
৩৭ স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র সিংহ
৩৮ রালং গিরি-সঙ্কট
৩৯ তিব্বতের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ
৪০ ডাইওনিয়া মিউসিপিউলা
৪১ শ্রীমদ্ কৃষ্ণমূর্ত্তি
৪২ স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী
৪৩ প্রাচীন বঙ্গীয় মুদ্রা ১নং (সম্মুখভাগ)
৪৪ ঐ ১নং (পশ্চাদ্ভাগ)
৪৫ ঐ ২নং (সম্মুখভাগ)
৪৬ ঐ ২নং (পশ্চাদ্ভাগ)
৪৭ দাপাং মঠ হইতে লামারা শান্তি পতাকা হস্তে ইংরেজ শিবিরে আসিতেছে
৪৮ লাসা উপত্যকা—ডক্কার
৪৯ আমাদের লাসা প্রবেশ
৫০ অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিগণ
৫১ সেংপু নদীর গোদারায় ইংরেজ সৈন্য পার হইতেছে
৫২ হো দিগের নৃত্য
৫৩ ষ্টার অব ইণ্ডিয়া গেট—বর্দ্ধমান
৫৪ মহতাব মঞ্জিল
৫৫ দেলকুশা রাজ প্রাসাদ
৫৬ কৃষ্ণ সায়র
৫৭ নবাব হাট—১০৯ শিব মন্দির
৫৮ সের আফগান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি
৫৯ যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁদ সুলতানা (শ্রীযুক্তসারদাচরণ রায় অঙ্কিত)
৬০ ইয়মডক্ তীরে ইংরেজ ছাউনী
৬১ সেংপু উপত্যকা
৬২ তিব্বতীয় সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ
৬৩ দলাই লামার প্রাসাদ
৬৪ লাসার দৃশ্য
৬৫ যমপুকুর ব্রত
৬৬ দলাই লামার রাজ প্রাসাদের সম্মুখ-দৃশ্য
৬৭ দূর হইতে দলাই লামার রাজ প্রাসাদ
৬৮ তিব্বত প্রান্তরে মেষ
৬৯ তিব্বতের কৃষক ইয়াক্ দ্বারা চাষ করিতেছে
৭০ লিংখর বা পবিত্র রাস্তা—লাসা
৭১ তিব্বতের একটী প্রধান মঠ
৭২ মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর
৭৩ টেটাংস মঠের সন্ন্যাসিনীগণ
৭৪ আটিয়ার শিলালিপি
৭৫ আটীয়ার মসজিদ
৭৬ খস্রু-সমাধি—এলাহাবাদ
৭৭ লামা বরকে মন্ত্র পড়াইতেছে
৭৮ মৃত দেহ সৎকার—লাসা
৭৯ জাহাঙ্গীর বাদসাহ
৮০ যোধপুরী বেগম
৮১ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস

বসন্ত জাগরণ।

[illegible]—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার হোম অঙ্কিত। ASUTOSH PRESS, DACCA.

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২১। { প্রথম সংখ্যা।

সৌরভ।

শ্যামোজ্জ্বল অর্ঘ্য-পুটে, প্রেমাঞ্জলি ফুলে সাজাইয়া,
এসো' বলে ডাকে যবে মালঞ্চের মুকুলিত হিয়া
নীহার চুম্বিতা মদালসা, প্রতি-ফুল-মর্ম্ম-কোষে,
জেগে ওঠ, হে সৌরভ! সুমধুর মদির পরশে
অঙ্গ-হীন পরিপূর্ণ আনন্দের মতো!— শাখাঞ্চলে
দুলে যুথি, হাসে চাঁপা, শেফালি মূরছি পড়ে মূলে!
গুঞ্জরে ভ্রমর-পুঞ্জ সরসীর রক্ত-পদ্ম-দলে,
সুন্দরে আনন্দ তুমি! হে সৌরভ! জাগো ফুলে ফুলে!

এসো বলে, তাই আজ, তোমা বধূ, ডাকে হে সঘনে
পিয়াসী অন্তর মোর! পুষ্প হতে নেমে এসো প্রাণে,
গন্ধজাল ঘেরা স্নিগ্ধ কাননের প্রেমালাপ সম
আশ্বাসে বিশ্বাসে ভরা!—কিবা ব্যথা নিরুপম
জানিব কেমনে বাজে মর্ম্মরিত কানন-তরুর!
রুণুঝুণু বাজে কার, স্বপ্নগড়া চঞ্চল নুপুর
ঝিল্লী ডাকা বন-পথে, জ্যোৎস্না-মাখা সুচীর সন্ধ্যায়!
সুন্দর চরণ কার, রক্তরাঙ্গা রঙীণ ব্যথায়
ঝলমলে লাল-ফুলে, সুকোমল সকাল বেলায়!
অনাহত বীণে কার, ঝরে পড়ে পূরবী রাগিণী
স্বর্গ-হতে স্বর্ণ মেঘে, সুরে কাঁপে প্রেম স্বপ্ন খানি!
কবিকুঞ্জে জাগে আজি, অক্ষমের চির-আকিঞ্চন
নন্দন-অমিয়া-লাগি; তুমি তারে করোনা বঞ্চন!
দিয়ো বর, চিত্তভরা আনন্দের সুরভি অক্ষয়,—
অশ্রুদৈন্য ভরা চিতে থা'ক তারা আনন্দের জয়
লাবণ্যের লাজমুষ্ঠি ছড়ায়ে কিরণে! নীলাকাশে
শিশির মণ্ডিতা ঊষা নবারুণে উঠে মৃদু হেসে!
মন্দগতি শুভ্র মেঘ ভেসে চায় অস্তাচল পানে
ফিরায়ে আনিতে চাঁদে;—বাঁশীবাজি উঠিছে বিপিনে
বনান্তের নীলাঞ্চল লীলাচ্ছন্দে দুলিছে পবনে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

পুষ্পক রথ।

(কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত, কাব্য, নাটক এবং কথা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্যোমমার্গে বিচরণ জন্য এক প্রকার অদ্ভুত ব্যোমযান বিদ্যমান ছিল, তাহার নাম "পুষ্পক রথ"। অভিধানে ব্যোমযান ও বিমান একার্থ প্রতিপাদক শব্দ। (ব্যোমযানং বিমানোহস্ত্রী ইত্যমরঃ)। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পুষ্পক রথ কি কবি কল্পনা মাত্র?

অথবা প্রকৃতই কোনও বাস্তব পদার্থ! কোনও পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার কল্পনা সম্ভবপর হইতে পারে না। কবি কল্পনা বস্তুর অতিরঞ্জন অথবা বিকৃত বর্ণনা করিতে পারে, কিন্তু যাহা নাই, তাহার কল্পনা করিতে পারে না। সত্যবটে, কবি কল্পনা বলে Gives to airy nothing a local habitation & a name". সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখিত ব্যোমযান কি airy nothing মাত্র? এই কথার মীমাংসা করিতে হইলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়।

জগতের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষে আকাশ পথে ভ্রমণ জন্য গগনচারী বিমানের অস্তিত্ব ছিল। ইতঃপর কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণ পাঠে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে রামায়ণ রচনার কালেও (ত্রেতাযুগে) ব্যোমযান বিদ্যমান ছিল। ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি দশানন বধের পর সীতাদেবীকে উদ্ধার করতঃ রাবণের অধিকৃত পুষ্পক রথ লাভকরেন এবং সীতা দেবীকে তৎসাহায্যেই আকাশ পথে অযোধ্যা নগরীতে আনয়ন করেন। এই পুষ্পক রথটী রাবণ কুবের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা এই বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারি যে শ্রীরামচন্দ্রের কোনও প্রকার ব্যোমযান ছিলনা, তাঁহাকে প্রথমতঃ সমুদ্র লঙ্ঘন জন্য সেতু প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল। ব্যোমযান থাকিলে শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেন না। তবে তাহার সৈন্য সামন্তকে সমুদ্র লঙ্ঘন করান জন্য অবশ্য সেতু বন্ধনের প্রয়োজনছিল। পুষ্পক রথ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিলনা বলিয়াই অনুমান হয়, কারণ এতাদৃশ বিমান প্রস্তুত ব্যাপার বোধহয় বহু আয়াস ও ব্যয়-সাধ্য ছিল এবং সকলে বোধ হয় নির্ম্মাণ কৌশলও অবগত ছিল না। যদি পুষ্পক রথকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে প্রশ্ন হয় যে—এই অদ্ভুত বিমান কি উপকরণে নির্ম্মিত হইত এবং তাহা কি কৌশলে গগন পথে অনায়াসে পরিচালিত হইত? এসমস্ত বিষয় জানিবার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা? পরিতাপের বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত এপ্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য কোনও অকাট্য প্রমাণ পাই নাই। শিল্প শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান কালে দুষ্প্রাপ্য অথবা বিলুপ্ত। ভারতের অনেক গ্রন্থালয়ে এখনও অনেক হস্ত-লিখিত নানাপ্রকার গ্রন্থ কীটদষ্টাবস্থায় উপেক্ষিত হইতেছে, সে গুলির উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে হয়ত অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নেরই সমাধান হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কিনা সন্দেহ। শিল্প সংহিতা নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু অদ্যাপি এই গ্রন্থখানা আমাদের নয়ন পথবর্ত্তী হয় নাই। বাৎস্যায়ণ ঋষি প্রণীত সুবিখ্যাত কামসূত্র গ্রন্থ পাঠে চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। "যন্ত্রমাতৃকা" উক্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যার অন্যতম। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর জয়মঙ্গল টীকায় যন্ত্রমাতৃকা কলার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশ" গ্রন্থে যন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—সজীব ও নির্জ্জীব। গো, অশ্ব প্রভৃতি চালিত যান নির্জ্জীব এবং জল, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি চালিত যান সজীব। পুষ্পক রথ, ব্যোমযান, রণতরী প্রভৃতি নির্জ্জীব যান। "বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশে" এই সমস্ত যান প্রস্তুতের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশ অদ্যাপি দুর্লভ। অত্রাবস্থায় আমাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত ও কাব্য পুরাণাদি পাঠেই পুষ্পকরথের বিষয় অবগত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যে ভারত এক সময় নানাবিধ বিদ্যার আলোচনায় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার আজ অতি শোচনীয় অবস্থা কেন হইল, ইহা বুঝিতে হইলে, ভারতের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ আলোচনা ব্যতীত এই জ্ঞানলাভের অন্য প্রকৃষ্ট উপায় নাই। প্রকৃত বটে যে কেবল মাত্র অতীতের গৌরব গাইয়া বৃথা আস্ফালন ও অহঙ্কার প্রকাশ করিলেই জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে:—Nation which cannot look backward can't go forward. একথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বথা প্রযুজ্য; কারণ আমাদের যদি কিছু স্পর্দ্ধা ও গৌরবের দ্রব্য থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাজি।

বর্ত্তমান সভ্য জগৎ এই সমস্ত রত্ন আহরণ জন্য একান্ত ব্যগ্র; কিন্তু আমরা তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াও তৎসমূহ রক্ষা করা সঙ্গত মনে করিতেছি না, ইহা আমাদের দশাবিপর্য্যয়েরই পরিচায়ক। প্রসঙ্গাধীন আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রয়াস করা যাউক।

পুষ্পকরথ সম্বন্ধে রামায়ণের বর্ণনা এতই স্পষ্ট ও সর্ব্বজনবিদিত যে তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ বাগজাল বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পক সাহায্যেই লঙ্কা হইতে আকাশ পথে সীতা দেবীকে সহ অযোধ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে ব্যোমযান কবিকল্পনা প্রসূত খপুষ্প নহে, অপরন্তু ইহা বাস্তব। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কবি কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তথাপি এ সম্বন্ধে মূলে একটা সত্য নিহিত আছে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে শাল্যের আকাশপথে সৌভপুরীর বর্ণনা ও আকাশপথে বিচরণ এবং যুদ্ধ বর্ণনা বিস্ময়জনক। রামায়ণ বর্ণিত মেঘান্তরালাবস্থিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বর্ণনাও অদ্ভুত। এ সকল কল্পনা মাত্র কিনা তাহা বলা দুরূহ, তবে আকাশপথে বিচরণ সম্ভবপর হইলে, বিমানাবস্থিত অবস্থায় যুদ্ধাদিও অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান কালে উদ্ভাবিত ব্যোমযান সহায়তায় পাশ্চাত্য জাতিগণও আকাশপথে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। Airship এবং areoplane প্রভৃতি যে প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নত হইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে অচিরকাল মধ্যেই গগনমার্গে বিচরণ অতি অনায়াস সাধ্য হইবে। পুষ্পক রথের বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে তাহা বর্ত্তমান airship প্রভৃতি হইতে উন্নত ছিল, কারণ তাহাতে বহু লোক যুগপৎ আরোহণ করিতে পারিত এবং পুষ্পক অতি সহজেই যথেচ্ছা চালিত হইত। অনেক স্থলে বিমানচারী রথগুলিতে অশ্ব ও হংসাদি যুক্ত বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়, ইহা বোধ হয় রূপক মাত্র, অথবা ইহাও বিচিত্র নহে যে বিমানে অশ্ব অথবা হংসাদির পুত্তলিকা কৌশলে সংযুক্ত হইত এবং সেগুলি রথের শোভাবর্দ্ধন করিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান airship প্রভৃতিকেও এই প্রকার সৌন্দর্য্য ভূষিত করা হইবে। ইতঃপর আমরা ভারতীর বরপুত্র কবিকুল শিরোমণি বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্য রঘুবংশ হইতে ব্যোমযানের বর্ণনা সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করিব। রঘুবংশের ১৩শ সর্গে মহাকবি সমুদ্র বর্ণন ব্যপদেশে যে অদ্ভুত কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। দশানন বধের পর সীতা দেবীকে পুষ্পক রথের সাহায্যে আকাশপথে অযোধ্যা আনয়ন প্রসঙ্গে যে বর্ণনা রঘুবংশের ১৩শ সর্গে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় না; যে কোনও দেশের যে কোনও সুধীই এই বর্ণনা মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তিনিই আত্মহারা ও মুগ্ধ হইবেন এবং মহাকবির পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবেন। মহাকবির অমৃত নিষ্যন্দিনী ভাষার পরিচয় গ্রহণ করিতে হইলে রঘুবংশের ১৩শ সর্গ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হয়। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা সমগ্র সর্গটী উদ্ধৃত করিলাম না, কেবল মাত্র যে যে স্থলে ব্যোমযান সম্বন্ধে বর্ণনা আছে সেই কতিপয় শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। ১৩শ সর্গের আরম্ভেই মহাকবি বলিতেছেন :—

> অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ
> পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
> রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং
> রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ॥

অনন্তর (রাবণ বধান্তর সীতা উদ্ধারের পর) গুণগ্রাহী (রত্নাকরাদি গুণাভিজ্ঞ) রাম নামক হরি রথারোহণে (পুষ্পক রথারোহণে) স্বীয় স্থান (বিষদ্ বিষ্ণুপদ মিবঃ) শব্দগুণ (আকাশের শব্দগুণ) আকাশে আরোহণ করে। রত্নাকর সমুদ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নির্জ্জনে সীতা দেবীকে বলিতে লাগিলেন।

অতঃপর মহাকবি সেতুবন্ধনযুক্ত সমুদ্র ও তারকামণ্ডিত ছায়াপথ দ্বারা বিভক্ত নীল আকাশের যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা রমণীয় ও অনুপম। বিমানের গতি বর্ণনা উপলক্ষে মহাকবি বলিতেছেন :—

কচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং
কচিদ্ ঘনানাং পততাং কচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ
প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥

সীতা দেবীকে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—এই দেখ আমাদের বিমান কখনও দেবতার পথে, কখনও মেঘের পথে, কখনও বা বিহগের পথ অবলম্বনে আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিতেছে।”

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে ব্যোমযান আরোহীর ইচ্ছানুসারেই চালিত হইতেছে। পুষ্পক রথের গতি কত দ্রুত তাহা মহাকবি অতি কৌশলে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। লঙ্কা হইতে অযোধ্যাপুরী পর্য্যন্ত উত্তীর্য্যমান দীর্ঘ পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতিক্রান্ত হইবে। এতদুপলক্ষ্যে কত নগর, কানন, শৈল, নদী প্রভৃতির মনোহর বর্ণনা উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহা রঘুবংশের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বিমান রাজ প্রয়াগের উপরি দেশে উপনীত হইলে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত ভাবে সীতা দেবীকে যে ভাবে তাহা দেখাইতেছেন মহাকবি কি সুন্দর উপমা রাজি দ্বারা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই বর্ণনা উদ্ধৃত হইল না।

রামানুজ ভরত অগ্রজকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিলে বিমানরাজ ধীরে ধীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল, অতঃপর ভরত ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইলেন, কিছু কাল পর পুষ্পক পুনর্ব্বার আকাশ পথে উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল। এ সময়ে রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত ভ্রাতৃত্রয়ই সীতা দেবী সহ রথারূঢ়। মহাকবি এতদুপলক্ষ্যে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :--

ভূয়স্ততো রঘুপতির্বিলসৎ পতাকং
অধ্যাস্ত কামগতিং সাবরজো বিমানম্।
দোষাতনং বুধ বৃহস্পতি যোগ দৃশ্য
স্তারাপতি স্তরল বিদ্যুৎ দিবাভ্র বৃন্দম্॥

অনন্তর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র কনিষ্ঠ দ্বয়ের সহিত বাতান্দোলিত সুশোভন পতাকাযুক্ত কামগতি বিমানে আরোহন করিলেন; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন বুধ, বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়সহ রমণীয় চন্দ্রমা প্রদোষ কালীন চঞ্চল মেঘ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই বর্ণনার তুলনা জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। এই সমস্ত বর্ণনা পাঠে স্বতই মনে হয় যে মহাকবি প্রত্যক্ষ করিয়াই সমস্ত বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সময় ব্যোমযান বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের বর্ণনা অবলম্বনেই স্বীয় অমানুষী প্রতিভা বলে পুষ্পক রথের বিস্ময় জনক বর্ণনা করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে মহাকবি কালিদাস আকাশ হইতে রথের অবতরণ প্রসঙ্গে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :— “মাতলী বলিতেছেন—

অথ কিম্! ক্ষণাচ্চায়ুষ্মান্ স্বাধিকার ভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে।

আর কি! আয়ুষ্মন্ আপনি অনতিবিলম্বেই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইবেন।

রাজা—(অধোঽবলোক্য)—মাতলে! বেগাদবতরণাদাশ্চর্য্যদর্শনং সংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ তথাহি—

শৈলানা মবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জ্যতং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎপাদপাঃ।
সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিল ব্যক্তা ব্রজন্ত্যাপগাঃ
কেনা প্যুৎ ক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎ পার্শ্বমানীয়তে॥”

রাজা দুষ্মন্ত অধোভাগে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিতেছেন :—মাতলে! বেগে অবতারণ বশতঃ মনুষ্যলোক (পৃথিবী) কি আশ্চর্য্য দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ :—উন্নত পর্ব্বত শিখর হইতে ভূপ্রদেশ যেন ভূপ্রদেশে অবতীর্ণ হইতেছে, বৃক্ষ সমূহের মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হওয়াতে তাহারা যেন আর পত্রাভ্যন্তরলীন বলিয়া বোধ হইতেছেনা। পূর্ব্বে বহু উচ্চ হইতে তাহা এই প্রকারই অনুমিত হইতেছিল। নদী সকল ক্ষীণ ভাবে প্রায় অদৃশ্যই ছিল, এক্ষণে ক্রমে প্রকাশিত হওয়াতে তাহারা যেন সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে। আমার মনে হইতেছে কোনও মহাপুরুষ যেন বিপুলা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করতঃ আমার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিতেছে।

অন্যান্য কাব্য নাটক পুরাণ প্রভৃতি হইতে ব্যোমযান সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত হর্ষচরিত নামক কথা গ্রন্থের ষষ্ঠোচ্ছ্বাসে ব্যোমযান প্রস্তুত সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা রূপ এই—

"আশ্চর্য্য কুতুহলী চণ্ডীপতি দণ্ডোপনত যবন নির্মিতেন নভস্তল চারিনা যন্ত্রযানে নায়ীত ক্বাপি।"

কুতুহলী চণ্ডীপতি দণ্ডোপনীত যবন নির্ম্মিত আকাশগামী যানে আরোহন করা মাত্র যন্ত্র বলে চালিত করিয়া তাহাকে কোন অপরিচিত দেশে বহন করিয়া নিল! এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আকাশগামী বিমান প্রকৃত প্রস্তাবেই একটা কিছু ছিল। অপিচ—পুষ্পক সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃই উক্ত হইয়াছে যে তাহা মায়া (কৌশল) বিশেষে নির্ম্মিত।

তত্ব জিজ্ঞাসু মহাত্মাগণ কেবল মাত্র কাব্য নাটোকোক্ত বর্ণনা দ্বারা ব্যোমযানের অস্তিত্ব বিষয় নিঃসন্দিহান হইতে পারেন না, একথা যথার্থ, কিন্তু শিল্প শাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই সমস্ত বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইবে। আমাদের মনে হয়, ব্যোমযান কবি কল্পিত নহে, ইহা বাস্তবিকই প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান ছিল। কালের ভীষণ আবর্ত্তনে ভারতের অনেক দ্রব্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে না, তাহাই যে কবি কল্পিত একথা বলা সমীচীন নহে। আয়ুর্ব্বেদের শল্য তন্ত্রোক্ত অনেক অস্ত্র শস্ত্রাদি ভারতের প্রায় কুত্রাপি দেখা যায় না, অত্রাবস্থায় এগুলি কল্পনা মাত্র বলা সঙ্গত হইবে কি! ধনুর্ব্বেদোক্ত অনেক যুদ্ধোপকরণ এবং অস্ত্র শস্ত্রও বিদ্যমান নাই, সেগুলিকেও কি কাল্পনিক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে!

পাশ্চাত্য তত্বানুসন্ধায়ী বুধবৃন্দ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাবলী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতঃ বহু অভিনব তত্বাবিষ্কার করিতেছেন, আর আমরা সেগুলির প্রতি যথেষ্ট অনাদর ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, ইহা আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—হিন্দু সন্তানগণ যেন তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হেলায় না হারান। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত গভীর তত্ব নিহিত আছে, সে গুলির যথেষ্ট আলোচনা হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এতদ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সত্য কথা বলিতে কি—পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের যুগপৎ আলোচনা হিন্দু সন্তানের পক্ষে যত সহজ সাধ্য, জগতের অন্য কোনও জাতির পক্ষে তাহা নহে। আমাদের মনে হয়, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনা দ্বারাই মানবের চরম উন্নতি সাধিত হইবে,—এতদুদ্দেশ্যেই বোধ হয় পরমকারুণিক সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রাচীন ভারতকে পরম বিদ্যোৎসাহী জড়বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নত ইংরেজ জাতির শাসনাধীন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সুযোগ অনবধানে হারাইলে আমাদিগকে পরিণামে ক্ষতি গ্রস্থ ও অনুতপ্ত হইতে হইবে। আশা হয় অচিরাৎ হিন্দু জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতঃ মানবীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সক্ষম হইবেন।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

ইশা খাঁ।

(কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভৌমিক মসনদ এ আলি ইশা খাঁ এখন আর বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। বিগত শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত তিনি ঐতিহাসিকদিগের নিকট কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এই কারণে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার নাম প্রচলিত ইতিহাস পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিতে সাহস করেন নাই। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকার ডাক্তার ওয়াইজ বার ভূঞা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন।* ইহার পর বঙ্গীয় লেখকগণ তাঁহার এই

* বিগত শতাব্দীতে বোধ হয় Dr. Wise ই সর্ব্ব প্রথম ইশা খাঁর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধেও এই রূপ আভাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"The story of his (Ishakhan's) life is not only interesting but importent as it illustrates a period of Bengal History which is ommitted in standard Histories. Stewart does not mention his name although he was one of the most able and indefatigable foes met with by the Emperor Akbor." (J. A. S. B. 1874. Page 209.)

সংক্ষিপ্ত কাহিনীর উপর উত্তরোত্তর রং ফলাইয়া ইশা খাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এইরূপ চেষ্টাতেও এতদিন পর্য্যন্ত তাহার ঐতিহাসিকত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় নাই। সম্প্রতি (১৯০৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী) ইশা খাঁর বংশধর দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগান বাটীতে (মনোহর বাগ)

দেওয়ান বাগে প্রাপ্ত ইশা খাঁর কামান।

ভূগর্ভ খনন করিতে করিতে ইশা খাঁর নামাঙ্কিত কামান প্রাপ্ত হওয়ায় আজ তিনি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন এবং তাহার লীলা ক্ষেত্র পূর্ব্ববঙ্গের শ্যামল ভূমিও ধন্য হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রহেলিকার মীমাংসার পথও উজ্জ্বল হইয়া আসিয়াছে।

কামান সাতটীর প্রথমটীতে পারস্য ভাষায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে—

"দর আহ্‌দে বাদসাহা আদেল শেরসাহ
খেলেদাল্লাহু মুলকুহু ও সুলতানুহু দর তারিখে
নাহছদ চেহেল নাহ্‌ আমল সৈয়দ আহম্মদ রুমী।"

অর্থাৎ ন্যায় পরায়ণ রাজা সের সাহার রাজত্ব সময় ৯৪৯ হিজিরা অব্দে সৈয়দ আহম্মদ রুমী কর্ত্তৃক কামান নির্ম্মিত হয়।

এই শ্লোকের নীচেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে "তরপ রাজা"। দ্বিতীয় কামানে কয়েকটী দাগ ব্যতীত কোন অক্ষর নাই। তৃতীয় কামানে পারস্য ভাষায় লেখা আছে—

"সরকার মহব্বত খাঁ"

৪র্থ টীতেও বিশেষ কিছু লিখা নাই।

৫মটীর গাত্রে বঙ্গাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে—

সরকার শ্রীযুক্ত ইছা খাঁ
ন মসনদ্দাম্বি সন হাজার
১০০২

৬ষ্ঠ ও ৭ম কামানেও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিছু পাওয়া যায় নাই।

এই কামানগুলির আবিষ্কার বিবরণ যথা সময়ে ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর মিঃ ষ্টেপলিটন এম, এ, বি, এস, সি এসিয়াটীক সোসাইটীর জার্নেলে ও আমি তাহা অবলম্বন করিয়া "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে" আলোচনা করিয়াছিলাম। এই সকল কামান হইতে প্রকৃত ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া এস্থলে তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অপরিচিত অধ্যায়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইশা খাঁ ক্ষত্রিয় সন্তান। তাঁহার পিতার নাম কালিদাস সিংহ। কালিদাস বাইসওয়ারা রাজপুত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তিনি অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত "গজদান" নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া বাসস্থানের

নাম অনুসারে "গজদানী" উপাধিতেও পরিচিত ছিলেন। *

কালিদাস বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাঙ্গলায় আগমন করেন। অবশেষে তিনি বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা বাহাদুর সাহের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। (১৫৫৫—১৫৬০ খ্রীঃ)

বাহাদুর সাহ নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে পর, তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জেলাল উদ্দিন (জৈনদ্দিন) বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও কালিদাসকে শ্রদ্ধা করিতেন।

জেলালউদ্দিনের ৩ তিন কন্যা ও এক শিশু পুত্র ছিল। তাহার প্রথমা কন্যাকে পরম ধর্ম্ম পরায়ণ সৈয়দ ইব্রাহিম মালিক উল উমরা বিবাহ করেন, দ্বিতীয় কন্যাকে কালাচাঁদ ও তৃতীয় কন্যাকে কালিদাস গজদানী বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ ও ক্ষত্রিয় সন্তান কালিদাস ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে কালাপাহাড় ও সোলেমান খাঁ নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিলেন। †

জেলালউদ্দিন পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলে সোলেমান জেলালের শিশু পুত্রকে পিতৃ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সুযোগে গিয়াসউদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তি জেলালের শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। ফলে বাঙ্গলার সিংহাসন লইয়া এক মহা বিপ্লবের সূচনা হয়। *

এ দিকে সের সাহের পুত্র সলিম সাহ সোলেমান ও গিয়াসউদ্দিন উভয়কে বিদ্রোহী বলিয়া অবিহিত করেন এবং তাজখাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই আক্রমনে গিয়াসউদ্দিন হত ও সোলেমান কারারুদ্ধ হইলে বাঙ্গলার সিংহাসন কররাণী বংশের হস্তগত হয়। †

দেওয়ান সোলেমান খাঁ, ইশাখাঁ ও ইছমাইল খাঁ নামক দুই পুত্র ও সায়েন সা ‡ নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃহীন পুত্রদ্বয়- ইশা খাঁ ও ইছমাইল খাঁ রাজকারাগারে নিক্ষিপ্ত এবং অবশেষে দাসরূপে বিক্রীত হয়। *

যে শিশু দুর্ভাগ্যের অমোঘ তাড়নায় দাসরূপে বিক্রীত হইয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতে সুদূর মধ্য এসিয়ায় চিরতরে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, কে বুঝিয়াছিল সৌভাগ্য

---

* বাস স্থানের নাম অনুসারে উপাধি প্রথা মুশলমান শাসন সময়ে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, যথা গজনভি, পানি, কাসিমপুরী, গজদানী ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে এক নামে দুই ব্যক্তি থাকিলেও বাসস্থানের নাম পশ্চাতে সংযুক্ত করিয়া পরিচয় প্রদানের রীতি ছিল। কালিদাস সিংহ এই কারণেই কালিদাস সিংহ গজদানী নামে পরিচিত ছিলেন। ইশা খাঁর বর্ত্তমান বংশধরগণ তাঁহাদের যে বংশ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে "কালিদাস প্রত্যহ ইষ্ট দেবতার পূজা সমাপন করিয়াই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া স্বর্ণগজ অর্থাৎ স্বর্ণ নির্ম্মিত হস্তী দান করিতেন। এই স্বর্ণ-গজ দানের জন্য তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক গজদানী উপাধি ভূষণে ভূষিত হন।" (মসনদালী ইতিহাস) কেহ কেহ আবার বলেন কালিদাস প্রতিদিন ১ গজ করিয়া স্বর্ণ (?) দান করিতেন বলিয়া গজদানী নামে পরিচিত ছিলেন। বলা বাহুল্য এইরূপ অসম্ভব কল্পনায় বাহুল্য আবরণে অনেক প্রকৃত তত্ত্বও ঢাকা পড়িয়া বিকৃতাকার ধারণ করিতেছে।

† জঙ্গলবাড়ীর ইতিহাস লেখক সোলেমান খাঁ ও বঙ্গেশ্বর সোলেমান কররাণীকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। বাস্তবিক তাঁহারা এক ব্যক্তি নহেন। সুলেমান খাঁ যখন জেলালউদ্দিনের দেওয়ান ছিলেন, তখন সোলেমান কররাণী বেহারের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। সোলেমান দেওয়ান ছিলেন বলিয়াই তাঁহার বংশ অর্থাৎ ইশা খাঁর বংশধরগণ এখনও দেওয়ান উপাধিতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

* রিয়াজউস-সলাতিন ১৪২ পৃষ্ঠা ও J. A. S B 1874; Akbar name Vol III 432.

† এই বিবরণ আকবর নামার অনুবাদক এইরূপ প্রদান করিয়াছেন

The father of the chief (Isakhan) was a man of Bais tribe of Rajput who used frequently to display his arrogance and break out in rebellion. In the time of Salim Khan Taj Khan & Darya Khan strong armies were sent in to the country and after a severe struggle the chief was compelled to seek a truce. After a short time he again broke out a rebellion but was taken prisoner and put to death.

Elliot's History of India (VI) p. 23.

‡ সায়েন সা বিবিকে তাজউদ্দিন খাঁ বিবাহ করেন। তাজউদ্দিনের পুত্র সা মহম্মদ তয়পের সুপ্রসিদ্ধ পীর হজরত কুতুবল আউলিয়ার ভগ্নী বিবাহ করেন। তাহার বংশধরের এখনও জীবিত আছেন।

* Akbar Nama (Elliot, Vol VI)

লক্ষ্মী তাঁহারই গলে অচিরকাল মধ্যে পুনরায় বিজয়ের বর মাল্য দান করিবেন।

তাজ খাঁ কররাণীর শাসনকালে কুতুব খাঁ রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। কুতুব খাঁ স্বীয় ভাগিনেয় ইশা খাঁ ও ইছমাইল খাঁর তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যথা সময়ে মাতুলের * যত্নে ও চেষ্টায় পিতৃহীন ভ্রাতৃদ্বয়—ইশা খাঁ ও ইছমাইল খাঁ দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইশা খাঁ মাতৃভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা বলে রাজদরবারে সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি তাহার মসতাত ভগ্নী তরপের সৈয়দ ইব্রাহিম মালিকউল উমরার কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করেন।

ইশা খাঁ সংসার ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া রাজ দরবার পরিত্যাগ করিলেন এবং জন কোলাহল বিমুক্ত পূর্ব্ববঙ্গের শান্তি পূর্ণ ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া লক্ষীয়া তীরবর্ত্তী খিজিরপুরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। খিজিরপুর বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অনতিদুরে উত্তর পূর্ব্ব কোনে অবস্থিত। এই পূণ্য ভূমিই ইশাখাঁর প্রাথমিক আবাস স্থল। এই বাস স্থানের নামের সহিতই তাহার নাম পরিচিত। ইতিহাসে বহু ইশাখাঁর উল্লেখ আছে, কিন্তু খিজিরপুরের ইশা খাঁ বলিতে একমাত্র ইহাকেই বুঝাইয়া থাকে। †

ইশা খাঁ খিজিরপুরে থাকিয়া স্বীয় প্রতিভা বলে তৎপ্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। এই সময় ঢাকায় একটী রাজকীয় ফাঁড়িথানা এবং সোনারগাঁয় ফৌজ দারের কাছারী অবস্থিত থাকিলেও তখন পর্য্যন্ত এতদ্দেশে মুশলমান শাসন বদ্ধমূল হয় নাই।

হুমায়ুন সাহের পলায়নের এবং সের সাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়ায় অরাজকতা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোর বিভিষিকা বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। এই অরাজকতার প্রশ্রয়ে বাঙ্গালার রাজসিংহাসন লইয়া উপর্য্যুপরি রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্রমে জেলালউদ্দিনের শিশু পুত্র, সোলেমান খাঁ, গীয়াশউদ্দিন, তাজ খাঁ কররাণী, সোলেমান কররাণী প্রভৃতির জীবন এই সিংহাসনের জন্য আহুতি স্বরূপ প্রদত্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় দেশের দশা যেরূপ হইতে পারে, সেইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। "শক্তিশালীর প্রভুত্ব ও দুর্ব্বলের দাসত্ব" বিধিই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ইশা খাঁ স্বীয় শক্তি ও প্রতিভা বলে ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গের বহু অংশ হস্তগত করিয়া লইতে লাগিলেন।

এই প্রকার দেশব্যাপি অরাজকতা লক্ষ্য করিয়া যে কেবল ইশা খাঁই শক্তি সঞ্চয়ে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এমন নহে। বাঙ্গালার বহু ভূম্যধিকারী আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সোনার গাঁয়ে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে রাজকীয় শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল, তৎস্থলে দেশীয় ভূম্যধিকারীগণ উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। (আগামী বারে সমাপ্য)।

* আকবর নামার অনুবাদকগণ uncle শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রাজপুত কালিদাসের মুশলমান ভ্রাতা থাকা সম্ভব পর নহে বিবেচনায় আমরা কুতুব খাঁকে ইশা খাঁর মাতুল বলিয়া পরিচয় করিলাম। আমাদের এ অনুমান সত্য কিনা, ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন।

† ইতিহাসে বহু ইশাখাঁর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকেরই মসনদ ই আলি উপাধি ছিল। কয়েক জন ঈশা খাঁর পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) হিজলির ইশা খাঁ—ইনি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা কতুলু খাঁর সেনাপতি ছিলেন।

(২) উমর খাঁর পুত্র ইশা খাঁ—ইনি সের সাহার রাজত্ব কালে লাহোরের জায়গীরদার হন এবং মসনদ ই আলী উপাধি প্রাপ্ত হন। (Tarekhi Sher Sahi).

(৩) সেখ মলাইর পুত্র ইশা খাঁ—ইনি ইশা খাঁ নিয়াজি নামে পরিচিত ছিলেন (Vide Tarekhi Sher Sahi).

(৪) মসনদ ই আলী হয়বৎ খাঁ সাহখাইলের পুত্র ইশা খাঁ ইনিও মসনদ ই আলি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (Vide Tarekh Sher Sahi)

(৫) ইশা খাঁ সুরী—তারিখি দাউদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

(৬) মির্জ্জা ইশা তার খাঁ—তারিখি জাহাঙ্গিরি ও তারিখই আকবরি গ্রন্থে এই ইশা খাঁর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তিব্বত অভিযান।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গিয়াংসী অধিকার।

"গিয়াংসী" শব্দের অর্থ 'উন্নত শৃঙ্গ'। ইহাতে যেন কেহ এমন মনে না করেন যে, ইহা এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। ইহা একটী উন্নত উপত্যকা। চারিদিককার সবুজ রংএর সমতল ময়দান দেখিলে ইহাকে আর পার্ব্বত্য দেশ বলিয়া মনে হয় না। প্রথম দর্শনে আমার ত বঙ্গদেশকে মনে পড়িয়াছিল। ইহা আমাদের সুজলা, সুফলা জন্মভূমির মত বলিয়া এ দেশের লোক ইহাকে 'নিয়াং' বা 'আনন্দ প্রদেশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সেইজন্য গিয়াংসীর তটবাহিনী নদীকে পর্য্যন্ত ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। শুনিলাম, কোনও সময়ে ইহা সমগ্র তিব্বতের মধ্যে এক বিশেষ পরাক্রান্ত প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত।

গিয়াংসী তিব্বতের এক প্রধান সহর। লাসার নিম্নেই ইহার স্থান। সিলিগুড়ি হইতে ইহা ২১৩ ও লাসা হইতে ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে নেপাল, ভুটান, সিকিম, মধ্য এসিয়া, এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যেমন সুগম পথ আছে, তিব্বতের অন্য কোনও সহর হইতে তেমন নাই। এইজন্য ইংরাজের মতে গিয়াংসী তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান স্থান। ইংরাজ বাণিজ্যপ্রিয় জাতি। বাণিজ্যই ইংরাজের সমস্ত উন্নতির মূল কারণ। তিব্বতের সহিত অবাধ বাণিজ্য স্থাপনের জন্যই আজ ইঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ও এই ভীষণ শীতকে তুচ্ছ করিয়া এই অভিযান তিব্বতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই গিয়াংসী ইংরাজের লক্ষ্যস্থল ছিল। আজ আমরা ইহার দ্বারে উপস্থিত। ইহা আমরা যে কি ভাবে অধিকার করিব তাহা ভবিষ্যগর্ভে নিহিত।

গিয়াংসী দুর্গের ডিহুঁ ও তাহার পার্শ্বচরগণ।

এই সহরের দুর্গটী এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। এই পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফুট, ঠিক নদীর উপর অবস্থিত। পশ্চিম তিব্বত দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে এক এক জন শাসনকর্ত্তা (ডিহুঁ) নিযুক্ত আছেন। গিয়াংসী এই বিভাগের অন্যতর। প্রত্যেক ডিহুঁর অধীনে দুই জন করিয়া জহুঁ (ম্যাজিষ্ট্রেট) আছেন। এক এক বিভাগে ৫০ জন চীনা সৈন্য ও ৫০০ তিব্বতীয় সৈন্য থাকে।

যে পর্ব্বতের উপর গিয়াংসী দুর্গ অবস্থিত তাহা পূর্ব্বদিকে ক্রমে ক্রমে নামিয়া গিয়া আবার প্রায় ৪০০।৫০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের মত। এই নিম্ন স্থানের মধ্যে গিয়াংসী সহর অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক পর্ব্বতের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, অপর পর্ব্বতের উপর এক বিশাল বৌদ্ধ মঠ দণ্ডায়মান। এই মঠের লামাদিগের পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণের। পথিমধ্যে আমরা যতগুলি মঠ দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বোধ হয় সকল গুলিতেই লামাদিগের এই প্রকার পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলাম। তিব্বতের কোনও

ইংরেজ শিবিরে তিব্বতীয় রাজ কর্ম্মচারী।

কোনও স্থানে পীতবর্ণের পরিচ্ছদধারী লামা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছদ পার্থক্যের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গিয়াংসী সহরে অনুমান প্রায় ১০০০০ লোকের বাস। সহর বাসীরা দুই প্রকার উপায়ে জীবন ধারণ করে। কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়। ইহার মধ্যে কৃষকের সংখ্যাই অধিক। চারিদিককার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া কৃষকেরা অতি অল্লায়াসে সুফল লাভ করে। এখানকার বণিকেরা ভারতবর্ষ, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করে।

আমরা গিয়াংসী প্রবেশ করিবার দুইঘণ্টা পরে জেনারেল সাহেব ডিহুঁকে দুর্গ সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ইহার উত্তরে কয়েকজন তিব্বতীয় কর্ম্মচারী জেনারেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "দুর্গের মধ্যে এখন কোনও সৈন্য নাই। এ অবস্থায় দুর্গ অধিকার করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।"

জেনারেল সাহেব অবশ্য এ আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি আদেশ দিলেন যে, পর দিবস প্রাতঃকাল আটটার মধ্যে দুর্গ সমর্পিত না হইলে, তিনি উহা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমাদের সকলের উপর হুকুম রহিল যে, তাঁহার আদেশ ভিন্ন যেন কেহ শিবির ত্যাগ না করি। তিনি জানিতেন যে, গিয়াংসীর অধিবাসীরা প্রায় সকলেই আমাদের উপর আন্তরিক অসন্তুষ্ট। এ অবস্থায় আমাদের কাহাকেও অরক্ষিত অবস্থায় পাইলে অনায়াসে ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

পর দিবস নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলেও যখন কোনও উত্তর আসিল না, তখন জেনারেল সাহেব ৩০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্গের কিয়দ্দূরে ডিহুঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন যে, দুর্গের মধ্যে আর কেহই নাই। আমরা অনায়াসে উহা অধিকার করিতে পারি। ইহার অর্দ্ধ ঘটিকা পরে দুর্গের সর্ব্বোচ্চ তোরণে ব্রিটিস্ পতাকা সগর্ব্বে উড়াইয়া দেওয়া হইল—অথচ একবিন্দু রক্তপাত হইলনা।

দুর্গের অবস্থা খুব ভাল বলিয়া মনে হইলনা। ইহার অধিকাংশ স্থান প্রাচীন; কখনও যে রাজমিস্ত্রির সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহার কোন পরিচয় কোথাও নাই। খানিকটা স্থান আধুনিক বলিয়া মনে হইল। বারুদ, তিব্বতের প্রস্তুত প্রাচীন ধরণের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অনেক রহিয়াছে। খাদ্যাদি কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। তাহাতে আমরা অবশ্য হতাশ হইলাম

না। কেননা আহার্য্য দ্রব্য আমরা যথেষ্ট সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া গ্রামের লোক বিশেষ ভীত বোধ হইল না। ইংরাজ যে অত্যাচারী নহে, তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। আমাদের সহিত প্রকাশ্যে কেহ কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করিল না।

বৈকালে আমরা গিয়াংসীর মঠ দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। মঠটী অনেকটা দুর্গের ন্যায়। উহার প্রধান দ্বার বন্ধ করিলে উহা হস্তগত করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা এক পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। মঠের চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর। উপরে উঠিবার ভাল পথ নাই। আমরা প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গন, দালান ও কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া প্রধান কক্ষে উপস্থিত হইলাম। উহার পশ্চিমদিকে বুদ্ধদেবের এক বিশাল মূর্ত্তি। দেবতা ধ্যানে মগ্ন। উভয় বাহু বক্ষের উপর স্থাপিত। মূর্ত্তির সম্মুখে দুইটি পিত্তলের পাত্রে মন্ত্রপূত সুগন্ধ-সলিল রক্ষিত। যাত্রীদিগকে উহা প্রদান করা হয়। মূর্ত্তির ঠিক সম্মুখে একটি ধাতুময় বৃহৎপ্রদীপ অতি স্নিগ্ধভাবে জ্বলিতেছে।

মঠের একস্থানে আমরা বহুসংখ্যক প্রাচীন পুস্তক দেখিতে পাইলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল বলিয়া আমরা উহা ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম, জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী উহার অধিকাংশ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন।

আমরা শিবিরে ফিরিয়া গিয়া শুনিলাম যে, দুর্গের এক নিভৃত স্থানে বহুল পরিমাণ গম, যব ও দাইল পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয়েরা জানিত যে, আমরা অবিলম্বে গিয়াংসী অধিকার করিব। এ ক্ষেত্রে তাহারা যে, বারুদ, বন্দুক ও খাদ্য দ্রব্যাদি সরাইয়া ফেলে নাই, তাহাতে আমরা সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইলাম। কোনও চতুর জাতিই এ ভাবে কাজ করিত না।

ঐ খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে আরও একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এক গোপনীয় কক্ষের ভিতর বহুসংখ্যক মনুষ্যের অস্থি রক্ষিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহার মধ্যে একটিও মস্তক নাই। শুনিলাম তিব্বতে এই প্রকারে সাজা দেওয়া হয়—মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

একদিন শুনিলাম যে, আমাদের জেনারেল সাহেব আদেশ দিয়াছেন, গিয়াংসী দুর্গ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। আমাদের সঙ্গে এমন অধিক সৈন্যাদি ছিলনা যে, এই প্রকাণ্ড দুর্গকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করি। অনেকে হয়ত ইংরাজের এই ব্যবহারকে নিতান্ত অন্যায় মনে করিতে পারেন। আমি কিন্তু তাহা মনে করি না। তিব্বত আমাদের নিকট প্রতিবাসী। এপ্রকার স্থানে রুসের আধিপত্য আমাদের পক্ষে যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম হইতে দণ্ডায়মান না হইলে, শেষে আমাদিগকে যে অত্যন্ত গোলযোগে পড়িতে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তিব্বত অভিযানের ইহাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিব্বতীয়েরা যাহাতে আমাদের সহিত মিত্রতা স্থাপিত করে, তাহার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হওয়াতে এই অভিযান প্রেরিত হয়। তাহারা যদি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে, এই অভিযান আজ ইতিহাসে স্থান পাইত না। গিয়াংসী আমাদের পক্ষে ঘোর বিদেশ, তারপর সঙ্গে আমাদের সৈন্যবল খুব কম। তিব্বতীয়েরা যে আমাদের সহিত সাধ্যমত শত্রুতা করিতেছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। গিয়াংসী ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এরূপস্থলে এ প্রকার প্রকাণ্ড দুর্গ অরক্ষিত অবস্থায় পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া যে নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ, তাহা বলা বাহুল্য। এই ঘোর বিদেশে সামান্য মাত্র ভ্রম হইলেই সকলকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাইতে হইবে। জেনারেল সাহেবের হাতে প্রায় ১০,০০০ লোকের জীবন রক্ষার ভার। তাঁহার কৃত কর্ম্মের উপর মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে আমাদের উচিত, নিজেকে তাঁহার স্থানে স্থাপিত করা।

একদিন একজন সহরবাসী বিশেষ ধমধামের সহিত জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শুনিলাম, ইনি সিকিম রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ষোল বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন তিব্বতীয় লামা সিকিমে এক রাষ্ট্র বিপ্লবের (civil war) সূচনা করেন। তখন এই যুবরাজের বয়স খুব অল্প

ছিল। ঐ গোলযোগের সময় লামারা ইঁহাকে অপহরণ করিয়া তিব্বতে লইয়া আসেন। তাহার পর যখন সিকিম রাজের মৃত্যু হয়, ইংরাজ ইঁহাকে সিকিমের শূন্য সিংহাসনে বসিবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু কি জন্য বলিতে পারি না, রাজকুমার ঐ আহ্বানে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিকিমের সিংহাসন প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ইনি গিয়াংসীর নিকট এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেছেন। তিব্বত গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে এক জায়গীর প্রদান করিয়াছেন।

ইহার পর ১৯ এ এপ্রেল জেনারেল সাহেব ৬০০ সৈন্য, কয়েকজন অশ্বারোহী, কয়েকটা তোপ, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ব্র্যানণ্ডারের (Lt. Colonel Brander) অধীনে স্থাপিত করিয়া চুম্বি ফিরিয়া গেলেন। আমরা তিনজন বাঙ্গালী এই খানেই রহিলাম। আমাদের সঙ্গে তিন সপ্তাহের খাদ্য দ্রব্য রহিল।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

কবির দান।

(১)

কোথা পাব আমি অমূল্য মণি—
মুকুতায় গাঁথা হার,
কি আছে রতন—দিতে তোমা উপহার!
শুধু কথা গাঁথি' হৃদয়ের সুরে
এনেছি করিতে দান—
উদ্দেশে তব—আমার ক্ষুদ্র গান।

(২)

উষার আলোকে কতফুল আজি
ফুটেছে কানন ভরি';
সন্ধ্যার ছায়ে—নীরবে পড়িবে ঝরি'।
তখনো কোমল বন-যুথিকার
মৃদু সৌরভ সম
ঘিরিয়া তোমায়—রহিবে এ গান মম।

(৩)

বাতাসের সাথে মিশিয়া নিশীথে
শত ছন্দে অবিরাম
গানটি আমার—ধ্বনিবে তোমার নাম।
উজ্জ্বল করি' মূরতি তোমার
থাকিবে এ চিরদিন
আঁধারে যেমন—দীপ নির্ব্বাণহীন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

৺হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন।

প্রাচীন ভারতের রাজধানা, বাণীর পাদ-পিঠ নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় গত ২৪শে চৈত্র ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রতিভা ও মনীষার জন্মভূমি নবদ্বীপ, অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র সম্পূজিত। বাঙ্গালীর গৌরব নব্য ন্যায়ের আদি প্রবর্ত্তক স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের নাম এ দেশে হিন্দুমাত্রের নিকটেই সুপরিচিত। বাঙ্গালী হিন্দু মনু জানে, পরাশর জানে, কিন্তু মানিয়া চলে এক রঘুনন্দনের ব্যবস্থা। রঘুনন্দনের বিধিই বাঙ্গালীর বেদ-বিধি। সেই মহাপণ্ডিত রঘুনন্দন নবদ্বীপের যে আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই আসনের স্থান ও সম্মান যে সর্ব্বোচ্চ ইহা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন ময়মনসিংহ জেলার একটী নিভৃত পল্লিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও দেশের পণ্ডিতকুল চূড়ামণিগণের অধ্যসিত সেই নবদ্বীপের, সেই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বজন বরেণ্য আসন অতি গৌরবের সহিত অলঙ্কৃত করিয়া জন্মভূমি ময়মনসিংহের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার তিন মাইল পশ্চিমে সাকরাইল গ্রামে ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ১০ই অগ্রহায়ণ পণ্ডিতাগ্রগণ্য হরিশ্চন্দ্র দেশ বিখ্যাত এক পণ্ডিত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ৺কৃষ্ণমোহন সিদ্ধান্ত একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত ও সুব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৺হরিশ্চন্দ্রের পিতা ৺হরমোহন চক্রবর্ত্তীও

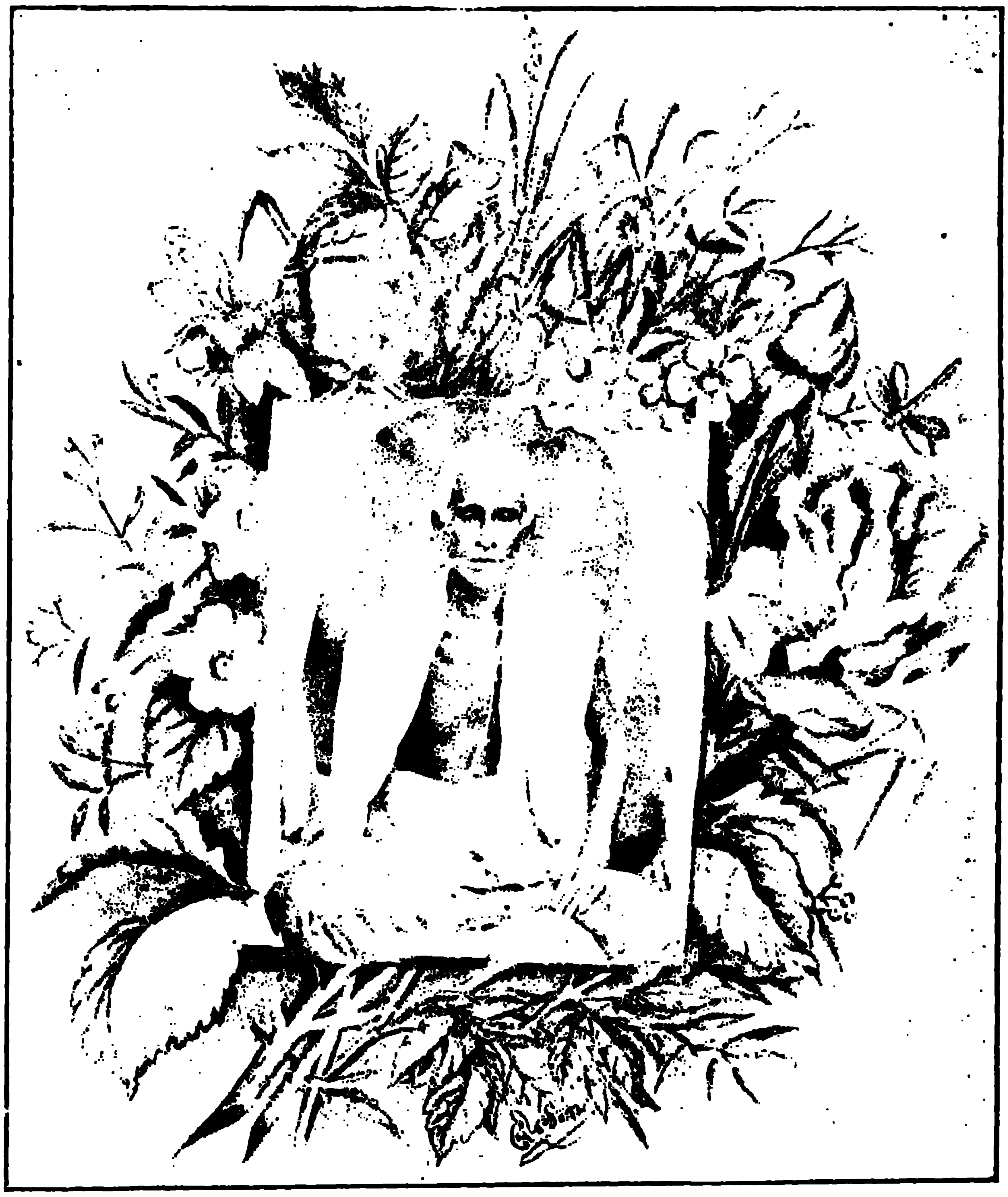

স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিশচন্দ্র তর্করত্ন।

Asutosh Press, Dacca.

পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বাড়ীতে টোল রাখিতেন ও ছাত্রদিগকে অকাতরে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন। এই বিদ্যাচর্চ্চার নিকেতনে ৺হরিশ্চন্দ্র বাল্যকালে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্রের অগ্রজ ৺রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সদাচারী লোক ছিলেন। তাঁহার কলাপ ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি কোন উপাধি না লইলেও স্থানীয় পণ্ডিত সমাজে তাঁহার বেশ আদর ছিল। স্বগ্রামে হরিশ্চন্দ্রের পার্শি ও গ্রাম্য পণ্ডিতের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা আরম্ভ হয়। পার্শির ২। ১ খানা সাহিত্য পুস্তকও তিনি পড়িয়াছিলেন। এই সময় হরিশ্চন্দ্র তাহার সমবয়স্কদিগের দলপতি ছিলেন। বৃক্ষারোহণ, সন্তরণ প্রভৃতি বিদ্যাতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বালকের দলপতি বলিলে যাহা যাহা বুঝা যায়, সে সমস্ত বিষয়ে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত পণ্ডিত বাড়ীর ছেলের সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করাই সমীচীন বোধ হওয়ায়, হরিশ্চন্দ্র কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বাড়ীতে সর্ব্বকনিষ্ঠ বিধায় অনেক সময় তাঁহার পড়াতে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সে জন্য তাহার সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শদাতা ও শুভানুধ্যায়ী মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত দিনাজপুরের রাজ কর্ম্মচারী ৺গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি অনতিদূরস্থিত অশোকপুর গ্রামে ৺রামগতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই বয়সেই হরিশ্চন্দ্র কাব্যামোদী হইয়া উঠেন। অতি অল্প সময়ে ইনি অতি সুললিত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। গৌরমোহন বালক হরিশ্চন্দ্রকে বহুদূরে পাঠাইতে সাহস করিলেন না। তখনকার দিনে এখনকার মত সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা ছিলনা। নৌকায় অথবা পদব্রজে ছাড়া যাতায়াত করা যাইত না। রেল, ষ্টিমার সে সময়কার লোকের স্বপ্নাতীত ছিল। পাছে বালক বহুদূর দেশে একাকী যাইয়া বিপদে পতিত হয়, সেই ভয়ে তাহাকে নিকটবর্ত্তী ভাল টোলে প্রেরণ করা হইল। সে সময় অধ্যাপক ও অধ্যাপক পত্নীগণ বিদ্যার্থীদিগকে স্বপুত্রবৎ পালন করিতেন ও অসুস্থাবস্থায় সাধ্যানুসারে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ত্রুটী করিতেন না। তথাপি সুকুমার বালকদিগকে বহুদূরে পাঠাইতে পিতা মাতা সাহস করিয়া উঠিতেন না। চারি মাইল দূরবর্ত্তী অশোকপুর গ্রামেও অধ্যয়ন কালে তাহার প্রায়ই পড়াশুনার বাধা পড়িতে লাগিল। তিনি মাতার ছোট ছেলে বলিয়া তাঁহার সাদর আহ্বান অবহেলা করিতে পারিতেন না। সেই জন্য সময় সময় বাড়ী আসিতে হইত। এইরূপ অনর্থক বাধাতে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না, ইহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তীস্থানে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া আটীয়া পরগণার হালালিয়া গ্রামে বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺ রামচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে নির্ব্বিবাদে বিদ্যার্জ্জন জন্য যাইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিতেই ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই স্থানেই হরিশ্চন্দ্র ব্যাকরণের কবিরাজ, পঞ্জি ও পরিশিষ্ট-সম্যক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়েই ব্যাকরণে তাহার ব্যুৎপত্তি অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল।

পূর্ব্বে ময়মনসিংহের পণ্ডিতগণ বিক্রমপুর ও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অনেক কম বিদায় পাইতেন। বহুকাল পরে মুক্তাগাছার রাজবাড়ীতে যখন ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের বিদায়ের সহচার লইয়া বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হয়, তখন ময়মনসিংহ বাসী প্রধান ব্যবসায়ী বৈয়াকরণের অনুপস্থিতিতে হরিশ্চন্দ্র বিক্রমপুরের প্রধান বৈয়াকরণের সহিত বিচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইহা কম সাহসের কথা নয়। বহুকাল পূর্ব্বে তাহার ব্যাকরণ পাঠ সমাধা হইয়াছিল। এই বিচারের ফলে ময়মনসিংহের অপ্রতিষ্ঠা দূর হওয়া নির্ভর করিতেছিল। বারিষ্টারকে মোক্তারের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার মত বিখ্যাত স্মার্ত্ত হইয়া ব্যাকরণের বিচার করার অপমান স্বীকার কেবল স্বজেলার গৌরব স্থাপন উদ্দেশ্যেই তিনি করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত জালেশ্বরে প্রথিত নামা সাহিত্যিক ৺ কৃষ্ণজয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার পাঠ করেন।

জালেশ্বর যাওয়ার সময় একটী হাস্যোদ্দীপক ঘটনা ঘটিয়াছিল। সাকরাইল হইতে জালেশ্বর হাটিয়া যাইতে হইলে যমুনা নদীতে খেয়া পার হইয়া পাবনার ভিতরদিয়া যাইতে হয়। একদা সমস্ত দিন হাটিয়া সন্ধ্যার পর তিনি

এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়ার আশায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীর সদর ঘরে বেড়া আছে বটে কিন্তু ঝাঁপ নাই। সেই ঘরে বসিয়া গৃহস্বামী ও তাহার বন্ধু বর্গ গ্রাবু খেলায় মত্ত। হরিশ্চন্দ্র আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া খেলোয়ারদের পাশে আসন গ্রহণ করিলেন। কেহই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। খেলা চলিতে লাগিল; কতক্ষণ পর একজন খেলোয়ার উঠিয়া গেলে লোকাভাবে আগন্তুক হরিশ্চন্দ্র খেলার জন্য আহুত হইলেন। খেলায় সকলেই এরূপ মত্তছিলেন যে কেহই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। অধিক রাত্রি হওয়ায় যখন অন্ন শীতল ও গৃহিণী গরম হওয়ার আশঙ্কা হইয়া উঠিল, তখন খেলোয়ারগণ সকলে একে একে উঠিয়া গেলেন, বাকী থাকিলেন গৃহস্বামী ও হরিশ্চন্দ্র। তখন গৃহস্বামী বুঝিতে পারিলেন এই অপরিচিত লোকটী বিদেশী। ব্রাহ্মণ কোপন স্বভাব ও ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন; অতিথি "নারায়ণ" এই সংজ্ঞা ভুলিয়া যাইয়া হরিশ্চন্দ্রকে স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন। বাড়ীর বাহিরে ব্যাঘ্রভীত-গৃহে স্থান দিতে গৃহস্থ অনিচ্ছুক। হরিশ্চন্দ্র মহাশঙ্কটে পড়িলেন। শঙ্কট হইলেই ভগবান তাহার নিবারণের উপায়ও করেন। গৃহস্থ অতিথিপরায়ণ না হইলেও তাহার গৃহিণী লক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিলেন। নিরাশ্রয় যুবকের শঙ্কট বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহাকে আশ্রয়দিলেন এবং তাহার আহার ও শয়নের সুব্যবস্থা করিলেন। এই অতিথি বাৎসল্য লইয়া কর্ত্তা ও গিন্নিতে ঝগড়া উপস্থিত হইল। শেষ ব্রাহ্মণ ধূমপানের সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া বাহিরের ঘরে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গী হইলেন। হরিশ্চন্দ্রও বিদেশে একা ঘরে থাকার দায় হইতে বাঁচিলেন। পরদিন গৃহিণী ভালরূপে অতিথি সৎকার না করিয়া তাহাকে যাইতে দিলেন না।

জালেশ্বরে অনেকগুলি সাহিত্যগ্রন্থ ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া হরিশ্চন্দ্র ন্যায় দর্শন পড়ার অভিপ্রায়ে বিক্রমপুর গমন করেন। বিক্রমপুরের তদানীন্তন প্রধান নৈয়ায়িক ৺ সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের টোলে শব্দখণ্ড ও অনুমান খণ্ড পাঠ শেষ করিয়া তিনি ফুরসাইলের বিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺ জগৎচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। যখন হরিশ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোলের ছাত্র সেই সময় বিক্রমপুর পরগণায় ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান ব্যবস্থাপক কে? ইহা লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। এই প্রাধান্যের সম্মান স্বরূপ প্রতি সভায় ১৲ অতিরিক্ত প্রণামী পাওয়া যাইত। ফুরসাইলের সার্ব্বভৌম মহাশয় ও দক্ষিণ পারের ৺ তারিণী চরণ শিরোমণি মহাশয় উভয়েই প্রাধান্য দাবী করিতেন। শ্রাদ্ধ বাসরে, বিবাহ সভায়, ব্রতপ্রতিষ্ঠাস্থলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাতেই ইহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ চলিতে লাগিল প্রাধান্যের বিদায় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিতনা। ইহার মীমাংসার জন্য সামাজিকগণ স্থির করিলেন যে শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি জয়ী হইবেন, তাঁহার প্রাধান্যই স্বীকৃত হইবে। এইরূপ দুইজন বিখ্যাতস্মার্ত্তের বিচারে উপস্থিত প্রধান নৈয়ায়িকগণ মধ্যস্থ হইলেন। তখন প্রশ্ন উঠিল, পূর্ব্বপক্ষ কে করিবে? উভয়েই অস্বীকার। উভয়েই উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক। প্রশ্ন করিলেই হীনতা ঘটে। তখন হরিশ্চন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, যে উভয়েরই ছাত্র উপস্থিত; একের ছাত্র অপরের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যখন ছাত্র নিরস্ত হইবে, তখন তাহার অধ্যাপক তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। ইহাতে কাহারও হীনতা নাই। উপস্থিত পণ্ডিতগণ এই প্রস্তাব সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তখন ছাত্র হরিশ্চন্দ্র, শিরোমণি মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বপক্ষ করিলেন। বিচার বহু সময় স্থায়ী হওয়ার পর শিরোমণি মহাশয় নিরুত্তর হইলেন। এই হইতে শাস্ত্রালাপে হরিশ্চন্দ্র কখনও পরাভূত হন নাই। এই বিচারের ফলে সার্ব্বভৌম মহাশয় বিক্রমপুরে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান ব্যবস্থাপক বলিয়া সর্ব্বজন-সম্মানিত হইলেন। এখন যেমন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রদের সম্মান বেশী, সংস্কৃত বিদ্যায় নবদ্বীপের ছাত্রদের তদ্রূপ সম্মান ছিল। হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য তাঁহার যজমান ৺ভৈরবনাথ সেন ও ৺গোলকচন্দ্র সেন মহাশয়দের উৎসাহে নবদ্বীপ ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে যান। তথায় স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তর্করত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি পাওয়ার পর তিনি মহামহোপাধ্যায় ৺রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের

টোলে পুরাতন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় হরিশ্চন্দ্রের ন্যায়ের জ্ঞানে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার প্রধান ছাত্র বলিয়া লোক সমাজে পরিচয় দিতেন। নবদ্বীপ পাঠ সমাপনান্তে হরিশ্চন্দ্র নিজ গৃহে টোল স্থাপন করিয়া সমাগত ছাত্রদিগকে আহার ও বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। টোলে স্মৃতি, বাদার্থ, সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যাপনা করিতেন। তাহার নিকট নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও বরিশাল প্রভৃতি দুরদেশ হইতেও ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এইরূপে টোলের স্থাপনা হইতে প্রায় ১৫ বৎসর অধ্যাপনা করার পর তাঁহার বেদান্ত, মীমাংসা দর্শন ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করার ইচ্ছা প্রবল হইল। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। কাশী যাওয়ার সময় হুগলি জেলার জনৈক জমিদারকে কুসুমাঞ্জলীর বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক অধ্যয়ন বায় সংকুলন করিয়াছিলেন। কাশীধামে প্রথিতযশা বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট তিনি তিন বৎসর কাল নিজ অভীষ্ট শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কাশীধামে অবস্থান কালেও অধ্যাপনা কার্য্যে বিরত ছিলেন না। নিজে একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার বিশেষত্ব এই ছিল যে অধীত পুস্তক হইলেও নিজে অধ্যয়ন না করিয়া পড়াইতেন না।

যখন ৺ ভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মুলাযোড় হইতে নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট টোলের অধ্যাপক হইয়া যান তখন সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺ তর্করত্ন মহাশয়কে মুলাযোড় কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক মনোনীত করেন। মুলাযোড় অবস্থান কালে তাহার সুযশ দক্ষিণবঙ্গে ব্যপ্ত হয়। ফলে ১৩১২ সালে নবদ্বীপ গবর্ণমেণ্ট টোলের স্মৃতির অধ্যাপকের পদ খালি হইলে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়কেই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যাপক বলিয়া মনোনীত করেন। এই নির্ব্বাচনে অনেক পণ্ডিত প্রতিবাদী হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তর্করত্ন মহাশয়েরই দাবী অগ্রগণ্য বিবেচনা করতঃ তাহাকে দেশের সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিও সুপ্রতিষ্ঠার সহিত তাঁহার শেষকাল পর্য্যন্ত সেই উচ্চতম আসনের সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

নবদ্বীপে যাহারা প্রথমে তাঁহার প্রতিবাদী ছিলেন, তাঁহার প্রতিভা ও কৃতিত্ব দর্শনে তাহারাও অল্পকাল পরেই তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার ব্যবস্থায় হিন্দু সাধারণের বিশেষ আস্থা ছিল ও লোকের স্থির ধারণা ছিল তর্করত্ন মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্যবস্থাই দিয়া থাকেন। মুলাযোড় অবস্থানকালে বিলাত ফেরৎ একটী ব্রাহ্মণসন্তান প্রায়শ্চিত্তান্তর সমাজে গৃহীত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া ৺ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে তর্করত্ন মহাশয় বলেন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে এবং তাহাতে প্রায়শ্চিত্তকারী পাপমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা না করা সামাজিকগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উক্ত ভদ্রলোকের উপকারার্থ ৺ তর্করত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর প্রধান লোকদিগের নিকট গমন করতঃ কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিদেশ প্রত্যাগতদিগকে সমাজে গ্রহণ করার বিষয় ও ইহাতে সমাজের ইষ্টানিষ্টের বিষয় আলোচনা করেন। সমাজিকগণ অনেকে সহানুভূতি প্রকাশ করেন কিন্তু কেহই অগ্রবর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন না। সে ক্ষেত্রে ৺ তর্করত্ন মহাশয় বিফল মনোরথ হইয়া আসেন কিন্তু সেই অবধি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত বিদেশপ্রত্যাগত যাহাতে সমাজে চলিতে পারেন, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহার পর নিমন্ত্রিত হইয়া যত পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইয়াছেন প্রায় সমস্ত সভাতেই তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে নিজ মতে আনিবার অভিপ্রায়ে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। বারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তি মহাশয়কে কৃত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া সমাজে উঠার ব্যবস্থা প্রধানতঃ তর্করত্ন মহাশয়ই দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা উপলক্ষে ভাটপাড়ার প্রথিতনামা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ রায়

চৌধুরী মহাশয়ের কাশীপুরের আবাসে বিচার হয়। এই বিচারে মধ্যবর্ত্তী স্থানীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নির্দ্দেশ মতে ৺ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের যুক্তিই সমীচীন বোধ হয়। গত ফাল্গুণমাসে যখন কালীঘাটে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন হয় ও সেই সভায় যখন কৃত প্রায়শ্চিত্ত সমুদ্র যাত্রীদিগকে সমাজে গ্রহণ নিষেধাত্মক বলিয়া মত গৃহীত হয়, তখন ৺ হরিশ্চন্দ্র রুগ্নশয্যায় কলিকাতা অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের এই সংকল্পের বিরুদ্ধবাদিগণ মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন তাহার সহিত দেখা করিতে যান। ৺ হরিশ্চন্দ্র সেই জীবন মরণের সন্ধিস্থলেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টার উর্দ্ধকাল তৎবিষয়ে শাস্ত্রিয় প্রমাণাদি ও যুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহার এই একটী মহৎ গুণ ছিল যে যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তখন সে বিষয়ে তন্ময় হইতেন। এই একাগ্রচিত্ততাই তাঁহার পণ্ডিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিশয়ে বিশ্ববিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণে প্রকটিত হইবে। একদা সাকরাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের কোন ব্যবস্থার জন্য ৺ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৺ তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার নিবাস সাকরাইল গ্রামে জ্ঞাত হইয়া বলিলেন যে যাহারা গঙ্গা তীরে বাস করেন, তাহারা পানীয় আহরণার্থ অন্যত্র গমন করেন না। আপনি সাকরাইল গ্রামবাসী হইয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট না যাইয়া আমার নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা জন্য কেন আসিলেন বুঝিতে পারিনা। আপনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট ব্যবস্থা লইলে প্রকৃত শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা পাইবেন। ৺তর্কালঙ্কার মহাশয় ৺তর্করত্ন মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতেন। ভট্টপল্লীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপধ্যায় শ্রীযুত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। মুলাযোড় কলেজে উঁহারা দুইজনই অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় দুই জনের মধ্যে হৃদ্যতার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে সৌহৃদ্যে পরিণত হয়। যখন তর্করত্ন মহাশয় মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার রুগ্ন শয্যায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয় চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, বারিষ্টার প্রবর শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দেশস্থ প্রধান২ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন চিকিৎসায়ই ফল হইল না। অবশেষে ১৩২০ সনের ২৪ চৈত্র তর্করত্ন মহাশয় নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। **শ্রীকেদার নাথ সেন।**

সোনার ছবি।

আমি মনের মত যে ছবিটি
এঁকেছিলাম মনে মনে,
সারা বিশ্ব উজাড় করে
পেলেম না সেই ধ্যানের ধনে
ও রূপের রোমাঞ্চ যে দিন
ফুটে উঠ্‌ল প্রাণের গায়ে,
দেখ্‌লাম আমার সোনার ছবি
মিশিয়ে গেল তোমার পায়ে।
দেখ্‌লাম প্রাণের নূতন চোখে
সুখ দুখের শোভা রাজে,
শুন্‌লাম প্রাণের কাণে কাণে
বিশ্ব তানের বীণা বাজে।
আমার প্রতি পল কেন
তোমার সাথে রয়না গাঁথা,
জল যেমন নদীর সাথে
তরুর শাখে যেমন পাতা!
কি আশ্চর্য্য মিল,
যেন আলোর সাথে ছায়া,
আত্মার সাথে জড়িয়ে জড়িয়ে
গুটিয়ে গেল কায়া।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

স্ত্রীশিক্ষা।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কি প্রণালীতে হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দুই মত আছে। কেহ কেহ বলেন, পুরুষদের যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, স্ত্রীদিগকেও সেই রূপ শিক্ষাদান করা উচিত। কারণ স্ত্রী পুরুষ লইয়া সমাজ, সমাজ দেহের উভয়খানি সমানভাবে পরিপুষ্ট না হইলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত সমাজের মঙ্গল কোথায়? আর একদলের মত এই, স্ত্রী পুরুষ সমাজের দুইটি পৃথক অঙ্গ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন, সেই জন্য তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীও ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। ইহার উত্তরে প্রথম দল বলেন—"তা কেন হবে? তোমরা পুরুষেরাইত স্ত্রীদিগকে অনেক সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ, সেই জন্য স্ত্রীজাতির প্রকৃতিও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে! সমান সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন।"

পারেন বৈ কি?. কিন্তু তাহাতে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল, ইহাই বিচার্য্য! শরীরের দুই অঙ্গ স্বাধীনভাবে ও সমান ভাবে পরিপুষ্ট হওয়াটা ততবড় কথা নহে, যত বড় কথা হইতেছে উভয় অঙ্গের মিলিত ভাবে কার্য্য দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করা। ডান পা আগে আগে যে পথে চলিতে চায়, বাঁ পা যদি বলে,আমি সেদিকে কেন যাব, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমার যে দিকে খুসী সেই দিকে যাব, তাহা হইলে এই উভয় পদের অধিকারী ব্যক্তিকে ধরাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। সেইরূপ দক্ষিণ হস্ত যদি বলেন, আমি কেবলই খাঁটিয়া মরি কেন, তুমি বাম হস্ত, তুমি কতকদিন কাজ কর, আমি বিশ্রাম করি; তাহা হইলে বলা বাহুল্য পুরুষের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার একেবারে ক্ষান্ত হয়। বিধাতার বিধানে সমাজের দুইটি অঙ্গ, স্ত্রী ও পুরুষ কতকগুলি প্রকৃতিগত পার্থক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

উভয়ের শরীর ও মন অনেক বিষয়ে সমান হইলেও কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই বিভিন্নতার জন্যই তাহাদিগকে পৃথকরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই জন্মগতপার্থক্য রক্ষা করাই তাহাদের জীবনধারণের সার্থকতা। সেই বিভিন্নতা রক্ষা দ্বারাই স্রষ্টার সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। কেবল মানুষের মধ্যে নহে, জড়জগৎ, উদ্ভিজ্জ জগৎ, প্রাণি জগৎ এমন কি সৌরজগতেও দুইটি বিভিন্ন শক্তির পৃথক পৃথক ভাবে ক্রিয়াদ্বারা সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে। প্রাণিজগতে স্ত্রীপুরুষভেদ সকলের চোখেই পড়ে। উদ্ভিজ্জগতে পুরুষজাতীয় পুষ্পের পরাগ স্ত্রীজাতীয় পুষ্পের গর্ভকোষ মধ্যে পতিত হইয়া ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে! আবার জরজগতেও পুংত্ব শক্তির এবং স্ত্রীত্ব শক্তির ক্রিয়া পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণে অনুভূত হয়। এমন কি সৌরজগতে মাধ্যাকর্ষণ ও বিকর্ষণ (centrifugel & centripetalforce) নামে এই উভয় শক্তির ক্রিয়া গ্রহনক্ষত্রাদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রধাবিত করিতেছে। সুতরাং সমগ্রসৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এই দুইটি শক্তি সমান ভাবে ক্রিয়া করিয়া সৃষ্টি প্রবাহকে স্থির রাখিয়াছে। এই উভয়বিধ শক্তির সমতা প্রাপ্তিদ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ ক্ষণকালও তিষ্টিতে পারে না। এই উভয়বিধ শক্তির সাম্যাবস্থা সৃষ্টির অবস্থা নহে, তাহা প্রলয়ের অবস্থা। মনুষ্যজাতির পক্ষে, ইহার স্থূল অর্থ এই, স্ত্রীও পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার বিপর্য্যয় হইলে সমাজ কোন ক্রমেই টিকিতে পারে না। পুরুষের গর্ভধারণোপযোগী ক্ষমতা নাই, স্ত্রীলোকের তাহা আছে; আবার পুরুষ তাহার প্রবল শারীরিক শক্তি লইয়া যেরূপ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, স্ত্রী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা বলিয়া তাহা পারে না। এখন স্ত্রী যদি গর্ভধারণে অসম্মত হয়, অধিকন্তু ব্যায়ামাদি দ্বারা পুরুষোচিত বল লাভ করে, তবে ভগবানের এই সৃষ্টি অল্পদিনের মধ্যেই সমর ক্ষেত্রের মারামারি কাটাকাটিতে পরিসমাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতে ও আমেরিকায় রমণীদিগের সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষতা লাভ করার চেষ্টা দ্বারা সমাজে যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। *

---

* এসম্বন্ধে সম্প্রতি ঢাকা রিভিউতে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের Dr Waet Zol. এর মত এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"That boys are to be educated to be men, that irls

বিলাতে নারীদিগের এই বিকৃত শিক্ষা হইতে সাফ্রাজিট্‌স দলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা পার্লেমেণ্ট সভায় পুরুষদিগের ন্যায় ভোট দিবার অধিকার লাভের জন্য না করিতেছে এরূপ অপকার্য্য নাই। সেই ভীষণ ভোটোন্মাদিনী চামুণ্ডার দল কখনও প্রকাশ্য রাস্তায় প্রধান মন্ত্রীকে চাবুক মারিতেছে, কখনও লোকের দরজা, জানালা ভাঙ্গিতেছে, কখনও বা প্রধান প্রধান অট্টালিকা ও জাতীয় কীর্ত্তিসকল বোমা দ্বারা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে বা অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিতেছে। তাঁহাদের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, প্রচণ্ড অট্টহাস্য ও ভীমতাণ্ডব নৃত্যে আজ ইংরেজ সমাজ টলটলায়মান! মাতৃজাতির উপযুক্ত কোন গুণ তাহাদের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য গর্ভধারণ ও সন্তান পালনকে তাহারা বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিলে এইরূপ সামাজিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। যে শিক্ষাদ্বারা এইরূপ স্বভাবের বিপর্য্যয় ও বিকৃতি ঘটায় তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

একথা অবশ্যই সত্য যে এই সাফ্রাজিটস্ দল এনারকিষ্টদিগের ন্যায় সমাজের ব্যাধি স্বরূপ। আর একথাও ঠিক যে স্ত্রীশিক্ষার যে ভয়াবহ পরিণাম হইতে এই শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, আমাদের দেশে শিক্ষার বিকৃতি ততদূর গড়াইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত prevention is better than cure রোগোৎপত্তির পরে চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ যাহাতে না জন্মে সে জন্য সাবধান হওয়া অনেক ভাল। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে কে জানিত, আমাদের দেশে এনারকিষ্ট দলের উৎপত্তি হইবে? তখন যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, আজ তাহা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষগুণ সকল আমাদের দেশে এত দ্রুতবেগে আমদানী হইতেছে—আর আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই আমাদের দেশে এত অধিক পরিমাণে আসিতেছে যে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখন পর্য্যন্ত এদেশে সাফ্রাজিটস দলের উৎপত্তি না হইলেও, এদেশের পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত রমণীগণের মধ্যে সাফ্রাজিটস্‌দিগের সহিত পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্না রমণীর অভাব নাই। সুতরাং কেবল উপযুক্ত সুযোগের অভাবেই যে তাঁহারা দলে মিশিতে পারিতেছে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদের পুরুষদিগের মধ্যেই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা সর্ব্বথা সুফল উৎপাদন করিতেছে তাহা বলিবার উপায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকায় একজন চিন্তাশীল লেখকের একটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তিনি বলেন—"আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ আধুনিক কৃত্রিম শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারে ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মধ্যবিত্ত জীবন বহু বর্ষ হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে গঠিত হইতেছে। এ শিক্ষার আদর্শের সহিত জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য হয় নাই বলিয়া শিক্ষা জীবনকে একটা সার্থকতার দিকে লইয়া না যাইয়া, একটা সর্ব্বাঙ্গীন পরিসমাপ্তিতে পর্য্যবসিত না করিয়া ক্রমশঃ একটা অন্ধকার অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছে। তাই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে এরূপ কৃত্রিমতা, এরূপ অস্বাভাবিকতা, এরূপ সরলতার অভাব। যাহা কৃত্রিম তাহার বিকাশ নাই। যাহা সহজ সরল তাহার ত বন্ধন নাই, তাহাই উন্নতিশীল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই—কৃত্রিমতা পরিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজ আপনার চিন্তার মাপকাঠিতে সমগ্র সমাজের আদর্শ গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। যদি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ কখনও জনসমাজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে সে সময় যে হিন্দুসমাজ, ভারতীয় সভ্যতা ও জগতের সভ্যতার পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।"

আমিও উক্ত লেখকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতেছি,

are to be women, and hence that they must be educated differently-this selfevident principle seems to be forgotten in America. Already Nature begins to avenge herself. The American woman is slowly degenerating in consequence of her emancipation. As she leaves the sphere of her home to enter the great market of life, she becomes less able and willing to fulfil her natural duties. This is the opinion of distinguished physicians and clergymen.

The Dacca Review, July 1914, page 133.

যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কৃত্রিম আদর্শে আমাদের পুরুষদিগের জীবন গঠিত হইতেছে, সেই আদর্শ যদি স্ত্রীদিগের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয়, তবে তাহা হিন্দু সমাজ ও ভারতীয় সভ্যতার পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিনের সূচনা করিবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা আমাদের বৈষয়িক জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, আমাদের অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের জাতীয় চরিত্র দিন দিন শিথিল ও ভিত্তিহীন হইতেছে। আমাদের অসন বসনে আচার ব্যবহারে কৃত্রিমতার বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ও এখন স্বাভাবিক উপায়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া কৃত্রিম উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছে। যে দৃশ্য স্বভাবতঃ সুন্দর আমাদের চক্ষু এখন আর তাহাতে পরিতৃপ্ত নহে, পশ্চিম দেশে কাহাকে সুন্দর বলে তাহা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের কর্ণ এখন আর দেশীয় রাগরাগিণীর মাধুর্য্যে সন্তুষ্ট নহে, বিলাতী সুর বুঝিবার সামর্থ্য না থাকিলেও তাহা শুনিবার জন্য লালায়িত। আমাদের রসনা এখন আর দেশীয় খাদ্যের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারে না, যে সকল খাদ্য বিলাতী ধরণে প্রস্তুত সুতরাং সুসভ্য বলিয়া পরিচিত, অন্তঃ প্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়াও তাহা গ্রহণ করিতে লোলুপ। যে সকল বেশ ভূষা আমাদের দেশের উপযোগী, এবং এমনকি বিদেশীয়ের চক্ষেও সুশোভন, আমরা তাহা অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সজ্জায় সজ্জিত হইতেছি। এইরূপে আমরা এক বিরাট কৃত্রিমতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া জাতীয় জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতেছি, এবং অর্থশূন্য ফ্যাসনের হস্তে নিজ নিজ স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছি। হিন্দুর জাতীয়তার ভিত্তি যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের সহিত আমাদের দিন দিন বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। এক দিন পৃথিবীতে হিন্দুজাতির ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও পরকালে বিশ্বাসী জাতি আর ছিল কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মের জন্য হিন্দুজাতি যতদূর ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, পৃথিবীতে আর কোন জাতি তাহা পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ শতকরা ৯৯ জন ধর্ম্মবিশ্বাসবিহীন এবং কার্য্যতঃ নাস্তিক। এখন হিন্দুর গৃহে ধর্ম্মাচরণের পরিবর্ত্তে বিলাসিতার স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইতেছে। এখন হিন্দুর গৃহে আর সংযম শিক্ষা হয় না, তাহার স্থলে উৎকৃষ্ট বেশভূষা, চা, চুরুট, সোপ, এসেন্স প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য অধিকার করিয়াছে। এখন ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম গৃহদেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন শরীরই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মধ্যে যে আত্মা নামক একটী পদার্থ আছে, আমরা দিন দিন তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে আমরা শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে যাইয়া নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতেছি এবং সেই অভাব পূরণ করতে যাইয়া ঘোরতর দরিদ্রতার পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। এখন যাহার উদরের অন্ন জোটে না, রোগের সময় ঔষধ জোটে না, সেও সভ্য হইবার জন্য বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেছে। এইরূপে আমাদের জীবন ব্যাপারে সরলতার স্থানে কৃত্রিমতা সন্তোষের স্থানে অতৃপ্তি এবং সহিষ্ণুতার স্থানে চাঞ্চল্য অধিকার করিয়াছে। আমরা স্রোতের সেওলার মতন এই পরিবর্ত্তনের তরঙ্গে গা ছাড়িয়া দিয়াছি, আর কথায় কথায় আমরা বলি ইহা "যুগধর্ম্ম"। এই অসংযমের পরাকাষ্ঠাকে যদি ধর্ম্ম বলা যায়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে জানি না।

আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে জন্মার্জ্জিত গৃহলক্ষ্মীগণই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। হিন্দুজাতির বহু তপস্যার ফল এখন পর্য্যন্ত হিন্দু রমণীর মধ্যে কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাঁহারাই সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া সনাতন ধর্ম্মের হোমাগ্নি এখন পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ জাগ্রত রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার কৃত্রিমতা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করে নাই। যেরূপ শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র কলুষিত না হইয়া বরং তাহা বিকাশিত হয়, তাঁহাদের জন্য সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। হিন্দুরমণীর মজ্জাগত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্বজন প্রীতি, সন্তান বাৎসল্য, দেবভক্তি, পতিভক্তি প্রভৃতি গুণ যে শিক্ষার দ্বারা নষ্ট না হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাঁহাদিগের জন্য সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক।

সহস্র ২ বৎসর যাবৎ সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি পুণ্য স্মরণীয়া রমণীগণের চরিত্র হিন্দু রমণীকে এক মহান্ আদর্শের দিকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। যে শিক্ষাদ্বারা হিন্দু রমণীগণ সেই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন, সে শিক্ষা আমাদের সমাজের কল্যাণজনক নহে।

আমাদের বালিকাগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য পড়িবে অথচ সেই সাহিত্য তাহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিবেনা, ইহা অসম্ভব কথা। একথা যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যের কোন মূল্যই নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে আমাদের পুরুষদিগের চিত্তে সেই সাহিত্য এক বিষম বিপ্লবের স্বচনা করিয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। এমন দিন গিয়াছে যখন উচ্চশিক্ষাভিমানী হিন্দুসন্তানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে ভুলিয়া পাশ্চাত্যসমাজের যাহা কিছু, সব প্রশংসার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার অন্ধ অনুকরণ করিতেন দেশের যাহা কিছু তাহা ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক সময়ে এই স্বদেশ দ্রোহিতার নাম ছিল patriotism. তাঁহাদের এই মোহ কাটিতে অনেক দিন গিয়াছে। সেই দলের অনেক লোক অভিজ্ঞতার ফলে কালক্রমে পথে আসিয়াছেন। যদি হিন্দুনারীদিগকেও এখন পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত করা হয়, তবে আমাদের অন্তঃপুরেও সেইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ইহা ধ্রুব কথা। কারণ, সকলেই জানেন, History repeats itself—ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

মানবের অনুকরণ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বিশেষতঃ রমণী হৃদয় অধিকতর ভাবপ্রবণ বলিয়া তাহাতে অতিশীঘ্রই বাহিরের বস্তুর ছাপ পড়ে। বালিকাদিগকে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইলে তাহারা সেই সাহিত্যের অভিনব ভাব সকলের অন্ধ অনুকরণ করিতে শিখিবে না, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। খাল কাটিয়া সুন্দরবনের লোনাজল ঢুকাইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল হাঙ্গড় কুমীর সমাজে ঢুকিবে তাহাদিগকে কে বাধা দিবে? Matriculation ক্রমে মাতৃ কুলাশনে অর্থাৎ refusal of maturity তে পরিণত হইবে। আমাদের চিরপূজ্য পাতিব্রত্যের আদর্শ ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার স্থানে অবাধপ্রেম, কোর্টসিপ, ডাইভোর্স প্রভৃতি পাশ্চাত্যভাব সকল সমাজে প্রবেশ লাভ করিবে। ইহা অবশ্যই জানি আমাদের কোন কোন মনীষী হিন্দুনারীর সতীত্ব ধর্ম্মকে Old fashioned idea বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন এবং হিন্দু বিধবার একনিষ্ঠ পতিপ্রেমকে সামাজিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যদিয়াও এই সকল ভাব সমাজে প্রবেশ করিতেছে সন্দেহ নাই। এই সকল বিদেশীয় ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা সাহিত্যকেও জ্ঞান বৃক্ষের বিষময় ফলের ন্যায় বর্জ্জন করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। কারণ হিন্দু নারীর পবিত্রতার উপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে আমাদের জগৎ পূজ্য বাঙ্গালী কবি সম্প্রতি তাঁহার বীণাপাণি দত্ত স্বর্ণবীণা দূরে রাখিয়া "সাবল" গ্রহণ করিয়াছেন এবং কবিতায়, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের ভিত্তি খুঁড়িতে ও প্রাচীর ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি হিন্দুর জাতীয়তা রূপ বৃদ্ধ মেষকে বিশ্বমানবতার হাড়িকাঠে বাঁধিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদনের অভিপ্রায়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে মহাদেশ হইতে তিনি এই বিশ্ব মানবতার সংবাদ আনিয়াছেন, সেখানেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য এক প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। সম্প্রতি আবার তিনি কতকগুলি কাঁচা "সবুজপত্রকে" প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে "অভিযানে" প্রেরণ করিতে করিতে বলিতেছেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

* * * * * *

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়।
আরত কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীন, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,

ঝিমায় যেন চিত্র পটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধকরা খাঁচায় !
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !"

এই প্রবীণ পরম পাকারদল অন্ধকারে বন্ধকরা খাঁচায় বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে কেবল ভাবিতেছে, যাঁহারা খাঁচা ভাঙ্গিয়া নূতন আলোকে বাহির হইয়াছেন তাঁহারা ভারতোদ্ধারের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের মন্ত্রপূত "সবুজপত্রের" দল সেই "আধমরাদের" ঘা মেরে বাঁচাইতে গিয়া নিজেরাই খাঁচায় আটক পড়িবে না তাহা কে বলিতে পারে ? কারণ অনেক অনেক কচি সবুজপত্রকেই ইতি পূর্ব্বে "রক্ত আলোর মদে মাতাল" হইয়া "পুচ্ছ তুলিয়া উচ্চে নাচাইতে" দেখাগিয়াছে, কিন্তু পরে সেই সবুজরঙ্ পাকিয়া হলুদবর্ণ ধারণ করিলে তাহাদের মদের নেশা ছুটিয়া যায় এবং সেই চির পরিচিত খাঁচাকেই নিজের গৃহ বলিয়া চিনিতে পারে।

সে যাহা হউক এই আধমরা সমাজ যাহাতে একেবারে মরিয়া না যায়, সেজন্য বাহিরের আলোক হইতে আমা-দের নারীজাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সমাজের unit ব্যক্তি নহে, পরিবার। সেই পরিবারের কেন্দ্র হইতেছেন গৃহিণী। প্রত্যেক হিন্দুবালিকাকেই কালে সেই গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহের মন্ত্রই তাঁহাকে শ্বশুরকুলের সাম্রাজ্ঞী পদে বরণ করে। সুতরাং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সেই গৌরবান্বিত পদের উপযুক্ত হওয়া উচিত। হিন্দুরমণীর আদর্শ জগজ্জননী অন্নপূর্ণা, Miss Nightingale নহেন। বি, এ পাশকরা স্বাধীন প্রকৃতি বিবাহ বিমুখী বিদূষী কখনও হিন্দুরমণীর অনুকরণীয় নহেন। একজন বিখ্যাত কবি একটি ক্ষুদ্র কবিতায় একটি কল্যাণময়ী হিন্দুনারীর স্বভাব সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই চিত্রটি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :—

কল্যাণী—

প্রভাতে দেখেছি তোমা' স্নাতশুচি বেশে
তুলিতে পূজার ফুল পট্টাম্বর পরি' ;
পূজাশেষে নিরমাল্য ধরি' সিক্তকেশে
পশিতে রন্ধনগৃহে,—দেখেছি সুন্দরি।
পুনঃ অন্নপূর্ণা রূপে, দেখিয়াছি, বালা,—
অতীত মধ্যাহ্নে তোমা' তুষিতে যতনে
গৃহাগত অতিথিরে—রিক্ত করি থালা,
আপনি অভুক্ত থাকি, প্রসন্ন-আননে।
আবার দেখেছি—তোমা দিবা-অবসানে
ভক্তিভরে করি' গৃহে সন্ধ্যাদীপদান
নমিতে দেবতাপদে—কায়মনঃ প্রাণে
যাচিতে নীরবে পতি পুত্রের কল্যাণ !
হে কল্যাণি, যুগে যুগে হো'ক তব জয়,
ওইরূপ বঙ্গগৃহে হউক অক্ষয়।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

"কোজাগর"-লক্ষ্মী।

কে তোরা জাগিস্ ওরে, উঠে আয় সুপ্তিশয্যা ছাড়ি,
দেখে যারে হেমাঙ্গিণী ব্যোমগর্ভে পরি হেমসাড়ি !
নবনীত-শুভ্র-মেঘবাসীনা, পৃষ্ঠদেশ রাখি নীলিমায়,
অভিজিৎ-শনৈশ্চর-নীলপদ্মযুগে পা দুটি লুটায় !
জ্যোছনা-অঞ্চলখানি বিশ্বতলে পড়িছে খসিয়া,
কাঞ্চন-করঙ্ক কাঁখে—পূর্ণচন্দ্র দিক্ উজলিয়া !
সীমন্তে শোভিছে ওই শুকতারা প্রসান্ত উজ্জ্বল,
সৌরলোক চেয়ে আছে মুখপানে বিস্ময়-বিহ্বল !
বাজে বিশ্বে ঝিল্লীরব—বুঝি ওরে বসি শতে শতে,
নক্ষত্রকুমারীগণ হুলুধ্বনি করে ছায়া পথে !
বাজাগো মঙ্গল শঙ্খ পুরনারী আরক্তকপোলে !
নিতম্বচুম্বিত কেশাবৃত হৈমগ্রীবা বেড়িয়া অঞ্চলে
আভূমি প্রণাম করি', মাগবর ভক্তিভরে কাঁপি' !
কোথাওরে দৈন্যাতুর ! আজি আয় !—কনকের ঝাঁপি
মুক্তকরি', হেমপুঞ্জ বিশ্বতলে ঢালেন কমলা,—
কে নিবি কে নিবি আয় ! এ রজনী করিসনা হেলা !—
কমলা এসেছে দ্বারে, শরতের শুভ পৌর্ণমাসী,
আজি নিশি 'কোজাগর', ঘুমায়োনা ওগো বিশ্ববাসী !

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

বৈদেশিকী।

পুচ্ছ বিশিষ্ট মানব।

গুম্ফ শ্মশ্রু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক দেখিলে যেরূপ আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইব, পুচ্ছ বিশিষ্ট মানব দেখিলেও তাহা আমাদিগের নিকট কম কৌতূহলের বিষয় হইবে না। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ

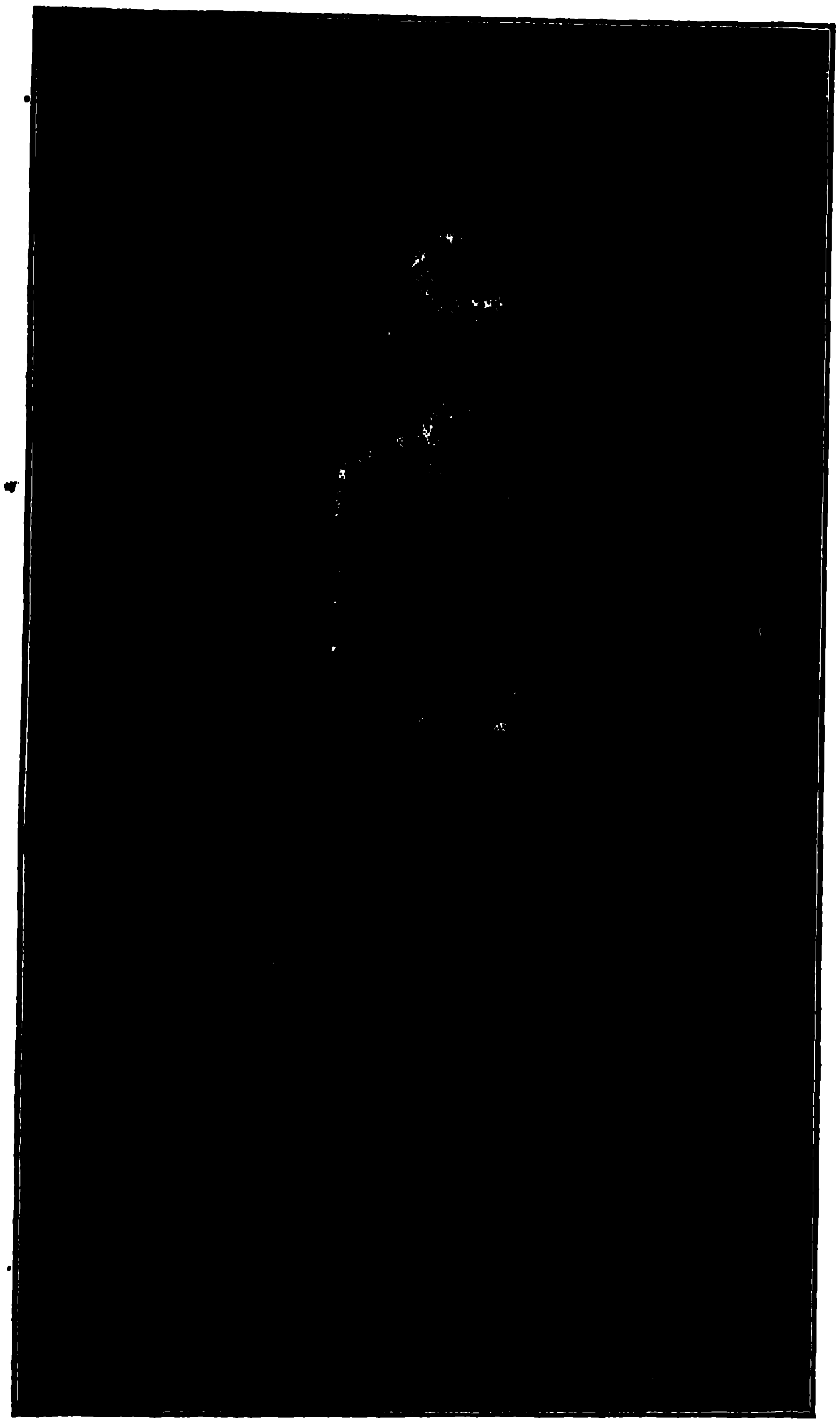

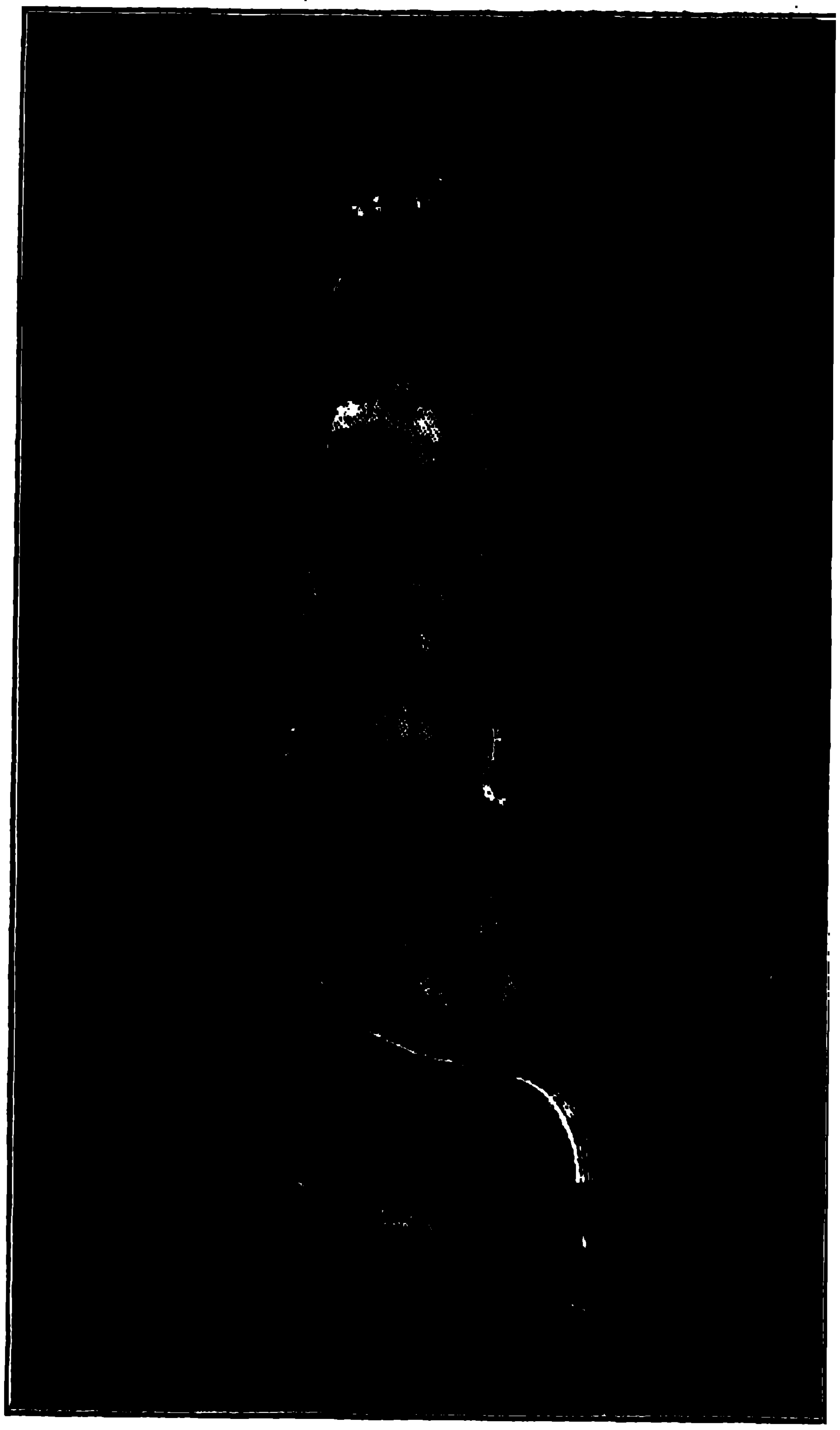

করিবার উপযোগী সামগ্রীর কখনও অভাব লক্ষিত হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়াম্-নিয়াম নামক এক জাতীয় মানব বাস করে। এক দল আফ্রিকা ভ্রমণকারী এই জাতির ভিতর লাঙ্গুল বিশিষ্ট লোক দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদিগের উক্তি সকলে হয়ত বিশ্বাস করিবেন না।

খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ও ভূগোল বেত্তা টলেমী বিদ্যমান্ ছিলেন। ইঁহার রচিত ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে এবং মার্কোপলো, ষ্ট্রাপ্‌ মেলেট্ প্রভৃতির পুস্তকে বহু সংখ্যক নরমর্কটের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়! বার্টেল্‌স্ স্বীয় পুস্তকে এইরূপ ২১টী মানুষের বর্ণন করিয়াছেন। উহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) মনুষ্যদেহে সংলগ্ন পুচ্ছ। মেরুদণ্ড (triangular base bone) অস্বাভাবিকরূপে মলদ্বার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে এরূপ হইয়া থাকে। (২) সঞ্চালনশীল পুচ্ছ। এই শ্রেণীর পুচ্ছ মেরুদণ্ডের

নিম্নস্থ ত্রিকাস্থির নিকট (Sacrum) শরীর হইতে ঝুলিয়া পড়ে। (৩) বর্দ্ধিত ত্বক্।

এই সকল পুচ্ছ সচরাচর ৩।৪ ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না। পুচ্ছ বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিরই শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকে। কেহ কেহ বলেন, অঙ্গপুষ্টির অপূর্ণতা বশতঃ পুরুষ পরম্পরাগত এই প্রকার প্রত্যঙ্গ বিশেষের উদ্ভব হয়। অপর দল বলেন, একথা ঠিক নহে, ভ্রূণাবস্থায় অপরিমিত বর্দ্ধনই ইহার কারণ। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যেই এই প্রকার লাঙ্গুল বিশিষ্ট অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে সকল স্থলেই এই সকল পুচ্ছ বিশিষ্টের কশেরু নামক পৃষ্ঠাস্থি ছিলনা; চর্ব্বি ও শিরা সমূহে ঐ সকল পুচ্ছ গঠিত।

যে লাঙ্গুল বিশিষ্ট বালকের চিত্র প্রদত্ত হইল, সে জাতিতে "মই"। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সাইগন দেশে এই ফটোগ্রাফ্ গ্রহণ করা হইয়াছিল। তখন উহার বয়ক্রম ১২ বৎসর। সচরাচর ৩।৪ ইঞ্চির অধিক লম্বা পুচ্ছ দেখা যায় না বটে, কিন্তু এই বালকের লাঙ্গুল প্রায় ১ ফুট দীর্ঘ। উহা কোমল মসৃণ ও অস্থিশূন্য এই বালকের দেহের বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার নিতম্বের উপর এক একটা স্তর আছে, বালকটী শীর্ণকায় এবং বয়সের অনুপাতে অঙ্গের পরিপুষ্টি হয় নাই।

জাপানের সেক্ষপিয়র।

চিকামাৎসু মন্‌জিমন জাপানী সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। জাপানীরা ইঁহাকে "জাপানের সেক্ষপিয়র" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যেরূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বঙ্গের সারওয়ালটারস্কট্" বলি। সেক্ষপিয়রের প্রায় একশতাব্দী কাল পরে, ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে চিকামাৎসু জন্ম গ্রহণ করেন। ওসাকা নগরের এক রঙ্গালয়ে অভিনয় জন্য তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নানা বিষয় অবলম্বনে তাঁহার নাটক গুলি লিখিত হইলেও, বিয়োগান্ত ও নিরাশ প্রণয় ঘটিত রচনাই অধিক। জাপানী রঙ্গ ভূমির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া চিকামাৎসু ১৭২৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগামী হন।

জাপান ম্যাগাজিনে মিষ্টার কাজুমি চিকামাৎসু ও সেক্ষপিয়রের এইরূপ তুলনা করিয়াছেন—উভয়ের গ্রন্থেই বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত ঘটনা পরম্পরা পরস্পর সংমিলিত, গদ্য ও পদ্য রচনা একত্র গ্রথিত, এবং রাজা ও আভিজাত বংশীয়ের ভাষায় ও সাধারণ জনগণের কথায় পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উভয়েরই ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অধিক ঝোঁক ছিল। উভয়েরই সরল সহজ অবাধ বাক্য বিন্যাসে নিপুণতা ছিল, এবং উভয়েরই রুচি কিঞ্চিৎ প্রাচীন কালোচিত শ্লীলতা বর্জ্জিত। কিন্তু চিকামাৎসুর প্রধান দোষ এই যে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে মৌলিকতা ও গভীরতার অভাব দৃষ্ট হয় এবং নরহত্যা ও রক্ত পাতের যেরূপ বাড়াবাড়ি তাহাতে সে কালের দর্শক দিগের রুচির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাটকগুলির কবিত্ব সেক্ষপিয়রের রচনার সহিত তুলনা হইতে পারেনা।

বামনের দেশ।

উত্তর ইটালীর অন্তর্গত বার্গামো সহরে বামনের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন হইল ভিয়ানা বাসী অধ্যাপক ম্যাস্ক কাসোইজ্ ইটালী ভ্রমণ কালে বার্গামো সহরে বামনের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সেক্‌সৃপিয়ারের Mid-summer Night's Dream নামক নাটকে বার্গামো দেশীয় ভাঁড়ের উল্লেখ আছে। ভাঁড়েরা সচরাচর খর্ব্বকায় হাস্য রসিক ও নৃত্যকুশল হইয়া থাকে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, এই দেশীয় মানুষের এই প্রকার আকৃতিগত বিশেষত্ব দীর্ঘকাল যাবৎ বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক কাসোইজ্ মাত্র দুই ঘণ্টাকাল বার্গামো সহরের এক অংশে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি প্রায় কুড়ি জন বামনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। উহাদের মাথার খুলি বৃহৎ, নাসিকার তলদেশ অবনমিত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ্রস্ব ও মোচড়ান। স্ত্রী পুরুষ, বয়স্ক লোক ও বালক বালিকা সকল শ্রেণীর মধ্যেই কাসোইজ এই প্রকার বামন দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহাদের সকলেরই মুখমণ্ডল প্রতিভাদীপ্ত। বৃটীশ মেডিকেল জার্নেল এই বামনদিগের সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য ইটালী দেশীয় চিকিৎসক মণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

সমর প্রসঙ্গ।

আজ ইউরোপের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে লোকক্ষয়-কর শানিত অস্ত্রের ছুটাছুটি চলিয়াছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ইউরোপে সমরাভিনয়—সমস্ত সভ্য সমাজের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ। এই সমরের পরিণামে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নবভাবে গঠিত হইবে, অনেকে এই অনুমান করেন।

ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর নেপোলিয়ানকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপে সমরাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন ওয়াটারলুর সমর ক্ষেত্রে বৃটিশ সেনাপতি ওয়েলিংটন নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়া ইউরোপে রাষ্ট্র-বিভাগ নির্দ্ধারিত করেন। তারপর যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট।

অধিকাংশই অন্তর্বিপ্লবের ফল। ইহার মধ্যে প্রসিয়ান যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রী বিসমার্ক ও সেনাপতি মল্টকের অসাধারণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় প্রসিয়ার সৈন্য ধীরে ধীরে সমগ্র ফরাসি দেশ প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। ফ্রান্স জার্ম্মান সীমান্তের বিস্তৃত এলসেইস লোরেন প্রদেশ প্রসিয়াকে প্রদান করিয়া ১৮৭১ সনের মে মাসে-ফ্রাঙ্ক ফোর্ট নগরে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই যুদ্ধের ফলে প্রসিয়ারাজ জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট-রূপে বরিত হইয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সার্ভিয়ার রাজা।

তারপর ধীরে ধীরে জার্ম্মান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হেলিগোলেণ্ড জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ফরাসি দেশ বর্ত্তমানে ৮৭টী বিভাগে বিভক্ত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব্বে ৩৪টী ভাগে বিভক্ত ছিল। ফরাসি বিপ্লবের পর, তাহাকে বহু আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে হইয়াছে। ১৮৪৮ অব্দে ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়েনের নেতৃত্বে পুনরায় সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি সেখানকার সম্রাট নির্ব্বাচিত হন। পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Republic গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সাত বৎসরের জন্য এক এক জন শাসনকর্ত্তা (President) নিয়োজিত হইয়া দেশরক্ষা করিতেছে।

১৮২৯ সনের আড্রিয়ানোপলের সন্ধিতে সার্ব্বিয়া তুরস্কের সুলতানের করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। ইহার পর বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলি যখন তরবারি সাহায্যে সুলতানের নিকট হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য কাড়িয়া লইতে ছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্তে সার্ব্বিয়াও আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১৮৩১সনের ১৫নবেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে যে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে বেলজিয়ম স্বাধীনতা লাভ

করে। এইরূপে ক্রমে ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠিত হইয়া দেশে শান্তি স্থাপিত হয় এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তিতে ইউরোপ সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।

তারপর গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ও বলকান সমরই প্রধান। বল্কান যুদ্ধের ভেরী নিনাদ নিরস্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনি এখনও ইউরোপ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সেদিন আবার বল্কান প্রদেশে নূতন করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অস্ট্রিয়া ও সার্ব্বিয়ায় রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। রুশিয়া ও জার্ম্মেনিতে অস্ত্রের ঝন ঝনা রব উঠিয়াছে।

ইউরোপের এই মহাসমর প্রধানতঃ শ্লাভ ও টিউটন এই দুইজাতীর বিদ্বেষ বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইউরোপে গ্রীক, লাটিন (রোমান), টিউটন, কেলটও শ্লাভ এই পাঁচটী আর্য্য জাতীয় শাখা অতি প্রাচীন যুগ হইতে

জার্ম্মাণ সম্রাট।

বাস করিয়া আসিতেছে। গ্রীক ও রোমানের কোন পৃথক অস্তিত্ব এখন আর জানা যায় না। জার্ম্মান ও অস্ট্রিয়ানেরা খাঁটি টিউটন। কেল্ট শাখার সামান্য অবশেষ স্কটল্যাণ্ডের উত্তর ভাগে, আয়রলণ্ডে ও ওয়েলসে এখনও বর্ত্তমান আছে। ফরাসি, স্পেনিয়ার্ড, ইটালিয়ান, বেল-জিয়ানরা টিউটনে ও কেল্টে মিশ্রিত জাতি। ইংরেজ টিউটন হইয়াও এখন কতক পরিমাণে কেল্ট জাতির সহ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। সার্ভিয়া ও রুশিয়া প্রভৃতি শ্লাভ জাতীয়।

রুশিয়ার সম্রাট।

অস্ট্রিয়ার আদিম অধিবাসীরা টিউটন হইলেও বর্ত্তমান অস্ট্রিয়া রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি। তাহার অর্দ্ধাধিক প্রজা শ্লাভ জাতীয়। রুশের বিপুল সাম্রাজ্য, বিশাল শক্তি সমগ্র শ্লাভ জাতির গৌরবের জিনিস। কিছু দিন হইতে এই বিরাট শ্লাভ জাতি এক Czar এর নেতৃত্বে এক বিশাল শ্লাভ শক্তি গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। যদি এ চেষ্টা ফলবতী হয়, তবে অস্ট্রিয়ার সমূহ ক্ষতি, তাই অস্ট্রিয়ার সম্রাট ইহার বিরোধী।

বিগত ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্ডিন্যাণ্ড এবং তাঁহার পত্নী সারাজিভো নগরে নিহত হইয়াছেন সার্ভিয়ার প্রজা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। অস্ট্রিয়া সম্রাট ইহাদের বিচার ভার অস্ট্রিয়ার হাতে দিতে সার্ভিয়াকে অনুরোধ করেন। সার্ভিয়া তাহাতে অস্বীকার করেন। সুতরাং অস্ট্রিয়ার সম্রাট সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শ্লাভ জাতীর উপর এই আক্রমণে শ্লাভ জাতির প্রধান অবলম্বন ও আশ্রয় রুশিয়া তরবারী ধারণ করিয়া অস্ট্রিয়ার সম্মুখীন

হইলেন। শ্লাভ ও টিউটনে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহার পর যাঁহারা এই সমরে যোগদান করিয়াছেন, তাহারা কেহ বা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কেহ বা আত্ম রক্ষার জন্য, কেহ স্বার্থ রক্ষার জন্য।

ইংলণ্ডেশ্বর।

ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য জগতে অতুলনীয়—একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা। ইংলণ্ডের নৌশক্তি

ফরাসী রাষ্ট্র নায়ক।

অজেয়-অপ্রতিহত। বর্ত্তমান জার্ম্মেনি ধীরে ধীরে আপন বাণিজ্য বিভব বিস্তার করিয়া জগতে আপন প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতেছিল কিন্তু এই বিস্তৃত বাণিজ্য সম্ভাগে রক্ষা করিতে হইলে সাম্রাজ্য বিস্তার প্রয়োজন তাই জার্ম্মেনি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। যেই রুশিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, অমনি জার্ম্মেণী অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিশিয়া গেল। এদিকে ফ্রান্স জার্ম্মেণীর শত্রু। প্রতিশোধের আশায় ফ্রান্স রুশিয়ার সহিত মিলিয়া গেল। তখন জার্ম্মেনি সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বেলজিয়ামে প্রবেশ করিলেন ইংলণ্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এইরূপে এক পক্ষ জর্ম্মণী অষ্ট্রিয়া ও অপর পক্ষ সর্বিয়া রুশিয়া ফ্রান্স বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণাম ইউরোপের শক্তিক্ষয়, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন দান। বিজ্ঞানেরও বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু—তাহা বিশ্বধ্বংশী অস্ত্র শস্ত্রেরই উন্নতি কল্পে।

পণ পরিশোধ।

(১)

তখন ও ভোরের পাখী ডাকিয়া যায় নাই, সেফালিকা ফুল মাটীতে লুটাইয়া পড়ে নাই। মা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন "ঊষার সময় বহিয়া যায়; উঠ।"

ঘুমের ঘোরে ছেলের কাণে সে কথা উঠিলনা। ছেলে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে ছিল।

মা প্রদীপ জ্বালিলেন। ছেলের খাবার সব ট্রাঙ্কে বাঁধিয়া, কাপড় চোপড় গুছাইয়া দিয়া আবার ডাকিলেন "যতীন সময় যে হলো উঠ।" তখন ভোরের পাখী কলরব করিয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বদিক কনক রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। যতীন তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র ও মঙ্গল চণ্ডীর অষ্ট দূর্ব্বা লইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিল।

দাদা কলিকাতা যাইবে, মণি রাত থাকিতেই উঠিয়া আব্দার ধরিয়াছে, সেও যাইবে। মা তাকে কত বুঝাইলেন, কত প্রবোধ দিলেন কিছুতেই সে মানিলনা। অবশেষে সে তাহার শেষ সম্বল অবলম্বন করিল—ঘর বাড়ী প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। যতীন

বিল্বপত্রের ঘ্রাণ লইয়া মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিল; পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিল। তারপর মণিকে কোলে লইল। তখন মণি একেবারে গলিয়া গেল। যতীন মণির জন্য কলিকাতা হইতে কত কিছু আনিবে বলিয়া প্রবোধ দিল, মণি কিন্তু প্রবোধ মানিতে চাহিল না; সে দাদার গলা ধরিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। এদিকে সময় বহিয়া যায়, সুতরাং মণির হাতে থুথু দিয়া চক্ষে অশ্রু লইয়া যতীন যাত্রা করিল। মণি পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল "দাদা আমিও যাব, দাদা আমিও যাব।"

মা প্রমাদ গণিলেন। যতীনের যাত্রায় বাধা পড়িল। যতীন একটু থামিল। তারপর একে একে সকলকে প্রণাম করিল, শেষে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের চরণ বন্দনা করিয়া মণির উচ্চ ক্রন্দনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল।

বাড়ীর ঘাটেই নৌকা বাঁধা ছিল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। যত দূর দেখা গেল মা সতৃষ্ণ নয়নে মণিকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর বালক মণি হাত পা আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে নৌকা দৃষ্টি পথের বাহিরে গেল ক্রন্দনের রোল তখনও শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও শূন্যে মিলাইয়া গেল। তখন নবোদিত অরুণ কিরণের কনক আভা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বর্ষাসমাগমে নদী কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। বনস্থলী ও মাঠ বর্ষার জলে দিগন্ত পর্য্যন্ত ডুবিয়া মহাসাগরের মত কল কল করিতেছে। উপরে দিগন্তব্যাপী আলোকোজ্জ্বল নীলাকাশ, কখনও গাঢ় তিমিরাবৃত ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি; নীচে অসীম জল তরঙ্গ। এই তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেদ করিয়া যতীন্দ্রনাথের নৌকা পল্লিপথে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে চলিতে আসিয়া পদ্মায় পড়িল।

তখন সহসা একখানি কাল মেঘ আসিয়া পদ্মার জলে একটু ছায়া সঞ্চিত করিল। দেখিতে দেখিতে সে কাল মেঘ খণ্ড সমস্ত আকাশ ঘেরিয়া ফেলিল। তখনও পদ্মা স্থির অচঞ্চল। দুর্য্যোগ ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। পুঞ্জীভূত মেঘখানি হইতে প্রলয়ের আশঙ্কা ঘোষণা করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। তারপর মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি; যতীন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিলেন। চতুর্দ্দিকের মেঘরাশি দৈত্যের মত আকাশের চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল; পদ্মার জল গর্ব্বভরে আস্ফালন করিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতরী সেই বীচিবিক্ষুব্ধ জলরাশি অতিকষ্টে ভেদ করিয়া পারি দিতে ছিল। যতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "পরাণ দা ঝড় আস্‌ল যে, এখন মধ্য নদীতে উপায় কি?"

"ভয় কি দাদা। তুমি ঠিক হইয়া বসিয়া থাক। এ আর কি ঝড়, এইরূপ কত ঝড় বাদল মাথার উপর দিয়া গেছে; সে অনেকদিনকার কথা—তোমার ছোটবেলার কথা, তোমার বাবাকে নিয়া সন্ধ্যার সময় এইখানে কি বিষম ঝড়েই না পড়িয়াছিলাম। ঈশ্বরের কৃপা থাকিলে ঝড়ে কি হয়। ঝড়ের ভয় করিয়া চলিলে কি পদ্মায় পারি জমান যায়।" পরাণের আশ্বাসে যতীন্দ্রনাথের ভয় ভাঙ্গিল না।

সে বলিল "পরাণ দা। আমার কিন্তু সাহস হয় না দেখছ না একখানা নৌকাও নাই, তোমার অসম সাহস।"

বাড়ীর চাকর পরাণ উচ্চৈঃস্বরে বদর বদর করিয়া ডাক ছাড়িয়া পাল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নৌকা ভীম বেগে ছুটিল। পরাণের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া যতীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাহার বৃহৎ ট্রাঙ্কটির উপর হইতে তাহার অসহায় দৃষ্টি ক্ষুদ্র গ্লাডষ্টোন ব্যাগটীর উপর নিপতিত করিল। এমন সময় প্রবল বাতাস উঠিল, সে বাতাসে পদ্মাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিল। তখন পদ্মা তাহার সেই সর্ব্বগ্রাসী মুখব্যাদন করিয়া যেন যতীন্দ্র নাথের ক্ষুদ্র নৌকাখানাকে গ্রাস করিতে আসিল; পরাণ পাল নামাইবার অবসর পাইল না। বাতাসের একটা প্রবল ধাক্কা আসিয়া ক্ষুদ্র নৌকার ক্ষুদ্র ছাদটি ও সঙ্গে সঙ্গে পরাণকে পদ্মার জলে ফেলিয়া দিল। নৌকার ভিতরদিয়া এক পশলা জল বহিয়া গেল। নৌকা নিমজ্জিত অবস্থায় আসিয়া সজোরে তীরে লাগিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি মাত্র লইয়া লাফাইয়া তীরে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

(২)

সম্মুখেই একখানা ভগ্ন জীর্ণ গৃহ দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ তাহাতে আশ্রয় লইলেন। ব্যাগ হইতে একখানা শুষ্ক

বস্ত্র খুলিয়া স্বীয় আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। ঝড় তখনও প্রবল বেগে বহিতেছিল।

যখন ঝড়ের প্রকোপ একটু থামিল তখন যতীন্দ্রনাথের কর্ণে একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বর প্রবেশ করিল। সে রমণী কণ্ঠ নিসৃত আকুল রোদন ধ্বনি যতীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া হৃদয় তন্ত্রীতে যেন একটা ভীষণ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। যতীন্দ্রনাথ সেই রোদন ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দ্বিধা-শূন্য প্রাণে সেই অপরিচিতের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

যতীন্দ্রনাথ ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "বাড়ীতে কে আছেন।" তখন দিবা দ্বিপ্রহর।

একখানি জীর্ণ কুঠরীর মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর আসিল "কে?"

যতীন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত—চতুর্দ্দিকে কয়েকটি স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতেছে। স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে যতীন্দ্রনাথের প্রাণে সহজেই একটা সমবেদনা আনিয়া দিল। যতীন্দ্রনাথ অতি কষ্টে জানিতে পারিলেন যে হঠাৎ আজ দুদিন যাবৎ গৃহস্বামী বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহার কণ্ঠ-রোধ হইয়াছে—তিনি এখন অন্তিম দশায় উপনীত।

যতীন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন, রোগী এখন পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার বা কবিরাজের চিকিৎসাধীন হন নাই; কেননা গ্রামের একমাত্র কবিরাজ শিবরতন আজ দুই দিন যাবত বাড়িতে নাই, অথচ অন্য চিকিৎসকের দ্বারা ব্যবস্থা করাইবার সামর্থ্যও রোগীর নাই॥

যতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন মহকুমা হইতে ডাক্তার আনান হয় নাই কেন? এই কথার উত্তরে তিনি গোপনে ঝিয়ের নিকট হইতে খবর পাইলেন যে গৃহকর্ত্তার হাতে কতকগুলি মারাত্মক ঋণ ব্যতীত এক কপর্দ্দকও নাই, যাহাতে এই পরিবার এক সন্ধ্যা চলিতে পারে, চিকিৎসা ত দূরের কথা।

যতীন্দ্রনাথ নিরাশ হইলেন না। তাঁহার ব্যাগটী গৃহকোণে রাখিয়া একটা ছাতা লইয়া সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া তিনি চিকিৎসকের অনুসন্ধানে ছুটীলেন।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি পৌঢ়া গৃহকর্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মা, আপনাদের কোন ভয় নাই। বৃথা কান্না-কাটি করিয়া রোগীর অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিবেন না। আমি যে প্রকারে পারি ডাক্তার লইয়া আসিতেছি।

(৩)

যতীন যখন আর্দ্রবস্ত্রে জল কাদা হাটিয়া শ্রীশ ডাক্তা-রের ডিস্পেন্সারিতে উপস্থিত হইলেন তখন ডাক্তার আহারের পর ডিস্পেন্সরি ঘরেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। যতীন দেখিয়াই—সেই ঘুমন্ত ডাক্তার বাবুকে চিনিয়া ফেলিলেন—এযে আমাদের শ্রীশ বাবু!

যতীন যখন এফ, এ পড়িত তখন একই মেসে থাকিয়া শ্রীশবাবু বি এ, পড়িতেন। যতীনকে শ্রীশবাবু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সে স্নেহে কোন স্বার্থ ছিল না—অথচ তাহা সেই মেচের সকল ছাত্রের একটী আলোচনার বিষয় ছিল। যতীন শ্রীশবাবু অপেক্ষা অনেক ছোট। তারপর সে দিন কালের কবলে ঢলিয়া পড়িয়াছে; শ্রীশ বাবু বি, এ ফেল করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন, ইহার পরও যতদিন না শ্রীশবাবু মেডিকেল হোষ্টেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ততদিন যতীন তাঁহার সাথের সাথী ছিল। ইহার পর শ্রীশবাবু এল, এম্, এস্ পাশ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া আসেন, যতীন এম্, এ পড়িতে থাকে।

যতীন শ্রীশ বাবু সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ আরো একটু পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য কম্পাউণ্ডারকে দুই একটী প্রশ্ন করিয়া তাহা দূর করিয়া লইলেন—তারপর তাহার নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করিলেন।

ডাকে ডাকে শ্রীশ বাবুর শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়া উঠিলেও চক্ষু হইতে নিদ্রা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেলনা। তিনি অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে বলিলেন "না আজ এই দুর্য্যোগের দিনে কোন 'কলে' যেতে পারব না।" তখন যতীন নিজেই শ্রীশবাবুকে ডাকিলেন। শ্রীশ বাবু অগত্যা চোক কচলাইয়া উঠিয়া বসিয়া যতীনকে দেখিয়া সাহ্লাদে বলিলেন "এ কি, কোথাহতে, My dear Laughing Philosopher" এ দুর্য্যোগে কোথাহতে এলে ভাই! তারপর, আহার হয়েছে কি?"

যতীনের সুন্দর মুখখানায় সর্ব্বদাই হাসি মাখা থাকিত বলিয়া মেচের সকলেই তাহাকে Laug ing Phil sopher বলিয়া ডাকিতেন।

যতীন একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"আমি এখনও কিছু খাই নাই। খাওয়ার প্রয়োজনও নাই; আপনি এখনি আমার সঙ্গে গিয়া একজন রোগীকে না দেখিলে চলিবে না ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।

শ্রীশ বাবু বলিলেন "স্নান করেছ কি?" যতীন বলিল "স্নানের কার্য্য বৃষ্টিতেই হয়ে গেছে। আপনি বিলম্ব করিলে চলিবে না। অনুগ্রহ করে প্রস্তুত হন।"

শ্রীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন "এ আমা দ্বারা হবেনা। আমি অনুগ্রহ করে এমন অতিথিকে কিছুতেই নিগ্রহ কর্ত্তে পার্ব্বোনা। আগে অতিথি সৎকার হউক তারপর অন্য কথা। তুমি বসো।" বলিয়া শ্রীশ বাবু তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া আগন্তুকের হাত পা ধুইবার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন এবং নিজে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

অনিচ্ছা সত্বেও শ্রীশ বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি যতীনের ছিলনা। শ্রীশ বাবু তাহাকে টানিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন এবং আহারে বসাইলেন। তখন যতীনের ক্ষুধার চিন্তা অপেক্ষা রোগীর চিন্তাই প্রবল ছিল।

যতীন আহারে বসিলে শ্রীশ বাবু রোগীর অবস্থা ও পরিচয় ইত্যাদি জানিতে চাহিলেন। অল্পভাষী যতীন বড় বিশেষ কিছু বলিতে পারিলনা। কেবল—এখান হইতে অনতিদূরে এক দরিদ্র ভদ্রলোক বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত, তাহাকে দেখিতে হইবে এই বলিয়া যতীন শ্রীশ বাবুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। শ্রীশ বাবু অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন "চল যাওয়া যাক। তোমার যেখানে আহ্বান সেখানে সাঁতারাইয়া গেলেও যেতেই হবে। তবে বাতব্যাধিতে আমরা যে কি করিয়া উঠিতে পারিব বুঝিতে পারিতেছি না। একজন কবিরাজ হলে হতো ভাল।" যতীন বলিল "তাহাইবা কোথায় মিলিবে?" শ্রীশ বাবু বলিলেন "দেখা যাক।"

(৪)

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীশ ডাক্তার ও মাধব কবিরাজকে লইয়া যতীন যখন রোগীর বাড়ী পঁহুছিলেন, তখন পাড়া প্রতিবেশীরাও আসিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার কবিরাজী চিকিৎসাই ব্যবস্থা করিলেন। যতীন নিজ হইতে কবিরাজের হাতে আটটা টাকা তুলিয়া দিয়া সমস্ত দিন রাতের জন্য তাঁহাকে আটক করিলেন এবং নিজে রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীশ ডাক্তার তাহার বেহারা ভৃত্যটীকে যতীনের সাহায্যার্থে রাখিয়া সেদিনের জন্য বিদায় লইলেন।

যতীন অনুসন্ধানে জানিলেন, তখন পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে রান্নার কোন উদ্যোগ হয় নাই। তিনি শ্রীশ বাবুর সেই বেহারা দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ডাইল ক্রয় করিয়া আনাইলেন এবং তাহাই রান্না করিতে গৃহ কর্ত্রীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অপরিচিত যুবকের এবম্বিধ আত্মত্যাগ লক্ষ্য করিয়া প্রৌঢ়া বিচলিত হইলেন। তিনি আহারের যোগাড় না করিয়া পারিলেন না; বিশেষ গৃহে অতিথি।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রৌঢ়া পত্নী, যুবতী কন্যা ও একটী শিশু পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ গৃহস্বামী ভবের বন্ধন উন্মোচন করিলেন। নিরাশ্রয়া কন্যা ও স্ত্রীর, সেই হৃদয় বিদারক চীৎকার যতীন্দ্রনাথকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। সাত বৎসরে শিশু ছেলেটী যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া আসিয়া "বাবা" "বাবা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন দর্শন শাস্ত্রের এম,এ, উপাধি ধারী বিজ্ঞ যতীন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি শিশুকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া অনাবিল ভাবের প্রবাহে দুইগণ্ড ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন।

(৫)

পর দিন প্রাতে বেহারার হাতে শ্রীশ বাবু যতীনের এক চিঠি পাইলেন। বাল্য বন্ধু যতীন লিখিয়াছেন—

পরম প্রীতিনিলয়েষু—

আমাদের সকল চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হইল; উপায় নাই। কল্যকার সমস্ত দিনের অনিয়মে ও রাত্রিজাগরণে

আমার অসুখ হইয়াছে। পাছে অসুখ বৃদ্ধি হইয়া আরও অনর্থ ঘটায় সেজন্য আমি কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

যে অনাথ পরিবারের শোক ও দুঃখকে এই কয় ঘণ্টার ভিতর নিজের করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা আমাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছে। আমার হঠাৎ অসুখ বোধ না হইলে, এই অনাথ গুলিকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতাম না। ইঁহাদের অন্তকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমার সাধ্যানুসারে করিয়া গেলাম। এখন আপনি ইহাদিগের জন্য একটু না খাটিলে হইবে না। অন্ততঃ ইহাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছেন জানিয়া আপনি একটা সুব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিলে আশ্বস্ত হইব। আমি সামান্য কিছু সাহায্য আপনার নিকট রাখিয়া গেলাম, আশা করি আপনি ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন।

ভগবান আপনার, যশ, সম্মান কিছুরই অভাব রাখেন নাই। অর্থের স্বচ্ছলতার কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। স্বচ্ছলতা প্রতি ভগবানের যে ইঙ্গিত আপনার ন্যায় হৃদয়বান সাধুপুরুষ তাহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া চলিবেন, ইহাই শেষ প্রার্থনা। ইতি

আপনার স্নেহের নগেন

পুনঃ—আপনারনিকট অনেক জানিবার রহিল; নিম্ন ঠিকানা উত্তর পাইব আশা করি।

৭নং সিমলা ষ্ট্রীট—
কলিকাতা

বলা বাহুল্য যতীন্দ্র কলিকাতা মেচে নগেন্দ্রনাথ নামেই পরিচিত।

(৬)

যথা সময়ে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতার মেচে পৌঁছিয়া পিতার দুইখানা টেলিগ্রাম দেখিতে পাইলেন। এক খানা যে দিন যতীন বাড়ী ছাড়িয়াছেন তার পর দিন; আর এক খানা তার উত্তর না পাইয়া তার পর দিন। যতীন্দ্র নাথ প্রথমেই পিতার টেলিগ্রামের উত্তরে নিজ পৌঁছতত্ব প্রদান করিলেন।

ঝড় বৃষ্টি অত্যাচারে ও পথের অনিয়মে এবং অনিদ্রায় যতীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিয়া শয্যা লইতে বাধ্য হইলেন। সামান্য সর্দ্দির জ্বর বলিয়া বড় একটা গ্রাহ্য করিলেন না। দিন চলিতে লাগিল।

তখন স্নেহলতার আত্ম বিসর্জ্জনের করুণ কাহিনী "সঞ্জীবনী" সজীব ভাবে বর্ণনা করিয়া ইংরেজি শিক্ষায় দীক্ষিত বাঙ্গালিকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে জ্বলন্ত ভাষায় আহ্বান করিতেছিলেন। ফলে দেখিতে দেখিতে কয়েক দিনের ভিতর স্নেহলতার অনুকরণে দেশে আরও ৫।৭টী ঘটনা ঘটিয়া গেল। মেচে বাজারের সর্ব্বত্রই স্নেহলতার কথা আলোচিত হইতে লাগিল। যুবকগণ দলে দলে এই পণ প্রথার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিল। দেশে একটা নূতন ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল।

যতীন্দ্র নাথের জ্বর প্রবল না হইলেও প্রত্যহই জ্বর হইতে লাগিল। একদিন যতীন্দ্রনাথ প্রভাতে বিছানায় শুইয়া একখানা পুস্তকের পাতায় চক্ষু বুলাইতেছিলেন, এমন সময় তাহার সহপাঠী সুরেশ আসিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিল তখন দেশের বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে কথা উঠিল, কথা বার্ত্তায় সুরেশ বলিল "কিহে নগেন্, তোমার পিতা নাকি তোমায় আবার বিয়ে দিচ্ছেন? তোমাদের দেশে কি এই সংবাদ পত্র গুলিও পৌঁছায় না?"

"সে কি আমি ত তার কিছুই জানি না?"

"তবে কি? সে দিন নবীন বাবু দেশ থেকে এসে মেচে এই খবর টা দিয়ে গেলেন, আর তুমি তার কিছুই জান না! আমরা শুনেইত অবাক। তোমার মত ছেলের যে দু দশটা বিয়ে মিলবে—যখন তোমার বাবা ইচ্ছা করেছেন—তাতে আর সন্দেহ কি?"

"বাবা ইচ্ছা করেন হবে, তাতে আর আমি কি করতে পারি।"

"সে কি? তোমার কি কোন personality নাই? তুমি এখন দুই দুইটা বিষয়ে M. A. পাশ করেছ। দেশের তোমারই ত আশা ভরসার স্থল।"

"দেখ ভাই, personality সম্বন্ধে কোন কথা বলবার নাই। যে দেশ থেকে এই personality এসেছে সে

দেশে একথা খাটে, আমাদের দেশে তা খাটে না। এখানে একটা সমাজ আছে। ব্যক্তিত্বকে সমাজ দেহে বিসর্জ্জন দেওয়াই এদেশের প্রথা ও মন্ত্র। সে দেশের সকলই স্বত্ব প্রধান সুতরাং personality সে দেশের জিনিষ—এ সমাজে তাহা খাপ খায় না।"

"আমি তোমার Argument শুনে অবাক হয়ে যাই। তুমি নাকি একটা Philosophyর M. A. আর তুমি বলছ তোমার personality নাই।"

"সেকি? আমার পিতার কাছে আমার কি personality থাকতে পারে ভাই! তিনি আমার সম্বন্ধে যা করবেন, তা চারদিক দেখেই করবেন; বিবেচনাও যা করতে হয় তিনিই করবেন।"

"তবে তোমার কি কিছুই করবার নাই?"

"ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধিয়তে" যখন দরকার হবে তখন দেখা যাবে।"

"এইত দেখ কাল" "বেঙ্গলিতে পড়েছি একটা ডাক্তার লিখেছেন যে একটী ভদ্রলোক তাঁর কন্যাকে সমাজের বড় ঘরে ভাল পাত্র দেখে বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে বিবাহের সময় পাত্রের পিতাকে হাজার টাকা দিতে পারেন নাই তাই বরের পিতা সে মেয়েকে পরিত্যাগ করেছেন। এদিকে সেই টাকার সুদ সহ দুই হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে—এই ঋণ রাখিয়া পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এখন সমাজ এই কন্যার কি ব্যবস্থা করিবেন? ডাক্তার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বালিকার জন্য হাজার টাকা নিজে দিতে সম্মত আছেন বাকী হাজার টাকা সমাজের কাছে প্রার্থী। একটা appeal করেছেন।" যতীন্দ্রনাথ আগ্রহভরে বলিলেন "দেখি দেখি কোথায় বেঙ্গলি খানা।"

সুরেশ বেঙ্গলি খানা আনিয়া দিল। যতীন্দ্রনাথ বেঙ্গলি খানা সাগ্রহে পড়িতে লাগিলেন।

(৭)

গ্রামে গ্রামে আগমনীর মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু লোকের মনে শান্তি নাই, চতুর্দ্দিকে হাহাকার, লোকের হাতশূন্য, পাটের অকল্যাণে দেশে টাকা আসে নাই। ইউরোপে সমর চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের কথা; তথাপি পণপ্রথার আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ীতে আসিয়া যতীন্দ্রনাথের জ্বর সারিয়াছে। তখন যতীন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে গ্রামের পণ নিবারণীসভায় যোগদান করিয়া সেই ডাক্তারের আবেদনে সকলকে আহ্বান করিলেন। ফলে এই দুর্দ্দিনেও কিছু কিছু টাকা উঠিতে লাগিল। হৃদয়বান ব্যক্তিরা দুর্দ্দিনেও ডাক্তারের আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যাহার যাহা শক্তি সে তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। মেয়েরা কেহ কেহ শরীর হইতে অলঙ্কারও প্রদান করিলেন। এইরূপে টাকা উঠিল এবং যথাসময়ে সম্পাদক মহাশয় টাকাগুলি শ্রীশ ডাক্তারকে পাঠাইয়া দিলেন।

যে দিন শ্রীশ ডাক্তারকে টাকা পাঠান হইল সে দিন শ্রীশ ডাক্তারের একখানা চিঠি কলিকাতা হইতে redirect হইয়া যতীন্দ্রনাথের নিকট পঁহুছিল—

শ্রীশ ডাক্তার লিখিয়াছেন:—

স্নেহের নগেন!

তোমার পত্র পাইলাম। আমি গতকল্য সেই অনাথ পরিবারের নিকট গিয়াছিলাম। সেখানে তাহাদের নিকট যে মরুন্তদ করুণ কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছি আজ তাহাই শুধু তোমাকে লিখিব।

দশ বৎসর পূর্ব্বে এই বৃদ্ধ তাহার প্রাণপ্রতিম কন্যাকে একটী সুন্দর পাত্র দেখিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠঘরে বিবাহ দেয়। যখন বিবাহ হয় তখন এই কন্যার বয়স মাত্র সাত বৎসর। বালিকা তখন বিবাহের কিছুই জানে না। কন্যার পিতা পাঁচ হাজার টাকা বরপক্ষকে নগদ দিতে কথা দেয়। নগদ এক হাজার টাকা প্রদানও করে। তখন কন্যার পিতা একজন বড় জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বিবাহের সময় যখন এই বৃদ্ধ বাড়ী আসেন তখন তাহার নৌকায় ডাকাত পড়িয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। ভদ্রলোকটী কোন প্রকারে স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হন। হৃতসর্ব্বস্ব বৃদ্ধ তখন মহাবিপদে পতিত হন। এদিকে কন্যা বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে সে ২০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া বরের পিতাকে

প্রদান করেন এবং বক্রী এক হাজার টাকা বিবাহের পর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

কোন প্রকারে বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া যায়। সে বিবাহে বৃদ্ধ তাহার মনের মত আমোদ আহ্লাদ করিবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং পাত্রপক্ষের লোক জনও তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। বিবাহ হইয়া গেলে বরের পিতা হাজার টাকা চাহিলেন। তখন বৃদ্ধের চক্ষু স্থির, হাতে একটী কপর্দ্দকও নাই।

বরের পিতা একটু পিশাচ প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি কন্যার পিতা হইতে একখানা হাজার টাকার খত লিখাইয়া লইলেন।

বিপদ একা আসে না। এদিকে বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যু হইল। নবীন যুবক প্রাচীন কর্ম্মচারীকে পছন্দ করিলেন না। বৃদ্ধের চাকুরী গেল। বৃদ্ধ বয়সে চাকুরী গেলে যাহা হয়, এই বৃদ্ধের কপালেও তাহাই ঘটিল। ক্রমে ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব গেল। কেবল মাত্র ভদ্রাসন বাড়ী ও কিছু খামার জমি মাত্র এখন সম্বল রহিল।

কন্যার শ্বশুর টাকা পরিশোধ না হওয়ায় কন্যাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এই যুবতী কন্যাই এখন বিধবার গলগ্রহ। আর এই সাত বৎসরের শিশুটীর যে কি হইবে, ভাবিতে পারি না।

তবে তোমার মত একজন শিক্ষিত যুবক যখন এই অনাথ পরিবারের সুখ দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তখন এই বালকের জন্য চিন্তার বড় বেশী কারণ দেখি না। যুবতী কন্যার কি উপায় করিবে ভাবিয়া দেখিও।

বর্ত্তমানে কন্যার শ্বশুর যে সুদে মূলে দ্বিসহস্র মুদ্রা দাবী করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। আপততঃ ইহাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বোধ হয় তিনি কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারেন। শুনিয়াছি এই কন্যার স্বামী একজন শিক্ষিত যুবক।

আমি এই অনাথ পরিবারের সাহায্যার্থ আমার যথা সাধ্য প্রদান করিব। বাকী হাজার টাকার ব্যবস্থা তোমাকে করিতে হইবে। ইতি,

তোমার—

শ্রীশ ডাক্তার।

(৮)

নির্জ্জীব বাঙ্গালীর চণ্ডী মণ্ডপ আজ শারদার আগমনে উৎফুল্ল। বাহিরে শারদ শশীর শুভ্র চন্দ্রিকার মাধুরী, শারদ রজনীকে মধুময়ী করিয়া তুলিয়াছে, চতুর্দ্দিক মায়ের আগমনী করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে।

সপ্তমীর চাঁদ আকাশে দেখা দিয়াছে। সাহানপুর গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা আজ রায় বাড়ীর বহিরাঙ্গণে চণ্ডী মণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে জড় হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে লোক জন চলিতেছে, ঢাক ঢোল বাজিতেছে। বাহির এক ভাবুক পাগল বসিয়া গাইতেছে—

"এবার মোর মা ঘরে এলে
আর আমি পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনব না।"

পাগলের মধুর কণ্ঠে লোক জড় হইতে লাগিল। বাড়ীর কর্ত্তাও সেই পাগলের গানটী শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

এমন সময় দেখিলেন একখানা ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া তাঁহার ঘাটে লাগিল। রায় মহাশয় পূর্ব্ব হইতে নৌকা-খানার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। একটী ভদ্রলোক নৌকা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি সাহান পুরের রায় বাড়ী।"

উপর হইতে এক ব্যক্তি উত্তর করিল "হা।" ভদ্র লোকটী নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আগন্তুকের উপর আকৃষ্ট হইল।

আগন্তুক তাহাকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপ-নার নাম ?"

রায় মহাশয় নাম বলিলে আগন্তুক হস্তোত্তলন করিয়া অভিবাদন করিলেন।

রায় মহাশয়ও আগন্তুককে লইয়া আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিলেন। আগন্তুক বসিয়াই কথা তুলিলেন "আপনি আপনার পুত্রকে স্বর্গীয় হলধর ঘোষের কন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন ?

রায় মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"সে অনেক কথা।"

আ—"হলধর ঘোষের নিকট আপনার কিছু প্রাপ্যও ছিল।"

রায় মহাশয় আগ্রহের সহিত বলিলেন "হাঁ ছিল বটে"।

"সে টাকাটা আমি আজ পরিশোধ কর্ত্তে এসেছি! আপনি সে টাকাটা বুঝিয়া নিয়া তাঁর আত্মাকে ঋণমুক্ত করে দিন" বলিয়া আগন্তুক পকেট হইতে একটা নোটের তাড়া খুলিয়া হাতে রাখিলেন। রায় মহাশয় আগন্তুকের কথা শুনিয়া রামু ভাণ্ডারীকে তামাকের জন্য ডাকিতে আরম্ভ করিলেন!

আগন্তুক বলিলেন "আমি তামাক খাই না।" তামাক ডাকিতে হইবে না।

রায় মহাশয় আগ্রহের সহিত বলিলেন—"বিশ্রাম করুন; তারপর হাতমুখ প্রক্ষালন করুন। বেহাইর মৃত্যুর সময় যাইয়া একবার দেখিতে পারি নাই। বাতের জ্বালায় মহাশয় আমি একেবারে পঙ্গু—তাকি একটু নড়বার যোটী আছে? তা আপনি তাঁদের কে হন? এই দেখুন নিলরে নিলরে।" বলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া রায় মহাশয় তাহার বাতের খেচুনির প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন।

আগন্তুক তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আমি তাদের কেহ নহি, বিধবার অনুরোধে তাহার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে, এবংতাহার কন্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া যাইতে আসিয়াছি। বিধবাও সঙ্গে আসিয়াছেন। এখন আপনি আপনার পাওনা সহ পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলেই, আমার কার্য্য শেষ হয়। আমি আপনার গৃহে হাতমুখ ধুইতে আসি নাই।" কথাটী বলিয়া আগন্তুক চিন্তিত হইলেন। রায় মহাশয় দন্তাগ্রে জিহ্বা দংশন করত জোড় হস্তে বলিলেন—"তাওকি হয়, আপনি মহৎ লোক, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আজ আর কোথাও যাইতে পারেন না। এই আমি বেহানকে ও বধূমাতাকে আনিতে লোক পাঠাই-তেছি এই বলিয়া রায় মহাশয় চাকর অভাবে স্বহস্তেই গাড়ু গামছা ও জলচৌকীর সমাবেশ করিয়া খড়মের চটাপট ধ্বনি তুলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

রায় মহাশয় ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেলে ভদ্রলোকটি উঠিয়া আরতি দেখিতে চণ্ডী মণ্ডপের সম্মুখে গিয়া দাঁড়া-ইলেন। তিনি একাগ্রমনে মায়ের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-ছিলেন এমন সময়—"একি শ্রীশবাবু যে,"গরীবের দোয়ারে হাতীর পাড়া" বলিয়া একজন আসিয়া তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

শ্রীশবাবু হর্ষ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—"তাইতো দেখছি তুমি আবার কোথা হতে হে?"

সে আবেগ বাড়াইয়া বলিল "ভালো ভালো কুশল-তো! কতক্ষণ?"

এই সময় রায় মহাশয় ডাকিলেন—যতীন্।

যতীন তাঁহাকে দেখাইয়া শ্রীশবাবুকে চুপিচুপি বলিলেন "আমার পূজনীয় পিতৃদেব।"

রায় মহাশয় বলিলেন—"যাও বাবা ইঁহাকে লইয়া ভিতরে যাও।" রায় মহাশয় ও যতীনের পরিচয় পাইয়া শ্রীশবাবু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পকেটের পণ পরিশোধের নোটের তাড়া তখনো রায় মহাশয়ের কবল-গত হয় নাই। শ্রীশবাবু তাহা সন্তর্পণে বাহির করিয়া লইয়া রায় মহাশয়ের সম্মুখে যতীনের হাতে দিয়া শ্লেষ ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন—

"এই লও তোমার পণ পরিশোধের টাকা।" যতীন বাড়ীর ভিতর হইতে কিছু নূতন সংবাদ জানিয়া আসিয়া-ছিল এক্ষণ শ্রীশবাবুর কথায় আর কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। লজ্জায় যতীনের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে আর কথা বলিতে পারিল না। শ্রীশবাবুর প্রদত্ত নোট-গুলি ভাল করিয়া ধরিতেও পারিল না, তাহা মাটীতে পড়িয়া গেল। রায় মহাশয় তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বালকগণ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বৃত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সমস্বরে তান ধরিয়াছে—

"বেহাই শক্ত, টাকার ভক্ত, দেহের রক্ত চুষিয়া খায়।
কোনও দৈন্য, করেনা গণ্য, স্বার্থ ভিন্ন জানে না হায়॥
ইত্যাদি—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কালিদাস স্ত্রী না পুরুষ।

সম্প্রতি নাকি কতিপয় গবেষণাশীল পণ্ডিতও অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তিশালী সাহিত্যিকের দুর্দান্ত চেষ্টায় কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসের জন্মস্থান নবদ্বীপের সান্নিধ্যে কালীদহ নামক কোন দীর্ঘিকার তীরে এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আকস্মিক আবির্ভাব ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সাগরকূলবর্ত্তী পুরদ্বারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথা দুটা যে নিতান্তই অমূলক অথবা কেহ কেহ যে বলিতেছেন, উহাতে গুলির প্রভাব জাজ্জল্যভাবে বিদ্যমান—তাহার বিচার করিবার সময় বোধ হয় এখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

কবিকাহিনী ও রাজন্যকাণ্ড বোধ হয় একদরে বিকাইবে না। তাই আপাততঃ আমরা কবি কাহিনীরই আলোচনা করিব। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশাবতংশ ভূঁইয়ুর শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজদিগেব সছিদ্র কাহিনী প্রবন্ধান্তরে বলিতে প্রচেষ্ট হইব।

কবি কালিদাস স্ত্রী কি পুরুষ, এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তি, ষষ্ঠী তৎপুরুষ কি দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন, প্রথম শতাব্দীর কি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক, ভারতবর্ষের কি ইয়ুরোপের অধিবাসী এই সকল মতের মীমাংসার জন্য যে আজ এই সর্ব্বপ্রথম আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নয়। আমাদের বোধ হয় কালিদাসের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কতগুলি বিষয়ের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। "রাম না জন্মিতেই রামায়ণের" ন্যায় কথাটার ভিতর একটু রহস্য রহিয়া গেল—ক্রমে তাহা উদ্ভাবিত হইবে।

কালিদাসের জন্মস্থান আজকাল ভারতবর্ষে সাব্যস্ত হইলেও ইয়ুরোপেই ইহার সম্বন্ধে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। সর্ব্বপ্রথম বোধ হয় ইটালীতে—দশম শতাব্দীতে, তারপর আরবে দ্বাদশ শতাব্দীতে, তারপর জার্ম্মেনীতে ষোড়শ শতাব্দীতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুষিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এবং শেষ উনবিংশ শতাব্দীতে কবির জন্মভূমি ভারতবর্ষে—কালিদাস কাহিনীর আলোচনা হয়। কবির স্বদেশ ভারতবর্ষেও বিদেশী কর্ত্তৃকই বোধ হয় কবিকথা প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। সে বিদেশী মহাত্মার নাম—সার উইলিয়ম জোন্স।

এই সকল পরদেশী আলোচকগণের গবেষণার মূল ভিত্তি কি আমরা তাহা সম্পূর্ণ রকমে অবগত হইতে অবকাশ পাই নাই—পাইবার সময়ও বোধ হয় ফুরাইয়া যায় নাই। কেননা স্বয়ং কবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

কালহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বিঃ—ইত্যাদি।

কালিদাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই অজ্ঞান বা অপ্রাজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কাহারও মত ও অনুসন্ধিৎসা যে নিতান্ত তরল ও অসমীচীন এরূপ মনে করিবার প্রচুর কারণ নাই।

সার উইলিয়ম জোন্সই বোধ হয় কালিদাস সম্বন্ধে এ দেশে গবেষণার সূত্রপাত করেন। তৎপূর্ব্বে এই ভাবের রাজ্য ভারতবর্ষে টোলের অধ্যাপক পণ্ডিতগণের টীকা লিখন ও অধ্যাপনা ব্যতীত কালিদাসীয় গবেষণা লইয়া কাহারও মাথা ঘুরাইতে যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ছিল—দেখা যায় না। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কালিদাস সম্বন্ধীয় গবেষণা ভারতবর্ষে ছিলই না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে কবি কালিদাসের নামের উল্লেখ কিরূপ ভাবে আছে তাহা সংক্ষেপে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দশম শতাব্দীতে ইটালীর ভেটিকান লাইব্রেরীতে রক্ষিত কলিদসিওর (Colidosi) যে হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আলোচনায় ইটালীর তৎকালীন রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেকবি বলেন যে Colidsio ও Boadiceo এই দুই তন্বী খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলিদসিও অল্প বয়সেই শ্বেত সরস্বতীর (Minerva) বরে কাব্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করেন; অতঃপর Icenia (ইজিনির—উজ্জয়িনীর নয়) রাজার নিকট স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনী Boadicea কে বিবাহ দিয়া নিজে সেই রাজসভার সভাকবি হইয়া কাব্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহার কাব্য প্রতিভা লইয়াই দন্তী (Dante) এবং Boccaceo ইটালীকে জ্ঞানগৌরবে পূজ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবি ভাষায় লিখিত কলী ও দশীর যে বিরাট গ্রন্থাবলী বোগ্দাদের পুস্তকালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিল তাহার এক প্রতিলিপি সেই সময় মিশরের জগদ্বিখ্যাত পাঠাগার অল্ অজহরে নীত হয়। প্রতিলিপিকারক আবুবেন খোরাসনী গ্রন্থের প্রতিলিপি শেষ করিয়া ঐ নকল গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখেন যে—"কেসাইর নিবাসী কলী ও দশী দম্পতি এই অপূর্ব্ব কাব্য নাটক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার এই তৃতীয় অনুলিপি আমি গ্রহণ করিলাম। ১ম প্রতিলিপি আবু রসিদ রোমে, ২য় প্রতিলিপি অলবেরুণী ভারতবর্ষে ও ৩য় প্রতিলিপি আমি মিসরে নিলাম। আবু রসিদের প্রতিলিপি হইতে লাটিন ভাষায় ও অলবেরুণীর প্রতিলিপি হইতে সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হইয়াছে।"

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মেন ধর্ম্ম-সংস্কারক মার্টিন লুথার রোমের পোপ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া নীলাচলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কতিপয় দিবস তাঁহার সহবাসে যাপন করেন। তিনি স্বদেশে যাইয়া যখন তাহার ধর্ম্মমতবিরোধী ইরাসমাসের (Erasmas) সহিত কথা কাটাকাটি করেন, তখন তিনি রোমান ধর্ম্মযাচক পোপদিগের বিলাসিতার সহিত শ্রীচৈতন্যের ত্যাগের তুলনায় সমালোচনা করেন। পোপের পার্শ্বচরগণের মূর্খতা ও অক্ষর জ্ঞানহীনতার সহিত শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর-গণের কাব্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান জ্ঞানের তুলনা করেন। তিনি ভারতের এই সকল অতুলনীয় বিষয়ের আলোচনায় এক স্থানে লিখিয়াছেন—"পোপ যদি ধনবলে ও জনবলে বলীয়ান হেতু সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিতে চান, তবে তাহার সে চেষ্টা বৃথা। তাহাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে হইবে। এবং তাহার পার্শ্বচর-দিগকে ধর্ম্মে ও শিক্ষায় আদর্শ স্থানীয় হইতে হইবে—যেমন হিন্দুস্থানের ত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাহার পার্শ্বচরগণ। পোপের নিরক্ষর পার্শ্বচরেরা বাইবেলের পাতা মুখস্থ করিয়াছে কিন্তু ভার্জ্জিল বা দান্তের নাম শুনিলে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া যায়। আর শ্রীগৌরাঙ্গের পার্শ্বচরগণ ধর্ম্মগ্রন্থ, বেদ, উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া কবি কালিদাসের কাব্য নাটক পর্য্যন্ত নিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন।" *

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন নাট্য সাহিত্যের জন্মদাতা চেকামৎসু মঙ্গাইমন তাহার নাট্য গ্রন্থাবলীর মুখবন্ধে লিখিয়া গিয়াছিলেন—"আমি আমার নাটকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় আদর্শই গ্রহণ করিলাম। প্রাচ্য কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসের আদর্শে আমি আমার নাটকাবলীর ভাষা ভদ্র ও নীচ অর্থাৎ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের ভাষা উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা নীচ করিলাম। এবং প্রতীচ্য কবি সেক্সপীয়র হইতে বিয়োগান্ত ও বীভৎস ভাব গ্রহণ করিলাম।"

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ভারতবর্ষের আধিপত্য গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিলাতি পত্র Monthly Reviewতে "প্রাচ্য বাণিজ্যের হিসাব নিকাশ" নামক এক প্রবন্ধে বিলাতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেরিডেন ভারত বিজয় যে প্রাচ্য বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি ও তাহার মধ্যে গৌরবের সামগ্রী যে কি আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করেন। ঐ প্রবন্ধে লেখক ভারতের কাব্য নাটক ও দর্শন বিজ্ঞানের এক বিরাটচিত্র প্রদর্শন করিয়া তাহার সহিত প্রতীচ্য কাব্য নাটক ও দর্শনের তুলনায় সমালোচনা করেন ও ভারতীয় সম্পদকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধে লেখক ভারতের কালিদাস ও ইংলণ্ডের সেক্সপিয়রের নাম অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ইংরেজের এই আস্ফালন প্রতিবাসী শক্তি পুঞ্জের

* কেহ কেহ অনুমান করেন মার্টিন লুথারের এই সমস্ত চিঠি পাঠ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী Erasmasও নাকি ভারতবর্ষে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত নবদ্বীপে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মার্টিন লুথারের লিখিত পত্রাবলী "De Servo. Arbitrio" নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইলে, তাহা পাঠ করিয়া জার্ম্মেণ পণ্ডিত Heiurich Noth সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া কবি কালিদাসের ও অন্যান্য ভারতীয় লেখক-গণের সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর জার্ম্মাণ অনুবাদ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত অনুলিপি গ্রহণ করেন। ইনিই জর্ম্মণ জাতির মধ্যে সংস্কৃতানুরাগ প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পর লাটিন ভাষাতেও কালিদাসের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হয়।

গাত্র জ্বালা বৃদ্ধি করে, বিশেষ ফরাসিরা সদ্য শক্তিক্ষয় করিয়া ভারতে কোণা চাপা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং রুষ শক্তি চেষ্টা সত্বেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিয়াছিল না—তাঁহারা Monthly Review-র এই প্রবন্ধের তার স্বরে প্রতিবাদ করিল। রুষের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Karanisin রুষিয় ভাষায় নব ব্রমিয়াতে ও ফরাসি ভাষায় Le Temps পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশ করিলেন। এ প্রতিবাদ প্রবন্ধে Karanisin বলেন—"সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজ যাহা লইয়া গর্ব্ব করেন তাহা নিতান্তই অসার। তাহাদের জন্মভুমির গৌরব সেক্ষপিয়র ও বিজিত ভুমির গৌরব কালিদাস নামে মাত্র প্রতিভা বা গৌরবের বস্তু, বাস্তব জগতের কেহই নহেন। * * * সুপ্রসিদ্ধ Denis De Sallo তাঁহার Journal des Scovans-এ যে বেকনের লেখাই সেক্ষপিয়রের লেখা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও ঠিক নহে। ইটালীয় কবি বোকাসিওর লেখাই যুগে যুগে রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণের কল্যাণে অবশেষে সেক্ষপিয়রের নামে পরিচিত হইয়াছে। সেক্ষপিয়র লেখক নহেন, একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা মাত্র। কালিদাসের নামে প্রচারিত সংস্কৃত গ্রন্থরাজিও ইটালির বিদুষী কবি কলিদসিয়ার লাটিন গ্রন্থাবলীর সংস্কৃত অনুবাদ। কল্পনা প্রিয় ভারতবাসীর হাতে পড়িয়াই ইটালীর Iceni দ্বারতের উজ্জয়িনীতে পরিণত হইয়াছে Dante ও নাকি দণ্ডি হইবার উপক্রম, কি বাতুলতা। * * * ইটালির মহিলাকবির লেখা যদি ভারতের সম্পত্তি, তবে ফরাসী নাটককার ভলটেয়ারের De les at Sukuntala ও ফরাসীর সম্পত্তি। ইংরের গর্ব্ব করিবার কি আছে?"

এই শ্লেষ পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিলাতের মনস্বী উইলিয়ম জোন্স (পরে স্যার) সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের পিউনী জজ হইয়া আসিয়া কলিকাতা বেঙ্গল এসিয়াটীক সোসাইটী স্থাপন করেন। সার উইলিয়মের প্রাণপাত চেষ্টার ফলে কালিদাস যে ভারতীয় কবি তাহা আপাততঃ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। * অন্ততঃ আমরা মনে করিয়া লইতেছি। এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রচেষ্টা হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তিই কালিদাস সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক বেবর (Weber), অধ্যাপক লাসেন, এলফিন ষ্টোন, টড, প্রিনসেস, উইলফোর্ড, কোলব্রুক, ভাউদাজি, প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। এই সকল শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের উৎকট চেষ্টার পরও কালিদাস স্ত্রী কি পুরুষ, এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তি খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর কি পর শতাব্দীর, উজ্জয়িনীর কি বাঙ্গলার, (ইয়ুরোপের কি ভারতবর্ষের একথাটা বরং ছাড়িয়াই দিলাম) স্থির হইল না।

*স্যার উইলিয়ম জোন্সের Commentaries on Asiatic Poetry তে এই উক্তি পাঠ করিয়া জর্ম্মান অধ্যাপক লেশরণি বলেন—"যাহারা পৃথিবীর ভাষার খবর রাখেন না এইরূপ একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত তাহাদেরই মুখে শোভা পায়।"

এই অধ্যাপক প্রবরের সহিত বহু ভাষাবিদ স্যার উইলিয়ম জোন্সের কথা কাটা কাটী হয়। অধ্যাপক প্রবরের জার্ম্মান বুলি উদ্ধৃত করিয়া "বেণা বনে মুক্তা ছড়াইব" না। আমরা শিক্ষিত পাঠকের অবগতির জন্য স্যার উইলিয়মের প্রতিবাদের ভাষা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Kalidas flourished in the 1st. century before christ when our brethren were as illeterate & barbarious as the army of Hanuman * * *

স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় কবিদিগের বিষয় গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—"The sanscrit poetry was the sportful danghter of Valmiki and having been educated by Vyasa, she chose Kalidas for her bridegroom after the mannar of Vedarbha."

প্রতীচ্য ভাষাগুলির সহিত তুলনা করিয়া Sir William লিখিয়াছিলেন—Sanscrit language is more perfect than the the Greek, more copies than the Latin & more Exquisitely Refined than any language of Europe.

"সার উইলিয়মের এই প্রতিবাদ পাঠ করিয়া সভ্য জাতীর চখে তাক লাগিয়া গিয়াছিল। তাহারা ক্রমে কালিদাসের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে মনোযোগ প্রদান করেন।

ইটালি ও জর্ম্মানি হইতে পূর্ব্বেই কালিদাসের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

১৭৯১ খ্রীঃ জর্ম্মাণ পণ্ডিত G. Forster পুনরায় জার্ম্মান ভাষায় ও ১৮০৪ খ্রীঃ ফরাসী পণ্ডিত A Bruguiere ফরাসী ভাষায় ভারতীয় কালিদাসের অনুবাদ প্রচার করেন। এবং ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে রুষির পত্রিকা Asiat. Boten, কালিদাসের পুস্তকাবলীর রুষির অনুবাদ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

তাহা নাকি না হইবারই কথা, কেননা শাস্ত্রকারগণই বলিয়াছেন প্রকৃত বিষয়ের যে তত্ব তাহা নাকি "নিহিত গুহায়াং"।

সাবল কোদাল লইয়া না খোদিলে সে তত্ব উদ্ধার হইবার নহে। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যার জোরে কথা বলা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময় সাবল কোদালের জোরে কথা বলার যে মূল্য অনেক বেশী সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল বঙ্গীয় "আর্কলজিক্যাল সোসাইটী." ও "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" প্রভৃতি।

আমরা আর অধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের সুধৈর্য্য পাঠককে অধৈর্য্য করিয়া তুলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে বিপদ গ্রস্থ করিব না। এ পর্য্যন্ত আমরা যে কয়টী কালিদাস সম্বন্ধীয় আলোচনার স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আমরা এটী স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারিতেছি যে প্রকৃত গুণবান ব্যক্তিকে সকলি আপনার বলিয়া পরিচিত করিতে অনুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ন্যায়ই হউক আর অন্যায়ই হউক।

যাঁহারা নিজ মাতৃভূমির গৌরব রক্ষার প্রয়াসে এইরূপ অলীক কল্পনার সাহায্যে ভারতীয় প্রত্নতত্বকে পেত্নীতত্বে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা যে নিতান্ত মূর্খ এ কথা সাহস করিয়া বলিতে যাওয়া খুব নিরাপদ নহে। আজ আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। আগামী বারে কালিদাস স্ত্রী কি পুরুষ এবং এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তি এই প্রত্নতত্ব বিষয়ক ব্যাকরণ বিভীষিকার মীমাংসার জন্য আমাদের সযত্ন সংগৃহীত একখানা অপ্রকাশিত পূর্ব্ব প্রাচীনতম তাম্র লিপির আলোচনা দ্বারা প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি এম, এ।

মনে রেখো।

কপালে থাকিলে দুঃখ অবশ্যই ফলে।
জলধি হইয়ে জলে বাড়ব অনলে॥

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভাল কিম্বা মন্দ আমি, কি চিনিবে পরে?
আপনারে না চিনিলাম এত কাল পরে।

শ্রীকালী প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ সমালোচনা।

প্রাচীন ভারত—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত, ঢাকা সুমতি সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৪১৮ পৃষ্ঠা।

দেশের ইতিহাসানুশীলন দ্বারা যাহারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন, তন্মধ্যে আমাদের স্বজেলাবাসী রামপ্রাণ বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি বহুকাল হইতেই ঐতিহাসিক চর্চ্চার দ্বারা লুপ্ত ঐতিহাসিক তত্বের উদ্ধার করিয়া ইতিহাসের কলেবর পুষ্ট করিতেছেন। তাঁহার রচিত 'মোগল বংশ' 'হজরত মহম্মদ,' 'পাঠান রাজ বৃত্ত' 'রিয়াজউস সলাতিন' 'ইস্লাম কাহিনী' ইত্যাদি গ্রন্থ নিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই পরিচিত এবং প্রত্যেক গ্রন্থেই গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্প্রতি তিনি 'প্রাচীন ভারত' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৈদেশিক পর্য্যাটকগণের বিবরণ হইতেই এই গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে কেবল মাত্র আমাদের দেশীয় পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির উপর নির্ভর করিলে চলিতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থে ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত থাকিলেও তাহার সাহায্যে ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, কারণ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্ম তত্বের আবরণে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, ধারা বাহিক রূপে ইতিহাস রচনার চেষ্টা সেকালে ছিলনা, কাজেই মধ্য যুগের ভারতীয় ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণী ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এ পর্য্যন্ত বৈদেশিক পর্য্যাটকগণের লিখিত

বিবরণীর সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংকলন বিষয়ে কেহই মনোযোগী হন নাই, রামপ্রাণ বাবু এক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। দেশ জননীর গৌরববাণী প্রচার কল্পে যশস্বী ঐতিহাসিক রামপ্রাণ বাবু যে সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া প্রাচীন ভারতের গৌরব মালিকা গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী, সভ্যতার মুকুটমণি ভারতের যে মহিমাজ্জ্বল গৌরব ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি তাহাতে প্রকৃতই গর্ব্ব অনুভূত হয়। হিরোডোটস, টিসিয়াস, প্লিনি, ষ্ট্রাবো, টালমি, ডিউন অলবারুণী প্রভৃতি পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-কাহিনীর যথার্থ বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার কোন গ্রন্থেরই অনুবাদ করেন নাই, অথচ প্রত্যেক লেখকের সার সংকলন করিয়া স্বাধীনভাবে তুলনায় সমালোচনা দ্বারা স্বকীয় মত প্রচার করিয়াছেন। রামপ্রাণ বাবুর লিপি কৌশল প্রশংসনীয়, ভাষা বিশুদ্ধ এবং মার্জ্জিত। এ গ্রন্থ খানা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এই গ্রন্থের যথেষ্ট আদর করিবেন। ভাষার অযথা উচ্ছ্বাস কোথাও নাই। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

রূপকথা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার কোমলমতি বালক বালিকাদের উপযোগী করিয়া নানা দেশীয় রূপকথা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল বালক বালিকার উপযোগী।

গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রকাশ করিয়া প্রকাশক মহাশয় বালক বালিকাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর। আমরা বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক যোগেন্দ্রনাথের হাতে শেষে "রূপকথা" দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহাকে যে প্রতিভা দিয়াছেন তাহা তিনি ছেলেদের "রূপ কথায়" ম্লান না করিলেই অধিকতর সুখী হইব।

মিলন—শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। মিলনাত্মক সামাজিক নাটক। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। ভাষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সুলেখক হইতে পারিবেন।

একলব্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় প্রণীত। ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ।৵০ আনা।

গ্রন্থকার মহাভারত বর্ণিত একলব্যের উপাখ্যান অতি সরল ও সহজ ভাষায় শিশুদের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একলব্যের একাগ্রতা শিশুদের অনুকরণীয়। এই গ্রন্থ শিশুকে সযত্নে পড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রন্থে কয়েকখানি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়া ইহাকে আরো উজ্জ্বল ও মধুর করা হইয়াছে। শিশুসাহিত্যে অবিনাশ বাবুর হাত আছে। অবিনাশ বাবুর নিপুণ তুলিকায় একলব্য বেশ সুন্দর রঞ্জিত হইয়াছে। শিশুদের নিকট একলব্য বিশেষ আদর লাভ করিবে। বাঁধাই মনোরম।

নিবেদন।

শারদীয় পূজা উপলক্ষে সৌরভ আফিস একমাস কাল বন্ধ ছিল। সে সময় যে সকল গ্রাহক আফিসে চিঠি পত্র দিয়াছেন তাহাদের চিঠির উত্তর দেওয়ার তখন সুবিধা হয় নাই। এখন অনুগ্রহ করিয়া চিঠি লিখিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন ও উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা যাইবে।

কাগজের অভাবে সৌরভ প্রকাশে বিলম্ব হইল তজ্জন্য গ্রাহকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রটী গ্রহণ করিবেন না। আগামী সংখ্যা ১লা অগ্রহায়ণ গ্রাহকদিগের হস্তগত হইবে।

Published by Keder Nath Mazumder, Research house Mymenshing.

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat art Press, Dacca.

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন

জন্ম—২১শে শ্রাবণ, ১২৪৯। মৃত্যু—২২শে কার্ত্তিক, ১৩২১।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২১। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

তিব্বত অভিযান।

(গিয়াংসী ও অপরাপর কথা)।

জেনারেল সাহেব চলিয়া যাইবার পর আমরা একে একে সহর ও তাহার চারিদিককার দ্রষ্টব্য বিষয় সকল দেখিতে আরম্ভ করিলাম। সহরের আয়তন বড় ক্ষুদ্র নয়, তবে দেখিবার উপযুক্ত বড় একটা কিছু নাই। রাস্তা ঘাট অত্যন্ত আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ বলিয়া প্রথম প্রথম আমাদের বড় কষ্ট হইত। কিন্তু—

"শরীরের নাম মহাশয়,
যা সওয়াবে তাই সয়।"

কয়েক দিনের মধ্যে আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ তিব্বতে আজ আমরা কয়েক মাস হইতে ইহা দেখিয়া আসিতেছি। সহরের বিশেষ কোনও প্ল্যান্ নাই। যেখানে যেমন সুবিধা হইয়াছে, বাড়ী বা রাস্তা তেমনি নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ বাড়ী দ্বিতল। ইষ্টকের বড় প্রচলন নাই, সমস্তই প্রস্তরময়। বাড়ীগুলির ছাদ আদৌ নাই, এক একটা পাথরের ঢিবির মত যেন কোনও রকমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। শীত প্রধান স্থান বলিয়া গবাক্ষ রাখিবার প্রথা নাই। সুতরাং ঘরগুলি সকলই আমাদের সেকেলে নবাবদের বেগম-মহলের মত 'অসূর্য্যম্পশ্যা'। আগেই বলিয়াছি, তিব্বত লামাদের দেশ। তাঁহারা সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু সহরের সমস্ত ভাল ভাল বাড়ী তাঁহাদের হাতে। তাঁহারাই সহরের প্রথম শ্রেণীর অধিবাসী। অর্থ এবং ক্ষমতা দুইই ইঁহাদের হাতে। ইঁহারা আইনেরও উপরে। শত সহস্র অন্যায় কার্য্য করিলেও কেহ ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এ অবস্থায় ইঁহাদের প্রত্যেকে যে এক ২ জন 'মহান্ত মাধব গিরি' হইয়া পড়িবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দেশের সাধারণ অধিবাসী দিগের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রী কন্যা লইয়া বাস করা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। কেহ যদি বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে তাহা সে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পরে না, লামাদিগকে উহার ভাগ দিতে হয়। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই কাহিনী—এই অত্যাচার!

অনেকে তিব্বতকে ভারতের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন তিব্বতের লামাদিগের ন্যায় ভারতের ব্রাহ্মণ জাতি চিরদিন অন্যান্য জাতির উপর অধিকার ও অত্যাচার করিয়া আসিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না। ভারতের বিপ্রগণ দেশের জন্য (লামাদিগের ন্যায়) আইন কানুন প্রস্তুত করিতেন বটে, কিন্তু শাসনের ভার তাঁহারা কখনও নিজের হাতে রক্ষা করেন নাই। সে কাজটা চিরদিন ক্ষত্রিয়েরা করিয়া আসিয়াছেন। তিব্বতে লামা ভিন্ন আর কেহ লেখা পড়া করিতে পারে না। ভারতে অবশ্য এপ্রথা কোনও দিন ছিল না। ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, কায়স্থ সকলেই লেখা পড়া শিখিতেন। বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি পাঠে সকলের অধিকার না থাকুক, কিন্তু তিব্বতের মত ছোট বড় সকলে নিরক্ষর থাকিতেন না।

তিব্বতের যে কোনও সহরে প্রবেশ করিলেই বিদেশীয়গণ সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য করিবেন যে, এখানে মঠ ভিন্ন অন্য কোনও ভাল ইমারত নাই। দেশের যেখানে সেখানে মঠ। কেহ যেন মনে না করেন, ইহা লামারা

গিয়াংসীতে বৃটিশ পতাকা।

নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাদের নির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয় জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পর্য্যন্ত ২।৩ টা মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। লোকালয় হীন পর্ব্বত, জঙ্গল বা প্রান্তরেও আমরা অনেক ভাল ভাল মঠ দেখিয়াছিলাম। লামারা যদি জন সাধারণের নিকট হইতে ইহাদের নির্ম্মাণ ব্যয় গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও হয়ত তত দোষের হইত না কিন্তু ঐ সমস্ত মঠে যে সকল লামা বাস করেন, তাঁহাদের সমস্ত খরচ দেশের হতভাগ্য অধিবাসীকে বহন করিতে হয়। লামারা সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু আহারাদি ব্যাপারে তাঁহারা এক এক জন এক একটি ক্ষুদ্র নবাব!

দেশের লোক লামাদিগের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে কেন? শত ২ বর্ষ ব্যাপী অজ্ঞানতা নিবন্ধন ইহারা এমন গভীর কুসংস্কার জালে আবদ্ধ হইয়াছে যে, ইহাদের হিতাহিত বিবেচনার আর কোনও ক্ষমতা নাই। ইহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, শত ২ অপদেবতা নিত্য ইহাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইহারা যদি মঠ নির্ম্মাণ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে অর্থ সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পদে পদে অমঙ্গল ভোগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ইহারা এই সকল অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে রীতিমত পূজা করে। যে বুদ্ধদেব একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য বেদকে পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া ছিলেন, তাঁহার উপাসকগণের কি ভীষণ অবনতি! হিন্দুদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একাধিক দেবতার উপাসনার ছায়া আসিয়া পড়িবে ভাবিয়া যিনি বেদ ও বিপ্রকে ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, আজ তাঁহার একি পরিণাম?

গিয়াংসীর মধ্যে ও চারিদিকে কত যে বৌদ্ধমঠ আছে তাহার স্থিরতা নাই। এখানকার সর্ব্বপ্রধান মঠটি দুর্গের ঠিক অপর দিকে পর্ব্বতের উপর। আমরা একদিন উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। একটার সময় বাহির হইয়া বেলা দুইটার সময় উহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সঙ্গে একজন লামা পথ পরিদর্শক ভাবে গিয়াছিলেন। উপরে উঠিবার ভাল পথ ছিল না। গলদঘর্ম্ম অবস্থায় উহা অতিক্রম করিয়া মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। উহার চারিদিকে উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর ঠিক যেন দুর্গের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। ফটক বন্ধ করিয়া দিলে ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শুনিলাম, ভিতরে প্রবেশ করিবার অপর কোনও পথ নাই। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রবেশদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। লামা মহাশয় সঙ্গে ছিলেন বটে, কিন্তু কিছু দক্ষিণা না দিয়া প্রবেশ-অধিকার পাইলাম না। প্রথমেই খানিকটা অন্ধকারময়

স্থান অতিক্রম করিতে হইল। তাহার পর বাম দিকে কতকদূর গিয়া আমরা এক প্রশস্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দ্বারের উপর চারিজন দিক্‌পালের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি গুলি খুব প্রশান্ত—পরিধানে চীন যোদ্ধার পরিচ্ছদ। পূর্ব্ব দিক্‌পালের শ্বেতবর্ণ মস্তকের উপর সূর্য্যদেবের গোলাকার মূর্ত্তি। পশ্চিম দিক্‌পালের বর্ণ লোহিত—অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের রং। দক্ষিণ দিক্‌পাল সুবর্ণ বর্ণে চিত্রিত। কারণ, তিব্বতীয়দিগের মতে অর্থাধিপতি (কুবের) দক্ষিণ দিকের অধিপতি। উত্তর দিক্‌পালের মূর্ত্তি সবুজ বর্ণে রঞ্জিত। তিব্বতে বরফের রং এই বর্ণে কল্পিত হয়। দিক্‌পাল চতুষ্টয়ের পার্শ্বে দুইজন ভীষণাকার দানবের মূর্ত্তি। এই কক্ষের বাম দিকে মঠের প্রধান কক্ষ। কক্ষের মধ্যে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের বিশাল মূর্ত্তি। ঐ সময়ে কয়েকজন লামা মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন। ভাষা বুঝিলাম না, কিন্তু সুর ও ছন্দ সংস্কৃত স্তোত্রের মত বলিয়াই মনে হইল। কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা অন্যদিকে গমন করিলাম। একস্থানে কয়েকটি সুসজ্জিত কক্ষ দেখিলাম। মঠের প্রধান ২ লামারা উহাতে বাস করেন। তাঁহারা যে বিশেষ আরামের সহিত থাকেন তাহা তাঁহাদের বাসস্থানের সাজসজ্জা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

এই মঠে আমরা পীত ও লোহিত পরিচ্ছদধারী লামা দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম, ইহার প্রধান লামা মহাশয় বিশেষ উদার। তাঁহার নিকট উভয় সম্প্রদায়ই সমান। তবে এমন উদারতা বোধহয় তিব্বতের আর কোনও মঠে নাই। মঠে প্রায় ৫০০ লামার উপযুক্ত স্থান নাই। কিন্তু ঐ সময়ে তিন শতের অধিক লোক ছিল না।

ইহার পর আমরা মিলন কক্ষে (ডুকং) প্রবেশ করিলাম। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একখানা চক্র স্থাপিত আছে। ইহার নাম 'জীবন চক্র'। ইহার চারিদিকে বুদ্ধদেবের কয়েকটি উপদেশ খোদিত আছে। যে কেহ উহা ঘুরাইয়া দেয়, সে ঐ সকল উপদেশ পাঠের ফল লাভ করে। অবশ্য ইহার জন্য দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই জন্য সাধারণ লোকে ইহা দুই একবারের অধিক ঘুরাইতে পারে না। বড় লোকেরা প্রায়ই প্রতিনিধি দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের নামে কি ভীষণ প্রতারণা! আমাদের মধ্যে যেমন মালা ফেরান ও মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ, ইহাও কতকটা সেইপ্রকার। হয় ত ইহা আমাদের দেশের ঐ প্রথা হইতেই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। তিব্বতের প্রত্যেক মঠে এই জীবন-চক্র আছে। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র প্রস্তুত করাইয়া সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া থাকেন। কোন কোন বড় লোক একটা চক্র প্রস্তুত

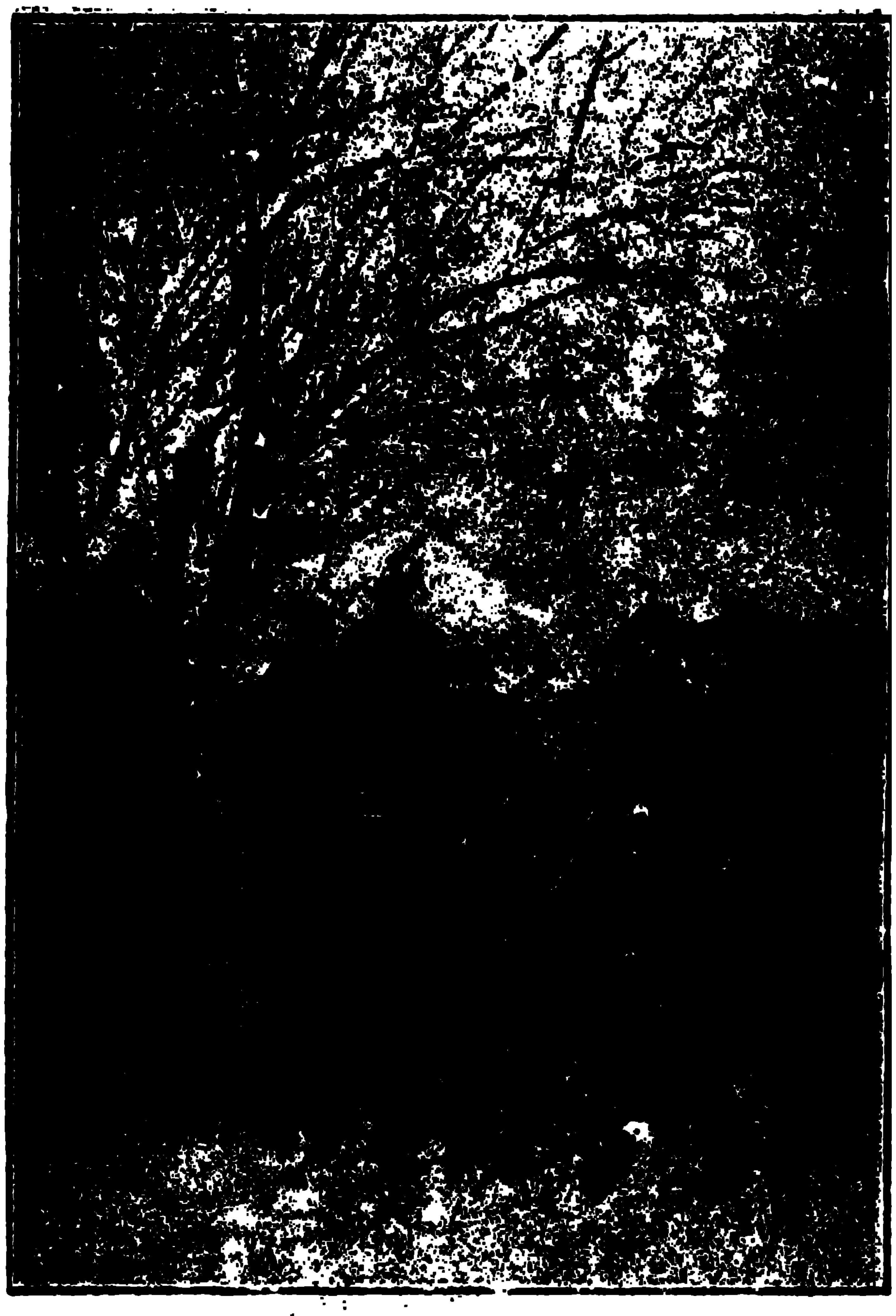

জেনারেল মেকডনেল্ড ও তাঁহার টাঙ্ক।

করাইয়া কোনও প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দেন। যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র তাহারা উহার সাহায্যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

শুনিলাম, এই মিলন-কক্ষে প্রাত্যহিক পূজা পাঠ প্রভৃতি হইয়া থাকে। কক্ষগুলি অত্যন্ত অন্ধকারময় বলিয়া উহার মধ্যে দিবা রাত্রি ঘৃত প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। এই কক্ষের পার্শ্বে আর একটি ঘরের ভিতর

বহুতর প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দেখিতে পাইলাম। উহাদের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিলাম যে, ইহাদের বড় একটা যত্ন লওয়া হয় না। প্রধান লামা মহাশয় বলিলেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে—কয়েকখানা২০০০।২৫০০বৎসরের পুরাতন। তিনি আরো বলিলেন যে, প্রাচীন কালে এই সমস্ত গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এইস্থানে বলিয়া রাখি যে,

তিব্বতীয় অশ্বারোহী সৈন্য।

তিব্বতের প্রধান প্রধান মঠগুলিতে আজ পর্য্যন্ত বহুতর প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক নিতান্ত অযত্নের সহিত পড়িয়া আছে—এইভাবে যে কত দুর্লভ পুস্তক নষ্ট হইয়াছে বা হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? এখনও যদি চেষ্টা করা হয়, তাহাহইলে অনেক অমূল্যরত্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পায়। যদি কোনও দিন ইহাদিগকে সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতের কত অজ্ঞাত কাহিনী, আমাদের প্রাচীন পিতামহগণের জ্ঞান গরিমার কত দুর্লভ দৃষ্টান্ত যে প্রকাশিত হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিব্বতে এই সকল প্রাচীন পুস্তক অতি ভক্তির সহিত পূজিত হয়। লামারা ইহা পূজা করিবার পূর্ব্বে ও পরে ইহাকে ভক্তির সহিত মস্তকে রক্ষা করেন। মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ পুস্তকগুলিকে সহরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। ঐ সময় সহরবাসীমাত্রেই রাজপথের উপর লুণ্ঠিত হইয়া উহাদিগকে বন্দনা করে।

আমরা মঠের কয়েকজন লামার সহিত দ্বিভাষীর সাহায্যে কয়েকবার আলাপ পরিচয় করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ভূগোল সম্বন্ধে ইঁহাদের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নাই। নিজের দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের আখড়াধারী বাবাজীদিগের প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রকার অভিজ্ঞতা, এ দেশের লামারা যে উহাপেক্ষা বিন্দুমাত্র উন্নত নহে ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। অবশ্য, সকলেই হস্তীমূর্খ নয়। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

গিয়াংসীর এই মঠের অনতিদূরে স্থানীয় শবাগার। এই স্থানে সহরের প্রায় অধিকাংশ শব ফেলিয়া যাওয়া হয়। দেশের যত শকুনি, কাক, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি এই স্থানে এক প্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে মনের সুখে বসবাস করিতেছে। ইহারা মৃতদেহ খাইয়া খাইয়া এমন হিংস্র ও নির্ভীক হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা তাহাদের খুব নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেও, তাহারা পলায়ন করিবার ভাব প্রকাশ করিল না। কুকুরগুলি বরং মুখভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করিল যে, আমরা যাওয়াতে তাহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। বোধহয় মনে মনে বলিল "হে মানব! এখনও ত তোমাদের এখানে আসিবার সময় হয় নাই। তবে অনর্থক কেন আমাদিগকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ?" তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাপঙক্তি ও নখরাজি দর্শন করিয়া আমরা অবিলম্বে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলাম।

অনেকে বলেন, এদেশে কাষ্ঠের অভাব বলিয়া মৃতদেহ দাহ করা হয় না। বৎসরের অধিকাংশ সময় সমস্ত দেশ

বরফে আবৃত থাকে বলিয়া কবর দেওয়াও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই জন্য উপরোক্ত উপায়ে শবের সৎকার করা হয়। লামাদিগের মৃত দেহ ও বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগীর শব দাহ করা হয়। এই স্থানের অনতিদূরে চীনাদের শ্মশানভূমি। তথায় কিন্তু কবরের বন্দোবস্ত আছে।

গিয়াংসীর নিকটবর্ত্তী 'সে চীন্' নামক স্থানের মঠ। ইহা পূর্ব্বোক্ত মঠ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এই স্থানে প্রায় ২০০০ লামা বেশ আরামের সহিত বাস করিতে পারেন। এই স্থানের সকলেই পীতবর্ণধারী লামা। শুনিলাম, প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে এই সম্প্রদায় তিব্বতে প্রথম সংস্থাপিত হয়। এই বর্ণের পরিচ্ছদধারী লামা সমাজের স্থাপয়িতা 'সংখপা' স্বয়ং একবার এই মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মঠ হইতে একটা সুড়ঙ্গ বরাবর লাসা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আমরা এই সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস পাইলাম না।

পর দিবস বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা তিনজন বাঙ্গালী ও একজন সাহেব আর একটি মঠ দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। শুনিলাম, সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চিরদিন এক একটি অন্ধকারময় কক্ষের মধ্যে বাস করেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাহিরে আইসেন না। গিয়াংসী হইতে ইহা প্রায় ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। বেলা প্রায় ২টার সময় আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের অশ্বের পদ শব্দে কয়েক জন লামা বাহিরে আসিলেন। ইঁহারা, দেখিলাম, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আমাদিগকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন। মঠটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের, কিন্তু ইহার কোনও স্থানে ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিলাম না। এই স্থানের লামারা যোগী, সেই জন্য নাকি ইঁহারা মূর্ত্তির উপাসনা করেন না। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে জনৈক যোগী আসিয়া এই মঠ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এখানকার সন্ন্যাসীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মঠের মধ্যে ৩॥ হাত দীর্ঘ ও ২॥ হাত প্রশস্ত এবং ৩ হাত উচ্চ বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ (cells) আছে। নূতন যোগীদিগকে ঐ কক্ষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ছয় মাসের জন্য দিন রাত্রি বাস করিতে হয়। ঐ সময়ে উঁহারা প্রত্যহ একমুষ্টি চাউল একবার করিয়া আহার করেন। ঐ হিসাবে ছয় মাসের আহার ঐ কূপের মধ্যেই রক্ষিত হয়, এবং উহার প্রবেশ দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহারা পুনরায় ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর তিন মাসের জন্য ঐ প্রকার কক্ষে প্রবেশ করেন। এই অবস্থায় তাঁহারা দুই দিন অন্তর এক মুষ্টি তণ্ডুল আহার করিয়া থাকেন। ইহার পর, যোগী ইচ্ছা করিলে শেষ সোপানে আরোহণ করেন। তৃতীয় পরীক্ষা বড় কঠিন, কারণ ঐ সময় যোগীকে যাবজ্জীবন ঐ কক্ষের মধ্যে থাকিতে হয়। ঐ সময় সপ্তাহে এক মুষ্টি চাউলের ব্যবস্থা। এ পর্য্যন্ত নাকি এই মঠের দুই জন মাত্র সন্ন্যাসী এই তৃতীয় পরীক্ষায় পাশ নম্বর পাইয়াছেন। আমরা যে সময় গিয়াছিলাম তখন নাকি তৃতীয় অবস্থার কেহই ছিলেন না। এই মঠের নাম 'নিয়াং—টু—কি—নিউ'। ইহার অর্থ—'মানবের দুরবস্থার বিষয়ে ধ্যান করিবার গহ্বর'।

এই স্থান হইতে আমরা নিকটবর্ত্তী আর একটি মঠে গমন করিলাম। সেখানে দেখিবার উপযুক্ত কিছু না থাকিলেও আমরা একটি সংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। শুনিলাম, প্রথমোক্ত মঠে ক্রমাগত ২১ বৎসর কাল কূপবাসী এক যোগী আছেন। ঐ মঠের লোকেরা কিন্তু আমাদিগকে ঐ সংবাদ আদৌ দেয় নাই। কাজেই আমরা আবার ঐ স্থানে ফিরিলাম এবং অনেক চেষ্টার পর ঐ অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার আদেশ পাইলাম। আমরা চারিজন ও দুইজন সাধারণ লামা এক ক্ষুদ্র কক্ষের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম। এই কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৮ ও ৫ হাতের অধিক নহে। ইহার কোনও দিকে কোনও প্রকার গবাক্ষ বা ছিদ্র ছিল না। প্রবেশ দ্বারও অত্যন্ত ক্ষুদ্র—এক জন লোক কোনও রকমে প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য কক্ষটি অন্ধকারপূর্ণ ছিল। উহার মধ্যে একটি তৈল-প্রদীপ কোনও প্রকারে নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছিল। সাহেবের নিকট মোমবাতি ছিল। তিনি উহা জ্বালিয়া দিলেন। তখন দেখিলাম কক্ষের দক্ষিণ দিককার প্রাচীরের গাত্রে দুই ফুট উচ্চ ও দুই ফুট প্রশস্ত এক দ্বার রহিয়াছে। একজন লামা ঐ

দ্বারের উপর মৃদুভাবে আঘাত করিলেন। দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করা হইল। কিন্তু কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন দ্বিতীয় বার একটু জোরের সহিত আঘাত করা হইল। প্রায় দেড় মিনিট পরে ঐ ক্ষুদ্র দ্বার ভিতর হইতে উন্মুক্ত হইল। সঙ্গে ২ একখানা অতি জীর্ণ শীর্ণ হাত বাহির হইল। নখগুলি অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া নানাপ্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখিলাম, হাতখানা সজোরে কম্পিত হইতেছে। সাহেব তিব্বতীয় ভাষা জানিতেন। তিনি অতি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন?" ভিতর হইতে এক অতি অস্বাভাবিক কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হইল। নাভিশ্বাসের সময় লোকের যেমন স্বর হয় ইহা কতকটা সেই রকম। মনে হইল যেন আওয়াজটা অনেক দূর হইতে আসিল। ইহার পর হাতখানি অদৃশ্য হইল এবং খুব আস্তে আস্তে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম যে প্রায় ২১ বৎসর যাবত উক্ত যোগী ঐ কূপের মধ্যে বাস করিতেছেন। পাঁচ দিনের পর উঁহাকে এক মুষ্টি চাউল ও সামান্য পানীয় প্রদান করা হয়। তাঁহার কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ৪. প্রস্থে ২॥ ও উচ্চে ৩ হাত মাত্র। উহাতে বিন্দুমাত্র আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। এই ২১ বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ঐ কক্ষ ত্যাগ করেন নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি শৌচ প্রস্রাবের জন্য যে কি করেন তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। লামাদিগকে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাই-লাম না।

তিব্বতে এই জাতীয় মঠ আরও কয়েকটি আছে। উহাদের সর্ব্বত্রই এইভাবে যোগাভ্যাস করা হয়। ইহা-দের মধ্যে বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই বটে, কিন্তু ইহার সন্ন্যাসীরা সকলেই বৌদ্ধ। এ ভাবে যোগাচরণ ভাল কি মন্দ তাহা বলিবার অধিকার হয় ত আমার নাই। কিন্তু এপ্রকারে দেহপাত করিয়া ধর্ম্ম সাধনা যে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব। শরীরকে কষ্ট দিয়া যে ধর্ম্ম সাধনা হয় না, ইহা ভগবান অমিতাও স্পষ্ট-ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। এই মতের স্থাপনকর্ত্তা মিলা নামক জনৈক ভারতবর্ষীয় ঋষি অনুমান অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে উপস্থিত হয়েন এবং প্রচার করেন যে, প্রত্যহ কিয়ৎকাল নির্জ্জনে বসিয়া আত্মচিন্তা করিলে অচিরে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। এই সঙ্গে ২ তিনি শিষ্যদিগকে ভারতবর্ষীয় যোগীজনসুলভ নানাপ্রকার আসন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সকল শিক্ষা দেন। বুদ্ধদেবও এই প্রকার নির্জ্জন আত্মচিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আধুনিক অজ্ঞ তিব্বতীয়েরা স্থাপনকর্ত্তার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এক্ষণে গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। পশ্চিমে একটি প্রবাদ বাক্য আছে:—"গুরু গুড়ই রহ গয়া, চেলা লেকিন্ চিনি হো গয়া।" তিব্বতে দেখিতেছি ঋষি মিলার চেলাগণ আরও এক ধাপ উপরে উঠিয়াছেন।

ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতে থিয়সফিষ্টদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিব্বতে এখনও এমন অনেক যোগী মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা যোগবলে নানাপ্রকার অসাধ্য সাধন করেন—ইঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন। আমি উঁহাদের বিষয়ে অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কাহারও সাক্ষাৎ পাই নাই। হয়ত আমি পাপী বলিয়া তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

ঔদ্ভিদ লবণ।

চরক সংহিতায় আমরা ঔদ্ভিদ নামে এক প্রকার লবণের নাম প্রাপ্ত হই। যথা—

সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চস্যু লবণানি চ॥

চরক সূত্র স্থান ১।৪২

সৌবর্চ্চল (সোরা), সৈন্ধব, বিড় (বিটলবণ), ঔদ্ভিদ লবণ ও সামুদ্র এই পাঁচ প্রকার লবণ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রীতে ইহাকে মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত রে (Reh) লবণ বলা হইয়াছে। *

উপরে ঔদ্ভিদ শব্দের মূল অর্থ "মৃত্তিকা জাত" বলা হইল। কিন্তু ঔদ্ভিদ শব্দ উদ্ভিদ শব্দ হইতে উৎপন্ন। উদ্ভিদ

সাধারণতঃ বৃক্ষকে বুঝায়। অতএব ঔদ্ভিদ অর্থে "বৃক্ষ জাত" হইয়া পড়ে।

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও "ঔদ্ভিদং পাংশু লবণং যজ্জাতং ভূমিত স্বয়ং" ডল্বনাচার্য্যের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া উদ্ভিদ লবণের রে (Reh) লবণ অর্থ করিয়াছেন। (১)

চরকে ঔদ্ভিদ ও পাংশু দুইটী বিভিন্ন লবণ। যথা—

সৈন্ধব সৌবর্চ্চল কাল্মবিড় পাক্য কূপ্য বালকৈলমৌলক সামুদ্র রৌমকৌ।

দ্ভিদৌষর পাটেয়ক পাংশু জানীতেবং প্রকারাণি চান্যানি লবণ বর্গঃ।

চরক, বিমানস্থান, ৮।১:৮

অতএব উদ্ধৃত ডল্বনাচার্য্যের ব্যাখ্যায় ঔদ্ভিদ ও পাংশু লবণ বিভিন্ন বলিয়া পাংশু লবণকেই ভূমি হইতে উৎপন্ন বুঝাইতেছে মনে হয়।

মনিয়ার উইলিয়ামস্ কিন্তু ঔদ্ভিদ লবণকে "fossil salt" বলিয়াছেন। এ অর্থে উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে ইহার উৎপত্তির আভাষ পাওয়া যায়।

ঔষর নামে এক লবণের উল্লেখ উপরি উদ্ধৃত চরকের বিমান স্থানে আমরা দেখিতেছি। এই লবণ ঊষর ভূমি জাত। আমার মনে হয় এই ঔষর নাম হইতেই রে (Reh) নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঔষর ও রে (Reh) উভয় লবণই ভূমি জাত।

সুশ্রুতের সূত্র স্থানে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিকে লবণবর্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"সৈন্ধব সৌবর্চ্চল বিড় পাক্য রোমক সামুদ্রক পক্তিম যবক্ষারোষ প্রসূত সুবর্চ্চিকা প্রভৃতানি সমাসেন লবণোবর্গঃ

সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬।১২

সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট, পাক্য, রোমক, সামুদ্র, পক্তিম, যবক্ষার, ঔষর, সবর্চ্চিকা (সাচীক্ষার) প্রভৃতি লবণবর্গ।

এস্থলে যে সকল লবণের উল্লেখ দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে যবক্ষার ও সুবর্চ্চিকা (সাচীক্ষার) বাদ দিলে, পাক্য, রোমক, পক্তিম ও ঊষর লবণের নাম চরকের সূত্র স্থানে পাওয়া যায় না। সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিড় ও সামুদ্র নাম উভয় গ্রন্থেই আছে। ঔদ্ভিদ বলিয়া চরকে যে লবণের নাম আছে সুশ্রুতে সে নাম পাওয়া যায় না। তবে পাক্য, রোমক, পক্তিম ও ঊষর লবণের মধ্যে একটী ঔদ্ভিদ কিনা বিবেচ্য। নিম্নে তাহার বিচার করা যাইতেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন তাঁহার রসরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চ লবণ ও নবসার নামক পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"জাম্বীর জেন নবসার ঘনাম্ল বর্গৈঃ।
ক্ষারাণি পঞ্চ লবণানি কটুত্রয়ঞ্চ॥

লেবুর রস, নবসার, ঘন অম্ল সমূহ (Concentrated acids) ক্ষার সকল, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু।

একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত গোবিন্দপাদের রস হৃদয়ে ছয়টী লবণের নাম প্রাপ্ত হই। যথা—

সৌবর্চ্চল সৈন্ধবকং চুলিক সামুদ্র রোমক বিড়ানি।
ষড় লবণান্যেতানি ... ... ৯ম পটল।

সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, চুলিক, সামুদ্র, রোমক ও বিট এই ছয়টী লবণ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত রসরত্নসমুচ্চয়ে পঞ্চ লবণ ও চুলিকা লবণের উল্লেখ দেখিতে পাই। নবসার ও চুলিকা লবণ যে এক দ্রব্য তাহার উল্লেখও এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামঠং পঞ্চলবণং ক্ষারাণাং ত্রিতয়ং তথা।
মাংস দ্রাব্যাম্লবেতশ্চ চুলিকা লবণং তথা॥

রসরত্নসমুচ্চয়, ৪র্থ অধ্যায়। ৬৪

হিং, পাঁচ প্রকার লবণ, তিন প্রকার ক্ষার, মাংসদ্রাবী অম্লবেত ও চুলিকা লবণ।

করীর পীলু কাষ্ঠেষু পচ্যমানেষুচোদ্ভবঃ।
ক্ষারো সৌ নবসারঃ স্যাচ্চুলিকা লবণাভিধঃ॥

ঐ। ১২৭

কোমল বংশ ও পীলুকাষ্ঠ পচিলে এক প্রকার ক্ষার উৎপন্ন হয়। ইহাই চুলিকা লবণ নামক নবসার।

---

*"Audbhida (lit. begot of the soil) is the name applied to the saline deposit commonly known as the Reh efflorescence." Vol 1. P. 2,3.

(১) Dr. P. C. Roy's Hindu chemistry, Vol II., Addenda P. 127.

"সার" শব্দের অর্থ বৃক্ষের মজ্জা। যথা—"সারো মজ্জা সমৌ" অমরকোষে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ পচিয়া এক প্রকার লবণ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া হিন্দুগণ উহাকে যে উদ্ভিদের "সার" মনে করিতে পারেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা বৃক্ষের নূতন প্রকার "সার" বলিয়া ইহাকে "নবসার" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল দেখা যাইতেছে। ইহাকে এক প্রকার "ক্ষার"ও বলা হইয়াছে। কারণ বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া তাহার পাংশু হইতে ক্ষরণ করিয়া যবক্ষার প্রস্তুত করা হইত। নবসারও বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন এবং জলে ক্ষরিত হয়।

নবসার নিম্নলিখিত প্রকারে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নবসার ও চুলিকা লবণ নাম হইয়াছে।

ইষ্টিকা দহনে জাতং পাণ্ডুরং লবণং লঘু।
তদুক্তং নবসারাখ্যং চুলিকা লবণং চতৎ॥

রসরত্নসমুচ্চয়, ৩য়। ২৮

ইষ্টক দহন সময়ে লঘু, পাণ্ডুরবর্ণ এই লবণ জন্মে বলিয়া "নবসার" নামক লবণকে চুলিকা লবণও বলা হয়।

নবসারকে "জঠরাগ্নিকৃৎ" ও "ভুক্তমাংসাদি জারণং" প্রভৃতি গুণযুক্ত বলা হইয়াছে। যথা—

রসেন্দ্র জারণং লোহদ্রাবণং জঠরাগ্নিকৃৎ।
গুল্ম প্লীহাস্তশোষঘ্নং ভুক্ত মাংসাদি জারণং॥

রসরত্নসমুচ্চয়, ৩য়।১২৯

ইহা পারদ জারিত করে, লৌহ দ্রব করে, এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে। গুল্মরোগ, প্লীহা ও মুখশোষ নষ্ট করে এবং ভুক্ত মাংস জীর্ণ করে।

চুলীক বা চুলিকা শব্দ সংস্কৃত চুল্লী শব্দ হইতে উৎপন্ন। ললিত বিস্তর, সুশ্রুত ও মনুতে চুল্লী শব্দ আছে।

পঞ্চ-সূনা গৃহস্থস্ত চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ। মনুসংহিতা, ৩।৬৮। গৃহস্থের পাঁচটী সূনা বা প্রাণীবধ স্থান আছে যথা—চুল্লী, পেষণী, ঝাঁটা.........।

অতএব এশব্দ আধুনিক বা বৈদেশিক নহে। কেহ এই লবণকে বিদেশাগত মনে করিতে পারেন না।

ইষ্টক দহন কালে ইহা উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাকে আধুনিক বলিতে পারা যায় না। কারণ ইষ্টক দহন প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছে। বাজসনেয়ী সংহিতায়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে, কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র প্রভৃতিতে "ইষ্টিকা" শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণে এইরূপ লেখা আছে।

ইষ্টকা বহু সাহস্রী শীঘ্র মানীয়তামিতি।

আদিকাণ্ড, ১৩ সর্গ। ৯

দেখাগেল ৭ম শতাব্দীর "নবসার" লবণ উদ্ভিদ হইতে জাত। চরকের ভাষায় ইহার নাম উদ্ভিদ হইতে পারে। কিন্তু যবক্ষারও উদ্ভিদ্ হইতে জাত। চরকসংহিতায় ঔদ্ভিদ লবণ কি যবক্ষারকে বুঝাইত? যবক্ষার যে ঔদ্ভিদ লবণ নহে তাহা চরকের চিকিৎসাস্থলের নিম্নলিখিত অংশ দেখিলেই বুঝা যায়। যথা—

সৌবর্চ্চলং যবক্ষারঃ সর্জ্জিকৌদ্ভিদ সৈন্ধবম্। ২৮।১১৪

......সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ঔদ্ভিদ লবণ, সৈন্ধব লবণ।............

অতএব "নবসার" ও ঔদ্ভিদ লবণ যে এক তাহাই প্রমাণিত হয়।

সুশ্রুতে যে পক্তিম লবণের উল্লেখ দেখা গিয়াছে, পক্তিম শব্দের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে উহা পরিপাকে উপকারী বলিয়াই উহার নাম পক্তিম।

পক্তিম—Digestive, promoting digestion, Susruta.

মনিয়াম উইলিয়াম্সের অভিধান।

রসরত্নসমুচ্চয়ে নবসার "জঠরাগ্নিকৃৎ" ও "ভুক্তমাংসাদি জারণং" বলিয়া বর্ণিত। অতএব পক্তিম লবণের সহিত নবসার লবণের মিল দেখা যায়।

রসহৃদয়ে ৬য়টী লবণের নাম আছে। যথা, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড়, রোমক ও চুলিক। চরকে পাঁচটী লবণের নাম সূত্র স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড় ও ঔদ্ভিদ। অতএব চরকের অপেক্ষা রসহৃদয়ে রোমক লবণ বেশি এবং চরকের ঔদ্ভিদ স্থানে রসহৃদয়ে চুলিক রহিয়াছে। চরকের বিমান স্থানে রোমক ও ঔদ্ভিদ লবণ বিভিন্ন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা হইলে রসহৃদয়ের রোমক কখনই চরকের ঔদ্ভিদ লবণ হইতে পারে না। চুলিক নামই চরকের ঔদ্ভিদ নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কারণ চুলিক লবণ ইষ্টকের পাঁজায় উদ্ভিদ দগ্ধ হইয়াই উদ্ভূত হয় এবং সেই জন্যই রসহৃদয়ে চরকের ঔদ্ভিদ লবণের স্থানে চুলিক লবণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা আমরা এই তথ্যে উপনীত হই যে, চরকসংহিতা রচনার কালে অর্থাৎ খৃষ্টের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে লবণকে ঔদ্ভিদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, সুশ্রুত রচনার কালে (খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে) তাহাই পক্তিম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পক্তিম লবণই আবার ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে নবসার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর রসহৃদয়ে ইহাকে চুলিক নাম দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া মনে করিতে পারা যায় এই নাম আরো পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ নবম বা দশম শতাব্দীতে চুলিক নামকরণ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে চুলিক লবণ নিষাদল নামে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাক্ পৃথিবীর অপর কোন্ দেশে কত প্রাচীন কালে ইহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পারশ্য ভাষায় নিষাদলকে নৌসদর্ বলে। সংস্কৃত নবসার ও পারসীক নৌসদর্ নামে যে সাদৃশ্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে এক জাতি অপর জাতির নিকট এই দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কে কাহার নিকট ঋণী এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। আমরা দেখিতে পাই খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে আবু মনসুর নামে এক পারসীক আল্কেমিষ্ট ও চিকিৎসক নিশাদলকে ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেন। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন পারসীক বা আরবীয় বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থে নৌসদর্ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষে ৭ম শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে নবসার নাম প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব পারসীকগণ যে ভারতবর্ষ হইতে এই লবণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিশরীয়গণ এই লবণ জানিতেন, পূর্ব্বে লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কারণ, বর্ত্তমান কালে ইউরোপে সাল এমোনিয়াকম্ নিষাদলকে বুঝায়; এবং এমোনিয়াকম্ অর্থ (মিশর দেশীয়) আমন দেবতা সম্বন্ধীয়। কিন্তু এক্ষণে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে মিশর দেশে সাল-আম্মোনিয়াকম্ অর্থে সৈন্ধব ও সাচীক্ষারকে বুঝাইত; কারণ এই দুই লবণ আমন দেবতার মন্দিরের নিকট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। অতএব প্রাচীন মিশরীয়গণ চুলিক লবণ জানিতেন না। তবে পরবর্ত্তী কালে উষ্ট্রের বিষ্ঠা দগ্ধ করিয়া মিশরে নিশাদল প্রস্তুত হইত। এই প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ আবু মনসুর আবিষ্কার করেন। কারণ তাঁহার গ্রন্থে এই প্রক্রিয়ার প্রথম উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে চুলিক লবণ নাম আমরা একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। সম্ভবতঃ এই নাম ইহার পূর্ব্বেই ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এই নাম আবু মনসুরের আবিষ্কৃত উষ্ট্রময় জাত লবণে ঠিক প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি হিন্দুগণ পারসীকদিগের নিকট এই প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতেন তবে তাঁহাদের বর্ণনায় উষ্ট্রময় দগ্ধ করিবার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু সেরূপ কোন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইষ্টকের পাঁজা ভিন্ন অপর কোন চুল্লির কথা নাই। তাহাতেই মনে হয় যে হিন্দুগণ অপর কাহারও নিকট ইহা শিক্ষা করেন নাই। চুলিক লবণ নামও পারসীকদিগের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয় যে পারসীকগণ সংস্কৃত চুলিক শব্দে নবসার উৎপত্তির প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবিয়া উহা নিষাদলের অপর এক নাম রূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইহার ইঙ্গিতে উষ্ট্রময় চুল্লিতে পোড়াইয়া নিষাদল উৎপত্তির এক নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (১) এই নূতন প্রণালী ভারতে প্রচারিত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত ল্যাটিন-জেবারের গ্রন্থে ইহাকে সাল-আর্মেনিয়াকম্ বা আর্মেনিয়া দেশের লবণ বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে সে সময়ে ইউরোপে নিষাদল আর্মেনিয়া দেশ হইতে যাইত। পরে ইহার নাম সাল-আম্মোনিয়াকম্ এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মিশর দেশ হইতে তখন এই লবণ ইউরোপে আমদানি

(১) গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সৌরভে "নবসার" প্রবন্ধে নবসার ও চুলিকা লবণ নাম হইতে আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে এই দ্রব্য মিশর হইতে ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে আমাদের সে অনুমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রঃ লেঃ।

হইত বলিয়া তাহা মিশরীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ল্যাটিন-জেবারের গ্রন্থে নরমূত্র হইতে লবণ যোগে এই লবণ উৎপাদনের এক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এই প্রণালীর কথা সংস্কৃত বা পারসিক কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব মনে হয় ইহা ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন খৃষ্টের ৭ম শতাব্দীতে এসিয়া হইতে ইউরোপে নিষাদল প্রথম নীত হইয়াছিল। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে হিন্দুগণই প্রথম এই লবণ আবিষ্কার করেন এবং পারসীকগণ তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত হন। তবে মুসলমান গণ উষ্ট্র ও মূত্র হইতে এবং ইউরোপীয়গণ নরমূত্র হইতে ইহার উৎপত্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

নিষাদল নামে পারসীক নৌসদর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিয়াছি নৌসদর নাম সংস্কৃত নবসার শব্দ হইতে উৎপন্ন। অতএব নিষাদল নাম প্রকারান্তরে সংস্কৃত নবসার হইতেই আসিয়াছে। যদ্যপি নৌসদর হইতে নবসার শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে পুনরায় নিষাদল শব্দ কেন হইল তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহাতেই বুঝা যায় নবসার হইতেই নৌসদর শব্দ প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

আমায় ও দেবতায়।

নীরবে বেসেছি ভাল — নীরবে ভজিব তায়
কে বিঘ্ন ঘটাবে মম — সে নীরব সাধনায় ?
জীবনের ক্ষুদ্র কক্ষে — জগতের অগোচরে
প্রেমানন্দে সুখানন্দে — অর্চ্চনা করিব তারে,
জীবন করিব ক্ষয় — সে মধুর ভাবনায়
অভিন্ন রবেনা আর — আমায় ও দেবতায়।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

রামগতির টপ্পা।

"সৌরভে" "ময়মনসিংহের দাশুরায়" * শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

দেশের লুপ্তোন্মুখ গুপ্তরত্নের উদ্ধার কল্পে ও সৌরভ-গৌরব রক্ষার নিমিত্ত এই প্রকার গুণীগণের গুণ-গরিমার কথা লইয়া সুলিখিত পুস্তক-প্রবন্ধের সবিশেষ প্রচার প্রয়োজন মনে করিতেছি! ইহা দ্বারা দিন দিন বঙ্গ-ভাষার অঙ্গ-শোভা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবার কথা।

পল্লীগ্রামস্থ নিরক্ষর কবিদিগের স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি-সঞ্জাত কনক কণিকা সদৃশ কবিতাগুলি কুড়াইয়া লইলে,—বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটা দিক অবশ্যই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে।

দেশের অনেক নিখুঁত-খাটি জিনিস মাটীর সঙ্গে মিশিয়া মাটী হইয়া যাইতেছে। অনাদরে অন্ধকূপে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। বহু সাধুসজ্জনের পবিত্র জীবন কাহিনী,—প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নাম,—বহু কল্যাণকর ঘটনা ক্রমশঃ অতীতের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বিস্মৃতির অতল-স্পর্শ গভীরতায় তলাইয়া যাই-তেছে। অনেকেই তাহা দেখেন না,—অথবা দেখিয়াও ছুঁইতে ধরিতে ঘৃণা-লজ্জা মনে করেন। এইরূপ অকল্যাণ কর প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমরা দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, সন্দেহ নাই। "কুস্থান হইতে তুলি লইবে কাঞ্চন।" বহু বুদ্ধিমান্ বড় মানুষকে এই সুনীতির অনুকূলে উদাসীন থাকিতে দেখা যায়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে,—অযত্নে পতিত স্বদেশ জাত মণি-মুক্তা গুলির ধূলা-মাটী ধুইয়া মুছিয়া লইতে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলাম।

"ময়মনসিংহের দাশুরায়" রামগতি সরকারকে * আমি যত জানি,—চন্দ্রকুমার বাবু তত জানেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ,—আমি বহুদিন রামগতি সর-

---

* কবি রামগতিকে "ময়মনসিংহের দাশুরায়" না বলিয়া ময়মন-সিংহের নিধু বাবু বলিলেই ঠিক হইত। কেননা নিধুবাবু উহার অল্প পরিচিত, দাশুরায় পাঁচালীতে ওস্তাদ ছিলেন।

* কবির ওস্তাদদিগের সাধারণ উপাধি সরকার"।

কারের সঙ্গে একযোগে থাকিয়া কবিগান করিয়াছি। এবং কবিগান সম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছি।

চন্দ্রকুমার বাবুর লিখিত "ময়মনসিংহের দাশুরায়" প্রবন্ধটী নানাকারণে কিছু অসম্পূর্ণ রহিয়াগিয়াছে। আমি আপন অযোগ্যতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই প্রবন্ধের পোষকতায়,—পরিশিষ্ট স্বরূপ "রামগতির টপ্পা" শীর্ষক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিতেছি।

রামগতি সরকারের কয়েকটি টপ্পা (গীতি কবিতা) লইয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

রামু, রামগতি, রামকানাই এক সময়ের লোক। রামু,—মালী,— রামগতি,— শীল,— রামকানাই,—নাথ ছিলেন। রামুর বাড়ী,—আউটপাড়া, রামগতির বাড়ী,—গাঙ্গাইল,—আর রামকানাইর বাড়ী ঘাইটাল ছিল। এই গ্রামত্রয় ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার এলাকায় অবস্থিত।

রামগতি সরকার সময় সময় অবস্থার পীড়নে সেখানে যাইয়া বাড়ী বাঁধিতেন। তিনি কিছুকাল সুকুন্দি গ্রামেও বাস করিয়াছিলেন ;—এবং তথা হইতে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কৈলাটী ফতেপুর দাশুবিশ্বাসের অধিকারে আসেন। দাশুবিশ্বাস মহাশয় কতকখানি অনুর্ব্বরা ভূমি জোত স্বত্বে দিয়া, রামগতি সরকারকে প্রজা করিয়া লইলেন। ঋণের জ্বালায় সুকুন্দীও ছাড়িলেন, বিশ্বাস মহাশয়ের প্রদত্ত জমীতে ফসলও হয় না,—একদিন এই সমস্ত ঘটনা লইয়া রামগতি, আঠার-বাড়ীর জমীদার মহিম বাবুকে এক টপ্পা শুনাইলেন। এই আত্মনিবেদন ও প্রার্থনাসূচক কবিতাটী (টপ্পা) "ময়মনসিংহের দাশুরায়„ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, জন্য এখানে আর পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করিলাম না।

দয়াবান্ মহিমবাবু রামগতি সরকারের এই টপ্পা শুনিয়া জীবন পর্য্যন্ত উপভোগের জন্য কিছু ভূমি সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অনক্ষর কবিদিগের মধ্যে উপর্য্যুক্ত তিন জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তন্মধ্যে রামু রামগতি যত প্রতিভাশালী ও বিখ্যাত, রামকানাই তত না।

রামু-রামগতিতে প্রায় সর্ব্বদাই কবির লড়াই হইত। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জেলার ঝুমুর ওয়ালীর দল আসিয়াও,—এই প্রভূত প্রতাপশালী বীরদ্বয়ের সঙ্গে রণপ্রাঙ্গণে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু,—রামু-রামগতির প্রবল পরাক্রমে তাহারা অনেকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিত না। অল্পকাল মধ্যেই হঠিয়া যাইত।

পরে এই অজেয় কবি-বীরদ্বয়ের পরাক্রমে পরাভূত হইয়া, নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ঢাকা জেলার ঝুমুরওয়ালীর দল সকল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। সেই হইতেই ভিন্ন জেলার ঝুমুর ওয়ালীদলের ব্যবসায় ময়মনসিংহে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রামু-রামগতির বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল,—ঝুমুর ওয়ালী দেশ ছাড়িল,—তখন আর তাঁহাদের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারে এমন কেহ রহিল না। এই সময়ে কেবল রামু-রামগতিতেই যুদ্ধ বাঁধিত।

ছড়াপাঁচালীর মুখ রামুর বেশী হইলেও রামগতির টপ্পার মত এমন টপ্পা করিতে রামুর শক্তিতে সকল সময় কুলাইয়া উঠিত না।

রামগতির তুলনায়, রামু কষ্টকবি ছিলেন। রামুকে অনেক সময় গীতের জওয়াব করিতে,—টপ্পা রচনা করিতে, কি কোন "ধরাট" কথার ভাবসঙ্গত উত্তর করিতে চিন্তাযুক্ত দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দাশু-রায় রামগতি,—কি বলিবেন,— কি রচনা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া গুছাইয়া লইতেন না। গানের সময় তাঁহাকে সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখিয়াছি। রামগতির জিহ্বাগ্রে সরস্বতীর অটল আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রামু-রামগতি বসন্তের কোকিল ছিলেন। তাঁহাদের কুহু-কূজনে ময়মনসিংহের কাব্য-কানন সর্ব্বদাই আনন্দ মুখরিত থাকিত।

একদিন রামুমালী কবির ভাবে বিভীষণ হইয়া'—রামগতিকে রাবণ করিয়া অনুযোগ মাখা হিতোপদেশ দিতেছেন,—

"দাদা! আপনি তো রাম-সীতাকে চিনিতে পারেন নাই। রাম, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,—আর সীতা

পূর্ণ লক্ষ্মী নারায়ণী। আপনি একজন বিখ্যাত রাজা,—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সীতাহরণ কার্য্যটা আপনার পক্ষে বড় অন্যায় হইয়াছে। আপনি কা'র কথায় রামের সীতাকে আনিলেন ?"

রামু বিভীষণের জিজ্ঞাসার উত্তর রামগতি রাবণ টপ্পায় করিতেছেন,—

চেতান,—তুমি বল্লে নাকি রামের সীতা আন্‌লাম কার কথায়।

পারাণ,—বিভীষণ, তুমি জান না কারণ, যখন ভগ্নী এসে জানাল আমায়॥

মিল,—তার কাটা নাকে, বসন দেখে, দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে কি ?

মহড়া,—আমি সেই রাগেতে, হরণ ক'রে আন্‌লাম রামের জানকী।

অন্তরা,—সূর্পনখার নাসা কাণ, কেটে কল্ল অপমান, রামের ভাই লক্ষ্মণ ধানুকী,—

মিল,— তুমি ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ মারো,—বাজারের ভাও জান কি ?

আঃ মরি মরি ! কি সুন্দর গুরু-গম্ভীর ভাবের উত্তর টী ! রাবণ একজন সুবিজ্ঞ প্রবীণ রাজা,—তাঁর মুখে যেরূপ উত্তর সাজে,—রামগতি সরকার, রামু সরকারকে সেইরূপ ভাবেই উত্তর দিয়াছেন। শেষ কথায় রাবণ শ্লেষ মিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"বিভীষণ! তুমি রাজা না,—সুতরাং মানাপমান, রাজগৌরব, রাজ্য রক্ষা, প্রজাপালন, যুদ্ধ বিগ্রহ এ সকল বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমার খবর (জ্ঞান) নাই। তুমি কেবল খাও, বেড়াও, আর ঘুমাও। কোন্ দিক দিয়া কি হয় না হয়,—বা কোন্ বিষয়ের কি করা না করা, সে সম্বন্ধে তুমি একবারে বোধ শূন্য।

গ্রাম্য নিরক্ষর কবির ভাষায়—

"তুমি ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ মারো বাজারের ভাও জান কি ?"

বাস্তবিক যাহারা কেবল ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ করে,—তাহারা "বাজারের ভাও" অর্থাৎ চাউলের দর জানে না।

পাঠক ! দেখুন রামগতির কি শক্তি ! একটী টপ্পার ভিতর কত ভাব-রসের সমাবেশ।

একদিন আষাঢ় মাসে শম্ভু সরকার আমাদের রামগতি সরকারের সঙ্গে কবির পাল্লা দিতেছেন। শম্ভু জাতিতে ঝাল (জেলে) ছিলেন। তাঁহার দলের লোকগুলিও সমস্তই ঝাল ছিল। সুযোগ পাইয়া রামগতি সরকার, শম্ভু সরকারকে লজ্জিত করিবার মানসে কতকগুলি মাছের নাম দিয়া একটী টপ্পা গড়িয়া লইলেন।

চিতান,—আজগবী এক কাব্য কথা, মন দিয়া শুন সে সকল।

পারাণ,—মরি হায় রে!—আষাঢ়ে নূতন ঢলে, সিঙ্গ-মাগুর-কৈ-কাতলে বেঁধেছে একদল॥

মিল,—ঘন্তা (১) পুঁটা, খাদে দু'টা, গজার আর বাগরৈ গায় মূলতানে,—

মহড়া,—চান্দা, চেলা, ইচা, ঘুলীয়া (২) মলা, খৈলা(৩) আর চিতল চিতানে।

অন্তরা,—বোওয়াল,লাড়ী (৪) বাইম, লেড়ী পাব্যা (৫) এই কয়টা মৈল ভাব্যা, (৬) ধর্‌বে কোন স্থানে,—

মিল,—দলের নটুয়া, কড়ি কাটুয়া, মড়ার, চাটুয়া কাছিম মাঝ্ খানে॥

এই টপ্পাটি প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাষায় রচিত হইলেও,—ইহাতে শ্লেষ ব্যঞ্জক কবিত্বের ঝঙ্কার অতি সুন্দর রূপেই পরিস্ফুট হইয়াছে। অতি অল্প সময় মধ্যে এতগুলি মাছের নাম লইয়া একটি টপ্পা সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে।

আর একদিন বারড়া-উড়া গ্রামে আমি আর পরাণ কর্ম্মকার (প্রাণকৃষ্ণ কর্ম্মকার) কবিগান করিতেছি,—

(১) ঘন্তা,—বনিয়া বা বাটুকীয়া মাছ।

(২) ঘুলীয়া,—টেংরা মাছ।

(৩) খৈলা,—খলিশা।

(৪) লাড়ী,—টাকী বা উকল মাছ। ইহাকে কোন কোন স্থানে 'শুয়ড়া' বলে।

(৫) লেড়ী পাব্যা,—ঈষৎতাম্র বর্ণ এক প্রকার ছোট পাবিয়া মাছ।

(৬) ভাব্যা,—ভাবনা করিয়া।

এমন সময় হঠাৎ আমাদের "দাওয়ায়" আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার এই আকস্মিক গমনে সভাস্থ সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তৎপর কিছুকাল বিশ্রামের পর সভাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আসরে অবতরণ পূর্ব্বক ছড়া পাঁচালী গাহিতে লাগিলেন। আমারও পরাণের অযোগ্যতা সভার লোককে বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার ছড়া পাঁচালীর বিষয় হইল। তচ্ছ্রবণে আমি একটুকু বিরক্তির সহিত বলিলাম,—"আমরা (আমি আর পরাণ) অযোগ্য হইলেও তো বায়না পাইয়া আসিয়াছি,—আপনি যদি একজন উত্তম সরকার হইতেন, তবে আপনার বায়না নাই কেন?"

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে রামগতি সরকার এই টপ্পাটি গাহিলেন,—

চিতান,—তুমি বল্লে নাকি বিজয় ঠাকুর
আমার বায়না নাই।
পারাণ,—তুমি বিজয় ঠাকুর গুণবান্,
কর্ত্তে পার কবিগান, স্বীকার পাইলাম,
ধর্ম্ম সভার ঠাঁই॥
মিল,—উকীল, মোক্তার বায়না করে
বারিষ্টারে বসে খায়।
মহড়া,—বিজয় ঠাকুর! সেই জন্য কি
বারিষ্টারের মান্য যায়?
অন্তরা,—বধ করে দুই ভেড়ী, ঘৃণা
করে কেশরী, বসে রক্ত চায়,
মিল,—লজ্জা করে, মানের ডরে,
সাধু যায় না চোরের নায়। *

টপ্পা শুনিয়া আমরা এবং সভাস্থ লোক সকলেই চমৎকৃত হইলাম।

আমি নিরপেক্ষ ভাবে বলিতেছি,—বাস্তবিক কথাটা সত্য। উকীল মোক্তার আর বারিষ্টার,—মেষ আর সিংহ,—এবং চোর ও সাধুতে যতটুক্ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে, রামু-রামগতির সঙ্গে কবিগান সম্বন্ধে আমাদের ততোধিক প্রভেদ ছিল মনে করি।

একবার পুড়াকান্দিয়া দয়াচান্ সাহার বাড়ীতে আমি আর রামগতি সরকার শারদীয় দুর্গা পূজায় বায়না লইয়া গিয়াছিলাম। দুর্গা পূজায় তিনদিন গান হয়। সপ্তমীর আসর আগে যার হইবে,—নবমীর শেষ আসরও তাহার হইবে। তবে প্রতিপক্ষের কেবল অষ্টমীর এক আসর থাকিল।

যিনি আগে আসর রাখিবেন, তিনিই দাঁড়া করিবেন। অগ্রগামী ব্যক্তির ইচ্ছা মতই দাঁড়া হইয়া থাকে। এজন্য অনেক অপটু সরকার কোন মতে সপ্তমীর আসর রাখিতে চেষ্টা করে। তবেই তাহার সপ্তমী নবমী দুই আসর আগে হইল।

আমি রামগতিকে ভয় করিয়া সপ্তমীর সন্ধ্যা আরতির পরেই আসর দখল করিবার অভিপ্রায়ে আমার দলের বায়েনকে বলিলাম,—"সকালে ঢোল লইয়া আসরে যাও।" ঢুলী আমার কথামত আসরে ঢোল বাজাইয়াছিল। আমার এই প্রকার কার্য্য দৃষ্টে রামগতি সরকার কিছু বিরক্ত হইলেন। কারণ,—কবিওয়ালাদিগের একটী নিয়ম আছে,—নিজে অগ্রে আসরে না গিয়া প্রতিপক্ষকে আসর রাখিবার জন্য বলিতে হয়। আমি ভয় পাইয়া এই ভদ্রজনোচিত কর্ত্তব্যটি ভুলিয়া গেলাম। তৎপর রামগতি সরকার আমার এই অন্যায়াচরণটী লক্ষ্য করিয়া এই টপ্পাটী গাহিলেন,—

চিতান,—পুরা কান্দার বায়না লইয়া
আইলাম দুই জনে।
পরাণ,—আমরা উভয়েতে কর্ব্বো গান,
উভয়ে রাখিব, উভয়ের সম্মান,
তাইতে কিছু ভিন্ন জ্ঞান, নাই কারো মনে॥
মিল,—তুমি কোন্ বিচারে, সন্ধ্যা পরে,
আসরে বাজালে ঢোল?—
মহড়া,—ভাব্‌ছি তোর খাপ্‌ছি *
দেখে,—সম্মুখে কর্ব্বে নাকি গণ্ডগোল॥
অন্তরা,—গ্রামে কিম্বা নিকটে,—
কবি যারা গায় বটে, জানি তা'দের মূল,—
মিল,—ভিন্নদেশী কেহ হৈলে,—(তারে) আগে—
করে অনুকূল॥

* নায়,—নৌকায়।

* খাপ্‌ছি,—বোধ হয়,—আস্ফালন।

এই টপ্পার পায়াণে কি সুন্দর মৈত্রী ভাবের দু'টা কথা বলিয়া, মিলের পদে বলিতেছেন,—

"তুমি কোন্ বিচারে, সন্ধ্যাপরে,
আসরে বাজালে ঢোল ?"

বিপক্ষ পক্ষকে অগ্রে আসর লইবার জন্ত অনুরোধ না করিয়া আমি কবিগানের নিয়ম লঙ্ঘন করিলাম,—সৌজন্ত হারাইলাম,—এই জন্তই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কোন্ বিচারে, সন্ধ্যাপরে, আসরে বাজালে ঢোল ?"

অন্তরার পদে ও পরের মিল পদে বলিতেছেন,—

"গ্রামে কিম্বা গ্রামের নিকটে, যাহারা কবি গায়,—তাহাদের মূল অর্থাৎ রীতিনীতি জানি, ভিন্নদেশী কেহ আসিলে, তাঁহাকে আগে অনুকূল করে।"

এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই,—আমি পুড়া কান্দিয়ার নিকটস্থ লোক,—আর তাঁহার বাড়ী পুড়া কান্দিয়া হইতে অনেক দূরে। তাঁহাকে অগ্রে আসরে নাইবার অনুরোধ করিয়া পরে আমার আসরে নামা উচিত ছিল। মহড়ার পদে বলিতেছেন,—"তোর খাপ্‌ছি দেখে ভাবনা করিতেছি,—সম্মুখে (নবমীতে) গণ্ডগোল কর্ব্বে নাকি ?

"গণ্ডগোল" অর্থাৎ কোন গোপন ভাবের দাঁড়া লইয়া বিপক্ষ পক্ষকে হয়রাণ করা। এই জন্তই বলিতেছেন, তোর খাপছি, দেখে ভাবনা করিতেছি, সম্মুখে গণ্ডগোল কর্ব্বে নাকি ?"

পুরাকান্দিয়ার গান সমাপন করিয়া আমরা সুগুন্দিয়া গ্রামে আসিলাম। এখানে এক পালা গান হইবে। রামগতি সরকার দিনের বেলায় আহারান্তে নিদ্রা গিয়াছেন,—এই অবসরে তাঁহার গাটুরী খুলিয়া কোন দুষ্ট লোকে নয়টী পয়সা চুরি করিয়া লইয়া যায়। তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন,—গাটুরীতে পয়সা নয়টী নাই। তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া গান আরম্ভ হইলেই একটি টপ্পা গাহিলেন,—

চিতান,—পুরাকান্দা গান করিয়া আইলাম সুগুন্দিয়া।
পরাণ,—মোদের মনে ছিল বাসনা, এখানে কবিগান কর্ব্বো দুজনা,—বিধির কিবা ঘটনা,—দিল বেগুণ দিয়া॥
মিল,—আমরা এবার গেলে, কোন কালে, ফিরে হবেনা আসা,—
মহড়া,—দুঃখেতে বুক ফেটে যায় সুগুন্দিয়া হৈল কি চোরের বাসা।
অন্তরা,—(আছেন) ব্রাহ্মণ, শূদ্র মজুমদার,—তবে কেন অবিচার আজব্ তামাসা,—
মিল,—আমার নিদ্রা কালে, গাট্টি খুলে, চোরে নিল নয় পয়সা॥

আর এক দিন,—রামু-রামগতি দুইজন রামেশ্বরপুর গান করিতে গিয়াছেন,—রাত্রিতে রামগতির ১৸৹ মূল্যের এক যোড়া নূতন জুতা কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া যায়। রামগতি মনোদুঃখে প্রথম আসরেই এই জুতা চুরি সম্বন্ধে একটি টপ্পা গাহিয়া গ্রামস্থ সকলকে বৃত্তান্ত জানাইলেন,—সেই টপ্পাটী এই,—

চিতান,—কালে কালে কলির ধর্ম্ম হতেছে প্রবল।
পরাণ,—রামুমালীর সঙ্গেতে কবি-সঙ্গীত গাইতে, এথা এসে পেয়েছি তার ফল॥
মিল,—অকস্মাতে,—এ রাজ্যেতে মঠের মাথায় পড়ল কুঁড়।
মহড়া—এখন আর সাবেক ধরাণ নাই সে রামেশ্বরপুর।
অন্তরা,—ভদ্রলোক কয়েক জন, বুদ্ধে সাধ্যে বিলক্ষণ,—যাঁদের করি জোর,—
মিল,—সেই ভদ্রদের মাত মেরেছে কয়েক শালা জুতা চোর॥

রামেশ্বরপুর একটি ভদ্র লোকের গ্রাম। এখানে চোর বদ্‌মায়েসের অবস্থান অসম্ভব। তবে যে জুতা চুরি হইয়া গেল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। কবি রামগতি এইজন্যই গাহিলেন,—"অকস্মাতে এ রাজ্যেতে মঠের মাথায় পড়্‌ল কুঁড়।" মঠের মাথায় কুঁড় (কুণ্ড) পড়াটা যেমন বড়ই অসম্ভব। রামেশ্বরপুরে জুতা চুরি হওয়াটাও তেমনি অসম্ভব। তাহাও হইয়া গেল।

আর একদিন কাটিহালী গ্রামে রামু-রামগতি দুই জনেই উপস্থিত। কাটিহালীর কর্ত্তারা,—রামু কিছু তালুক খরিদ করিয়াছেন জন্ত তাঁহাকে বড়ই প্রশংসা করিতেছেন। বলিতেছেন,—"রামু বড় ভাগ্যবান্,।

রামগতির তালুকও নাই,—তাঁহাকে কেহ প্রশংসাও করিলেন না। রামগতি ভাবিলেন,—রামুর তালুক সম্বন্ধে একটী টপ্পা না গাহিলে এখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামুর তালুকদারীর অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন না। এই মনে করিয়া উপস্থিত আসরে গাহিলেন,—

চিতান,—রামু বড় ভাগ্যবান্ কর্ত্তারা শুন্‌ছেন।
পরাণ,—বল্লে আমি দোষী হই,—আসল কথা কই
কৈ! (১)
একশ টাকার তালুক কিন্যা, তিনশ টাকা দেন্।
মিল,— * * * *
মহরা— * * * *
অন্তরা,—হাওলাত করে কাওয়ালা লয়,—
নিজের নামে দলীল হয়,—
মাজনেরে দেয় রেন্,—
মিল,— দখল পায়না পঁচা মালী
এমন তালুক কল্ল কেন্?

এই টপ্পায় বড় বিরক্ত হইয়া রামু সরকার রামগতির অন্যকোন ছিদ্র না পাইয়া বলিলেন,—

"তোমার মুখ খান যেমন 'ডায়মন্, কাটা।"

অর্থাৎ রামগতির মুখে বসন্তের দাগ ছিল।

রামুর এই কথার উত্তরে রামগতি রামুর আকৃতিগত কয়েকটী কথা লইয়া আর এক টপ্পা রচনা করিলেন।

চিতান,—আচ্ছা ঢকের পুরুষ,
নাই কোন দোষ, দেখ্‌তে চমৎকার।
পারাণ,—কবি গাই,—কত দেশ-বিদেশে যাই,
এমন ঢকের পুরুষ দেখি নাই কো আর॥
মিল,—ঘাড়টা মোটা, চোক্‌টী ছোট,—
মাথাটা বানরের হুল।
মহড়া,—রামুমালী, কেওয়া বনে
ফুটেছে গোলাপের ফুল॥
অন্তরা,—হাঁড়গিলার মত দু'টা পাও, পেট্‌টা যেমন,
কুন্দা*নাও কপালের দুই দিকে নাই চুল,—
মিল,—* * * * বুক্‌টা যেমন
হুক্কার খোল।

মহড়ার পদটী কি সুন্দর!! "রামু মালী কেওয়া বনে ফুটেছে গোলাপের ফুল।"

এক সূত্রধর সরকারের সঙ্গে রামগতির গান হইতে ছিল,—সূত্রধর রামগতিকে 'নাপিত' বলিয়া নিন্দা করায়,—কবি রামগতি গাহিলেন,—

টপ্পা।

চিতান,—* * * * *
পারাণ,—* * * * *
মিল,—নাপিত ধোবা সভার শোভা,
মর্ম্ম কেবা জানে তার,—
মহড়া,—গোয়াল, বাণ্যা কামারের নিচ্ছুন্
কাঠ-কাটা ছুঁ তার।
অন্তরা,—গোয়াল-বাণ্যা, কামারে,—
চাইর-আনী চুরি করে,—ব্যক্ত ত্রিসংসার,—
মিল,—ছুঁতার বাড়ী কাষ্ঠ দিলে
তুলে মূলে পায় না আর॥

ঈশ্বরগঞ্জ গান গাহিয়া আর বিদায় পাইতেছেন না। কয়েক দিন যাবত মুদী ঘরে দল সহ বসিয়া খাইতেছেন। নাজির মহিম বাবু রামগতিকে পত্র দিয়া আনিয়াছিলেন। বিদায়ের বিলম্ব হইতেছে জন্য মনোকষ্টে রামগতি নাজির বাবুকে এক টপ্পা শুনাইলেন।

চিতান,—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বাবুজী নাজির।
পারাণ,—বাবুর আজ্ঞা পেয়ে কবির দল,—
দু'খানা করিয়ে সম্বল, হুজুরেতে
হয়েছি হাজির॥
মিল,—এখন লভ্য করা দূরে থাকুক,—
দায় ঠেকেছে খোরাকী।
মহড়া,—বিদায় দিলে, দুর্গা বলে,
বাড়ী যেয়ে হই সুখী॥

এই টপ্পাটীর অন্তরা ও শেষ মিল পদ মনে নাই।

একবার নেত্রকোণা আসিয়া এক টপ্পা গাহিয়াছিলেন,—তাহার মাত্র চিতানটুকু মনে আছে।

(১) বাল কোথায়?

* সুসঙ্গের পাহাড়ে এই সকল কুন্দা,—প্রস্তুত হয়,—ইহা একটী গাছের নৌকা।

"নেত্রকোণার পত্র পাইয়া রাত্রে কল্লাম গাত্রোত্থান।"

আর একদিন রামকানাইকে জাতিগত নিন্দার ভাঁজ দিয়া এক টপ্পা শুনাইলেন।

চিতান,—কত যুগী-জোলা, ঝুমুর—ওয়ালা,
দেখার বাকী কি আছে?
পারাণ,—হরি সরকার, পীতাম্বর,—
যারা ছিল কবিকর, তাঁরা সবে
দেখে গিয়াছে।
মিল,—কত মন্দ বা'দুর, হদ্দ হৈল,
বাকী রৈল জোলার পো,—
মহড়া,—কবি তো নয় রে কানাই
হানা দণ্ডীর * যো।
অন্তরা,—যুগী গাতে থাকে চিরকাল,—
অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক শিয়াল,
লাকুর ভাই মাকু,—
মিল,—নাইলছে তেরা * * * গা,—
সই করে গা,—জোলা কো।

এক দিবস রামু সরকার ব্যাস হইয়া মাতৃ-আজ্ঞায় পুত্রোৎপাদন কল্পে অম্বা ও অম্বালিকার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রামগতি সরকার অম্বা-অম্বালিকার পক্ষ হইতে উত্তর করিলেন,—

চিতান,—তুমি বল্লে নাকি মাতৃ আজ্ঞা রক্ষা
করার দায়।
পারাণ,—* * * * *
মিল,—এমন ধর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম কল্লে জন্ম যাবে বিফলে।
মহড়া,—মাতৃ প্রায় ভ্রাতৃ বধূ,—
কোন্ চক্ষু ভাসুর হৈয়া কু-বলে?
অন্তরা,—পর নারী রমণে, নিরয় বাসে গমনে,
ঘটবে কপালে,—
মিল,—তুমি মাতৃ রমণ কর্ব্বে নাকি?
যদি তোমার মায় বলে?

একদিন হাসনপুর গ্রামে আমি,—কালীচরণ দে, রামগতি ও পরাণকর্ম্মকার এই চারিজন মিলিয়া দোলযাত্রায় হোলী গান করিতেছি।—আমি আর কালী একদিকে, রামগতি আর পরাণ একদিকে। হঠাৎ আমার সঙ্গে পরাণের বিবাদ লাগিয়া উভয় পক্ষে এক বিষম হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। আমাদের পক্ষের একজনের লাঠির আঘাতে পরাণের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। পরে হাঙ্গামা নিবৃত্তি হইলে,—সকলে বলিলেন,—রামগতি সরকার! আপনি এ সম্বন্ধে একটা টপ্পা করেন। পরাণ ভাবিয়াছিল, যে রামগতি যখন আমার দলে, তখন আমার অনুকূলে বিজয়ঠাকুরের প্রতিকূলেই টপ্পা রচিত হইবে। কিন্তু নিরপেক্ষ রামগতির টপ্পায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। রামগতি টপ্পা করিলেন,—

চিতান,—হাসনপুরে সালোক বাড়ী
হুলি গাওনা হয়।
পারাণ,— কালী সরকার পরাণচান্
রামগতি বাঁধছে হলী গান
সরকারীতে পরাণ আর বিজয়।
মিল,— শেষে বিজয়'র সঙ্গে
কাজ্যা করিয়া পরাণের
যায় দাঁত ভাঙ্গা।
মহড়া,— কামার কিসে ভদ্র হবে
আসলে পোঙ্গা।
অন্তরা ও শেষ মিল্ মনে নাই।

ভাটি অঞ্চলে দোলের সময় হোলী গানে পাঁচালী গাইবার রীতি প্রচলিত আছে। যাহারা পাঁচালী গাহিল, তাহারাই সরকারী করিল। এই জন্যই বলিয়াছেন,— "সরকারীতে পরাণ আর বিজয়।"

রামগতির বহু টপ্পা এ জেলার লোকের মুখে মুখে আছে। সেই সমস্তগুলি সংগ্রহ করিয়া "রামগতির টপ্পা" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে বাসনা করিয়াছি। কার্য্য শেষ হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

---

* হানা দণ্ডী,—যুগীদের বস্ত্র বয়নের যন্ত্র।

ঠিক্ কথা।

(সেখ সাদীর—পারসী হইতে)

গলিত দন্ত
পলিত কেশ
বৃদ্ধ সে ধনবান—
বন্ধুরা তার
কহে বার বার
"ঘরে আন বিবিজান !"
"আছে তব ধন,
নাহি পরিজন,
অভাব পূরণ হবে—,,
বৃদ্ধ কহিল—
"বলিলেই যদি
বলিতেই হল তবে—
"কথাটা তা এই
স্পৃহা মোটে নেই
বৃদ্ধারে ঘরে আনি !"
বন্ধুরা কহে—
"যুবতীরে আন,
সবে জানে তুমি ধনী !"
"যা বলেছ ঠিক্
ভেবে চারিদিক !"
বৃদ্ধ কহিল হেসে—
"দুর্ব্বল কর
কাঁপে থর থর,
তুষার শুভ্রকেশে—
"বৃদ্ধ হইয়া
বৃদ্ধা চাহিনা,
দন্ত বিহীন হাসি—
মন্দ কি তায়
লইব যুবতী
সুধাসম ভালবাসি ! !"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

পূর্ণানন্দ গিরি।

"শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি," "শ্যামারহস্য," "ষট্‌চক্রনিরূপণ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা পূর্ণানন্দ গিরিকে নিয়াও একটা টানাটানি করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। পূর্ণানন্দ স্মরণাতীত কালের লোক নহে, তাঁহার বংশও বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই, গুরুকুলও বর্ত্তমান, জন্মস্থান, দীক্ষাস্থান, এমন কি তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুস্তকও বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি স্বপ্রণীত পুস্তকের রচনাকাল নির্দ্দেশেও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এই সকল প্রভূত প্রমাণ সত্ত্বেও এসিয়াটিক্ সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার পুস্তক বিবরণীতে পূর্ণানন্দকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং রাজসাহী জেলায় তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে ময়মনসিংহ কাটিহার (?) বাসেন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ণানন্দের বংশধরগণ এই বিবরণ অবগত নহেন, এবং অবগত হইবার সুযোগও নাই, শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণী ইংরেজী ভাষায় লিখিত, এবং সাধারণের আলোচনার বিষয়ও নহে। যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু, একমাত্র তাঁহারাই খবর রাখিতে পারেন। পূর্ণানন্দের জন্মস্থান ময়মনসিংহের অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার অধীন কাটীহালী গ্রামে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত গাজরা নামক ক্ষুদ্র নদীর ঘাটে ব্রহ্মানন্দ গিরি নিরক্ষর পূর্ণানন্দকে দীক্ষিত করেন, সেই পবিত্র দীক্ষাস্থান অদ্যাপি পূর্ণানন্দের ঘাট নামে তত্রত্য সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত। ব্রহ্মানন্দ গিরি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। পূর্ণানন্দ সন্ততির মধ্যে অনেকে অদ্যাপি ব্রহ্মানন্দ সন্তানের শিষ্য। ব্রহ্মানন্দ সন্ততি ঠাকুর মহাশয়গণ দীর্ঘকাল ঐ প্রদেশে না যাওয়ার ফলে অনেক শিষ্য অন্য গুরুর নিকট দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ণানন্দের অধস্তন দিয়াড়া নিবাসী ৺রাঘবেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ও এক জন খ্যাতনামা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার প্রণীত এবং হস্ত লিখিত অনেক তন্ত্রগ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাঘবেন্দ্র ঠাকুরের সন্ততি ৺কেদারেশ্বর স্মৃতিভূষণ মহাশয় প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের সন্ততিদিগের মন্ত্রশিষ্য। সুতরাং উভয় বংশের গুরুশিষ্যভাব এখনও অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। জগদম্বার কৃপায় পূর্ণানন্দবংশে অদ্যাপি ক্ষুদ্র বৃহৎ পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। রংপুর প্রদেশে পূর্ণানন্দের অনেক কীর্ত্তি কলাপ এবং কিংবদন্তী জন সাধারণের নিকট সুপরিচিত। ঐ দেশে পূর্ণানন্দের অনেক শিষ্য ছিল; অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ উত্তরাধিকারী রূপে সেই সকল শিষ্যের গুরুতা লাভ করিতেছেন। তুঁষভাণ্ডারের জমিদারগণ খ্যাতনামা পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান দর্শনাধ্যাপক শ্রীমান্ যামিনীনাথ তর্কবাগীশদিগের মন্ত্র শিষ্য। পূর্ণানন্দের জীবনী সম্বন্ধে খ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও অনেক বিবরণ অবগত আছেন। এই সকল জাজ্জল্যমান প্রমাণ সত্বেও শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ণানন্দকে কেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপে কল্পনা করিলেন, তাহার কারণ বুঝা গেল না। (রাম চরিতের সন্ধ্যাকর নন্দীকেও তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সেই ভ্রমপূর্ণ মত সাধারনের দৃষ্টি গোচর করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণার ফলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের দলপুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়)। পূর্ণানন্দ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পাকড়াশি গাঁই। পূর্ণানন্দের পূর্ব্ব পুরুষ অনন্ত উপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ হইতে তাঁহার কায়স্থ শিষ্য রাজা হংসদাস কর্ত্তৃক কাটীহালীতে নীত হন। কাটীহালীর সন্নিহিত খাগড়িয়া গ্রামে রাজা হংসদাসের বাস ছিল। হংসদাস গুরুপত্নীকে সন্নিকটবর্ত্তী কাটীহালি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

পূর্ণানন্দের সিদ্ধিস্থান কামরূপ, তাঁহার লিখিত প্রধান পুস্তকের নাম "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি",এই গ্রন্থে শ্রীবিদ্যার অর্থাৎ ষোড়শী দেবীর "তত্ত্ব" বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" এই নামটি যৌগিক। শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তককে কেন তত্ত্বচিন্তামণি নামে নির্দ্দেশ করিলেন তাহা বুঝা গেল না। পূর্ণানন্দ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ সন্ততিগণই সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। পূর্ণানন্দের বাসস্থানের নাম কাটিহার নহে, তাহা কাটিহালী। উত্তর বঙ্গে একজন পূর্ণানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি সাঁতুলের রাজার সমসাময়িক।

এই রাজা দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক নহেন। ইঁহার সময়েই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে প্রসিদ্ধ পাঁচুড়িয়া দোষের সৃষ্টি হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকর্ত্তৃক সংগৃহীত একখান শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি পুস্তক ১৬৪০ শকাব্দে নীলশর্ম্ম কর্ত্তৃক লিখিত। একখানি পুস্তক লিখিত হইলে তাহা সাধারণের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হইতে কত সময় আবশ্যক, তাহা মনীষাসম্পন্ন মানবমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লিখিত"শ্যামারহস্য" আমাদের ঘরেই আছে। শ্যামারহস্যে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উল্লেখ আছে। (বিস্তরস্তমৎকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণ্যাদাববগম্যতাম্) এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি শ্যামারহস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং একই গ্রন্থকারের লেখা। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে লিখিত আছে যে, এই পুস্তক চতুর্দ্দশ শতোত্তর নবনবতি শকাব্দে, অর্থাৎ চৌদ্দশত নিরনব্বই শকে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ণানন্দের সহিত, দুই শত বৎসরের অনধিক কালের লোক বারেন্দ্র পূর্ণানন্দের একত্বাশঙ্কাও হইতে পারে না। কিন্তু রাজসাহী প্রদেশে অনেকের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে সাঁতুলের পূর্ণানন্দই শ্যামারহস্য প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। এমন কি স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়, তাঁহার পিশাচ সহোদর নামক পুস্তকে এই ভ্রান্ত মত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নামমাত্র-সাম্যে ভ্রম-পতিত এই সকল লেখকের অদম্য লেখনীর উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব পরকীর্ত্তিবিলোপনলোলুপ দেববিগ্রহ বিধ্বংসকারী যবনের হস্তস্থিত উলঙ্গ কৃপাণের ভীষণ আক্রমণাপেক্ষাও ভীষণতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই শ্রেণীর কুলক্ষয়া কীর্ত্তিনাশা লেখনীর যাদৃচ্ছিক আক্রমণের ফলে আমার মত কত জনকেই যে পূর্ব্ব পুরুষের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইবে কে তাহা বলিতে পারে।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে অতীত বিষয়ে লিপি বিন্যাস করিতে হইলে একটু বিচার বিতর্কের সহিত সেই কার্য্যে

হস্তক্ষেপ আবশ্যক। ইহাও জানা আবশ্যক যে পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ভৈরবানন্দ প্রভৃতি নাম মহাপুরুষদিগের সাধনা লব্ধ, এই শ্রেণীর উপাধিধারী লোক অদ্যাপি সংসারে বিলুপ্ত হয় নাই। কত পূর্ণানন্দ ভৈরবানন্দ হইতেছে, যাইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখিতেছে। কর্পূরমঞ্জরীতে বর্ণিত ভৈরবানন্দও দশকুমার চরিতের ভৈরবানন্দকে এক করিয়া যদি দণ্ডীর অথবা রাজশেখরের সময় নির্ণয় করা যায় তবে প্রত্নতত্ত্বনিরূপণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইবে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে এই প্রবন্ধ পূর্ণানন্দ গিরির সম্পূর্ণ জীবনী নহে, ইহা রিপোর্টের প্রতিবাদ মাত্র। সুতরাং ইহাতে ধারাবাহিক বংশাবলী এবং মহাপুরুষের সিদ্ধি সংসৃষ্ট বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইল না। এই সমস্ত বিবরণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির সহিত মুদ্রিত করিতে বাসনা আছে।

সাধারণের অবগতির জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের রিপোর্টের নকল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"Purnananda was a great Tantric compiler of the Sixteenth century. He was a Varendra Brahman born in the district of Rajshahi, left an orphan at a tender age. Brahmananda a great Tantric writer of his time, brought him up and initiated him in the mysteries of Tantra. The place where he obtained Siddhi or success is still known as Siddhinagar. Purnananda became the Guru or spiritual guide to a number of influential Brahmans in the north and east Bengal and his descendants are still to be found in many places, working as spiritual guides. Katihar in Mymensingh appears to be great strong hold of his descendants. Tattva Chintamoni his great work runs through several thousands of Slokas. The influence which he and his Guru still exercises over the Brahmans of Bengal is very great. He was devoted to the left-handed worship."

"পূর্ণানন্দ ষোড়শ খৃষ্টাব্দীয় একজন প্রধান তান্ত্রিক লিখক। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, এবং রাজসাহী জেলা তাঁহার জন্মস্থান। অতি শৈশবে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। ব্রহ্মানন্দ নামক ঐ সময়ের একজন প্রধান তান্ত্রিক লিখক তাঁহাকে পালন করেন এবং তান্ত্রিক গূঢ় রহস্য সমূহে দীক্ষিত করেন। যে স্থানে পূর্ণানন্দ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সিদ্ধিনগর নামে অভিহিত হইতেছে। পূর্ণানন্দ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও বহু স্থানে দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কাটিহার নামক স্থানে তাঁহার বংশধরগণের প্রধান বাসস্থান বলিয়া বোধ হয়। তত্ত্বচিন্তামণি নামক তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে সহস্র সহস্র শ্লোক আছে। এখনও বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের উপর তাঁহার ও তাঁহার গুরুর অত্যন্ত বিশাল প্রতিপত্তি রহিয়াছে। তিনি বামাচার মতে সাধনা করিতেন।"

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

তিব্বতে মুসলমান সৈন্য।

প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ রাজ তিব্বতে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তজ্জন্য একাধিকবার ব্রিটিশ সৈন্যের অভিযান হইয়াছে। ব্রিটিশরাজ অনুসৃত তিব্বত নীতি সম্বন্ধে অনেক প্রকার বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল বাদ প্রতিবাদে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সমূহের স্তম্ভ পূর্ণ হইতেছে, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টেও ইহার প্রতিধ্বনি পরিশ্রুত হইতেছে।

ভারতরাজ কর্ত্তৃক তিব্বতে প্রভাব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উদ্যোগের দৃষ্টান্ত, এই নূতন নহে। হিন্দু রাজত্বকালেও তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই সম্পর্কের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

মোসলমান শাসন কালেও অন্যূন তিনবার তিব্বত অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সকল অভিযান সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হয় নাই। বিশেষতঃ তৃতীয় অভিযানের বৃত্তান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আর প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য সৌরভের জনৈক পাঠক পাঠিকাদিগকে উক্ত অভিযান তিনটির বিবরণ উপহার দিবার অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

ভারতবর্ষে মোসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই তিব্বত বিজয়ের উদ্যোগ হইয়াছিল। মোহাম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশের কিয়দংশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তিব্বতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করেন। তিনি তিব্বত আক্রমণ জন্য দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ রাজধানী দেবকোট (বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলায় দেবকোট স্থাপিত ছিল) হইতে বহির্গত হন। মোসলমান সৈন্য প্রথমতঃ বর্দ্ধনকোট (বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলায় এই নগর স্থাপিত ছিল) উপনীত হয়। এই স্থান হইতে তাহারা দশ দিন ধরিয়া করতোয়া ও তিস্তা নদীর পার্শ্ব দিয়া অভিযান করে। অতঃপর বক্তিয়ার একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু প্রাপ্ত হন এবং তাহার সাহায্যে সৈন্যসহ নদী অতিক্রম করেন। মোসলমান সৈন্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া ছয়দিনের পথ অতিবাহন পূর্ব্বক তিব্বত রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। বক্তিয়ার খিলিজি তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সীমান্থিত দুর্গ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বহু মোসলমান সৈন্য নিহত হইল, তথাপি বক্তিয়ার জয় লাভ করিতে পারিলেন না। এই কারণ বক্তিয়ার তিব্বত জয়ের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময় মোসলমান সৈন্যের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। তাহারা মনুষ্য বা পশুর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইল। দেশের অধিবাসীরা খাদ্য দ্রব্য এবং পালিত পশুর আহার্য্য-তৃণ দগ্ধ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া পর্ব্বত গুহায় লুকায়িত হইয়াছিল। সৈন্যেরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া অশ্বমাংস আহার করিতে লাগিল। এইরূপ দুরবস্থায় বক্তিয়ার সৈন্য লইয়া সেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদের আগমনের পূর্ব্বে শত্রু সৈন্য সেতু ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সেতু ভগ্ন দেখিয়া মোসলমান সৈন্যের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই সময় শত্রু সৈন্যের আগমন সংবাদ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অধিকতর ভীত করিল। তাহারা নিরুপায় হইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নদী পার হইতে লাগিল। বহু সৈন্য জলমগ্ন হইল। বক্তিয়ার কেবল এক সহস্র (মতান্তরে তিন শত) অশ্বারোহী সৈন্য সহ পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ভগ্নচিত্তে দেবকোটে ফিরিয়া আসিলেন। নিহত সৈন্যের আত্মীয় স্বজন বক্তিয়ারকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহাদের বিলাপ মিশ্রিত তিরস্কারে তাঁহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইল। ক্ষোভে ও অপমানে তাঁহার দারুন জ্বর ও কাস পীড়া হইল। দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই তিনি পঞ্চত্ব লাভ করিলেন।

প্রথম অভিযানের কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে তিব্বত বিজয় জন্য দ্বিতীয় বার উদ্যোগ হইয়াছিল। এই অভিযানও প্রথম অভিযানের ন্যায় নিষ্ফল ও শোচনীয় হইয়াছিল।

কল্পনামত্ত মোহাম্মদ চীন দেশ জয় করিবার জন্য কৃত সংকল্প হন। হিন্দুস্থান ও চীন দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে পারিলে চীন বিজয় সহজসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া মোহাম্মদ প্রথমতঃ হিমালয় সংলগ্ন করাজল (তিব্বত) রাজ্য জয় করিতে মনন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজকোষের কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। করাজল রাজ্য হরণ জন্য যে অগণ্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতির পীড়নে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, ইবন বতুবা স্বীয় ভ্রমণ কাহিনীতে এই অভিযান সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

সে সময় যে সকল ক্ষমতাশালী হিন্দুরাজা শাসন করিতেছিলেন, করাজলের অধিপতি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। মোহাম্মদ তোগলক মস্তাধার ধারকগণের অধিনেতা মালিক নাকবিয়াকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া এক লক্ষ অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য

করাজল রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। মোসলমান সৈন্য হিমালয়ের পাদদেশস্থিত জিদিয়া নগর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ অধিকার করিয়া দেশ লুণ্ঠন, গৃহ সকল দগ্ধ এবং অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়াছিল। হিন্দুগণ রাজকোষ এবং গো মেষপাল শত্রু হস্তে পরিত্যাগ করিয়া সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতোপরি পলায়ন করে। পর্ব্বতারোহণের একমাত্র পথ ছিল ; এই পথে অশ্বারোহী সৈন্য কেবল একে একে গমন করিতে পারিত। এই পথে মোসলমান সৈন্য পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া ওয়াবেঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক অধিবাসীদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। সুলতান তাহাদের বিজয় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে বাস জন্য একজন কাজি ও একজন ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করেন।

বর্ষাকাল সমাগত হইলে মোসলমান সৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বহু সংখ্যক অশ্ব বিনষ্ট হয় এবং অতি বৃষ্টিতে ধনুকের জ্যা শিথিল হইয়া যায়। আমীরগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পাদদেশে বর্ষাকাল যাপন পূর্ব্বক বর্ষান্তে পুনর্ব্বার বিজিত দেশে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থী হয়েন। সুলতান অনুমতি প্রদান করেন। হিন্দুগণ মোসলমান সৈন্যকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কীর্ণ পথ অবরোধ করিয়া পর্ব্বতের প্রবেশ দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা পুরাতন বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া মোসলমান সেনার মাথায় নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই আঘাতে অনেকের প্রাণ নাশ হয়। অধিকাংশ সৈন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল ; যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও শত্রু হস্তে বন্দী হয়। মোহাম্মদ তোগলকের বিপুল সৈন্য মধ্যে কেবল মাত্র তিন জন (সেনাপতি নাকবিয়া, বদর উদ্দীন মালিক দৌলৎ শাহ এবং আর এক জন) দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন। কিন্তু ইতিহাসবেত্তা বর্ণির মতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য এই দুঃসংবাদ প্রচার করিবার জন্য রক্ষা পায়।

পাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিব্বত বিজয় জন্য তৃতীয় বার উদ্যোগ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর দীর্ঘকাল অবধি তিব্বত জয় করিবার অভিলাষ পোষণ করিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহার আদেশে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁ মিরবহরের পুত্র হাসিম খাঁ স্থানীয় জমিদার এবং অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও সমস্ত যত্ন বিফল হইয়াছিল, তাঁহার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। এই কারণ তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন এবং বহু কষ্টে স্বস্থানে ফিরিয়া আইসেন।

শাহজাহান সিংহাসনের অধিকারী হইয়া পিতার অভীষ্ট তিব্বত বিজয় জন্য উদ্যোগী হন। পাদশাহ নামা নামক পুস্তকে এই অভিযানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত রাজ্য তিব্বত নহে, তিব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র রাজ্য, এই ক্ষুদ্র রাজ্য তিব্বতের করদ ছিল। যাহা হউক, পাদশাহ নামায় মোগল সৈন্য প্রেরণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। পাদশাহ শাহজাহান কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা জাফর খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আট হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তারপর তিনি করচাবারের দুর্গম পথে সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন এবং এক মাস অন্তে সফর দু নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থান তিব্বত সীমান্তের প্রধান দুর্গ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং নীলাব অর্থাৎ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ছিল। তিব্বতের মরজবান অব্দালের পিতা অলিরায় দুইটি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে দুইটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুই দুর্গের নাম কহর পুচা এবং কহচনা ছিল। এই দুই দুর্গে আরোহণের পথই অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। মোগল সৈন্যের আগমনে অব্দলা কহর পুচা দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ও সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ কহচনা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ সম্পত্তিসহ নীলাব নদের অপর তীরবর্ত্তী সকর দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

জাফর খাঁ এই সকল দুর্গের উচ্চতা এবং দৃঢ়তা পরীক্ষা করিয়া তৎসমুদয় আক্রমণ করা অসমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু অব্দালের কঠোর শাসনের বৃত্তান্ত

তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হওয়াতে তিনি উৎপীড়িত সৈন্য এবং কৃষকদিগকে সদ্ব্যবহার বলে হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে ব্রতী হইলেন। অতঃপর তিনি সকর দুর্গ অধিকার এবং অব্দালের পরিবার বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোগল সৈন্যের পক্ষে দুই মাসের অধিক কাল ঐ দেশে অবস্থিতি করা অসম্ভব ছিল। কারণ এই সময় অন্তে বরফপাতে মোগল সৈন্যের মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা ছিল। এই জন্য জাফর খাঁ বৃথা সময় নষ্ট করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া মির ফকির উদ্দীনকে চারি হাজার সৈন্যসহ সকর দুর্গের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং নিজে কহরপুচা দুর্গস্থিত অব্দালের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অব্দালের ভ্রাতুষ্পুত্র হাসন এবং আর কতিপয় তিব্বতবাসী মোগলের বশ্যতা অঙ্গীকার করিয়াছিল; জাফর খাঁর অনুরোধে তাঁহারা তিব্বতবাসীদিগকে মোগলের পক্ষভুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মির ফকির উদ্দীন নীল নদ উত্তীর্ণ হইয়া সকর দুর্গ অবরোধ করিলেন। অব্দালের পুত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক দৌলত সকর দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অবরোধকারী মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কতিপয় সৈন্য শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইল। এই ঘটনায় দৌলত এতদূর ভয়াকুল হইলেন যে, তিনি আত্মীয় স্বজনবর্গকে সকর দুর্গে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে কাশগড় দ্বারপথে পলায়ন করিলেন। মির ফকির উদ্দিন তাঁহার পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যগণ দুর্গ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, তিনি অব্দালের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। দৌলতের পশ্চাদনুসরণ জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারা দৌলতকে ধৃত করিতে পারিল না, কিন্তু পথিমধ্যে দৌলত কর্তৃক পরিত্যক্ত স্বর্ণ রৌপ্য প্রাপ্ত হইয়া তৎসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

জাফর খাঁ এই বিজয় সংবাদ অবগত হইয়া কহরপুচা ও কহচনা দুর্গ অধিকার জন্য সাতিশয় উদ্যোগী হইলেন। কহচনার দুর্গাধিপতি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর অব্দাল নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং তারপর অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। জাফর খাঁ রক্তপাতের আশঙ্কা করিয়া অগৌণে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সংকল্প করিলেন। বিজিত ভূমির বন্দোবস্ত সময় সাপেক্ষ বলিয়া তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন, এবং অব্দালকে সপরিবারে সঙ্গে লইয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। জাফর খাঁ অব্দালের উকীল মোহাম্মদ মুরাদকে বিজিত ভূমির শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৃহৎ তিব্বতের অধিপতি সঙ্গি বাম খল ক্ষুদ্র তিব্বতের বুরাগনগর অধিকার করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য স্থানও স্বাধিকারভুক্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কাশ্মীরের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ অবগত হইয়া হোসেনবেগের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই দুই সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তিব্বতীয় সৈন্য পলায়ন করিল। অতঃপর তিব্বতের অধিপতি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

তুমি স্বপ্রকাশ।

উষায় যখন তোমার কুঞ্জে
যোবনের বাঁশী বাজে
বাসনা তখন বুকের মাঝে
লুকা'য়ে থাকে লাজে।
আঁধারের লেপ মুছিয়া ধীরে
দীপ্ত শিখাটী রাজে
তোমারি আলোকে তোমারে হেরিয়া
বিস্ময়ে থাকি মজে।
তুমি স্বপ্রকাশ কর তমোনাশ
হৃদয় বিপিনে পশি
জীবন-সন্ধ্যায় আলোটী তোমার
না হয় যেন গো মসি!

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দুখের সাথী।

(১)

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর উপর মধ্যাহ্নের অলস্ত ভাস্কর অতি নির্দ্দয়ভাবে, নিতান্ত কাপুরুষের মত, অজস্র কিরণবাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। পথ, প্রান্তর, মাঠ ঘাট, ধূলিধূসর গ্রাম্য পথ, সকলি যেন দুপুরের রোদে একেবারে পুড়িয়া উঠিয়াছে। কেবল কল্যাণময়ী পল্লীলক্ষ্মী ঝরণার পাশে, গাছের তলায় ও গৃহস্থের ঘরের কোণে, আপনার কোমল ছায়াঞ্চল খানি বিছাইয়া দিয়া, গৃহাগত ক্লান্ত কৃষক ও গৃহহীন ভ্রান্ত পথিক, সকলের জন্য আপন হাতে বিরামশয্যা পাতিয়া রাখিয়াছেন। চারিদিক নীরব; কেবল মাঝে মাঝে দুচারিটী ছোট পাখীর সুমিষ্ট আওয়াজ শব্দময়ী পৃথিবীর অতিক্ষীণ প্রাণস্পন্দনের মত এক একবার কাণে আসিয়া বাজিতেছিল।

সে সময়ে ঘরের ভিতরে খাটের উপরকার গরম বিছানা ছাড়িয়া সিমেণ্ট করা ঠাণ্ডা মেঝের উপর নরম মাদুরে শুইয়া মজুমদার বাড়ীর বড়বৌ দিবানিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলেন। আয়োজনের যদিও কোন খুঁত ছিল না, তবু ঘুম কিছুতেই আসিতেছিল না। ঘরের ভিতরটা নীরব ও স্নিগ্ধ। দিবালোক যেন অতি কোমল পাদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া একবার একটা ভ্রমর সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া সারাঘরময় উড়িয়া বেড়াইল। বোধকরি ঘরের মধ্যে কোথাও সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের সন্ধান না পাইয়া আবার উড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে, আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া একটী নবযুবতী বড়বৌএর ঘরে প্রবেশ করিল। নেসপাতিটীর মত তার পাণ্ডুর মুখের উপর একটা উজ্জ্বল রক্তিম ছায়া। তেমন মুখ দেখিলে আর কাউকে বলিয়া দিতে হয় না যে সে মুখের মালিক এই মাত্র রান্না-ঘরের উনুনের আঁচের সমুখ হইতে সবে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে স্ত্রীলোকটীর মুখ দেখিয়া বিধাতার সৌন্দর্য্য-কল্পনাকে বারবার প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু অন্তরের পরিচয় যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল তার স্নিগ্ধ কাতর, শঙ্কিত সুন্দর চোখদুটী ভরিয়া! সে চোখের চাহনি যেন পৃথিবীর পানে চাওয়া সন্ধ্যার ম্লান দৃষ্টিটুকুর মতই অতি সকরুণ! সে চোখ যেন বেদনার মৌন ভাষায় জগতের নিকট কাঁদিয়া বলিত :—এত সুন্দর ফুলে ফলে ভরা আনন্দের জগতে আমার মত দুঃখিনীর কি প্রয়োজন ছিল! কিন্তু তবুও বিধাতার সৌন্দর্য্য কল্পনাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, কারণ সৌন্দর্য্যের উপর দুঃখের ঐ সজল আবছায়া টুকু না থাকিলে বুঝি তাকে এমন মানাইত না।

যুবতী বড়বৌয়ের খুব কাছে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল :—"বৌদি, ঘুমাচ্চো?"

বৌদিদি কিন্তু চোখ মুদিয়া মাদুরের উপর শুইয়াই থাকিলেন কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু ডাকের সাড়া পাইয়া ঘুমের মানুষটীর মুখের ভাব যেরূপ কঠিন হইয়া উঠিল তাতেই তাঁর চিত্ত ও নিদ্রা দুইটারই গভীরতা অতি সহজে পরিমাপ করিয়া লওয়া যায়। প্রকৃত ঘুমের মানুষের ঘুম ভাঙ্গানো বরং সহজ কিন্তু সচেতন মানুষের কপট নিদ্রা ভাঙ্গানো সজীব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই যুবতী বৌদিদির ঘুম ভাঙ্গাইবার আর কোনও ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া ঝিকে চুপি চুপি বলিল :—

"ঝি! বৌদি জাগলে বলো, সিকের বোতল থেকে আমি একটু ঘি নিয়ে যাচ্চি?"

ঝি বড়বৌয়ের মাথার কাছে বসিয়া হাতে পাখা লইয়া ঢুলিতেছিল। সে ঘাড় কাৎ করিয়া কমলাকে সম্মতি জানাইল কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটী কথা বলিতে সাহস করিল না;—এ বাড়ীতে বড়বৌয়ের এমনি একছত্র আধিপত্য, এমনি দুর্দ্দান্ত প্রতাপ!

যুবতীর নাম কমলা। সম্বন্ধের গুণে বড়বৌ কমলাকে ননদিনী রাই বাঘিনী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন; অবশ্য জনান্তিকে তা বলা বাহুল্য।

পাকা স্ত্রী-বিদ্বেষীরা বলিয়া থাকে যে অনেক সময় নিজেদের সুবিধামত বুদ্ধিমতীরা অনেক প্রকাশ্য কথাও কাণে শুনিতে পান না বটে কিন্তু নেপথ্যের কাণাকাণি সে যত চুপেচুপেই হোকনা কেন—তাঁদের শ্রুতিগোচর

না হইয়া যায় না। সে যাহোক কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই বড়বৌ মাদুর হইতে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এখন তাঁর সিকেয় ঝুলানো বোতলস্থিত ঘিয়ের মমতা আর তাঁকে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে দিল না।

কমলা রান্নাঘরের সমুদয় কায শেষ করিয়া দুপুরের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন ভাইপো ও ভাইঝিদিগের বিকালের আহারের জন্য তুলিয়া রাখিয়া, সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর দুটী ভাত ঘি নুন দিয়া সবে মাখিয়া লইয়াছিল। এমন সময় বড়বৌকে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে ঝড়ের মত সশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কমলা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। হাত হইতে মুখের গ্রাস থালার উপর পড়িয়া গেল। বড়বৌ সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন :—

"ঠাকুর ঝি! তোমার কেমনতর আক্কেল গা? আমি অত করে ঘিটুকু বাঁচালুম,আর তাই দেখে তুমি নোলার জল সামলাতে পারলে না! বাজারে দড়ি কলসী জোটে না?"

আপন ভাইএর সংসারে দুমুঠা ভাতের জন্য এত অপমান! কমলার ব্যথিত অন্তরাত্মা বুঝি বলিতেছিল—মা বসুন্ধরা, আর কেন? এখনো কি তোমার পরীক্ষা শেষ হয় নাই? একবার দ্বিধা হও মা—তোমার বক্ষের ভিতরে আমায় একটু স্থান দাও! তবু কমলার মন যা অনুভব করিতেছিল, মুখ সেটা কথায় তর্জ্জমা করিয়া বড়বৌকে খুলিয়া বলিতে সাহস করিল না। কেবল ছলছল চোখে একবার বড়বৌয়ের মুখের পানে তাকাইয়া কমলা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল :—

"ছেলে মেয়েদের বিকেলে খাবার জন্য আর সব তুলে রেখে একটু ঘিনুন দিয়ে দুটো খেতে বসেচি বৈ তো নয়! কেন মিছিমিছি বকচো বৌদি!

কমলার মৃদু প্রতিবাদে বড় বৌ একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"ইস্ বাপরে! কথার ঠাট দেখ না একবার! সোয়ামীর ঘরে অন্ন জোটে না যার,তার আবার অত ঘি খাওয়া কেন? চুরি করে ঘি খাবেন উনি, আর আমরা বলেছি বলেই দোষ হলো!"

এরূপ মিষ্টালাপের পর, কমলার কণ্ঠনালী দিয়া যদি শুষ্ক অন্নের গ্রাস না গলিয়া থাকে, তবে তাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না! থালার উপর মাখা ভাতগুলির উপর কয়েক ফোটা চোখের জল রাখিয়া সে হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উঠানে নামিয়া আসিয়া দেখে অনিল সেখানে দাঁড়াইয়া।

বড় বৌ-এর মিষ্টালাপ হইতেই ব্যাপারখানা যে কি তা বুঝিয়া লইতে অনিলকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। লাজে অপমানে তার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। হেমন্তের নীহারসিক্ত রক্তপদ্মটীর মত কমলার অশ্রুসিক্ত মুখখানা দেখিয়া অনিল রাগে কাঁদিয়া ফেলিল। রাগের মাথায় বৌদিদিকে দুটো স্পষ্টকথা শুনাইয়া দিবার জন্য সে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল এমন সময় কমলা সহসা তার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া, স্বর্গের ক্ষমাশীলা দেবতার মত বলিল :—

"তোমার পায়ে পড়ি সেজ দা, থামো! ওঁরা গুরুজন, রাগ করে আমাদের দুকথা বলবেন বৈ কি! কিন্তু তাই বলে কি ওঁদের পর আমাদের রাগ করা সাজে?—রাগ যে চণ্ডাল।"

অনিলের চোখ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু কমলার চুড়ি পড়া সুন্দর হাতখানির উপর গড়াইয়া পড়িয়া দুটী তরল মুক্তা বিন্দুর মত ছলছল করিতে লাগিল।

(২)

এককালে গোবিন্দপুরের মজুমদারদের সংসারটী ধন ধান্যে লোক জনে ও সৌভাগ্য সম্পদে গ্রামের আর দশ জনের উপর টেক্কা দিয়া, জোয়ারের জলের মত সহসা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মজুমদার বংশের প্রায় সকলেই অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন বলিয়া, মা লক্ষ্মীর অনুগ্রহটা এ পরিবারে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বর্গীয় জগবন্ধু মজুমদার মহাশয়ের পিতা নিজে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াও, প্রাক্তন কর্ম্মদোষে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের কোপে পড়িয়াছিলেন। সে জন্য অনর্থক মিথ্যা মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া যে পরিমাণে ঋণ করিতে হইয়াছিল, জগবন্ধুর আমলে তার সুদের দায়েই পৈত্রিক তালুক মুলুক যা কিছু ছিল প্রায় সমুদয়ই নীলাম হইয়া গেল।

কিন্তু তবুও—মজুমদারদের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও—সে ঋণবহ্নি মন্ত্রঃপুত যজ্ঞশিখার মত আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক ঋণ জিনিষটার এমনি বাড়তির মুখ! জগবন্ধু এত বিপদে পড়িয়াও একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন না। নিমজ্জমান সংসারটীকে কোনও মতে বিনাশ জলধির তলদেশ হইতে ভাসাইয়া তুলিবার জন্য দুর্গানাম স্মরণ করিয়া মজুমদার মহাশয় আসন্ন মৃত্যুর ডাকটা পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে সৎপথে থাকিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল সংসারী লোকের নয়, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরও প্রশংসা যোগ্য! তারপর এক জীবনের প্রাণপণ চেষ্টায় পৈত্রিক বিষয়ের যে কোণাটুক ভাসিয়া উঠিল, তাও কন্যা কমলাকে অষ্টমবর্ষে "পাত্রস্থ" করিতে গিয়া হস্তচ্যুত হইয়া গেল। কমলার বিবাহের সময় সংসারটী যখন ডুবিবার মতন হইল, তখনও জগবন্ধুর পুত্রেরা কমলার ব্যয়বহুল বিবাহে কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না—তেমন সঙ্কীর্ণ মন লইয়া তারা কেউ উদার মজুমদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অর্থ ব্যয় করিয়া যার সঙ্গে কমলার বিবাহ দিয়া জগবন্ধু বিখ্যাত মজুমদার বংশের কুল রক্ষা করিলেন, সে দুর্মূল্য কুলীন শাবকটীর ছাঁকা কুলের গৌরব বই আর কোনও প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ আছে বলিয়া জানা যায় না। বিবাহের পর পিতৃ-মাতৃ হীন দরিদ্র জামাতাটীকে নষ্টনীড় বিহঙ্গ শিশুটীর মতই জগবন্ধু আপনার কল্যাণ-মণ্ডিত স্নেহ-তপ্ত-হৃদয়ের মাঝখানে তুলিয়া লইয়া ভাবিলেন, নিজের আর পাঁচটা যেমন এটাও তেমন। নিজের পাঁচটার মত এটাকেও বুকে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু অদৃষ্ট ও গ্রহ-নক্ষত্র উভয়ে যুক্তি করিয়া এই চপলমতি কুলীন যুবকটীর হৃদয়, সরস দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তার উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে কমলার হৃদয় পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখা সহজ হইল না। কারণ তখনও নববসন্তের চঞ্চল বাতাসে কমলার অস্ফুট হৃদয় সুখে ও স্বপ্নে, শোভায় ও সুগন্ধে, বিস্ময়ে ও আনন্দে ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে নাই! আট বছরের মেয়ে তখনো প্রেমের বর্ণমালাই ভাল করিয়া শিখিয়া উঠিতে পারে নাই। বালিকার এই অপরাধে জামাই বাবু কলেজে নাম কাটাইয়া, শিকল কাটা টিয়ার মত একদিন যে হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন, আর তার কোনও খবর পাওয়া গেল না! জগবন্ধুর নিকট যখন এ দুঃসংবাদ আসিয়া পঁহুছিল, তখন তিনি বিপদে মধুসূদনের নাম স্মরণ করিয়া, দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন, পুলিশে খবর দিলেন, সংবাদ পত্রে প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। তার পর সম্ভবপর স্থান শেষ করিয়া অসম্ভবপর স্থানে, একবারের স্থানে পাঁচবার করিয়া গোপনে প্রকাশ্যে অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু সে দুর্মূল্য হারাণো মাণিকটীর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পার হইয়া গেল, জামাই বাবুর আর কোনও খবরই পাওয়া গেল না বটে কিন্তু তাই বলিয়া কমলার রূপ-যৌবন জামাই বাবুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে কেন? বসন্তাগমে মাধবী লতার শ্যামল অঙ্গ যেমন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে, তেমনি দেখিতে দেখিতে নব যৌবনের রূপরাশি কমলার ক্ষীণ দেহলতার চারিদিকে বিকশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! জল সিঞ্চন ব্যতীত ফোটা ফুলের শোভা আর কত দিন স্থায়ী হয়? বিফল যৌবন লইয়া স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে, কমলার নব-যৌবনের ফুলরাশি অকালে শুকাইয়া আসিল। তার ব্যথিত সুন্দর মুখখানি হিমানীসিক্ত পদ্মের মত দিন দিন পাণ্ডুর হইয়া আসিতে লাগিল। দিনে দিনে পলে পলে যেমন করিয়া অশ্বত্থের মূল প্রবিষ্ট জীর্ণ মন্দিরের গ্রন্থি নীরবে বিদীর্ণ হইতে থাকে, কমলার নিরাশ হৃদয় তেমনি করিয়া সকলের চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অগোচরে নিঃশব্দে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। জগবন্ধু সকলই দেখিলেন, বুঝিলেন, কিন্তু করিবার মত কিছুই পাইলেন না, কারণ মানুষ কখনো অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

মা ষষ্ঠীর কৃপায় জগবন্ধুর সন্তান ভাগ্যটা ভাল ছিল। চার ছেলে,—এক মেয়ে কমলা। কিন্তু কমলাকে দিয়াই তাঁর দুরদৃষ্টের লাঞ্ছনা শেষ হইল না। সেবার গ্রামে কলেরা রোগ দেখা দিতেই জগবন্ধুর চারটী ছেলেই

উঠাউঠি কলেরা হইয়া মরিবার পথে দাখিল হইল! চারটী একসঙ্গে মুখে করিয়া লইয়া যাইবার সময় বোধ-করি যমরাজ দুইটী পথে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাই যমের সদর দরজা হইতে বিনোদ ও অনিল ফিরিয়া আসিল। আর দুইটী চলিয়া গেল। কমলার কিছু হইল না, কারণ অদৃষ্ট মন্দ হইলে স্বয়ং মৃত্যুরাজও মানুষকে অনুগ্রহ করিতে সাহস পান না।

মানুষের দুরদৃষ্টের মত কঠিন শিক্ষক আর নাই। এ পর্য্যন্ত জগবন্ধু জীবনে দুরদৃষ্টের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার শেষকালে এমন দুই দুইটা সোণার ছেলে যমের মুখে নিজের হাতে সঁপিয়া দিয়া জগবন্ধুর আয়ু আর এক বর্ষ পার হইল না। শেষ বয়সে সংসার-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তিনি মরিয়া বাঁচিলেন।

এদিকে বিনোদ মুখে গোঁফের রেখা দেখা না দিতেই গোপনে আবকারী দোকানে আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রকাশ্যভাবে তিনি আফিমের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। সকল প্রকার তরল ও বাষ্পীয় মাদক দ্রব্যের মধ্যে মাদকতায় আফিমকে নেশার রাজা বলার সার্থকতা আফিমানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই আফিম ও বড় বৌয়ের একান্ত অনুগত হইয়া বিনোদ মনুষ্যত্ব হারাইয়া-ছিলেন। বড় বৌও যে বাপের বাড়ী হইতে যথেষ্ট সহৃদয়তা লইয়া শ্বশুরালয় আলো করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলা সঙ্গত হইবে না।

এমন অবস্থায় অসচ্ছল ও বিপন্ন মজুমদার পরিবারের সমুদয় দায়িত্ব অনিলের ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। কিন্তু কমলাকে লইয়াই অনিল ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গেল। অনিল এবার এফ, এ পরীক্ষায় পঁচিশ টাকা স্কলার-সিপ পাইয়া কলিকাতায় একটী বেসরকারী কলেজে বি, এ পড়িতেছিল। যখন সে ভাবিয়া দেখিল দুঃখিনী কমলার পিতৃকুলে বা শ্বশুরকুলে কোথাও স্থান নাই; তখন সে স্থির করিল কমলাকে সে কলিকাতায় নিয়া তার নিজের কাছে রাখিবে। স্কলারসিপের টাকা ও প্রাইভেট মাষ্টারি করিয়া যা কিছু পাওয়া যাইবে ও তাতে ভাই বোনের কোনও রকমে কায়ক্লেশে কাটিয়া যাইবে।

অনিল কমলার দুই বছরের বড় মাত্র। যে বয়সে মানুষের হৃদয়ে নব বসন্ত জাগিয়া উঠে, নানা ভাবের ফুল ফোটে, স্বপ্নের অস্ফুট মাধুরী মদের গোলাপী নেশার মত সারা চিত্ত জড়াইয়া ধরে, অনিল সেই বয়সে, নিজের মাথার উপর কঠোর কর্ত্তব্যভার চাপাইয়া নিরুপায় দুঃখিনী বোনটীর হাত ধরিয়া, চোকের জল মুছিতে মুছিতে অকূল সংসার জলধির তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। সমুদয় সংসার দৈন্যের অপরাধে তাদের পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু যিনি পারের কাণ্ডারী, দৈন্য তাঁর নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, চরম দুঃসময়েও অনিল এই কথা মনে করিয়া কতকটা আরাম বোধ করিল।

(৩)

গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি আটটার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। সে সময় ঈষৎ তপ্ত বাতাসে তীব্রগন্ধ মৃগনাভি লেবেণ্ডারের একটী রেখা টানিয়া সরোজকুমার পায়ের 'পামসু'তে মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে একটা দোতালা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া সিঁড়ি দিয়া ঝড়ের মত বরাবর উপরের দিকে উঠিয়া গেল। ঠিক রাস্তার উপরেই বাড়ী খানা। দোতালার উপরকার দোর জানলার সমুদয় সাসি ঝিলমিলিগুলি খোলা ছিল বলিয়া বাড়ীটার চারিদিক দিয়া ঘরের উজ্জ্বল আলো চারিধারের তরল অন্ধকারে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।

দোতালায় একটী আলোক উজ্জ্বল কুঠুরীতে একখানা খাটের উপর পরিস্কার ধবধবে বিছানায় গায়ের উপর একখানা পাতলা চাদর টানিয়া দিয়া একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক শুইয়াছিল। তার অস্ফুট পদ্ম কোরকের মত মুদ্রিত চোখ দুটী দেখিলে মনে হয়, সে স্ত্রীলোকটী ঘুমে একেবারে বিভোর। কিন্তু গায়ের উপরের কুঁচি করা চাদর খানার ভাঁজগুলি দেখিয়া মনে সন্দেহ হয়—সম্ভবতঃ ঘুমটা যত পাকা দেখাইতেছে, বাস্তবিক ততটা নয়। হয়তঃ দোতালার সিড়ি উপর পামসুর মস্‌মস্ শব্দ শুনিয়া চাদরখানা স্ত্রীলোকটার গায়ের উপর উঠিয়া থাকিবে!

সরোজ আস্তে আস্তে নিদ্রিতার কাছে আসিয়া তাকে অতি সন্তর্পণে একটু ঠেলা দিয়া মৃদু স্নিগ্ধ স্বরে ডাকিল—

"মৃণাল ও মৃণাল! আজ যে দেখচি সন্ধ্যা না পড়তেই

তোমার দুপুর রাত! আমার একটু চা তৈরি করে দেবে না?—গলা যে একেবারে শুকিয়ে গেল!"

তা ঘুমটা পাকাই হোক আর কাচাই হোক, সরোজের আর্তনাদে সেটা সহজে ভাঙ্গার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সরোজ কতক্ষণ মেঝের উপর অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইল; তার পর দেরাজের উপর হইতে হাতীর দাঁতের হাত পাখাখানা তুলিয়া লইয়া একটু হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করিল; কিন্তু খালি পেটে নিরেট হাওয়া খাওয়াটা ভাল ঠেকিল না। তাই সরোজ আবার মৃণালের কাছে আসিয়া গলার স্বর যথাসাধ্য নরম করিয়া বলিল:—"তোমার পায়ে পড়ি মৃণাল, একবার উঠ! উঠে আমার এক পেয়ালা চা করে দাও! শরীরটা ভাল বোধ হচ্চে না—বড্ডো সর্দ্দি করেচে!"

মৃণাল সরোজের দিক হইতে অপর দিকে বেগে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল:—

"অত রাত্রে আমি উনুন ধরাতে পারবো না। ব্যথায় মাথাটা আমার একবারে ছিঁড়ে পড়্‌চে!"

সরোজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি উনুন ধরাতে যাবে কেন, বামুন ঠাকুর, ঝি—এরা সব কোথায়?"

"তারা চাকরী জবাব দিয়ে দুপুর বেলা চলে গেছে!"

তখন সরোজের উদরে ভগবান বৈশ্বানর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিলেন। মৃণালের কথাটা তেমন মুখ রোচক না হওয়ায়,সরোজ একটু বিরক্তির সহিত বলিল:—

চমৎকার হয়েচে! তোমার জ্বালায় দেখচি ঝি ঠাকুর রেখে থাকা দায়—রাত্রে খাবার কি বন্দোবস্ত করেছ তবে?"

সরোজের কথায় মৃণাল বিলক্ষণ চটিয়া গেল। সে বলিল—"তা বটেই তো, আমার জ্বালায়ই তো ঝি ঠাকুর থাকে না।"

সরোজ নরম হইয়া বলিল—"তা যা হয়েছে তাতো হয়েছে—এখন কি ব্যবস্থা করবে। মৃণাল পূর্ব্ববৎ চটা মেজাজেই বলিল—"আমি আবার কি বন্দোবস্ত করবো? আমি যে এখন উঠে উনুন ধরাবো, হাঁড়ি চড়াবো, সে আমার দিয়ে হবে না! আমারো ত মানুষের শরীর?"

সরোজ ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"তা একজনকে তো গিয়ে রান্না চড়াতে হবে! এমন রোজ রোজ খাওয়া দাওয়া বন্দ করেই বা থাকা যাবে কদ্দিন।"

মৃণাল এবার বিছানার উপর বেগে উঠিয়া বসিয়া গায়ের কাপড় গোছাইতে গোছাইতে বলিল:—"আমারো যে অসুখ বিসুখ হতে পারে, তা তুমি বিশ্বাস করতে যাবে কেন? তার চাইতে আমার মাথায় খুব কষে এক ঘা দিয়ে দাও না!—একেবারে সব চুকে যাক।"

কথা বলিতে বলিতে মৃণালের চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। প্রেমযুদ্ধে রণনিপুণ স্ত্রী যোদ্ধাগণ যখন বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তখন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীগণের জয় লাভের আশা একেবারে চুকিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল। মৃণালের চোখের কোণে জল দেখিয়া সরোজ নিজে গলিয়া জল হইয়া গেলেন। বলিলেন—"তোমার বুঝবার ভুল হোলো, মৃণাল! আমি কি তোমার অসুখের কথা অবিশ্বাস করচি? ক্যাস বাক্সের চাবিটা দাও দেখি একবার—দোকান থেকে দুজনের খাবার নিয়ে আসি!"

মৃণালের রাগ তখনো পড়ে নাই। সে অভিমান করিয়া আঁচল হইতে চাবির গোছাটা নিঃশব্দে খুলিয়া ঝন্ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল। চাবির গোছা কুড়াইয়া লইতে লইতে সরোজ বলিল:—"ভাল কথা, শরৎ ডাক্তার আজ একটি ঝির কথা বলছিল। পাড়াগেয়ে ঝি রাঁধবে, ঘরের আর কাযও করবে, ২৪ ঘণ্টা বাড়ীতেই থাকিবে, কিন্তু বাইরে যাবে না। বাজারও কর্ব্বে না। ওকে আটকানো যাক তা হলে, কি বল?"

মৃণাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একটু হালকা হইয়া বলিল:—"তা সস্তায় পেলে রেখে দাও না।"

এত কথা কাটাকাটির পর মৃণালকে আপোষের প্রস্তাবে এত সহজে রাজি হইতে দেখিয়া সরোজের উৎসাহের উত্তেজনাটা সহসা খুব বাড়িয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আলনা হইতে চাদরটা কাঁধের উপর ফেলিয়া বলিল "তা হলে ময়রার দোকান থেকে কিছু খাবার টাবার নিয়ে আসি, পথে শরৎ ডাক্তারকেও আজই ঝিটার কথা বলে আসি, শেষকালে ওটাও যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়।"

মৃণাল সরোজের প্রস্তাবে কোনও আপত্তি করিল না, সরোজও আর দেরী না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪)

নূতন ঝি আসার পর হইতে সরোজের গৃহে কিন্তু অশান্তি আরো বাড়িয়া উঠিল। নূতন ঝি কায করিত, সরোজের কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া আলনার উপর সাজাইয়া রাখিত। স্নানের সময় তোয়ালে খুঁজিতে এখন আর মৃণালকে সারা বাড়ী খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হয় না। সকালে বিকালে মৌতাদ মত সরোজের দু পেয়ালা গরম চার জন্ম এখন আর রাজ্য শুদ্ধ তোলপাড় করিতে হয় না। বাস্তবিক নূতন ঝিটী কাযের লোক। কিন্তু সে কখনো সরোজ বাবুর সম্মুখে বাহির হইত না। কিম্বা বাড়ীর বাহিরেও যাইত না। সরোজ বাবু শরৎ ডাক্তারের নিকট এই সর্ত্তে কবুল হইলে পর ঝি এ বাড়ীতে চাকরী করিতে রাজী হইয়াছে।

কিন্তু যে দিকে নিষেধ, মানুষের স্বাভাবিক কৌতুহল, চিত্তকে সেই দিকেই টানিয়া লইয়া যায়। ঝির প্রত্যেক কাযের মধ্যে সুন্দর পারিপাট্য ও লক্ষীশ্রী দেখিয়া সরোজ মনে করিত, নূতন ঝি মানুষটী না জানি কেমন! মৃণাল চক্ষের আড়াল হইলেই সরোজের চোখদুটী সে নূতন ঝিকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিত। হঠাৎ যদি দুই জনে কখনো কোথাও দেখা হইয়া পড়িত, অমনি ঝি মুখের উপর লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়া বিদ্যুতের মত চকিতে সরিয়া পড়িত। সরোজ টের পাইয়াছিলেন, ঝিটী অল্প বয়স্কা ও সুন্দরী। কিন্তু তার অবগুণ্ঠনের দুশ্ছেদ্যরহস্য জাল ছিন্ন করিয়া তার মুখের সৌন্দর্য্যটুকু আবিষ্কার করিতে না পারিয়া সরোজের চিত্ত আরো অধীর হইয়া উঠিল।

এখন ঝির তৈরী পান না হইলে সরোজের আর পসন্দ হয় না, নিজের কাযটি করিবার জন্ম সরোজ এখন মৃণালকে না বলিয়া ঝিকেই ফরমাস করে। মৃণালের কায কর্ম্মে সরোজ এখন পদে পদে খুঁত ধরিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং হাতের কাছে উপলক্ষ্য না পাইলেও সরোজ এখন ঝির কাযেরই প্রয়োজনাধিক প্রসংশা করিয়াও ক্ষান্ত হয় না! মৃণাল বুঝিতে পারিল, সরোজ তার কাছে আসিয়া আগেকার মত সুস্থ বোধ করে না। তার হৃদয় এখন আর এক জনের জন্ম সর্ব্বদা ব্যাকুল। মৃণাল বুদ্ধিমতী। ইঙ্গিতে সে সকলি বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, ফুলে ফুলে মধু পান করা যে ভ্রমরের স্বভাব, সে এক ফুলের সৌরভ নিঃশেষ পান করিয়া নূতন ফুলের সন্ধান পাইয়াছে। এক কথায় তার সৌভাগ্যের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই ঝি আসার পর হইতেই সরোজের এই নূতন ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় এখন ঝিই মৃণালের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল। মৃণাল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপে হোক এ আপদটাকে এ বাড়ী হইতে শীঘ্র বিদায় করিয়া না দিতে পারিলে তার শান্তি নাই। মৃণাল ঝির উপর রীতিমত উৎপাত সুরু করিয়া দিল।

এখন প্রায়ই দুপুর বেলায় সকলের খাওয়া হইয়া গেলে দেখা যাইত ঝির ভাতে কম পড়িয়াছে। মৃণাল নিজে বরাদ্দ করিয়া চাল দিত, কিন্তু ঝির ভাতে কম হইলে ঝিকেই গাল পাড়িয়া ভুত ছাড়াইত। মাথার একটা সোনার ফুল নিজে জাজিমের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া ঝিকে বজ্জাৎ চোর বলিয়া গালি দিয়া পুলিশে ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইল, কিন্তু ঝিটা এমনি বেহায়া যে এত অপমান সহ্য করিয়াও রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার নাম করিল না। মৃণাল যেদিন ঝির উপর বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিত, সেদিন সরোজ ঝিকে সুবিধা মত একলা পাইলে বুঝাইয়া দিত, মৃণালই তার উপর দুর্ব্যবহার করিতেছে, বাস্তবিক ঝির কোনও দোষ নাই। এদিকে উড়ে বেহারাটা—বাবু'কে নিজ হাতে ঝিকে এটা ওটা দিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে বলিয়া গোপনে মৃণালের নিকট চোরা সাক্ষী দিয়া আসিল। মৃণাল স্থির করিল আপদটা'কে আজ যেমন করিয়াই হোক বাড়ী ছাড়া না করিয়া সে আজ জল স্পর্শ করিবে না।

বেলা সাড়ে দশটা। সরোজ তার আফিসের পোষাক লইয়া মৃণালের অপেক্ষায় আরো দুটা পান চিবাইতেছিল। মৃণাল নিজের পুরাণো বেনারসী সাড়ি খানার নানাস্থানে ছিঁড়িয়া নাকের জলে চোকের জলে এক করিয়া সরোজের সম্মুখে আসিয়া বলিল ঃ—"ঝিটাকে এখনি বাড়ীথেকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে যাও। এই

দেখনা, আমার সাড়ীখানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলেচে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি!" সরোজ মৃণালের একতরফা সাক্ষীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া একটু সন্দেহের ভাবে বলিল :—"তুমি স্বচক্ষে দেখেচ?"

মৃণাল রাগে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল :—

"দেখেচি না তো কি? আমার উপর ওর অত হিংসে কেন, তা কি আমার এখনো বুঝতে বাঁকি আছে? আমি কচি খুকী নাকি!"

মৃণালের অভিযোগটার সবটুকু মিথ্যা নয় বলিয়া সরোজ তেমন জোর করিয়া তার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সরোজকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃণাল গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল :—

"পাজি হিংসুটে মাগীকে এখনি এ বাড়ী থেকে বের করে যাও; হয় আমি থাকবো ও যাবে, নয় আমি যাব ও থাকবে। দুজনের এ বাড়ীতে থাকা হবে না, তা নিশ্চয়! আজি যা হয় একটা হয়ে যাবে।'

মৃণালের আস্ফালন দেখিয়া সরোজ বেচারা বেজায় ঘাবড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ বলিল :—"আফিসের বেলা গেল, ও বেলা ওর মাইনে চুকিয়ে নিশ্চয় বিদেয় করে দেবো। এখন দুপুর বেলা না খেয়ে কোথায় যাবে! একি হয়!

সরোজের ওকালতীতে মৃণাল আরো চটিয়া গেল। সে নাক মুখ লাল করিয়া বলিল :—

"আমার অত দামের সাড়ীখানা ছিঁড়ে ফেল্‌লে, পুলিশে ধরিয়ে দেইনি যে এই ঢের। আবার এর 'পর মাইনে! এখনি আপদটাকে রাস্তায় বের করে দাও!'

তোপের মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা এক পা দু পা করিয়া হঠিয়া আসা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কারণ এই প্রকার অন্যায় যুদ্ধে যঃ পলায়তে সঃ জীবতি। বিশেষ আফিসের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সরোজ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চলিয়া যাওয়ার সময় দেখিল ঝি পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ঝির সুন্দর মুখ আর মৃণালের দুর্ব্যবহার দুই-ই সরোজকে ঝির প্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল। আজ বিনা অপরাধে তাকে মৃণালের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া সরোজের সমবেদনা সহসা উছলিয়া উঠিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া এক পা দুই পা করিয়া ঝির নিকট গিয়া স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে বলিল :—"তুমি কাঁদচো কেন ঝি! তোমার তো কোন দোষ নেই—সব মৃণালের চালাকি! আমি সব বুঝতে পেরেছি :—

সরোজ এই কথা বলা মাত্র কর্কশ প্রতিধ্বনির মত তার পেছুন হইতে বাজিয়া উঠিল :—

"সব মৃণালের চালাকি! বটে!"

সরোজ থতমত খাইয়া বজ্রাহত পথিকের মত পেছুন ফিরিয়া দেখে সর্ব্বনাশ!—যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই রাত্রি হইয়াছে! সরোজ তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

(৫)

তিন দিন তিন রাত্রি অজ্ঞান থাকিয়া যখন সকাল বেলা সরোজের প্রথম চেতনা হইল, তখন সে নিজের শরীরের পানে তাকাইয়া দেখিতে পাইল তার সারা গা ভরিয়া বসন্ত দেখা দিয়াছে। মাথার ভিতর ভয়ানক যন্ত্রণা, সমুদয় শরীরে অসহ্য ব্যথা। তার বোধ হইল যেন সমগ্র পৃথিবীটা বাসুকীর মাথার উপর থাকিয়া থাকিয়া বার বার টলিয়া উঠিতেছে। দুরন্ত ব্যাধির খরশরে বিদ্ধ হইয়া সরোজ একবার তার ক্লান্ত চোক দুটী মেলিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া যেন কার অন্বেষণ করিল। ঘরে একটী লোকও নাই।

এ চরম দুঃসময়ে নিজেকে নিতান্ত অসহায় ও পরিত্যক্ত মনে করিয়া সরোজের মুখ ভয়ে একেবারে শুকাইয়া গেল। সে তার ক্ষীণ পরিশুষ্ক কণ্ঠে সমুদয় শক্তি আরোপ করিয়া ডাকিল—"মৃণাল!" সে ব্যথিত ব্যাকুল আর্ত্ত করুণ বিলাপের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি চারিদিগের গৃহ প্রাচীর হইতে চকিতে জাগিয়া উঠিয়া আবার অমনি নিস্তরঙ্গ বায়ু সমুদ্রে মিলাইয়া গেল! কিন্তু মৃণাল কোথায়? সরোজের কাতর কণ্ঠ স্বর শুনিয়াও তো সে আজ আর একটী বারের জন্য তার নিকট ফিরিয়া আসিল না!

সহসা সরোজের জ্বরতপ্ত কপালের উপর একখানা স্নেহশীতল কোমল হস্তের স্পর্শ লাগিবা মাত্র সরোজ চোক বুজিয়াই বলিয়া উঠিলেন "মৃণাল,—এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?" কোন উত্তর আসিল না। উত্তর না পাইয়া

সরোজ চোক মেলিয়া চাহিয়া দেখে, ঝি তার কপালের উপর তাহার স্নেহশীতল করতল বিন্যস্ত করিয়া দেবীমূর্ত্তির মত শয্যা প্রান্তে বসিয়া আছে। সরোজ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "ঝি, মৃণাল কোথায় গিয়াছে?"

ভয় কম্পিত কণ্ঠে ঝি বলিল—"রোগের প্রথম দিনেই বাড়ীর সমস্ত জিনিস পত্র লইয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

ফাঁসি কাঠের উপর যে প্রাণদণ্ডিত অপরাধী দাঁড়াইয়া,—তার চরণ তল হইতে সামান্য একখানা কাষ্ঠ ফলক সরাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন করিয়া আমাদের এত বড় সুখদুঃখের পৃথিবীটা, আজীবনের স্নেহমমতা, হাসি অশ্রু, আলো ছায়া লইয়া তার চরণ প্রান্ত হইতে অলীক স্বপ্নের মত দূরে সরিয়া যায়; অকস্মাৎ মৃণালের অন্তর্দ্ধানের বার্ত্তায় সরোজ আজ কতকটা সেইরূপ অনুভব করিল। এতদিন সে যে মরিচীকাকে সংসারের একমাত্র শ্রেয় জানিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তার হৃদয় হীনতা সরোজের হৃদয়ে বরফের তীরের মত গিয়া বিঁধিল। আজ সরোজের বার বার মনে হইতে লাগিল, কে যেন ফাঁসির দড়ি গলায় বাঁধিয়া তাকে শূন্যের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। চারিদিকের দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে যে এখনো বাঁচিয়া আছে, সেইটাই তার নিকট বড় আশ্চর্য্যের বলিয়া বোধ হইল!

সুখের সময় মানুষ যে বিষধর সর্পকেও ফুলের মালা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়—তারি নাম মোহ! সে সময় মিথ্যাকে কিছুতেই মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। মরিচীকাকে যদি তৃষ্ণার্ত্ত পথিক সত্য সত্যই শীতল নির্ঝর মনে না করিবে, তবে সে তার পিছু পিছু ছুটিয়া মরিতে যাইবে কেন? এ মরিচীকার জগতে বিপদই মানুষের পরম বন্ধু, অশ্রুজলই মানুষের একমাত্র খাঁটী জিনিষ। বিপদের সম্মুখে, অশ্রুর স্পর্শে ভ্রান্তিতার মিথ্যার মনোরম ছদ্মবেশ বেশীক্ষণ বজায় রাখিতে পারে না।

যে মৃণালকে সরোজ এতদিন ফুলের মালার মত গলায় ঝুলিয়া রাখিয়াছিল, সেই আজ অসময়ে সর্প হইয়া তার হৃদয়ে দংশন করিয়া চলিয়া গেল। আজ সরোজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল, মৃণাল তার সহজ সুখের দিনের চপল খেলার সাথী ছিল মাত্র! দুর্দ্দিনের কেউ নয়! সরোজের দুর্দ্দিন নিকটে দেখিয়া মৃণাল যে শুধু সরোজের হৃদয় দলিয়া চলিয়া গিয়াছে তা নয়, দস্যুর মত তার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তার বক্ষঃস্থলে নিষ্ঠুরতার তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সরোজ ভাবিল, কি আশ্চর্য্য। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই মৃণালকেই সরোজ পৃথিবীর মধ্যে তার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছিল! মোহ আর কাহাকে বলে!

বিপদে পড়িয়া আজ সরোজের শরীরের বল মনের বল দুইই লোপ পাইয়াছে। নচেৎ সে যাকে যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইয়া ছিল, তার অকৃতজ্ঞতা সে আজ নিশ্চয়ই নীরবে ক্ষমা করিতে পারিত না। ভাবিতে ভাবিতে সরোজ দৈন্যের পীড়নের কথা ভুলিল, ব্যাধির মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণার কথা ভুলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ তার বক্ষের আহত স্থানটীর উপরই হাত পড়িতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল—মানুষের অকৃতজ্ঞতা, প্রিয়জনের হৃদয়-হীনতা, ভালবাসার নামে এ জগতে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয়! রুগ্নশয্যার নিরুপায় শিশুর মত পড়িয়া চোক মুদিয়া সরোজ আজ এত দিন পরে ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল—সে ভাবনা সাগরের কি আর কুল কিনারা আছে?

সরোজ অনেক ক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ের সহিত ঝির মুখের পানে তাকাইয়া থাকিল। এ সংসার শ্মশানে, এ অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ জগতে, এখনো এমন স্নেহ শীতল কোমল স্পর্শ কেমন করিয়া সম্ভবপর, এই ভাবিয়া সরোজ আজ ব্যথিত হৃদয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময় অনুভব করিল। ব্যথিত হৃদয়ের বিস্ময়ের ভিতর দিয়া সরোজ আজ যথার্থ প্রেমের অরুণোদয় দেখিতে পাইল। সরোজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাকিল:—"ঝি!" ঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়া তাহার মুখের উপর ঘোমটা আরও কিছু টানিয়া দিয়া সরোজের গায়ের বসন্তগুলির উপর তুলা লোসনে ভিজাইয়া ভিজাইয়া আস্তে আস্তে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সরোজ জীবনে কখনো এতটা আরাম পাইয়াছে

বলিয়া তার মনে হইল না। ঝি তার নিজের বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া সরোজের মাথাটী নিজের স্নেহতপ্ত কোলের উপর তুলিয়া লইল। ঝির কোলে মাথা রাখিয়া সরোজের এখন আর মৃণালের কথা একবারও মনে হইল না। সে তার স্নেহার্দ্র, দুর্ব্বল, ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ মন সে মূর্ত্তিমতী সেবারূপিনী দেবীর সুন্দর পদতলে মনে মনে লুটাইয়া দিয়া ভাবিল গোটা পৃথিবীটা ছলনা ও অকৃতজ্ঞতায় জ্বলিয়া গিয়া এখনো শ্মশানে পরিণত হয় নাই, এ ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে এখনো নারী হৃদয় হইতে স্নেহ-নির্ঝর একেবারে শুকাইয়া যায় নাই! তাই এ দুঃখপূর্ণ মৃত্যুশীল পৃথিবীতে এখনো বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হয়!

ভাবিতে ভাবিতে সরোজ মনের আরামে ব্যারামের কথা ভুলিয়া গেল। ঝির কোলে মাথা রাখিয়া সরোজের ক্লান্ত চোখ দুটী অলস ঘুমের ঘোরে ভাঙ্গিয়া আসিল।

সহসা সরোজের জ্বরতপ্ত কপোলের উপর এক ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেই সে চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। সে ঝির মুখের পানে তাকাইয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল:—

"ও কি, ঝি! তুমি কাঁদচো?"

সরোজ মুখ তুলিয়া ঝির অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের নিম্নে শিশির সঞ্চিত লতার মত অশ্রুসিক্ত নেত্রপল্লব দুটি স্পষ্ট দেখিতে পাইল। স্বর্গের অমৃত জড়িত শিশির বিন্দুর মত, স্নিগ্ধ নন্দনের পারিজাতগন্ধি অমৃতের মত সুমধুর সে নীরব অশ্রুধারা। সরোজ ধীরে ধীরে তার রোগক্ষীণ শীর্ণ বাহু দিয়া ঝির চক্ষের জল মুছাইতে গিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

সেই সময় কপাট ঠেলিয়া একটী ভদ্রলোক ঘরের ভিতর আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"কমলা, আজ অবস্থা কেমন বোধ হচ্চে?"

কমলার নাম শুনিয়া সরোজের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখে অনিল।

সরোজ সহসা বিকারগ্রস্ত রোগীর মত চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঝি, কমলা কোথায়? অনিল বাবু কার কথা বলচেন?"

ঝি চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনিল বাষ্পাকুল নয়নে ঝির কম্পিত হাতখানি সরোজের রোগক্ষীণ হাতের উপর তুলিয়া দিয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিল:—

এ ঝি নয় সরোজ! এই আমাদের কমলা, ইহাকে তোমার চিরদিনের দুঃখের সাথী বলে মনে রেখো!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

ঈশা খাঁ।

(২)

দাউদের পরাজয়ের পর বঙ্গদেশ হইতে পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ হইলে পুনরায় বাঙ্গালার রাজশক্তির দুর্ব্বলতা দেখা যাইতে লাগিল। মোগল শাসনকর্ত্তা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ শাসন করিতে প্রয়াস পাইলেন। এই বন্দোবস্তে বেহারে ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হইল। ক্রমে পুনঃরায় বাঙ্গলা ও বেহার হইতে আকবর সাহের আধিপত্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীগণ স্বীয় স্বীয় সঞ্চিত শক্তির প্রভাবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশ হস্তগত করিয়া ফেলিলেন।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিগণই ইতিহাসে দ্বাদশ ভৌমিক নামে পরিচিত। * এই দ্বাদশ ভৌমিকের তিন জন হিন্দু ছিলেন। † হিন্দুদিগের মধ্যে যশোহরের

---

* প্রচলিত ইতিহাসে আমরা দ্বাদশ ভৌমিকের উল্লেখ দেখিতে পাই। আকবর নামার পাঠ লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করিলে দ্বাদশ স্থলে ত্রয়োদশ ভৌমিক ছিল বলিয়া মনে হয়, Elliot আকবর নামার পাঠ অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—"Isa by his intelligence and prudence acquired a name and he made twelve Zamindars of Bengal to become his dependents."

বেভারিজ সাহেব আকবর নামার আলোচনা করিয়া ঈশা খাঁ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"Abul Fazal's language if constructed strictly means that there were twelve Zamindars exclu-ive of Isa" (J. A S. B. 1904)

† ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিসফিচ সাহেব বঙ্গদেশে আগমন

প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণ রায়, ভৌমিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট নয়জন মুসলমান ছিলেন।

ইশা খাঁ এই দ্বাদশ ভৌমিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে সমস্ত নিম্ন বঙ্গ বা ভাটী ‡ প্রদেশ নিজ শাসনাস্তর্গত করিয়া অন্যান্য ভৌমিক দিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইশা খাঁ শক্তি সঞ্চয় করিয়া স্বাধীন ভাবাপন্ন হইলেও একবারেই রাজদ্রোহী হইয়া উঠিলেন না। প্রয়োজন অনুসারে সম্রাটের রাজস্ব প্রদান করিতেন।

বঙ্গেশ্বর দাউদের পলায়নের পর ইশা খাঁ করিম দাদ ও ইব্রাহিম প্রভৃতি কতিপয় আফগানের সহিত মিলিত হইয়া ভাটী প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার পর ৯৮৬ হিজরা (১৫৭৮ খ্রী) অব্দে মোগল শাসন কর্ত্তা হোসেন কুলী খানজাহান ভাটী আক্রমন করিলে ইশা খাঁ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। *

মোগল সেনানায়কগণ বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালার মোগল শাসনকর্ত্তা মোজাফর খাঁকে হত্যা করিলে বাঙ্গলায় যে অরাজকতা উপস্থিত হয়, ঐই সুযোগে ইশা খাঁও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল ভূমি বন্দোবস্ত করিতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। এই বন্দোবস্ত কার্য্যে তিনি ইশাখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইশা দিল্লীশ্বরের রাজস্ব সচিবকে অম্লান চিত্তে সাহায্য প্রদান করেন। টোডরমল্ল ইশাখাঁর সাহায্যে বাঙ্গালার অন্যান্য ভূঞা দিগকে হস্তগত করিয়া বাঙ্গালার ভূমি বন্দোবস্তে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই ভূমি বন্দোবস্তের পর ইশা খাঁ প্রকাশ্য ভাবে দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকার বাজুহায় ও সরকার সোনারগাঁর বিস্তৃত অংশ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই উভয় সরকারের সীমানা উত্তর পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে সাগর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইশা খাঁ বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া খিজিরপুরের রাজধানী সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। স্থানে স্থানে নূতন দুর্গও নির্ম্মিত হইতে লাগিল।

ইশা খাঁর দুরভিসন্ধি মূলক আয়োজন-বার্ত্তা সম্রাট কর্ণে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। সম্রাট বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা সাহাবাজ খাঁকে ইশাখাঁর কার্য্যকলাপ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এই সময় বিদ্রোহী মাছুম কাবুলী পলায়ন করিয়া ইশাখাঁর শরণাপন্ন হন। সাহাবাজ খাঁও ইশাখাঁর অভিপ্রায় পরীক্ষার উত্তম সুযোগ বুঝিয়া সসৈন্যে মাছুম কাবুলীর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ভাটীতে উপনিত হন। †

পলায়িত মাছুম কাবুলী যখন ইশাখাঁর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন ইশা খাঁ কোচবিহার বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। সাহাবাজ খাঁ মাছুম খাঁর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া খিজিরপুরের সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং ইশাখাঁর মনোভাব পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে মাছুম কাবুলীকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিবেন স্থির করিলেন। *

করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ ভৌমিকের উল্লেখ করিয়া তন্মধ্যে ৯ জনকে মুসলমান বলিয়া লিখিয়াছেন।

Pementhus● সেইমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জমিদারগণ ঠিক একই সময়ে ভৌমিক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

‡ আকবর নামা:ত ভাটী প্রদেশের যে চতুঃসীমা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রমাদবর্জ্জিত নহে বলিয়াই অনেকে মনে করেন। Elliot আকবর নামার ভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Bhati is a low lying country and is called Hindu name (Bhati) it lies lower than Bengal. It extends nearly 400 kos from south to north. On the east lies the sea and the country of Hubsha on the west lies the Hill country south of Tanda (sec) on the north the salt sea (sec) and the extremities on the Hills of Tibets."

● Ain i Akbari,

† Akbar nama

* কত্রাভু, বার সিন্দুর ও মহেশ্বরদী এই নগর তিনটী কোথায় অবস্থিত ছিল; বর্ত্তমান সময়ে তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীনে কাত্রাব ও ও মহেশ্বরদী নামে দুইটী তপ্পা বর্ত্তমান আছে। Bibliothica

কিন্তু সাহাবাজ খাঁ যখন শুনিলেন ইশা খাঁ সসৈন্যে কোচ বিহার গমন করিয়াছেন, তখন তিনি এই শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত মনে করিলেন না। ইশার অরক্ষিত পুরী খিজিরপুর ও খিজিরপুরের অপর তীরস্থ দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং অবিলম্বে সোনার গাঁ হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর সাহাবাজ "করাভূ" লুণ্ঠন পূর্ব্বক ইশা খাঁর তত্রস্থ অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া "বার সিন্দুর" ও "মহেশ্বরদী" নগর অভিমুখে দ্রুত গতিতে সৈন্য পরিচালন করিলেন এবং তাহাও অধিকার এবং লুণ্ঠন করিলেন।

মাছুম খাঁ অনোন্যপায় হইয়া এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিলেন। † সাহাবাজ খাঁ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আসিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে কুমারসমুদ্রে * তোটক (বর্ত্তমান টোক) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাহার শিবির সংস্থাপন করিলেন।

এই সময় ইশা খাঁ কোচবিহার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্থল ও জলপথে সাহাবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দুর্দ্দমনীয় মোগল বাহিনীকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ইশা খাঁ কুমারসমুদ্র (বর্ত্তমান এগারসিন্দুর) দুর্গে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইশা খাঁর দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এগার সিন্দুর।

Indicaতে কারাভুকে কাটরাবু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; Elliot সাহেব কাটরাপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। India Officeএর ২০৫ নং হস্তলিখিত গ্রন্থে কট্রভু ও কাট্রাবু দুই পাঠই বুঝা যায়। মাহিল উল উমরা গ্রন্থে কাটরাপুর পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। ঢাকার ডাক্তার ওয়াইজ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবদিগের সনদ দৃষ্টে "কাটরাবই" প্রকৃত নাম বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালীগঞ্জের উত্তরে লক্ষ্মীয়ার তীরে বক্তারপুর নামক স্থানে ইশা খাঁর জীবলীলা শেষ হয়। এই বক্তারপুর পার্সি অক্ষরের ও উচ্চারণের গোলমালে "কট্রাব" অথবা "কাটবার" শেষ বক্তারপুরে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। ডাক্তার ওয়াইজ বক্তারপুরে ইশাখাঁর বাসস্থান ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আকবর নামায় কিন্তু ইশা খাঁর সংশ্রবে কোন বক্তারপুরের উল্লেখ দেখা যায় না। Beveridge সাহেব বক্তারপুরকেই কাটরাব বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন। ১৭শ শতাব্দীতে Sebastion Manogere এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি কাটরাবকে একটী পরগণা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কাটরাব গ্রামের নামটী তাহার আগমনের পূর্ব্বেই বোধ হয় পার্সি নক্তার গোলমালে লুপ্ত হইয়া বক্তারপুরে পরিণত হইয়াছিল।

† মাছুম খাঁ যেখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি মাছুমাবাদ নামে পরিচিত। মাছুমাবাদ লক্ষ্মীয়ার তীরে অবস্থিত মুড়াপাড়ার সন্নিকট। এখানে অনেক প্রাচীন দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

* পার্সি আকবর নামায় যাহাকে 'কিমার সিন্দুর' লিখা হইয়াছে, ইলিয়ট সাহেব তাহাকে 'কুমার সমুদ্র' লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই স্থানে "এগার সিন্ধু" বা এগার সিন্দুর নামে পরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবগ্রন্থে এই এগার সিন্দুর নামের বিশেষ উল্লেখ

সাহাবাজ খাঁ ইশা খাঁর আক্রমণে পরাজিত না হইলেও ইশা খাঁর প্রবল শক্তি যে উপেক্ষার বিষয় নহে, তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন। উপযুক্ত অবসর পাইলে ইশা খাঁ মোগল সৈন্যকে এই অপরিচিত স্থানে অনায়াসেই বিধ্বস্ত করিতে পারেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। তাই সাহবাজ পরাজিত না হইয়াও নিজ হইতেই ইশা খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ইশা খাঁ আপনার অবস্থা বুঝিয়া মোগল সেনাপতির প্রস্তাব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া তদুত্তরে স্বীয় মন্তব্য প্রেরণ করিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। অবশেষে কুটনীতি প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বিপুল মোগল বাহিনীর সহিত ক্রমাগত ৭ মাস কাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া, ইশা খাঁর ক্রমেই শক্তি ক্ষয় হইতে লাগিল, ইশা খাঁ পরাজিত হইয়াও অদম্য উৎসাহে সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মোগল শিবিরে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইল। মোগল সেনানায়কগণ সাহাবাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। শিবিরে মহা অসন্তোষ বিরাজ করিতে লাগিল। কুট নীতিজ্ঞ ইশা খাঁর নিকট বিপক্ষ শিবিরের এই অবস্থা অপরিজ্ঞাত রহিল না। তিনি এই সুযোগে ব্রহ্মপুত্রের উজান দিকে বাঁধ বাধিয়া জল প্রবাহের গতি মন্দিভূত করিয়া বিপক্ষ শিবিরের উপর দিয়া ব্রহ্মপুত্রের গতি বেগ ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। সংকল্পিত কার্য্য আরম্ভ হইল।

যথা সময়ে ব্রহ্মপুত্রের ভাটীর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া উজান মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রবল স্রোত বেগ নূতন খোদিত পঞ্চদশ প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া মোগল শিবির তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। সাহাবাজ খাঁ অপ্রস্তুত অবস্থায় পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। মোগল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অস্ত্র, শস্ত্র, কামান, গোলা, রসদ, পত্র, সাজ সজ্জা ব্রহ্মপুত্রের প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া গেল। মোগল সৈন্য বজরার আশ্রয়ে অতি অল্পক্ষণ মাত্র যুদ্ধ করিয়াই পরাজিত হইল। ঢাকার থানাদার সৈয়র হোসেন প্রথমতঃ নিজ কামান সহ রক্ষা পাইলেন, শেষে তিনিও ইশা খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে ইশা খাঁ মোগল পক্ষের বহু কামান হস্তগত করিলেন, কিন্তু তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ হত হইয়াছিল।

সাহাবাজ খাঁ পুনরায় নূতন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ এইবার বন্দী সৈয়দ হোসেন দ্বারা সাহাবাজ খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব উথাপন করিলেন। সাহাবাজ খাঁ স্বীয় শিবিরে আত্মবিরোধের ভাব দেখিয়া, ইশাখাঁর প্রস্তাবে সহজেই স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত সর্ত্তে ইশা খাঁর সহিত মোগল সেনাপতির সন্ধি পত্র নিষ্পন্ন হইল।

১। ইশা খাঁ দিল্লীশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন।

২। তিনি নিজকে সম্রাটের ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন।

৩। সোনার গাঁ বন্দরে রাজকীয় থানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

৪। মাছুম কাবুলীকে মক্কা সরিফে প্রেরণ করিতে হইবে।

দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই নামটী প্রাচীন। পারস্য ভাষার অনুবাদে এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ তাহার কারণ আমার সাহায্যকারী মৌলবী বন্ধু এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

পার্সি কাফ্ এবং গাফ্ এই দুইটী অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য মাত্র একটী অতিরিক্ত রেখা দ্বারা রক্ষিত হয়। গাফের উপরের রেখাটী লোপ করিয়া দিলে তাহা কাফ্ হইবে। পূর্ব্বে হাতের লেখা অক্ষরে অনেকেই এই রেখাটী দিতেন না। "ঘোড়াঘাটকে" কোড়াঘাট লিখিতেন, এখনও অনেকে বগড়া (বগুরা জেলা) কে বকুরা লিখেন। তারপর পার্সিতে গাহারা (এগার) লিখিতে গিয়ে যে যে অক্ষরের নির্দেশ স্বরূপ এক দিকে বাকা একটী টান দেওয়া হয়, ঐ টানটী যদি শব্দটীর এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়, তবে ঐ হে খিস হইয়া খাড়ার এবং গাহারা (এগার) "তুয়ার" "কিআর" প্রভৃতিতে গোলমাল হইয়া যায়। পার্সির এ গোলমাল হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়া অনুবাদ করিতে গেলেই হইবে। আবার বোধ হয় এইরূপ গোলমালেই "এগারসিন্দু"—তুয়ার সমুদ্র ও কিআরসিন্দু প্রভৃতি নামে এবং কাটরাব, খতারপুর প্রভৃতি কাটরাপুর, কাটরাবু প্রভৃতি নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

৫। সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান করিবেন।

সন্ধি হইয়া গেলে সাহাবাজ সসৈন্যে লক্ষীয়ার তীরবর্ত্তী তাওয়ালে আগমন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সাহাবাজ চলিয়া গেলেই ইশা খাঁ কর্ত্তৃক পুনরায় নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। সন্ধি সর্ত্ত রক্ষিত হইল না দেখিয়া সাহাবাজ খাঁ পুনরায় এগারসিন্ধু দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

এইবার ইশা খাঁ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুতছিলেন। বিপুল বিক্রমে মোগল সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। মোগল সৈন্য এবার ইশাখাঁর বিক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। মোগল নৌসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মহম্মদ গজনভী প্রভৃতি বহু সেনানায়ক ও কর্ম্মচারী ব্রহ্মপুত্র প্রবাহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মোগল সেনা নায়ক মীর আদিলের পুত্র ও অন্যান্য বহু মোগলবীর অস্ত্র-শস্ত্র সহ ইশাখাঁর হস্তে ধৃত হইলেন।

সাহাবাজ খাঁ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ৮ দিনে আসিয়া সেরপুর-মরিচা বিশ্রাম লাভ করেন। *

ইশা খাঁ মোগল সৈন্যকে পরাজিত করিয়া বিপুল গৌরব ও আড়ম্বর সহকারে আসিয়া সোণারগায়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং ত্রিবেণী হাজিগঞ্জ, কলাগাছিয়া প্রভৃতি লক্ষীয়ার তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। একডালা ও এগার সিন্ধুর প্রাচীন দুর্গদ্বয়ের সংস্কার কার্য্যও আরম্ভ হইল এবং রাজধানীতে নূতন অস্ত্রশস্ত্র কামান গোলা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনতি বিলম্বে ইশা খাঁ নব বলে বলীয়ান হইয়া ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং ত্রিপুরেশ্বরের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আরও শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইলেন। অতঃপর দিল্লীশ্বরের অনুগত সাদক খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাও হস্তগত করিলেন। সাদক খাঁ পলায়ন করিয়া প্রাণে রক্ষা পাইলেন।

এদিকে সাহাবাজ খাঁ পরাজিত হইয়া দিল্লী যাইতে মনস্থ করিলে দিল্লীশ্বর সেই অকৃতকর্ম্মাকে ভৎর্সনা করিয়া পুনরায় ইশা খাঁর দমনের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন এবং সাহাবাজের সাহায্যার্থে সৈয়দ খাঁকে সাহাবাজের সহিত যোগদান করিতে অনুমতি করিলেন।

মোগল সম্রাটের এই আদেশ ইশা খাঁর কর্ণে পহুছিলে তিনি বন্ধু ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলবৃদ্ধি করিয়া লইলেন এবং সাহাবাজের আক্রমণ প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

পুনরায় লক্ষীয়ার তীরে মোগল সৈন্যের শিবির স্থাপিত হইল। পুনরায় লক্ষীয়ার শীতল জল উষ্ণ নর শোণিতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। প্রথম আক্রমণেই ইশা খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মোগল সেনা নায়কগণ চক্রান্ত মূলক প্রস্তাব বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না। ২১শে ফরওয়ার (পৌষ মাষ) মোগল সৈন্য নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ইশা খাঁর শিজিরপুরের দুর্গ অধিকার করিলেন। এই ঘটনার পর দিন রাজধানী সোণার গাঁ আক্রমণ করা হইল। ইশা খাঁ আপ্রাণ চেষ্টায় মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। সমস্ত দিন উভয় পক্ষের অসংখ্য কামান অগ্নি গোলা উদ্গিরণ করিল—সে দিন বিজয় লক্ষ্মী কাহারও গলে জয়মাল্য দান করিলেন না। এই সময় মোগল সেনা নায়ক অবগত হইলেন যে বিদ্রোহী মাছুম কাবুলী নৌকা পথে পলায়ন করিতেছে, অমনি তিনি তাহার একদল সৈন্য মাছুম কাবুলির পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় উভয় পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব হইল। মোগল পক্ষ ইশা খাঁকে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা করিতে সুযোগ প্রদান করিয়া মোগলবাহিনীকে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর রাজত্বের ত্রিংশৎ-বর্ষে) ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ কিচ্‌ফ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ইশা খাঁর রাজধানী সোণার গাঁ উপনীত হন। কিচ্‌ফ দেশের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন "এই প্রদেশের নায়ক ইশা খাঁ মি

* আবুলফজল যে স্থানেই মোগল সেনা নায়কের সম্মুখে ইশা খাঁকে দাঁড় করাইয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও দুর্বৃত্তি-সন্ধি-শত্রু বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাতে অনেক স্থলেই ইশা খাঁর প্রকৃত গৌরব ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন রহিয়াগিয়াছে। এই যুদ্ধ বর্ণনায় আবুলফজল মুক্তকণ্ঠে মোগল সেনাপতির লাঞ্ছনা ঘোষণা করিয়াছেন বটে কিন্তু ইশাখাঁর বীরত্বের প্রশংসা করিতে অধিক বাক্য ব্যয় করেন নাই। মোটকথা তাঁহার লিখন ভঙ্গি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই যুদ্ধ পূর্ব্বকার মগুয়ার খালী যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইয়াছিল।

ক্ষমতা ও তেজস্বীতায় অন্যান্য রাজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই স্থানে বহু সংখ্যক দ্বীপ ও নদ নদী বর্ত্তমান থাকায় অধিবাসী দিগের পলায়নের বিশেষ সুবিধা। বোধ হয় সেই কারণেই আজও এই স্থানের অধিবাসীগণ আকবর সাহের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহস করিতেছে। *

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিলেও যখন ইশা খাঁ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তখন সাহাবাজ খাঁ অনন্যোপায় হইলেন। এই সময় বিহারে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বাঙ্গালার মোগল শক্তি পদে পদে অযোগ্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া আকবর সাহ বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হইলেন এবং সাহাবাজকে প্রাণপণে বিদ্রোহী দমন করিতে বিশেষ আদেশ প্রদান করিলেন।

করিলে তাহারা সকলে মিলিয়া একযোগে দিল্লীর প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন।

এইবার ইশা খাঁ বুঝিলেন, অমিত বল মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় শক্তিক্ষয় না করিয়া ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করিলে সময়ে কার্য্যোদ্ধার হইবার অধিকতর সম্ভাবনা—সুচতুর আকবর সাহের মৃত্যুর পর সঞ্চিত শক্তির প্রয়োগ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ; অতএব তিনি আর মোগল রাজ্য আক্রমণ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোচরাজ্য গুলি অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময় ইশা খাঁ বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করেন। জঙ্গলবাড়ীর অধিপতি লক্ষ্মণ হাজরা ইশা খাঁর আক্রমণে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইশা খাঁ

ঈশা খাঁর পরিখা—জঙ্গলবাড়ী।

পর বৎসর ২০শে বামন (আকবরের মাস) সাহাবাজ খাঁ পুনরায় সসৈন্যে ভাটী যাত্রা করিলেন। ইশা খাঁ এবার সন্ধি সর্ত্ত স্বীকার করিয়া দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং সাদক খাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার পর ইশা খাঁ পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়ও ইশা খাঁর সহিত যোগদান করিলে তাহারা সকলে মিলিয়া একযোগে দিল্লীর প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন।

ক্রমে উত্তরে রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত সমগ্র কোচরাজ্য অধিকার করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উজানপথে "রাঙ্গামাটী" ও সেরপুরে দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ হাজরার রাজধানী হাজ্রাদিতে "জঙ্গলবাড়ী বা জঙ্গলপুরী" নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পরিখা বেষ্টিত করিলেন এবং সেই জঙ্গলপুরীতে পরিবার পরিজন রক্ষাকরতঃ মোগলের ভবিষ্যৎ আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দশ বৎসর এই ভাবে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

* প্রবোধিত "কিঞ্চে অমণকাহিনী" জাহ্নবী ১৩১৬।

* লক্ষ্মণ হাজোকে Gait সাহেব তাঁহার প্রণীত History of Assam গ্রন্থে রঘুদেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। History of Assam page 6t.

কেঁদো না, কেঁদো না তুমি স্থির কর মতি।
এসেছি করিতে আমি তব অব্যাহতি॥

[চিত্র—শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত ব্রতকথা হইতে গৃহীত]

শ্রীযুক্ত পীতাম্বরনাথ কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

ASUTOSH PRESS, DACCA.

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২১। { তৃতীয় সংখ্যা।

তিব্বত অভিযান।

(গিয়াংসী আক্রমণ।)

কয়েক সপ্তাহ আমরা গিয়াংসীতে বেশ আরামের সহিত কাটাইলাম। আমরা যে চারিদিকে শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি তাহা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জেনারেল সাহেব গিয়াংসী দুর্গ ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উহা কেন যে কার্য্যে পরিণত হইল না তাহা বলিতে পারিনা। আমরা যদি দুর্গের মধ্যে থাকিতাম তাহা হইলে উহা ধ্বংস না করিলেও চলিত। কিন্তু আমরা নদীর ধারে শিবিরের ভিতর বাস করিতেছিলাম বলিয়া দুর্গ খালি পড়িয়াছিল। এই সুবিধা পাইয়া তিব্বতীয়েরা ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে নানা প্রকার অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। ঐ কার্য্য এমন গোপনে হইতেছিল যে, আমরা উহার কোনও বাষ্প পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইহার কারণ ছিল।

সহরের লামা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদের সহিত বেশ খোলাখুলি ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই সাহেবদের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, নানাপ্রকার ফল, মূল ও অপরাপর খাদ্য দ্রব্য তাঁহাদিগকে উপহার দিতেন। গায় পড়িয়া দেশের অনেক কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। আমাদের সাহেব কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারা তিব্বতীয়দিগের এই ব্যবহারে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিলেন—তাঁহাদিগকে আমাদের বিশেষ বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। আমার কিন্তু প্রথম হইতেই তাঁহাদের আচরণ ভাল বলিয়া মনে হইত না। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ কথাটা সর্ব্বদা আমার মনে হইত। দুই একজন সাহেবকে আমার মনের ভাব জানাইয়া ছিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অধিকন্তু বলিলেন, "তোমরা ভারতবর্ষের লোক তোমাদের বড় সন্দিগ্ধ প্রকৃতি।" অগত্যা আমাকে নীরব হইতে হইল। ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে নানা সাহেব সাহেবদিগের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন করিতেন। সেই নানাই আবার তাঁহাদিগকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু আমার কথাই ঠিক হইল। শেষে জানিতে পারিলাম, লামারা যে সময়ে আমাদের নিকট আসিয়া পরম আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন সেই সময় গোপনে গোপনে তাঁহারা আমাদিগের সকলকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯এ এপ্রেল জেনারেল সাহেব চুম্বি ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ৩রা মে তারিখে আমাদের কিয়দংশ সৈন্য অন্যত্র প্রেরিত হইল। ঐ দিন সন্ধ্যার পর একজন দ্রুতগামী তিব্বতীয় অশ্বারোহী ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী সিগাংসী নামক স্থানে প্রেরিত হইল। এই কার্য্য খুব গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সংবাদটা আমাদের কর্ণ গোচর হইল। এই স্থানে বলা উচিত, সিগাংসী তিব্বতের এক প্রাদেশিক

রাজধানী; ঐ স্থানে একজন গভর্ণর বাস করেন। আমাদের গিয়াংসী অধিকারের পর ঐ স্থানে ক্রমে ক্রমে তিব্বতীয় সৈন্য সংগৃহীত হইতে ছিল। গিয়াংসীর অনেক লোক ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিল। ইহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল। আমাদের প্রায় তৃতীয়াংশ সৈন্য অন্যস্থানে চলিয়া যাওয়াতে গিয়াংসীর লামারা আমাদের সর্ব্বনাশের সুন্দর সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া সিগাংসীতে সংবাদ পাঠাইয়া দেন।

এই সংবাদ পাঠাইবার পর কর্ত্তাদের ভুল ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা লামাদিগের বিষয়ে ইতঃস্তত করিতে ছিলেন—গিয়াংসীর লামারা যে বিশ্বাসঘাতক, তাঁহারা যে এতদিন মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের আচরণ করিতে ছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্থির করিতে পারিতে ছিলেন না। কিন্তু লামারা নিজেরাই এ সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন। ৪ঠা মে হইতে তাঁহারা আমাদের শিবিরে যাওয়া আসা বন্ধ করিলেন। ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পর আমরা শুনিলাম, তিব্বতীয় সৈন্যেরা দলে দলে গিয়াংসীর দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সাহেবেরা কয়েকজন লামাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলেন না। সমস্ত সন্দেহ দূর হইল।

আমাদের কর্ণেল্ সাহেব গিয়াংসীর তিব্বতীয় গভর্ণরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র কর্ণেল্ সাহেব দুর্গের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি কিছুই জানেন না। কর্ণেল্ সাহেব বলিলেন, "আপনি জানেন না? ভাল কথা। কিন্তু কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাকে আমাদের অতিথি থাকিতে হইবে। যদি সত্য সত্যই আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়, তবে, আপনাকে আমাদের সৈন্য দলের সর্ব্বাগ্রে থাকিতে হইবে।" উত্তরে গভর্ণর বলিলেন, "তিব্বতীয়েরা যদি সত্য সত্যই আপনাদিগকে আক্রমণ করে, তবে তাহার জন্য আমাকে কেন দায়ী করিতেছেন? আপনারা আমাদের নিজের দেশে আমাদের বিনা আহ্বানে প্রবেশ করিয়াছেন। অপনারা কি মনে করেন, জন সাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছে? তাহারা যদি আপনাদিগকে আমক্রণ করে তবে তাহার জন্য আমাকে দায়ী না করিয়া নিজেকে দায়ী করা উচিত।"

সে দিবস রাত্রিটা আমরা বিশেষ শঙ্কিত ভাবে অতিবাহিত করিলাম। আমাদের সঙ্গে ঐ সময় বোধ হয় ২০০।২৫০ অধিক সৈন্য ছিল না তিব্বতীয় গভর্ণর মহাশয় আমাদের সহিত থাকাতে তিব্বতীয় সৈন্যেরা যে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে বিরত থাকিবে এমন আশা আমার ছিল না। আমরা তিনজন বাঙ্গালী প্রায় সমস্ত রাত্রি তাম্রকূট ধ্বংস করিতে করিতে এই সকল কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। রায় মহাশয় বেচারা মধ্যে মধ্যে এমন এক একটা কথা বলিতে লাগিলেন যে, হাসিব কি কাঁদিব তাহা বুঝিতে পারিতে ছিলাম না। একবার বলিলেন, "ভাই! গিন্নির বড় ইচ্ছেছিল একটি খোকা হয়। ভগবান দেখ্‌চি তাতে বাদ সাধ্‌লেন্।" অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া সেনজা বলিলেন, "আহা! কষ্টের কথা বটে। কিন্তু আজ কালত বিধবা বিবাহ চলিতেছে। গিন্নির যদি খুব সাধ থাকে, তবে সে সাধত অনায়াসে মিটাইতে পারেন।" বলা বাহুল্য রায় মহাশয় বড়ই চটিয়া গেলেন।

ভোরের সময় সামান্য তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা এক বিকট চীৎকারে আমাদের সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রায় মহাশয়, "ওইরে! লামারা এসেছে!" বলিয়া তাড়াতাড়ি লেপ সমেত একবারে সেন মহাশয়ের উপর আসিয়া পড়িলেন। তিনি অবশ্য এই প্রকার ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ঘর অন্ধকারময় ছিল বলিয়া ব্যাপারটা আমরা ভাল করিয়া কেহই বুঝিতে পারি নাই। সেন মহাশয় মনে করিলেন (পরে তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম) বুঝি কোনও তিব্বতীয় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি যথাসাধ্য সজোরে ধাক্কা দিয়া রায় মহাশয়কে ফেলিয়া দিলেন। বেচারা একটা জল পূর্ণ কলসের উপর যাইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য কলসটা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন রায় মহাশয়, ওরে বাবারে! আমায় ডুবিয়ে মারলেরে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন আমাদিগের কক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, তখন শুনিলাম বাহিরে "কী—হু—হু—উ—উ" শব্দ চারিদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বুঝিলাম, আমরা তিব্বতীয় সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। সঙ্গে ২ বহুতর বন্দুকের গভীর গর্জ্জন আরম্ভ হইল। আক্রমণের সংবাদ আমরা পূর্ব্বাহ্নেই পাইয়াছিলাম। তথাপি কেন জানি না আমাদের সিপাহীরা বিশেষ প্রস্তুত ছিল না। বোধ হয়, ঐ সংবাদের উপর কর্ত্তারা ততটা বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। এ পর্য্যন্ত তিব্বতীয়েরা নানা প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও গায় পড়া হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে নাই। এইজন্য বোধ হয় সেনাপতিরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমরা অনেকটা নিরাপদ ছিলাম। উহার দক্ষিণ দিকে ও সম্মুখে উন্মুক্ত ময়দান ছিল। এইজন্য এই দুই দিকে প্রায় ৫ ফুট উচ্চ প্রাচীর প্রস্তুত করান হইয়াছিল। তিব্বতীয়েরা এই দুইদিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

কমিসেরিয়েট আমাদের শিবিরের পশ্চাতে নদীর তটের নিকট অবস্থিত ছিল। আমরা তিনজন ঐ দিক-কার একটা তাঁবুর ভিতর অবস্থান করিতেছিলাম। যখন আমাদের ঘরের ভিতরকার গোলোযোগ নিবৃত্ত হইল, তখন আমি মনে করিলাম, আমরা উপস্থিত অনেকটা নিরাপদ আছি। কিন্তু অবিলম্বে আমি আমার ভ্রম

ইংরেজ শিবির—গিয়াংসী।

যাহা হউক, ইংরাজ পরিচালিত সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিক হইতে বিউগল্ বাজিয়া উঠিল—দুই তিন মিনিটের মধ্যে সিপাহী ও কর্ম্মচারীরা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, কাজগুলা যেন কোনও অদৃশ্য যাদুমন্ত্র বলে সম্পন্ন হইল।

এই স্থানে আমাদের শিবির-দুর্গের কিছু বর্ণনা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা ঠিক নদীর তীরে শিবির স্থাপিত করিয়াছিলাম। শিবিরের বাম দিকে খানিকটা বন্ধুর স্থান ছিল বলিয়া এই দুই দিক হইতে বুঝিতে পারিলাম। সহসা দুইটা গুলি আমাদের তাঁবু ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সকলে ক্যাম্প খাটের উপর বসিয়া ছিলাম। এই ঘটনায় আমরা সকলে তাড়াতাড়ি ভূমির উপর শয়ন করিলাম। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটা গুলি চলিয়া গেল। আমরা যদি বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলে আমাদের মধ্যে দুই একজন যে নিশ্চয়ই হত বা আহত হইতাম তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এই সময় দিবসের আলো চারিদিকে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের তাঁবুর মধ্যে আর গুলি

প্রবেশ করিল না বটে, কিন্তু আমরা স্থান ত্যাগ করিলাম না, সেইভাবে পড়িয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কাপ্তেন্ রাইভার্ আমাদের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থার কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, এবং কহিলেন, "আপনারা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। যাহা হউক, এখন আর আপনাদের কোনও ভয় নাই। তিব্বতীয়েরা নদীর দিক হইতে তাড়িত হইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এখন আমাদের অবস্থা কি রকম? সাহেব বলিলেন তিব্বতীয়েরা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দক্ষিণদিক ও সম্মুখের ভাগ অধিকার করিয়া আছে। তাহারা খুব চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু ভাল আড়ালে বসিয়া এই নূতন যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম। প্রথম আক্রমণের পর তিব্বতীয়েরা অনেকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। এবার তাহারা আমাদের গুলির লক্ষ্যের ভিতর আসিল না। অথচ তাহাদের গুলি আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের বন্দুক সকল লাসায় প্রস্তুত হয়, এবং উহার গুলি প্রায় ১২০০ গজ পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু আমাদের বন্দুকের গুলি সচরাচর ৪০০।৫০০ গজের অধিক দূর যাইতে পারে না। এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা বন্দুক চালান বন্ধ করিয়া দিলাম। তিব্বতীয়েরা এই ঘটনায় বোধ হয় বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারাও যুদ্ধ স্থগিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, কি ভাবিয়া বলিতে

খারো গিরি সঙ্কট

সেনাপতি না থাকাতে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বোধ হয় উহারা শীঘ্রই পলাইবে।

সাহেব চলিয়া গেলেন। ইহার অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তিব্বতীয়েরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। শুনিলাম, উহাদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন হত ও ১০০ জন আহত হইয়াছে। প্রায় ৪০।৪৫ জন বন্দী হইয়াছিল। আমাদের হতাহতের সংখ্যা খুব কম। ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিব্বতীয়েরা পুনরায় আসিয়া আক্রমণ করিল। এবার তাহারা শুধু দক্ষিণ দিক ও সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করিল বলিয়া আমরা তিনজন এক প্রকার নিরাপদ ছিলাম। আমি ও সেনমহাশয় কয়েকটা বড় বড় প্যাকিং কেসের পারি না, তাহারা ভীষণ রবে চীৎকার করিতে করিতে আমাদের প্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িল। আমাদের সিপাহীরা এ প্রকার ঘটনার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। তাহারা শত্রু পক্ষের উপর পুনঃ পুনঃ গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল। তিব্বতীয়েরা সে ভীষণ বেগ সহ্য করিতে পারিল না, চারিদিকে পলাইতে লাগিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবা মাত্র আমাদের অতিথি সেই তিব্বতীয় গভর্ণর কমিসেরিয়েটের এক নিভৃত তাঁবুর মধ্যে একখানা বড় লোহার কড়ার মধ্যে মস্তক রক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হইবার পর আমরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে আবিষ্কার

করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই ঘটনার পর তাঁহার নিতান্ত শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইল যে তাঁহার মত অপদার্থ কাপুরুষ কখনও অপরকে যুদ্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারেন না। বেলা এগারটার পর উক্ত গভর্ণরের স্ত্রী স্বামীর জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা সহরের অনেক কথা জানিতে পারিলাম। শুনিলাম, সিগাংসী হইতে প্রায় ৩০০ নূতন সৈন্য আসিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছে। আরও ২০০ লোক শীঘ্র আসিবে। তিব্বতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আত্মসমর্পণ

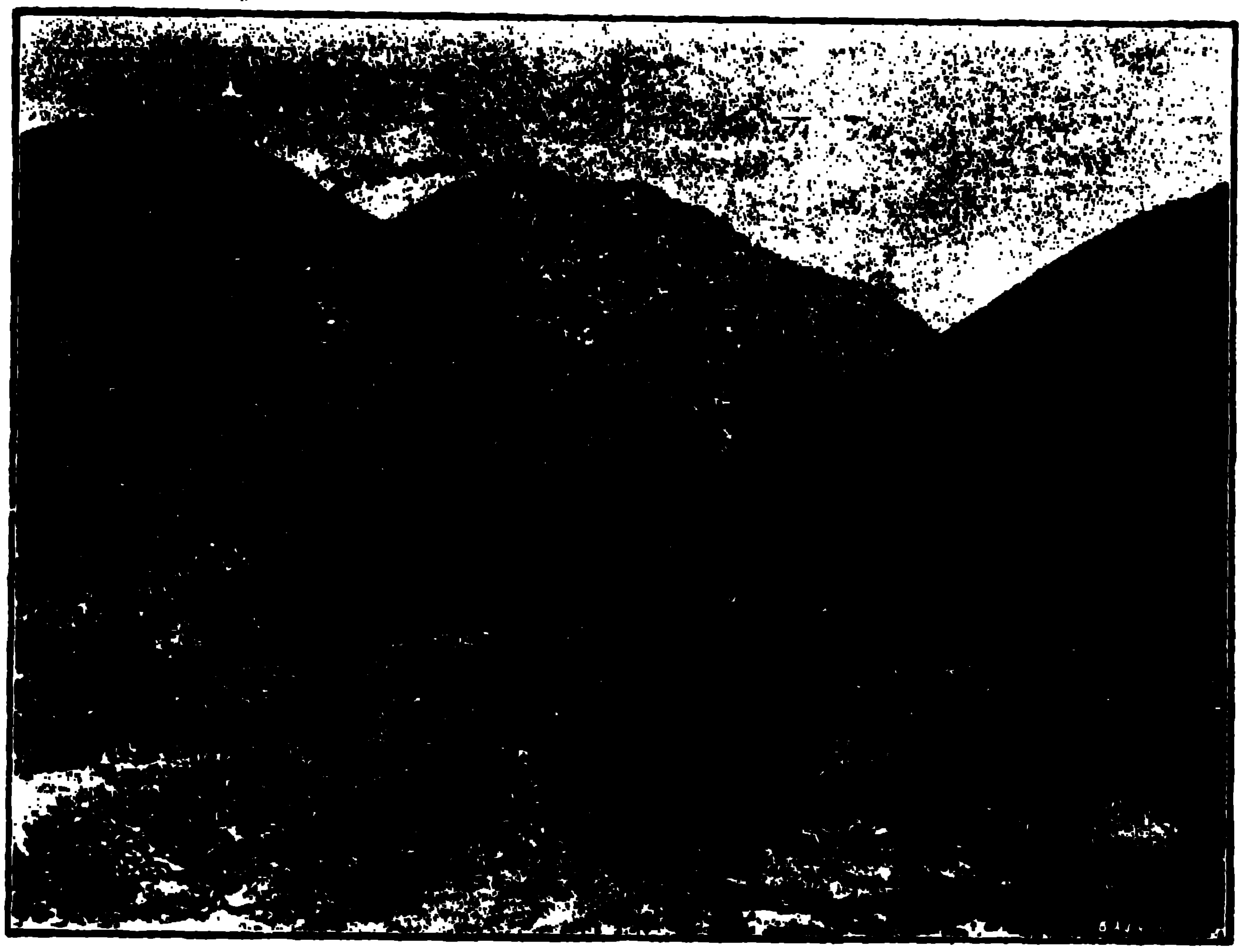

খায়ো গিরি সঙ্কটে ইংরেজ সৈন্যের অভিযান।

করিব, ততদিন তাহারা অবরোধ করিয়া থাকিবে। আমরা আত্মসমর্পণ করিলে তাহারা আমদিগকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বি দিগের উপযুক্ত সঙ্কল্প বটে!

আমাদের কাপ্তান্ পর্ (Captain Parr) সহরের ভিতর একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেন। ঐ স্থানে তিনি ও তাঁহার কয়েকটী ভারতবর্ষীয় ভৃত্য থাকিতেন। যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে সেনা-নিবাসে সাহেবদের একটা পার্টি ছিল। রাত্রি প্রায় একটার সময় উহা শেষ হওয়াতে পর্ সাহেব আর বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতেই কিন্তু তিনি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। জানিতে পারা গেল যে, যুদ্ধের দিন অতি প্রত্যূষে কয়েকজন তিব্বতীয় ঐ বাসার দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। প্রথমেই তাহারা সাহেবের সন্ধান করে। তাঁহাকে না পাইয়া হতভাগ্য ভৃত্যদিগকে পশুর মত হত্যা করে। তাহারপর সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়।

সেদিন সমস্ত দিন আমরা অবরুদ্ধ হইয়া রহিলাম। আমাদের অবস্থার কথা একবার স্থিরভাবে বিচার করিয়া রাত্রেও আমাদের সিপাহী ও কর্ম্মচারীরা বিশ্রামের খুব অল্পই অবসর পাইয়াছিলেন। প্রায় ২০০ সৈন্য ২০০০ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া বড় সহজ কথা নহে। পাঠক! দেখুন। সে সময় আমরা তিব্বতের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে ছিলাম। যদি হারিয়া যাই, তাহা হইলে তিব্বতীয়েরা আমাদিগকে পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে। আমরা যদি কোনও সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে থাকিতাম, তাহা হইলে বিশেষ ভাবনার কথা ছিল না। আমরা সকলে কাপড়ের তাঁবুর মধ্যে ছিলাম। উহার চারিদিককার অবস্থার কথা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি।

সমস্ত রাত্রিকাল আমরা জাগিয়া বসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তিব্বতীয়েরা আমাদিগকে কোনও প্রকারে বিরক্ত করিল না। রাত্রি প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না ছিল না বলিয়া আমরা তাহাদের কার্য্য কলাপ কিছুই দেখিতে পাইতে ছিলাম না। আমরা তিনজনে পূর্ব্বোক্ত তাঁবুর মধ্যে বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম। রায় মহাশয় বিশেষ চিন্তিত বলিয়া মনে হইল। পূর্ব্বরাত্রের উপহাসের পর অবধি তিনি সেন মহাশয়ের সহিত অদো-বাক্যালাপ করেন নাই। আমার সহিতও তিনি বিশেষ প্রাণ খুলিয়া কথা কহেন নাই।

প্রাতঃকালে উঠিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে বুঝিলাম যে, তিব্বতীয়েরা গত রাত্রি নিতান্ত আলস্যে অতিবাহিত করে নাই। আমাদের শিবির দুর্গের ঠিক সম্মুখস্থ প্রাচীরের মধ্যে তাহারা বহুতর ছিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহারা ঐ প্রাচীরের আড়ে বসিয়া বেশ নিরাপদের সহিত আমাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে পারে। এ যেন,

"তোর শিল তোরই নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।"

আমাদের নিজের প্রস্তুত প্রাচীর অবশেষে আমাদের অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রিকালে তাহারা কোনও প্রকার শব্দ না করিয়া তাহারা যে কি প্রকারে এতগুলি ছিদ্র করিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বলিতে ভুলিয়াছি যে, এই সময়ে আমাদের সঙ্গে একটাও তোপ ছিল না। আমাদের যে সৈন্য অন্যত্র প্রেরিত হইয়াছিল সমস্ত তোপ তাহারা লইয়া গিয়াছিল। যদি আমাদের সহিত একটাও তোপ থাকিত, তাহা হইলে ব্যাপার ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিব্বতীয় দিগের সহিত একটাও তোপ ছিল না।

ঐ দিবস আমরা শুনিলাম, যে রাত্রি দুইটার সময় তিব্বতীয়েরা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। কারণ, জ্যোতির্ব্বিদেরা নাকি বলিয়াছে যে আক্রমণের উহাই প্রশস্ত সময়। অবশ্য আমরা সকলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু কেহই আসিল না। এই ভাবে আরও দুই দিন অতিবাহিত হইল। ৯ই এপ্রেল আমাদের সৈন্যেরা ফিরিয়া আসিল। এক্ষণে ইহাদের কথা কিছু বলা আবশ্যক।

গিয়াংসী হইতে লাসা যাইবার পথে 'খারো গিরি শঙ্কট। আমরা শুনিয়াছিলাম, ঐ স্থানে ৩০০০ শত্রু সৈন্য একত্র হইয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে আমরা প্রায় ৪৫০ সিপাহী ঐ স্থানে প্রেরণ করিলাম। পরে শুনিলাম, উহাদিগকে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়েরা সুউচ্চ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিতি করিতেছিল। আমাদের সিপাহীরা উহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র উহারা অতি ভীষণ ভাবে গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে ঠিক ঐ সময় বরফ পড়া আরম্ভ হওয়াতে আমাদের কষ্ট যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু আমাদের গুর্খা সৈন্যেরা ঐ গুলি বা বরফকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া তিব্বতীয়দিগকে আক্রমণ করিল। ক্রমাগত প্রায় চারি ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর উহারা পলায়ণ করে। এই যুদ্ধে আমাদের অনেকে হতাহত হয়। কাপ্তেন বেথুন এই স্থানে হত হয়েন। তিব্বত অভিযানে এ প্রকার যুদ্ধ আর হয় নাই। ইহা "খারো যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ।

যাহা হউক, উক্ত সৈন্য ফিরিয়া আসিবার পর আমাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল না। কারণ, এই সময় আমরা প্রায় ৩৫০০ সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত ছিলাম। এতদ্ব্যতীত, প্রায় প্রত্যহই নূতন লোক আসিয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছিল। লামারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিল। বোধ হইতেছিল যে, অবিলম্বে সমস্ত দেশ আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। আমরা গরীব কেরাণী। আমাদের আর কোনও কাজ ছিল না। দিন রাত্রি আমরা তিন জনে এক স্থানে বসিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতাম। কি যে হইবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য ও ছিল না। আরও কিয়দ্দিবস অবরুদ্ধ থাকিলে আমাদিগকে যে অনাহারে থাকিতে হইবে তাহার কতক আভাস পাইতে ছিলাম।

জেনারেল সাহেব অবশ্য চুপ করিয়া ছিলেন না। প্রথমে তিনি আমাদিগকে কিছু খাদ্য দ্রব্য পাঠাইলেন। তাহার পর ২৪ এ মে ২০০ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল! এইবার আমাদে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। তাহাদের আসিবার কয়েক ঘণ্টার পর সমস্ত অবরোধ কারী সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। এই সময় আমি ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি যে, তিব্বতীয়েরা যে এমন যুদ্ধ করিতে পারে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ইহারা যদি রীতিমত শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে জগতের যে কোনও সৈন্য দলের সম্মুখীন হইতে পারে।

আমরা অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলাম বটে, কিন্তু

বিপদের গুরুত্ব অনেকটা বর্ত্তমান রহিল। গিয়াংসী দুর্গ এখনও তিব্বতীয়দিগের হস্তে। এতদ্ব্যতীত, পূর্ব্বোক্ত প্রধান মঠের মধ্যেও অনেক সৈন্য অবস্থান করিতে ছিল। ঐ উভয় স্থান কি প্রকার দুর্গম স্থানে অবস্থিত তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য আমরা উহা শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারিলাম না। সহরের অবস্থা ও খুব ভাল ছিল না। প্রত্যহ চারিদিক হইতে সৈন্য সকল আসিয়া উপস্থিত হইতে ছিল। এই জন্য আমরা কেহই আর সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতাম না। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ফাঁসীর কয়েদীর মত বাস করিতাম। প্রায় প্রতিদিন শিবিরের মধ্যে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হইত। সাহেবেরা প্রায় প্রতিদিনই নৃত্যগীত করিতেন। আমাদেরও কোনও দিন বৈঠকী গান, কোনও দিন রামায়ণ কথা, কোনও দিন ভাঁড়ের নাচ, রাত্রে প্রায়ই আমরা তিনজনে গোলাম চোর, ডাক বুরুজ প্রভৃতি খেলায় এগারটা বারটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতাম। বলা বাহুল্য, রায় মহাশয়ের সহিত পুনরায় আমরা শান্তি স্থাপন করিয়াছিলাম।

একদিন রাত্রে আমি ও সেন মহাশয় ছদ্ম বেশে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বাজারের জনৈক দোকানদার আমাদের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলে। তখন আমরা পলায়ণ করিতে বাধ্য হইলাম! কিন্তু পথ ভুলিয়া বিপদে পড়িয়া ছিলাম। একজন তিব্বতীয় রমণীর কৃপায় আমরা অবশেষে শিবিরে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হই। ইহার পর হইতে আমরা নিশা ভ্রমণ একবারে ত্যাগ করিলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

শ্রীবিক্রমপুর।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীবিক্রমপুরের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত সম্পৃক্ত। যখন বাঙ্গালা, বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয় নাই, যখন প্রাচ্যভারতের চক্রবর্ত্তীরা "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন, সেই গৌড়ীয় যুগেও শ্রীবিক্রমপুর ছিল। রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগদি, বঙ্গ ও মিথিলা ভাগের সময়েও শ্রীবিক্রমপুরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পরে রাঢ় বরেন্দ্রে পাঠান অধিকার স্থাপিত হইলে সেনবংশীয়েরা যখন লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপ্রদেশে আগমন করিলেন, তখনও শ্রীবিক্রমপুরের নাম বিলুপ্ত হয় নাই। "গর্গ যবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র' বিশ্বরূপ সেনও শ্রীবিক্রমপুরে স্কন্ধাবার সমাবাসিত করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের পরে আর কোনও রাজা শ্রীবিক্রমপুরে স্কন্ধাবারের সমাবাস করিয়া ছিলেন কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

পাল, সেন বর্ম্ম, খড়্গ ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ শ্রীবিক্রমপুরে স্কন্ধাবার সমাবাসিত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তাম্রশাসন পাঠে বুঝা যায়, শ্রীবিক্রমপুর প্রাচ্যপ্রদেশের একটি নগর ছিল। কিন্তু নগর হইলেও উহা যে রাজধানী ছিলনা, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে বিশেষ কারণ আছে। পাল-সেন-বর্ম্ম-খড়্গ-চন্দ্র নৃপতিরা কেন শ্রীবিক্রমপুরে আসিয়া ভূমিদান করিতেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। রাজধানীতে থাকিয়া দান ক্রিয়াই স্বাভাবিক; এই জন্য বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরকে ভূমিদাতা রাজগণের রাজধানী বলিতে চাহেন। কিন্তু যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে শ্রীবিক্রমপুর কোন কালে রাজধানী ছিল, একথা বলিতে পারা যায় না। পালবংশীয়দিগের দুইটি রাজধানীর কথা আমরা জানিতে পরি—একটী গৌড়, অপরটী রামাবতী। পালবংশের প্রসিদ্ধ রাজা শ্রীমান্ রামপাল দেব স্বনামে এই নূতন রাজধানী—রামাবতীর প্রতিষ্ঠা করেন। তদীয় পুত্র মদন পাল দেব—'শ্রীরামাবতী নগর পরিসর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ' কিছু ভূমি 'চম্পহিট্টী বাস্তব্যায় ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামি শর্ম্মাণ' দান করিয়া ছিলেন।

সেন রাজগণের তিনটি রাজধানীর কথা নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যায়। সে তিনটি রাজধানী—বিজয়পুর, গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী। বিজয়পুর বিজয় সেনের রাজধানী; বল্লালসেনের রাজধানী গৌড়। লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে লক্ষ্মণাবতী নগরীর

প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্রে পাঠান অধিকার হইলে, সেন বংশীয়েরা তৎকালীন বঙ্গে আগমন করেন। তখন তাঁহাদের রাজধানী সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে (মহেশ্বরদি বা ভাওয়ালের টেঙ্গর প্রদেশের কোনও স্থানে) স্থাপিত হয়। সেন রাজগণের এই নূতন রাজধানীর অবস্থিতি স্থান অসংশয়িত ভাবে নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ এক ভাঙ্গা দুর্গকে সেন রাজগণের এই নূতন রাজ-ধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পাল ও সেন রাজগণের তাম্রশাসন পাঠে ইহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি হয় যে শ্রীবিক্রমপুর উহাদের রাজধানী ছিল না।

পূর্ব্বপ্রদেশে আগমন করিয়া পাল ও সেন রাজারা শ্রীবিক্রমপুরে জয়স্কন্ধাবারের সমাবাস করিতেন, ইহার অধিক কোন কথা তাম্রশাসন হইতে জানা যায় না। বর্ম্ম ও খড়্গ বংশীয় দিগের রাজধানী কোথায় ছিল, যদিও তাহা এপর্য্যন্ত অসংশয়িত রূপে নির্ণীত হয় নাই, তথাপি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, বর্ম্ম ও খড়্গ বংশীয় দিগের রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুর নগরে ছিল, এরূপ বলিবার কোন সামান্য হেতুও এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাল ও সেন বংশীয় দিগের ন্যায় বর্ম্ম ও খড়্গ বংশীয় নৃপতিরা ও শ্রীবিক্রমপুরের স্কন্ধাবার সমা-বাসিত করিয়া ভূমিদান করিয়াছেন তাঁহাদের তাম্র-শাসনেও 'শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারাৎ' ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই।

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে 'শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ' লিখিত হইয়াছে। শ্রীবিক্রমপুর, রাজধানী হইলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বলিয়া উহার পরিচয় দিবার কোনই প্রয়োজন হইতনা। রাজধানী স্বনামেই পরিচিত। অন্য স্থানই রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বা অন্তঃপাতী বলিয়া পরি-চিত হইয়া থাক। এই তাম্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে শ্রীবিক্রমপুর সেন রাজগণের শেষ সময়েও রাজধানী ছিলনা উহা একটি নগর মাত্র ছিল; সেই নগরটি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃর্গত ছিল।

নাম সাদৃশ্য হেতু বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণাটিকে প্রাচীন বিক্রমপুর (শ্রীবিক্রমপুর) বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁদের বিশ্বাসের মধ্যে দুইটী প্রধান ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি—প্রাচীন বিক্রমপুর বা শ্রীবিক্রমপুর একটি নগর বা বড় একখানি গ্রাম ছিল, বর্ত্তমান বিক্রমপুর একটী পরগণা; এই পরগণায় বিক্রমপুর নামে কোনও গ্রাম নাই, কখনও যে ছিল, এমনও কেহ বলিতে পারে না। গ্রাম বা নগর বিক্রমপুরকে, একটী পরগণা বা প্রদেশ বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা প্রাচীন বিক্রমপুর বা শ্রীবিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশের অন্তর্গত ছিল; বিক্রমপুর পরগণা চিরদিনই সমতট বা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্, এমন কি বিক্রমপুর ও ঢাকার ইতিহাস প্রণেতারাও বিক্রমপুর পরগণাকে সমতট বা বঙ্গের অন্তর্গত ভিন্ন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত বলেন নাই। ব্রহ্মপুত্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির পূর্ব্বসীমায় এবং বুড়ীগঙ্গা দক্ষিণ সীমায় ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ঢাকা নগর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির দক্ষিণ দিকের শেষ জন স্থান। বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণ তীর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থান সমতট নামে কথিত হইত। সমতটের অন্তর্গত কোনও স্থানে—প্রদেশ বা পরগণাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশের কোনও নগর বা গ্রাম বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

বিক্রমপুর নামে কোনও গ্রাম বা নগর এ পরগণায় না থাকিলেও সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামের সমষ্টির নাম মোগল রাজত্বে বিক্রমপুর পরগণা কেন হইল, ইহা একটি প্রশ্ন বটে। আমরা প্রাচীন বিক্রমপুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে ইহাই অনুমিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বিক্রমপুর, কাম্বোজাক্রমণে বিধ্বস্ত হইলে, উহার অধিবাসীগণ দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়া যাইয়া এক সাগর-শাখা বা বিল বেষ্টিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং আপনাদের পূর্ব্ব নিবাস-স্থানের নামেই নূতন বাস ভূমির পরিচয় দিতে থাকেন। পুরাতন বিক্রমপুর বাসীদিগের এই নবাধ্যুষিত গ্রাম গুলির নাম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও সকল গ্রাম নিবাসীরাই আপনাদিগকে বিক্রমপুরবাসী বলিতেন।

এইজন্য উত্তর কালে পরগণা বিভাগের সময় চুড়াইন বিল, আড়িয়ল বিল, বিল দাউনিয়া প্রভৃতি বিল ব্যবহিত গ্রাম সমূহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি বিক্রমপুর পরগণা নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এখনও দেখা যায়, কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম নদীস্রোতে ভাসিয়া গেলে তাহার অধিবাসীগণ যে স্থানে যাইয়া বাস করেন, উহা কোনও প্রসিদ্ধ স্থান না হইলে এই নূতন অধিবাসীরা আপনাদের পূর্ব্ব বাস স্থানের নামেই এই নূতন বাস ভূমির নাম করণ করিয়া লয়। পুরাতন বিক্রমপুরের অধিবাসীগণও তাহাই করিয়া ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কালে লোকে প্রাচীন বিক্রমপুর বা শ্রীবিক্রমপুরের কথা বিস্মৃত হইয়া এই নবাধ্যুষিত স্থানকেই পাল সেন-বর্ম্ম খড়্গ-চন্দ্র রাজাগণের স্কন্ধাবারের সমাবাস ভূমি বলিয়া মনে করিয়াছে ; এবং উহারই মধ্যে প্রাচীন ঘটনার (আদিশূরের যজ্ঞ ক্ষেত্র, বল্লালসেনের বাড়ী প্রভৃতির) স্থান নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সামঞ্জস্য প্রিয় কল্পনাপের মানব প্রকৃতির এইরূপ ব্যবহার অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কল্পিত হইলেও বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সুন্দরের সুড়ঙ্গ, নাগরীর হাট, প্রভৃতির স্থান দেখাইয়া দেয়। মনসার পাঁচালী রচয়িতাদিগের বর্ণনায় বঙ্গের বহু প্রদেশেই চাঁদ সওদাগরের বাড়ী, উজানী ও নেতা ধোবানীর বস্ত্র প্রক্ষালনের প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুর পরগণাতেও এই কারণেই আদিশূর ও বল্লালসেনের রাজধানী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, পুরাতন ও প্রসিদ্ধ স্থান—রামপাল। নাম মাত্রেই বুঝা যায় যে, উহা পালবংশীয় সেন নৃপতি বা ভৌমিকের স্থাপিত। শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বল্লাল কাটায় দীঘী নামে রামপাল" বল্লাল দীঘী কাটাইলেন কিন্তু দীঘীটার নাম হইল রামপাল। আর সেই রামপাল হইতেই গ্রামটির নাম—যাহা বল্লালের রাজধানী তাহার নাম—লোকে ভুলিয়া গিয়া "রামপাল" বলিতে আরম্ভ করিল। এ 'কারিকা' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমূল্য চিন্তাপ্রসূ সমূহের মত, ঐতিহাসিক সমাজে সাদরে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অয়েন্দ্রীর প্রসিদ্ধ পাল নৃপতি রামপাল দেবের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে দেখিয়া অনুমিত হয়, রামপাল স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন সামন্ত নৃপতি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। পালবংশীয় অধিকাংশ নৃপতি ও ভৌমিক "পরম সৌগত" ছিলেন। রামপালের প্রতিষ্ঠা হইতেই বিক্রমপুর পরগণায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়। বজ্রযোগিনী গ্রামে সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। ইহা খুবই সম্ভব। বজ্রযোগিনী নাম হইতেই বুঝা যায় এ গ্রাম বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের স্থাপিত। চন্দ্র দ্বীপের অধিপতি "পরম সৌগত" শ্রীচন্দ্রদেবের সময়ে চন্দ্রদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার ও বিহার স্থাপিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব, শ্রীচন্দ্রদেব, আধুনিক বিক্রমপুর পরগণারও অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সময়েই বিক্রমপুর পরগণায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার ও উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু বজ্রযোগিনীতে সঙ্ঘারাম অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারের নিদর্শন স্বরূপ বুদ্ধ বা বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, উহা, বিক্রমপুর পরগণাকে শ্রীবিক্রমপুর নগর বলিয়া নির্ণয় করিবার কোনও দুর্ব্বল হেতুও হইয়া দাঁড়ায় না।

আদিশূর বিক্রমপুর পরগণার রামপালে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে গজারি গাছটিকে জড়াইয়া যে উপকথা প্রচলিত আছে, ঘটক কারিকা সেই উপকথার রস ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। ঘটক কারিকায় স্পষ্টতঃ লিখিত হইয়াছে ঃ—

সকল গুণ সমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠা
হুতবহ সমভাসাঃ ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ
নিজ পরিবার বর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং বাপ্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং ॥

সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ গঙ্গাম্বুবিধৌত পাপমুক্ত পবিত্র গৌড় নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। তখন গঙ্গা, গৌড় নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। ব্রাহ্মণ পঞ্চক গঙ্গাহীন দেশে আসেন নাই। যাঁহারা রামপালকে আদিশূরের যজ্ঞ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা— সুরসরিদবধৌতং বাপ্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং ॥ এই শ্লোকার্থ

লোকেরও একটা কষ্ট কল্পিত কূটার্থ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সুরসরিৎ—গঙ্গানদী। পদ্মা যখন গঙ্গারই এক শাখা—বিশেষতঃ প্রধান শাখা, তখন সুরসরিৎ বলিতে পদ্মাকেই বুঝাইতে পারে। আবার পদ্মা যখন বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তখন "সুরসরিদ্বধৌত" বলিতে বিক্রমপুর পরগণাকে না বুঝাইবে কেন? বিক্রমপুর 'সুরসরিদ্বধৌত' হইলে তদন্তর্গত রামপালও অবশ্যই সুরসরিদ্বধৌত। তাহার পরে রহিল গৌড়, বিক্রমপুর যে গৌড় তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা গৌড় বলিতে যেমন গৌড় নগরকে বুঝায় তেমনই গৌড় রাজ্যকেও বুঝায়। বিক্রমপুর যখন গৌড় দেশের মধ্যে অবস্থিত তখন বিক্রমপুরে আসিলেই গৌড়ে আসা হয়। সুতরাং "সুরসরিদ্বধৌত গৌড়"—রামপাল। বলা বাহুল্য টোলে এরূপ অর্থ নির্ণয়ের অভিনয় চলিলেও ইতিহাসের সত্য নির্ণয়ে উহা একবারেই উপহসনীয়।

আদিশূর, পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা আদিশূরকে রামপালের রাজা বলিতে চাহেন তাঁহারা পঞ্চসার বা পাঁচগাওকে আদিশূর দত্ত গ্রাম-পঞ্চক বলিয়া নির্দেশ করেন। এস্থলে পঞ্চের সহিত পঞ্চ বা পাঁচের মিল ব্যতীত তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অপর কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চে পঞ্চ মিলাইয়া উত্তম যমক অলঙ্কার হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা কাব্যে শোভনীয় হইলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

প্রকৃতপক্ষে আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে যে পাঁচ খানি গ্রাম দান করেন উহা গৌড় উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। এড়ু মিশ্র লিখিয়াছেন :—

"ভাগ্নাসীর বিশিষ্ট পঞ্চ নগরং
তেভ্যো দদৌ গৌড়তঃ।"

আদিশূর যে পাঁচ খানি গ্রাম দান করেন উহাদের নাম :—

"কামটি, ব্রহ্মপুরীচ, হরিকোটস্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এবাং স্থানানি পঞ্চচ।"

হরিমিশ্রের ঘটক কারিকা।

যদি আদিশূর রাম পালের রাজা হইতেন, তাহা হইলে কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণের আদিবাস বিক্রমপুর পরগণার মধ্যেই হওয়া সম্ভব ছিল। সেরূপ হইলে ব্রাহ্মণ সমাজে রাঢ়ী বারেন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজ বা বঙ্গীয় বলিয়া একটা শ্রেণী হইত। কায়স্থদিগের একটা সমাজ পূর্ব্বকালে বঙ্গে (চন্দ্র দ্বীপে) স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া কায়স্থ সমাজে তিন শ্রেণী—রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বঙ্গজ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বঙ্গজ বা বঙ্গীয় শ্রেণী নাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম হইতেই বুঝা যায়, আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সন্তানগণ রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের গাঞী বা গ্রামিণ নাম যে যে গ্রামে বাস নিবন্ধন হইয়াছিল, সেই ১৫৬ একশত ছাপ্পান্ন গ্রামের একটিও বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত নহে। সমস্তই রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমে অবস্থিত। ইহা হইতে বুঝা যায় রাঢ়ী বারেন্দ্র ত্যাগ এবং গাঞী বা গাঁইরা (গ্রামিণ) নাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ সন্তান দিগের কেহ বিক্রমপুরে আসেন নাই। কালে রাঢ় ও বরেন্দ্রে মুসলমানাধিকার হইলে সেনরাজগণের প্রাচ্য প্রদেশে বা বঙ্গে আগমণের সঙ্গে সঙ্গে কনোজাগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তান রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ সুবর্ণ গ্রাম, বিক্রমপুর, মহেশ্বরদী প্রভৃতি স্থানে আগমন করেন। ইহার পরে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীপুর-রাজ কেদার রায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে সাড়ে তিন ঘর কুলীন কায়স্থ স্থাপিত এবং সুসমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজ স্থাপিত হয়। বলিতে গেলে কেদার রায়ই বিক্রমপুর পরগণার ঐতিহাসিক বা অভিনব গৌরবের মূল। বিক্রমপুর পরগণা যে প্রাচীন বিক্রমপুর নহে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম। শ্রীবিক্রমপুরের অবস্থান সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কোষ্ঠী।

৺ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনের অনেক কথাই সৌরভে প্রকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। তাই তাঁহার জন্ম পত্রিকার সামান্য আলোচনা আজ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ১০।১২ বৎসর হইল, আমার বন্ধু সেরপুর নিবাসী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিবেশী এবং তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ভাজন ৺ তারিণী চরণ মৈত্র মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অভিপ্রায় মতে তাঁহার জন্ম কুণ্ডলী লইয়া আমার নিকট ফলাফলের কথা জানাইতে লিখেন। আমি জন্ম কুণ্ডলী পাইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে লিখিলাম 'মহাশয়ের প্রেরিত জন্ম কুণ্ডলীতে আমার লগ্ন সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হইতেছে, যদি আপনার কোষ্ঠী হইতে গ্রহস্ফুটগুলি লিখিয়া পাঠান তবে আমি লগ্ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। আর প্রেরিত জন্ম কুণ্ডলীতে পত্নী স্থানের নিতান্ত অশুভ ফল বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া পত্নী স্থানের ফলটা জানাইলেও লগ্ন সম্বন্ধে সংশয় দূর হইবে।" আমার পত্রের উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিলেন। "আপনি আমার কোষ্ঠীর লগ্ন সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না। আমি শুনিয়াছি আমার জন্ম সময়ে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ উপস্থিত ছিলেন সুতরাং লগ্ন সম্বন্ধে কোন গোল হয় নাই। পত্নী স্থান সম্বন্ধে মহাশয় যে সন্দেহ করিয়াছেন তাহা যথার্থ। বলা বাহুল্য আমি ৫টী বিবাহ করিয়াছি একটীও জীবিত নাই। আমার কোষ্ঠী কলিকাতায় আছে সুতরাং গ্রহস্ফুট দিতে পারিলাম না।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্র পাইয়া আমার উৎসাহ আরো বর্দ্ধিত হইল। ভারত বিখ্যাত এতবড় একটা লোকের কোষ্ঠী সমালোচনা করা আমার মত নগণ্য জ্যোতিষ আলোচনা কারীর পক্ষে 'অসম সাহসিকতা' বৈ আর কি? যাহউক আমি তাঁহার জন্ম কুণ্ডলী দ্বারা নূতন কোষ্ঠী তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহু পরিশ্রমে ৯টী গ্রহস্ফুট ১২টী ভাবস্ফুট ১২টী সন্ধি স্ফুট সাধন করিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম ১২টী ভাবের সেইরূপ সমালোচনা তাঁহার নিকট পাঠাইলাম। তাঁহার কোষ্ঠীর সমালোচনা পাইয়া আমাকে তিনি যে কত আশীর্ব্বাদ কত বিনয় পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন, সেপত্র গুলি আমি খুঁজিয়া পাইতেছিনা, পাইলে সৌরভে এই সঙ্গে প্রকাশ করিতাম। যাহা হউক সৌরভের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম পত্রিকার সামান্য আলোচনা নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কোষ্ঠী।

১৭৫৮।৬।১৮।২৬।৩৭।১২ বিপলে জন্ম ১৭৫৮ শকাব্দার কার্ত্তিক মাসের ১৯শে তারিখ দিবা ২৬।৩৭।১২ বিপলের সময় জন্ম।

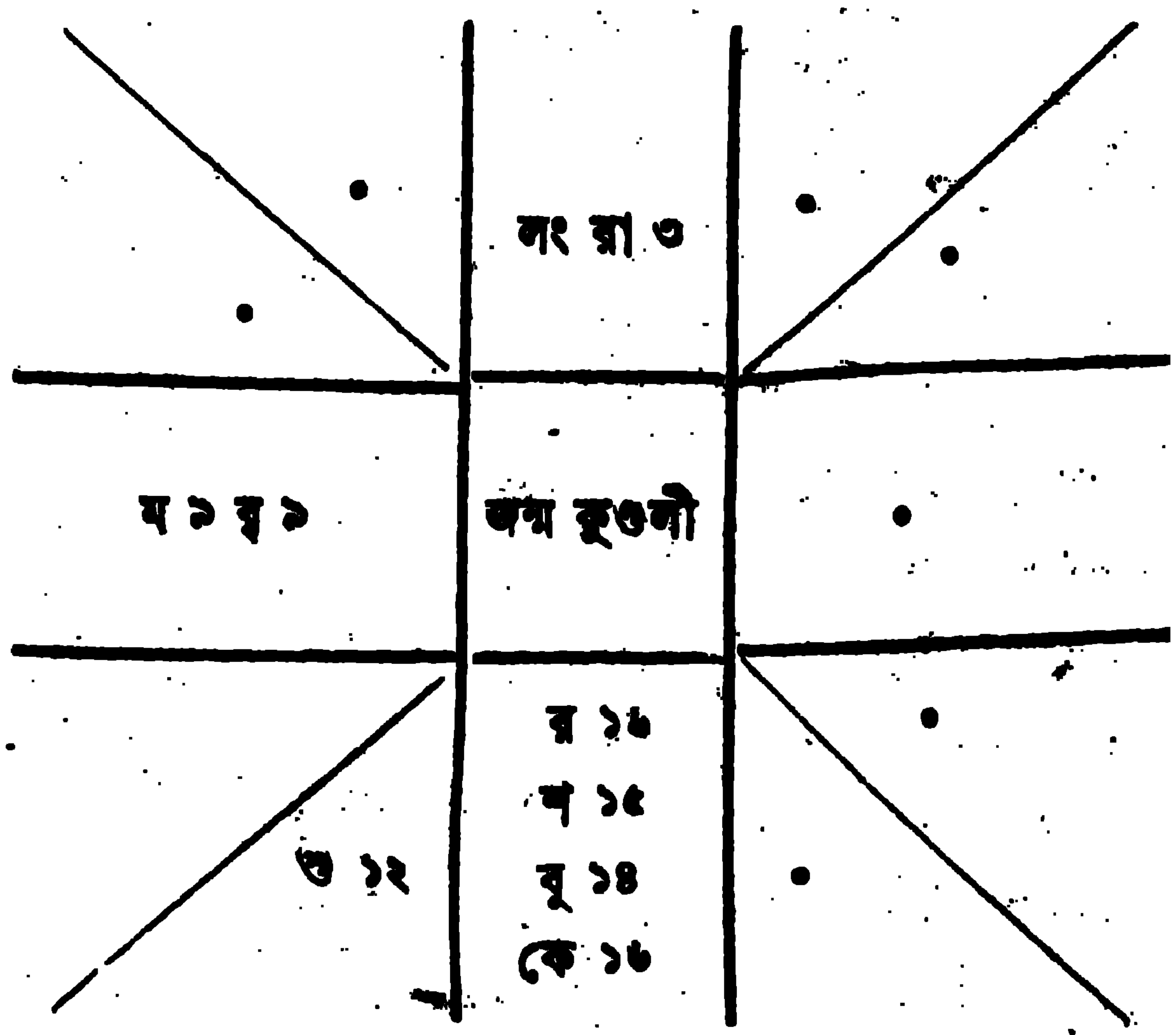

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম কুণ্ডলীতে. প্রথমতঃ লগ্ন স্থানের বিচার করিতে গেলে লগ্নপতি নীচস্থ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু লগ্নে সমুদায় গ্রহের দৃষ্টি থাকায় এবং মেষলগ্নে রাহু অবস্থান থাকায় দীর্ঘায়ু যোগ হইয়াছিল— লগ্নে সমুদায় গ্রহের দৃষ্টি ফল যথা—

বিলোকিতে সর্ব্ব খগৈ র্বিলগ্নে
লীলা বিলাসৈ সহিতো বলীয়ান্।
কুলে নৃপালো বিপুলায়ুরেব
ভাগ্যেন যুক্তোঽরিকুলস্য হন্তা।

ইহার ভাবার্থ এই যদি লগ্নে সর্ব্বগ্রহের দৃষ্টি থাকে

তবে জাতক দীর্ঘায়ু, বলবান, ভাগ্যবান হয়। আর রাহু অবস্থান দ্বারা সকল রিষ্ট নাশ হয়।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যে গুণে ভারত বিখ্যাত এই কোষ্ঠীতে সেই বিদ্যা এবং যশের যোগ সমুদায় আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। জন্ম কুণ্ডলীর ৫ম স্থানে বিদ্যা, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, সন্তান অপত্যাদির শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। পারিজাত গ্রহ মতে চতুর্থ স্থানে বিদ্যার শুভাশুভ দেখিতে হয়। এই কোষ্ঠীতে ভাগ্যপতি বৃহস্পতি উচ্চস্থ হইয়া লগ্নপতি মঙ্গলের সহিত চতুর্থস্থানে আছেন। "কর্কট রাশি বৃহস্পতির উচ্চস্থান, খনা বলিয়াছেন "কর্কটে জীবা বেদবাখানে না পড়ে শিশু আখর চিনে' একে কর্কটস্থ বৃহস্পতি তাহাতে মঙ্গলের যোগ হইয়া সোণায় সোহাগা হইয়াছে।

যত্রতত্র স্থিতো ভৌমো গুরুনা সহিতো যদি।
সর্ব্বদা ফল মাপ্নোতি স্বাত্নচ্চে ত্রিগুণং ফলং॥

এই কোষ্ঠীর ৪র্থ পতি চন্দ্র ৫ম স্থানে অবস্থান করিয়া ৫ম স্থানের শুভ ফল দিতেছেন। আর এই কোষ্ঠীর গ্রহগণের যোগজ ফল দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। যেমন বিষেবিষে অমৃত উৎপন্ন হয় আবার মধু ঘৃতেও বিষ হয়, গ্রহ দিগের যোগজ ফল দ্বারাও জাতকের সেইরূপ শুভাশুভ ফল হয়। এই কোষ্ঠীতে রবি, মঙ্গল, শুক্র, এই তিনটী গ্রহ নীচস্থ বৃহস্পতি ও শনি উচ্চস্থ। নীচস্থ গ্রহ দ্বারা কি শুভ যোগ হইয়াছে পাঠ করুন।

চেৎ খেচরো নীচ গৃহং প্রযাত তদীশর স্তাপিতহুচ্চ নাথঃ।
কেন্দ্রে স্থিতৌ তৌ ভবতঃ প্রসূতৌ প্রকীর্ত্তি তৌ ভূপতি সম্ভবায়॥

জন্মকালে যদি কোন গ্রহ নীচ গৃহ গত হয় এবং সেই নীচগত গ্রহের অবস্থিতি স্থানের অধিপতি ও সেই স্থানের উচ্চাধিপতি (৭ ম গৃহের অধিপতি) এই উভয়েই যদি কেন্দ্রে থাকে তবে সেই জাতক রাজা হয়। এই কোষ্ঠীতে শুক্র নীচস্থ কন্যারাশিতে আছেন, কন্যা রাশির অধিপতি বুধ ৭ম কেন্দ্রে আছেন, আর কন্যার ৭ম রাশির অধিপতি [illegible] কেন্দ্রে আছেন ইহা দ্বারা প্রবল রাজ যোগ হইয়াছে। প্রাচীনগণ রাজ যোগ বলিতে কেবল রাজা মহারাজা হওয়া মনে করিবেন না। বিশেষ সৌভাগ্য যোগগুলিকেই রাজ যোগ মনে করিবেন ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ। এই কোষ্ঠীতে রাজযোগ বা বিশেষ সৌভাগ্য যোগ আরো অনেক আছে। কেন্দ্র কোণ পতি সম্বন্ধ যোগ হইয়াছে। ৫ম কোণ পতি রবি ১০ ম কেন্দ্রে পতি শনির সহিত সহাবস্থান সম্বন্ধে যোগকারক হইয়াছেন।

পুত্র পিতৃ পতী চৈষাং প্রবলো রাজ কার কৌ।
অথ কাপি স্থিতৌ চাপি সম্বন্ধেচ চতুষ্টয়ে॥

এই কোষ্ঠীতে ক্ষেত্র সিংহাসন যোগ হইয়াছে।

দশম ভবন নাথঃ কেন্দ্র কোণে ধনে বা।
বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্র সিংহাসনে বা॥
স ভবতি নর নাথো বিশ্ব বিখ্যাত কীর্ত্তিঃ।
মদগলিত কপোলৈঃ সদ্‌গজৈঃ সেব্যমানঃ॥

ইহার ভাবার্থ এই যদি দশমাধিপতি গ্রহ কেন্দ্রে, কোণে কি ধনস্থানে কি স্বক্ষেত্রে বলবান হইয়া অবস্থান করেন তবে ক্ষেত্র সিংহাসন যোগ হয় ক্ষেত্র সিংহাসন যোগে জাত ব্যক্তি বিশ্ব-বিখ্যাত-কীর্ত্তি হয় ইত্যাদি।

এই কোষ্ঠীর শনি দশমাধিপতি, ৭ ম কেন্দ্রে উচ্চস্থ হইয়া অবস্থান করাতে বলবান ক্ষেত্র সিংহাসন যোগ হইয়াছে। এই কোষ্ঠীর ১২শ ভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ রূপে করিতে হইলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হয় বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিধন স্থানের সামান্য আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তর্কালঙ্কার মহাশয় দীর্ঘায়ু যোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

মন্দেনবা চিন্ত্য বিশেষ মায়ুঃ।
স্বক্ষেত্র মিত্রোচ্চ গৃহ স্থিতেন।
কর্ম্মে শ্বরেণাপি বিচিন্ত্য মায়ু
দীর্ঘং সুহৃৎ স্বোচ্চযুতেন তেন॥

ইহার ভাবার্থ এই শনি বা কর্ম্মপতি (১০ মপতি) স্বক্ষেত্রে, মিত্র ক্ষেত্রে কি উচ্চস্থ থাকিলে জাতক দীর্ঘায়ু হয়। এই কোষ্ঠীর শনি কর্ম্মপতি এবং উচ্চস্থ হইয়াছেন এই জন্য দীর্ঘায়ু যোগ হইয়াছে। আর—

অল্লায়ু দিননাথক শক্রমাধিপোযদি।
সমষে মধ্যমায়ুঃ স্যান্মিত্রে দীর্ঘায়ুরাদিশেৎ॥

ইহার ভাবার্থ এই লগ্নপতি যদি রবির শত্রু হয় তবে অল্পায়ু সম হইলে মধ্যায়ু আর মিত্র হইলে দীর্ঘায়ু হয়। এই কোষ্ঠীর লগ্ন পতি মঙ্গল রবির নৈসর্গিক মিত্র এবং তাৎকালিক অধি মিত্র, সুতরাং দীর্ঘায়ু যোগ হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার আয়ু কত এবং কোন স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইবে? আমি তাঁহার লিখিত মত যোগজায়ু ৭৪ বর্ষ এবং পরাশরোক্ত স্ফুটায়ু ৮১ বর্ষ কয় মাস লিখিয়া ছিলাম এরূপ মনে হয়। স্ফুটায়ু সাধনে বোধ হয় কোন স্থানে আমার ভুল হইয়াছিল গতিকেই স্ফুটায়ু ভোগ তাঁহার হয় নাই।

লগ্নে কেন্দ্রে শশি সুতে কোণে চন্দ্রে শুভেশনৌ।
জাতস্তু বেদ মুনিভির্ব্বর্ষৈঃ ক্লিশ্য ত্যতঃ সুখম্॥

ইহার ভাবার্থ এই লগ্নে কি কেন্দ্রে যদি বুধ থাকেন, ৫ মে কি ৯ মে যদি চন্দ্র থাকেন, আর শনি যদি শুভ ভাবাধিপতি কি শুভ রাশিতে থাকেন, তবে জাতকের ৭৪ বর্ষ আয়ু হয়।

এই কোষ্ঠীতে বুধ ৭ম কেন্দ্রে আছেন, চন্দ্র ৫ম কোণে আছেন শনি ১০ম ভাবাধিপতি হইয়া ৭ম কেন্দ্রে উচ্চস্থ আছেন। এই যোগজ আয়ুটি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রায় সম্পূর্ণই হইয়াছিল। বোধহয় তিনি ৭৩ বর্ষ কয়েক মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তীর্থমৃত্যু যোগ গুলি সুন্দর ছিল।

পুণ্যাধিপঃ পুণ্যাহেব কেন্দ্রে চন্দ্র প্রভা যোগ ইহ প্রণীতঃ।
রাজাধিরাজো গুণবান্ বিলাসী গঙ্গাজলে মুক্তি জীবনঞ্চ॥

এই কোষ্ঠীর ৯ম অধিপতি গুরু ৪র্থ কেন্দ্রে অবস্থান দ্বারা চন্দ্র প্রভা যোগ হইয়াছে।

নিধনং গুরুণা যুক্তং গুরুনা দৃশ্যতেঽথবা।
এবং ভৃগুসুতে নাপি তীর্থেচ মরণং ভবেৎ॥

এই কোষ্ঠীর নিধনাধিপতি মঙ্গল গুরু যুক্ত এবং নিধন স্থান বৃশ্চিক রাশিতে গুরুর পূর্ণ দৃষ্টি শুক্রের ও পাদ দৃষ্টি থাকায় তীর্থ মৃত্যু যোগ হইয়াছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আমার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে, রক্তপাত হয়, জ্বর আছে, বোধহয় এই শেষ ব্যাধি। আমার কোথায় মৃত্যু হইবে তাহা স্পষ্ট লিখিবেন।" আমি তাঁহার কোষ্ঠী সমালোচনা কালে তাঁহার ৺কাশীধামে মৃত্যু হইবে এরূপ লিখিয়াছিলাম কারণ এই কোষ্ঠীতে বৃহস্পতিই আত্মকারক গ্রহ। কোষ্ঠীতে যে গ্রহের স্ফুট ভুক্তাংশ সর্ব্ব গ্রহাপেক্ষা অধিক তিনিই সেই কোষ্ঠীর আত্মকারক গ্রহ হয়েন। এই কোষ্ঠীতে বৃহস্পতিই ধর্ম্মাধিপতি উচ্চস্থ এবং আত্মকারক; এই সকল শুভ যোগ দ্বারাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্তিমে মোক্ষধাম ৺কাশীধামে মৃত্যু হইয়াছে।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কোষ্ঠীর ফলাফল যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা তাঁহাকেও জানাইয়াছিলাম। সৌরভে তাঁহার জীবনের অনেক বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার জন্ম পত্রিকার আলোচনা প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় লিখিলাম।

লোকে সাধারণতঃ কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্র পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল প্রকাশক। আমরা দীর্ঘকাল জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যদি জাতকের জন্ম লগ্ন সুক্ষ্ম রূপে স্থির হয়, তবে কোষ্ঠীর লিখিত জীবনের অনেক ঘটনাই প্রত্যক্ষ হয়। তবে কোষ্ঠীতে যেসকল আয়ুর্বর্ষ লিখা হয় তাহা প্রায়ই ঠিক হয় না কচিৎ ২।৪ খানার গণনা ঠিক হয়। অষ্টবর্গ এবং মহাষ্টবর্গ বিচার দ্বারা জাতকের জীবনের সুখ দুঃখের অবস্থা অনেকটা বুঝা যায়। আর অষ্টোত্তরী বিংশোত্তরী উভয় দশাতেই যদি অশুভ ভাবাধিপতি গ্রহের দশা পড়ে, তাহাতে অনেক স্থলেই জীবনান্ত হইতে দেখিয়াছি। তবেই বলা যায় এই কর্ম্মফল প্রকাশক শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

যা ব্রহ্মণো বিলিখিতা নর ভাল পট্টে
"প্রারব্ধকর্ম্ম সদসৎ ফল পাকপংক্তিঃ।
হোরা প্রকাশয়তি তামিহ কর্ম্মপক্তিং।
দীপো যথা নিশি ঘটা দিকমন্ধকারে'॥

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

প্রার্থনা।

তোমারি কাজে না লাগি যদি
কেন গো আমারে আনিলে
না হেরি যদি অমর শোভা
কেন গো আমারে ডাকিলে ?
বুকের সম নীরবে চাহি
দাড়ায়ে তোমার দুয়ারে,
রহিব দীর্ঘ দিবস কত
ধৈরয চলেছে ফুরায়ে।
তোমারি মহা সেবার লাগি
আছে বাকী কত করম,
ডাক হে মোরে তাহারি পাশে
ভরিয়া উঠুক মরম,
এনেছ যদি করম তরে
অলস সমান জড়তা
বহিয়া কেন যাব হে ফিরে
হে প্রিয় আমার দেবতা।

শ্রীবিভাবতী সেন।

মুসলমানদের সংস্কৃত শিক্ষা।

মুসলমানদের মধ্যে ফৈজি, প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। ফৈজির পূর্ব্বেও অনেক মুসলমান ভদ্রলোক সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আকবর ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। প্রত্যেক ধর্ম্মে কিছুনা কিছু সত্য আছে, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ উদার ছিলেন। তাঁহার আদেশে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদকদিগের মধ্যে আবদুল কাদির, নকিব খাঁ, মুল্লা সাহ মহম্মদ, মুল্লা সাত্রি, সুলতান হাজি, হাজি ইব্রাহিম, সেখ ফৈজি প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। নিজামউদ্দিন আহম্মদ, তাঁহার তবকাৎ-ই আকবরিতে বলিয়াছেন যে, আবদুল কাদের কতকগুলি হিন্দী গ্রন্থের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। সে যুগের মুসলমানেরা হিন্দুদের ভাষা মাত্রকেই হিন্দী বলিতেন। সে হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকেও হিন্দী ভাষা বলা যাইতে পারে। আমির খসরু, সংস্কৃতকে হিন্দী বলিয়াছেন।

আবদুল কাদির লিখিয়াছেন, "সম্রাট্ সেরগড়ে (কনোজে) অবস্থান্ কালে আমাকে সিংহাসন বত্রিশের অনুবাদে আদেশ প্রদান করেন। আমার অনুবাদে সম্রাটের প্রীতি জন্মিয়াছিল। আমি সম্রাটের আদেশে পঁচিশ হাজার শ্লোকাত্মক রামায়ণের অনুবাদ করি। উক্ত গ্রন্থে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র বা রামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুরা, রামকে মানব দেহধারী পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকে।"

আবদুলকাদিরকে, সচরাচর বদায়ুনি বলা হইয়া থাকে। বদায়ুনির মহাভারত ভাল লাগিতনা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদের সাহায্যে মহাভারতের অনুবাদ সম্পন্ন হয়। বদায়ুনি, ফৈজি, আবদুল কাসিম, সেখ মহম্মদ সুলতান থানেশ্বরী, মহাভারতের অধিকাংশের অনুবাদ করেন। বদায়ুনিকে অথর্ব্ববেদের অনুবাদ করিতে বলা হয়, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের দুরূহত্ব নিবন্ধন তিনি অনুবাদের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অনন্তর হাজি ইব্রাহিম, সন্তোষজনক রূপে উক্ত অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

আকবরের সময়, মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা অধিক হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান-পিপাসু মুসলমান ভদ্র লোকগণ, পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ভাষার চর্চ্চা করিতেন। বিদর্পে নামক পঞ্চতন্ত্রের পারস্য অনুবাদ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। পারসীতে কলিলা ওয়া দমনা নামক গল্প দেখা যায়, তাহা পঞ্চতন্ত্রের করটক ও দমনক নামক গল্প হইতে অনুবাদিত। বাগদাদনগরীর খলিফাদের সভায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্য ও আরবি ভাষায় অনুবাদের সহায়তা করেন।

খলিফা অল মনসুরের রাজত্ব কালে মহম্মদ বিন্‌মুসা, আরবি ভাষায় বীজগণিতের অনুবাদ করেন। মিকা ও ইবন দাহন কর্ত্তৃক ঐ সময়ে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থের আরবি অনুবাদ হয়। স্পষ্ট বোধ হয়, এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বেও বাগদাদের রাজ সভায় সংস্কৃত ভাষার প্রচুর আলোচনা হইত। চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ আরব

জাতির মধ্যে ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যার আলোচনা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। মঙ্ক ও শালিহ নামক দুই জন ভারতীয় পণ্ডিত, খলিফা হারুণ-অল-রসিদের শরীর চিকিৎসক ছিলেন। মঙ্ক, পারস্য ভাষায় বিষ-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাচীন কালে হিন্দু জাতি, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। তাঁহারা কলা বিদ্যাকে চৌষট্টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক কলা সম্বন্ধে গ্রন্থ ছিল। তাহার অধিকাংশ পারস্য বা আরব্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। খলিফাদের রাজত্বকালে ভারতীয় সিদ্ধান্ত ও ফলিত জ্যোতিষ, ধর্ম্মতত্ত্ব ও বেদতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থের অনুবাদ হয়। তুর্ক ও আফগানদের ন্যায় আরব দেশীয়দের তাদৃশ পরজাত বিদ্বেষ ছিলনা।

কোন বিদেশীয় মুসলমান পণ্ডিত, আলবিরুণির ন্যায়, হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লাভ করিতে পারেন নাই। আলবিরুণি, হিন্দু শাস্ত্রের দোষগুণের অপক্ষপাত বিচার করিয়াছেন। আলবিরুণি, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ্-বিন্-ইজ্রেইল-অল্-তানুকি একজন বিদেশীয় পর্য্যটক। তিনি ভারতে আসিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

ফিরোজশাহ নাগরকোট অধিকার করিয়া তথায় বহুমূল্য পুস্তকাবলী-পূর্ণ একটী পুস্তকালয় প্রাপ্ত হন। তিনি দর্শন ও শাকুনবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ, মৌলানা ইজ্উদ্দিন খালিদ খানিকে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে বলেন। এই অনুবাদের দালিয়েল্-ই-ফিরোজসাহী নাম রাখা হয়। অনুবাদকের সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর জ্ঞান না থাকিলে তাহারা অনুবাদের ভার গ্রহণ করিতেন না।

লক্ষ্ণৌর নবাব জালালউদ্দৌলার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত ফলিত জ্যোতিষের একখানি পারসী অনুবাদ ছিল। এই অনুবাদ ফিরোজ তোগলকের রাজত্বকালে সম্পন্ন হয়। লক্ষ্ণৌর রাজকীয় পুস্তকালয়ে পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্য অনুবাদ ছিল উহা গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ খিলিজির রাজত্বকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ খিলিজি বোধ হয় বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কারাতুল্ মুলুক নামক গ্রন্থ, ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে শালাতুর নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনূদিত হইয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অশ্ববিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা শালিহোত্র মুনিকে শালাতুর বলা হইয়াছে। যাহাতে পৌত্তলিকদের সাহায্য লইতে না হয়, তজ্জন্য শালাতুর গ্রন্থখানিকে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে আর একখানি ষোড়শ সহস্র শ্লোকাত্মক শালাতুর নামক গ্রন্থ সাহজাহানের সময় পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। আরাঙ্গজীবের রাজত্বকালে সম্রাট্ জগন্নাথ পণ্ডিত আরব্য ভাষা হইতে তাজিক গ্রন্থাবলী সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। পরস্পরের ভাষা শিক্ষা না করিলে এইরূপ অনুবাদ হইতে পারিত না। পাঠান রাজত্ব কালে দরাপ-খাঁ, ত্রিবেণীতে থাকিয়া যে গঙ্গাস্তব রচনা করেন, তাহার ভাষা প্রগাঢ় সংস্কৃত। মুসলমানেরা যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, উহার অভ্যন্তরে কীদৃশ রত্ন রাজি নিহিত আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিকট নিতান্ত অসার, ইহার প্রমাণের জন্য সংস্কৃত শিখিতে গিয়া কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্মের মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ শুনা যায়। কোন জাতিকে চিনিতে হইলে তাহার ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দিশা হারা।

জমাট বাঁধা আঁধার রাতে মোট্‌টি নিয়ে ঘাড়ে,
শিকলি বাঁধা চরণে চলি এসেছি সাগর পারে।
সামনে ভীষণ পারাবারের উঠ্‌ছে বিষম ঢেউ,
পেছন পানে তাকিয়ে দেখি সঙ্গে নাইকো কেউ।
দাঁড়িয়ে সেথা ভাব্‌ছি মনে যাবকি তবে ফিরে,
স্মৃতির আগুণ উঠ্‌লো জ্বলে চৌদিকে মোর ঘিরে।
সরল প্রাণে গরল ভরা, মোট্‌টি ভরা পাপ,
জ্বালায় জ্ব'লে সাগর জলে দিলেম তাই ঝাঁপ।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী।

ইশা খাঁ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই সময় উসমান খাঁ পাঠান বিদ্রোহী হইয়া ঢাকার থানাদারের শাসনান্তর্গত স্থান অধিকার করিয়া লইলে, থানাদার রাজ বাহাদুর পলায়ন করিয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা রাজ-পুত-রাজ মানসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল আক্রমণ করেন * এবং অতি প্রত্যুষে উসমান খাঁকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া তাহার সমস্ত কামান গোলা হস্তগত করিলেন। উসমান পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

মানসিংহ রাজ বাহাদুরকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঢাকা আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। মানসিংহ বুঝিলেন বিক্রমপুরাধিপতি ও সোণারগাঁও অধিপতির প্ররোচনাতেই উসমান খাঁ বিদ্রোহাচরণ করিয়া এই অনর্থ সংঘটন করিয়াছিল তাই তিনি শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। †

তাহাই হইল। যথা সময়ে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। মানসিংহ শ্রীপুর ও বিক্রমপুর অধিকার করিলেন। বহু আফগান স্ত্রী পুত্র লইয়া বিক্রমপুর আশ্রয় লইয়াছিল ; বিক্রমপুর আক্রান্ত হইলে তাঁহারা সোনার গাঁ যাইয়া আশ্রয় লইল।

আফগানেরা সোণার গাঁ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া মানসিংহ সোণার গাঁ অবরোধ করিলেন। প্রাথমিক যোদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জয় সিংহ হত হইলে মোগল সৈন্য পরাজিত হইয়াছিল। পরদিন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিন মানসিংহও পরাজিত হইলেন। তিনি ইশা খাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত প্রীতি সম্বন্ধ সংস্থাপন করিলেন। বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তৃত ভূভাগের ভৌমিকত্ব প্রদান করা হইল। অতঃপর মানসিংহের প্রস্তাবে ইশা খাঁ দিল্লীশ্বরের 'মসনদে' স্থান পাইবার অধিকারী হইয়া "মসনদ-ই-আলি" এই সম্মানিত উপাধি ভূষণে ভূষিত এবং বিস্তৃত জমিদারির সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সম্মান প্রাপ্তির পর আর ইশা খাঁ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই।

১০০৮ হিজিরা অব্দে (১৫৯৯—১৬০০ খ্রীঃ) অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার বংশধরগণ বলেন "তাহার পরিত্যক্ত রাজধানী বক্তারপুরে তাহার সমাধি চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহা আর এখন অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না।

ইশাখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দাউদ শ্রীপুরের কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মানসিংহকে পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়া অনেক কষ্টে তাহা দমন করিতে হইয়াছিল।

এখন আমরা কামান গুলির খোদিত লিপি মালা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচারিটী কথার উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথম কামানটী সেরসাহের রাজত্ব কালে তাহারই প্রয়োজনে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ঐ কামানে খোদিত পার্সি লিপি হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু ঐ পারস্য লিপির নিম্নে ক্রমে 'রুকত গাজি' ও তরপ রাজা নাম অঙ্কিত কেন ?

আমাদের মনে হয় সেরশাহার মৃত্যুর পর কোন ক্রমে 'রুকৎগাজি" নামক কোন ব্যক্তি এই কামানের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন এবং তাহাতে নিজ নাম অঙ্কিত করেন। ক্রমে রুকৎগাজি হইতে শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের হিন্দু রাজা এই কামান অধিকার করেন ও বাঙ্গালী হিন্দু-প্রিয় বঙ্গাক্ষরে কামানে নিজ নাম চিহ্নিত করেন। ইহার পর ত্রিপুর রাজ অমর মাণিক্য তরপ রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্রকে বন্দী করেন সেই সময় [illegible]

---

* [illegible] মানসিংহ কোথায় [illegible] [illegible], [illegible] ইলিয়টের [illegible] আকবর নামার [illegible] যে তিনি [illegible] ঢাকার [illegible] [illegible] করিতে- [illegible]।

† [illegible] আকবর নামার শ্রীপুর ও বিক্রমপুর [illegible] হইয়াছে। [illegible] ও বিক্রমপুর [illegible]। উপরের বিবরণেও [illegible] হওয়াও অসম্ভব নহে।

দ্রব্যের সহিত "তরপ রাজা" কামানটীও ত্রিপুর রাজের হস্তগত হয়। অতঃপর ইশাখাঁ মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া যখন ত্রিপুর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন ত্রিপুরেশ্বর ইশা খাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে তাহাকে এই কামান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন।

৩য় কামানটীতে ইশা খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহব্বত খাঁর নাম খোদিত আছে। এই কামানটী সেরসাহার নামাঙ্কিত ১নং কামানটীর অনুরূপ; সুতরাং তাহা মহব্বত খাঁর সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল কি সের সাহার নির্ম্মিত প্রাচীন কামানের উপর পরে মহব্বত খাঁর নামাঙ্কিত করা হইয়াছিল, কিম্বা ইশা খাঁই স্বীয় বিজয়লব্ধ কামান প্রিয়তম পুত্রের নামে নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায় না।

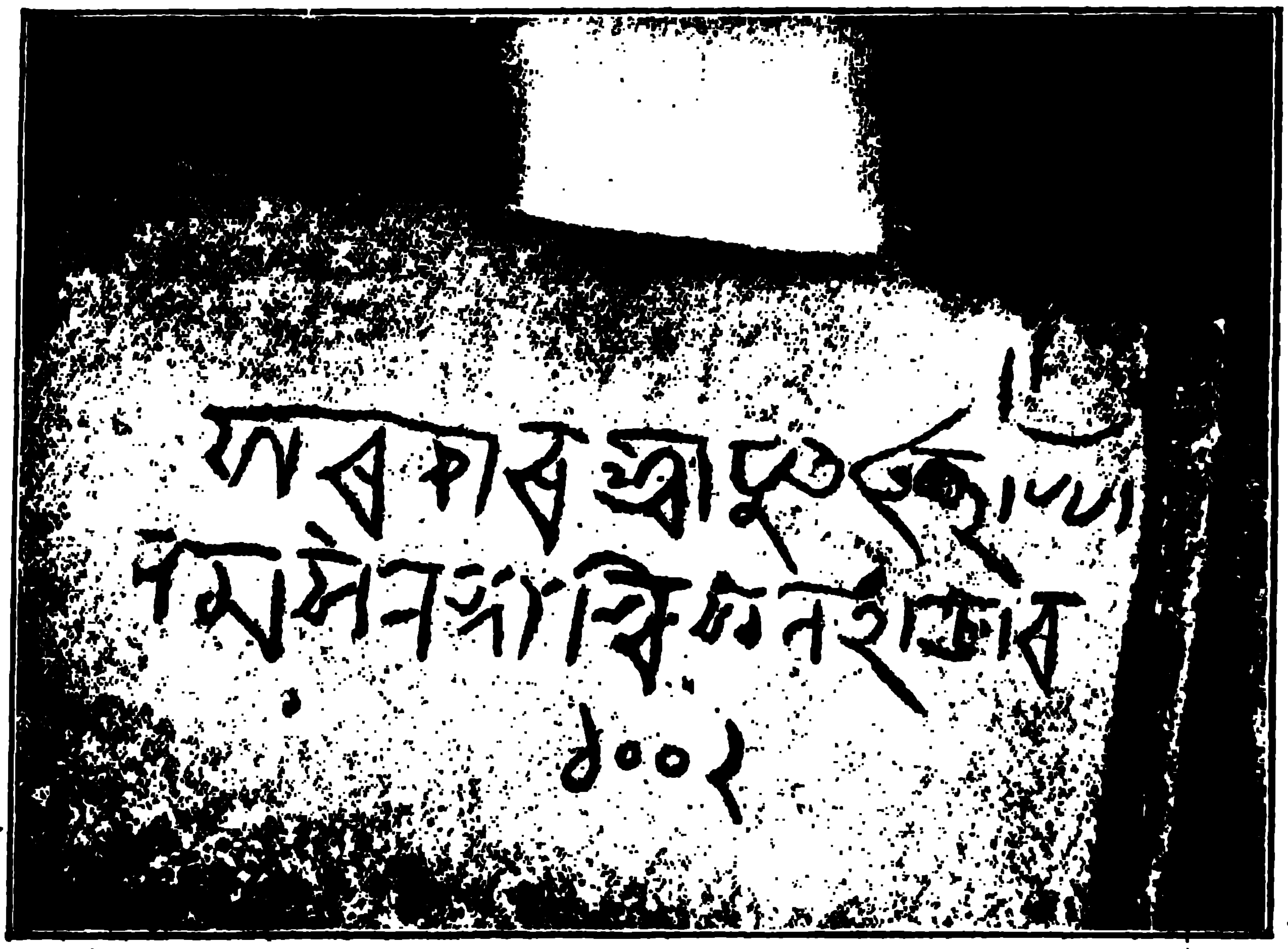

৫ম কামানে ইশাখাঁর নাম খোদিত আছে। ঐ কামানটী ১০০২ হিজিরা অব্দে ইশাখাঁর মৃত্যুর ৬ বৎসর পূর্ব্বে ও তাঁহার "মসনদ ই আলি" উপাধি পাইবার পরে নির্ম্মিত।

ইশাখাঁর নামাঙ্কিত কামানটীর বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে ইশাখাঁর রাজধানীতে কামান প্রস্তুতের কারখানা ছিল। কামানে বঙ্গাক্ষর খোদিত দেখিয়া ইহাও স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে কামানটী কোন বাঙ্গালী হিন্দুকারিকর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সময় কামানটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, (১৫৯৪খ্রীঃ) সেই সময় বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্ব—পারস্য ভাষারই প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ মুসলমান শাসনকর্ত্তার নির্ম্মিত কামানে পারস্য অক্ষরেই তাহার বিবরণ খোদিত হইবার কথা—তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গাক্ষরে হওয়ায় তাহা বাঙ্গালী হিন্দুর কর্ম্ম কুশলতারই পরিচয় প্রদান করিতেছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

অন্যান্য কামান গুলি সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় বিশেষ কিছুই নাই।

ইশাখাঁ সম্বন্ধে দেশে বহু অমূলক গল্প প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইশাখাঁ কর্ত্তৃক চাঁদরায়ের কন্যা হরণ ব্যাপার তাহার মধ্যে একটী। এইরূপ অমূলক কাহিনী জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্ক—তাহা আমরা বিগত চুঁচুরা অধিবেশনে দেখাইতে চেষ্টা করিয়া ছিলাম। আমরা জাতীয় ইতিহাস সংকলনে সেরূপ অমূলক প্রবাদ বা গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি না। ইশা খাঁর সম সাময়িক প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রমাণ ব্যতীত এই প্রবন্ধে অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি প্রবন্ধটী অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল।

অবিচার।

(সেখ সাদী)

দুষ্টেরে করিলে ক্ষমা না করি দমন,
শিষ্টের তাহাতে হয় অনিষ্ট সাধন!
অত্যাচারী জনে তুমি মার্জ্জনা করিয়ে
কাঙ্গালের ব্যথা আরো দিয়োনা বাড়ায়ে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

সমর চিত্র।

বৃটীশ সমর সচিব লর্ড কিচেনার।

বৃটীশ সেনাপতি ফ্রেঞ্চ।

ফরাসী সেনাপতি জফ্রে।

সমর চিত্র।

রুষ সেনাপতি রেনেক্যাম্ফ।

জর্ম্মাণ সেনাপতি মল্টকে

অষ্ট্রীয় সেনাপতি হপেণ্ডরফ্।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

"ইতিহাস" বলিতে কেবল রাজগণের বিবরণ ও যুদ্ধ-প্রসঙ্গ বুঝায় না। যেমন সমাজ সমূহের সমবায়ে দেশের প্রতিষ্ঠা, সামাজিক বিবরণাবলীই তদ্রূপ দেশের ইতিহাসের এক প্রধান অঙ্গ। সামাজিক ইতিহাস দেশের প্রধান বংশনিচয়ের বৃত্তান্ত মাত্র।

এ প্রবন্ধে ময়মনসিংহের সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়ার যোগ্য এক ক্ষুদ্র বংশ বৃত্তান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সে অনেক দিনের কথা। তখনও ঈশাখাঁ পূর্ব্ব ময়মনসিংহে আবির্ভূত হন নাই। তখন আসাম প্রদেশীয় কোন রাজা এগারসিন্দুরকে কামরূপের রাজধানী করিয়া সমস্ত পূর্ব্ব দেশ শাসন করিতে ছিলেন। তখন এগারসিন্দুর পূর্ব্ব দেশের প্রধান বাণিজ্য স্থান। তখন ব্রহ্মপুত্রের অন্যতর শাখা শঙ্খ নদী প্রবল বেগে বিল বারোয়া প্লাবিত করিয়া বড় হাওরে ছুটিয়া যাইত; সেই সময় উত্তর বঙ্গের কোনও প্রবল পরাক্রান্ত 'রাজা' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ জমিদার পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মপুত্র নদ তীরে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষায় আগমন করেন। দেশে তখনও কোচ, হাজং প্রভৃতির অত্যাচার, মোসলমানের অত্যাচার; সুতরাং নিরাপদে অবস্থানের আশায় সেই রাজা এগারসিন্দুরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে আপন বাসস্থান নির্ণয় করিয়া অবস্থান করেন। আজিও তথায় এক ভগ্ন ইষ্টকালয়ের শেষ চিহ্ন লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই স্থান আজিও সকলের নিকট "রাজাবাড়ীর টেক" নামে পরিচিত। টেক অর্থ জল বেষ্টিত উচ্চ ভূমি। রাজা বাড়ীর টেকের উত্তর দিয়া শঙ্খনদী, পশ্চিম ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র,—সুতরাং টেক নামটি অন্বর্থই হইয়াছে।

এই রাজাবাড়ীর টেকে যে রাজা বাস করিতেন, তাঁহার পর তদীয় গুরুদেবও তথায় আগমন করেন। ইঁহারা "সাতুটার অম্বর'। (শব্দটা অম্বর কি ওঝা, তাহা ঠিক পাঠ করা যায় না।) প্রথমতঃ মধুসূদন মৈত্রের পুত্র গণপতি মৈত্র উক্ত রাজশিষ্যের বাটিতে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া এদেশে আগমন করেন। প্রাচীন বংশপত্র হইতে মধুসূদনের মহিমা খ্যাপক নিম্ন লিখিত শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিলাম।

"আসীৎ পুরাকুলীনাগ্রগঃ সাতুটাম্বর পত্তনে।
মদাত্য পুরুরাধীমান্ দ্বিজন্মা মধুসূদনঃ ॥ ১
শান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ শ্রীমান্ জ্ঞানীচ মনুকর্ষভঃ।
কাশ্যপেস্থবুক চর্দ্ধিরবথ সন্তান হেতুকঃ। ২
নিরোবিজ পঠিমৈত্রঃ সুধীরঃ কণ্ শাখিনঃ।
গঙ্গায়া পশ্চিমে ভাগে দেবার্চ্চাবিরতো বসন্ ॥ ৩

কশ্চিদ্দ্বজো দৈন্যবশাদশক্তঃ।
কন্যাং প্রদাতুং পনুমর্ত্তুমিচ্ছুঃ।
গঙ্গাম্ব সংসর্গ কৃত প্রযত্নো,
গঙ্গাতটৈছাশ্মন্ সমুপাগতেহভূৎ। ৪
প্রাচীং দশং তংস মযূখ দীপ্তাং,
দৃষ্টানাচ্চদাত্তৎমধু সূদনাখ্যঃ।
গঙ্গাজলে স্নানযুতো বদান্যঃ,
সন্ধ্যা শংকরং বিধিনা দয়ালুঃ ॥ ৫
হেনেহ পৃষ্টোদৃশ কিমাত্ম নাশে,
ইত্থং প্রবৃত্তো মধুসূদনেন।
প্রোক্তেতি বৃত্তং স্বস্থশেদ্রবীত্তং,
তচ্ছ্রেন পুণ্যং দ্বিজকংসদৈন্যঃ ॥ ৬
তৎপ্রাণ সংসর্গ সমুদ্যতস্তং,
সংলোক্য বাণী মধুসংযুতেন।
ইত্যত্র তিং কুরু কর্ম্মসৈবং,
পাপংশিতত্বা মহমুদ্বহামি ॥ ৭
ইত্থং সদৈন্যঃ সদ্বয়স্তু তস্থ,
বিপ্রোনিশম্যাত্ম হৃদং বাচেত্থ।
লোক প্রণিন্দাত্মনসাপা পম্যাং
তস্মান্নিবৃত্তঃ স্বগৃহং জগাম ॥ ৮

তদ্ধীন বংশজাং কন্যামূঢ়স্তস্থ সুতোত্তমা।
বিবদন্তেন তাতেন বঙ্গে গণপতির্যযৌ॥ ৯
পরস্পর প্রজাতানাং দ্বিজানাং জ্ঞাপনং হিতং।
শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত দ্বজেনেদং বিলিখ্যতে ॥ ১০
সিংহপ্রাপ্তভাস্করস্থ ব্যোমাম্বর রসৈক মে।
শকে সৌমদিনে পঞ্চদৈত্যাচার্য্য দৃশিপ্রমে ॥ ১১

কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তির বিপত্তি চিরদিনই; সভ্যতার সহিত মাত্রাটা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই মাত্র তফাৎ। এই কঠোর বিপত্তিতে মধুসূদন ব্যতীত আর কে ত্রাণ

কর্ত্তা হইতে পারে? এক কন্যাদায়গ্রস্ত বিপ্র দৈন্য বশাৎ এই বিপত্তিতে পতিত হইলে, শ্লোকোক্ত মধুসূদন সেই দরিদ্রের প্রতি কিরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহা স্মর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক ১৬০০ শকের ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবারে রচিত হয়। সুতরাং ইহা ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। মধুসূদনের পুত্র গণপতি তৎপুত্র চতুর্ভুজ, তাঁহার পুত্র কংসারি, ইঁহার পুত্রের নাম হৃষীকেশ, তৎপুত্র দামোদর, তৎপুত্র বিদ্যাধর, ইঁহার পুত্র হরিবল্লভ মস্য়া গ্রামে বাস করেন। হরিবল্লভের পুত্র রমাপতি, শ্লোকপ্রণেতা রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত ইঁহারই পুত্র।

রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্তের পুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র শ্রীকণ্ঠ, তৎপুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর, তৎপুত্র জগচ্চন্দ্র, তৎপুত্র উপেন্দ্র, তৎপুত্র দেবেন্দ্র বালক মাত্র। ইহা হইতে ইঁহাদের দীর্ঘজীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বংশধারার পুরুষ গণনানুসারে গণপতির এদেশে আগমনের অন্যূন ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

এই প্রাচীন বংশে অনেকেই সাধক ছিলেন ; তন্মধ্যে হরিবল্লভ, মুকুন্দরাম, ন্যায়বাগীশ, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, কৃষ্ণধন শিরোমণি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়ভূষণ ও জয়নাথ তন্ত্রাচার্য্য এ বংশের শেষ তান্ত্রিক। ন্যায়ভূষণ "মহামোক্ষ তন্ত্র" নামে একখানা বৃহৎ তন্ত্র গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কিন্তু উহা তাঁহার মৃত্যুর পর অপহৃত হয়।

এ বংশীয়গণ শক্তি মন্ত্রের উপাসক এবং অনেকেই বাণীর আরাধনায় দেশ প্রসিদ্ধ হন। ইঁহাদের অনেকেই টোল স্থাপন করিয়া বিদ্যাদান করেন। বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ছাত্রও তাঁহাদের টোলে অধ্যয়নার্থ আসিত।

পূর্ব্বোক্ত রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম, মনোহর তর্কভূষণ, লোকনাথ চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের খ্যাতি দূরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

গণপতির বংশধর বর্গ অনেক দিনই 'রাজাবাড়ী'তে ছিলেন। গণপতি যে শিষ্যের আশ্রয়ে সুখে বাস করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ ঐ জমিদারের মৃত্যু হয়। তৎপরে তথা হইতে জমানপুর গ্রামে বাসগৃহ নির্দ্দেশ করেন।

যখন ঈশাখাঁর সহিত বাদসাহের যুদ্ধ ঘোষিত হয়, তাহার সমকালে মোসলমানদের উৎপীড়নে নবযুবক হরিবল্লভ মস্য়া গ্রামে চলিয়া যান। হরিবল্লভের বংশধর বর্গ আজিও তথায় আছেন, ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই গুরুতা ব্যবসায়ী। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম গণ্যমান্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মস্য়ার কাশ্যপ, ভিটাদিয়ার শাণ্ডিল্য, নওপাড়ার গণিত (বাৎস্য) ও আশুজীয়ার বাগচী প্রভৃতি পূর্ব ময়মনসিংহে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

ময়মনসিংহের প্রধান প্রধান গ্রাম সকলের বংশবিবরণ সংগৃহীত হইলে উক্ত জিলার এক সুন্দর ইতিহাস রচিত হইতে পারে। এ প্রবন্ধটি তত্রত্য কাহারও মনে এই ভাব জাগাইতে সামান্য সহায় হইলেও লেখক কৃতার্থ হইবে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

বৈদেশিকী।

অদ্ভুত নিদ্রা-ব্যাপার।

পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা নিম্নে কয়েকটী অদ্ভুত নিদ্রা ব্যাপারের বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ আমরা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক ডাক্তার হফ্‌ম্যানের (Hoffman) Psychology and Common life (মনোবিজ্ঞানও সাংসারিক জীবন) নামক গ্রন্থ হইতে বর্ণনা প্রদান করিব –

স্কটলণ্ড দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক রিড্ সাহেব সুদীর্ঘকাল একক্রমে নিদ্রা যাইতে পারিতেন এবং এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে খাইয়া দুই দিবস অনাহারে থাকিতে পারিতেন।

ধাত্রীগণ অনেক সময় ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ দুই তিন ঘণ্টার জন্য মাত্র তন্দ্রা যাইয়া অবশিষ্ট সময় জাগ্রত থাকিয়া কার্য্য করে। কিন্তু ইহার পর যখন প্রকৃতির প্রেরণায় নিদ্রাবেশ উপস্থিত হয় তখন ক্ষয়িত শক্তির পূরণ জন্য তাহাদিগকে বহুকাল নিদ্রায় নিমগ্ন থাকিতে হয়।

ব্লোচে (Blauchet) নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক একটী চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক মহিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে যখন তাহার বয়ঃক্রম আঠার বৎসর তখন তিনি এককালে ৪০ দিবস নিদ্রিত ছিলেন, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিশ বৎসর তখন ১৫ দিবস নিদ্রিত ছিলেন। আরও তিনি ১৮৬২ খৃঃ ইষ্টার সাণ্ডে হইতে ১৮৬৩ খৃঃ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসর ব্যাপিয়া নিদ্রিত ছিলেন। এই সময় তিনি নিশ্চল ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তাহার নাড়ী ক্ষীণ ছিল এবং শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় অনুভূত হইত না। দুগ্ধ ও ঝোলই তাহার এক মাত্র খাদ্য ছিল। তাহার কোনও মল মূত্র ত্যাগই হইত না ; শরীরেরও কোন ক্ষয় হয় নাই ! তাহার আকৃতি এই সমগ্র নিদ্রা সময়েই কুসুমারক্ত ও সুস্থ ছিল। কিন্তু ইহা মূর্চ্ছাবস্থারই ঘটনা— সাধারণ নিদ্রাবস্থার ঘটনা নহে।

নিদ্রায় অপর সমস্ত ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকিয়া একটী মাত্র ইন্দ্রিয় নিদ্রিত থাকিতে পারে অথবা তদ্বিপরীতে অপর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিদ্রিত থাকিয়া একটী মাত্র ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকিতে পারে। সৈনিকেরা অনেক সময় অভিযান করিয়া যাইতে যাইতে ঘুমাইয়া থাকে তখন তাহাদের পায়ের মাংস পেশী ব্যতীত অপর সর্ব্বাঙ্গই নিদ্রিত থাকে। এই মাংস পেশীই কেবল চলিবার কার্য্য চালাইয়া থাকে। নাবিকেরাও এইরূপেই জাহাজের রসিতে ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকে।

সার এড্ওয়ার্ড কড্রিংটন্ (Codrington) সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে তিনি লর্ড হুডের (Hood) অধীনে পতাকাবাহী সহকারী সেনানীর কার্য্য করিতে ছিলেন, তখন তিনি নিদ্রিত হইলে কোনরূপ চীৎকার বা ভেড়ীবাদ্যই তাহাকে জাগাইতে পারিত না। কিন্তু "ধ্বজা" এই শব্দটী ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহার কর্ণে বলা হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে প্রস্তুত হইতেন।

ইরেসমাস্ (Erasmus) বলেন যে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক বেসেল নিবাসী অপোরিনাস্ (Oporinus of Basel) একদা একটী প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতার সহিত দীর্ঘ ভ্রমণ যাত্রায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাত্রি যাপনের জন্য পান্থনিবাসে উপস্থিত হইবার একটু পূর্ব্বে পুস্তক বিক্রেতা মহাশয় একটী হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে এতবেশী আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলেন যে অপোরিনাস্ জাগিয়া থাকিয়া তাহার নিকট ইহা পাঠ করিবার জন্য তিনি তাহাকে সম্মত করাইলেন। ইহার ফল এই হইল যে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার অপর সকল ইন্দ্রিয় বিষয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল পঠন কার্য্যটীই চলিতে লাগিল! সুতরাং যখন তিনি জাগ্রত হইলেন তখন তিনি যে পাঠ করিতে ছিলেন তাহা কিছুই মনে করিতে পারিলেন না।

নওয়া পোর্টার (Noah Porter) নিম্নোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে "এরূপ বহু ব্যক্তি আছেন যাহারা পাঠ বা কথোপকথন হইতে থাকিলে নিদ্রার আরাম ভোগ করিতে পারেন অথচ জাগরিত হইয়া পঠিত বা কথিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতেও সমর্থ হন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিতবাদীতে আজন্ম নিদ্রালু জক নামক বালকের কথা পাঠ করিয়াছিলাম তাহাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করি।

"জক্ নিউইট্ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে ক্লডেন মুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শিশু জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে। এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভিতর একবারও ইহার নিদ্রা ভাঙ্গে নাই।

জন্মাবধি নিদ্রিত নিউইট্‌কে রবারের নল দ্বারা কেবল মাত্র তরল খাদ্য খাওয়াইয়া সজীব রাখা হইয়াছে। এই নল নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া আহার নলীতে প্রবেশ করিলে সেই নলের ভিতর তরল খাদ্য ঢালিয়া দেওয়া হয়।

জকের বৃদ্ধা জননী জকের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে— অন্যদশ জনের ছেলে যেরূপ হইয়া থাকে আমার জক্‌ও সেইরূপ হইয়াছিল। অন্য দশজনের ছেলে জন্ম গ্রহণের পর ক্রন্দন করে, আহার করে, আমার জক্‌ও সেইরূপ করিত তবে জন্মের পর হইতেই জক্ নিদ্রা মগ্ন আছে একবারও চক্ষু মেলিয়া চাহে নাই। আমার ন্যায় জকের চক্ষু দুইটীও নীলবর্ণ হইয়াছে। আমি কত সময় চক্ষু

পল্লব ফাঁক করিয়া সুনীল চক্ষু দুইটার প্রতি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম।

কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জক্‌কে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে ইহার চক্ষুতে দোষ নাই। তবে দোষের মধ্যে এই দেখা যায় বালকটী চক্ষু মেলিয়া মুহূর্ত্ত সময়ও থাকিতে পারে না।

জক্ যদিও ঘুমঘোরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, কি অক্ষি পল্লব কুঞ্চিত করে, তথাপি মনে হয় ইহার ধারণা শক্তি নাই।

যে সকল চিকিৎসক জক্‌কে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। চিকিৎসক মহাশয়েরা জকের শরীরে বৈদ্যুতিক স্রোতঃ সঞ্চালন করিয়াছেন। চর্ম্মবেধ্ করিয়া ঔষধ দিয়াছেন এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু সকলেই নিষ্ফল হইয়াছেন। এমন কি, ইহারা জকের শরীর আগুনে দগ্ধ করিয়া, অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়াও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

জকের জীবনে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইবার, সেও অতি অল্প সময়ের জন্য-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছিল। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রথমবার যে রজনীতে তাহার পিতা পরলোক গমন করেন, সেই বিষাদময়ী রজনীতে এবং দ্বিতীয় বার ইহার পাঁচ বৎসর পরে ইহার পিতার পঞ্চম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিবসে॥" হিতবাদী ২৪ শে ফাল্গুন ১৩১৫ বাং।

উপরি উদ্ধৃত নিদ্রা ব্যাপার গুলির বিবরণ পাঠ করিলে কুম্ভকর্ণের ছয় মাস নিদ্রাতে অবিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ থাকে না। উদ্ধৃত নিদ্রা বৃত্তান্তে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে নিদ্রাবস্থায়ও আহার প্রদান করিয়াই নিদ্রিত ব্যক্তিকে জীবিত রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে যোগ-নিদ্রার কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আহারের আর কোন আবশ্যকতাই হয় না। পঞ্জাবে হরিদাস সাধুর মৃত্তিকা মধ্যে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত জীবন্ত সমাধি ইংরেজ আমলেই ঘটিয়াছে। যোগ নিদ্রায় যেমন আহার বন্ধ থাকে তেমনই শ্বাস প্রশ্বাসও বন্ধ থাকে। সমাধিস্থ হরিদাসকে দেখিয়া ইংরেজ চিকিৎসকগণ সম্পূর্ণরূপে মৃতের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। ভূ কৈলাসের রাজ বাড়ীতে যে দুইজন যোগীকে পাওয়া যায় তাঁহারা বাহ্যত এরূপই অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন যে জকেরই ন্যায় তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদনের বহু চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

হরিদাস সাধুর সমাধির পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান-পারদর্শী ইংরেজ পণ্ডিতগণ ইহার এই ব্যাখ্যাই করেন যে শীতকালে নিদ্রালু সর্প ভেক প্রভৃতি জন্তু যে প্রক্রিয়াতে আহার বিবর্জ্জিত হইয়া সমস্ত শীতকাল এক প্রকার মোহাবস্থায় যাপন করে—যোগিগণ সেই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াই অনাহারেও জীবিত থাকিতে পারে। আমাদের যোগশাস্ত্রে কিন্তু 'যোগামৃত' পান করিয়া দেহ ধারণের কথাই আমরা প্রাপ্ত হই। শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা যেমন জীবনের রক্ষা হয়, তেমনই জীবনের ক্ষয়ও, হয় এবং বাহ্য প্রকৃতির সহিত যোগই সমস্ত দুঃখ ও সংসার বন্ধনের কারণ বুঝিতে পারিয়াই হিন্দু সাধকগণ শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ করিয়া চৈতন্যকে অন্তর্নিবদ্ধ করিবার জন্য যোগ প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই যোগ প্রক্রিয়া দ্বারা শ্বাস বায়ুকে তাঁহারা এরূপই সংশোধন করিয়া লইতেন যে তাহাতেই চিরকাল তাঁহাদের শরীরের পোষণ হইতে পারিত। এই পরিশুদ্ধ শ্বাসবায়ুই নাড়ী নামক স্নায়ু সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া দেহের অপূর্ব্ব শক্তি ও চৈতন্য সঞ্চারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই অতুলনীয় শক্তি সমন্বিত অন্তঃচৈতন্যই যোগৈশ্বর্য্য বা যোগবল্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং নাড়ী সঞ্চারী শক্তি ও চৈতন্য পোষণকারী পরিশুদ্ধ বায়ুই "যোগামৃত" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য মহিলাও বালকের অস্বাভাবিক নিদ্রাব্যাপার মোহাবস্থা মাত্র ইহার উপর নিদ্রিতের কোন নিয়ন্তৃত্ব নাই। যোগনিদ্রা কিন্তু মানবিক প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ রূপ অন্তঃচৈতন্যাবস্থা। ইহার উপর যোগীর এরূপই নিয়ন্তৃত্ব যে তিনি যতকাল ইচ্ছা ইহাকে স্থায়ী করিতে পারেন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মা।

(১)

নাম তাহার চামেলী, তাহার গায়ের রং গোলাপ কুঁড়ির মত উজ্জ্বল, মুখখানা কোমল, ঢলঢলে, কোমল সৌরভের স্থায় কোমলতা পূর্ণ হৃদয়—তাহার হাসিতে প্রাণ নাচিয়া উঠে, কথায় মধুবৃষ্টি হয়, কিন্তু তথাপি সে অলক্ষণা। তাহার জন্মের সময়ে বিধি ভুল করিয়া তাহার বাম হাতে পাঁচটার বদলে ছয়টা অঙ্গুলি দিয়াছিলেন। এই অঙ্গুলিটার ভস্মদৃষ্টিতে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া ছারখার হইবে, তাহা চামেলীর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে মেয়েটার জন্ম হইতেই ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেও তাহাই হইল। চামেলী যখন সবে তিন মাস এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তখন তাহার পিতামহী বৃদ্ধ বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তারপর পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে কলেরায় মহামারী আরম্ভ হইল, চামেলীর পিতা মাতা উভয়েই জোয়ারের স্রোতে তৃণ খণ্ডের স্থায় ভাসিয়া গেলেন। চামেলী বৃন্তচ্যুত বনফুলের স্থায় শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। এ সমস্তই যে সেই ষষ্ঠ অঙ্গুলিটার কাজ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

চামেলীর আশ্রয়হীন অবস্থায় তাঁহার মামা তাহাকে লইয়া যাইতে আসিলেন। সকলেই তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল, কিন্তু চামেলীর ষষ্ঠ অঙ্গুলীর পশ্চাতে তাহার পিতার সঞ্চিত রজতস্তূপ এতই ঝলমল করিতেছিল যে তিনি সেই ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটার বাধা তুচ্ছজ্ঞান করিলেন। একদিন প্রভাতে চামেলী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নুতন সংসারে প্রবেশ করিল।

(২)

চামেলী যে তাহার পশ্চাতে অমঙ্গলের ছায়াটাকে টানিয়া আনিবে এ বিষয়ে তাহার মামীমা এক প্রকার নিঃসন্দেহ ছিলেন, সুতরাং তাহার পিতার অর্থরাশি গ্রাস করিয়াও যখন তাহার মাতুল ভবানী বাবুর অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না বরং দিন দিন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহাদের আক্রোশটা চামেলীর উপরই আসিয়া গড়াইল। ভবানী বাবু পূর্ব্ব হইতেই পানাশক্ত ছিলেন, এদিকে চামেলীর পিতার ভাণ্ডারটা হাতে পাইয়া তিনি পানের মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার সচ্ছিদ্র 'পকেট' আর কিছুতেই পূর্ণ হইল না।

চামেলীর মামীমা সেই ক্ষুদ্র বালিকাটাকেই সকল অনর্থের মূল বলিয়া তাহাকে গালাগালি এমন কি শেষ কিলটা চপেটাঘাতটাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন। ভবানী বাবুর ছেলে সতীশ চামেলীর সমবয়েসী হইলেও তাহাকে চামেলী দাদা বলিয়া ডাকিত, সতীশের মা তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখ্ সতীশ, চামেলীর সঙ্গে খেলিস্‌নে, ওর কাছেও যাস্‌নে—ও রাক্ষসী।" সতীশ মা'র ভয়ে বাড়ীতে চামেলীর সঙ্গে খেলিত না, কিন্তু চামেলীকে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় খেলিয়া বেড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত।

এদিকে ধীরে ধীরে চামেলীর জ্ঞান সঞ্চার হইতেছিল। এতদিন সে কেবল মামীমাকেই ভয় করিয়া চলিয়াছে কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে বুঝিতে পারিল, একটা অন্ধকারের কালো যবনিকা পৃথিবীর সকল আলোক টুকু তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে দুর করিয়া দিতেছে। অগ্নি যেমন পাত্রের নিম্ন হইতে সমস্ত জলটাকে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করিয়া ফুটাইয়া তোলে, চামেলীর হৃদয়ের অন্তরাল হইতে তেমনি একটা বিষাদের শিখা তাহার সারা হৃদয়টাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

(৩)

চামেলী বড় হইতে হইতে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবাহের ভাবনাটা চামেলীর মামীমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। কি করিয়া সেই ধাড়ী মেয়েটাকে বাহির করিয়া দিয়া শান্তিলাভ করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। অন্য দিকে এই দুশ্চিন্তা ভবানী বাবুর পানাশক্তিরও ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল। চামেলীই সকল অশান্তি এবং উপদ্রবের মূল, সুতরাং মামা এবং মামীমার সঞ্চিত ক্রোধ নানা আকারে তাহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। চামেলীর ষষ্ঠ অঙ্গুলিটার ভয়ে বরের দলও তাহার কাছে ঘেঁসিতে চাহিল না, যাহারা আসিল তাহারাও উপযুক্ত দক্ষিণা

প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া ফিরিয়া গেল। সুতরাং চামেলীর কষ্টের পরিসীমা রহিল না।

বেচারী সারাদিন দাসীর মত খাটিত, রান্না বান্না হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কাজ নিঃশব্দে করিয়া যাইত; তথাপি ভবানী বাবু কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর মন উঠিত না। 'অলক্ষণা', 'রাক্ষসী' 'সর্ব্বনাশী' এসব গালি তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে যে একটী পরিবারের গলগ্রহ এবং অশান্তির কারণ, তাহা মনে করিয়া চামেলীর দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইত। এ সংসারে তাহার এমন কেহ ছিল না, যাহার কাছে সে একটী স্নেহের কথা, বা একবিন্দু অশ্রুজল প্রত্যাশা করিতে পারে।

অবশেষে ভবানী বাবুর একজন 'ইয়ার' চামেলীকে দয়া করিয়া বিবাহ করিতে চাহিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ, সম্পত্তি পানপাত্র, জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় ইয়ারদিগের স্তুতিবাদ করিয়া আহার সংগ্রহ করা। ভবানী বাবু এবং তাহার স্ত্রী মুস্কিল আসানের চেরাগের আলোতে এই উপায়টা দেখিতে পাইয়া হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন; চামেলীকে কিন্তু তাহাপেক্ষাও সন্তুষ্ট দেখা গেল। মামা এবং মামীমা তাহাকে তাড়াইতে পারিলে যে শান্তিলাভ করিবেন, এই আনন্দে চামেলী আপনার বিপদের কথা একবারও ভাবিল না। মহা সমুদ্রের বুকে ভাসিতে ভাসিতে জাহাজে যখন আগুন ধরিয়া উঠে, তখন হতভাগ্য আরোহীর দল সীমাহীন সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াও শান্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

(৪)

চামেলীর বিবাহের সংবাদ পাইয়া সতীশ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল, সঙ্গে আসিল তাহার বন্ধু অমরেশ।

চামেলীকে সতীশ স্নেহ করিত, সতীশের পিতা তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া হতভাগিনী চামেলীকে বৃদ্ধ, কপর্দ্দকহীন, মাতালের হাতে দান করিতেছেন, দেখিয়া সতীশ ক্রোধে ক্ষোভে অস্থির হইয়া পিতার অন্যায় কাজে বাধা দিতে আসিল। অমরেশ বন্ধুর সাহায্য করিবে বলিয়া সঙ্গে চলিল।

অমরেশ ভবানী বাবুর গৃহে পদার্পণ করিয়া চামেলীর অক্লান্ত সেবা, অপরূপ সৌন্দর্য্য আর অসাধারণ আত্মত্যাগ দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্মী সরস্বতীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বলিয়া মনে করিল। তাহার হৃদয়ে চামেলী যে একটা অমুজ্জ্বল সুবর্ণ-রেখা অঙ্কিত করিতেছিল, অমরেশ তাহা বুঝিবার অবসর পায় নাই। সতীশের মুখে তাহার জীবনের করুণ কাহিনীটুকু শুনিয়া সহানুভূতি ও দয়ার আলোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'চামেলী অলক্ষণা' একথাটা অমরেশের কাছে বিধাতার কার্য্যে তীব্র উপহাস বলিয়া মনে হইল। সতীশ যখন চামেলীকে বাঁচাইবার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখন অমরেশ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল "সতীশ, আমি চামেলীকে বিবাহ করিব।"

সতীশ বন্ধুর কথাটাকে প্রথমতঃ উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিল, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিল ইহার ভিতরে কতটুকু সত্য নিহিত আছে। সতীশের মুখে এই শুভ সংবাদ শুনিয়া চামেলীর ম্লান মুখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল। তাহার চিররুদ্ধ কণ্ঠ হইতে প্রবল উত্তেজনায় প্রথম অস্পষ্ট, কিন্তু তার পর স্পষ্ট ভাবেই বাহির হইল, "দাদা আমার ছায়া যে গৃহে পড়িবে, সেখানেই অমঙ্গল হইবে! আমাকে দীন দরিদ্রের গৃহেই যাইতে দাও, তাহাই আমার উপযুক্ত স্থান।

আজন্ম দুঃখের বোঝা বহন করিতে করিতে চামেলী সংসারের অভিশাপকেই মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল।"

(৫)

চামেলীকে গৃহে আনিয়া অমরেশ দেখিল, তাহার দাদা দীনেশ বাবু অল্প কথায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার বৌদিদি গোপনে অমরেশকে বলিলেন "ঠাকুর পো, কাজটা কি ভাল হইল? সংসারে কি আর তোমার জন্য ভাল মেয়ে মিলিত না।" অমরেশ একথার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করিল, কিন্তু বৌদিদিকে যেন তেমন প্রসন্ন করিতে পারিল না।

মাতুলের গৃহ ছাড়িয়া আসিলেও চামেলী তাহার অদৃষ্ট দেবতাটীকে ছাড়িয়া আসিতে পারে নাই। যে ছায়াটা জন্ম হইতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিল, সে অলক্ষ্যে তাহার আঁচল ধরিয়া অমরেশের গৃহে প্রবেশ করিল। দীনেশ বাবুর মেয়ে কমলা জলে ডুবিয়া মরিল,

তাঁহার স্ত্রী নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুতরাং যে কথাটা এতদিন কাণাকাণি হইতেছিল তাহাই এখন সকলের মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"চামেলী, এ বাড়ীর সর্ব্বনাশ করিবে।" দীনেশ বাবু গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এমন সময় অমরেশের বৌদিদি এ সংসার ছাড়িয়া চলিলেন। তাঁহার শেষ কথা—"ঠাকুরপো, তুমি আবার বিবাহ কর"—অমরেশের কাণে একটা নিষ্ঠুর পরিহাসের ন্যায় বাজিতে লাগিল।

এ সকল দেখিয়া শুনিয়া হতভাগিনী চামেলী আপনাকেই দোষী বলিয়া স্থির করিল। কি উপায়ে কোথায় সে তাহার দুঃখের বোঝাটা নামাইয়া একটু শান্তিলাভ করিবে ভাবিয়া ভাবিয়া চামেলী কোনও কূল কিনারা পাইতেছিল না। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে যেমন অগাধ জলে ডুবিতে ডুবিতে ইতস্ততঃ হস্তপদ সঞ্চালন করে কিন্তু আশ্রয় লইবার কিছুই পায় না, তেমনি চামেলী একটা আশ্রয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অমরেশের বৌদিদির শেষ কথাটা তাহার হৃদয়ে একটা অস্বাভাবিক আলোকচ্ছটা আনিয়া দিল। চামেলী ভাবিল ইহাই রক্ষার একমাত্র উপায়।

সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শতবার আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, চামেলী রাত্রিতে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অমরেশ বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। পাগলিনীর ন্যায় সে অমরেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ, তুমি আমাকে পদতলে স্থান দিয়াছ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এখনও বলিতেছি আমাকে ত্যাগ কর, আবার বিবাহ করিয়া সুখী হও। আমি এ বাড়ীতে দাসী হইয়া থাকিলেই সুখী হইব, কাহারও সঙ্গে কোনও সম্পর্কের দাবী করিব না।"

অমরেশ চামেলীর চক্ষে উন্মত্ততার চিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিল, "চামেলী, কালই আমরা এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইব। তোমার কোনও ভয় নাই।" চামেলী সবেগে অমরেশের হস্তবেষ্টনী হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল "ছি, আমার জন্য সকলকে ছাড়িবে, সোণার সংসার ছারখার করিবে? আমি কিছুতেই তাহা হইতে দিবনা। যদি তুমি আমাকে না ছাড়, আমিই তোমাকে ছাড়িব—ঐ পুকুরের জলে ঝাঁপাইয়া মরিব।" চন্দ্রালোকে পুকুরের জল হাসিতেছিল, চামেলী হাত বাড়াইয়া তাহাই দেখাইয়া দিল।

অমরেশ আবার শিহরিয়া উঠিল—"চামেলী তাহাই হইবে। আমি আবার বিবাহ করিব। তথাপি তুমি এমন চিন্তা মনেও আনিও না।"

(৬)

নূতন বধূ চারুবালা আসিয়া চামেলীর পরিত্যক্ত অধিকার গ্রহণ করিল। চামেলী সেই দিন হইতে প্রকৃতই দাসী হইল। সারাদিন সকলের মন যোগাইয়া রাত্রিতে আপনার ছিন্ন, মলিন শয্যায় ক্লান্ত দেহমন লইয়া অবশ হইয়া পড়িত। চামেলী ভাবিত ইহাতেই তাহার দিন কাটিয়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে একটী স্বর্গের শিশু আসিয়া—চারুর ক্রোড় অধিকার করিল। এদিকে চারু ও বধূর আসন হইতে ক্রমে ক্রমে কর্ত্রীর পদে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। চামেলীকে তর্জ্জন গর্জ্জন করা—"খোকার দুধ এখনো গরম হয় নাই কেন, এত বেলা করে রান্না করিলে আমার চলিবেনা, সারাদিন ব'সে ব'সে কর কি?"—ইত্যাদি শাসন বাক্য প্রয়োগ করা তাহার কর্ত্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। চামেলী নীরবে আপনমনে সকল কাজ করিয়া যাইত। তিরস্কার, পুরস্কারের কোনও ভয় কিম্বা আশা তাহার ছিলনা। অমরেশ দেখিল আলেয়ার আলো যেমন অদূরেই জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু ধরিতে গেলে দূরে বহু দূরে চলিয়া যায়, চামেলী ক্রমে তেমনই দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে, তাহাকে কোনও বন্ধনের ভিতরে ধরিয়া রাখা অসম্ভব।

এদিকে চামেলীর হৃদয়ে একটা অভিনবপ্রবৃত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। চারুর ক্রোড়ে শিশুটীকে দেখিয়া চামেলীর মাতৃহৃদয়ে একটা প্রবল ক্ষুধা রাক্ষসের ন্যায় তাহার সংযমের সকল বন্ধনগুলি চর্ব্বন করিয়া নিঃশেষ করিতেছিল। এমনই একটী শিশু যদি তাহারও থাকিত। এমনই একটী শিশুকে বুকে লইয়া সে যদি

চলিতে পারিত, তবে এ সংসারের সকল দুঃখযন্ত্রণা বুঝি মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইতে পারিত! চারুর ছেলেটীকে সে যে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লইবে, তাহার জ্বালাময় হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া শান্তিলাভ করিবে তাহারও উপায় ছিলনা। চারু তাহা পছন্দ করিত না। বিশেষতঃ চামেলী ভাবিত তাহার নিঃশ্বাসে হয়তঃ সোণার মুকুলটী ঝরিয়া পড়িবে। একটা অপূর্ণ কামনা, একটা দুর্ণিবার অতৃপ্তি চামেলীকে বুঝাইয়া দিল, সেবায় নারীর কর্ত্তব্যের সবটুকু পরিসর পূর্ণ হয় না; সেবায় যে নারীত্বের বিকাশ মাতৃত্বে তাহার পূর্ণ পরিণতি।

(৭)

রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, চামেলী তখনও বিনিদ্রনয়নে আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। যে কখনো আপনার কথা ভাবে নাই, আজ সে নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। নারীর যাহা ন্যায় সঙ্গত অধিকার তাহাতেই যখন বঞ্চিত হইল, তখন এ বিফল জীবন লইয়া কি করিবে, চামেলী তাহাই ভাবিতে ছিল। ভাবিয়া ভাবিয়া চামেলী ঠিক্ করিল, তাহার জীবন একটা নিষ্ফল স্বপ্ন, জীবন্ত অভিশাপ, মৃত্যুতেই তাহার শান্তি।

অদম্য উত্তেজনায় চামেলী ঘর হইতে বাহির হইয়া পুকুরের ঘাটে আসিল। অমরেশ কে সে একদিন বলিয়া ছিল এই পুকুরের জলে তাহার স্থান হইবে, আজ সত্যই মৃত্যুর জন্য সেই পুকুরের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের এক কোণ হইতে চাঁদ হাসিতেছিল, তারাগুলি মিট্ মিট্ করিয়া নীরবে কি বলিয়া যাইতেছিল। ঘাটের পাশে বাগানে শেফালিকাগুলি স্তরে স্তরে মাটীতে লুটাইয়া তাহাদের শেষ মিষ্টগন্ধটুকু বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছিল। এমনি সুন্দর পৃথিবীতে চামেলী মরিতে যাইতেছে কিন্তু তাহাতে বাধা দিবার কেহ নাই।

বাগানের পাশদিয়া সদর দরজায় যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তাহা হইতে একজন লোক ডাকিল, "চামেলী"! চামেলী চমকিয়া উঠিল, কিন্তু যে ডাকিতেছিল সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চামেলী সবিস্ময়ে দেখিল সতীশ। তাহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া সতীশ বলিল, "এত রাত্রে পুকুরের ঘাটে কি করিতেছিলে, চামেলী?" চামেলীর রুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া গণ্ড বাহিয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল। বহুদিন পরে সতীশের মুখে স্নেহের 'চামেলী' শব্দ শুনিয়া হতভাগিনী আপনার বক্ষ পঞ্জরেরুদ্ধ দারুণ যন্ত্রণা আর লুকাইয়া রাখিতে পারিলনা।

চামেলীকে কাঁদিতে দেখিয়া সতীশ বলিল, "কেঁদোনা দিদি, আমি তোমার দুঃখের কথা জানিতে পারিয়াই তোমাকে লইতে আসিয়াছি। চল ঘরে যাই।"

পরদিন সতীশ যখন চামেলীকে লইয়া যাইতে চাহিল, অরমেশ তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। সতীশ যদি চামেলীকে বিন্দুমাত্র শান্তি প্রদান করিতে পারে, অমরেশের তাহাতে আনন্দিত হইবার কারণ আছে, একথা সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল।

(৮)

সতীশ কি ভাবিয়া সংসারে "আপনাকে লইয়া বিব্রত" থাকিতে চাহিলনা, তাহা কেহই জানেনা। সে অনেক গুলি অনাথ শিশু লইয়া একটা 'মাতৃকুটীর' স্থাপন করিয়া তাহার কাজে প্রাণ পণ যত্ন করিতেছিল। চামেলীকেও সেই মাতৃকুটীরে আনিয়া সে আশ্রয় প্রদান করিল।

মাতৃকুটীরে আসিয়া চামেলী শত শিশুর মা হইয়া বসিল। তাহদিগের সেবায় চামেলী অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিল। একটী শিশুকে আপনার করিবার জন্য, একটী শিশুকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য চামেলীর হৃদয় একদিন তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল আর আজ শত শিশু 'মা' বলিয়া তাহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। চামেলী দেখিল ভগবান্ যেন তাহার কামনা শতগুণে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে সে তো অনাদৃতা, অলক্ষণা নয়, সর্ব্বসুলক্ষণময়ী জননী!

সতীশ চামেলীকে একটা কাজের ভিতরে ভুলাইয়া রাখিতে চাহিতেছিল, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল চামেলীর ম্লানমুখে আবার হাসি দেখা দিয়াছে, —তাহার অশ্রুরাশি প্রাণের শান্তিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। চামেলী যেন অনাথ শিশুকে বুকে লইয়া মাতৃ কুটীরে জীবন্ত ম্যাডোনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চারু মনে করিতেছিল অলক্ষণা চামেলীর প্রস্থানে শান্তি লাভ করিবে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল চামেলী সংসারের কতটুকু সুখ শান্তি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এদিকে চামেলীর অদৃষ্ট দৈবতাটীকে সে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। ম্যালেরিয়ারূপে সে শীঘ্রই অমরেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া চারুকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল।

অমরেশ তাহার ক্ষুদ্র ছেলেটীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। নিরুপায় হইয়া সে চামেলীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মাতৃ কুটীরে উপস্থিত হইল। কিন্তু চামেলীর সেই জননীমূর্ত্তি দেখিয়া অমরেশ তাহার শ্রীরূপিনি হতভাগিনী চামেলীকে ভুলিয়া গেল। এ চামেলীকে সে কিছুতেই আপনার বলিয়া দাবী করিতে পারিল না।

অবশেষে অমরেশ বলিল, "চামেলী, আমার ছেলে আজ মাতৃহীন, তাই তোমাকে লইতে আসিয়া ছিলাম। কিন্তু এতগুলি শিশুকে মাতৃহীন করিবার আমার অধিকার নাই। তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব, তুমি তাহাকে তোমার শতটীর একটী বলিয়া গ্রহণ করিও।"

চারুর ছেলেকে চামেলী একদিন কোলে করিতে সাহস করে নাই, আজ সে আপনা হইতে আসিয়া তাহার স্নেহের ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। যে একদিন একটী ছেলের মা হইবার জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে আশা জানাইয়াছিল, ভগবান তাহাকে আজ শত ছেলের মা করিয়া তাহার করুণ আশা মিটাইয়া দিলেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু—পিতার নাম গোলক চন্দ্র বসু। পিতার একমাত্র সন্তান, কুলীন কায়স্থ। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত ধীপুর গ্রামে ১৭৭৫ শকের অগ্রহায়ণ মাসে বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া উমেশ বাবু মাতুলালয় কাসিমপুরে পালিত হন। বৃদ্ধ মাতামহ দৌহিত্রকে ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হইয়া যাইবার ভয়ে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া পার্সি শিখাইবার বন্দোবস্ত করেন। মাতামহের মৃত্যুর পর মাতুলের যত্নে তিনি বাঙ্গালা পড়িতে আরম্ভ করেন। এবং এক বৎসর পড়িয়াই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। বাঙ্গালা স্কুলে পাঠ করিবার সময়ই তিনি তাঁহার মাতামহের বাঙ্গালা লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৫ বৎসর ক্রমান্বয়ে এফ, এ পড়েন। অতঃপর তাঁহার শ্বশুর বান্ধব সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের উপদেশে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি তিনি উর্দ্দু ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন। কলেজ ত্যাগের পর তিনি ভবভূতির উত্তর চরিত ও বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে "সীতা নির্ব্বাসন" নামক একখানি গীতি নাটক রচনা করেন। অতঃপর উমেশ বাবু সুপ্রসিদ্ধ সারস্বত পত্রের সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৫ বৎসর সারস্বতপত্রের কার্য্য করিয়া ৪ বৎসর বান্ধবের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। এই সময় ঢাকা হইতে "ধূমকেতু" বাহির হইলে উমেশ বাবুর হস্তে তাহার পরিচালনের ভার পড়ে। "ঢাকা রিভিউও সম্মিলনের" তিনি একজন পরিচালক ছিলেন। অতঃপর উমেশবাবু ঢাকা প্রকাশের সংস্রবে কিছুকাল কার্য্য করিয়া হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। গীত সঙ্গীত, কুমার সম্ভবের পদ্যানুবাদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি কয়েকখানা পুস্তক তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—পিতার নাম শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন। নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আমতলা। ১২৯২ সালে উমেশ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সনে মুক্তাগাছা হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ সনে ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ, ও ১৯০৮ সনে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে বি, এ পাশ করিয়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর ১৯১০

সনে স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ পাশ করিয়া ১৯১১ সনে বি, এল পাশ করতঃ ঢাকা জগন্নাথ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়াছেন। উমেশবাবু বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য চর্চ্চা করেন। পাঠ্যাবস্থায় একখানা মাসিকপত্রও বাহির করিয়াছিলেন। সৌরভে ইহার প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে।

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র—নিবাস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আতাইকুলা গ্রাম। "আত্মবোধ" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। নব্যভারত, বিজয়া প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় ইহার প্রবন্ধাদি সময় সময় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সৌরভ।

হে জননী ভাষারাণী জগৎ গৌরব,
বহিছে তোমার অঙ্গে পবিত্র সৌরভ।
অযুত ভকতগণ সেবিছে তোমায়
ঝঙ্কারি উঠিছে গীতি ললিত বীণায়।
পুষ্প কুঞ্জে তপরতা তাপসী উমার,
আজো যেন প্রেম গন্ধে ভরা চারি ধার।
আষাঢ়ের মেঘ জাল উড়ায়ে বাতাসে;
যক্ষের বিরহ বার্ত্তা ভেসে যেন আসে।
সুললিত গীতিকাব্যে জয়দেব কবি,
রাখিলা এ বিশ্ব মাঝে চরণ সুরভি।
পুরাণো অতীত কথা জাগিছে গৌরবে।
যমুনার কলোচ্ছ্বাসে কদম্ব সৌরভে;
পবিত্র তোমার অঙ্গে হে ভাষা জননি!
ফুটিছে সৌরভরাশি দিবস রজনী।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

গ্রন্থ সমালোচনা।

কেদার রায়—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত। ঢাকা নবাবপুর এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ১৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১৷৷০ টাকা, ঐ কাগজে বাঁধাই ১।০ পাঁচসিকা।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস বাঙ্গালীর গৌরব কথায় পরিপূর্ণ। সে যুগে ইশা, কেদার, প্রতাপ, রামচন্দ্র, মুকুন্দরায় প্রভৃতি বার ভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীরগণ মোগল রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্র বাবু বারভুঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর কেদার রায়ের বিস্তৃত জীবন-কথা লইয়া এই গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বারভুঁইয়ার ইতিহাস, কেদার রায়ের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা, কেদার রায়ের রাজ্য সীমা, বঙ্গে পর্ত্তুগীজ প্রভাব, বাঙ্গালী ও মোগলের ভীষণ যুদ্ধ, চাঁদ রায়ের কেদার রায়ের কীর্ত্তি কথা, ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুর ইত্যাদি বহু বিষয় অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের লিখিত প্রত্যেক বিষয়ই গ্রন্থকার ইতিহাসের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেদার রায়ের চরিত্র মহত্ব ও বীর্য্যবত্তার ইতিহাস পড়িতে পড়িতে প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বীর পুরুষ মোগল রাজশক্তি, পাঠান রাজশক্তি ও পর্ত্তুগীজ জল দস্যুগণের বিরুদ্ধে যেরূপ সাহসের সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, স্থলযুদ্ধ ও নৌযুদ্ধ উভয় প্রকার যুদ্ধে যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কেদার রায়ের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়া যোগেন্দ্র বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী মহোপকার সাধন করিলেন। গ্রন্থকার যথার্থই লিখিয়াছেন যে, দেশের ইতিহাস যাহারা ভালবাসেন, দেশকে যাহারা শ্রদ্ধা করেন তাহারা সকলেই এ গ্রন্থ খানাকে প্রীতির

চক্ষে দর্শন করিবেন। কোথায় তার প্রত্যেক ... অন্তর ... বহু ... বাঙ্গালীর গৌরব ময় কীর্ত্তি-কাহিনী। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক বাঙ্গালীই ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিবেন। গ্রন্থ মধ্যে আট খানা হাফ্‌টোন চিত্র এবং বিক্রমপুরের একখানা প্রাচীন মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শিশু সংস্করণ রামায়ণ ও শিশু সংস্করণ মহাভারত।

শ্রীহরিমচন্দ্র চাকলাদার প্রণীত ময়মনসিংহ আচার্য্য এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য প্রত্যেক খানা ছয় আনা। রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন যুগের হিন্দুর জ্ঞান বিজ্ঞানের অমৃত ভাণ্ডার। এই জ্ঞানের অমৃত ভাণ্ডার হইতে যিনি শিশুদের হাতে তাহার একটু রেণু কণা তুলিয়া দেন তিনি সমাজের ধন্যবাদার্হ। চাকলাদার মহাশয় রামায়ণ ও মহাভারতের স্থূল জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় কবিতায় প্রকাশ করিয়া শিশুদের হাতে প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদের চিত্ত রঞ্জন করিবার জন্য অনেক গুলি স্বতন্ত্র চিত্রও গ্রন্থ দ্বয়ে প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ শিশু গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তক দ্বয়ের রচনা সরল, শিশুদের উপযোগী।

পুষ্প মঞ্জরী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত মূল্য এক টাকা। এক খানা গল্প গ্রন্থ। গল্প গুলির ভাষা সুন্দর বিষয়ও মন্দ নহে। আমরা ভরসা করিতেছি এই নবীন গল্প লেখক অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র গল্প লেখায় সিদ্ধ-হস্ত হইবেন।

কাহিনী—শ্রীহরিচরণ গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত মূল্য ।৶০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন"— "দেহাবসানের পরে আত্মার কিরূপ পরিণতি হয় তাহার বিন্দু মাত্র জানিতে পারিলেও আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইব মনে করিয়া এই গ্রন্থে স্মৃতিপর অলৌকিক সত্য ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে"। তিনি আরো বলেন "মৃত্যুর পরে আত্মার বিলোপ হয় না ইহা স্থির। সুতরাং ভৌতিক দেহ ছাড়িলে আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ কেন না হইবে?"

অধ্যাত্ম তত্ত্বে রেণুকণা লইয়াই ভারত ভূমি গঠিত সেই ভারতের দর্শন এখন ধূলায় ধূসরিত। চর্চ্চার অভাবে ... উড়াইয়া দিতে প্রয়াস পান। ... সমাজকে কাহিনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আত্মা সম্বন্ধে গবেষণার ফল উদ্ধৃত হইয়াছে এইরূপ ... সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; আমরা এই গ্রন্থে এতদ্দেশীয় দৃষ্টান্ত দেখিলে অধিকতর সুখী হইতাম।

আবেদন।

আজি মোর মনে হয়
ওগো বিশ্বেশ্বরি,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে
দিবস শর্ব্বরী
বিশ্বের সকল চিন্তা
ভাব-ভাষা-গান
মাতৃ-ক্রোড়ে সুখ-সুপ্ত
শিশুর সমান
ঘুমাইয়ে আছে তব
পদ্ম-আঁখি-কোণে;—
প্রাণময়ি! তুমি
যেথা প্রীতি-ফুল্ল-মনে
কর বিন্দু নেত্র-পাত,
তখনি সেথায়
রূপ-গন্ধ-সুষমার
দীপ্ত চেতনায়
লক্ষ কলি যুগপৎ
উঠে বিকশিয়া
সারা বিশ্ব সাথে তাই
আছে মোর হিয়া
একান্ত উৎসুক হয়ে
শুভক্ষণ মাগি'
তব পুণ্য নয়নের সুধা
বৃষ্টি লাগি'—
হে সুন্দরি! চাহ চাহ
আছি আঁখি তুলি'
নন্দনের রুদ্ধ-দ্বার
যাক্ ত্বরা খুলি'॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

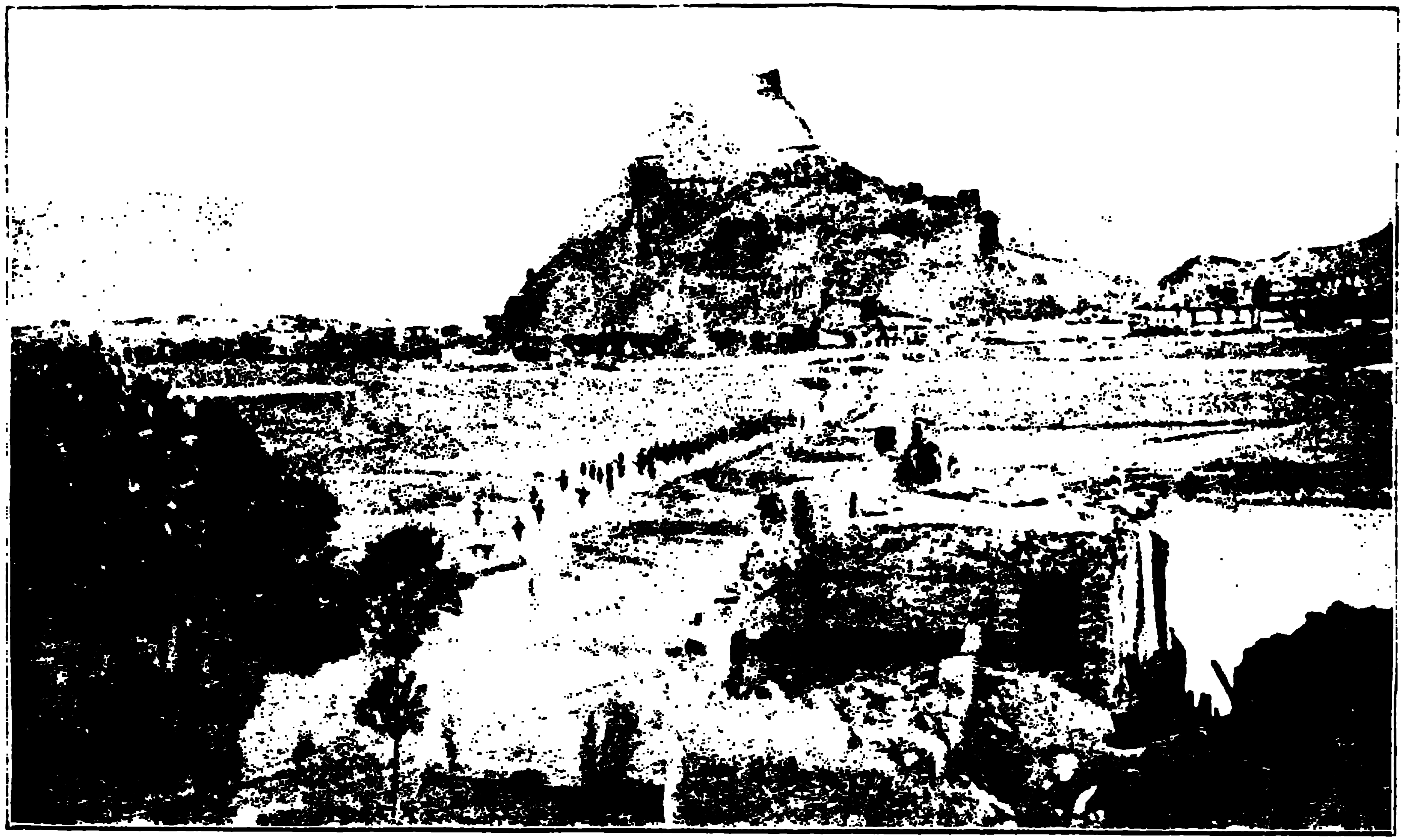

পর্ব্বতোপরি গিয়াংসী দুর্গ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২১। { চতুর্থ সংখ্যা।

আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি।

ভক্ত যখন স্মরণ করেন, দেবতার তখন আসন টলে; মর্ত্ত্যে যখন বিশ্বামিত্রের তপস্যার মত গুরুতর তপশ্চর্য্যা হয়, ইন্দ্রের তখন সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে; নব্য আলোকে অনালোকিত অনেকের মনেই এ বিশ্বাস আছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে যে এই সূক্ষ্ম সম্বন্ধ রহিয়াছে, ভারতবর্ষে এটা নূতন কথা নহে। কিন্তু এই মর্ত্ত্যবাসী জড়দেহধারী মানুষের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম মানসিক শক্তি আছে, তাহা কেবল তপশ্চর্য্যায় বা ঈশ্বর প্রেমেই ফুটিয়া উঠে এমন নহে। মাতা যখন স্মরণ করেন, বিদেশে ভোজনে উপবিষ্ট সন্তানের তখন বিষম যায়; বিপন্ন সুহৃদ যখন মনে করে, দূরস্থ বন্ধুর মনে সে বিপদের ছায়া পড়ে;—এ সকল বিশ্বাসও বাংলায় খুঁজিতে হয় না।

কালিদাস বলিতেছেন :—

'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনম বোধ পূর্ব্বং
ভাবাস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥'

মনে কোনই উদ্বেগের কারণ নাই; তথাপি রম্য বস্তু দর্শনে অথবা মধুর শব্দ শ্রবণে হঠাৎ মনের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে; মানুষ তখন অজ্ঞান পূর্ব্বক জন্মান্তরের দৃঢ় সৌহার্দ্দের কথা স্মরণ করে।

দুর্ব্বাসার শাপে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; তার পর সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। শকুন্তলা বিষয়ক ঘটনা রাজার জানা নাই; সুতরাং শকুন্তলা একাগ্র চিত্তে রাজার ধ্যান করিতেছেন যোগীর মত তাঁহাকে 'মনে করিতেছেন' বলিয়াই যে এই চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, একথা দুষ্মন্ত বুঝিতে পারিলেন না। তাই যোগ শাস্ত্রানুযায়ী এই মানসিক অবস্থার ব্যখ্যা দেওয়া হইল। পতঞ্জলির মতে ব্যাখ্যা যাহাই হউক, সুহৃদে স্মরণ করিলে যে মনের অবস্থান্তর হইতে পারে, কালিদাস কি দুষ্মন্তের এই মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহাই স্বীকার করিতেছেন না?

পতঞ্জলি বলেন, আত্মা কর্ম্মবশে নানা যোনি ভ্রমণ করে; এবং যখন যে দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই দেহের উপযোগী কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পশু দেহে যখন আত্মা বাস করিবে, তখন তাহাতে পশুর উপযোগী বাসনারই বিকাশ হইবে, এবং সেই অনুসারেই কর্ম্ম করিবে; আবার, যখন মানুষ দেহ লাভ করিবে, তখন মানুষের উপযুক্ত বাসনার অভিব্যক্তি হইবে, এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিবে। বাসনার আদি নাই ("তাসামনাদিত্ব মাশিষো নিত্যত্বাৎ।" ৪।১০), সুতরাং আত্মা অনাদি কাল হইতেই এইরূপ দেহ হইতে দেহান্তর ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। এবং যখনই কোন দেহ প্রাপ্ত হয় তখনই ঐরূপ দেহের পূর্ব্বানুভূত বাসনার বিকাশ হয়। আমি যে এই প্রথম মানুষ হইয়াছি, তা নয়; পূর্ব্বেও কোন না কোন জন্মে মানুষ ছিলাম। আবার অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ পাইয়াছি; এখন এই দেহে মানুষের উপযোগী ইচ্ছা আমার হইতেছে এবং তদ্রূপ ক্রিয়া আমি করিতে পারিতেছি। কেবল তাহাই

নয়, আমার পূর্ব্ব মানব জন্মে যা যা অনুভব করিয়াছিলাম, তার একটী স্মৃতি আমার মনে আছে, এবং আছে বলিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানুষের মত কাঁদিতে পারিয়াছিলাম এবং মাতৃস্তন্য পান করিতে পারিয়াছিলাম। অবশ্যই বুদ্ধি যেমন সকলের সমান নয়, এই স্মৃতিও সকলের সমান নয়। জাতিস্মর যিনি তিনি সমস্ত গুলি জন্মান্তর জানেন এবং প্রত্যেক জন্মের ঘটনা গুলিও মনে করিতে পারেন *। সকলে তা না পারিলেও, কিছু কিছু সকলেরই স্মৃতিতে থাকে। তা না হইলে, পশু জন্মের পর যখন মানব দেহ লাভ করা হয়, তখন তদনুরূপ সংস্কার গুলি আসে কোথা হইতে? "তত স্তদ্বিপাকানু গুণানামভি ব্যক্তি র্বাসনানাম্।" ৪।৮। সহজ জ্ঞান বা সংস্কারের (Instinct) এক অভিনব ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই!

মানুষ জন্মের পরই আবার মানুষ জন্ম, অথবা পশুজন্মের পরই আবার পশুজন্ম লাভ হইবে, এমন নয়। আজ যে মানুষ দেহে আছে, সে আত্মা হয়ত, সহস্র বৎসর পরে, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া, মানবদেহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যখন যে পশুদেহে বা বৃক্ষদেহে বা দেবদেহে ছিল, তখন তাহার তদনুরূপ বাসনারই অভিব্যক্তি হইয়াছিল, মানুষ-বাসনার অভিব্যক্তি হয় নাই। আবার এখন মানুষ দেহ পাওয়া মাত্রই, মানুষ-বাসনার অভিব্যক্তি হইয়াছে। দেশকাল প্রভৃতির ব্যবধান সত্বেও এইরূপ হইয়া থাকে, কারণ স্মৃতিমাত্রই সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং তাহা চিত্ত-সত্বে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। "জাতিদেশকাল ব্যবহিতা নাম প্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ। ৪।৯।

পতঞ্জলি হইতে, তা হইলে আমরা পাইলাম এই যে ঃ—

১। যে কোন আত্মা কর্ম্মানুসারে দেব দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ-গুল্ম দেহ পর্য্যন্ত আশ্রয় করিতে পারে।

২। অনাদি কাল হইতে আত্মা এইরূপ দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে।

৩। যখন আত্মা যে দেহে বাস করে, তখন তার তদ্রূপ বাসনারই অভিব্যক্তি হয়; অন্য দেহোপযোগী বাসনা তখন অব্যক্ত থাকে। "ইতরাস্তু সত্যোঽপি অব্যক্তসংজ্ঞাং তিষ্ঠন্তি।"

ইহার মধ্যে মূল কথা এই যে, অবস্থাবিশেষের সঙ্গে বাসনা বিশেষের সম্বন্ধ আছে; যে অবস্থায় যে বাসনার জন্ম হয়, সেই অবস্থার পুনরাগমনে সেই বাসনারও পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। এখন, এই অবস্থা অর্থ একই শরীরের বিভিন্ন সময়ের অবস্থা হইতে পারে এবং বিভিন্ন শরীরের অবস্থাও হইতে পারে। বলা অনাবশ্যক, যে শেষোক্ত অর্থটী বিভিন্ন শরীরের অস্তিত্ব অর্থাৎ জন্মান্তর বাদের উপর নির্ভর করে। যদি তাহা নাও মানি, তথাপি প্রথম অর্থটী গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? এটা কি ঠিক নয় যে আমাদের শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ মানসিক অবস্থার সুতরাং বাসনারও পরিবর্ত্তন হয়? এটা কি ঠিক নয়, যে শৈশবের ইচ্ছা যৌবনে থাকে না অথবা বার্দ্ধক্যের ইচ্ছা যৌবনে ফুটে না? শুধু তাই নয়; একথা কি কেহ অস্বীকার করিবেন যে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ২ পর্য্যন্ত বাসনার পরিবর্ত্তন হয়? প্রখর গ্রীষ্মেই ডাব খাইতে ইচ্ছা হয়, শীতে নয়। কেবল যে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনার পরিবর্ত্তন হয়, তা নয়। প্রত্যেক দিনই, প্রতি মুহূর্ত্তেই, শারীরিক অবস্থার সঙ্গে ২ বাসনার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ক্ষুধা হইলেই খাইতে ইচ্ছা হয়, আর তৃষ্ণা পাইলেই লোকে পান করিতে চায়, অন্যত্র নয়। সুতরাং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে যে বাসনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়?

মানুষের অবশ্যই নিজের উপর একটা কর্ত্তৃত্ব আছে; তার ফলে, অনেক সময় সে নিজের ইচ্ছার জন্মদাতা; এবং কোন ২ ইচ্ছার বিনাশকও বটে। কু-প্রবৃত্তি দমন অর্থ কতকগুলি ইচ্ছা বিনাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং সৎপ্রবৃত্তি লাভ অর্থ কতকগুলি ইচ্ছার সৃজন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যে কথায় বার্ত্তায় এ সমস্ত উপদেশ দিয়া থাকি, তাতেই প্রমাণ হয় যে মানুষের নিজের উপর যে একটা কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। এই কর্ত্তৃত্বের ফলে, মানুষের বেলায় কখনও কখনও বাসনামাত্র শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করেনা সত্য, তথাপি শারীরিক অবস্থা যে ইচ্ছার জন্ম দিতে

(১) "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।" গীতা।

পারে না, তাহা নয়। মানুষ নিজের ক্ষমতা বলে ইচ্ছাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে মাত্র।

ইচ্ছা যে শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, ইতর প্রাণীর বেলায় তাহা অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। কোকিল বসন্ত কালেই ডাকে—সারা বছর জুড়িয়া নয়। পিপীলিকা বর্ষাকালেই আহার্য্য সংগ্রহ করে, শীতে নয়। পাখীর মধুর কলকলধ্বনী প্রভাতের নিদ্রাই ভঙ্গ করে – অপরাহ্নের নয়।

পতঞ্জলি যদি কেবল এই মাত্র বলিতেন তাহা হইলে যে একটা খুব নূতন কথা হইত, তাহা বোধ হয় না; এবং আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে তাঁহার কোন কলহও থাকিত না। কিন্তু আত্মার জন্মান্তরের স্মৃতি আছে— এই একটা নূতন কথা তিনি বলিতেছেন। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে (১) জন্মান্তর সম্ভব এবং আছে; (২) আত্মার জন্মান্তরে স্মৃতি সম্ভব।

পতঞ্জলি ইহা কি ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, অথবা মোটে প্রমাণ করিয়াছেন কি না,সে বিচার আমরা এখানে করিতে চাই না। উপরে পতঞ্জলির মত সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই পাইতেছি, ইন্দ্রিয় সাহায্য ছাড়াও যে আত্মার বিষয় জ্ঞানের একটা সূক্ষ্ম শক্তি আছে, তাহা কেবল কাব্যে বা সাধারণ বিশ্বাসেই স্বীকৃত হইতেছে এমন নয়; দার্শনিক গবেষণার ভিতরও তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পরিস্ফুট।

বাসনা যেমন শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, শারীরিক অবস্থাও আবার তেমনি বহির্জগতের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং যখনই কোন বাসনার উদয় হয়, তখন তদনুযায়ী শরীরের একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে একথা আমরা বুঝিতে পারি। শুধু তাই নয়; শরীরের পরিবর্ত্তন যখন বহির্জগতের পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে, তখন বহির্জগতেরও একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। কোকিল যদি কেবল গায়ক না হইয়া একটু ভাবিতেও জানিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত যে তার যখন গান গাইতে ইচ্ছা হয়, তখন সেটা বসন্ত কাল। এখানে মানসিক অবস্থা হইতে বহির্জগতের জ্ঞান লাভ হইতেছে। এবং মনস্তত্ত্ববিদের মতে বহির্জগতের সমুদায় জ্ঞানই প্রায় এইরূপ মানসিক অবস্থা বা বেদনার (sensation) উপর নির্ভর করে। কিন্তু কালিদাস যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন সেটা বহির্জগতের জ্ঞান নহে, আত্মার নিজের জন্মান্তরীয় অবস্থার জ্ঞান; এবং এই জ্ঞান আত্মার অবস্থা হইতেই লাভ হইয়া থাকে, অথচ আত্মার এই অবস্থার কারণ জড়জগতে কুত্রাপি নাই। যদিও রাঘব ভট্ট কালিদাসের ঐ শ্লোকটা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পতঞ্জলির ঐ সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাপি পতঞ্জলি উদ্ধৃত সূত্রে ঠিক কালিদাসের কথাই বলিয়াছেন বোধ হয় না। তা হইলেও বহির্জগতের পরিবর্ত্তন দ্বারা উৎপন্ন শারীরিক পরিবর্ত্তনের সাহায্য ছাড়া অর্থাৎ (sensation) এর সাহায্য ছাড়াও যে আত্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারে,ইহা পতঞ্জলি স্বীকার করিয়াছেন। (যোগদর্শন-বিভূতি পাদ)। এইটাকেই আমরা আত্মার একটা সূক্ষ্ম শক্তি বলিতে চাই। যে শক্তি দ্বারা শরীরের বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া ও আত্মা জ্ঞান লাভ করে, তাহা একটা সূক্ষ্ম শক্তি বই কি?

আধুনিক মনস্তত্ত্বে আমরা পাইঃ—

(১) বাহিরের জড়জগতের জ্ঞান—জড়জগৎ কর্ত্তৃক আমাদের শরীরের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা হইতে পাই অর্থাৎ এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ।

(২) অন্য আত্মার অস্তিত্ব বা অবস্থার জ্ঞান—ঐ আত্মা জড়জগতে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে—তাহা হইতে লাভ হয়। ভাষার সাহার্য্যে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও জড়জগতের নিকট ঋণী—কারণ শব্দ বায়ুর উপর নির্ভর করে। আমি তখন ভাষায় আমার মনের ভাব ব্যক্ত করি, তখন জড়জগতেও কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইতেছে; আর যখন মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব ধরিয়া নেওয়া হয়, তখনও জড়জগতের ক্রিয়া হইতেই জ্ঞান লাভ হইতেছে—কারণ মুখ জড়জগতের।

কিন্তু যে সূক্ষ্ম শক্তির কথা আমরা বলিতেছি, তাহা দ্বারা এ ছাড়া অন্য উপায়ে এবং অন্যবিধ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

১ম। জন্মান্তরের সুখের (এবং হয়ত, দুঃখেরও) কথা—(কালিদাস) ; জন্মান্তরের বাসনার কথা (পতঞ্জলি) এই উভয় জ্ঞানই আত্মার অবস্থার উপর নির্ভর করে ; কিন্তু কালিদাসের মতে আত্মার এই অবস্থা ঝড় জগতের কোন পরিবর্ত্তনের সহিত সম্পৃক্ত নহে ; পতঞ্জলির মতে উহা শরীরের অবস্থার উপর নির্ভর করে সুতরাং জড় জগতের সহিত সম্পৃক্ত।

২য়। অন্যের মনের অবস্থার জ্ঞান ;—(কালিদাসের বাস্তব অর্থ)। দুষ্মন্ত যদিও জানেন না, তথাপি বস্তুতঃ শকুন্তলা তাঁহাকে দুঃখ সংবিগ্ন চিত্তে স্মরণ করিতেছেন এবং সে জন্যই তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর।

এই খানে আত্মা নিজের অবস্থা হইতে জ্ঞান লাভ করিতেছে। এবং এই অবস্থা অন্য আত্মার ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, জড় জগৎ কোনও রূপে সাহায্য করে না।

এই খানে আমরা আর একটী বিষয় পাইতেছি। আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি যে কেবল জ্ঞানোৎপাদিনী তাহা নহে ; কার্য্যকারিনী সূক্ষ্ম শক্তিও আত্মার একটা আছে। শকুন্তলার আত্মা দুষ্মন্তের আত্মার যে ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা জড় জগতের সাহায্য ছাড়া ; সুতরাং ইহা একটী সূক্ষ্ম কার্য্যকারিনী শক্তি নয় কি ? আবার লৌকিক বিশ্বাসে আমরা পাই যে মাতা স্মরণ করিলে সন্তান খাইতে বসিলে তাহার বিষম যায়, এখানে মাতার আত্মা সূক্ষ্ম ভাবে পুত্রের দেহে একটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতেছে। সুতরাং কার্য্য কারিনী সূক্ষ্ম শক্তিও দ্বিধা বিভক্ত হইতে পারে ঃ—

(১) অন্য আত্মার উপর ক্রিয়া ; (২) অন্যের দেহের উপর ক্রিয়া। উভয়ই জড়জগতের সাহায্য ছাড়া ক্রিয়া হয়।

আর একটী বিষয়ের প্রতি এখানে কেবল উল্লেখ মাত্র করিব। সকলেই জানেন নিমিত্ত কথাটীর একটী বিশেষ অর্থ আছে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নহে, সাধারণ বিশ্বাসেও আমরা পাই যে অক্ষিস্পন্দন বা বাহু স্ফুরণও ভবিতব্যতা সূচনা করে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কেবল আত্মার নয়, জড় জগতেও একটা সূক্ষ্ম শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

আত্মার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য কিনা একবার বর্ত্তমান আলোকে দেখা উচিত। এবং যদি তাহা সত্য হয়, নূতন করিয়া আত্মার সংজ্ঞা দিতে হইবে।

জড় বুদ্ধি—প্রতীচীকে এই আখ্যা দিতে সাহস আমার নাই। কিন্তু Like knows like এটা অত্যন্ত পুরাণ কথা ; এবং প্রতীচীর পরিচয় জড়ের সহিতই বেশী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুকে উপদেশ দিয়াছিলেন "জাড্য দোষ দূর কর।" দেখিতেছি, সময় আসিয়াছে যখন, একটু ভিন্ন অর্থে, মনস্তত্ত্ববিদকেও একথাটী স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তিব্বত অভিযান।

গিয়াংসী-দুর্গ-অধিকার।

খুব তাড়াতাড়ি করিয়াও জেনারেল সাহেব ২৬এ জুনের পূর্ব্বে গিয়াংসী উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সহিত প্রায় ২০০০ এর উপর সৈন্য আসিল। এই সময় গিয়াংসী দুর্গ ও মঠে প্রায় ৮০০০ তিব্বতীয় সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য স্থানেও প্রায় ১৫০০ সৈন্য একত্র হইয়াছিল। ২৮ এ জুন জেনারেল সাহেব স্বয়ং দুর্গ ও মঠ আক্রমণ করিলেন। ঠিক ঐ সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু আমাদের সৈন্যেরা তাহাতে বিন্দুমাত্র নিরোৎসাহ হইল না।

প্রথমে আমরা মঠ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলাম। এই কার্য্যে আমাদের গুর্খা ও পাঠান সৈন্য নিযুক্ত হইল। প্রাতঃকাল ৭টা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার পর তিব্বতীয়েরা মঠ হইতে তাড়িত হইল। ইহা হইতে পাঠক হয়ত বুঝিতে পারিবেন যে উহারা নিতান্ত কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করে নাই। কিন্তু যখন শুনিলাম যে, এই সমস্ত দিবস ব্যাপী যুদ্ধে আমাদের মোটে ছয় জন হত ও আহত হইয়াছে, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম।

পরদিবস আমরা গিয়াংসী দুর্গ তিন দিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম যে দুর্গের ভিতর পানীয় জলের কোনও বন্দোবস্ত নাই। উহা বাহির হইতে লইয়া যাওয়া হয়। আমরা অবশ্য প্রথমেই ঐ জল লইবার পথ বন্ধ করিলাম। সে দিবস আর কিছুই হইল না। কিন্তু জল বন্ধ করিবার ফল ঐ দিন সন্ধ্যার

গিয়াংসী দুর্গ-দ্বার।

পর আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন লামা শ্বেত পতকা হস্তে লইয়া জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও ২৪ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে লাসা হইতে দুইজন কর্ম্মচারী সন্ধি করিবার জন্য আসিতেছেন। তাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গিয়াংসীতে উপস্থিত হইবেন। জেনারেল সাহেব সম্মত হইলেন। তিনি পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন; তবে অবরোধ ত্যাগ করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন কেহই আসিল না, তখন আমাদের সিপাহীরা কয়েকটা ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া জানাইয়া দিল যে, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে সংবাদ আসিল যে লাসা হইতে উক্ত কর্ম্মচারীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জেনারেল সাহেব স্থির করিলেন যে, পরদিবস প্রাতঃকালে ইংরাজ শিবিরে সন্ধির বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে।

যথাসময়ে লাসার কর্ম্মচারীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ বৃথা তর্ক-বিতর্কের পর কর্ণেল ইয়ংহজবেণ্ড * স্পষ্ট বলিলেন, যে পর্য্যন্ত না আপনারা গিয়াংসী দুর্গ ত্যাগ করিতেছেন সে পর্য্যন্ত আমি সন্ধির কোনও প্রস্তাবে কর্ণপাত করিব না। ইহার পর আর কথা চলে না। লাসার কর্ম্মচারীরা কোনও উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

৫ই জুলাই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিবস ভীষণ যুদ্ধের পর ঠিক সন্ধ্যার সময় দুর্গের সর্ব্বোচ্চ তোরণে ব্রিটিস্ পতাকা উড়িতে লাগিল। পর্ব্বতের উপর এই সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে প্রায় ৮০০০ সৈন্য ছিল। আড়াই হাজার ইংরাজ সিপাহী কর্ত্তৃক এ প্রকার স্থান অধিকার করা যে, খুব প্রশংসার কথা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমি অধিকাংশ সময় কিয়ৎ দূরে দাঁড়াইয়া এই দুর্গাধিকার পর্ব্ব দেখিতেছিলাম। পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করা যে

* পাঠকের মনে থাকিতে পারে তিব্বত অভিযানে দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম জেনারেল ম্যাকডোনেল্ড (General Macdonald) অভিযানের সমস্ত সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহার উপর। যুদ্ধ স্থলে সৈন্য পরিচালনার ইনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। দ্বিতীয়—কর্ণেল্ ইয়াংহজ ব্যাণ্ড Colonel Young Husband) তিব্বতীয় দিগের সহিত সন্ধি প্রভৃতি সংস্থাপনে ইনি সর্ব্ব প্রধান। অর্থাৎ এই অভিযানে Macdonald প্রধান Military Officer ও Young Husband প্রধান Political officer নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কি প্রকার কঠিন কার্য্য এবং আমাদের দেশীয় সিপাহীরা ইংরাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে যে কি প্রকার অমানুষিক শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করে, তাহা সে দিন আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। যে সময়ে আমাদের সিপাহীরা পর্ব্বতের উপর তোপ উঠাইতেছিল, সে সময়ে শ্রাবণের ধারার মত তাহাদের উপর গুলি পড়িতেছিল। তাহাতে কিন্তু উহারা নিমেষের জন্যও ইতস্ততঃ করিল না। একজন পড়িতেছে, চক্ষুর নিমেষে আর একজন যাইয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। যে মরিল বা আহত হইল, তাহার দিকে কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া দেখিতেছিল না। হয়ত সে আর একজনের পরম বন্ধু

ইংরেজ সৈন্যের গিয়াংসী প্রবেশ।

বা অতি নিকট আত্মীয়, কিন্তু সে সময় সেসব কথা কেহই ভাবিতে ছিল না। কতজন পড়িয়া 'জল' 'জল' করিতেছে, কেহবা হয়ত ঘোড়ার নীচে অর্দ্ধপ্রোথিত ভাবে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে, কাহারও একটা হাত, কাহারও একখানা পা, কাহারও বা মুখের কিয়দংশ উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। আমার কতবার মনে হইল, যাইয়া উহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করি। কিন্তু কর্ম্মচারীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করাতে আমাকে বাধ্য হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইল। সুখের বিষয় এই যে, ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন কর্ম্মচারী ও ভিস্তি আসিয়া ঐ সকল আহত দিগকে নানা প্রকার ভাবে সাহায্য দান করিতে লাগিল। সেদিনকার দৃশ্য কিন্তু অনেক দিন আমার মনে থাকিবে। যুদ্ধ যে কি নির্ম্মম পৈশাচিক ব্যাপার, তাহা আজ হাড়ে ২ অনুভব করিলাম।

গিয়াংসী দুর্গ অধিকৃত হইবার পর আমাদের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। চারিদিককার সমস্ত তিব্বতীয় সৈন্য দুই একদিনের মধ্যে একবারে অদৃশ্য হইল।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

তৃণ।

(১)

আমরা তৃণ—ঘাস,
এই যে বিশাল পৃথিবীটা,
আমাদেরি বাস্ত ভিটা,
বাস্তবিকই মোদের এটা,
আদিম অধিবাস!
আম্‌রা আছি জলে স্থলে,
গিরি গাত্রে সাগর তলে,
প্রান্তরে কান্তারে করি
বসত বার মাস!

আম্‌রা চির জীবন পন্থী,
আম্‌রা চির মরণ মন্থী,
মোদের প্রতি মর্ম্ম গ্রন্থি
জীবন জয়োচ্ছ্বাস!
আমাদের নাই মৃত্যু জরা,
উদ্যম অধ্যবসায় ভরা
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে
নবীন অভিলাষ!

(২)

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
আমাদেরে ক্ষুদ্র বলি,
তোম্‌রা যাও চরণে দলি,
কথায় কথায় রঙ্গ কর—
ব্যঙ্গ উপহাস,
জগৎটা তোমাদের জন্য,
ভাগী অংশী নাইক অন্য,
আম্‌রা যত অকর্ম্মণ্য
তোমাদের বিশ্বাস!
তাই সে মোদের নাশে রত,
তোম্‌রা আছ অবিরত,
ক্ষুর্‌পী কোদাল লাঙ্গল দিয়ে
নিত্য কর চাষ!

(৩)

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
তোমাদের ও শস্য ফলে,
পৃথিবীটা ক' দিন চলে,
কয়টা জীবের বল উহা,
কত দিনের গ্রাস?
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু,
কত জীব যে ক্ষুদ্র তনু,
পিপীলিকা কীট পতঙ্গ
থাকবে উপবাস?
ছাগল গরু ঘোড়া ভেড়া,
অনাহারে মর্‌বে এরা,
তাদের ছেড়ে বাঁচ্‌বে তোম্‌রা
এই কি মনের আশ?

কি অহঙ্কার কি গরিমা,
স্পর্দ্ধার নাইক পরিসীমা,
লাজে মরি দেখে এমন
বিদ্যা পরকাশ!

(৪)

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
কীটানুকীট পশু পাখী,
আম্‌রা জগৎ বাঁচায়ে রাখি,
আম্‌রা যোগাই সবার অন্ন
নইলে উপবাস!
আত্মদানে আম্‌রা ধন্য,
পবিত্র কৃতার্থম্মন্য
দধীচির কি বিশ্ব হিতের
এমন অভিলাষ?
পরসেবা জীবন ব্রত,
তাই আমরা পদানত;
বিনয়েতে হলে নত
মানের হয় কি হ্রাস?

(৫)

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
হাজার হলে ঘৃষ্ট-পিষ্ট,
হইনা ক্লান্ত হইনা ক্লিষ্ট,
নিরুৎসাহ নিরুদ্দিষ্ট,
নিরাশ নিরাশ্বাস!
পণ—প্রতিজ্ঞা নাহি টলে,
নিত্য দহি দাবানলে,
নিত্য সহি বর্ষা বাদল,
প্রলয়ের উচ্ছ্বাস,
কর্ম্মে মোদের নাইক ক্ষান্তি,
ধর্ম্মে মোদের নাইক ভ্রান্তি,
চাইনা অবসর কি শান্তি
চির রণোল্লাস!
আম্‌রা ত জানিনা ভয়,
মরণ কিম্বা পরাজয়,
আমাদের এ জীবন কেবল
জয়ের ইতিহাস!

জন্মভূমি—জন্ম মাটী,
আম্‌রা ভালবাসি খাটি,
বুকে ঢেকে বুকে হাটি—
বদ্ধ স্নেহ পাশ,
মোদের হলে ছাড়াছাড়ি,
মরণ যে হয় দু’জনারি,
কেহবা হই মরুভুমি
কেউ বা মরা ঘাস!
দেখে মোদের কর্ম্ম-শক্তি,
অতুলন এ দেশ ভক্তি,
সেবা ধর্ম্মে আসুরক্তি
নিষ্কাম প্রয়াস,
মহানন্দে তৃণের অর্ঘ্য,
শির পেতে লয় সুর বর্গ,
কার বল অলকা স্বর্গে
এমন জয়োচ্ছ্বাস?
আম্‌রা তৃণ—ঘাস!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভারতে পারদ।

কোন্ অতীত যুগে পারদ ভারতে আবিষ্কৃত এবং কিরূপে ইহার প্রচার সাধিত হইয়াছিল, আমরা এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। ইহার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা এই তথ্যে উপনীত হইয়াছি যে খৃষ্টের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে ভারতের সহিত গ্রীক আল্-কেমিষ্টদিগের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। অমরকোষে পারদের নিম্নলিখিত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"চপলো রসঃ সূতশ্চ পারদে।"

চপল, রস, সূত ও পারদ। বিশ্বকোষে এই চারিটী নাম ব্যতীত "হরবীজ" নামও পাওয়া যায়। কোনও বেদে কিন্তু এই ধাতুর উল্লেখ নাই। সামবিধান ব্রাহ্মণে পারদ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তথায় ইহার অর্থ দ্বারা কোন ধাতুকে বুঝায় না। মনুসংহিতায় ও মহাভারতে এক জাতির নাম অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, মনুতে—

পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খশাঃ। ১০।৪৪

উপরি উদ্ধৃত অংশে দরদ নামও পাওয়া যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে দরদ শব্দ হইতে কিরূপে দারদ্ শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার ব্যাখ্যা আছে। মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশে দরদ্ জাতির উল্লেখ আছে। 'ললিত বিস্তরে' দরদ লিপির কথা দেখা যায়। অতএব প্রাচীন কাল হইতেই পারদ ও দরদ জাতির নাম আর্য্যগণ অবগত ছিলেন। কিন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ে ধাতব বা খনিজ পদার্থ তখনও বুঝাইত না। বর্ত্তমান দর্দি স্থানই প্রাচীন দরদ জাতির বাসস্থান ছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে চরক সংহিতা খৃষ্টের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

এই গ্রন্থে পারদ ও দরদের নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে পারদ ধাতু বোধ হয় তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিম্বা, ঔষধার্থে তখনও ইহার প্রয়োগ হয় নাই। সুশ্রুতে আমরা প্রথম পারদ শব্দ ধাতু অর্থে প্রাপ্ত হই। তাহাও কেবল একটী স্থলে বর্ত্তমান; হিঙ্গুল বা দরদ নাম কিন্তু এ গ্রন্থেও নাই।

রক্তং শ্বেতং চন্দনং পারদঞ্চ কাকোল্যাদি ক্ষীর পিষ্টশ্চবর্গঃ।

সুশ্রুত, চিকিৎসিত স্থান, ২৫।১৫

"রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন, পারদ ও কাকোল্যাদি বর্গ দুগ্ধে পেষণ করিয়া"। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের মতে সুশ্রুত খৃষ্টের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। অতএব পারদ খৃঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পরিজ্ঞাত বলা যাইতে পারে।

গ্রীক বৈজ্ঞানিক থিওফ্রেষ্টস খৃষ্টের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিঙ্গুল হইতে পারদ নিষ্কাশন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যদিও গ্রীকদিগের সহিত আর্য্যদিগের পরিচয় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি হিন্দুগণ যে গ্রীকদিগের নিকট পারদ প্রাপ্ত হন নাই তাহা প্রাচীন পারদ নামই প্রমাণ করিতেছে। থিওফ্রেষ্টস্ ইহাকে "আগু্রসফুটস্" বা তরল-রজত নাম প্রদান করেন। যদ্যপি হিন্দুগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে এই ধাতু প্রাপ্ত হইতেন, তবে গ্রীক নামেই ইহা তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইত। গ্রীকগণও পারদ জাতির নিকট এই

ধাতুর প্রথম সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কি না এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হইতে পারে।

সুশ্রুতের পর বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গ হৃদয় (২০০—৩০০ খৃঃ অব্দে) রচিত হয়। ইহাতে পারদের সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ হৃদয়, উত্তর স্থান, ১৩।১৬ দ্রষ্টব্য।

৫৮৭ খৃঃ অব্দে রচিত বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় পারদ ধাতুর উল্লেখ আছে। হিঙ্গুল নাম এই গ্রন্থে প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"মাক্ষীক ধাতু মধু পারদ লোহচূর্ণ পথ্যা শিলাজতু বিড়ঙ্গ ঘৃতানি যো হন্যাৎ।"

এই যুগেও পারদ নামই প্রচলিত রহিয়াছে দেখা যায়।

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বাসব দত্তায়ও পারদ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"পারদ পিণ্ডইব কাল ধাতু বাদিনঃ।"

(ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দ্বারা উদ্ধৃত হিন্দু কেমিষ্ট্রী ২য় ভাগ। ১৩৪ পৃঃ।)

"কুব্জিকা তন্ত্র"নামে একখানা গ্রন্থ, ভারতের বহির্দ্দেশে সম্ভবতঃ নেপালে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেন। এই তন্ত্রে পারদ শিবের বীর্য্য বলিয়া বর্ণিত এবং রস নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"মদ্বীর্য্যঃ পারদো যদ্বং পতিতঃ স্ফুটিতং মণিঃ।"

আরো বলিতেছেন—

"রসবিদ্ধং যয়া তাম্রং ন ভূয় স্তাম্রতাং ব্রজেৎ।"

(হিন্দুকেমিষ্ট্রী ২য় ভাগ। পৃঃ xliii ও x iv)

"রস (পারদ) দ্বারা বিদ্ধ হইলে তাম্র পুনরায় তাম্রতা প্রাপ্ত হয় না।"

পারদের রস ও শিববীর্য্য নাম ইহার পূর্ব্বে আমরা কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হই না এবং পারদের দ্বারা তাম্রকে সুবর্ণে পরিণত করারও উল্লেখ প্রাচীনতর কোন গ্রন্থে নাই। কোন প্রাচীন গ্রন্থে হীন ধাতুকে সুবর্ণ করিতে পারা যায় এরূপ ধারণার কথা ভারতে প্রচারিত হয় নাই। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কুব্জিকা তন্ত্রই এই বিষয় প্রথম প্রচার করেন। নিম্নোক্ত শ্লোকে "ষড়বিপ্রজারণ"পারদ তন্ত্রের বর্ণনাও কুব্জিকাতন্ত্রে দেখা যায়।

মদ্বীর্য্যেণ প্রসূতাস্তে তাবার্য্যা সূনকে বহি।

তিষ্ঠন্তি সংস্কৃতাঃসত্বঃ তস্মা ষড় বিপ্র জারণাদ্।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই তন্ত্র সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

"In short we have ample references to alchemical processes described in the very technical terms in which Rasarnav, Rasaratnakar and other typical works of the Tantric period abound."

অর্থাৎ "সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তান্ত্রিক যুগের রসার্ণব রসরত্নাকর প্রভৃতি আদর্শ গ্রন্থে যে সকল পারিভাষিক শব্দ বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়াছে, (এই তন্ত্রে) ঠিক্ সেই সকল শব্দ দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সকল বর্ণিত হওয়ার যথেষ্ঠ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।"

কুব্জিকা তন্ত্রে আমরা আরো দেখিতে পাই যে ভারতবর্ষে এই তন্ত্র প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। যথা—

গচ্ছত্বং ভারতেবর্ষেঽধিকারায় সর্ব্বতঃ।

পার্ব্বতী শিবকে ভারতের সর্ব্বদেশে গমন করিতে বলিতেছেন। ইহা দ্বারা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বহির্দ্দেশে পারদ-ক্রিয়া সকল বিশেষরূপে পরীক্ষিত এবং উহাদের পারিভাষিক শব্দ ও সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল।

হর্ষ চরিত ৭ম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে রসসিদ্ধ নাগার্জ্জুনের উল্লেখ আছে। নাগার্জ্জুন বিরচিত রসরত্নাকর গ্রন্থ তাহা হইলে হর্ষ চরিতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আচার্য্য রায়ের মতে উহা ৭ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আমরা পারদের কতকগুলি নূতন নাম ও প্রক্রিয়া দেখেতে পাই।

১ম। এই গ্রন্থে সূত, সূতক ও খোট নাম পারদে অর্পিত হইয়াছে। যথা—

দরদং পাতনা যন্ত্রে পাতিতঞ্চ জলাশয়ে।

সত্বং সূতক সঙ্কাশং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৭

"পাতনা যন্ত্রের দ্বারা দরদ (হিঙ্গুল) হইতে সূতক সদৃশ সত্ব জল মধ্যে পতিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

নানাবর্ণং ভবেৎ সূতং বিহায় ঘন চাপলম্।

ঘনত্ব ও চাপল্য ত্যাগ করিয়া সূত নানা বর্ণ যুক্ত হয়।

অগ্নিমধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ খোটবদ্ধস্য লক্ষণম্॥

যখন অগ্নি মধ্যে অবিকৃত থাকে তখনই খোটের বদ্ধ-লক্ষণ জানিও। এই গ্রন্থে পারদকে পার্ব্বতীনাথ-সম্ভব বলা হইয়াছে ; যথা—

এক এব মহাদ্রাবী পার্ব্বতীনাথ সম্ভব। ৫০

পার্ব্বতীনাথ সম্ভব (পারদ) সর্ব্বাপেক্ষা দ্রবকারী বস্তু।

পারদ জাতির নিকট পারদ প্রথম পাওয়া গিয়াছে বলিয়া পারদ নাম ভারতে সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত হয়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু রস, সূত, খোট ও শিববীর্য্য নাম কেন ইহাতে অর্পিত হইল, ইহাদের মূল কোথায়, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। পূরে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

১। রসরত্নাকরে আমরা একটী প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই ; তাহাকে "রসবন্ধ" নাম প্রদান করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ার বর্ণনায় পারদের মৃত, মূর্চ্ছিত ও বদ্ধ অবস্থার লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে ঐ অংশ উদ্ধৃত হইল।

অথাতো রসবন্ধাধিকারং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
আর্দ্রত্বঞ্চ ঘনত্বঞ্চ চাপল্যং গুরুতেজসঃ।
যস্যৈতানি ন দৃশ্যন্তে তং বিদ্যামৃত সূতকম্।
নানাবর্ণং ভবেৎ সূতং বিহায় ঘন চাপলম্।
লক্ষণং দৃশ্যতে যস্য মূর্চ্ছিতং তং বদন্তিহি॥
গুরুত্বমরুণত্বং বা তেজো ভাস্কর সন্নিভম্।
অগ্নিমধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ খোটবদ্ধস্য লক্ষণম্॥

"অতঃপর রস-বন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিব।"

"গুরু (শ্রেষ্ঠ) তেজসের আর্দ্রত্ব, ঘনত্ব, ও চাপল্য যখন দেখা যাইবে না, তখনই সূতককে মৃত জানিও। ঘনত্ব ও চাপল্য ত্যাগ করিয়া সূত নানা বর্ণ যুক্ত হয় ; এরূপ লক্ষণাক্রান্ত দেখিলে তাহাকে মূর্চ্ছিত বলে। যখন ইহার গুরুত্ব, অরুণের মত বর্ণ, বা ভাস্করের মত তেজ অগ্নি মধ্যে অবিকৃত থাকে তখনই খোটের বদ্ধ-লক্ষণ জানিবে।"

পারদ-বন্ধ বা পারদ ভস্মের উল্লেখ যেমন ৭ম শতাব্দীর ভারতীয় গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইহার উল্লেখ আমরা ৫ম শতাব্দীর গ্রীক আল-কেমিষ্ট জোসিমসের গ্রন্থেও দেখিতে পাই। উপরি বর্ণিত লক্ষণ যে গ্রীক দিগের নিকট প্রাপ্ত, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে আমরা পারদের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি কুব্জিকা তন্ত্রে ইহার একটী নাম "রস"। অমরকোষে "রস" শব্দের বিভিন্ন অর্থ এইরূপ "শৃঙ্গার যৌবিষে বীর্য্যে গুণে রাগে দ্রবে রস।" দেখা যাইতেছে যে দ্রব অর্থাৎ তরল দ্রব্য ও বিষময় পদার্থ রস বাচ্য। পারদকে এই অর্থে রস পর্য্যায় ভুক্ত করা যাইতে পারে। সেজন্য কিন্তু ইহারাই কেবল "রস" নাম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত রসতন্ত্র সমূহে কতকগুলি দ্রব্য মহারস বা রস পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াছে। পারদ কিন্তু তাহাতে স্থান পায় নাই। ঐ সকল তন্ত্রে পারদ "রস" নামে অনেক স্থলে উল্লিখিত হইলেও রস পর্য্যায় ভুক্ত হয় নাই কেন ? নিম্নে কতকগুলি রস শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

বৈক্রান্ত কান্ত সস্যক মাক্ষিক বিমলাদ্রি দরদ রসকাশ্চ।
অষ্টৌ রসা স্তথৈষাং সত্বানি রসায়ণানি স্যুঃ॥ ৯ পটল

(রসহৃদয় ১১ শ, শতাব্দীতে রচিত) "বৈক্রান্ত, চুম্বক লোহ, তুতিয়া, মাক্ষিক (Copper pyrites), বিমল, অদ্রি, (bitumen) দরদ (হিঙ্গুল) ও রসক (Calamine) এই আট প্রকার রস। ইহাদের সত্ত্ব রসায়ণে প্রযুক্ত হয়।"

গন্ধক গৈরিক সুশিলা ক্ষিতি খেচর মঞ্জনঞ্চ কঙ্কুষ্ঠম্।
উপরস সংজ্ঞমিদং স্যাৎ। * * * ৯ম পটল, রসহৃদয়।

গন্ধক, গেরিমাটি, সুশিলা, ক্ষিতি, খেচর, (mica), অঞ্জন, কঙ্কুষ্ঠ এই সকল উপরস।

মাক্ষীকং বিমলং শৈলং চপলো রসকস্তথা।
সস্যকো দরদশ্চৈব স্রোতোঞ্জন মথাষ্টকম্॥
অষ্টৌ মহারসাঃ*১। ২ ও ৩ রসার্ণব (দ্বাদশ শতাব্দি)

মাক্ষিক (copper pyrites) বিমল, শৈল (bitumen), চপল, রসক (calamine). সস্যক (তুতিয়া) দরদ (হিঙ্গুল) ও স্রোতোঞ্জন (সুর্ম্মা) এই আট প্রকার মহারস। এই আটটী মহারসের মধ্যে একটী "চপল।"

এই চপল নামে কিন্তু পারদকে বুঝাইতেছে না। কারণ চপলের নিম্নলিখিতরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গবদ্দ্রবতে বহ্নৌ চপল স্তেন কীর্ত্তিতঃ। ৭। ২৭

অগ্নিতে রাঙের মত গলিয়া যায় বলিয়া ইহাকে চপল বলে।

অভ্র বৈক্রান্ত মাক্ষীক বিমলাদ্রিজ সস্তকম্।

চপলো রসকশ্চেতি জ্ঞাত্বাষ্টৌ সংগ্রহেদ্রসান্॥ ২।১

রসরত্ন সমুচ্চয়। (১৩শ শতাব্দীতে রচিত)

অভ্র (mica), বৈক্রান্ত, মাক্ষীক (copper pyrites) বিমল, অদ্রিজ (bitermen) সস্যক (তুতিয়া) চপল ও রসক (calamine) এই আট রস জানিয়া সংগ্রহ করিবে। এখানেও চপল পারদ নহে। ইহা রাঙের মত ধাতু বিশেষ।

রসতন্ত্র সমূহে পারদকে কোথাও রস, কোথাও রসেন্দ্র বা রসনৃপ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়, রস বাচক দ্রব্যের মধ্যে ইহার নাম না থাকায় রসাচার্য্যগণ ইহাকে রসেন্দ্র আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার "রস" নাম এরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, যে অনেক স্থলে "রস" নামেই পারদের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় পারদের রস নাম, উহার গ্রীক নাম অর্গুরস ক্সুটস্ ও উদার্গুরস হইতে আসিয়াছে। এই দুই নামেই "রস" শব্দ বর্ত্তমান। অতএব পরদের "রস" সংজ্ঞায় গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান, অনুমান করা যাইতে পারে।

পারদের একটী নাম সূত। এই "সূত" শব্দ দীর্ঘ উকার যুক্ত। বেদে আমরা "সুত" শব্দ সোমরস অর্থে প্রাপ্ত হই। যথা—

সুতঃ পবিত্রং পর্য্যেতি রেভন্। ঋগ্বেদ, ৯।৯৭।১

"সোমরস শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের (ছাঁকনির) চতুর্দ্দিকে যাইতেছে। সোমলতার পত্র ও ডাঁটা প্রস্তর দ্বারা নিপেষিত করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া তাহা হইতে সোমরস বাহির করা হইত বলিয়া ইহাকে "সুত" বলা হইত। বৈদিক যুগে সোমরসের অসাধারণ ক্ষমতায় লোকের বিশ্বাস ছিল। সোমরস স্বর্গে লইয়া যায় ও অমর করে, এই বিশ্বাস নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ হইতে জানা যায়।

লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধী।

ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৯

(হে সোম!) যে স্থানে লোক সকল জ্যোতি যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, সেই স্থানে আমাকে অমর কর।

তান্ত্রিক যুগে "সুতের" পরিবর্ত্তে "সূত" বা পারদ যে ঐরূপ অসাধারণ গুণশালী তাহা প্রচারিত হইয়াছে। পারদ ও পারদ ভস্ম ভক্ষণ করিলে মনুষ্য অমরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উহার সাহায্যে অসীম ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে, এইরূপ বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে।

ভক্ষণাৎ সাধকেন্দ্রস্তু দিব্য দেহমবাপ্নুয়াৎ। ৩২

রসরত্নাকর (৭ম শতাব্দী)

(রসভস্ম) ভক্ষণ করিলে সাধক দিব্যদেহ লাভ করেন।

তং সূতং ভক্ষয়েদ্ যোহি সোঽমরত্বমবাপ্নুয়াৎ।

সুবর্ণতন্ত্র। ১০ (ষোড়শ শতাব্দী বা পরবর্ত্তী)

এরূপ পারদ ভক্ষণে লোক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

বলীপলিত নাশঞ্চ তথা কালস্য ধ্বংসনম্।

যথা লোহে তথা দেহে ক্ষমতে নাত্র সংশয়ঃ॥

রসরত্নাকর (৭ম শতাব্দী)

লোল মাংস ও শুভ্রকেশ প্রভৃতি কালের চিহ্ন সকল ধ্বংস করে। যেমন ধাতুর উপর সেইরূপ দেহের উপর ইহার ক্ষমতা আছে, তাহাতে সংশয় নাই।

রসোপরস যোগেন সিদ্ধং সূতং সুসাধিতম্।

বিদ্ধ শুল্বায়নং নাগং যথার্থ কাঞ্চনং কৃতম্॥

রসরত্নাকর (৭ম শতাব্দী)

"রস ও উপরস দ্বারা সম্যক প্রকারে শোধিত সিদ্ধ পারদ, তাম্র ও সীসাকে বিদ্ধ করিয়া যথার্থ কাঞ্চনে পরিণত করে।"

পারদ ও পারদ ভস্মের এই সমস্ত অলৌকিক গুণাবলী তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহারা ইহার সাহায্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহা লইয়া নানা মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু পারদের সূত নাম যে গ্রীক অর্গুরস ক্সুটস্ হইতে গৃহীত এবং বৈদিক "সুতের" পরিবর্ত্তে লোক মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল,তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। যদি সামান্য সন্দেহ থাকে, তাহা উপরি উদ্ধৃত ঘোট নাম দ্বারা দূরীভূত হইয়া যায়।

কারণ "খোট" শব্দ পারদ অর্থে অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা যে বৈদেশিক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষুটস্ ও খোট শব্দের মধ্যে এত অধিক সাদৃশ্য যে উহার উৎপত্তি গ্রীক ভাষার ক্ষুটস্ শব্দ হইতেই হইয়াছে তাহা এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

গ্রীক ভাষার X (ক্ষ) ও ইংরাজি ভাষার Xএর প্রকৃত উচ্চারণ সংস্কৃত যুক্তাক্ষর ক্‌ষ এর মত। সেই জন্য গ্রীক "ক্ষুটস্" শব্দের উচ্চারণ খুটস্ ও এক্‌যুটস দুইই হইতে পারে। এক্‌যুটস্ বৈদেশিকের মুখে "সূতস" হইয়া পড়ে। অতএব খোট ও সূত নামের মূল গ্রীক শব্দ ক্ষুটস্ ইহাই প্রমাণিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম কুব্জিকা তন্ত্রেই পারদকে শিববীর্য্য বলা হইয়াছে। গ্রীক আল্‌কেমিষ্টদিগের গ্রন্থেও পারদ "হার্মিস" দেবের বীর্য্য বলিয়া বর্ণিত। এই হার্মিস দেব কিমিয়া বিদ্যার আদি গুরু বলিয়া গ্রীকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। হীন ধাতু সুবর্ণে পরিণত করার নামই কিমিয়া বিদ্যা। ভারতবর্ষে প্রাচীন কোন গ্রন্থে এই প্রক্রিয়ার কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই না। কুব্জিকা তন্ত্রেই প্রথম ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই তন্ত্র ভারতে প্রচার আবশ্যক তাহাও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল কারণে কুব্জিকা তন্ত্র গ্রীক প্রভাবান্বিত বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

রসরত্ন গ্রন্থকার সাকাণ্ড নামে এক রসাচার্য্যের নিকট রসবন্ধ ও তাহার লক্ষণ অবগত আছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা

কথয়ামি ন সন্দেহঃ সাকাণ্ডেন যথা কৃতং

এই রস-বন্ধের লক্ষণ বর্ণনার মধ্যেই আমরা পারদের খোট নাম প্রাপ্ত হইল। "খোট" শব্দ গ্রীক হইলে, এই প্রক্রিয়া যে গ্রীক রসাচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র "সাকাণ্ড" নাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন "We are unfamiliar with the name, probably the reading is incorrect" (এই নামের সহিত আমরা পরিচিত নহি। সম্ভবতঃ লেখা অশুদ্ধ)। যদি আমরা গ্রীক খোট শব্দ স্মরণ রাখিয়া "সাকাণ্ড নাম বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে সাকাণ্ড যে কোন বৈদেশিকের নাম এই অনুমানই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে, গ্রীক আলেকজাণ্ডার শব্দ উচ্চারণে সেকেণ্ডার হইয়া। এই নিয়ম সাকাণ্ড নাম ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিলে, সাকাণ্ডের আদি গ্রীক আকার আলেকজান্দ্রীর (অর্থাৎ আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আগত) হইয়া পড়ে। যখন দেখি ৫ম শতাব্দীর আলকেমিষ্টগণ রস-বন্ধ বা fixation of mercuryর প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন। আমাদের অনুমাণের ভিত্তি তখন আরো দৃঢ় হয়। মায়ার্সের রসায়ণ ইতিহাসের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে ৫ম শতাব্দীর জসিমস্ এর গ্রন্থে রস-বন্ধের (fixation of mercury) নাম স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, ৭ম শতাব্দীতে আরবগণ আলেকজান্দ্রিয়া নগর ধ্বংস করিলে আলেকজান্দ্রিয় আল্‌কেমিষ্টগণ নানা দেশে ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ২ রসাচার্য্য ভারতের প্রান্ত দেশে আগমন করতঃ স্বদেশীয় রসশাস্ত্র প্রচারে ব্যাপৃত হন। সেই জন্য ই ভারতের বহির্ভাগে কুব্জিকা তন্ত্র রচিত এবং পারদ-রস খোট ও সূত সংজ্ঞা প্রযুক্ত। বৈদেশিক সাকাণ্ড নাম ও সেই কারণেই আমরা নাগার্জ্জুন বিরচিত রসরত্নাকরে দেখিতে পাই।

বারান্তরে পারদের যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

যাচ্‌না।

হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গোপনে
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি সহ,
রয়েছি দাঁড়ায়ে পূজিব চরণ
চাহ কি না চাহ কহ!
দরশন সাধ নাহিক আমার
পরশন নাহি চাই;
উন্মুক্ত পরাণে পূজিতে এসেছি,
আছে কি তাহার ঠাঁই?

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

রামু সরকার।

রামু সরকার ময়মনসিংহের একজন অনক্ষর কবি। রামু জাতিতে ভুঁইমালী ছিলেন। কবি গানের ওস্তাদ দিগের সাধারণ উপাধি "সরকার"। বোধহয় ইহা প্রাদেশিক পদবী। ময়মসিংহের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, —ছোট বড় সকলেই রামু মালীকে প্রাদেশীক প্রথানুসারে "রামু মালী" না বলিয়া "রামু সরকার" বলিতেন। আমিও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রবন্ধে "রামু সরকার" লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কিশোরগঞ্জ মহকুমার আউটপাড়া গ্রামে, বাঙ্গলা ১২৪৭ সালের চৈত্র মাসে রামু সরকার জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৩২০ সালের ৩০ শে ফাল্গুন ৭২ বৎসর বয়সে ৫ পাঁচ পুত্র ও ৪ চারি কন্যা রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামুর পিতার নাম রামপ্রসাদ ও মাতার নাম রায়মণী ছিল।

প্রাগুক্ত আউটপাড় নিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামু সরকারের শিক্ষাগুরু ছিলেন। উপাধি না থাকিলেও, অমর ভট্টাচার্য্য একজন বহুদর্শী পণ্ডিত ও ঈশ্বর পরায়ণ সাধু ছিলেন। তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদে রামু একজন দেশ বিখ্যাত কবির সরকার।

রামু সরকার বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত সাহিত্যের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহার আর লেখা পড়া শিক্ষা হইল না। বিশেষতঃ সামাজিক হিসাবে যাহারা নীচ জাতি, তৎকালে তাহারা লেখা পড়া শিক্ষার দিক দিয়া বড় একটা বিশেষ মনোনিবেশ করিত না।

পূজ্যপাদ অমর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বালক রামুর বুদ্ধি বৃত্তির প্রাখর্য্য ও সঙ্গীত সাধনার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহাকে আগ্রহের সহিত শিষ্য করিয়া লইলেন। রামু, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্নেহানুগ্রহ ও শক্তি সঞ্চারে, অল্পদিন মধ্যেই গীত বাদ্য ও শাস্ত্র পরিজ্ঞানে মহা প্রাজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রামু কেবল গুরু মুখে শুনিয়া শুনিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন, আর ভুলিতেন না। রামুর স্মরণশক্তি সংসার ছাড়া ছিল। গ্রন্থাদি বুঝিবার শক্তিও তাঁহার অত্যন্ত অধিক ছিল। কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে, রামু শ্রবণ মাত্রই তাহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হইতেন। এমন কি, সহজ সহজ সংস্কৃত শ্লোকাদির তাৎপর্য্যার্থ নিজে নিজেই বুঝিতে পারিতেন।

মৌখিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত রামু শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে ছড়া পাঁচালীও বলিতে শিক্ষা করিয়া লইলেন। ১৪ বৎসর বয়সে রামু সরকার কবির দলে প্রবেশ করিয়া ২০।২২ বৎসর বয়ক্রম কালে একজন বিখ্যাত কবির সরকার হইয়া বসিলেন।

রামগতি, রামকানাই, শক্তিরাম, বড় হরি, মিঞাজান, নবু সরকার, গোবিন্দমালী, বিশ্বম্ভর ঠাকুর প্রভৃতি বহু স্বদেশী বিদেশী কবিওয়ালাগণ রামু সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহারা কবিত্ব শক্তিতে রামুর সমতুল্য হইলেও অনেক সময় বিজয় লক্ষ্মী রামুকেই যেন স্নেহের চুম্বন দানে সুখী করিতেন।

রামু লেখা পড়া না জানিয়াও একজন মহা কবি ছিলেন। একবার (১২৯০ সালে "নব্য ভারতের" জন্মকালে) নব্যভারত পত্রে নারায়ণ দেব প্রসঙ্গে এই অনক্ষর কবি রামুর কথা দিক্‌দর্শন মাত্র আলোচিত হইয়াছিল।

রামু সরকার চৌপদী ছড়া অতি সুন্দর ও তাড়াতাড়ি বলিতে পারিতেন। প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনীয় বিষয়টী সভাস্থ শ্রোতৃবর্গকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার পক্ষে রামু সরকারের আশ্চার্য্য শক্তি ছিল। রামুর ছড়ার প্রশংসা করিয়া অনেকেই বলিতেন—"না, রামুর ছড়া !!"

তিনি যে কেবল ছড়া বলিতে পারিতেন, এমন নহে, পাঁচালীতেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ঢোলের তালে মিশাইয়া স্বর সংযোগে অতি সুললিত পাঁচালী কীর্ত্তন দ্বারা সভার চিত্ত রঞ্জন করিতে রামু একজন অদ্বিতীয় ছিলেন।

রামু ইচ্ছাকরিয়া সভাকে হাসাইতে ও কাঁদাইতে পারিতেন। কি শৃঙ্গার, কি হাস্য, কি করুণা, যখন যে রসের পাঁচালী বলিতেন, তখন সেই রসই মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রোতার মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিত।

রামুর ছড়া পাঁচালীতে যমকানুপ্রাস কি উৎপ্রেক্ষোপমা প্রভৃতি অলঙ্কার গুলি বড়ই সুন্দর হইত। ব্যাজ

ভক্তিতে তাঁহার সমতুল্য সরকার এ অঞ্চলে কেহই ছিলেন না। সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে রামুর উপমাগুলির তুলনা ছিলনা।

রামু সরকার লেখা পড়া না জানিয়া কিপ্রকারে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তি লাভ করিলেন, ইহা অনেকেই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। কবিত্ব শক্তি যে স্বাভাবিক, কোন ভাষা বোধ সাপেক্ষ নহে, আমাদের রামু সরকার তাহার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আক্ষেপের বিষয় এই, রামুর এই অতুল্য অমূল্য কবিতা গুলি কোয়াসার মত শুধুই হাওয়ায় মিশিয়া গেল। রামু সরকার কোন পুস্তক কি পদাবলী রচনা করিয়া যান নাই। আমি বহু যত্নে রামু সরকারের কয়েকটী গীতি কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অদ্য তাহাই "সৌরভে"র পাঠকগণকে উপহার দিয়া, রামুর কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

রামু নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার স্বভাব ভদ্র জনোচিত ছিল। রামুকে সকলেই সমাদর করিতেন। অনেক কবির আসরে রামু সরকার ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

একদিন কাটিহালীর সভায় রামু সরকার পঞ্চ মকারের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা ও তাহার সাধন প্রণালী বর্ণন করিলেন যে সভাস্থ বহু উপাধি ভূষিত পণ্ডিত তচ্ছ্রবনে "ধন্য রামু! ধন্য রামু!!" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করিয়াছিলেন।

অনেক সময় রামু সরকার করুণ রসের পাঁচালী বলিতে বলিতে ভন্ডাবাক্রান্ত হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন।

রামু সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে,—প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে সেজন্য নিম্নে তাঁহার রচিত কয়েকটী গীত লিখিয়াই উপসংহার করিতেছি।

কবির ডাকসুর বা নান্দী।

হরি বলে ডাক্‌রে আমার মন,—
এলো নিকটে শমন।
তুমি কার আশাতে বসিয়ে রয়েছ?
তোমার গণার দিন যে, দিনে দিনে গত হলো,
তা, কি টের পেয়েছ॥
(তুমি কার আশাতে বসিয়ে রয়েছ')
যাবে যদি ভব পারে, বল কৃষ্ণ হরে হরে।
কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ!
পড়ে ভবের ফান্দে, রামু কান্দে,
ভক্তি ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ॥
(অন্তরা) এ দেহ থাক্‌তে চেতন, হরি বল মন,
জীবনের ভরসা আর কি?
যখন আস্‌বে শমন, দিবে দরশন,
তখনে ঘোর হবে দুই আঁখি॥
যার জন্য খাট বেগারি, তারা সব রবে পড়ি,
উড়ে পালাবে প্রাণ পাখী,
তোমার ভবের কামাই ভবে রবে,
মন্ তোরে,—দিবেই বা কি? নিবেই বা কি?

এক দিবস নেত্রকোণা শ্রীপঞ্চমী যোগে আমি ঢাকা রাজখাড়া নিবাসী মদন শীলের সঙ্গে কবিগান আরম্ভ করিয়াছি,—রামু সরকার তখন আমার সঙ্গে। মদন সরস্বতী পূজায় হরি বিষয়ক নান্দী গীতে মঙ্গলাচরণ করিলেন। তৎপর আমার ঢুলী আসরে নামিবা মাত্রই রামু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাকসুর" কোন্‌টা গাহিবেন? আমি বলিলাম যে "কালী বিষয়ক এক্‌টী ডাক্ মাল্‌সী জানা আছে,—তাহা দিয়াই মঙ্গলাচরণ শেষ করিব।"

শুনিয়া রামু কহিলেন, "না—তা, কখনই হইবে না। আমি এখনই সরস্বতী বিষয়ক একটী নান্দী রচনা করিয়া দিতেছি।" ঢুলী আসরে আখড়াই বাজাইতেছে, ইত্যবসরেই তিনি রামু এই গীতটী রচনা করিয়া দিলেন।

ভারতি! তুমি কৃপাবতী, দীনের প্রতি
কর কৃপা দান।
তোমার কৃপা হলে, মূকে সুখে করে শ্রুতি গান॥
তুমি কৃপা কর যাঁরে, তাঁর মত কে এ সংসারে,
করে সে কবিত্ব সুধা পান।
তোমার কৃপা বিনে, দিনে দিনে শুখায়ে গেল প্রাণ।
মা, তোমার বীণার ধ্বনি, মধুর ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশেছে যার কাণে।—
তার প্রাণে যে কি আনন্দ সে বিনে তা, আর কে জানে!

সাহিত্য সঙ্গীত সুধা, পান করে সে নিশি দিনে—
চায়না সে আর ভবের বিভব,—কেবল তোমার
চরণ বিনে ॥

মদনের সঙ্গে আমার বসন্ত গীতের পাল্লা চলিতেছে। দুই দিন কোন মতে কাটাইলাম, তৃতীয় দিনে আমার বসন্ত গীতের তহবিল ঝাড়া পড়িল; আর একটী বসন্ত হইলেই কোন মতে রক্ষা পাওয়া যায়। নিরুপায় হইয়া আমি রামু সরকারকে জানাইলে, তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে নিম্নলিখিত গীতটী রচনা করিয়া দিলেন।

গীত—বসন্ত। রাগিণী—বসন্ত।

চিতান।—যুদ্ধ বেশে, মদন এসে উদয় বৃন্দাবন।
পারাণ—করে কুসুম ধনু, কুসুম শর,
কোকিল ভ্রমর সহচর,
সঙ্গে গতি ধীর-মন্থর মলয় পবন।
লহর। দেখে মদনেরে কুঞ্জ দ্বারে,
সখি সবে পরস্পরে—করে আলাপন।
বলে—উপায় কি এখন? হায়! এসেছে মদন,—
বিচ্ছেদ বাণে বিঁধা প্যারী মদন এলো ধনুক ধরি,
বল কিসে রক্ষা করি, রাধিকা জীবন।
মিল। বিশাখা কয় ললিতাকে মনে পেয়ে ভয়,
ঘটিয়াছে কি অসময় রসময় বিনে।
মহড়া। বল গো! সখি ললিতে, বিধুমুখী রাইকে
প্রাণে রাখি কেমনে? ॥
ধুয়া। মদন সেজে ফুলের সাজে,
প্রবেশিতে কুঞ্জ মাঝে, উদ্যত এখন।
অতনুর তনু দেখে, চমকিত মন,—
আতঙ্কেতে কাঁপে অঙ্গ, দেখে অনঙ্গের রঙ্গ,
কিসে মদন দিবে ভঙ্গ, কও আমার স্থানে।
খাদ। বিচ্ছেদের দেশেতে মদন এলো কি জন্যে?।
লহর। আশা ছিল হৃদ্ কমলে, শীতান্তে বসন্ত এলে,
আসিবে মাধব, কর্ব্বো বসন্ত-উৎসব,
হায় আমরা সখি সব;
সে সাধে বিবাদ ঘটিল, কি ভাবিলাম কি হইল,
মদন এসে দেখা দিল, একি অসম্ভব!!।
মিল। কি দিয়ে করিব এখন মদনকে বারণ
বিনয়ে না হয় নিবারণ, প্রমত্ত রণে।

এই গীতটীর পরচিতান ও অন্তরা মনে নাই।

বসন্ত গীতের পাল্লা সমাপন হইলে, লহর কবি আরম্ভ হইল। তখন আমাদের নিরক্ষর কবি রামু সরকার নিম্নলিখিত কবি গানটী প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

চেতান। অর্জ্জুন আমার নামটী বটে,
আমি হে পাণ্ডু রাজ নন্দন।
পারাণ। একটী তত্ত্ব পেয়ে,
সত্য যাচ্ছে উন্মত্তের প্রায়,—মরি হায়!
এসেছি দ্বারকা ভুবন ॥
লহর। হায় মরি হায়, কি সর্ব্বনাশ,—ঘটালে এসে অকস্মাৎ,—
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—হায়,—হায় রে!
বিধিশিব নারদ-নরে, যে চরণ চিন্তা করে,
সে পদে তুই কোন্ বিচারে, কল্লে শরাঘাত।
মিল। তোর অঙ্গ কালো, চক্ষু রাঙ্গা,
আমার যে দেখে করে ভয়,—
তুই কোথায় ছিলে, এথায় এলে,
বল শুনি তুই কার তনয়?
মহড়া। কেরে! তুই জংলী মস্তা,
নাইরে তোর ধর্ম্মে আস্থা,
বুদ্ধি খাস্থা পেলেম, পরিচয়।
ধুয়া। যে কৃষ্ণ জগতের সার, তাঁরে তুই কল্লে সংহার,
দুরাচার কেমন তোর অন্তর?
লক্ষ্মী সেব্য বিধি ভাব্য, কৃষ্ণ কলেবর,
তোর মত দেখিনা বর্ব্বর,
জানলাম তোর পশু হৃদয়
খাদ। তোর মত দেখিনা এমন দুষ্ট দুরাশয়।
লহর। তোর জঙ্গলীর প্রায় জংলী স্বভাব,—
সর্ব্বদা থাকিস্ জঙ্গলে, তোরে মানুষ কে বলে?
হায় হায় রে, তীর ধনু হাতে রাখি,
সর্ব্বদা মারিস্ পাখী।
পরম ধন কমলাখি,
(তাঁরে) মার্‌লে কি বলে?

মিল। যে শরে প্রাণ কৃষ্ণ মরে,—
কে তোরে দিল এমন শর,
জান্তে চাই তোর্ আদত খবর,
ভেঙ্গে বল্ রে।—সমুদয়।

অন্তরা। মরি হায়, কি উপায়,—
কুলনারী অকুলেতে ভেসে যায়।
কান্তেছে কৃষ্ণ শোকে সর্ব্বদায়।
জীবন সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ ছিলেন দ্বারকায়,
কৃষ্ণ সকলের উপায়,—
কেন সেই কৃষ্ণকে বধ করিয়ে জগৎ কল্লে নিরুপায়? ॥

পয়চিত্তান্— দয়ার সাগর, শ্যাম নটবর,
কি তাঁহার ছিল অপরাধ?

পায়রান। তুই কি আক্রোশে, কিবা দোষে, ঘটালে প্রমাদ;
তোর সঙ্গেতে কৃষ্ণের কি ছিল মনোবাদ?

লহর। দয়ার সাগর কৃষ্ণচন্দ্র,—
নিদয় কেন্ হলে তাঁর প্রতি?
তোর একি কুমতি? হায়! হায় রে,
সাধে বিবাদ ঘটালে, পাপের তাপেতে জ্বলে,
ঘটবে রে! তোর্ অন্তকালে, বিষম দুর্গতি।

রামু সরকার শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ সম্বন্ধে একটী গীত সখি সংবাদের সুরে প্রস্তত করিয়া দত্তগ্রামের দলে গাহিয়া ছিলেন; সেই গীতটী এই।

চিতান। শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ কল্লেন প্যারী।

পায়রান। কুঞ্জ ভঙ্গের সময়, কৃষ্ণ শ্যাম রসময়,
খুজ্লেন বাঁশরী ॥

লহর। বাঁকা ত্রিভঙ্গ —সশঙ্কিত হইয়ে অতি,
সন্দে (হ) কল্লেন শ্রীরাধার প্রতি;
অরি কৃষ্ণ সকাতরে, ধরে রাধার যুগল করে,
কেঁদে বলেন ধীরে ধীরে, (আমার) বাঁশী দেও রাই শ্রীমতী।

মিল। রাইগো! বাঁশী মোর সর্ব্বস্ব ধন, তুমি জান;
এ দাস এ ধনে বঞ্চিত হলে উপায় বল?

মহড়া। যোহন বাঁশী দাও রাই, এখন বিদায় চাই,
সুখের নিশি প্রভাত হৈল।

ধুয়া। প্যারি! জাগ্ল সব নগরবাসী, কোকিল ডাকে,
করে গুণ্ গুণ্ গুণ্ ভ্রমর উড়ে ঝাকে ঝাকে,
মনের সুখে হাসে, হেরে প্রাণেশে,
তাই দেখে কুমুদিনী লজ্জায় মুদিত হৈল।

খাদ। লক্ষ্য সাধনের মুখ্য যন্ত্র বাঁশী ছিল।

লহর ওগো রাধে গো!—বাঁশী বিনে ভাসি অকুলে,
বেঁচে কাজ কি আমার গকুলে!
গোষ্টে গেলে গহন বনে, ললিত পঞ্চম তানে ডাকি তোমায়।
বাঁশীর গানে, আমি ভাসি সুখ সলিলে।

অন্তরা।—সাধনের ধন বংশী রতন, অযতনে গেল।
নিয়ে এই মুরলী, নাগরালী, গকুলে মোর ছিল।
কতনা সাধনা করে, পেয়েছিলাম বাঁশরীরে,
হাঁয় মরি কি হৈল!
বাঁশী বিনে বৃন্দাবনে কি ধন আছে বল?

লহর।—ওগো রাধে গো। বাঁশীর প্রতি কেন তোমার মন?
কুল বধুর কিবা প্রয়োজন?
একে তুমি পরাধিনী,—ঘরে আছে ননদিনী;
বাঁশী দেখ্লে রায় বাঘিনী কর্ব্বে কত জ্বালাতন॥

এই গীতটীর ধুয়া পদে অতি সুন্দর কবিত্বের ঝঙ্কার পরিস্ফুট হইয়াছে। রাধে! সকল নগরবাসী জাগিয়াছে। কোকিল কুহু কুজনচ্ছলে প্রভাতী গাহিতেছে, মধু মত্ত মধুব্রত সকল মধুস্বরে গুণ্ গুণ্ করিয়া উড়িয়া ঘুরিয়া কুসুম কানন গুলিকে আনন্দ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে; সারানিশি বিরহ ভোগের পর নলিনী সূর্য্য দেবের শুভাগমণ কাল সমাগত দেখিয়া মনের সুখে মৃদু মধুর হাসিতেছেন, তদ্দর্শনে কুমুদিনী লজ্জায় মুদিত হইল। এই ভোরের ভাবটী কি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। অনক্ষর করিব পক্ষে এইরূপ প্রাকৃতিক বর্ণনা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যে সময় সুসঙ্গাধিপতি মহারাজারা চারি ভাই (রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগত কৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ) বর্ত্তমান ছিলেন, তখন রামু সরকার রাজ বাড়ীর একটী বর্ণনা গাহিয়া বিশেষরূপ পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

চিতান। রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম্ম অবতার।
পারাণ। বড় বাঞ্ছা করে, এসেছি চরণ দেখবার তরে,
বর্ণিবারে সাধ্য কি আমার।
লহর যেমন ইন্দ্রপুরী, তেম্‌নি মহারাজের বাড়ী,
অমরা সমান।
কত নৃত্য গীত গান, হচ্ছে অবিরাম;
স্থাপিত আছেন দশভুজা, বাহিরবাড়ী দুর্গা পূজা,
ত্রেতায় যেমন শ্রীরাম রাজা,
এম্‌নি হয় মোর জ্ঞান।
মিল। ধর্ম্মেতে যুধিষ্ঠির তুল্য, চন্দ্র তুল্য রূপ,
আমি মূঢ়ে কি বলিব রূপে গুণের নাই তুলনা।
মহড়া। গোলকের নাথ গোলক ছেড়ে, রাজকুলেতে
দুর্গাপুরে, এক অংশে জন্মিলেন চার জনা।
দানে বটেন মহাদানী, মানে বটেন মহামানী,
এ জগতে নৃপমণি আমি আর এমন্‌ হেরিনা।
খাদ। পাত্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে করেন মন্ত্রনা।
লহর। আছে নবত (নবহত) খানা,
তার দক্ষিণে নায়েবের থানা,
বাগানের কাছে, আনন্দ বাজার আছে।
বড়্‌ পুষ্করিণীর উত্তর পারে,
আম্‌লা পট্টী শোভা করে,
বাঘের দালান পশ্চিম পারে, আজব্‌ কারখানা।

এই গীতটীর অবশিষ্টাংশ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেলনা। খাদের লহরে রাজ বাটীর মানচিত্রটী মন্দ আঁকা হয় নাই। তবে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বোধ হয়, অন্তরা ও পর চিতানে সমস্ত বাটীরই বর্ণনা ছিল।

একদিন আমি কবির দাঁড়ায় বারণ হইয়া রামু সরকারকে মহাদেব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রভো! আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় আমার শরীরে অমিত বল, তবে মিথিলায় গিয়া আপনার ধনুখানা তুলিতে পারিলাম না কেন? আমি সীতা লোভে হরধনু তুলিতে গিয়া লজ্জা পাইয়া আসিয়াছি। একদিন তো এই ধনু সহ কৈলাস পর্ব্বত বাম হস্তে উত্তোলন করিয়া এই বিশ্ব সংসারকে চমৎকৃত করিয়াছিলাম। তবে অন্ত আমার এমন দশা হইল কেন?

রামু মহাদেব টপ্পায় উত্তর করিলেন,—
চিতান। বল্লে, তুমি আমার কাছে বারণ মহারাজ,
পারাণ। হরধনু তুলিতে পাল্লেনা কোন মতে
মিথিলাতে পেয়ে এলে লাজ।
মিল। এ সবকার্য্যে যেতে হ'লে, জান্‌তে হয় তার পূর্ব্বাপর।
মহড়া। ধনু তুল্‌তে গেলে কেন, না জেনে খবর?
অন্তরা। জনকের জানকী,—তাঁরে জান কি?
তুমি নিতান্ত বর্ব্বর।
মিল। সেই সে ধনু তুল্‌তে পারে, যে হয় সীতার যোগ্য
বর।

রামু সরকার অনেক সময় আমাকে বৈষ্ণবের দিকে রাখিয়া, স্বয়ং শাক্তের দিকে থাকিয়া আসরেখুব রঙ্গ রহস্যের তুফান তুলিয়া দিতেন। আমি আর একদিন, কালী বাড়ীর পাণ্ডা হইয়া, রামুকে সনাতন গোস্বামী করিয়া দাঁড়া উলটাইয়া লইলাম। এবং একটুকু রহস্য করিয়া বলিলাম, "জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী।" রামু সরকার টপ্পায় এই কথার অতি সুন্দর উত্তর করিলেন।

চিতান। তুমি বল্লে নাকি জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী।
পারাণ। জাতিকুল, সে তো স্থূলের দেশের গোল,
কুল কি মানে প্রেমানুরাগী?
মিল। (আমরা) রাধা কৃষ্ণ প্রেম সাগরে ডুবায়েছি
জাতি কুল।
মহড়া। পাণ্ডা ঠাকুর! কুল্‌ থাক্‌তে আর অকুলেতে
কেউ পাবেনা কূল।
অন্তরা। শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, জীবমাত্র তাঁর সন্ততি,
সম্প্রতি বুঝ জাতির মূল;
তুমি দেখতে ভাল মাকালের (মহাকাল) ফল
অথবা মান্দারের ফুল॥

ময়মনসিংহের পল্লীতে পল্লীতে খুজিলে দুই চারি জন স্বভাব কবির কবিতা পাওয়া না যাইবে, এমন নহে। বারান্তরে ময়মনসিংহের ভক্ত কবি রমানাথের কয়েকটী গীতি কবিতা "সৌরভের" পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

মায়ার আরসী।

সেবার সহরের ডাক্তারদের মধ্যে একটা নূতন ধরণের রোগী চিকিৎসা লইয়া ভারি হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। নানা বিভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ একত্র হইয়া কন্‌সাল টেসনের জন্য মস্ত একটা কমিটি বসাইলেন, কিন্তু সেটা রোগ অথবা রোগী, কারোও কোন কাজে আসিল না। রোগীর পিতৃ মাতৃ কুলের সাত পুরুষের বংশ তালিকা ঘাঁটিয়া হোমিওপ্যাথির দল যেরূপ আঠারো আনা উৎসাহের সহিত গবেষণা ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে আধুনিক বাইওক্যামিক দল আন্তরিক চটিয়া গেলেন! হালের এলোপ্যাথির ডাক্তারেরা রণ্টজেন আলোর সাহায্যেও ব্যারামটার বিশেষ কিছু ঠাহর করিতে না পারিয়া, অস্ত্র চিকিৎসার অনুকূলে মত দেওয়ায় সুপ্রাপ্যাথি দলের সঙ্গে তাঁদের জন্মের মত বিচ্ছেদ হইয়া গেল। ব্যাপার জটিল দেখিয়া আমাদের বৃদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ টিকি নাড়িয়া বিশেষ প্রাজ্ঞের মত বলিলেন, শব ব্যবচ্ছেদ প্রথাটার চড়কেও উল্লেখ দেখা যায়—কিন্তু বায়ু পিত্ত ককাশ্রিত যে কোনও জীবিত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া চিকিৎসা করার অনুকূলে প্রাচীন সুশ্রুত স্পষ্ট কিছু বলেন নাই! কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব যতই থাক না কেন, তার ভাস্কর লবণ অথবা পীযুষকান্তি রসায়ণ কিম্বা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বটিকায়, রোগী বিশেষ উপকার বোধ করিল না।

রোগীর পিতা গৌরমোহন ঘোষাল, কুলাংশে ফুলের মুখুটী—এতকাল কাহারো নিকট মাথা হেঁট করিয়া চলিতে হয় নাই। কিন্তু আজকালকার দিনে, নিছক্ কৌলীন্য দ্বারা জীবন রক্ষা ও পরিবার প্রতিপালন দুষ্কর। তাই তাঁহাকে এক ছোট লোক ধনীর সুবৃহৎ আড়তে মাসিক সাড়ে আট টাকা মাহিয়ানার দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মাসিক সাড়ে আট টাকায় ভদ্রলোকের সহরে থাকার ব্যয় কুলান যায় না, তবে কিনা ঘোষাল মহাশয়ের মাহিয়ানার উপরে কিছু উপরির যোগাড় ছিল। সহরে ছোট্ট এক খানা একতালা দালানে ঘোষাল মহাশয়ের সস্ত্রীক বাস। দুই দিক হইতে দুই খানা প্রকাণ্ড ধনী লোকের তেতালা বাড়ী যে ভাবে তাঁর বাসা বাড়ীটাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহাতে তাঁর অন্দর মহল হইতে মাথার উপর আকাশের কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান মাত্র নজরে পড়িত। সে বাড়ীতে বাস করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখা বিশেষ ভাগ্যের কথা! এরূপ অবস্থা বিপাকের ভিতরে পড়িয়া যদিও গোমস্তা মহিষীকে প্রকৃত পক্ষে অসূর্য্যম্পশ্যা হইতে হইয়াছিল, তথাপি পিতৃ কুলে কিম্বা পতিকুলে কোথাও কোন রাজকুলের সহিত তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, তা নিঃসন্দেহ।

আমাদের সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ;—ম্যালেরিয়া গ্রস্থ হইলেও উর্ব্বর। আমাদের রক্তের ভিতরে যে পরিমাণে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিয়াছে, পুন্নাম-নরকের বিভীষিকা যে সেই পরিমাণে অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ হইতে পারে না। তাই আমাদের গোমস্তা মহিষী যখন প্রয়োজনাধিক স্থূল দেহ প্রযুক্ত নিঃসন্তান যৌবনের নদী খাড়া পাড়ি দিয়া উঠিলেন, তখন পুন্নাম নরকের বিভীষিকা আমাদের ঘোষাল মহাশয়কে একেবার অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু সোণার বাংলায় মা ষষ্ঠি অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা; পারত পক্ষে তিনি ভক্তের আকিঞ্চণ অপূর্ণ রাখেন না! তাই হাতে ডানায়, মাথায় গলায়, অনেক তাবিজ মাদুলী ধারণ করার পর গৃহিণী আধা বয়স পার করিয়া তাঁর বিভীষিকা গ্রস্থ স্বামীকে একটী পুত্র রত্ন অর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। সুতিকা গৃহে গৃহিনী অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে কমপাউণ্ডারটীকে ডাকা হইল, সে ভিজিটের টাকা না পাওয়ায় "রি" লিখিয়া লম্বা চৌড়া প্রেসক্রিপসন লিখিতে বসিল না। মোটামুটি রোগিনীর জন্য এক বোতল পোর্টের ব্যবস্থা করিয়া সরিয়া পড়িল। কিন্তু ঘোষাল মহাশয় এক বোতল পোর্টের দাম যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পুত্র কামনা করাতে বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট নাই, কিন্তু এক জন্ম গোমস্তাগিরী করিয়া এক বোতল পোর্টের নগদ মূল্য বাহির করা গোমস্তা মহাশয়ের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু বাহবা দিতে হয় স্থূলাঙ্গী গোমস্তা মহিষীকে!—

কারণ তিনি বিনা পোর্টেই তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিয়া স্বামীকে ডাক্তার খানার বিল সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতে দেন নাই!

স্ত্রী সারিয়া উঠিলেন বটে কিন্তু ছেলেটীর সম্বন্ধে ঘোষাল মহাশয়ের মন হইতে কুসংস্কার দূর হইল না। তিনি মনে করিতেন যে ছেলেটা অন্নের জন্য মাতৃঘাতী হয় নাই। সে সুবিধা পাইলেই পিতৃঘাতী হইতে কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করিবে না, একথা সুনিশ্চিত। সুতরাং শৃঙ্গী ও স্ত্রীজাতী হইতে পুরুষের পক্ষে যতটা তফাৎ থাকা শাস্ত্রের ব্যবস্থা, ঘোষাল মহাশয় পুত্রের নিকট হইতে সর্ব্বদা ততোধিক ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিলেন। কারণ কখন যে কিসে কি হইয়া দাঁড়ায়, তাহা কেউ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না!

যা হোক ছেলেটী শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, এবং মিত্রের মুখে তদতিরিক্ত কোনও সুস্বাদু দ্রব্যের ব্যবস্থা না করিয়া পাঁচ বছর পার হইয়া গেল, তখন পর্য্যন্ত কিন্তু তার আশ্চর্য্য ব্যারামটা কেউ টের পায় নাই। শেষ কালে ব্যারামটা ধরা পড়িল কি করিয়া সে কথাটা এখানে একটু পরিস্কার করিয়া বলিয়া রাখা দরকার!

(২)

ঘোষাল মহাশয় ছেলেটীর নাম রাখিয়াছিলেন, নবীন। ঘোষাল মহাশয় নবীন হইতে যতখানি তফাৎ দিয়াই চলাফেরা করুন না কেন গৃহিনী তাঁর আঁধার ঘরের আলো;—সবে ধন নীলমণিটীকে কখনো চোখের আড়াল হইতে দিতেন না। বাহিরে গেলে কখন কোন দুষ্ট লোকের "চোখ" লাগিয়া, ছেলের অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে তিনি এ পর্য্যন্ত নবীনকে ঘরের বাহির হইতে দেন নাই। স্যাৎস্যেতে বাড়ীর ভিতরে রৌদ্রহীন স্থানের গাছের মত, ছেলেটী কোন মতে টিম্ টিম্ করিয়া বাড়িতে ছিল। দৈন্য ও অন্ধকার ছেলেটাকে এমনি নিবিড় বেষ্টনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে মুক্ত বায়ুর সতেজতা, অবাধ আলোর প্রফুল্লতার মাঝে খেলিয়া বেড়াইবার জন্য এ পর্য্যন্ত একটী ঘণ্টারও ছুটী সে পায় নাই!

সেদিন কি দুঃসাহসে জানিনা, ফাল্গুণের মিঠা রোদ গোমস্তা মহিষীর খাস অন্তঃপুরের সেওলা পড়া স্যাৎস্তেতে বারান্দাটার উপর কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরিচিত দৈন্যের অভ্যস্ত সঙ্কোচের মধ্যে সোণালি রোদের এমন উজ্জ্বল আলিপনা দেখিয়া বিগত যৌবনা গোমস্তা গৃহিণীর হৃদয়ে জীবন বসন্তের সবগুলি বিফল স্বপ্ন আবার উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল কি না ঠিক বলা যায় না; কিন্তু সেদিন যে তাঁর সতর্কতা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সেদিন যখন তিনি আবার অনেককাল পর রোদে মাদুর বিছাইয়া সিঁদুরের কৌটা পাশে রাখিয়া আয়নার সম্মুখে চুল বাঁধিতে বসিয়া গেলেন, তখন সেই সুযোগে নবীন চোরের মত ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। গৃহিণী তখন বেণী বিন্যাসে ব্যস্ত তাঁর স্নেহের নজরবন্দী যে পালাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল, সেদিকে তাঁর হুস্ ছিল না!

নবীন ঘরের বাহিরে আসিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল! এমন সুন্দর সবুজ পৃথিবী আর তো সে কখনো দেখে নাই! সমগ্র আকাশটী যেন সোণার কিরণ মাখা একটী নীল শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে! আকাশের নীলিমার সহিত নবীনের এই প্রথম পরিচয়! প্রথম পরিচয়ের স্নিগ্ধতায় নবীনের সারা হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল!

নীল আকাশ হইতে চোখ ফিরাইয়া নবীন দেখিল; সম্মুখে বড় লোকের বাড়ীতে সবুজ ফুল বাগান! সে দিন কি কারণে জানি না, ফুল বাগানের মালী বাগানের ফটক বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল: বসন্তের কার সাজিতে যদি স্বয়ং মহাদেবের তপোভঙ্গই সহজ হইয়া থাকে, তবে বড় লোকের বাড়ীর ভারি ফটক যে বসন্তের সুগন্ধি হাওয়ায় খুলিতে পারে, ইহাতে অসম্ভব কি আছে?

এ সংসারে বড় ছোটর মধ্যে যে একটু অতি সুস্পষ্ট ভেদ রেখা আছে, সৌন্দর্য্যের জগতে দরিদ্র বলিয়া যে মানুষের প্রবেশ নিষেধ হইতে পারে, অনভিজ্ঞ নবীনের তখনো সে জ্ঞান-নেত্রের উন্মেষ হয় নাই। তাই বিনা অনুমতিতে খোলা ফটক দিয়া বড় লোকের বাড়ীর ফুল বাগানে ঢুকিতে সে একটুও ইতস্ততঃ করিল না!

বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ নবীন ভাবিল, এ তো ফুল বাগান নয়, এযেন পুরু সবুজ কাগজের উপর লেখা

একখানা চিঠি! নানা রঙের আভা জড়ানো সুগন্ধি ফুলের ভাষায় লেখা, নব বসন্তের আগমন সংবাদ! নবীনের চিত্ত বসন্তের লঘু আনন্দের মত অত্যন্ত হালকা হইয়া গেল। গৃহের চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া সে এত দিন যে আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে, তাহাতে স্নিগ্ধতা আছে বটে, কিন্তু সেখানে এই মুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবীর চাকচিক্য, এই বসন্তের ফুল-ফোটা ফুলবনের উজ্জ্বল্য ও বিচিত্রতা কোথায়?

নবীন ফুল গাছের ধারে অনেকগুলি প্রজাপতি উড়িতে দেখিয়া নিজেও আরেকটী রঙ্গীণ প্রজাপতির মত আনন্দে তাদের সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছিল। সহসা লাল-গোলাপ-ধরা একটা বসরা গোলাপের ঝাড় যেন সবুজ ফুল কণ্টকিত দুখানা সবুজ শাখা মেলিয়া দিয়া নবীনের সম্মুখে দাঁড়াইল! সে ফুল-ধরা গোলাপের রূপ দেখিয়া নবীন প্রজাপতির কথা ভুলিয়া গিয়া অবাক হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিল কি সুন্দর সবুজ অবরোধ! গোলাপের হৃদয় হইতে কোমল বেদনা পূর্ণ স্নিগ্ধ সৌরভ টুকু নিশ্বাসে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া, যখন মুগ্ধ নবীন নিজের হৃদয়খানি ফুলের গন্ধে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় একটী ভ্রমার সুরতরঙ্গ রাঙ্গা মাধবী কুঞ্জে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সেকি কাননস্থিত ফুল পল্লবের নব-বসন্তের প্রতি সুকণ্ঠোত্থিত একখানা কোমল উচ্ছ্বাস পূর্ণ অভিনন্দন পত্র; না সুরভি-গন্ধি কুসুমিতা তরুরাজির প্রবিরল মুগ্ধ মধুকথার মত পরিমিত গীতিঝঙ্কার!

ভ্রমার ঝঙ্কার শুনিয়া নবীন কোমল গন্ধ জাল ঘেরা কাননের ভিতর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার নিজের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, মল্লিকা জুঁই, মালতী চম্পক পত্র পল্লব রচিত বিচিত্র ফুলদানে তারি জন্য নানা জাতি রঙ্গীণ সুগন্ধের উপহার সাজাইয়া তাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে! নবীন আজ তার হৃদয়ের ভিতরে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিল—যেন সে আজ নূতন করিয়া এক সুন্দরতর জগতে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে জগতের সুখ দুঃখগুলি, দুঃখ সুখের মাধুরী মাখা। এমন সুন্দর স্থানে, এমন নিরালা যায়গায়, সুখ দুঃখকে জীবনে এমন সমগ্র ভাবে, এমন ঘনিষ্ট ভাবে লাভ করিয়া আনন্দের মধ্যেও আজ তার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল!

নবীন তাড়াতাড়ি মার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে পিছন দিক হইতে সোহাগ করিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিল। মা তখনো আরসীর সম্মুখে বসিয়া একমনে চুল বাঁধিতেছিলেন। তিনি নবীনকে চোখে না দেখিয়াও, বুঝিলেন। সে প্রাণ জুড়ানো স্নেহের পরশ মার নিকট কখনো ভুল হইতে পারে না! কিন্তু আরসীতে ও কার মুখের ছবি পড়িয়াছে? মা তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন,—না, নবীনই তো বটে! তিনি চোখ মুছিয়া আবার আরসীর পানে তাকাইয়া দেখিলেন—কি আশ্চর্য্য!—আয়নার ভিতরে তো নবীনের ছবি পড়ে নাই! আয়নার ভিতরে যার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে নবীনেরই সমবয়সী আর একটী মেয়ের! মেঘের আবছায়া ঘেরা শিশু সুধাকরের মত একখানা কচি মুখ! কিন্তু সে তো নবীনের মুখের ছাপ নয়! সে সময় তো ঘরের কোথাও সে চেহারার মেয়ে ছিল না! কার ঐন্দ্রজালিক মায়ায়, কোন স্বপ্নের রাজ্য হইতে সে সুন্দর মুখখানা আয়নার ভিতরে আসিয়া জুটিল, ঘোষাল পত্নী তার কোনও ঠিকানা করিতে পারিলেন না!

তিনি নবীনকে বার বার নানাভাবে আয়নার সম্মুখে খাড়া করিয়া আয়নার ভিতরের ছবি দেখিলেন। নবীনের ছবি না পড়িয়া, সেই মেয়েটী আয়নার ভিতর জাগিয়া উঠে। নবীনের পরণে ধুতি, ছবির মেয়ের পরণে নীলা সাড়ি। নবীনের চুল পুরুষের মত খাটো করিয়া কাটা, ছবির মেয়ের মুখের চারি পাশে ঘন পুষ্ট শৈবাল পুঞ্জের মত কালো চুলের রাশি! মেয়েটীর মুখের সঙ্গে নবীনের মুখের ভাবগত কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও স্ত্রী পুরুষের মুখের যে পার্থক্য তা দুইটীর ভিতরে অতি সুস্পষ্ট!

ঘোষাল মহাশয়ের দোকান হইতে ঘরে ফিরিতে বিলম্ব হইল। তিনি ঘরে ফিরিলে পর নবীনের মা ব্যাপারটা অবিকল স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিলেন। ঘোষাল মহাশয় দরিদ্র হইলেও হিসাবী লোক। প্রত্যহ নগদ তহবিলের সঙ্গে হিসাব মিল হইলে, তবে তিনি বাড়ী ফিরিতে ছুটি পান। প্রত্যক্ষ,

প্রমাণ ব্যতীত স্ত্রীর মুখের কথার উপর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে রাজি নন। তিনি আয়নার নিকট ল্যাম্পের আলোটা চিমনি-না-কাটা গোছ উস্কাইয়া দিয়া গৃহিণীকে হুকুম করিলেন "এইবার নবীনকে নিয়ে এসো দেখি।" নবীন বেচারী তখন খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গৃহিনী তখন তাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া চোরের মত আয়নার সম্মুখে আনিয়া খাড়া করিলেন, তখনো বেচারার চোখের ঘুম ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই!

নবীন ঘুম-ঘোর চোখে আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, আয়নার ভিতরে আর একখানা ঘুম-কাতর সুন্দর মেয়েলি মুখ ফুটিয়া উঠিল! সুন্দর, অতি সুন্দর—সে মুখ, দেখিয়া সহজে চোখ ফিরাইয়া নেওয়া শক্ত! তবু সে মুখ দেখিয়া স্ত্রীর মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল; ঘোষাল মহাশয় একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন! ঘোষাল মহাশয় নিজের কোঁচা দিয়া আয়না খানা ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া চোখ ভাল করিয়া রগড়াইয়া আবার আয়নার পানে তাকাইয়া দেখেন, সেই মেয়ে, আয়নার ভিতর হইতে একদৃষ্টে নবীনের মুখের পানে তাকাইয়া আছে!

ঘোষাল মহাশয়ের মনে হইল—এ আয়না খানা বিবাহের পর তিনি স্ত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছরের কথা। সেই হইতেই আয়নাতে তাঁর স্ত্রীর ছাড়া পুরুষের ছবি কখনো পড়ে নাই। এতকাল স্ত্রী সহবাসে আয়নাটার হয়তঃ এমনি স্ত্রৈণতা জন্মিয়া গেছে যে প্রতিবিম্ব ধারণ করিবার সময়ে সে এখন স্ত্রী পুরুষের ভেদটুকু রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য যে পরিমাণ নিরপেক্ষতা দরকার, সে তাও এখন ভুলিয়া বসিয়াছে। এই মনে করিয়া তিনি আয়না খানা জোরে ঘরের কঠিন মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। আলোকের চূর্ণের মত ভাঙ্গা আয়নার কাচ মেঝের উপর ঠিকরাইয়া পড়িল। গোমস্তা মহাশয় সেই রাত্রেই বেশী দাম দিয়া বাজার হইতে আরেক খানা ভাল আয়না কিনিয়া আনিলেন। এমন বেহিসাবী দুঃসাহসের কার্য্য তিনি জীবনে আর কখনো করেন নাই!

আয়না খানা ঘরে আনিয়া একবার স্ত্রীর মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিলেন বাস্তবিক এ যাত্রা আয়নাতে স্ত্রীর মুখের পরিবর্ত্তে তাঁর নিজের মুখের ছবি পড়িল না। একবার নিজেও আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—নূতন আয়নাতে তারি শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত, প্রকাণ্ড মুখ খানার হুবুহু ছাপ পড়িয়াছে। তারপর আয়নার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একরূপ নিঃসন্দেহ হইয়া ঘোষাল মহাশয় আবার নবীনকে সে নূতন আয়নার সম্মুখে খাড়া করিলেন। কিন্তু এবারও আয়নার ভিতরে সেই আগেকার মেয়েলি ছবিটাই ফুটিয়া উঠিল, নবীনের চেহারা ফুটিল না!

অতঃপর আর চোখ বা আয়নাকে দোষ দিয়া ঘোষাল মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

এর পরই চিকিৎসকের উৎপাত আরম্ভ হইল। নবীন বেচারী রোগ অপেক্ষা চিকিৎসার জ্বালায়ই বেশী অস্থির হইয়া পড়িল। ভিজিটের টাকা না পাইয়াও যে ডাক্তারেরা দলে দলে আসিয়া এ রোগীটাকে দেখিতে লাগিলেন, সেটা Art for Art's sake, Art for Propession's sake নয়। ডাক্তারেরা চিকিৎসায় যে বিশেষ ফল লাভ করিবেন, সে আশা করিতেন না। আসল কথা—ব্যারামটার আশ্চর্য্যজনকত্বই ডাক্তারদের চিকিৎসার বিষয় হইয়া উঠিল!

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই রোগ না সারিলেও রোগের নূতনত্বটা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ ডাক্তারদের অনুগ্রহ তামাসাগীর লোকদের কৌতুহল দুই-ই শিথিল হইয়া আসিল। যখন নবীনের বয়স পোনরো পার হইয়া গেল, তখন দেখা গেল যে পোনরোটী বসন্তের আলো ছায়ায় একা নবীনই বাড়িয়া উঠিয়াছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়া সঙ্গিনীটাও নিঃশব্দে নব যৌবনের সৌন্দর্য্যের মাঝে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার ও বাজে লোকের উৎপাতে নবীন আগে তার সঙ্গিনীটাকে দুরদৃষ্টের অভিশাপ বলিয়া মনে করিত; কিন্তু এখন তার ছায়া দেখিয়া নবীনের সারা হৃদয় বাসন্তী কল্পনায় রঙ্গীণ হইয়া উঠিত! মনে ভাবিত, এমনি সুন্দর একটী সহচরীর হাত ধরিয়া নক্ষত্র রঞ্জিত পথে স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হওয়া—সে কি সৌন্দর্য্য

দেবতার বর, না দুরদৃষ্টের অভিশাপ? নবীন কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারিত না বটে, কিন্তু এখন সে আর তার জীবনটাকে নিষ্ফল মনে করিত না।

(৩)

আকাশে দু একখানা হাল্‌কা মেঘ দক্ষিণের হওয়ায় চাঁদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। নবীন মালাকরের বাগানে বকুলতলায় বসিয়া মালা গাঁথিবার উদ্দেশ্যে ফুলে স্ঁচ বিধাঁইতে গিয়া বারে বারে আঙ্গুলে স্ঁচ ফুটাইয়া হাতখানা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিতেছিল। অদূরে ঝরণার কুল হইতে রাখালের বাঁশী নব-বিরহের উচ্ছ্বসিত বেদনা সুগন্ধি নিশ্বাসভরা ফুলের বাগানে ছড়াইয়া দিতেছিল। সে বাঁশীর সুরে নবীনের ব্যথিত হৃদয়ে নানা রঙ্গের আকাঙ্ক্ষার ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মালাকর শ্রীবাস পেছনদিক হইতে সস্নেহে ডাকিয়া বলিল:—"কি হে বন্ধু! আজকে তো তোমার অবস্থা বড় সুবিধা রকম বোধ হইতেছে না!—ব্যাপারখানা কি?"

নবীন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল:—

"ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া আনিনু প্রেমের বীজ,
রোপণ করিতে গাছ সে হইল, সাধল মরণ নিজ!"-

বন্ধু! আর আমার বলিবার কি আছে! আমি নিজে সাধ করিয়া মরিতে বসিয়াছি!" শ্রীবাস নবীনের কথা শুনিয়া একটু কৌতুকের সহিত উত্তর করিল:—

"চাঁদ কি লাগি সুরয উপবাস!" সে বেশ তো! কিন্তু কাকে দেখে হঠাৎ তোমার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগ সঞ্চার হইল?—তোমার ছায়া সহচরীটাকে দেখে নয় তো!" নবীন আবার বলিল:—

বন্ধু! তার চোখের উপর কামের কামান ভুরু! আমি যে তার শুধু চোখ দুটী চিনি, মানুষটাকে তো চিনি না!'

শ্রীবাস হাসিয়া বলিল:— "আর বলতে হবে না! ঐ চোখের ভুরু দিয়েই গোটা মানুষটা ধরা পড়ে গেছে!" তার পর হাত নাড়িয়া সুর করিয়া ঢপওয়ালীর মত বলিল

———————————"শুনহে নগর চান্দা!
সে যে বৃষভানু-রাজনন্দিনী—নাম বিনোদিনী রাধা!"

শুনলে, সে সে আমাদের চাটুর্য্যের বিনোদিনী গো।"

নবীন কথা বলিল না—কিন্তু তার মুখখানা যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় তা বেশ দেখা গেল।

শ্রীবাস একটু চিন্তা করিয়া বলিল, দেখ নবীন, এক উপায় আছে। এপর্য্যন্ত রোজগার যা কিছু করেছ সব চাটুয্যের পায় উজাড় করে দিয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব কর! আমি চাটুয্যাকে চিনি। তোমার টাকা গুলি যদি বাজে ভাল, তবে মেয়েটা হাত ছাড়া হবে না। কিন্তু সাবধান, ঐ ছায়া সঙ্গিনীর কথাটা তাদের কারো কাছে ভেঙ্গো না—সাবধান!"

নবীন স্মিতমুখে "তথাস্তু" বলিয়া তৎক্ষণাৎ একগাছি বেল ফুলের মালা মাত্র সম্বল করিয়া চাটুয্যেদের বাড়ী "বমবার্ড" করিতে উদ্যোগী হইয়া পড়িল!

(৪)

শুভ দিনে শুভ বিবাহ হইয়া গেল। নবীন বিনোদিনীকে তার নিজের ঘরে লক্ষ্মীর পাটে বসাইল বটে, কিন্তু তার মন পড়িয়া থাকিত তার অঙ্গহীনা ছায়াময়ীর কাছে! বিবাহের আগে দূর হইতে বিনোদিনীকে যতটা সুন্দর দেখাইয়াছিল, ঘরে আনিয়া আর তাকে তত সুন্দর লাগিত না। বিনোদিনী চোখের আড়াল হইতেই নবীন তার ঘরের আয়নার ভিতরস্থিত ছায়াসঙ্গিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইত। কখনো কখনো সে ছায়া সঙ্গিনীর সহিত তার গোপন মিলনটী নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নানা বাজে ওজর দেখাইয়া বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিয়া দিত। জগদীশ্বর পুরুষের হৃদয়ের গতি নিরূপণ করিবার নারীর হৃদয়ে একটী আশ্চর্য্য দিক্‌ দর্শন যন্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বিনোদিনী যে নবীনের প্রাত্যহিক ছলনা টুকু না বুঝিত, এমন নয়।

দিন দিন নবীনের নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল। নবীন তার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া আপনার সমুখে দাঁড়াইতেই, কোন বিচিত্র মায়ালোকের সমুদয় ইন্দ্রজাল জড় করিয়া, আয়নার ভিতরে এক প্রস্ফুটিত যৌবনা অনিন্দ্য সুন্দরী নারী নবীনের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইত! নবীন হৃদয়ের রক্ত দিয়া সে ছায়াময়ীর পার্শ্বে আলতা পরাইত, নয়ন জলে স্নান করাইয়া হাসির কণক চেলী পরাইয়া দিত, তার পর পায়ে তার ভাবের নূপুর বাঁধিয়া

দিয়া নিজের বীণাটীতে গানের সুরটী হিল্লোলিত করিয়া তুলিত! নবীন কখনো হাসিত, কখনো কাঁদিত, কখনো স্বরের মূর্চ্ছণার সঙ্গে সঙ্গে সে মায়াময়ীর লাবণ্যময় চরণচ্ছায় নিজে অবসিত হইয়া পড়িত! এমনি করিয়া সে অনেক তরুণ প্রভাত. নিঃঝুম দুপুর, অনেক নক্ষত্র-মালিনী নিশি, সে ছায়ারূপিনীকে লইয়া কাটাইয়া দিয়াছে!

বিনোদিনী স্বামীর সবটুকু হৃদয় অধিকার করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ভিতরের রহস্যের সবটুকু জানিত না। অথচ ভিতরে ভিতরে বেশ একটা রহস্যের খেলা জমিয়া উঠিতেছে, সেটা বেশ টের পাইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া তার বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত হিংসা ও অভিমানে জ্বলিতে থাকিত। একদিন বিনোদিনীর এই অন্তর্দাহ যখন অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল, তখন সে নবীনকে শক্ত রকম গ্রেপ্তার করিয়া ধরিল অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিল:—

"আজ তুমি আমায় সব কথা খুলে বল! ঘরের ভিতরে তোমার গোপনীয় কাজটা কি; আর সেটা আমার কাছে গোপন করিও না। আমি যদি তোমার মনোমত স্ত্রী না হয়ে থাকি, তোমার কাজের অজুহাত যদি শুধু আমাকে চোখের আড়াল করিবার কৌশল মাত্র, তবে তাও আমায় খুলে বল—আমাকে এমন করিয়া মারিওনা!"

নবীন গন্ধহীন কাঠ গোলাপের মত একটু হাসিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু সে হাসি এতই ম্লান যে তাহাকেই বিনোদিনীর অভিযোগের অর্দ্ধেক স্বীকারোক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়! নবীনের হাসির চেষ্টা ব্যর্থ হইলে কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল:—"দেখচো তো চব্বিশ ঘণ্টা কাজের বোঝা নিয়ে—

বিনোদিনী কথাটা শেষ না হইতেই অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল:—"না, আমাকে ছলনা করিও না তুমি! যে কাজ তোমার হৃদয়ের এত খানি জুড়িয়া আছে, আমাকেও তার অংশী করে নাও! তোমার কাজে আমারো অধিকার আছে যে!"

নবীন বিনোদিনীকে কোনও জবাব দিয়া উঠিতে পারিল না। কেবল হাসির জোরে সে বিনোদিনীর অভিযোগটা উড়াইয়া দিতে চাহিল; কিন্তু বিনোদিনী আজ তার হৃদয়ের সমুদয় আবেগ দিয়া তার অভিযোগটীকে ঠেকাইয়া রাখিল। নবীন পরাস্ত হইল কিন্তু যখন ক্রটী স্বীকার করিল না, অভিমানিনী তখন বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়া নবীনের নিকট হইতে চলিয়া গেল; আর একটী বারও তার পানে ফিরিয়া তাকাইল না!

পরদিন প্রাতঃকালে নবীন যখন এক সাজি ফুল লইয়া তার ঘরে প্রবেশ করিল, বিনোদিনী তখন জানালার ফাঁকে চোখ রাখিয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়াছিল। নবীন প্রভাতী কুন্দের এক সাজি মালা হাতে করিয়া সবে তার মায়ার আরসীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ঐ না আয়নার ভিতরে স্ত্রীলোকের ছায়া পড়িল! সেই ছায়ার পানে কিনা নবীন সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছে! বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে ঘৃণায় অপমানে জ্বলিয়া উঠিল। সে আজ সব টের পাইয়াছে। ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া রোজ রোজ গোপনে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিবার ছলে তাকে যে বঞ্চনা করিতেছে, আজ আয়নায় বিনোদিনী তার সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইয়াছে! সে নিজে স্বচক্ষে যা দেখিয়াছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে অবিশ্বাস করিবে কেন? বিনোদিনীর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। ভাবিল, এরি জন্য, এত মালা গাঁথা, এত ছলনারো প্রয়োজন ছিল! বিনোদিনী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া অস্ফুট চীৎকারে সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল!

চীৎকার শুনিয়া নবীন তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখে, তার গৃহ, গৃহাঙ্গন শূন্য! বিনোদিনী রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে!

সে সময়, অঙ্গনের কোণে একটা নিম গাছের শাখায় বসিয়া একটা চাতক ফটিক জল বলিয়া কাঁদিতেছিল।

নবীন কিছুক্ষণ মোহাবিষ্টের ন্যায় শূন্য গৃহাঙ্গনে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিল। তারপর ব্যথিত অভিমানে বিনোদিনীকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল "বিনোদিনি! আমি তো তোমায় কখনো অবহেলা করি নাই! দরিদ্রের ঘরে যে লক্ষ্মীর পাট ছিল, তাতেই

তো তোমায় বসাইয়াছিলাম। অন্তরের মণি-পীঠে যাকে বসাইয়া এতকাল ফুল চন্দন প্রেম অশ্রু দিয়া গোপনে পূজা করিয়া আসিতেছি, সে যে নিতান্তই ছায়া—এত করিয়াও সে ছায়াতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারি নাই, সেও কি এত দিনে বুঝিতে পারো নাই?—ছায়ার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আমাকে একটা বার জিজ্ঞাসাও করিলে না?—"

নবীন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তার জন্ম নক্ষত্রকে অভিসম্পাত করিল, তা বই আর তার কোনও উপায় ছিল না!

নবীন বিনোদিনীকে আবার ঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিল বটে কিন্তু বিনোদিনী আসিল না—নবীনের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিল না। নবীন প্রত্যাখ্যানের অভিমান, ব্যথিত অন্তরে চাপিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ফিরিয়াই নবীন তার মায়ার আরসীর সমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তার চির দিনের রহস্যান্তরালবর্ত্তিনী, তুল্যার্জ্জিত শান্তির মত, অশ্রুধৌত কান্তির মত, অক্ষয় আনন্দের মত, অঙ্গহীন সৌন্দর্য্য, লইয়া নির্ব্বাক সমবেদনায় তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তার নীরব অর্থভরা স্নেহদৃষ্টি যেন নবীনের হৃদয় হইতে সব জ্বালার চিহ্ন মুছিয়া লইল।

নবীন আজ তার পানে তাকাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল:—"এসো এসো হে কল্যাণি! একবার আমার কাছে এসো, জীবন কুঞ্জে এখন মূর্ত্তি ধরে দেখা দাও! জীবন পথের চির সঙ্গিনী আমার, এখন আমার মৃত্যুর পথ আলোকিত করিয়া আমায় হাত ধরে নিয়ে চল!'

আরসীর ভিতরে ছায়া-ময়ীর সুন্দর নয়ন প্রান্তে দুটী উজ্জ্বল আলোকস্বচ্ছ অশ্রু কণা দেখা দিল—তেমন ভুবনমোহন অশ্রু নন্দনের অপ্সরার চক্ষেও ঝরে না!

(৫)

বিনোদিনী আর নবীনের গৃহে ফিরিল না। সে নবীনকে ক্ষমা করিতে না পারিয়া বিফল আক্রোশে নিজেই অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল। এমন করিয়া হৃদয়ের ভিতরে তুষানল জ্বালাইয়া বিনোদিনী আর বেশী দিন বাঁচিল না। একদিন নিদাঘ দিনের রৌদ্র শুষ্ক শিথিল বৃন্ত ফুলটার মত নিঃশব্দে মৃত্যুর মাঝে ঝরিয়া পড়িল।

বিনোদিনীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া নবীন আবার রোদনোচ্ছ্বসিত চক্ষে তার মায়ার আরসীর সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি রহস্যের নেপথ্য হইতে নবীনের ছায়া রূপিনী, আরসীর ভিতর দেখা দিল। নবীন তার পানে চাহিয়া বলিল:—"আর কেন হে ছায়া-মায়াময়ি! জীবন রঙ্গভূমিতে একটা অশ্রুময় অঙ্কের অভিনয় তো এখন শেষ হলো? এখন রঙ্গভূমিটা চোখের জলে কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে! বাঁকি জীবনের অভিনয়টা শুধু তোমাতে আমাতে! তোমার জন্য আমি, আমার জন্য তুমি, দুজনের ভিতরে আর যে কেউ এসে দাঁড়ায়, নিয়তি তাকে চূর্ণ করে দেয়। সুতরাং আর আমার ব্যর্থ সুখের অনুসন্ধানে কাজ নাই! হে প্রেয়সি, হে শ্রেয়সি! হে আমার প্রণয় কুঞ্জের দেবতা! যদি আমার জীবন বিফল করিয়া দিয়াছ, এখন আমার ব্যর্থ জীবন তোমাকেই সফল করিয়া দিতে হইবে!"

এত দিনে নবীন তার জীবন সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইল। এখন আর তাদের গোপনতা বা রহস্যান্তরালের আবশ্যক ছিল না। সে অপূর্ব্ব ছায়াময়ী এখন আর মুহূর্ত্তের জন্যও নবীনের চক্ষের অন্তরাল হইত না। এখন নবীন তার চারিদিকের কুসুমিত বনকুঞ্জে তার ছায়াময়ীকে দেখিতে পাইত, তার মনে হইত, আকাশের নক্ষত্র পুঞ্জের ভিতর দিয়া, লাবণ্যের নির্ঝরিণীর মত, তার মঞ্জুল যৌবন শ্রী নন্দন বন হইতে তার হৃদয়ের তটপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে। এ জীবন সঙ্গিনীকে লইয়া আনন্দে দিন কাটাইবার জন্য এখন আর নবীনের গৃহের আবশ্যক ছিল না। এখন বন ফুল ফোটা শিশির ভিজা মুক্ত প্রান্তরে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া জীবন পাত্রের শ্যামল আনন্দ রস পান করিয়াই তারা সুখী হইল। নীলাকাশে নক্ষত্র লেখা অনন্ত প্রেম লিপি খানা পড়িতে পড়িতে আনন্দের আতিশয্যে জীবনগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িত। এই অবস্থায় আসিয়া পঁহুছিলে জীবনের আনন্দ উপভোগ করার জন্য মানুষের উদ্ভাবিত কৃত্রিম আসবাবের প্রয়োজন হয় না। হৃদয়ের ভিতরে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া মানুষের হৃদয়ে অনন্ত বিশ্বের শোভা ফুটাইয়া দেয়।

নবীনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিনোদিনী কোনও সন্তান সন্ততি রাখিয়া যায় নাই। কিন্তু এই ছায়াময়ী নবীনকে এতই সন্তান সন্ততি দিয়াছিল যে এখন তারা দেশময় ছড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এ পক্ষের প্রত্যেকটী পুত্র কন্যার জন্য জন্মবেদনাটী সহ্য করিতে হইয়াছে নবীনকে! কারণ তাদের মা যে দেহহীন ছায়া মাত্র! তার হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের সকল অভিনব উপাদান গুলি সজ্জিত ছিল, প্রাণে মাতৃস্নেহেরও অপ্রাচুর্য্য ছিল না, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জননীদের মত সন্তানের জন্ম বেদনা সহিবার উপযুক্ত স্থুলদেহ তার ছিল না!

এমনি ভাবে নবীনের বাকী জীবনটা এক পেয়ালা সুস্বাদু মদ্যের মত এক চুমুকে নিঃশেষ হইয়া গেল!

অবশেষে রঙ্গমঞ্চের সবগুলি দীপ নিবাইয়া দিয়া নবীনের চির বিদায় লইবার সময় একবার তার জন্ম সঙ্গিনীর সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। নবীন একবার ব্যাকুল হৃদয়ে ঝাপ্‌সা চোখে কুয়াশাময় সবুজ পৃথিবীর পানে চাহিয়া তার অন্বেষণ করিল।

সহসা উষার গোলাপী আভায় ঘনায়মান অন্ধকারের এক প্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই, নবীন দেখিল, চোখের সমুখে নন্দন কাননের একাংশ ঝলমল করিতেছে! এবং সেই নন্দন সুষমা মাখা একটী কল্পলতার কুঞ্জে তার জীবন-সঙ্গিনী তারি অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে! নবীন তাকে দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল:—

"ভরা আমার পরাণখানি,
সম্মুখে তার দিব আনি
শূন্য বিদায় করব নাত উহারে—
মরণ যে দিন আসবে আমার দুয়ারে!"

নবীনের জীবন সঙ্গিনী সে উষার কোমল আনন্দমাখা স্বর্গ হইতে মধুর কণ্ঠে নবীনকে ডাকিয়া বলিল:—

এস বন্ধু, এসো! এত দিন পৃথিবীতে বসিয়া হৃদয়ের স্বপ্ন দিয়া এ নন্দন কানন তুমিই রচনা করিয়াছ! তোমার সকল স্বপ্ন সত্য হইয়া এইখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে!'

নবীন মৃত্যুকে একটী সুন্দর মিলনান্তক গাথার মত অনুভব করিতে করিতে মৃত্যুর শীতল কোলে নয়ন পল্লব মুদ্রিত করিল!

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাঁচিয়া থাকিতে যারা একদিনও নবীনকে ভাল মুখে একটা কথা বলা দরকার বোধ করে নাই—যারা নবীনের ছেলে মেয়ে গুলিকে কেবল দশ জনের সমুখে অপমান করিয়াই আনন্দ লাভ করিয়াছে, তারাই আজ সকলের আগে নবীনের পুত্র কন্যাগুলির উপর উন্মত্তের মত পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল:—আহা! এরা এ নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ সামগ্রী নয়,—স্বর্গ হইতে এরা অক্ষয় সৌন্দর্য্যের আভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

* * *

কল্পনা নয়, কাহিনী নয়,—বাস্তবিক দেবতার বরে আমাদের শোক দুঃখপূর্ণ, ক্ষুদ্রতাহীনতাপূর্ণ পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন, যাঁদের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে গিয়া পুরুষ হইয়াও মাতৃত্বের জন্মবেদনাটুকু সহ্য করিতে হয়!

কাব্য ও কবিতাই ইঁহাদের পুত্র কন্যা—ভাবরাজ্যের সুন্দর সুন্দর শিশুগুলির জন্মদান করিয়া ইঁহারা পৃথিবীতে কবি নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

ইঁহাদের হৃদয়ের অৰ্দ্ধেক পুরুষ, অৰ্দ্ধেক নারী—গঙ্গা যমুনার মিলনের মত স্ত্রী পুরুষের ভাববৈচিত্র্য লইয়া ইঁহাদের হৃদয় পূর্ণ—জগতের জীব সৃষ্টিই বল, আর কাব্য সৃষ্টিই বল,—বিধাতার বিধি অনুসারে পৃথিবীতে স্ত্রী শক্তি সহায় না হইলে একা পুরুষ, সৃষ্টি ব্যাপার রক্ষা করিতে পারে না!

কবির হৃদয় প্রকৃত পক্ষে মায়ার আরসীই বটে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

কীটভুক-তরু।

বিশ্বেশ্বরের অনুপম সৃষ্টি-কৌশল বিশ্বরাজ্যের সৃষ্ট পদার্থ-মাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত জগতের অতিক্ষুদ্র অণু হইতে বৃহত্তম হিমগিরি পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, প্রত্যেকটী সৃষ্ট পদার্থ ই, তাঁহার অনন্তলীলার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই সৃষ্টির বিবিধ-সৌন্দর্য্য ও রচনা চাতুর্য্য সন্দর্শন করিয়া, বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়। স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টিতে যে কত শত অত্যাশ্চর্য্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

কতকগুলি উদ্ভিদ আছে তাহাদিগকে কীটভুক-তরু কহে। কীটভুক-তরু উদ্ভিজ্জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ। উদ্ভিদেরাও যে, মাংসাশী প্রাণীর ন্যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে ও ভক্ষণ করিয়া থাকে, ইহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর হইলেও, অসত্য নহে। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য কীটভুক-তরু ও উহার চাষ সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিতেছি।

এসিয়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের নানা স্থানেই কীটভুক-তরু দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। কীটভুকতরু (Nepenthes or insectivorus plant), ঘট পুষ্প বা ঘট পত্র উদ্ভিদ (Pitchers plant) বাঁদর ঝুলি (Monkey cup) নামে পরিচিত। ইহার পুষ্প ঘটাকৃতি। পত্রাগ্রভাগ হইতেই সাধারণতঃ ঐ ঘট বহির্গত হইয়া থাকে। এই জন্যই ইহাকে ঘট পত্রক বা ঘট পুষ্পক উদ্ভিদ বলা যায়। বাঁদরগণ তাড়াতাড়ি কোনও খাদ্য বস্তু গ্রহণ করিতে হইলে। প্রথমতঃ তাহা তাহাদের গালের উভয় পার্শ্বস্থ ঝুলি বা থলেতে পূরিয়া রাখে এবং তৎপর ক্রমশঃ ঝুলি হইতে ঐ খাদ্য বাহির করিয়া খাইয়া থাকে। এই ঝুলি খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ হইলে, তাহার আকৃতি অনেকাংশেই ঘটের বা কীটভুক-তরুর পুষ্পের আকার ধারণ করিয়া থাকে। সেই জন্য ইহার বান্দর বা বাঁদর ঝুলি নাম হইয়াছে। এদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা রামতূণীর (Rama's bag of arrows) নামে পরিচিত। তীর রাখিবার আধারকে তূণীর কহে। ঘট পুষ্পের আকৃতি তূণীরের ন্যায় বলিয়া ইহ রামতূণীর নামে পরিচিত। কীটভুক-তরুর নানা প্রকার বিভিন্ন জাতি আছে। এই গাছের ফুল তত সুন্দর না হইলেও ইহাদের কোন কোন জাতির পাতা নানা বর্ণে চিত্রিত বলিয়া অতি সুন্দর দেখায়। এই সকল পাতার নয়ন-মোহন রমণীয়তা বিশ্ব স্রষ্টার কারু কার্য্যের সম্যক পরিচায়ক।

অধিকাংশ কীটভুক-তরুরই ফুল হয় না; তবে পাতার অগ্রভাগ হইতে যে একটী ঘটবৎ পত্র বহির্গত হয় উহাকেই ফুল বলা যায়। এই ফুল বা ঘটের অভ্যন্তরে আঠাবৎ একরূপ পদার্থ সঞ্চিত থাকে। ঐ আঠাবৎ তরল পদার্থ ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ বলিয়া, তাহা পান করিবার জন্য মসা মাছি ও ক্ষুদ্র ২ কীট পতঙ্গাদি ঘট মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই পাত্রস্থ আঠাবৎ মধুর রস উহাদের গাত্রে ও পাখায় সংলগ্ন হইয়া যায়; এবং তাহাতেই তাহারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মধুপানে রত কীট পতঙ্গাদি উহাতে এরূপ ভাবে আবদ্ধ হয় যে, আর উহাদের ঘটের মধ্য হইতে বাহির হইবার বা উড়িবার শক্তি থাকে না, ঐ অবস্থায় পাত্র মধ্যেই কীটাদির দেহ বিলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উহারা মধুর লোভে কীটভুক তরুর পত্র প্রান্তস্থ ঘটের বা ফুলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই, আঠাবৎ মধুর রসে আবদ্ধ হইয়া জীবন হারায় এবং ঐ রসেই জীর্ণ হইয়া যায়। কোন ২ জাতীয় কীটভুক-তরুর ঘট বা পাত্রের মুখে সরার বা ঢাকনীর ন্যায় একটী আবরণ থাকে। এই আবরণের এক প্রান্ত ঘটের সহিত সংলগ্ন রহে। কিন্তু অপর প্রান্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঘটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই আবরণটীর স্পর্শ শক্তি এতই প্রবল যে, কীট পতঙ্গাদি ঘটের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, উহা উদ্দীপিত হইয়া উঠে; এবং ঘটের মুখ ঢাকিয়া পড়ে। ফলে, একবার ঘটের মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহা হইতে বহির্গত হইবার আর কোনও উপায় থাকে না। সরল প্রাণ জীব ঘটাবরণের কুহক বুঝিতে না পারিয়া মধুর লোভে ঘট মধ্যে প্রবেশ করিলেই, জীবনলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আঠাবৎ মধুর রসে পতিত কীট পতঙ্গাদি জীর্ণ

হইয়া গেলেই, পুনরায় আবরণের এক প্রান্ত উত্থিত হইয়া পড়ে; এবং কীটাদির প্রবেশ পথ পুনরায় সুগম করিয়া দেয়। এইরূপে কীট পতঙ্গাদি উদরস্থ করিয়াই, কীটভুক-তরু স্বীয়দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

কীট ভুক-তরু শীত প্রধান দেশেই বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। আর্দ্র বায়ুবিশিষ্ট স্থান ইহার চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যান তত্ত্ববিদ্ ফার্ম্মিঞ্জার সাহেব বলেন, ফার্ণহিটের তাপমান যন্ত্রের ৭০´ হইতে ৮০´ ডিক্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানেই কীটভুক-তরু রোপণ করিতে হয়। এইরূপ শীতল স্থানই এই জাতীয় গাছের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কীটভুক-তরু শীত প্রধান দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও, আমি আমার নার্শেরী বাগানে, বহুচেষ্টায় ২।৩ জাতীয় গাছের চাষ করিতেছি। তন্মধ্যে খসিয়া পাহাড়ের (N pinthes Khosiana) ও মালয় দেশীয় নেপেন্থেস্ হুকারিয়ানা (Nepenthes Ho keriana) নামক কীট ভুক-তরু আমার বাগানে বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। *

কাষ্ঠ ও মৃণ্ময় পাত্রাদিতে, ঝাঁকাতে অথবা ভূমিতেও ইহাদের চাষ করা যায়। নিম্ন প্রদেশে ঝাঁকার চাষ করাই সুবিধা জনক। ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া ঝাঁকায় চাষ করিলে অধিক উত্তাপের সময়, গাছ গুলিকে স্নিগ্ধ স্থানে ঝুলাইয়া রাখা যায়। ইহাদের কোন কোন জাতি লতা স্বভাবাপন্ন। সুতরাং পাত্রে ইহাদের চাষ করিলে, গাছগুলি লতাইয়া পাত্রের বাহিরে পড়িয়া যায়। তদবস্থায় গাছের পাতাতে ধুলি-বালি লাগিয়া, উহাদের মনোহর সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ঝাঁকায় ইহাদের চাষ করাই সুবিধা জনক, কোন কোন জাতি গুল্ম স্বভাবাপন্ন। সুতরাং উহারা পাত্রে চাষের পক্ষে উপযোগী।

ফার্ম্মিঞ্জারের মতে সমান ভাগ পিট্ (Peat) মৃত্তিকা, পাতার সার, ও শৈবাল মিশ্রিত মৃত্তিকাই ইহাদের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমি ঘাসযুক্ত দোআঁশ (Turfy loam) মৃত্তিকার সহিত পুকুরের পচা পাঁক, প্রস্তর চূর্ণ, বালি পাতার সার, শৈবালের গুড়া, অভাবে নারিকেলের ছোবার গুড়া পচা সার, কঙ্কর ও সুরকি মিশ্রিত করিয়া, উহাতে ঘট পুষ্পের চাষ করিয়া থাকি। * ছায়াযুক্ত স্থানই ইহাদের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভূমিতে রোপণ করিতে হইলে, সবুজ গৃহের (Green house) রকারিতে (Rockery) ইহাদের চাষ করাই সুবিধা জনক। তদভাবে পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘ উচ্চ দেওয়ালের উত্তর পার্শ্বে, উচ্চস্থানে ইহাদের চাষ করা যাইতে পারে। ইহারা আর্দ্রতা ভালবাসে। ইহাদের গাছের গোড়া আর্দ্র থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, গোড়ায় অধিক জল দাড়াইলেও গাছ পচিয়া মরিয়া যায়। লতা স্বভাবাপন্ন উদ্ভিদ বলিয়া ডাবা কলম দ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন করাই সুবিধা জনক। কাটিং ও বীজ দ্বারাও কোন কোন জাতির গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ জাতিরই বীজ হয় না। ইহাদের জন্মস্থান বোর্নিও, ইউরোপ, আমেরিকা, ফিলিপাইন দ্বীপ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, আফ্রিকা, জাভা দ্বীপ, এবং ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে এবং খসিয়া, নাগা, জয়ন্তিয়া ও গাড়ো পাহাড়ে কয়েক জাতীয় কীটভুক-তরু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অর্দ্ধ সভ্য পার্ব্বত্য-জাতীয় লোকেরা ইহাকে রামতুনীর কহে। নিম্নে কয়েকটী প্রধান জাতির বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। নেপেন্থেস্ খসিয়ানা (Nepenthes Khasiana) ইহার জন্মস্থান খসিয়া ও গাড়োপাহাড় সিঙ্গাপুর ও সিংহল দ্বীপ। এই গাছ লতানে স্বভাব বিশিষ্ট। ইহার কাণ্ড ধূসর বর্ণের আবরণে আবৃত থাকে। এই জাতির পাতা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২।৩ ইঞ্চি প্রস্থ। পাতার বর্ণ গাঢ় চক্‌চকে সবুজবর্ণ। পাতার অগ্রভাগ হইতে একটী লম্ব শীষ নির্গত হইয়া থাকে। এবং উহাই

* কলিকাতা শিবপুর উদ্ভিদাগারের (Botanical gardens) তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার প্রেইন, কিয়ৎকাল হইল একখানি চিঠিযোগে আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি বহু চেষ্টাতেও শিবপুর রাজকীয় উদ্ভিদাগারে (Royal Botanical gardens) ইহাদের চাষ করিতে সক্ষম হন নাই। দারুন নিদাঘ সময়ে উত্তাপ আধিক্য হেতু উহারা মরিয়া গিয়াছে।

* খাটি পিট্ (Peat) মৃত্তিকা এদেশে দুর্লভ। সুতরাং এদেশে উপরোক্ত মিশ্র মৃত্তিকায়ই ইহাদের চাষ করা সুবিধা জনক।

ক্রমে ঘটের আকার ধারণ করে। এই ঘটই কীট ভোজনের যন্ত্র বিশেষ। সবুজ ও হলুদ বর্ণের নানা বিধ ছায়া (sha le) দ্বারা চিত্রিত ও কারুকার্য্য সমন্বিত ঘটটী প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়; নীচের স্থূলতার পরিমাণ ও ৩।৪ ইঞ্চির কম হইবে না। ঘটের নিম্নভাগই স্থূল। কিন্তু উপরিভাগ ক্রমে ঘট হইয়া উঠে। ঘটের গলদেশ অতিশয় সরু। মুখের উপরিভাগের এক পার্শ্বে একটী সরা বা ঢাকনী সংলগ্ন থাকে। সরার আকার ঘটের মুখের অনুযায়ী হয়। পাতার অগ্রভাগে ইহার ঘট জন্মে বলিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহার ঘট দেখিতে ভেণ্ট্রিকোসা জাতির ঘটের প্রায় অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে বর্ণের পার্থক্য ভিন্ন গঠনের কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় না। এই জাতির ঘটের মুখ তরঙ্গায়িত নহে।

২। নেপেন্থেস এম্পিউলেরিয়া (N ampullaria) ইহার জন্মস্থান বোর্নিও দ্বীপ। এই গাছের ঘট সবুজ বর্ণের হয় এবং ঘটের মুখে ছোট একখানি সরা বা ঢাকনি থাকে। ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহা ক্ষুদ্র জাতীয় কীটভুক-তরু।

Nepenthes Balfouriana.

নেপেন্থেস্ বেল্‌ফোরিয়ানা।

৩। নেপেন্থেস্ বেল্‌ফোরিয়ানা Nepenthes Balfouriana ইহা শঙ্কর জাতীয় কীটভুক-তরু। মাষ্টার সিয়ানা (N Mastersiana ও মিক্সটা (N. Mixta) নামক জাতির সংযোগে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ঘট জরদ মিশ্রিত সবুজ বর্ণের হয়; এবং তাহার স্থানে স্থানে লাল ফোটা থাকে। ঘটের আকৃতি লম্বা থলের অনুরূপ। চর্ম্ম পাদুকার অর্থাৎ জুতার আকৃতির সহিত ইহার ঘটের কতকটা সাদৃশ্য আছে।

৪। নেপেন্থেস বাইকাল্‌কারেটা (N. Bicalcarata) ইহার জন্মস্থান বোর্নিও দ্বীপ। এই ঘটপ এক গাছের ঘটের আকৃতি থলের ন্যায়; এবং ঘটের বর্ণ সবুজ।

Nepenthes Chelsoni Excellens

নেপেন্থেস্ চেলসনি এক্‌সেলেন্স্

৫। নেঃ চেলসনি এক্‌সেলেন্‌স (N Excellens). ইহার জন্মস্থান অনিশ্চিত; ঘট বৃহদাকারের হয়। ঘটের বর্ণ উজ্জ্বল সবুজ; কিন্তু তাহার নানা স্থানে লাল ফোটা থাকে। ঘটের ঢাকনী নানা বর্ণে চিত্রিত ও ফোটা ফোটা দাগ যুক্ত।

৬। নেপেন্থেস কার্টিসি (N. Curtisi) ইহার জন্ম স্থান বোর্নিও। এই জাতির ঘটলম্বা; এবং বেগুনে বর্ণের ফোটা যুক্ত সবুজ বর্ণের হয়।

৭। নেঃ হিরসুটা গ্লেব্রেসেনস্ (N Hirsuta Glabsascens) ইহার জন্মস্থান বোর্নিও। ঘটের বর্ণ জরদের আভাযুক্ত সবুজ

৮। নেঃ হুকারিয়ানা (N. Hookeriana.) বিখ্যাত প্রাণী ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডাক্তার হুকারের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই জাতির জন্মস্থান মালয় দেশের সারাওয়াক (Sarawak) নামক

স্থান। ইহার ঘটলাল রঙ্গের ফোটা দ্বারা চিত্রিত। ঘটের ঢাকনী আছে; এবং তাহাতে দুইখানি পাখা সংযুক্ত থাকে।

৯। নেঃ মাষ্টার্সিয়ানা (N. Mastersiana) ইহা সেঙ্গুইনিয়া (N Sanguinia) ও ডিষ্টিলেটোরিয়া (N. Distillatoria) এই দুই জাতির সংযোগে উৎপন্ন শঙ্কর জাতি। ইহার ঘট রক্ত বর্ণ এবং প্রায় ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। ঘটের আকৃতি স্তম্ভের অনুরূপ (Scylindria) চর্ম্মপাদুকা অর্থাৎ জুতার আকৃতির সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে।

১০। নেপেন্থেস মিক্‌ষ্টা (N. Mixta) ইহা কার্টিসি ও নর্থিয়ানা (N. Northiana) নামক জাতির সংযোগে উৎপন্ন শঙ্কর জাতি। এই জাতির ঘটেও পাখা আছে। ঘট জরদাভ সবুজ বর্ণের। এবং তদুপরি নানাস্থানে অন্য রঙ্গের ফোটা অঙ্কিত থাকে। ঘটের মুখের নিকট লাল বর্ণের ঢাকনী থাকে।

১১। নেঃ নর্থিয়ানা (N. Northiana) এই জাতীয় গাছ উৎকৃষ্ট। ইহার ঘট ১২ হইতে ১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪।৫ ইঞ্চি প্রস্থ হইয়া থাকে। ঘটের আকৃতি চেপ্টা (flat) ধরণের হয়; এবং তাহা লালবর্ণে চিত্রিত, স্তম্ভাকার ও পাখাযুক্ত। ঘটের উর্দ্ধভাগ তুরীর (Trumpet) অনুরূপসট; কিন্তু নিম্নাংশ স্থূল ও বৃহৎ হইয়া থাকে।

১২। নেঃ রাফ্লিসিয়ানা (N. Rafflesiana) ইহার জন্মস্থান বোর্নিও। ইহার ঘট সবুজ ও জরদ বর্ণের; এবং তাহা রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত থাকে। ইহা অতিশয় সুন্দর জাতি।

১৩। নেপেন্থেস সেঙ্গুইনিয়া (N. Sanguinia) ইহার ঘট রক্তবর্ণ, প্রায় দশ বার ইঞ্চি লম্বা হয়।

১৪। নেঃ সিডেনি (N. Sydenii) ইহার জন্ম স্থান অষ্ট্রেলিয়া। ইহার ঘট পাতলা সবুজ বর্ণের হয়; এবং উহা লালবর্ণে চিত্রিত।

১৫। নেঃ ভেন্ট্রিকোসা (N. Ventricosa) ইহার জন্ম স্থান ফিলিপাইন দ্বীপ। ইহার ঘটের নিম্ন ভাগ গোলাপী বর্ণের এবং উপরি ভাগ জরদাভ সবুজ বর্ণের হয়। ঘটের মুখের কিনারা তরঙ্গায়িত; অর্থাৎ ঢেউ তোলা; উহা উজ্জল লালবর্ণের। কিন্তু কিনারা হইতে ঘটের মুখের দিকে ক্রমেই লালবর্ণের সহিত বেগুণে বর্ণের সংমিশ্রণ থাকে। ইহার ঘট বড়ই সুন্দর, ইহার ঘটের গঠণ এদেশীয় খসিয়ানা জাতিরই প্রায় অনুরূপ। উপরোক্ত কয়েক জাতি ভিন্ন আরও বহু সংখ্যক জাতীয় কীটভুক-তরু আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জাতির নামই উল্লেখ যোগ্য।

Nepenthes Ventricosa.

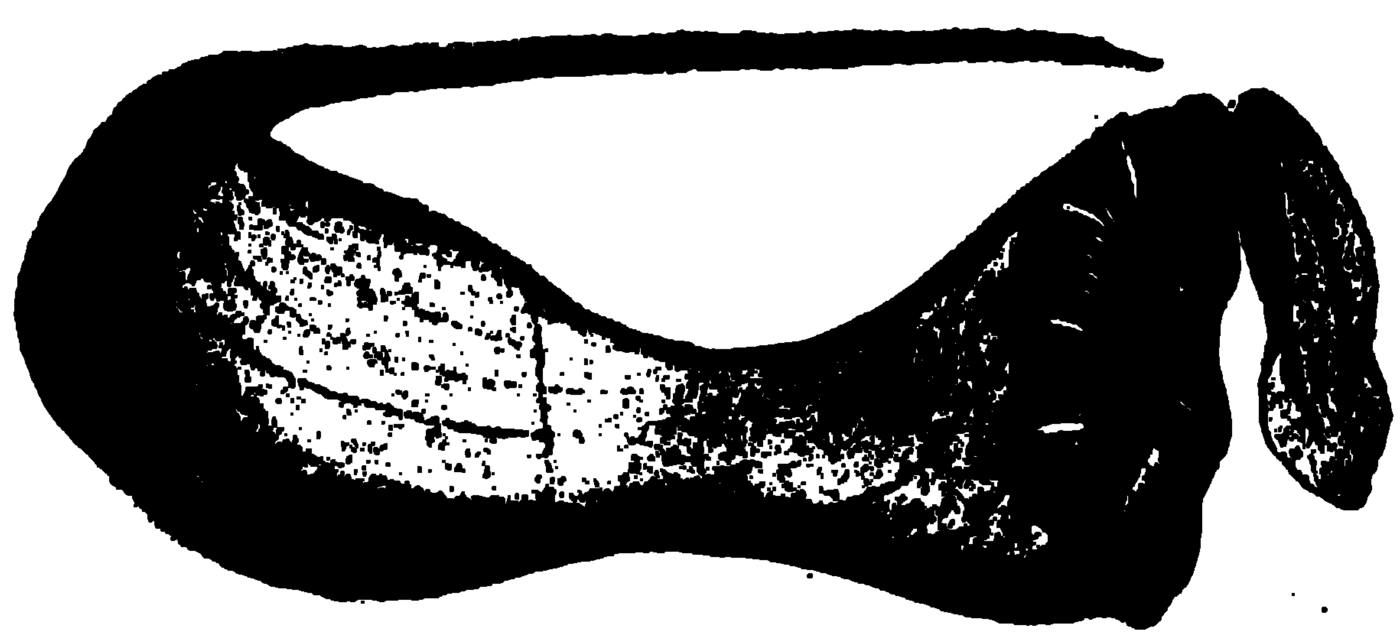

নেপেন্থেস্ ভেন্ট্রিকোসা।

১। নেঃ টিভিই N Tiveyie
২। ঐ ভিচ N. Veitchie
৩। ঐ রুবেল্লা N. Rubella
৪। ঐ মিক্‌ষ্টা সেঙ্গুইনিয়া N. Mixta Sanguinea
৫। নেপেন্থেসডিক্‌সনিয়ানা—Nepenthes Dicksoniana.
৬। ঐ এমাসিয়ানা—N. Amasiana.
৭। ঐ সাইলিণ্ড্রিকা—N. Cylindrica.
৮। ঐ গ্রেসিলিস্—N. Gracillis.
৯। ঐ মাডাগাস্কারিয়ানা—N. Madagaskeriana.
১০। ঐ চেলসনি—N. Chelsoni.
১১। ঐ বার্কি এক্‌সেলেনস্—N. Burkei Excellens.
১২। ঐ কার্টিসি সুপার্ব্বা—N. Curtissi Superba
১৩। ঐ ডিষ্টিলেটোরিয়া—N. Distillatoria.
১৪। ঐ নেপেন্থেস ইন্টারমিডিয়া—N. Interemdia.
১৫। ঐ ফাইলাম্ফোরা—N. Phyllamphora.

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

আলোচনা।

শ্রীহট্টেরই রঘুনাথ।

কিয়দ্দিন হইল কোনও পত্রিকায় রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছিল; তাহাতে নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগের পর লেখক মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রঘুনাথ শ্রীহট্টের (তথা পূর্ব্ববঙ্গের) লোক নহেন তিনি নবদ্বীপেরই খাস অধিবাসী ছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি আজ ন্যূনাধিক দশ বৎসর যাবৎ রঘুনাথকে অযথা শ্রীহট্টের লোক বলিয়া ব্যাখ্যিত করিতেছেন, ইত্যাদি। ঐ সকল পাঠ করিয়া 'সৌরভ' সম্পাদক মহাশয় আমাকে "ব্যাপার খানা কি?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাহারই উত্তরে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

সন ১৩০৯ সালে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলনকল্পে উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত মুদ্রিত চিঠি শ্রীহট্টের শিক্ষিত সাধারণের নিকটে প্রচারিত হয়। তদুত্তরে বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে রঘুনাথ শিরোমণি এই শ্রীহট্ট অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোথায়, কোন বংশে ইত্যাদি তখন পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহই নির্দ্দেশ করেন নাই। অতঃপর রঘুনাথ কোন্ বংশের লোক কোন্ জায়গায় তাঁহার পিতৃভূমি ছিল এই দুই বিষয় নিয়া অচ্যুতবাবু এবং দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস মহাশয় গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়া নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তখন এই বিষয় নিয়া দুইটি দল বাধে—একদল তাঁহাকে কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতির ভ্রাতা বলেন, অপর দল তাঁহাকে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই বিষয় নিয়া অবান্তর আরও কথা আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে; তন্মধ্যে বৎস গোত্রীয় রাজা সুবিদনারায়ণ—যিনি রঘুপতিকে কন্যাদান করিয়াছিলেন—সম্বন্ধে তুমুল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। অতঃপর কালক্রমে ঐ বিষয়ক আন্দোলন আসিয়া যায়। পরন্তু "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে' অচ্যুত বাবু তাঁহার নিজের মত লিপিবদ্ধ করিলেও অপর পক্ষের সমস্ত যুক্তিতর্ক উল্লেখ করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; ভবিষ্যতে কেহ যদি রঘুনাথ সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে চান। 'ইতিবৃত্তে' উভয় পক্ষের কথা পড়িয়া যাহা সমীচীন হয় গ্রহণ করিয়া, তদুপরি নিজের গবেষণা লব্ধ মালমসলা সংযোগ পূর্ব্বক শিরোমণি বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করিতে অবশ্যই পারিবেন।

তবে যে লেখক মহাশয়ের কথা প্রারম্ভে উল্লেখিত হইয়াছে তিনি ঠিক্ সরল ভাবে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি প্রবন্ধটিকে শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি এইরূপ শিরোনামা দিয়া প্রকারান্তরে 'শ্রীহট্ট' যে বঙ্গের একটা কিছু নয়, তাহাই বুঝাইতেছেন; এবঞ্চ প্রবন্ধ মধ্যে আরও এমন সব বিষয় আছে, যাহাতে তাঁহার শ্রীহট্টের প্রতি যেন একটা নিরনুগ্রহক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপিচ পূর্ব্বে প্রতি বাদী পক্ষ যে সকল কথার আলোচনা আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন তাহা পাকে-প্রকারে স্বীয় গবেষণা লব্ধ বলিয়াই যেন তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বিশেষতঃ তদাশ্রিত পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ও যে নিরপেক্ষতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই ইহা আরও দুঃখের বিষয়। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে একটি প্রতিবাদ নিতান্ত খামখেয়ালি ভাবে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করিয়াছিলেন —কারণ বোধ হয় এই যে উহা প্রকাশিত হইলে পরে উক্ত লোকে মহাশয়ের দাঁড়াইবার আর স্থান থাকিত না —গবেষকত্বও অনেকটা খর্ব্ব হইয়া যাইত। তৎপর বহু পীড়াপীড়িতে দ্বিতীয় প্রতিবাদ এমন ভাবে ছাপাই-য়াছেন যে তাহা অপেক্ষা না ছাপানই ভাল ছিল—তিনি প্রতিবাদের রক্তমাংস কৌশল করিয়া বাদ দিয়াছেন। এবং স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে এবিষয়ে আর প্রতিবাদ প্রকাশিত করিবেন না। ফলতঃ সাহিত্য বাজারে এতাদৃশ্য অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

যাহা হউক লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন

---

* বলা আবশ্যক যে তাঁনও রঘু-পতির ন্যায় শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন।

আলোচনা করিব। রঘুনাথ শিরোমণি পূর্ব্ববঙ্গের এবং শ্রীহট্টেরই লোক, এটা অচ্যুতবাবুর আবিষ্কৃত নূতন কথা নহে।

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে"র উপাদান মধ্যে শ্রীহট্টবাসী পণ্ডিতগণের যে সকল সাক্ষ্য বাক্য আছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন—কেন না, তাহা আপাততঃ পক্ষপাত দুষ্ট বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। তাই শ্রীহট্টের অধিবাসী ভিন্ন যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই উল্লেখিত হইতেছে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ
২৫ শে শ্রাবণ ১৩২১

সবিনয় নিবেদন মেতৎ

* * * *

"রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান শ্রীহট্ট, এরূপ কিংবদন্তী আমরা শিশুকাল হইতে শুনিতেছি। অধ্যাপক মহাশয় দিগের নিকটেও এইরূপ শুনিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়গণ সকলেই এরূপ বলেন। তাঁহারাও অধ্যাপক পরম্পরায় এরূপ অবগত হইয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে কথা এযাবৎ আর শুনি নাই। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ (মহামহোপাধ্যায়) মহাশয়ও এরূপ বলিলেন, তিনিও নিজ অধ্যাপকের নিকট এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে এরূপ অবগত আছেন। আমাদের কলেজের অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকটে জানিলাম তাঁহারাও এই কিংবদন্তী অবগত আছেন এবং বিশ্বাস করেন।

"পূজ্যপাদ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সোসাইটি হইতে প্রকাশিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকায় একথা লিখিয়াছেন। সেই লেখা এইরূপ—*

'রঘুনাথ শিরোমণিঃ প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তেই রঘুনন্দনশ্চ পূর্ব্ববঙ্গবাস্তব্য আসীৎ। গদাধরোঽপ্যুত্তর বঙ্গবাস্তব্যঃ। পশ্চান্নবদ্বীপে অধীত্য তত্রৈব নিবাসং চক্রুঃ। তদেবং নবদ্বীপে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আসন তে প্রায়োবঙ্গদেশীয় এবেতি জ্ঞায়তে।'

"রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টবাসী, এই কিংবদন্তী অবাধে পুরুষানুক্রমে সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান ভাবে প্রচলিত আছে। ইহার বিরুদ্ধ কোনও গ্রন্থের উক্তি বা প্রবাদের কণিকামাত্র নাই। এই অবস্থায় এই কিংবদন্তী প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়েরও এইরূপ মত।

* * * *

অনুগ্রাহ্য শ্রীযামিনীনাথ শর্ম্মণঃ।"

ইনি ময়মনসিংহের পণ্ডিতরত্ন (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়। এবং মহামহোপাধ্যায় দর্শনতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীও ত্রিপুরা জেলায়! অর্থাৎ কেহই শ্রীহট্টের লোক নহেন। ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী; এখন পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতগণ কি বলেন দেখা যাউক।

শ্রীহট্টের ইটা নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ মহাশয় বোধ হয় প্রাগুক্ত লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে বিচলিত হইয়া এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করেন। কিয়দ্দিন হইল তিনি লিখিয়াছেন—

"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন 'রঘুনাথ শ্রীহট্টের কি না নিশ্চয় জানি না, কিন্তু তিনি পূর্ব্বদেশীয় ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে জননীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। একথা প্রবাদরূপে জানা আছে।' "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, রঘুনাথ পূর্ব্বদেশীয় রাঢ়ী শ্রেণীর লোক বলিয়া তাঁহার ধারণা।

"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন নাকি একদা শ্রীহট্টের কোনও মেধাবী ছাত্রকে 'রঘুনাথ শিরোমণির' দেশের উপযুক্ত ছাত্র বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।'

দেখা গেল, যে পশ্চিমবঙ্গের মনীষিগণ রঘুনাথকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া জানেন; এবং পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শ্রীহট্টের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন! ইহাই স্বাভাবিক; পশ্চিমবঙ্গের নিকট সকল জেলার ব্রাহ্মণই এক—কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন অংশের খবর রাখিবারই কথা।

অধিক বাহুল্য। উপসংহারে কেবল একটি দুঃখের

* নব্যভারত ১০৫৫-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান বিচার শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কথা বলিব ; যে পত্রিকাখানিতে রঘুনাথকে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীনন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্ববঙ্গেরই একখানি পত্রিকা। এবং লেখক মহাশয় কেবল যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী এমন নহে, তিনি (অন্ততঃ দু'পুরুষ যাবৎ) শ্রীহট্ট কাছাড়েরই অন্নজলে পরিপুষ্ট।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

দশরথ জাতক।

ভাদ্রের "মানসীতে" "দশরথ জাতকের" উপাখ্যানটি পড়িয়া মনে ইত্যাকার প্রশ্ন উদয় হইয়াছে। একি ! সীতাদেবীকে রামের বৈমাত্রেয় ভগিনী করা হইয়াছে কেন ? রাম ও লক্ষণের সঙ্গে সীতা বার বৎসর (!) বনে বনে ঘুরিয়াছেন। তৎপর রামের সঙ্গে তাঁহাকে বিবাহও দেওয়া হইয়াছে। আমাদের চক্ষে ব্যাপারটা অশাস্ত্রিক, অযৌক্তিক ও বিসদৃশ বটে। কোন পুরাবৃত্তেও ত এরূপ নাই। তবে জাতকে এরূপ উপাখ্যান কোথা হইতে আসিল ? ইহা নিশ্চিত যে এ জাতকের সম্পূর্ণ উপাখ্যানটি আমাদের দেশ হইতে নেওয়া হয় নাই।

আমার মনে হয় এই আখ্যানের কতকাংশ ব্রহ্মদেশ হইতে নেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ বৌদ্ধ দেশ। এদেশের লোকদের রীতিনীতি আমাদের দেশের রীতিনীতি হইতে আকাশ পাতাল প্রভেদ এবং আমাদের চক্ষে বিস্ময়জনক। এদেশে রাজাদের মধ্যে বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ করা অতি সাধারণ ব্যাপার। এবং বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ প্রসস্ত বলিয়াই গণ্য হয়।

ব্রহ্মে রাজপুত্রদের বিবাহের ব্যাপারটা দাড়াইত এইরূপ। প্রত্যেক রাজা বহু বিবাহ করিতেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যাও অসংখ্য হইত। রাজাদের নিয়ম হচ্ছে এই যে যাহাদের শরীরে রাজশোনিত প্রবাহিত কেবল সেই রূপ পাত্রীকেই বিবাহ করিতে হইবে। রাজ পরিবারের বাহিরে সচরাচর এরূপ পাত্রী না পাওয়ায় বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলন হয়। তৎপর এরূপ বিবাহ রাজ পরিবারে প্রসস্ত বলিয়া গণ্য হয়। এ প্রথাই [illegible]য়া আসিতেছে। কোন রাজপুত্রের বৈমাত্রেয় ভগিনী অথবা রাজশোনিত যুক্ত অন্য কোন পাত্রী না পাওয়ায় তিনি নিজ সহোদরা ভগিনীকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রথা শুধু রাজ পরিবারেই প্রচলিত। প্রজা সাধারণের মধ্যে নহে।

বর্ত্তমান বন্দী রাজা থিব মুখ্যতঃ রাজ পরিবারের নহেন। রাজকন্যা বিবাহ করিয়া তিনি রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি নিলগীরি পর্ব্বতে গভর্ণমেন্টের ভাতা গ্রহণ করিয়া নজরবন্দি অবস্থায় আছেন।

ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মিনডন্ মিন্ সুচতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ করিয়াছিলেন। মিনডন্ মিনের পিতার ৪৬টী মহিষী ছিল। তন্মধ্যে ৪টি প্রধানা ছিল। প্রথমার গর্ভে একটি কন্যা হয়। দ্বিতীয়ার গর্ভে মিনডন্ মিনের জন্ম। পুত্র অপেক্ষা কন্যা ৫ বৎসরের বড়। বৃদ্ধ রাজা মরিবার পর মিনডন্ মিন্ রাজা হয়েন।

রাণী বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাজা অপেক্ষা রাণীর প্রতাপ অধিক ছিল। বলিতে গেলে রাণীই এই বিশাল রাজ্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলেই ইংরেজ ও ফরাসীগণ বহু দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত উভয়কেই দূরে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনিতে বহু রহস্যপূর্ণ ইতিবৃত্তি রহিয়াছে। রাজা যদিও চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন কিন্তু তিনি রাণীর সঙ্গে কিছুতেই আটিয়া উঠিতে পারিতেন না। প্রবাদ আছে যে রাজা রাণীর সঙ্গে কথা বলিবার সময় জোড়হাত করিয়া কথা বলিতেন এবং "প্রভো" "হুজুর" "দেবী' ("মাবিয়া") ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এপ্রকার আচার প্রভু ভৃত্যেই শোভা পায়। আমার মনে হয় বড় বোন বলিয়াই রাজা এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

যাহা হউক এ প্রকার আচার ও যৌন সম্বন্ধ বোধ হয় ব্রহ্মদেশেই চলিত আছে। অন্য কোথায়ও আছে কিনা জানি না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

Published by Keder Nath Mazumder, Research house Mymensing.
Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat art Press, Dacca.

স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সিংহ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২১। { ৫ম সংখ্যা।

তিব্বত অভিযান।

ইয়াম্‌ডক্‌ হ্রদ ও সাংপোনদী।

এই সময় আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে তিব্বতীয়েরা আমাদের সহিত সন্ধি করিবে না। এস্থলে লাসা গমন করাই আমরা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। সেখানে না যাইলে ইহারা কোনও মতে নত হইবে না। পথি-মধ্যে যে আমরা নিরাপদ থাকিব সে বিষয়ে অবশ্য স্থির কিছুই জানিতাম না। তিব্বতীয়েরা আমাদিগকে পথিমধ্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করিতাম। পথের বিষয়ে পাকা খবর আমাদের মধ্যে কেহই জানিতেন না। গিয়াংসী হইতে লাসা পর্য্যন্ত পথে আমরা যে কোথাও কোনও প্রকার খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ কবিতে পারিব, তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা নিম্নলিখিত প্রকার সৈন্যাদি লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম:—

৭নং পর্ব্বত আক্রমণের তোপ (Mountain battery)
৩০নং ঐ
৫০ জন স্যাপার সৈন্য (Sappers)
২০০ জন পর্ব্বত আক্রমণের পদাতিক সৈন্য
৪০০ গোরা সৈন্য (Pioneers and Maxims)
৬০০ পাঠান সৈন্য।
৬০০ গুর্খা সৈন্য।
যুদ্ধ হাঁসপাতাল। কমিসেরিএট।

সর্ব্বসমেতে প্রায় ২০০০ সৈন্য আমাদের সহিত চলিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২৪০০ অন্যান্য লোক ছিল। প্রয়োজনের সময় যাহাতে আমরা সাহায্য পাইতে পারি, তজ্জন্য আমরা গিয়াংসীতে ৫০০ সৈন্য রাখিয়া দিলাম।

১৪ই জুলুয়ারি আমরা গিয়াংসী ত্যাগ করিলাম। প্রথমে আমরা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। গিয়াংসী উপত্যকা ক্রমে ২ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। পথ আবার পর্ব্বত সঙ্কুল হইতে লাগিল। দূরে খারো গিরি সঙ্কট আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পর দিবস আমরা পূর্ব্বোক্ত নিয়াং নদীর এক বিস্তৃত সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে দুইটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী একত্র মিলিত হইয়া নিয়াং নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। তিব্বতীয়েরা এই সঙ্গম স্থানে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

পরদিবস আমরা রালংনদীর উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম। এই সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল বলিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া গমন স্থগিত রাখিতে হইল। সে দিন বৃষ্টি আর বন্ধ হইল না। তাঁবুর মধ্যে বসিয়া আমরা ভিজিতে লাগিলাম। পরদিবস আমরা রালং গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামের অনতিদূরে এক গগণভেদী পর্ব্বত দেখিতে লাগিলাম। শুনিলাম ইহার উচ্চতা প্রায় ২৪০০০ ফুট। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম 'নুজিন ফংসং'। পূর্ব্বোক্ত খারো ইহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। লাসা গমন করিতে হইলে ইহা অতি-

ক্রম করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। রালং গ্রামে আমরা শুনিলাম যে, খারোর উপর প্রায় ২০০০ তিব্বতীয় সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। এই গ্রামটী বিশেষ সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত বলিয়া আমরা এই খানে এক ক্ষুদ্র সেনা নিবাস স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইলাম। মধ্যে মধ্যে সেনা নিবাস স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পথিমধ্যে যদি আমরা কোনও প্রকার বিপদে পড়ি, তাহা হইলে এই সকল স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। বিশেষতঃ আমাদের পশ্চাতে থাকিয়া ইহারা আমাদের যাতায়াতের পথকে রক্ষা করিবে। ইহারা না থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে আমাদের নিকট দ্রব্যাদি প্রেরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িত!

যাহাহউক আমরা রালাং ত্যাগ করিবার প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে আমরা দেখিলাম যে, পর্ব্বতের উপর বহুতর তিব্বতীয় সৈন্য আমাদিগকে বাধা দিবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের এই অবস্থা দর্শনে আমরা বিলক্ষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। রায় মহাশয় একেবারে হাপ ছাড়িয়া দিলেন। কর্ত্তাদের পরামর্শে আমরা ঐ স্থানে গতি স্থগিত করিলাম। ৩০০ গুর্খা সৈন্য তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতের উপর প্রেরিত হইল। কিন্তু তিব্বতীয়েরা যুদ্ধ করিল না। তাহারা পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানে সরিয়া গেল। তখন আমাদের সৈন্যেরা ফিরিয়া আসিল।

পরদিবস আমরা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিলাম। আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা ক্রমে ১৬, ৬০০ ফুট উচ্চে উপস্থিত হইলাম। তিব্বতীয় দিগের কোনও চিহ্ন দেখিলাম না। এত উচ্চে আসিলাম বটে, কিন্তু পথে বরফের বিশেষ কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হইল না। তাহার কারণ এই যে, এখন জুলাই মাস। তবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন, যে আমরা বেশ আরাম উপভোগ করিতে ছিলাম। শীত এত প্রবল ছিল যে, অশ্বারোহী দিগকে বাধ্য হইয়া পদব্রজে গমন করিতে হইতেছিল।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা এক উপযুক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করিলাম। আহারাদির পর ৫০০ গুর্খা সৈন্য তিব্বতীয় দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। উহারা তখন প্রাপ ২০, ০০০ফুট উচ্চ এক স্থানে অবস্থান করিতে ছিল। গুর্খারা যে পর্ব্বতারোহণে কি প্রকার পটু, তাহার আজ চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলাম। তাহাদের সেই দীর্ঘ বুট, নিকার ও বন্দুক সমেত ছাগলের মত সেই বন্ধুর, পথহীন বরফ মণ্ডিত পর্ব্বতের উপর অতি ক্ষিপ্র ভাবে আরোহণ করিতে লাগিল। এক এক স্থানে পর্ব্বত এমন সরল ভাবে উঠিয়াছে যে, আমরা সেখানে বিশেষ সন্তর্পণের সহিতও গমন করিতে সাহসী হইতাম না। উহারা কিন্তু অনায়াসে সে সকল স্থান অতিক্রম করিয়াগেল। উহারা কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতে তিব্বতীয়েরা উহাদের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল। গুর্খারা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর ও বৃক্ষাদির আড়ালে আড়ালে গমন করিতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত তাহারা কিন্তু বন্দুক ব্যবহার করে নাই। যখন তাহারা বুঝিল যে, তাহারা উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা বন্দুক ধরিল। তাহাদের অব্যর্থ সন্ধানের ফলে তিব্বতীয়েরা দলে দলে মরিতে লাগিল। শেষে আর টিকিতে না পারিয়া চারিদিকে পলায়ণ করিতে লাগিল। গুর্খারা উহাদিগের অনুসরণ করিতে ছিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার আদেশ পাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই যুদ্ধ আমাদের সম্মুখেই হইয়াছিল। দূরবীণের সাহায্যে আমরা সমস্ত যুদ্ধ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।

পর দিবস আমরা পর্ব্বতের অপরদিকে অবতরণ করিয়া বেলা তিনটার সময় 'টি শি' দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার কিয়দ্দূরে 'ইয়ামডক্' হ্রদ। দুর্গের মধ্যে কয়েকজন কর্ম্মচারী ও সাধারণ ভৃত্যাদি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ইঁহারা আমাদিগকে লাসা যাইতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন লাসা আমাদের সর্ব্ব প্রধান তীর্থস্থান। সেখানে রাজনৈতিক কোনও কথা হইতে পারে না। বিশেষতঃ সেখানে বিদেশী ও ভিন্ন ধর্ম্মীর প্রবেশ নিষেধ।" ইয়ংহজ্‌ব্যাণ্ড বলিলেন, "দলাই-লামা তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তা, তিনি যখন

কোনও মতে আমাদের সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না এবং তিনি যখন লাসায় অবস্থান করেন, তখন আমরা তথায় যাইতে বাধ্য। আর আমি জানি, লাসায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান সওদাগর বাস করে। এক্ষেত্রে আমরা তবে কেন তথায় যাইতে পারিব না?"

ইহার পর আমরা ঐ দুর্গ অধিকার করিলাম। উহার মধ্যে আমরা যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলাম।

রালং গিরিসঙ্কট।

পরদিবস ২১শে জুলাই আমরা পুনরায় অগ্রসর হইলাম। এবার আমাদের পথ ইয়াম্‌ড্রক্ হ্রদের ধার দিয়া। চারি দিবস পর্য্যন্ত আমরা ঐ বিশাল হ্রদের পশ্চিম তীর ধরিয়া গমন করিলাম। মানচিত্রে এইহ্রদ টর্ কোয়স্ নামে পরিচিত। ইহার চারি দিককার ঘের ১৫০মাইলের উপর। সহসা দেখিলে সমুদ্র বলিয়া মনে হয়। ইহার তিন দিকে সুউচ্চ পর্ব্বতমালা। মধ্য স্থলে একটী পার্ব্বত্য দ্বীপ। এই দ্বীপের দৈর্ঘ প্রায় ২৫ মাইল। শুনিলাম হ্রদটা ক্রমে ২ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ইহার জল ঈষৎ লবণাক্ত।

পঞ্চম দিবসে আমরা 'পাশ্‌টি' দুর্গে উপস্থিত হইলাম। দুর্গে জন মানব ছিল না। নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় শুনিলাম, লাসার পথে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত তিব্বতীয় সৈন্যের কোনও অস্তিত্ব নাই। গ্রামের মধ্যে বৃদ্ধ ও বালক ভিন্ন অপর কোনও পুরুষ মানুষ দেখিলাম না। উহারা হয় ভয়ে পলাইয়াছে, নতুবা যুদ্ধ করিবার জন্য কোনও স্থানে একত্র হইতেছে।

পর দিবস আমরা 'খম্বা' গিরিসঙ্কট পথে উপস্থিত হইলাম। ইহা ইয়াম্‌ড্রক্ হ্রদের ঠিক তীরের উপর অবস্থিত। পর দিবস আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। ঐ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করা হইল। সে দিনে রাত্রি জোৎস্নাময়ী। আমি ও দুইজন সাহেব একখানা ক্ষুদ্র নৌকা সংগ্রহ করিয়া হ্রদ ভ্রমণে বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর গমনের পর আমরা এক পর্ব্বতময় দ্বীপ দেখিলাম। উহার উপর অবতরণ করিবার অভিপ্রায়ে আমরা ঐ দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা নামিবার উপযুক্ত পথ পাইলাম না। অগত্যা ফিরিয়া আসিতে হইল।

ইহার পরদিন বেলা নয়টার সময় আমরা প্রসিদ্ধ 'সাংপো' নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। পাঠক জানেন, এই সাংপোই আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ। এই সময় বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা নদের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু নদ আমাদের অনেক নীচে প্রবাহিত হইতেছিল। 'খম্বা' গিরিসঙ্কট প্রায় ১৬০০০ ফুট উচ্চ। আমরা সঙ্কটের প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম। সাংপো এই গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া অতি ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। আমরা যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেখান হইতে প্রায় ৮০০ ফুট নীচে এক অতি দুর্গম স্থান ভেদ করিয়া বহিতেছিল। প্রবাহের শব্দ আমরা খুব স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। ভাবিলাম, নীচে নামিয়া একবার নদীর জল স্পর্শ করিয়া আসি। কিন্তু পথ এমন দুর্গম যে, নদীর নিকট উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এমন কি গুর্খারা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না।

আমরা দুই দিন পর্য্যন্ত সাংপোর তীরে ২ গমন করিলাম। তৃতীয় দিবসে আমরা নদী পার হইলাম। তিব্বতীয়দিগের বড় ২ টানা নৌকায় আমরা সমস্ত দিন সৈন্য ও অপরাপর দ্রব্যাদি অপর পারে লইয়াগেলাম। ঐ দিন আমাদের মধ্যে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা উপস্থিত

হইল। একখানা ক্ষুদ্র বোটে মেজর ব্রেদর্‌টন্ (Major Bretherton), দুইজন গুর্খা ও দুইজন হিন্দু কুলী পরপারে যাইতেছিলেন। সহসা বোটখানা একটা ঘূর্ণী জলের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে উহা উল্‌টাইয়া গেল, এবং কোনও সাহায্য পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সকলে নদীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মেজর সাহেব আমাদের কমিসেরিএটের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

খচ্চর ও ঘোড়াদিগকে পরপারে লইয়া যাইতে আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে আমরা কয়েকটা খচ্চরকে জলের মধ্যে ছাড়িয়াদিলাম। উহার মধ্যে তিনটা ডুবিয়া গেল, অপর গুলা কোনও রকমে অপর পারে উপস্থিত হইল। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত বোটের উপর চক্ষুবন্ধ করিয়া উহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। পর দিবস আমরা লাসা উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম। কিয়দ্দূরে একটি দুর্গ দেখিতে পাইলাম। ইহার মধ্যে কেহই ছিল না। কয়েক মাইল দূরে আমরা 'লাসা' বা 'কই' নদী দেখিতে পাইলাম। ইহা সাংপোর এক শাখা নদী। ইহার তীরে 'চুকুল' একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ বিস্মিত হইলাম। আমরা যতই লাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, প্রাকৃতিক দৃশ্য ততই যেন অপ্রীতিকর হইতেলাগিল। চারিদিকে পীতবর্ণের ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত, বালুকাময় ময়দান, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের উপলখণ্ডের স্তূপ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দেখিলাম না। বৃক্ষ লতার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। দেশের রাজধানীর পথ যে এমন ভীষণ হইতে পারে. তাহা আমার ধারণা ছিল না। আমার বোধ হয়, প্রাচীন তিব্বতীয়েরা রাজধানীকে দুর্গম করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রকার স্থানে লাসা নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত হইতে যাহাতে সহজে কেহ রাজধানীতে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহার জন্য উহারা এই দুর্গম পথকে সুগম করিবার চেষ্টা করেন নাই। লাসাকে ইংরাজেরা Forbiddencity (নিষিদ্ধ নগর) নামে অভিহিত করেন।

১লা আগষ্ট হইতে কিন্তু প্রকৃতির সে দীন ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রুক্ষ শ্রীহীন পর্ব্বত এবং প্রস্তরখণ্ড সকল ক্রমে ২ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইল। পুনরায় কই নদী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। উহার উভয় তীরে শস্যপূর্ণ ময়দান সকল দেখিয়া অনেক দিন পরে জননী বঙ্গভূমিকে মনেপরিল। বেলা এগারটার সময় আমরা গম গ্রামে প্রবেশকরিলাম। গ্রামখানি বৃহৎ, কিন্তু গ্রামের মধ্যে কয়েকজন বৃদ্ধ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিলাম না। দূরে কয়েকটা মঠ দেখিলাম। ইহাদের অধিবাসী লামারা কিন্তু কেহই পলায়ন করে নাই। একটা মঠের মধ্যে ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অতীশের সমাধি স্থান আছে। ইনি একজন তৎসাময়িক দিগ্বিজয়ী বৌদ্ধধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিব্বতে লামাদিগের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে শুনিয়া ইনি জন্ম ভূমি ত্যাগ করিয়া এই দেশে উপস্থিত হয়েন ও চারিদিকে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মূর্ত্তি পূজা, ভূত প্রেত পূজা ও অন্যান্য ব্যাপারের প্রতি ইনি সম্পূর্ণ খড়্গ হস্ত ছিলেন। ইনি ঐ সকলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। লামাদিগকেও ছাড়িলেন না। তাঁহারা যে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রকৃত ধর্ম্মকে গোপন করিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের নামে এক জঘন্য অপধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ইহা তিনি সর্ব্বত্র মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন। সে সময় এদেশে লামাদিগের অখণ্ড প্রতাপ ; তাঁহারা এই নবাগতের এই প্রকার মত প্রচারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অতিশ তখন এ দেশের চারিদিকে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সহস্র ২ লোকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শেষে এমন হইল যে, অধিকাংশ লামা পর্য্যন্ত তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। পূর্ব্বতম লামারা লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন ; এইজন্য অতীশ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, তাঁহার শিষ্যদিগকে পীতবর্ণের পোষাক ব্যবহার করিতে হইবে। এক্ষণে এই পীতবর্ণ পরিচ্ছদ ধারীরাই তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তিধারী। ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে অতীশের এই স্থানে দেহান্ত হয়। আজকাল তিব্বতের

অনেকে অতীশকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করে। তিব্বতের ধর্ম্মজগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতের অধিবাসীরা চিরদিন এদেশকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়াছেন। ভারত তিব্বতের অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মগুরু; কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল তিব্বতের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। এ দেশের ধর্ম্মজগতের যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা সেই লামারা প্রায়ই নিরক্ষর, এবং বহুবিধ অদ্ভুত ও ভীষণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দৃশ্যত ইঁহারা সকলেই সংসার ত্যাগী এবং সর্ব্বপ্রকার বাসনা বর্জ্জিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রায় সকলেই ঘোর বিষয়ী। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকাতে ইঁহারা যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন; ইঁহাদের অত্যাচারে জনসাধারণ অতি শোচনীয় ভাবে বাস করেন।

আমরা যখন লাসার ৫ মাইল দূরে উপস্থিত হইলাম। তখন ঐ স্থান হইতে কয়েকজন উচ্চ কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন দলাইলামার মন্ত্রী সভার সভ্য। প্রথমেই ইঁহারা আমাদিগকে লাসা প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে আর যুদ্ধাদি না হয়, তাহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক্ষণ বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, এক্ষণে আমাদের সৈন্যেরা লাসায় প্রবেশ করিবে না। কর্ম্মচারীরা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরস্ত্র অবস্থায় লাসায় প্রবেশ করিবেন। যাহাতে আমরা আবশ্যক দ্রব্যাদি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য লাসার কয়েকজন দোকানদার আমাদের সৈন্যাবাসে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবে।

তাহার পর আমরা সেই স্থানেই শিবির স্থাপিত করিলাম। পরদিবস (৩রা আগষ্ট) আমরা লাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই লাসা-সহর। ইহারই জন্য আজ প্রায় শত ২ বৎসর হইতে ভিন্ন ২ জাতির শত ২ ভ্রমণকারী প্রাণান্ত পণ করিয়া আসিতেছেন। ইহার বিষয়ে ভিন্ন ২ জাতি ভিন্ন২ প্রকার অত্যদ্ভুত কাহিনী সকল জনসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সেই লাসা আজ সত্যসত্যই আমাদের সম্মুখে। কি জানি ইহার মধ্যে কি আছে! না জানি আজ আমরা কি এক বিস্ময় কর ব্যাপার দর্শনে একবারে স্তম্ভিত হইব!

তিব্বতের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ।

লাসার চারিদিককার দৃশ্য বিশেষ মনোমুগ্ধকর। চতুর্দ্দিকে সাগর প্রবাহের মত পার্ব্বত্যভূমি ধীরে ২ মস্তক উন্নত করিয়া দূর পর্ব্বত সকলে যাইয়া মিশিয়াগিয়াছে। নিজ সহরটি এক সমতল অধিত্যকার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। হিমালয়ের সুদৃঢ় প্রাচীর সকল সহর হইতে দূরে দাঁড়াইয়া যেন অবাক্ নয়নে এই গুপ্ত সহরের পানে চাহিয়া আছে। সহরের চারিদিকে নানা প্রকারের সবুজ বর্ণের ময়দান ও উদ্যান সকল সহরের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে—বাদাম, পেস্তা, অগুণ, দাড়িম, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি সুপক্ক ফলের ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সহরটি কই নদীর ঠিক তীরে অবস্থিত। ইহা সহরের দক্ষিণ দিক্ ধৌত করিয়া

সাংপোর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য নাচিয়া ২ চলিয়া গিয়াছে। নদীর দক্ষিণ দিকে লাসার প্রাচীণ দুর্গ। এক্ষণে ইহা পরিত্যক্ত। এখন সহরের প্রধান দুর্গ সহরের মধ্যে অবস্থিত। পুরাতন দুর্গের অনেক স্থান ভুমিসাৎ হইয়াছে। দুর্গের পাশে চেরীগ্রাম। সহরের কসাইখানা এই গ্রামে অবস্থিত। লাসা বৌদ্ধ রাজধানী বলিয়া কসাইখানা সহরের বাহিরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই স্থানে প্রত্যহ প্রায় ৫০০।৬০০ মেষ ও তিব্বতীয় ইয়ক্ (সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছাদিত এক প্রকার গোজাতি বিশেষ) হত্যা করা হয়। লামা মহাশয় দিগের চিরদিন অরুচি—মাংস না হইলে তাঁহারা এক গ্রাস ভাত খাইতে পারেন না। জীবহত্যা করা ইহাঁদের নিকট মহাপাপ। কিন্তু অপরে হত্যা করিলে আহারে কোনও বাধা নাই। চীন এবং ব্রহ্মদেশেও এই চমৎকার উপায়ে ভগবান বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ-নীতি 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' প্রতিপালিত হইয়াথাকে! এই কসাইখানার কিয়দ্দূরে ড্যাং পং মঠ। ইহা এক নাতি উচ্চ পর্ব্বত মূলে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে নাকি ইহাই সর্ব্ববৃহৎ মঠ। ইহার মধ্যে প্রায় ১০, ০০০ লামা বাস করেন। ইহা হইতে ইহার আকার অনেকটা অনুমিত হইতে পারে।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

কীটভুক তরু।

মক্ষিকা ভুক উদ্ভিদ বা মাছি ধরা গাছ।

১। পিঙ্গিকিউলা—ইহাদের জন্মস্থান ইউরোপ। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির বিশেষতঃ মাছির মাংস ভোজন করিয়া, স্বীয় দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। নিম্নে কয়েক প্রকার মক্ষিকাভুক উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহারা ভিনাসের মাছিধরা গাছ (venus' fly trap plant) নামে পরিচিত, যে স্থান সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, সেইরূপ স্যেঁৎসেতে ভূমিতেই মাছি ধরা গাছ জন্মিয়া থাকে। এই গাছের পাতার পিঠের শির দাঁড়ার (মেরু দণ্ডের) দুই দিকের দুই ডাল একদিগে বাঁকিয়া, উভয় প্রান্ত একত্র সম্মিলিত হইতে পারে ; কিন্তু তন্মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকে। পত্রের উভয় প্রান্ত সম্মিলিত হইলে, তাহা একটী ফাদের অনুরূপ হয়। বস্তুতঃ ইহাকে মাছিধরা ফাঁদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাছিধরা গাছের পত্রের উভয় প্রান্ত সকল সময়েই যে সম্মিলিত থাকে, তাহা নহে ; পত্র গুলি অন্যান্য বৃক্ষ পত্রের ন্যায় অকুঞ্চিত ভাবেই রহে ; প্রত্যেকটী পত্রের উপর দুই প্রস্থ শিরা থাকে ; এই শিরা গুলির স্পর্শ শক্তি অতিশয় তীব্র। ফলে, পত্রের উপর কোনরূপ কীট পতঙ্গ অথবা মাছি বসিবামাত্রই, শিরাগুলি উদ্দীপিত হয় ; এবং তৎক্ষণাৎ পত্রের উভয় প্রান্ত নিঃসহায় জীবকে ভিতরে রাখিয়াই বুজিয়া যায়। পত্র-ফাঁদে আবদ্ধ জীব অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পত্র গর্ভে জীর্ণ হইয়া যায়। মূল বিভাগ ও বীজ দ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যে কতরূপ যে আশ্চর্য্য উদ্ভিদ রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়? এই জাতি মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী জাতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

(ক) পিঙ্গিকিউলা গ্রেণ্ডিফ্লোরা—Pinquicula Grandiflora Irish beetlewort.

(খ) ঐ এলপাইনিয়া—do Alpinia.

(গ) ঐ কাওডেটা—do Cowdata.

(ঘ) ঐ ভালগেরিস্—do Vulgaris.

(ঙ) ঐ লিউসিটেনিকা—do Lusitanica.

২। ডাইওনিয়া।--Dionaea N. o. Dionaceae

ইহারাও একরূপ মাছিধরা গাছ। ইহাদের স্বভাবও উপর্য্যুক্ত জাতির ন্যায় অর্থাৎ ইহারাও পত্র-সাহায্যে কীটপতঙ্গ অথবা মাছি ধরিয়া খায়। কিন্তু এই জাতির পত্রের গঠন স্বতন্ত্ররূপ। ইহাদের পত্রের উভয় পার্শ্ব করাতের দাঁতের মত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁত কাটা ; দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ফাঁপা এই ফাঁপা স্থানে মধু থাকে। মধুর লোভে আকৃষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গাদি পত্রের উপর উপবিষ্ট হইবামাত্রই পত্রের উভয় পার্শ্বস্থ দাঁতগুলি পরস্পর সম্মিলিত হইয়াযায়। ইন্দুর-মারা কেচিকলের

উপর ইন্দুর ছাড়িলে তাহার যে দশা হয়, মাছিধরা পত্রের ফাঁদে পড়িয়াও কীট পতঙ্গাদি সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাছিধরা গাছের পত্রগুলি যখন মেলিয়া যায়, তখন তাহা ঠিক ইন্দুর থাকিবার বিস্তৃত কেচি কল বা ফাঁদেরই অনুরূপ দেখায়। মধু লোভে আকৃষ্ট কীট-পতঙ্গাদি পত্র-ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া, পত্রোদরেই জীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষুদ্র জীবের মাংস ভক্ষণ করিয়াই, মাছি ধরা গাছ স্বীয় দেহেরপুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। মাছিধরা গাছের পত্র-ফাঁদের মধ্যে তিন গাছি সূত্রবৎ লোম আছে; কীটাদির স্পর্শ মাত্রই তাহা উদ্দীপিত হয়। ফলে, ফাঁদটীও বুজিয়া যায়। ফাঁদে আবদ্ধ জীব জীর্ণ হইয়া গেলেই পত্রটী বিস্তৃত হইয়া যায়; অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বীজ হইতেই এই জাতিরও বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহাদেরও নানা জাতি আছে। তন্মধ্যে ডাইওনিয়া মিউ-সিপিউলা (Dionaea Muscipula) জাতিই সুন্দর। ইহার ফুলও সুন্দর। নিম্নে এই জাতির চিত্র প্রদত্ত হইল।

ডাইওনিয়া মিউসিপিউলা।

সূর্য্য শিশির গাছ Drocera

N. O. Droceracea.

সূর্য্য শিশির গাছও কীটভুক-তরুর ন্যায় উদ্ভিদ-জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ। ইহাকে একরূপ রসাল কাণ্ডক উদ্ভিদ বলাযায়। সূর্য্য শিশির গাছের পাতার কোন কোন স্থান গুটীর মত স্ফীত হয়। এই সকল গুটী বা স্ফীত স্থান একরূপ রসে স্ফীত থাকে। শিশিরের উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে, তাহা যেমন চাক-চিক্য বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সূর্য্য-শিশির গাছের পত্রস্থ গুটীর রসে সূর্য্যরশ্মি পাত হইলেও, তাহা দীপ্তিমান হইয়া থাকে। শিশির ও পত্রের গুটীর রসের বর্ণ প্রায় একরূপ; সুতরাং সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে উভয়েরই উজ্জলতা সমভাবে বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্য ও শিশিরের সম্মিলন কার্য্য উক্ত বৃক্ষ-পত্রে উপলব্ধি করিতে পারা যায় বলিয়াই উদ্ভিদ-বেত্তা গণ এই গাছের নাম সূর্য্য-শিশর (Sun dew plant) রাখিয়াছেন। ইউরোপের নানাস্থানেই বহু বিভিন্ন জাতীয় সূর্য্য-শিশির গাছ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে কোনও কোনও জাতি কীটভুক। ভারত বর্ষের দাক্ষিণাত্য-প্রদেশেও এক জাতীয় সূর্য্য-শিশির গাছ আছে। সাধারণতঃ আর্দ্র ভূমিতেই এই গাছ জন্মে। এবং জলা ভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহাদের বাসস্থল। যে স্থান সর্ব্বদা সিক্ত থাকে, সেইরূপ সেৎসেতে স্থানই সূর্য্য-শিশির গাছের চাষের পক্ষে উপযোগী। এ দেশেও এই বিস্ময় জনক উদ্ভিদের চাষ হইতে পারে; কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের চাষ সুবিধা জনক হয় না।

যে ভূমিতে বৎসরের কতকাংশ সময় জল দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ বদ্ধজলময় স্থানের মৃত্তিকাই, সূর্য্য-শিশির গাছের চাষের পক্ষে উপযোগী। উক্তরূপ জলময়স্থানের মৃত্তিকায় নানারূপ পার্থিব-পদার্থ পচিয়া গিয়া, ঐ মৃত্তিকাকে পচা মৃত্তিকায় পরিণত করে। এইরূপ মৃত্তিকাই এই জাতীয় গাছের চাষ পক্ষে প্রশস্ত বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হয়। পাঠক গণের কৌতুহল নিবারণের জন্য নিম্নে দুইটী প্রধান জাতীয় সূর্য্য-শিশির গাছের বিবরণ বিবৃত হইল।

১। ড্রসেরা রৌটাণ্ডিফলিয়া Drocera Routandifolia বা কীটভুক সূর্য্য-শিশির গাছ। ইহার জন্মস্থান ইউরোপ। ইউরোপের নানাস্থানে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, এই গাছ স্বতঃই জন্মিয়া থাকে; এবং নালা অথবা অন্য কোনরূপ জল নির্গমন-পথের ধারে কখনও কখনও

ইহার গাছ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ইউরোপে বহু বিভিন্ন জাতীয় সূর্য্য-শিশির গাছ আছে; তন্মধ্যে এই জাতীই উৎকৃষ্ট। এই গাছের লোমযুক্ত গোলাকার পাতাগুলি আঠাবৎ একরূপ তরল পদার্থে আবৃত থাকে। পাতার কোনও কোনও স্থান গুটীর মত স্ফীত হয়। এই সকল স্ফীত স্থান রস পূর্ণ; এবং তাহাতে সূর্য্য রশ্মি পতিত হইলেই, উহা শিশিরের ন্যায় শোভমান হইয়া থাকে। পাতার এই উজ্জ্বলতা সন্দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া, তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি বসিলে, পত্রলোমে তাহাদিগকে এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরে যে, উহারা আর তিল-পরিমাণ স্থান ও কোন দিকে নড়িতে সক্ষম হয় না। কীট পতঙ্গাদি লোমে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেই, পত্র হইতে রস নির্গত হইতে থাকে; এবং আবদ্ধ—জীবকে রসমগ্ন করিয়া, জীর্ণ করিয়া ফেলে। কীটভুক সূর্য্য-শিশির গাছের পাতা ও রোমের স্পর্শ শক্তি এত প্রবল যে, মক্ষিকাদি পাতার উপরে বসিবা মাত্রই, তাহাকে ধরিবার জন্য পত্র ও লোমের ঈষৎ স্পন্দন উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই গাছের পাতার উপরে কোনরূপ ধাতব বা তদ্রূপ কঠিন পদার্থ রাখিলে, পত্রস্থ লোমে তাহা জড়াইয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দেয়। পদার্থটী সজীব কি নির্জীব, তাহা স্পর্শমাত্রই উহারা বুঝিতে পারে। এই জন্যই পত্রে নির্জীব পদার্থ পড়িলে, রোমের বন্ধন বিশেষ রূপে শ্লথ হইয়া পড়ে, এবং তদবস্থায় পত্রের রস ও নির্গত হয় না। উদ্ভিদ ও প্রাণী তত্ত্ববিদ ডারুইন সাহেবের লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, একটী গমের দানার ১/১৮১১ ওজন বিশিষ্ট একটী প্রাণী ও যদি কীটভুক সূর্য্য-শিশির গাছের পাতার উপরে বসে, তাহা হইলেও, উহার পত্র ও পত্রস্থ লোমগুলি, উদ্দীপিত হইয়া নড়িতে থাকে, কিন্তু তদুপরি বৃষ্টির শতধারা পতিত হইলেও উহার চৈতন্য সম্পাদিত হয় না। ভগবানের কি অপূর্ব্বলীলা!

২। ড্রসেরা বার্মেণী Drocera Burmanii বা ভারতবর্ষীয় সূর্য্য শিশির (Indian Sund.w) গাছ ইহার জন্ম স্থান দাক্ষিণাত্য। এই গাছ আর্দ্র স্থানে জন্মে। এই জাতীয় সূর্য্য-শিশির গাছের ফুল গোলাপী বর্ণের, এবং তাহা লম্বা শীষের অগ্রভাগে প্রস্ফুটিত হয়। প্রথমোক্ত জাতির সহিত এই জাতীয় গাছের আকৃতিগত সাদৃশ্য রহিলেও, ইহারা তদ্রূপ স্বভাবাপন্ন নহে।

৩। ড্রসেরা ক্যাপেন্‌সিস (Drocera Capensis) ইহার জন্ম স্থান ইউরোপ। ইহা প্রায় সর্ব্বাংশেই প্রথমোক্ত জাতির অনুরূপ স্বভাবাপন্ন। কিন্তু ইহার মূল হইতে পত্র সকল বহির্গত হইয়াই চারিদিকে ঝুলিয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা ইহাকে বিলম্বিত পত্রক সূর্য্য শিশির গাছ" এই নামেই অভিহিত করিব। এই জাতির পাতার কিনারা ঘন লোমে আচ্ছাদিত থাকে। ইহা এই লোমের সাহায্যেই কীট পতঙ্গাদি ধৃত করিয়া থাকে। ইহার পত্রের মধ্যস্থল রস পূর্ণ থাকে। এবং তাহাতে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইলেই উহা চক্‌চক্‌ করে। পত্রের চাকচিক্য সন্দর্শন করিয়া তদুপরি কীট পতঙ্গাদি উপবিষ্ট হইবা মাত্রই তৎপার্শ্বস্থ লোমে উহা বিজড়িত হইয়া পড়ে, এবং দুই এক ঘণ্টা মধ্যেই পত্র গর্ভে জীর্ণ হইয়া যায়।

বিলম্বিত-পত্রক-সূর্য্যশিশির গাছের পত্রই উহার মুখ এবং পত্রই উহার পাকস্থলী। এই সকল কীটভুক উদ্ভিদের বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করিলেও বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়; এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহারা বিশ্বনিয়ন্তার রচনা চাতুর্য্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ নয় কি?

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

প্রমাণ না বিশ্বাস।

মানব জীবনে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রথম উন্মেষ হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুইটী মতের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মতানুসারে অন্যান্য জাগতিক সত্যের ন্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ সাপেক্ষ। শুধু বিশ্বাসের বলে এবং ধর্ম্মগ্রন্থের অনুমোদনের জন্যই যে মানিয়া লইব ঈশ্বর আছেন, তাহা নয়। যে পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব নিরূপণ না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে অন্ধ বিশ্বাসের প্রহেলিকায় ডুবিয়া থাকিতে

হইবে। জগতে যাহা অন্ধ, যাহা পুরাতন এবং যাহা পরিত্যক্ত তাহাই জ্ঞান বুদ্ধি অননুমোদিত বিশ্বাস। সেই জন্য এতদ্‌পক্ষীয়েরা বলেন যে শুধু বিশ্বাস হইলেই চলিবে না, প্রমাণেরও নিতান্ত প্রয়োজন। আর প্রমাণ যে নাই তাহাও নয়।

অপর পক্ষ আবার ভক্তির প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাণিত। ঈশ্বর প্রমাণ তাহাদিগের নিকট বাতুলতা মাত্র—অহঙ্কারীর গর্ব্বোক্তি নাস্তিকতার দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান সত্য, সুন্দর ও আনন্দ, তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশেই অনুভব করিতে পারি। বাহিরে লোক সমক্ষে বাক্য দ্বারা সে অনুভূতি, সে বিরাট স্বরূপের অভিব্যক্তি প্রমাণ করা দূরে থাকুক, প্রকাশ করাই অসম্ভব।

বর্ত্তমান সময়ে ভাবের বন্যা, ভক্তির উচ্ছ্বাস অনেক কমিয়া আসিয়াছে। জ্ঞান বুদ্ধির যুক্তি দ্বারা পরিশোধিত না করিয়া জাগতিক ঘটনা ও পদার্থ নিচয়ের কোন কিছুই আমরা গ্রহণ করি না। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র এবং যাহা কিছু ভক্তি করার উপযুক্ত তদ্‌সমুদয়ই জ্ঞান দ্বারা সম্যকরূপে বুঝিয়া লই এবং দেখি, বাস্তবিক তাহারা সৌন্দর্য্য ভূষিত, পবিত্রতা মণ্ডিত, ভক্তির আধার কি না। যাহা ভক্তিবাদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত তাহাও জ্ঞানবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুবা ভক্তি অভক্তির আবাস স্থল হইয়া দাড়াইবে। ইহাই বর্ত্তমান সময়ের উক্তি।

আমাদের ভারতবর্ষে বাঙ্গালী জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, আমাদের সমাজের পনরো আনা অংশ ভক্তি লইয়া ব্যস্ত। দেউল প্রাঙ্গণে আরতি দর্শনে সমবেত বঙ্গ নরনারীর বদন মণ্ডল দর্শন করিলে কে না মনে করিবে, সেখান হইতে এক বিরাট ভক্তি স্রোত ভগবানের চরণপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। চৈতন্যের ভক্তি প্লাবনে যে বাঙ্গালা ডুবু ডুবু, সে বাঙ্গালায় জ্ঞানবাদ প্রচার করা যে কত কঠিন, তাহা ভগবানই জানেন। তাই বলিয়া কি জ্ঞানের উপাসনা ছাড়িয়া দিব। গীতায় যে জ্ঞান যোগ উল্লেখিত হইয়াছে তাহা কি শুধু ভ্রান্তি মূলক?

মনোবিজ্ঞানের (Psychology) দিক হইতে দেখিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ঈশ্বর জ্ঞানই সকল প্রকার শাস্ত্র জ্ঞান সমূহকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক বিরাট জ্ঞানের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। এই ভগবদ্‌ জ্ঞান না থাকিলে সমস্ত পার্থিব জ্ঞানই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। ঠিক জ্ঞান শব্দটী তখন তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতনা।

ভক্তিবাদই যাহাদের ধর্ম্ম তাহারাও ভগবদ্‌জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করেন। জ্ঞানের বিরুদ্ধে ভক্তির সমস্ত কথা সমর্থন করিবার নিমিত্ত ভক্তিবাদীরা গভীর বিশ্বাসের নূতন নামকরণ করিয়াছেন, উচ্চতর জ্ঞান (Higher reason)। গোলাপকে যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহার সুগন্ধ ও নয়নারাম সৌন্দর্য্য থাকিয়াই যায়, একটুও বিনষ্ট হয় না। কাণাকে পদ্মলোচন বলিলেও তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে না। তেমনি ভক্তি বিশ্বাসকে যে নামেই পরিবর্ত্তিত কর না কেন, তাহা যা' ছিল তা' রহিয়াই যাইবে। নাম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরূপ বদলাইবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই ঘোরতর সন্দেহ।

এই জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঈশ্বর প্রমাণ ভক্তিবাদের মত তত সহজ বলিয়া বোধ হয় না। যে প্রমাণ প্রণালী অবলম্বনে আমরা জাগতিক সত্য নিরূপণ করি, তাহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। যে প্রমাণ বলে আমরা সার্ব্বজনীন বাক্যে (universal proposition) হইতে কোনও ক্ষুদ্রতর বাক্যে (particular proposition) উপনীত হই, সে প্রমাণের ইংরাজী নাম Deductive inference (অবরোহণ প্রমাণ প্রণালী); আর যে প্রমাণ দ্বারা আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য হইতে কোনও সার্ব্বজনীন বাক্যে চলিয়া যাই, তাহার ইংরাজী নাম Inductive Inference (অধিরোহণ প্রমাণ প্রণালী)। ভারতবর্ষীয় ন্যায়ে এই দুই রকম প্রমাণ একত্র করিয়া যে যুক্তি পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার নাম অনুমান।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই উভয়বিধ কোন প্রমাণ দ্বারাই ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কারণ Deductive প্রমাণে আমরা বড় হইতে ছোটতে চলিয়া যাই; আর এমন কোনও জিনিষ আমরা কল্পনা

করিতে পারি না যাহা ভগবান অপেক্ষা বৃহৎ। আর ইংরাজীতে যাহাকে Inductive প্রমাণ বলে, তাহা দ্বারাও আমরা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না; কারণ এই প্রকার প্রমাণে আমরা ছোট ছোট শান্ত বাক্য অথবা শান্ত বস্তুর ভাষায় প্রকাশিত সম্বন্ধ হইতে একটা সার্ব্বজনীন শান্ত বস্তু অথবা সম্বন্ধে উপনীত হই। শান্ত হইতে আমরা অনন্তে চলিয়া যাইতে পারি না। এই জন্য এবম্বিধ প্রমাণে অনন্ত, অফুরন্ত, আনন্দময় ভগবান পাওয়া যায় না।

তবে কি আমরা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া ভগবানে যাইতে পারিব না! শুধু কি ভক্তি লইয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে! জ্ঞান গরীমা মণ্ডিত তর্কশাস্ত্র কি উন্মাদের কাতরোক্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়! মানবের প্রথম জীবনে যে জ্ঞানদেবীর অর্চ্চনা আরব্ধ হইয়াছিল এবং যাহা বাণীর পুত্রগণ অদ্যাবধি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে, যে অর্চ্চনা যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া সমস্ত জগৎকে উন্নমিত করিবে তাহার মূলে কি কিছুই নাই!

অনেক সময় আমাদের মনে এই সন্দেহ হয়। যে যুগে বিশ্বাসের আধিপত্য পূর্ণ বিরাজিত ছিল, যখন প্রমাণের নাম করিলে প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইত, সেই যুগে খৃষ্টীয় য়্যানছেল্মের (Anselm) মনে কয়েক দিন যাবৎ ভগবান বিশ্বাসের না প্রমাণের বস্তু, এই প্রশ্নটা সদাসর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উপাসনার সময়েও তাঁহার মনে ঐ প্রশ্ন উদিত হইত—ধীর মনসংযোগে উপাসনা আর হইত না। ভক্তির বাঁধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিল। অবশেষে যখন যুক্তি তর্কের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে তিনি আপনার একপ্রমাণ স্থির করিলেন, তখন তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

ইউরোপীয় দর্শনের প্রথম পথপ্রদর্শক ডেকার্ট (Descartes) বৎসরের পর বৎসর কেবল ভাবিয়াছেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ব্রহ্ম, আত্মা ও সত্য জানিবার প্রকৃষ্ট উপায়—প্রমাণ না বিশ্বাস! অনেক অক্লান্ত চিন্তনে যখন তিনি এক প্রমাণে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার জ্ঞানার্চ্চনা সার্থক হইল।

এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের স্বতঃই মনে হয় যে উল্লিখিত দুই প্রকারের প্রমাণ ব্যতীত আরও একটী প্রমাণ আছে, যাহাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। এই প্রমাণের ইংরাজী নাম Hypothetical reasoning যখন প্রাকৃতিক এবং মানসিক ঘটনা নিচয় ও বস্তু সমূহ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের ব্যাখ্যা ও মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টাকরি, তখন প্রথমতঃ আমরা একটা অর্দ্ধ অনুমান এবং অর্দ্ধ যুক্তিজ্ঞান প্রসূত একটী ব্যাখ্যা ধরিয়া লই। এই চলনসই ব্যাখ্যাটীরই ইংরাজী নাম (Hypothesis)—তারপর আমরা দেখি, এই ব্যাখ্যাটী সমস্ত জাগতিক ঘটনা ও বস্তু সমূহের প্রতি প্রযোজ্য কিনা। এই সত্যাসত্য পরীক্ষার ইংরাজী নাম Verification. পরীক্ষায় যদি আমাদের ব্যাখ্যাটী কৃতকার্য্য হয়, তখন তাহাকে খাঁটী সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; তখন আর ইহা চলনসই ধরিয়া লওয়া জিনিস (Hypothesis) নয় তখন ইহা ধ্রুব সত্যে (absolute truth) পরিণত হয়। কিন্তু পরীক্ষায় যদি আমাদের ব্যাখ্যাটী অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন এক ব্যাখ্যা ধরিয়া লওয়া হয়। এই নূতন ব্যাখ্যাটীর সত্যাসত্যও পূর্ব্বের ন্যায় পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইলেই ব্যাখ্যাটীর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান জগতেও এইপ্রকার প্রমাণের প্রভূত প্রচলন দেখা যায়। এই প্রমাণ দ্বারাই আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি। মানসিক ও ভৌতিক বস্তু ও ঘটনা নিচয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ সমূহ এক ভগবান ব্যতীত অপর কিছুদ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না। যে জাগতিক সুচারু শৃঙ্খলা দর্শনে কবির প্রাণ আনন্দ হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত, যে জ্ঞানময়ী চিন্তা মানবকে জগতের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া অপরাপর জীবজন্তু ও পদার্থ নিচয়ের ভাগ্য বিধাতা করিয়া দিয়াছে, তদ্‌সমুদয়ই ভগবান ব্যতিরেকে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। একজন ইংরাজ দার্শনিক ঠিক এই কথাটীই অন্যভাবে বলিয়াছেন—"An Infinite and all perfect God can be dis-

believed in only at the cost of reducing our whole intellectual, moral and natural world to confusion" সুতরাং ভগবান নিশ্চয়ই আছেন। তাহার অস্তিত্বে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তর্কশাস্ত্রের সাধারণ প্রমাণ দুইটীদ্বারা ভগবানকে পাইতেগেলে হতাশ হইবারই খুব সম্ভাবনা। কিন্তু একটু বিশেষ ভাবে তৃতীয় প্রমাণটী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয় মান হয় যে হতাশ হইবার কিছুই নাই। বরং মানবের পক্ষে যতখানি ধ্রুবসত্য পাওয়া সম্ভব, ততখানি ধ্রুব সত্য এই প্রমাণ সাহায্যে আমরা অবলীলা ক্রমে পাইতে পারি। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবাদ অলীকস্বপ্নও নয়, আর মূর্খের প্রলাপ বচনও নয়। যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর তাহা আমরা এই জ্ঞানবাদেই পাইতে পারি। ভক্তিবাদে ভগবানকে আমাদের নিকট সৌন্দর্য্যের অবতার বলিয়া বর্ণনা করে, কিন্তু তাহার শিবত্ব ও সত্যতার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, কেবল এক জ্ঞানবাদ দ্বারাই আমরা ভগবানকে গুণাতীত গুণাধার বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

রামায়ণীযুগের রাজ্য শাসন প্রণালী।

আমরা প্রাচীন ভারতের রাজনীতি চর্চ্চায় ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা সকলি বাক্য মূলক। সামাজিক জনগণের উচ্চ বহ্বাস্ফুট হইতে সেই সমাজের একটা ছায়া-চিত্র কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু সেই চিত্র প্রকৃত কি না, তাহা বলা যায় না। কেননা, কথা এবং কার্য্য এই দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। রাম যে উচ্চ রাজনীতির মূল-সূত্র গুলি একটী একটী করিয়া ভরতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ বটে; কিন্তু তাহা তৎকালীন রাজগণ কর্ত্তৃক সম্যক অনুষ্ঠিত হইত কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। এইবার আমরা তদ্বিষয়েরই আলোচনা করিব।

প্রথমেই রাজা নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। তখন রাজা নির্ব্বাচন বিষয়ে প্রজার মত গৃহীত হইত। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইক্ষাকুবংশে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে, তথাপি দশরথ প্রজা সাধারণের অভিমত গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিলেন। প্রথমে তিনি মন্ত্রী ও অমাত্যগণসহ এই বিষয় আলোচনা করিলেন, অবশেষে রাজ্যস্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নরপতিগণকেও নিমন্ত্রন করিয়া পাঠাইলেন।

যথা সময়ে অভ্যাগত নৃপতিগণ ও জনমণ্ডলীর সম্মুখে রাজা দশরথ আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। রাজা দশরথ সভাস্থ সকল ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আমার এই রাজ্য আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক পুত্রবৎ পালিত হইয়াছে, ইহা আপনারা অবগত আছেন। আমিও আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুষ্ঠিত পথ অবলম্বন করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাশক্তি প্রজাপালন করিয়া আসিয়াছি এবং লোকের হিতানুষ্ঠান করত এই শরীর জীর্ণ করিয়াছি। এখন এই জীর্ণ শরীরের বিশ্রাম প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আমি আর এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে পারি না। এই জন্য—

"সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।
সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্ব্ব অযোধ্যানন্নুমান্য দ্বিজর্ষভান্॥" * ১০

এইরূপ এই সকল সন্নিহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠের অনুমতি ক্রমে পুত্রকে প্রজা হিতে রত করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

দশরথ বলিতে লাগিলেন—"রামকে আমি আগামী কল্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমার

---

* দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝায়। তবে কি শূদ্রের মত গ্রহণীয় ছিল না? এই স্থানে এই প্রশ্নটীর উদয় হইতে পারে। রাজা দশরথ সমাজের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বোধ হয় তখন ব্রাহ্মণগণই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। দ্বিজ-শব্দে এখানে কেবল ব্রাহ্মণও হইতে পারে। রাজা এখানে দ্বিজগণকে সম্বোধন করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি যে পৌর ও জানপদ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন না, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

বিশ্বাস সেই লক্ষ্মী সম্পন্ন রাম আপনাদের অনুরূপ নাথ হইবেন।"

রাজা দশরথ তাহার এই মানসিক ইচ্ছা সম্মিলিত জন মণ্ডলীকে জানাইয়া তাহাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

"আমার এই মন্ত্রণা যদি সাধু হয় এবং আপনাদেরও হিতসাধিনী হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আর এই মন্ত্রণা যদি কেবল আমারই প্রীতিদায়িনী হয়, তবে আমাকে যাহা করিলে সকলের হিত হইবে, আপনারা সেইরূপ কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ করুন। আপনাদিগের পরামর্শ আমি প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু মধ্যস্থেরা নিরপেক্ষভাবে পূর্ব্ব ও পরপক্ষ বিচার পূর্ব্বক প্রকৃত হিত অনুসন্ধান করেন। এইজন্য তাঁহাদের বিচার সমধিক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।"

দশরথ এইরূপ বলিয়া নিরস্ত হইলে সভামধ্য হইতে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল। সমাগত সেই সকল নরপতি ব্রাহ্মণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা, পৌর ও জানপদদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঐক্য মতাবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিলেন এবং মন্ত্রণা শেষে বৃদ্ধ নরপতিকে কহিলেন—"রাজন্, আপনি বহুকাল রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন—অতএব আপনি এখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আমাদেরও তাঁহাকে অভিষিক্ত দেখিতে অভিলাষ হইয়াছে।"

রাজা দশরথ উপস্থিত জনগণের মুখে এইরূপ সহানুভূতি সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন—আমি রামকে অভিষিক্ত করিব ইচ্ছা করিয়াছি বলিয়া হয়তঃ সকলে এই বিষয় চিন্তা না করিয়াই আমার মতের সমর্থন করিয়া অথবা তাহাদের বিরুদ্ধ কথা আমার অপ্রিয় হইবে বলিয়াছে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। যাই হউক এই বিষয় সাধারণের মত আরও পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। তাই রাজা দশরথ পুনরায় সেই সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

শ্রুত্বৈব বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছথ।
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মেতদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ॥ ২৪
কথন্নু ময়ি ধর্ম্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজমহাবলম্॥ ২৫
(অযোধ্যা—২)

"রাজগণ, আপনাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার এই সংশয় জন্মিতেছে যে, বোধহয় আপনারা আমার ইচ্ছানুসারেই রঘুনন্দন রাম কে রাজা করিতে বাসনা করিতেছেন; কেননা আমি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছি, তথাপি কেন আপনারা রামকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে চান—আপনারা ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করুণ।"

তখন সভাসদগণ রামের জনহিত কর গুণাবলীর আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ সকলের মুখেই রামের প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগের মতানুসারে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক ঘোষণা করিয়া দিলেন।

ইহা বাক্য মূলক নহে। পরন্তু কার্য্যমূলক প্রণালী। অই প্রণালীকে আধুনিক Parliamentary প্রণালীর জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। এই প্রণালী অনুসারে আধুনিক সভ্য জাতীয় দিগের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারী রাজারা এই প্রণালী কদাপি অবলম্বন করেন না। আধুনীক সভ্যতানুমোদিত ভোট গ্রহণ প্রথা ও এই প্রথা হইতে ক্রমে-পরিগৃহীত হইয়াছে॥ দ্বৈধ মতের সৃষ্টি হইতেই অধিকাংশের সম্মতির শ্রেষ্ঠতা উদ্ভাবিত হইয়াছে। অবশ্য দশরথের ন্যায় ধর্ম্মভীরু লোক রাজ্যাভিষেকে মতদ্বৈধ উপস্থিত দেখিলে সম্মতি গ্রহণের পক্ষপাতী না হইয়া—তাহার সেই বাসনাই পরিহার করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু রামায়ণের পরবর্ত্তী সমাজেই ভোটের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের কৃষ্ণ অধিকাংশের মতে রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাম-জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীতে মন্ত্রী ও অমাত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বহুবার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। এইবার আমরা সেই সকল ইঙ্গিত ও উক্তি কতদূর কার্য্যে পরিণত ছিল, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কচ্চিদাত্ম সমাঃশূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়া।
কুলীনা শ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ॥ ১৫
(অযোধ্যা—১০০)

এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন, ও ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই মন্ত্রিত্ব পদে নির্ব্বাচন করিতে হইবে এই গুণাবলী যে মন্ত্রীত্বের উপযোগী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এখন দেখা যাউক অযোধ্যায় কিরূপ প্রকৃতি লোকের প্রভাব ছিল।

অযোধ্যার মন্ত্রীগণ ঋষি শ্রেণী হইতে গৃহীত হইতেন। রাজা দশরথের অষ্ট সংখ্যক অমাত্য বা দেশাদি কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য দুইজন ঋত্বিক ও অষ্ট সংখ্যক মন্ত্রী বা ব্যবহার দ্রষ্টা ছিলেন। ইহারা সকলেই ঋষি ছিলেন।

অমাত্য গণের নাম—

ধৃষ্টি র্জয়ন্তো বিজয় সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্র বর্দ্ধনঃ।
(বালকাণ্ড—৭)
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্র শ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ॥ ৩

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল, ও সুমন্ত্র—ইহারা সকলেই মন্ত্রজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, রাজার হিতানুষ্ঠায়ী, যশস্বী; পুত-চরিত্র, এবং নিরন্তর রাজকার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন।

ঋত্বিক্ দ্বয়—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব; ইঁহারা মন্ত্রীর কার্য্যও করিতেন। মন্ত্রী—ইঁহাদিগকে সহ ৮ জন ছিল, যথা বশিষ্ঠ, বামদেব, সুযজ্ঞ, জাবালী, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, ও কাত্যায়ণ। ইঁহাদিগের মধ্যে বশিষ্ঠই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রাচীন ভারতে ইঁহারাই যে রাম কথিত গুণগ্রামের আঁধার ছিলেন, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলিতে পারে। কাহারও চরিত্র সমালোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য না হইলেও মহাকবি ইঁহাদিগের যে গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে আমরা তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"রাজা দশরথের মন্ত্রী ও অমাত্যগণ বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা শ্রীমান, কীর্ত্তিমান, মহাত্মা, ধনুর্ব্বেদবিৎ, সুদৃঢ়, বিক্রমশালী, রাজকার্য্যে অত্যন্ত সাবধান, তেজস্বী, ক্ষমাসম্পন্ন, ও সস্মিত ভাবী ছিলেন। তাঁহারা কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী ছিলেন না বা কোন কারণ বশতঃ মিথ্যা কথা বলিতেন না। শত্রু ও মিত্রের কোন বৃত্তান্ত তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। অপরাধী হইলে পুত্র দিগের প্রতিও তাঁহারা সমুচিত দণ্ড নির্দ্ধারণ করিতেন এবং কোষ পূরণে এবং সৈন্য সংগ্রহে অতিশয় আগ্রহ সম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হিংসা না করিয়া পুরুষের বলাবল সন্দর্শন পূর্ব্বক যথোচিত তীক্ষ্দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক কোষ পরিপূরণ করিতেন।

এইরূপ গুণ রাশির যাহারা আঁধার তাঁহাদিগের দ্বারা রাজ্যের সর্ব্ব বিষয়িণী উন্নতিই সাধিত হইয়া থাকে। অযোধ্যার রাজ্যও ইঁহাদিগের দ্বারা সুরক্ষিত হইত।

কিন্তু এই শাসন একটু পক্ষ পাতিত্ব মূলক নয় কি?

"ব্রহ্মক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোষং সমপূরয়ন্।
সুতীক্ষ্ণ দণ্ডাঃ সম্প্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্॥ আদি—৭।১৩

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হিংসা না করিয়' পুরুষের বলাবল সন্দর্শন করতঃ যথোচিত তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক কোষ পরিপূরণ করিতেন।" এই উক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শাসন বহির্ভূত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকার, সুতরাং সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি হিংসার যোগ্য না হইতে পারেন; কিন্তু ক্ষত্রিয় কি হেতু মুক্তি পাইবার অধিকারী হইলেন? রাজবর্ণ বলিয়া নয় কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বর্ণ বৈষম্য প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং এই বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া চলাই তৎকালে অমাত্যপদ প্রাপ্তির একটী প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

তাহা হইলে ইহাই কি সত্য যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বর্গ তখন রাজকীয় শাসন বহির্ভূত ছিলেন। এই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

রামায়ণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েরই প্রাধান্য দেখা যায়। ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। রামায়ণের ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ রক্ষায় সতত যত্নবান। ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়ের সম্মান রক্ষা ও হিতব্রতে নিরত। এমন অবস্থায় এতদ উভয় শ্রেণীর সমন্বয়ে যে কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি রচিত হইয়াছিল, তাহা যে উভয়কে রক্ষা করিয়া হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাই হউক এই বিষয়ের নিরপেক্ষ বিচার প্রয়োজন।

রামায়ণের ব্রাহ্মণ উচ্চ আদর্শে গঠিত। তিনি কাহারও হিত ব্যতীত অহিত করিতেন না। ব্রাহ্মণ কোন অপরাধ জনক কার্য্যে ভ্রমেও ব্রতী হইতে পারেন এইরূপ তৎকালীন সামাজিক জনগণের মনে ধারণাই হইত না। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্ত যদি এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে তাহা দোষনীয় নহে। বরং ইহা আদর্শকে উচ্চে রাখিবার সৎচেষ্টা। রামায়ণের একস্থলে দশরথ কৈকেয়ীকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—"আমি তোমার অনুরোধে রামকে বনে পাঠাইলে, আর্য্যগণ রথ্যা সমূহে সমবেত হইয়া আমাকে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবেন।" (অযোধ্যা ১২)

ইহা দ্বারা দেখা যায়, ব্রাহ্মণের উচ্চাদর্শ রক্ষা করিবার জন্যই শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণকে রাজদণ্ডে অব্যাহতি দিয়াও গুরুতর সমাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অপদস্ত করিতে ক্রটী করেন নাই। সুতরাং যে চরিত্র আদর্শ ও যাহাতে অপরাধ করিবার কোন শক্তি নাই, সেই বিমল চরিত্র ব্রাহ্মণ-জাতিকে অপরাধের বহির্ভুত রাখাতে কোন ক্রটী বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে—বলা যায় না। এখন ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে এরূপ রীতি কার্য্যকরী ছিল কি না তাহা দেখা যাউক।

ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়া শুনিলেন, রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। ভরত কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতঃ রাম কি কোন ব্যক্তিকে হিংসা করিয়াছিলেন? পরদারে আসক্ত হন নাই তো? কি কারণে তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। ভরতের এই প্রশ্ন হইতে ক্ষত্রিয় রাজনন্দন হইলেও যে একবিধ অপরাধে তাহার প্রতি এইরূপ গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হইত, তাহা অনুমান করা যায়।

অন্যত্র—প্রজার প্রার্থনায় ক্ষত্রিয় রাজা সগর নিজ পুত্রকেও পর্য্যন্ত সস্ত্রীক নির্ব্বাসিত করিয়া রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। (অযোধ্যা—৩৬) সুতরাং প্রজার মনস্তুষ্টির জন্ত যে তখন ক্ষত্রিয়-রাজপুত্রও অব্যাহতি পাইতেন না, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। এই দৃষ্টান্ত তৎকালীন আদর্শ শাসন ও প্রজাবাৎসল্যের একটী দৃষ্টান্ত।

অযোধ্যার রাজ কার্য্য অষ্টাদশ তীর্থে (Department) বিভক্ত ছিল। মন্ত্রী এবং অমাত্যের সংখ্যা ও রাজকীয় বিভাগের সংখ্যা সমান ছিল। সুতরাং মনে হয় এই অষ্টাদশ জন মন্ত্রী অষ্টাদশ বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন। এই অষ্টাদশ তীর্থ কি কি ছিল, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

(১) প্রধান মন্ত্রীর বিভাগ (Prime Minister's office) (২) প্রধান পুরোহিতের কার্যালয় (Lord Bishop's office) (৩) যুবরাজের বিভাগ (Royal Prince's office) (৪) সামরিক বিভাগ (War Minister's office) (৫) দৌবারিকের বিভাগ (৬) অন্তঃপুর রক্ষকের বিভাগ (৭) রন্ধনাগারাধ্যক্ষের বিভাগ (৮) ধনাধ্যক্ষের কার্য্যালয় (৯) রাজাজ্ঞা প্রচারকের কার্য্যালয় (১০) প্রাড্‌বিবাক-কার্য্যালয় (Legal Remembrance's office) (১১) ধর্ম্মাধিকারীর বিভাগ (Judicial Dept.) (১২) ব্যবহার নির্ণায়কের কার্য্যালয় (Law maker's office) (১৩) বেতনাধ্যক্ষ (Pay master's office), (১৪) নগরাধ্যক্ষের বিভাগ (Corporation office) (১৫) অবসর বেতনগ্রাহীর বিভাগ (Pensoner's office) (১৬) রাষ্ট্রপাল বিভাগ (সীমান্তরক্ষক) (১৭) দণ্ডাধিকারীর বিভাগ (Executive Dept.) ও (১৮) দুর্গপালের। কার্য্যালয়। এই অষ্টাদশ বিভাগের তত্বাবধানে রাজ্য শাসন হইত।

তৎকালে রাজস্ব ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য দ্বারা প্রদত্ত হইত বলিয়া বোধ হয়। রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ নির্দ্ধারিত ছিল। (অযোধ্যা—৬) তখন আর্য্য সমাজে বিনিময় মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। ঐ মুদ্রা 'সুবর্ণ' ও 'নিষ্ক' নামে পরিচিত ছিল। উভয়ই স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল। *

---

* মনুসংহিতায় উহাদের পরিমাণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।—

সর্ষপা ষট্‌ যবোমধ্য স্ত্রিয়বন্তেক কৃষ্ণলং।
পঞ্চ কৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্ত ষোড়শ॥
* * চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কঃ। (অধ্যা—৮)

৬ সর্ষপ—১ যবোমধ্য
৩ যবোমধ্য—১ কৃষ্ণল
৫ কৃষ্ণল—১ মাসা
১৬ মাসা—১ সুবর্ণ
৪ সুবর্ণ—১ নিষ্ক॥
১ নিষ্ক ৮০ রতি ওজনের।

স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ধাতু মুদ্রা তখন প্রচলিত ছিল না।

তৎকালে রাজকীয় বিধান অনুসারে কোন অপরাধে কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, এইবার তাহার আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ব্রহ্মস্ব হরণ. নিরপরাধ ব্যক্তির ক্ষতি, পর স্ত্রী গমন প্রভৃতি পাপে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। (অ—৭২)

কোন কোন অপরাধে অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন (নাসা কর্ণ ছেদন প্রভৃতি) কশাঘাত, মুণ্ডন প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বিপক্ষের দূতদিগের পক্ষে এইরূপ দণ্ডের ও ব্যবস্থা ছিল। (সুন্দরা—৫২)

তস্করদিগের প্রতি বধ ও কারাবাস বিহিত ছিল।
(সুন্দরা—২৮)

স্ত্রীলোক কোন অপরাধেই বধ্য ছিল না। (অযোধ্যা—৭৮)

——

জর্ম্মাণ সম্রাট।

আজ সমস্ত পৃথিবীর চোখ যদি এক জন লোকের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি জর্ম্মাণীর বর্ত্তমান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম ভিন্ন আর কেহ নহে। ইউরোপে যে এক প্রকাণ্ড সমর বহ্নিতে আজ সহস্র ২ মানবের জীবন-রুধির আহুতি পড়িতেছে, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহারা কমবেশী এ আগুণের তাপ অনুভব না করিতেছে। কোথায় ফিজিদ্বীপ আর কোথায় চীন, কোথায় ক্যানাডা আর কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় জাপান আর কোথায় ভারতবর্ষ—এমন কোন স্থান নাই, যেখানে মাতা পুত্রহীনা, স্ত্রী পতি হীনা অথবা ভগ্নী ভ্রাতা-হীনা না হইতেছে। অসভ্য যারা, এতকাল যাহাদিগকে পৃথিবীর বাহিরে মনে করা হইত, আজ হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিবার জন্য তাদেরও আহ্বান পড়িয়াছে;—আজ তাদেরও বীরত্ব কাহিনী সভ্য জগতের কথনীয় হইয়াছে; কেবল তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যে আঘাত পড়ায়, যাহাদিগকে সমরক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিতে হয় নাই, তাহারাও এ যুদ্ধের প্রভাব মধ্যে ২ অনুভব করিতেছে। এত বড় যুদ্ধ ইতিহাসে কখনও হয় নাই, এই তুমুল কাণ্ডটা ঘটাইল কে? ইংলণ্ড, রুষিয়া, বেলজিয়ম ও ফ্রান্স একবাক্যে বলিতেছে, জর্ম্মণীর দ্বিতীয় উইলিয়ম। কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ডকর্জ্জন ইহাকে 'নরঘাতক' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং এমন দিন বোধ হয় সপ্তাহে যায় না, যখন ইহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু ভাবা ও বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস যদি বৃহস্পতি বা মঙ্গলগ্রহ হইতে কেহ আসিয়া লিখিত, তাহা হইলে কি হইত জানি না, কিন্তু যত দিন পৃথিবীর লোকেই ইহা লিখিবে, তত দিন খাঁটি সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য পাওয়া যাইবে, বুকে হাত দিয়া একথা বলা চলে না। মানুষের মনের যে গূঢ় বাসনা তাহাকে কার্য্যে প্রেরণ করে, তাহার ভাবায় সব সময় উহাকে বুঝিয়া নেওয়া যায় না। সত্য জ্ঞানের এ অন্তরায় যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন, মানুষের কার্য্য সম্বন্ধে অন্ততঃ আমাদিগকে অর্দ্ধ-সত্য নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। জর্ম্মাণ সম্রাটই এ আগুণের একমাত্র কারণ কিনা ভবিষ্যৎ যেমন জানিবে আমাদের তেমন জানিবার সুবিধা নাই। তথাপি ইঁহারই যে একমাত্র দোষ, পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকই তাহা মনে করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিশেষত্ব এই যে, জর্ম্মাণ জাতির ঘাড়ে এ দোষের বোঝা বড় পড়ে না; কারণ জর্ম্মাণ জাতি অর্থ কৈসরের সৈন্য ও সামন্ত, অর্থাৎ তাঁহার মুষ্টিগত একমাত্র তাঁহার ইচ্ছার অধীন একটা প্রকাণ্ড কল। একজন লোক একটা প্রকাণ্ড শক্তিসম্পন্ন জাতির উপর এমন অপ্রতিহত আধিপত্য নেপলিয়ান বোনাপার্টের পর নাকি কেহ কোথাও করিতে পারে নাই। এমন যে একটা লোক, তাহার সম্বন্ধে স্বভাবতঃই কিছু জানিবার কৌতুহল হওয়ার কথা। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে একজন পর্ত্তুগীজ লেখক ইঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে যাঁরা অনেক দিন পূর্ব্বেও এই সম্রাটকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, তাঁরা বুঝিয়া ছিলেন যে ইনি একদিন পৃথিবীতে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইবেন। আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার মর্ম্ম নিয়ে পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

"তেইশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জর্ম্মাণ-সম্রাট এক অদ্ভুত হেয়ালি, এক অপূরণীয় সমস্যার পরিণত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কত শত প্রশ্ন ইউরোপের মনকে চিন্তা ক্লিষ্ট করিতেছে, কত বিষয়েই মানুষ কি হইবে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া চলিতেছে। এত সব প্রশ্নের মধ্যে এই সম্রাটের ভবিষ্যৎ অন্যতম। যে বিষয়েই ইউরোপের চিন্তা ধাবিত হউক না কেন, এই উদীয়মান সম্রাটের অহংভাব অত্যন্ত তেজের সহিত তার পথে বর্ত্তমান। ম রেনা এক জন নাস্তিক; পরলোক ও ঈশ্বরে বিশ্বাস না করায় ও মৃত্যুতে তাঁহার কোন দুঃখ ছিল না; তিনিও মরিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যু তাঁহাকে জর্ম্মাণ সম্রাটের চরম পরিণতি দেখিতে দিবে না, এই তাঁর দুঃখ।

সিংহাসন আরোহণ করিয়া অবধি, এই বেগশীল সম্রাট্ পৃথিবীর দৃষ্টি ও ঔৎসুক্য আকর্ষণ করিয়াছেন; যেন জর্ম্মাণ সিংহাসন একটী সুসজ্জিত রঙ্গমন্দির, যাতে কত কিছু তাজ্জব ব্যাপারের সংঘটন হইতে পারে। সিংহাসন আরোহণ করিবার তিন বৎরের মধ্যেই ইনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে তাঁহার ভিতরে এক ব্যক্তির নয়, বহু ব্যক্তির করণ-সামগ্রী সন্নিহিত রহিয়াছে;—ইহাদের এক একটীর পরিণতি হইবে, আর তিনি এক এক বেশে পৃথিবীর সম্মুখে বিকসিত হইবেন। সুতরাং স্বভাবতঃই মানুষের জানিতে ঔৎসুক্য হয়, এই নানা রঙ্গে রঙ্গীন জীবন নাট্যের শেষ অঙ্কে কি হইবে?

ইহাতে রাজশক্তির বহুবিধ বিকাশ সমাবিষ্ট রহিয়াছে। কখনও তিনি সৈন্যরাজ—দৃঢ় শিরস্ত্রাণ ও তরবারে সৈন্যবেশে সজ্জিত; সৈন্য পরিদর্শন ও নকল যুদ্ধ নিয়া ব্যস্ত; রাজ্যটাকে একটা দুর্গ কল্পনা করিয়া, সমস্ত রাজকার্য্যের উপরে নূতন পাহারার বন্দোবস্ত করিতেছেন; কাওয়াজ শিক্ষককে জাতির শ্রেষ্ঠতম উপাদান মনে করিয়া, সমস্ত নৈতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপরে দুর্গের শাসন-নীতির স্থান দিয়েছেন এবং জর্ম্মাণীর সমস্ত মহিমা শিক্ষা-নবীশ যুবকদের কাওয়াজের পরিপাট্যে কেন্দ্রীকৃত করিতেছেন। অকস্মাৎ পট পরিবর্ত্তন! রাজা সৈন্যবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রমজীবীর বেশে বিরাজমান! এখন তাঁহার আর অন্য কোন কাজ নাই, কেবল মূলধন ও শ্রমজীবীদের বেতন প্রভৃতির প্রশ্ন নিয়াই ব্যস্ত,—কখনও বা সমাজ সংস্কারের জন্য সভা আহ্বান করিতেছেন, কখনও বা নিম্ন জাতির উন্নতি-কল্পে অন্যবিধ উপায়ের চিন্তা করিতেছেন—এখন তিনি সংস্কারক রাজা!

হঠাৎ আবার সকলের অজ্ঞাতসারে, একদিন তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন ঘটিল। এখন তিনি ভূতলে ঐশ-শক্তির প্রতিনিধি—ঈশ্বর-নিযুক্ত রাজা; আইন কানুন সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা-প্রসূত; তিনি সভ্রান্ত, আপ্ত; তাঁহার ইচ্ছার উপরে কোন শক্তি নাই। কারণ স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। পৃথিবীর লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে;—এ আবার কোন্ লীলা। ইতি মধ্যে রঙ্গমঞ্চে অন্য চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; এবার রাজা ধীর ললিত বেশে, বিলাসি-জন-পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পরিচ্ছদ ও অন্যবিধ বিলাস সম্ভোগের পারিপাট্য, তাঁহার একমাত্র চিন্তা; মহিলাদের উত্তমাঙ্গে কিরূপ অবরণ থাকিবে,—নৃত্য-গীতে কে কি প্রণালীতে চলিবে, পানাহারের রীতি কি হইবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্তই তিনি ঠিক করিয়া দিতেছেন। পৃথিবীশুদ্ধ লোক হাসিতেছে, এমন সময়, এ আবার কি? সে রাজা ত আর নাই। এবার দ্বিতীয় উইলিয়ম্ আধুনিক রাজা, উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য-ভব্য; অতীত তাঁহার কাছে অন্ধ বিশ্বাসে কলুষিত; বর্ত্তমান শিক্ষা হইতে তিনি প্রাচীন সাহিত্য ও ললিত কলাবিদ্যাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং স্বায়ত্ত-শাসনের ভিতর দিয়া জড়বিদ্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাণ্ড নবীন সভ্যতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কর্ম্মশালা এবার তাঁহার নিকট মহত্তম দেবমন্দির! জর্ম্মাণীর সমস্ত ক্রিয়া জড় তাড়িত শক্তিতে চালিত হইবে, এই তাঁহার প্রধান স্বপ্ন!

এই বহুরূপী সম্রাট মাঝে ২ যখন তাঁহার রঙ্গমঞ্চ অর্থাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করেন, যখন তিনি পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন, তখন আবার তাঁহার অন্য-মূর্ত্তি! আজ হয় ত তিনি নাবিক-রাজ,

অর্ণব যানে কন্‌ষ্টান্তিনোপলেরদিকে অগ্রসর হইতেছেন; এখন তিনি কবি! রঞ্জিত ভাষায় প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রাচীর সুনীল গগনের অথবা এসিয়ার সৈকত-ভূমির মৃদু অনিলের বর্ণনা পাঠাইতেছেন। আবার উদীচী যখন তাঁহার ভ্রমণ-ক্ষেত্র যখন নরওরেতে তিনি দেখিতে পান তুষার-বন্ধ-মুক্ত বারি ধারা ইরম্মদ রবে দেবদারুর ছায়া মধ্য দিয়া ধাবিত হইতেছে, তখন তিনি জাহাজের ছাদে বসিয়া প্রাকৃতিক শক্তির কাছে যে মানব শক্তি কিছুই নয়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। আবার, যখন তিনি বিলাসি সমাজের মধ্যবর্ত্তী, তখন তিনি একটী ফুল বাবু। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে একটী করিয়া উজ্জ্বল আংটি। তার পর হঠাৎ একদিন নিশিথ সময়ে বার্লিনে সমর ভেরি বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে টেলিগ্রাফের তার কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত ইউরোপ উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রাভাতিক সংবাদ পত্রের জন্য ছুটিয়া চলিল. চারিদিকে ভীষণ সংবাদ প্রচারিত হইল, আগামী 'বসন্ত কালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে!' একি হইল! আর কিছু নয়, দ্বিতীয় উইলিয়ম তাঁহার রঙ্গমঞ্চে পুন আরোহণ করিয়াছেন—কৈসর বার্লিনে ফিরিয়া গিয়াছেন!

স্তম্ভিত পৃথিবী অব্যক্ত কণ্ঠে জল্পনা করিতেছে কে এই ব্যক্তি, যে প্রতি মুহূর্ত্তে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য বেশে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে? ইহার চরম বিকাশ কোথায়? বৈজ্ঞানিক জগতে মঙ্গল-গ্রহ বা চুম্বক বা ইমফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর সম্বন্ধে যেমন নানাবিধ মত দৃষ্ট হয়, ইঁহার সম্বন্ধেও তেমনি নানাজনে নানা মত পোষণ করিতেছেন;—ইনি একটী সমসাময়িক সমস্যা। কেহ বলেন, ইনি মাত্র একজন অপক্ক যুবক,—কেবল সংবাদ পত্রের যশঃ পিপাসু; এবং সেই জন্য তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ দৃশ্যকাব্যের জমকে রঞ্জিত! কেহ বলেন, ইহার ঔপন্যাসিক ব্যারাম হইয়াছে - অতিরিক্ত কল্পনার উন্মত্ত প্রেরণায় ইনি কাণ্ড-জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন; এবং সর্ব্বশক্তিমান্ সম্রাট্ বলিয়া ইনি অপ্রতিহত ভাবে নিজের কল্পনা-ব্যাধি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন। আবার কেহ বলেন—ইনি হোহেন্-জোলার্ণ রাজবংশের একজন রাজা মাত্র, এবং ইহাতে অসংযত রাজ শক্তি, বৈদান্তিক জগৎ মিথ্যাবাদ বা অজ্ঞেয়-ব্রহ্মবাদ, সৈন্য-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বাদ, আরও কত কিছুর একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

সিনাই পর্ব্বতের উপর ভগবানের সঙ্গে যখন মোসেস কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন এবং সমাজ শাসনের নিমিত্ত কানুন জানিয়া আসিয়া লোকেতে প্রচার করিয়াছিলেম তারপর ভগবানের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে এমন হৃদ্যতা আর কখনও দেখা যায় নাই। কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়ম দেবতার প্রিয়দর্শী, খোদাবন্দের পিয়ার, ভগবানের আদেশে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে, তিনি লোক শাসন করিতেছেন। ইহার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়; কারণ, বিশ লক্ষ সৈন্য ইহার আদেশে উঠে বসে, এবং একটী সমগ্র জাতি ইহার পদতলে অবস্থিত! এই জাতি দর্শনে ও নীতিতে স্বাধীনতা খোজে বটে কিন্তু সম্রাটের আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য্য করিয়া লয়।

সমস্ত সমসাময়িক রাজাদের চেয়ে উইলিয়ম বহুভাষী এবং যে কোন সমিতিতে, যে কোন উৎসবে ইনি বক্তৃতা করেন, সেখানেই তিনি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দের কথা না বলিয়া ছাড়েন না। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ বা ইতালির রাজা যেমন তাঁহার সম-পদস্থ ব্যক্তি, তেমনি ঈশ্বরও তাঁহার একজন সম-পদস্থ বন্ধু! এক সময়ে তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্ব-শক্তিমান্ প্রভু জগৎ পাতা জগদীশ্বর বলিতেন; কিন্তু কিছুকাল পরে; পীয়মান্ সোমরসের স্রোতে যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন তিনি ভগবান্‌কে আমার পুরাতন বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিলেন। যেন, কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়ম ও পরমেশ্বর এই উভয়ে মিলিয়া বিশ্ব রক্ষার জন্য একটী লিমিটেড্ কোম্পানী খুলিয়াছেন! কিছু দিন পর হয় ত এই পুরাতন বন্ধু একেবারেই অন্তর্হিত হইবেন এবং এই পৃথিবী রক্ষার কোম্পানী একা উইলিয়ম্‌ই পরিচালনা করিবেন।

একদিন হয় ত এই দুর্দ্ধর্ষ সম্রাটের অদম্য হঠকারিতার ফলে সমস্ত ইউরোপ অস্ত্রের ঝন ঝনায় জাগিয়া উঠিবে। ভগবানের সহিত সন্ধি—বিশ্ব শক্তির সহিত বন্ধুতা! নিশ্চিত বিশ্বাস যাহার এইরূপ, তাহার শক্তি অসাধারণ। কিন্তু এ বিশ্বাসের বিপদও যথেষ্ট; বাস্তব সত্য যখন সপ্রমাণ

করিয়া দিবে যে, ইহা আত্ম প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়, তখন দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না।

হইতে পারে, অনেক দিন পর এই সম্রাট্ ইউরোপের ভাগ্য বিধানের অধিষ্ঠাতা হইয়া বার্লিনে বিরাজ করিবেন; অথবা এও হইতে পারে যে একদিন ইনি নির্ব্বাসিতের চিরন্তন আশ্রয় লণ্ডনের কোন হোটেলে বসিয়া মলিন মুখে ভগ্ন প্রায় মুকুটটী ব্যাগ হইতে খুলিয়া শাশ্রুনয়নে নিরীক্ষণ করিবেন।

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে এই যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহার কতক অংশ আজ ফলিতেছে;— ইউরোপ আজ অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় মুখরিত। বাকীটুকু কি ভাবে ফলিবে, দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ব্যর্থ সাধন।

খুঁজিলাম এত করি
নগর নগর ভ্রমি
দেশ হতে দেশ দেশান্তর,
কভু সন্ন্যাসীর বেশে
কভু বা সংসারী সেজে
বাঁধি সুখে স্বপনের ঘর!
কিন্তু হায়। আজো তবু
পেলেম না দেখিবারে
এ'বিশ্বের নিয়ন্তা যে জন!
কেমন স্বরূপ তাঁর
কেমনে সৃজন করে
ফলে ফুলে মাধুরী এমন!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ভাণ্ডার যাঁহাদের জ্ঞান গরীমায় উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের ফল, দেশে একটা নবজাগরণের স্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গের যেসকল ঐতিহাসিক প্রাচীনকাল হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত, তাঁহাদের মধ্যে রজনীকান্ত গুপ্ত, ব্রজকান্ত মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের সকলই ক্রমে ক্রমে কালসাগরে বিলীন হইয়াছেন; তাঁহাদের শেষ চিহ্নটীকেও আমরা বিগত ২৪শে পৌষ তারিখে চিরতরে হারাইয়াছি।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় রথযাত্রার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোলোকচন্দ্র সিংহ। গোলকচন্দ্র ত্রিপুরাধিপতির রাজস্ব সচিব ছিলেন; সুতরাং সমাজে তাঁহার বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল।

কৈলাসচন্দ্র পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং আদরের সীমাছিল না। পঞ্চম বৎসরে কৈলাসচন্দ্রের হাতে খড়ি পড়ে। তৎকালে ত্রিপুরা জেলায় কুমিল্লা জেলা স্কুল ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে কালীকচ্ছ গ্রামে সাধক ৺ আনন্দচন্দ্র নন্দী ও অন্যান্যের উদ্যোগে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এই বিদ্যালয়ে কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয়। তখন দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজদাস দত্ত এম,এ, মহোদয়ও সেই স্কুলে পড়িতেন।

স্কুল স্থাপনের কয়েক বৎসর পরেই স্কুলটী উঠিয়া যায়। সুতরাং কৈলাস বাবুও স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হন। তার পর দেড় বৎসর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থাকিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "টাইফেড" জ্বরে আক্রান্ত হন। বহুদিন ভুগিয়া যখন আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহার পিতৃদেব রোগ শয্যায় শায়িত। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ়

গোলোকচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কৈলাস চন্দ্র বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিলেন।

১৩ বৎসর বয়সে কৈলাসচন্দ্র দার পরিগ্রহ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। সুতরাং অল্প বয়সেই সমস্ত সংসারের পরিচালনের ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হয়। তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে হয়। তিনি ত্রিপুরা রাজ সরকারে প্রবেশ করেন।

ঘটনা চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া যদিও তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তথাপি জ্ঞান পিপাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সরকারী কার্য্যের অবকাশে তিনি দিবা নিশি অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। কোন নূতন গ্রন্থ পাইলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থ পাঠে রত থাকিতেন। কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ সর্ব্বদা তাহার সাথের সাথী ছিল। কোন কর্ম্ম না থাকিলেই তাহা পাঠ করিতেন। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় কৈলাসচন্দ্রের আর একখানা নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ ছিল—"দুর্গা ভক্তি চিন্তামণি" * সর্ব্বদা গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার হৃদয়ে গ্রন্থ রচনার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে।

তৎকালে ঢাকা নগরীতে "হিন্দু হিতৈষিণী" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। কৈলাস চন্দ্র তাহার একজন লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ২০ বৎসর বয়ক্রম সময় তিনি একখানা উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময় কৈলাসচন্দ্র আগরতলা পরিত্যাগ করেন।

ত্রিপুরা রাজ সরকারে এই সময় আত্মকলহ উপস্থিত হয়। এবং ফলে তাহার মীমাংসার ভার ব্রিটিশ রাজ শক্তির উপর পতিত হয় বিংশতি বর্ষীয় কৈলাসচন্দ্র উক্ত ঘটনায় জড়িত হইয়া যেরূপ নির্ভিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। এই ঘটনায় জড়িত থাকিয়াও কৈলাসচন্দ্র সাহিত্য সেবায় বিরত ছিলেন না। মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতে ত্রিপুর রাজ্যের যে সকল প্রাচীন দলিল পত্র বাহির হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়াই তিনি "ত্রিপুর ইতিবৃত্ত, নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহার পর তিনি ফরাসী বীর ললনা জোয়ানের জীবন চরিত প্রকাশ করেন।

ইহার পর কৈলাস বাবু পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" তাঁহার 'মণিপুর বিবরণ' এবং ভারতী পত্রিকায় "হিয়োনসাঙ্গের বাঙ্গালা ভ্রমণ" প্রকাশিত হয়। ক্রমে তিনি "বঙ্গদর্শন" ও "ভারতীর" নিয়মিত লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়া বহু প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় কৈলাসচন্দ্রকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। তিনি কলিকাতা যাইবার পথে ঢাকায় 'বান্ধব' সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন এবং তাহার অনুরোধে ঢাকায় বসিয়া "দিনাজপুর স্তম্ভলিপি" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া বান্ধবে প্রদান করেন।

কলিকাতা পৌছিবার তিনমাস পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈলাসবাবুকে তাঁহাদের উড়িষ্যাস্থিত জমিদারীর শাসনভার প্রদান করিয়া কটক জিলার অন্তর্গত অরছিলি নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌছিয়া "উড়িষ্যা যাত্রা" ও "উড়িষ্যার ইতিহাস" শির্ষক প্রবন্ধ ভারতীতে বাহির করেন। এই স্থানে প্রায় দেড়বৎসর কাল অবস্থান করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক পদে নিয়োজিত হন। তখন কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই পদে থাকিয়া কৈলাসবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিশাল লাইব্রেরীটী নিজের অধীনে পাইয়া রীতিমত পড়াশুনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

তৎকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ অতি বিরল ছিল। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধাকল্পে কৈলাসবাবু শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজে অবস্থান কালে তাঁহার "শ্রীদারুব্রহ্ম" নামক শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ইতিহাস, সেনরাজগণ, মোহমুদ্গর, "হস্তামুলক" এবং সাধকসঙ্গীত ১ম ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। এইরূপে প্রায় ১০ বৎসর কার্য্য করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

* এই গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষায় প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে এখনকার মত আলোচনা ছিলনা। তখন রজনীকান্ত গুপ্তের ও প্রফুল্ল বাবুর ২।১ খানা গ্রন্থমাত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কৈলাসবাবু সেই প্রাচীন যুগে ভারতী, বান্ধব, নব্যভারত, তত্ত্ববোধিনী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি বাঙ্গলার একখানা ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়া বান্ধবে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইতিহাসখানা সমাপ্ত হয় নাই। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে কিরূপ শক্তি যোজনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের নিকট অবিদিত নাই।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কৈলাসবাবু "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস" প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস ছিল না ; যাহা ছিল, তাহাও জন সাধারণের নয়ন গোচর হইত না। কৈলাস বাবু রাজমালা প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে একটী অতি প্রাচীন রাজ্যের সুবৃহৎ ইতিহাস প্রদান করিয়া বঙ্গবাসীকে কৃতজ্ঞতা ভাজন করিয়াছেন।

কৈলাস চন্দ্র আজ ইহ জগতে নাই। আমরা যখন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার এই জীবনী সংগ্রহ করি; তখন সৌরভের "সাহিত্য সেবক" প্রবন্ধেই তাঁহার জীবনী প্রদান করিব মনে ছিল কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর। উপসংহারে তাঁহার শেষ জীবনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করিব।

৫০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত কৈলাস চন্দ্রের কোন ধর্ম্ম-মতেই বড় আস্থা ছিল না। তাহার সমর্থনে এস্থলে তাঁহার একটী স্বরচিত সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

পরজ—বাহার—আড়া।

ভ্রমিতে ছিলেম আমি নাস্তিকতা ঘোরবনে।
আমারে এনেছ তুমি ধর্ম্মরূপ তপোবনে॥
গভীর সে অরণ্য ছিলগো কণ্টকাকীর্ণ,
পথ হারা হয়ে মাগো ভ্রমিয়াছি নিশি দিনে।
পরিমু কপট বেশ আচরণ হিংসাদ্বেষ
উপহাস করিয়াছি সদা তব গুণ জ্ঞানে।
তুমি মাগো দয়া করি উজ্জ্বল আলোক ধরি,
পথ দেখাইয়ে মোরে, এনেছ নন্দন বনে।
অযাচিত কৃপাবারি ঢালিয়ে গো শিরোপরি
কৃতার্থ করেছ মাগো তারা সুত দীনহীনে॥

এক সময় তিনি বেদান্ত চর্চ্চায় নিবিষ্ট ছিলেন, আবার কতক দিন ব্রহ্মোপাসনায়ও রত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মেই তিনি অধিকতর আকৃষ্ঠ হইয়াছিলেন। রাজমালা প্রণয়নের পর গ্রন্থকার শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত চর্চ্চায় রত হন। সেই অবধি তিনি শক্তির উপাসক হইলেন। কুল গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ৺কালীর অর্চ্চনা করিতে থাকেন। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের পরও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। প্রথম বয়সে কৈলাস বাবু গুরুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ; এজন্য তিনি ব্যাকুল মনে সদ্গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কৈলাস বাবু সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিয়া তিনি 'কাঙ্গাল গীতা' ও 'কাঙ্গালের গীত' (সাধক সঙ্গীত পরিশিষ্ট বা ৪র্থভাগ) প্রণয়ন করেন। কাঙ্গাল গীতা অতি উপাদেয় ক্ষুদ্রগ্রন্থ। তুলসীদাস কবির ও মীরাবাইর ধূয়াবলীর ন্যায় কোন গ্রন্থই বঙ্গ ভাষায় ছিল না। কাঙ্গাল গীতা দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে।

কাঙ্গালের গীতা বা সাধক সঙ্গীত পরিশিষ্ট কৈলাস বাবুর স্বরচিত শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এই সঙ্গীত গ্রন্থে বিশেষত্ব ও নূতনত্ব আছে। সঙ্গীত গুলি উদার ভাবে পরিপূর্ণ। দশ মহাবিদ্যা ও দশাবতার অভিন্ন ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শেষ জীবনে তিনি বঙ্গীয় সাধকবৃন্দের জীবন চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমর লেখনী সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অবসর পায় নাই। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যও সে সম্পদে সম্পদশালী হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারিল না।

শ্রীমুনীন্দ্রকিশোর সেন।

শান্তি।

মরণের পর পারে
অমরত্ব গড়েছে নগর,
মরণের পরে সেথা
অমর হইবে নারীনর,
নাহি সেথা দ্বেষ হিংসা ;
পরস্পর স্নেহ করুণায়,
দেহ মুক্ত আত্মাগণ
হেথা আসি চির শান্তি পায়।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

নবযুগের অবতার।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের এক নব-জাগরণ অনুভূত হইতেছে। দেশমধ্যে ধর্ম্মের এই নব জাগরণের কারণ-স্বরূপ যতগুলি শক্তি-কেন্দ্র আছে, তাহার মধ্যে থিওসফিকেল সোসাইটী অন্যতম।

সম্প্রতি মহাত্মা শ্রীমদ্‌কৃষ্ণমূর্ত্তি নানা কারণে থিওসফিকেল সোসাইটীর মধ্যদিয়া দেশমধ্যে আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পরিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়ার ; মান্দ্রাজ বিভাগের কোন এক গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। পিতা নারায়ণ সরকারী কর্ম্মে পেন্সন প্রাপ্তির পর ১৯০৯ সনে "থিওসফিকেল সোসাইটীর" প্রধান নেতা শ্রীমতী এনিবেসান্তের ইচ্ছায় এসোটেরিক বিভাগের পত্রাপত্রী সম্বন্ধীয় আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে বৃতহন। শ্রীমতীবেসান্তের প্রতি শ্রীযুক্তনারায়ণের গুরুঠাকুরাণীর ন্যায় গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিছিল। শ্রীযুক্ত নারায়ণের দুই পুত্র, শ্রীমান কৃষ্ণমূর্ত্তি ও শ্রীমাননিত্যানন্দ পিতার সঙ্গে অবস্থান করিয়া সুব্রাণ্যায়াম হাইস্কুলে পড়াশুনা করিতে ছিলেন।

শ্রীমতীবেসান্ত শ্রীমানকৃষ্ণমূর্ত্তিকে মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া বালকের ভাবী শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া উক্ত স্কুল হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া আনিলেন। ১৯১০ সনে শ্রীমতীবেসান্ত শ্রীযুক্তনারায়ণের পুত্রের অভিভাবিকা হইবার জন্য তাঁহার একখানি সম্মতি পত্র চাহেন ;—তদনুসারে নারায়ণও তাহা প্রদান করেন।

শ্রীমদ্‌ কৃষ্ণমূর্ত্তি।

ইহার অনতিকাল বিলম্বেই ছেলেকে "থিওসফিকেল সোসাইটীর" অধীন রাখা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তনারায়ণের মত পরিবর্ত্তন ঘটে ; এবং অভিভাবিকা শ্রীমতীবেসান্ত হইতে ছাড়াইয়া আনিতে ইচ্ছাকরেন। শ্রীমতীবেসান্ত ছেলে-টীকে তাঁহার সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ করিবেন বলিয়া এতদিন যে আশা পোষণ করিতে ছিলেন, আজ তাহা নির্ম্মূল করিতে বাসনা জাগিল না। তিনি শ্রীমানকৃষ্ণমূর্ত্তির ভিতরে অলৌকীক শক্তি দেখিয়া ৺শ্রীখৃষ্ট বা শ্রীমৈত্রেয়ের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাকে কিছুতেই প্রত্যর্পণ করিলেন না।

শ্রীযুক্তনারায়ণ পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আদা-

লতে নালিশ রুজু করিলেন এবং পরপর মাদ্রাজ হাই কোর্ট পর্য্যন্ত শ্রীমতীবেসান্তের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলেন।

এদিকে শ্রীমতীবেসান্ত নালিশের প্রথমাবস্থায়ই শ্রীমান কৃষ্ণমূর্ত্তিকে শিক্ষার জন্য বিলাতে স্থানান্তরিত করিয়া ছিলেন। এখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিক্রীর বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করিয়া জয়ী হইলেন। কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহারই রহিল।

সম্প্রতি শ্রীমান কৃষ্ণমূর্ত্তি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংরাজিতে দুইখানি বই—At the Feet of the Master এবং Education as Service—লিখিয়া নূতনভাবে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। প্রথমোক্ত বই খানির বাঙ্গালা অনুবাদ "শ্রীগুরুচরণেষ"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত-রত্ন বি এ মহাশয় করিয়াছেন; দ্বিতীয় খানি বাঙ্গলা অনুবাদ "শিক্ষা না সেবা" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ বিল এল মহোদয় করিয়াছেন। বই-গুলি পাঠ করিলে শ্রীমদ্ কৃষ্ণমূর্ত্তির তত্বজ্ঞানে অন্তঃপ্রবিষ্টতা-শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্বন্ধে গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় "দেবাপি ও মরু" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। "থিওসফিকেল সোসাইটীর" নেতৃবর্গ মধ্যে শ্রীমতী আনি বেসেণ্ট্ ও শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার্ সাহেব সাধন বলে অধিক-তর যোগবল-সম্পন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা নিজের এবং অপরের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিতে সক্ষম। পৃথিবীস্থ ধর্ম্ম-জগতের নর-নারীগণ অদূর ভবিষ্যতে এই ধরাধামে জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব প্রত্যাশা করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব একটী মান্দ্রাজী বালকের দেহে প্রবেশ করিয়া তদবলম্বনে তাঁহার বিশ্বব্যাপী সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অনেকে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। সেই বালকটী এখন সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিলাতের লণ্ডন নগরে পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করিতেছেন। তাহার নাম শ্রীমান কৃষ্ণমূর্ত্তি! সাধারণতঃ তাহাকে বাৎসল্য ভাবে কৃষ্ণজিও বলা হয়। এই বালকটীর বর্ত্তমান জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্ব ত্রিশটী জীবন ও তাহাদের ঘটনাবলী শ্রীমতী বেসেণ্ট ও শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার সাহেব এক যোগে বিশেষ গবেষণার সহিত সাধন বলে অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিয়া ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

বড়শী শিকারী

(১)

কিশোর ব্রাহ্মণ কুমার নদীর তীর হইতে ঘরে ফিরিতে ছিল; দেখিল সুন্দরী এক মেয়ে, মাটীর ভাঁড় কাঁখে লইয়া জল ভরিতে জলে নামিতেছে। তার চুল গুলি চূড়ার মতন করিয়া মাথার উপরে বাঁধা। তার হাতে মোটা মোটা দুগাছি কাঁসের বালা, নাকে নথ, গলায় লাল সূতা বাঁধা, পড়নে লাল পেড়ে সাড়ী। তাহার চক্ষু দুটি বড় সুন্দর ভাবে ঢল ঢল; মুখখানি পদ্ম ফুলের মত। সে ব্রাহ্মণের দিকে একবার চাহিয়া আপন মনে জলে নামিল—তারপর কলসী ডুবাইয়া কাঁখে তুলিল। গায়ের কাপড়খানি একটু আবশ্যক, একটু অনাবশ্যক মত টানিয়া সে পথের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ দুই পায়ের উপর ভরদিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কার আকর্ষণে তাহার গলা হইতে উপরের দিক্‌টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মেয়েটার দিকে চক্ষু দুটাকে স্থির করিয়া রাখিল।

অনেকক্ষণ গেল। ব্রাহ্মণ সেখানে পুতুলের মত খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। চক্ষুদুটী মেলিয়াই রাখিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি ছিল না। তাহার নিশ্বাস ছিল কিন্তু তাহাতে তাহার কোনও শক্তি ব্যয়িত হইত না। সে ঠায় দাঁড়াইয়া দিনমান কাটাইয়া ছিল।

তারপর যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তখন রাখাল বালকের গান শোনা গেল—

"আমার এই প্রেম গোয়ালে, রাজার হালে
বঁধু বাঁধা থাকে বারমাস।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বামুণের ছেলে ঘরে গেল।

(২)

মেয়েটীর বয়সও বার তের বৎসরের কম নয়। সে

সাত আট বৎসরে বিবাহিতা হইয়াছিল। কপাল দোষে সে বিধবা। ছোট লোকের মেয়ে—বিধবার কোনও নিয়মই তাহাকে পালন করিতে হইত না। সে মাছ পর্য্যন্ত খাইত।

সে বামুণের ছেলের দিকে চাহিয়াছিল কেন, জান? একদিন যেন কোথাও এই ঠাকুরকে সে দেখিয়াছে—তা ভাল মনে পড়ে না। তাই, তার মনে আর কিছু ছিল না।

(৩)

পাঁচ ছয় দিন গেল। ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে ভোরবেলা দাঁড়ায়, মধ্যাহ্নে একবার বাড়ী গিয়া খায়, আবার আসে, আর—সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যায়।

এ রকমটা তাহার নিজেরই একটু কেমন বেতর ঠেকিল। মেয়েরা ঘাটে আসে, কাজ নাই কর্ম্ম নাই সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা কি ভাল দেখায়, ছিঃ!

তারপরদিন সে বড়শীর ছিপ লইয়া নদীতে বসিল। ভাল ভাল টোপ বড়শীতে গাঁথিয়া সে জলে ফেলে। মাছ আসে, টোপ খায়, ফাৎনা নড়ে, কিন্তু সে চাহিয়া আছে ঘাটের দিকে না হয় পথের দিকে। ঐ সে আসে কি না, তাই দেখে।

সে যখন ঘাটে আসে তখন বড়শীতে যদি একটা তিমিঙ্গিল লাগিত আর যদি তাহাকে শুদ্ধ টানিয়া গিলিত তাহাতেও তাহার দুঃখ বোধ হইত না। তাহাতে সে কৃতার্থ হইত।

বড়শী তুলিয়া দেখিত মাছ টোপ খাইয়া গিয়াছে! পুনরায় টোপ গাঁথিয়া সে বড়শী ফেলিত। মাছ পুনরায় টোপ খাইত। এই ভাবে দিন যায়।

(৪)

মেয়েটী ভাবিত কৈ ঠাকুরকেত একদিনও ছিপ টান্‌তে দেখি না। মাছ কি সে ধর্‌তে জানে না। না নদীর মাছ বড়শীতে খায় না। মাছ না ধর্‌লে আজ ক বচ্ছর ঠাকুর ঐ এক জায়গায় বসে আছেই বা কেন? উহু ঠাকুর মাছ ধরে। কিন্তু—কিন্তু ঠাকুর আমার দিকে অমন চাহিয়া থাকে কেন? দূর পোড়ার কথা ঐ মানুষটাই বুঝি ঐ রকম সবাইর দিকেই ঐ রকমে তাকায়। আর বেচারী করেই বা কি? বড়শীতে মাছ যদি না-ই খায়, তবে সে কি আশে পাশে চাইবেও না! চাইবেই ত।

ঐত ঠাকুর বড়শী তুল্‌ল। ঐত টোপ গাঁথে। এই বড়শী ফেলছে। ওঃ কৃষ্ণ! ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া আছে কেন? বড়শী রইল জলে, ঠাকুর এদিকে চায় কি? যাক্ আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি? ঠাকুর দেবতার কথা ভাব্‌তে নাই।

(৫)

সে আজ কি ভাব্‌ছিল যেন। বারটা বচ্ছর একখানে বসে আছি, একটা কথাও কইল না। এই বার বচ্ছরে তার রূপ যে ফেটে পড়্‌ছে। আর ত ধৈর্য্য থাক্‌ছে না। মেয়েটা কার? ও পাড়ার ত বটে কিন্তু বামুন মানুষ—ঐ লোকের পাড়ায় যাই কি করে? মেয়েটার এই ভরা যৌবন বৃথায় গেল।

আমিও আজীবন এই রূপের ধ্যানে এই ঘাটে কাটাব। সাধনার শেষ ফলটা কি, একবার দেখা চাই।

(৬)

হোক্ ব্রাহ্মণ। আর পারি না। আগুন চাপা থাকে না। এখনই জিজ্ঞাসা করব। "দেবতা, বড়শীতে কি মাছ খায়?"

পাগলের মত দৃষ্টিতে বামুণ সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"বার বচ্ছরে এই 'এক খুঁট' খেয়ে গেল।"

এর অর্থ কি? আজ ঠাকুরের নিকট মনের ভাব সাফ বল্‌ব। অমন সুন্দর সুপুরুষ! অমন তার যৌবন মাধুরী বশীর সাধনায় রৌদ্রে শুকাচ্ছে! উহুঁ—এর ভিতর অন্য কিছু আছে। আজ তা বুঝ্‌ব।

ঐ ত ঠাকুর বড়শীতে টোপ লাগাচ্ছে। বড়শী ফেলুক—তারপর—ঐ ত ঐ আমার দিকে চাহিয়াছে।

"ঠাকুর! ও ঠাকুর"

ঠাকুরের কণ্ঠ যেন শুক্‌না ছিল ঢোক গিলিয়া কষ্টে উত্তর করিল 'হা'।

"ঠাকুর! ও ঠাকুর! তুমি ঘাটে কি কর! মাছ ধর, না আর কিছু?

ঠাকুর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিল "ঠাকুর! ও ঠাকুর! কি চাও, বলত শুনি।"

ঘাটে আর কেউ ছিলনা। বড়শীতে তখন মাছ টোপ খাইতেছিল। রুই মাছ বুঝিয়া টান দিল, একটা রুই মাছ উঠিয়া আসিল। ঠাকুর মাছটা মাটীতে ফেলিয়া তার মুখের উপর চক্ষু দুটী রাখিয়া কহিল "আমি—আমি আমি তোমাকেই চাই। তোমারই সাধনা করি। আমি তোমাকে লইয়া ঘর করিব। দেবীর সেবা করিব। এই বার বচ্ছর রাত্রি জাগিয়া তোমার রূপ ধ্যান করিয়া যে বিরহের উচ্ছ্বাস গাঁথিয়াছি ও গাহিয়া সেই কবিতার কাঁড়ি তোমায় শুনাইব। চল, আমি আর কিছু চাইনা, কেবল তোমায় চাই।

"চাও ঠাকুর? আমি যে ধোপানী। আমার নাম রামী ধুপানী।"

"হোক তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি তোমাকেই চাই। আমি চণ্ডীদাস।"

ইহার পর নদীতে আর কেহ বড়শী শিকারীকে দেখে নাই।

বাঙ্গালির অন্তঃপুর।

ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি পুরুষ-সমাজে যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বাঙ্গালি মহিলা সমাজেও ধীরে ধীরে বহু বিষয়ে সেইরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই সকল মহিলাগণের আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে অন্তঃপুরেও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিয়াছে।

আমরা বাঙ্গালির অন্তঃপুর তিন ভাগে বিভক্ত করিব। দেশীয় খৃষ্টানগণের অন্তঃপুর, দেশীয় ব্রাহ্ম মহিলাগণের অন্তঃপুর, এবং হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুর।

দেশীয় খৃষ্ট সমাজের অন্তপুর অধিকাংশ স্থানে বিশেষতঃ উচ্চস্তরে অবিকল ইংরেজ মহিলাগণের রুচি প্রবৃত্তির অনুরূপ গঠিত। দেশীয় ব্রাহ্মগণ হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলেও তাঁহারা অনেক স্থলে ইউরোপীয় সমাজেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের উচ্চস্তরে অন্তঃপুর শব্দের প্রয়োগ করিলে হিন্দু সমাজের অন্তঃপুর অর্থ প্রকাশ পায় না। উচ্চস্তর সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের ছন্দানুবর্ত্তী।

দেশীয় খৃষ্টান সমাজ এবং দেশীয় ব্রাহ্ম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তঃপুর বহু পরিমাণে হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরের একই ভাবাপন্ন। বরং অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে।

ইয়োরোপীয় সমাজের ছায়া প্রথমতঃ দেশীয় খৃষ্টান সমাজের উপর পড়িয়াছিল তৎপর ব্রাহ্ম সমাজের উপর। ব্রাহ্ম সমাজ প্রকৃতিতে এবং দেশের অবস্থা গুণে বহু পরিমাণে হিন্দু ভাবাপন্ন হইলেও ইয়োরোপীয় আদর্শের দিকে হেলিয়া আছেন। ইহাদিগের অন্তঃপুরে নানা আকারে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে।

আমরা উক্ত উভয় অন্তঃপুরের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব না। হিন্দু সমাজে বাঙ্গালির অন্তঃপুরে গত এক শতাব্দীর মধ্যে প্রধানতঃ যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহারই আভাষ প্রদান করিব।

বাঙ্গালির অন্তঃপুর বলিতে পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তঃপুর বুঝাইত ভাই ভাই নিকট সম্পর্কীয় পরিজনের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল না বা ঘটিত না,আমরা একথা বলিতে চাই না কিন্তু উহাতে সর্ব্বত্র স্নেহ মায়া মমতার কোমল স্পর্শ ছিল একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিলোপের সঙ্গে পূর্ব্বের সে ঘনিষ্ট এবং ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবের বিসর্জ্জন হইয়াছে। সে সুখের অন্তঃপুর আর ফিরিয়া আসিবার চিহ্ন দেখা যায় না। পুরুষ সমাজে ভারতবর্ষের এক প্রদেশের এক জাতির রাজ নৈতিক ভ্রাতার সঙ্গে অন্য প্রদেশের অন্য জাতির রাজ নৈতিক ভ্রাতার প্রীতি বন্ধনের বক্তৃতা এবং অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। এদিকে ঘরের ভাই যে পর হইয়া যাইতেছেন সে বিষয়ে অনেকেই দৃষ্টিপাত করেন না। এই অশুভ দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষে হিতকর নহে। মহিলাগণ অন্তঃপুরে অপ্রীতির যদি কোন বীজ বপন করেন তাহা হইতে পুরুষ সমাজের জন্য ও বিষ বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে তৎবিষয়ে কোনই

সন্দেহ নাই। বহু অন্তপুরে এরূপ দূষিত প্রভাবে বাঙ্গালি সমাজ কলুষিত হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালির অন্তপুরে আর সে প্রাচীন প্রকৃতির মায়া মমতা স্বরূপিনী পরিচারিকা নাই। "কেষ্টার" ন্যায় ভৃত্যের অভাবে বাঙ্গালি অন্তঃপুর যে রস শূন্য এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহাদের সকলেই উহা স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিরোধী নহে। বাঙ্গালির বহু গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতা আছেন বলিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এখনও আদর আছে। দেবতার ভোগের জন্য যাহা, তাহার শুচিতার প্রতি অন্তঃপুরিকাগণের কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি? এখন নূতন করিয়া কোথাও গৃহ দেবতার প্রতিষ্ঠা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু অন্তঃপুরে দেব আরাধনা, পূজা আহ্নিক এবং ব্রত বিধি উঠিয়া গিয়াছে। এই বিপর্য্যয়ে অন্তঃপুরের ধর্ম্ম ভাবের কি পরিমাণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। সে পূজা আহ্নিকরতা মাতামহী নাই, সে পুষ্প-শয্যাকারিণী বধূ বা কন্যা নাই, জপ মালা হস্তে সেই প্রাচীন বিধবাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহারা অন্তঃপুরের শুদ্ধান্তপুর নাম সার্থক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে অথিতিগণের তৃপ্তির জন্য অন্তঃপুরিকাগণের কি আগ্রহই না ছিল! এখন অন্তঃপুরে আথিতেয়তার প্রবৃত্তি দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। রন্ধনশালা বাঙ্গালির অন্তঃপুরের এক প্রধান স্থান। গৃহিণীগণ সে ক্ষেত্রে লক্ষ্মীরূপিণী এবং অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী ছিলেন। এখন অল্প স্থানেই আছেন, অধিক স্থানেই নাই। ইঁহাদের পদ তথা কথিত উড়িষ্যার শিখিধারী ব্রাহ্মণগণ কিম্বা গোরক্ষপুরের গোবর্দ্ধনেরা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে পরিবার পরিজনের স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও তৃপ্তির যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তৎবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

অন্নের সঙ্গে স্নেহ পরিবেশিত না হইলে সে অন্ন আকাঙ্ক্ষিতরূপ পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য বিধান করে না। মা এবং ভগ্নির হস্তের শাক অন্ন বেতনভুক পাচকের হস্তের পরমান্ন অপেক্ষা বহুগুণে সুস্বাদু এবং তৃপ্তিকর। পাচকগণের হস্তে পড়িয়া বালক বালিকাগণের কি ক্ষতি হইতেছে আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াও করিতেছি না।

অন্তঃপুরে আহারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বিহারেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন অন্তঃপুরে পূর্ব্বের ন্যায় অকপট কলহাস্য পরিহাস আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের দৈন্য এবং দুরবস্থা উহার প্রধান কারণ হইলেও আমরা অনেক স্থানে আত্মসর্ব্বস্ব এবং পাশ্চত্য ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া পারিবারিক সুখের মূলে সবলে কুঠারাঘাত করিতেছি। সামান্য "দশ পঁচিশ" খেলায় অন্তঃপুরে যে আনন্দের উদ্রেক হইত এখন "ব্রী" খেলায় তাহার শতাংশের একাংশ আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

স্বাস্থ্যেও অন্তঃপুর শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। সে কঠোর কর্ম্মপরায়ণা গৃহিণী নাই। অম্লান বদনে সহস্র জনে অন্ন পরিবেশন কারিণী অন্নপূর্ণা রূপিণী সে বধূমাতা বা দুহিতা নাই। আমরা যে ক্ষোভে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছি বর্ত্তমান যুগের যুবকেরা তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। প্রাচীন অন্তঃপুরে সামান্য বাতাসার পরিবেশনে যে আনন্দ ছিল বিস্কুট বা 'চা' তে তাহা পূর্ণ হইবার নহে। অন্তঃপুরে উল্লাসতরঙ্গিত হরিকীর্ত্তনের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে বাতাসার যে বৃষ্টি হইত তাহাতে কেবল রসনার তুষ্টি হইত তাহা নহে, আনন্দে দেহ মনকেও পুষ্ট করিত। অন্তঃপুরে রসের ভাণ্ডার পিতামহীর মুখে আর সে 'রূপকথা' শুনিতে পাওয়া যায় না। মুদ্রিত পুস্তকে সুন্দর অক্ষর এবং সুন্দর চিত্র থাকিলেও উহা পিতামহীর মুখের সে সস্নেহ লালিত্য কোথায় পাইবে? শিশুগণ এবিষয়ে অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধার মুখে এখন আর রামায়ণ মহাভারতের পাঠ শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি আবৃত্তি করিয়া গৃহে গৃহে যে মঙ্গলের সূচনা করিতেন তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া অন্তঃপুরে অনেক মহিলা পরসেবা এবং পর শুশ্রূষায় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন।

ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে নাটক নভেল এবং অতি তুচ্ছ গল্প গুচ্ছ স্থান পাইয়াছে। বহু পরিবারে সুশিক্ষার শুভ্র কিরণ প্রবেশ করিয়াছে একথা আমরা অস্বীকার

করিব না। শিশুগণ উহা হইতে মাতৃ হস্তে সুফল প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালি অন্তঃপুরের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় বিলাস পরতন্ত্রতা। আমরা সকল অন্তঃপুরকে এদোষে দোষী করিতে চাহি না। যে বিলাসে ইয়োরোপ মজিয়াছে এবং মজিতে বসিয়াছে, অশন বসন, আমোদ প্রমোদে সেই বিলাস বাঙ্গালি অন্তঃপুরকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। 'খীলার' স্থান, 'পিয়ারসন্ সোপ' এবং 'আমলা মেথির' স্থান নানা প্রকার এসেন্সে অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে অলঙ্কারে গৃহস্থের মূলধন থাকিত এখন বিলাসিতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অন্তঃপুরিকাগণ নিত্য নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণে স্বর্ণকারকে বহু অর্থ দক্ষিণা দিয়া স্বীয় অর্থের অপচয় ঘটাইতেছেন। দরিদ্র দেশে এরূপ অপব্যয় শোভা পায় না। ব্যসন বিলাস ইয়োরোপীয় ছন্দানুবর্ত্তিনিগণকে বেড়ীয়া ধরিয়াছে। সে স্পর্শ হইতে হিন্দু বাঙ্গালির অন্তঃপুর মুক্ত থাকিতে পারিতেছে না। শিশুর জন্য যে মাতা অর্দ্ধসের দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার অঙ্গে উচ্চ মূল্যের শাড়ী ও সেমিজ দেখিয়া হাস্য ও অশ্রু সংবরণ করা যায় না।

বাঙ্গালির অন্তঃপুর কোন্ পথে কি উপায়ে সুগঠিত করা যাইতে পারে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিগণের তাহা অতি গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালির অন্তঃপুরসংহিতা লিখিবার যোগ্য লোক দেখিতে পাইতেছি না।

ভারতে পারদ।

ভারতীয় রসশাস্ত্রে পারদের যে সকল যৌগিক পদার্থ বর্ণিত আছে তাহাদের বিষয় আলোচনা করাই আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কালের গতি অনুসরণ করিয়া আমাদের বক্তব্য পাঠকদিগের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বহির্দ্দেশে সম্ভবতঃ নেপালে, কুব্জিকা তন্ত্র রচিত হয়। তাহাতেই প্রথম ষড়-বিগ্র-জারণ পারদের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মদ্বীর্য্যেণ প্রসূতাস্তে তাবার্য্যা সূনকে বহি।
তিষ্ঠন্তি সংস্কৃতাঃ সন্তঃ ভস্মাষড়্ বিগ্রজারণাম্ ॥

উহাই বর্ত্তমান কালের ষড়্গুণ-বলি-জারিত পারদভস্ম বা মার্কুরিক সল্‌ফাইড (Hgs)।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিচরিত নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর নামক গ্রন্থে পারদের সহিত অষ্টধাতুর জারণ প্রক্রিয়া এইরূপ বর্ণিত আছে।

জাম্বীরকেন নবসার ঘনাম্লবর্গৈঃ
ক্ষারাণি পঞ্চলবণানি কটুত্রয়ঞ্চ।
শিগ্রূদকং সুরভি সূরণ কন্দ এভিঃ
সংমর্দ্দিতো রসনৃপ শ্চরতেষ্ট লোহান্ ॥

জম্বুরা লেবুর রস, নিষাদল, ঘন অম্লবর্গ ক্ষার পদার্থ, পঞ্চলবণ, তিন প্রকার কটু, শিগ্রুরস সুরভিসূরণকন্দ, এই সকলের দ্বারা পারদ মর্দ্দিত হইলে আট প্রকার ধাতব পদার্থের মধ্যে চরিয়া যায়।

এই প্রক্রিয়া দ্বারা পারদ সঙ্কর (amalgam) প্রাপ্ত হই। সেকালে উহাদিগকে জারিত ধাতু ও বলা হইত।

এই গ্রন্থে পারদ ভস্ম করিবার নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।

সম পরিমাণ সুবর্ণ ও পারদ মর্দ্দিত করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক, সোহাগা এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। সেই নষ্ট পিষ্ট অন্ধ মূষায় ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তুষের লঘুপুটে উত্তপ্ত করিতে হইবে। (১)

এই পারদ ভস্ম পরবর্ত্তীকালে স্বর্ণসিন্দুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে! ইংরাজীতে ইহাকে মার্কুরিক সল্‌ফাইড বলে (Hgs)।

এই গ্রন্থের অপর এক স্থলে পারদ, গন্ধক ও তাম্রের যোগে পর্পটিকা রস নামে একটী দ্রব্যের উৎপাদন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

এক পল পারদ, চতুর্থাংশ উদ্ভিজ্জ বিষ, সম ভাগ গন্ধক ও তাম্র চূর্ণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে।

---

(১) রসং হেমসমং মর্দ্দ্যং পীঠিকা গিরিগন্ধকম্।
ত্রিপদী রজনী রম্ভাং মর্দ্দয়েৎ টঙ্কণা দিনম্ ॥ ৫০
নষ্ট পিষ্টঞ্চ মূকঞ্চ অন্ধমূষ্যাং নিধাপয়েৎ।
তুষাগ্নিলঘু পুটং দত্ত্বা যাবদ্ভস্ম ন জায়তে ॥ ৩১

কজ্জলি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একপল গন্ধক প্রদান করত সেই চূর্ণকে লৌহ পাত্রে ঘৃত পক্ক করিবে। যেমনি দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইবে অমনি পুটে বা কদলী পত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে পর্পটিকা রস প্রস্তুত হইবে। (১)

এই প্রক্রিয়া দ্বারা তাম্র ও গন্ধকের এবং পারদ ও গন্ধকের দুই যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। উদ্ধৃত অংশে কজ্জলিকা নাম ও বর্ত্তমান। উহা কি বস্তু এ গ্রন্থে তাহা বর্ণিত নাই। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে চক্রপাণির ভানুমতী গ্রন্থে উহা বর্ণিত আছে, পরে দেখান যাইবে।

১০ম শতাব্দীতে বৃন্দ তাঁহার সিদ্ধ যোগ নামক গ্রন্থে পর্পটী তাম্র নামে পারদের এক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পারদ, গন্ধক, তাম্রচূর্ণ, মাক্ষিক সহিত পুটপাক বিধিতে পাক করিয়া মধু সংযোগে লেহন করিবে। ইহা সর্ব্ব রোগ হরণ করে। ইহাকে পর্পট রসায়ণ বলে। (১) ইহা দ্বারা তাম্র+গন্ধক, পারদ+গন্ধক এবং লৌহ+গন্ধকের যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া মিশ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। নাগার্জ্জুনের পর্পটিকা ও বৃন্দের পর্পট রস কিছু বিভিন্ন। সম্ভবতঃ আমাদের শরীরে উভয়ের ক্রিয়া সমান।

চক্রপাণি তাঁহার ভানুমতী গ্রন্থ খৃষ্টের ১১শ শতাব্দীতে রচনা করেন। এই গ্রন্থে কজ্জলি বা রস পর্পটি নামে পারদ ও গন্ধকের মিশ্র পদার্থের উল্লেখ আছে।

"একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক লও। দুইটীকে খলে মর্দ্দন কর। তাহাতে কজ্জলি বা রসপর্পটি প্রস্তুত হইবে।" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু কেমিষ্ট্রি ১ম ভাগ পৃঃ ৭১।

(১) সূতকস্য পলং গৃহ্য তুর্য্যাংশং সাজ্কুকং বিষম্।
তৎসমং গন্ধকং শুদ্ধং চূর্ণং কৃত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥ ৮৪
কৃত্বা কজ্জলিকা মাদৌ পলং দত্ত্বা চ গন্ধকম্।
ঘৃত পকক তচ্চূর্ণং পচেলায়স ভাজনে॥ ৮৫
যাবদ্দ্রবত্ব মায়াতি তৎক্ষণাৎ তং বিনিক্ষেপেৎ।
পুটে বা কদলী পত্রে নিক্ষং পর্পটিকারসং॥ ৮৬
(১) রস গন্ধক তাম্রাণাং চূর্ণং কৃত্বা সমাক্ষিকং।
পুট পাক বিধৌ পক্কং মধুনালোড্য সংলিহেৎ॥
সর্ব্ব রোগ হরশ্চৈতৎ পর্পটাখ্যং রসায়ণম্॥

এই কজ্জলি শব্দ বৃন্দ ও নাগার্জ্জুনের গ্রন্থে ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দ্রব্যকে ইংরাজিতে মার্কুরিক সলফাইড বলা হয়। কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ইহাকে ইথিওপের খনিজ পদার্থ ও বলা হয়।

একাদশ শতাব্দীর গোবিন্দ ভিক্ষু বিরচিত রসহৃদয়ে আমরা জারিত পারদের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। নিম্নে উহার প্রক্রিয়া উদ্ধার করা গেল।

[টীকা—রসে বিড়যোজন মাহ]

বিড় মধরোত্তর মাদৌ দত্ত্বা সূতস্য চাষ্টমাংশেন।
কুর্য্যাজ্জারণ মেবং ক্রম ক্রমাদ্বর্দ্ধয়ে দগ্নিম্॥ ৭ম পটল।

[পারদে বিড়প্রয়োগ বলা যাইতেছে]

উপরে ও নিম্নে বিড় স্থাপন করিয়া এবং পারদের অষ্ট মাংশের সহিত মিশাইয়া জারণ করিবে। অগ্নিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিবে।

বিড় কি পদার্থ তাহাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

[টীকা—বিড় বিধান মাহ]

সৌবর্চ্চল কটুকত্রয় কাজ্ঞী কাশীশ গন্ধ কৈশ্চ বিড়ৈঃ।
শিগ্রো রস শতভাব্যৈ স্তাম্র দলান্য পিহি জারয়তি॥
৭ম পটল।

বিড় বিধান বলা হইতেছে--

সোরা, কটুত্রয়, ফট্‌কিরি, হিরাকষ ও গন্ধক মিশ্রণে বিড় (পদার্থ) হয়। শিগ রসের দ্বারা ভাবিত তাম্র-খণ্ডও ইহাতে জারিত হয়।

এই বিড় পদার্থ হইতে গন্ধকদ্রাবক ও সোরাম্ল (নাইট্রিক এসিড) উৎপন্ন হইবে। এই দুই অম্লযোগে পারদ মার্কুরিক সলফেট ও মার্কুরিক নাইট্রেটে পরিণত হইবে। এই দুইটী উত্তপ্ত হইলে রক্ত বর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। ঐ রক্তবর্ণ পদার্থ মার্কুরিক অক্‌সাইড ও বেসিক মার্কুরিক সলফেটের মিশ্র। মার্কুরিক সল্‌ফাইড রক্তবর্ণ সম্ভবতঃ এই প্রক্রিয়া দ্বারা জাত রক্তবর্ণ পদার্থকে ও মার্কুরিক সল্‌ফাইডকে একই মনে করা হইত। এইগ্রন্থে আমরা শুক্ল, রক্ত, ও পীতবর্ণ রসেন্দ্র বীজের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

ইতিরক্তোঽপি রসেন্দ্রো বীজেন বিনা ন কর্ম্মকৃদ্ভবতি।
দ্বিবিধং তৎ পীত সিতং নিযুজ্যতে সিদ্ধয়েচ্ছ রসম্॥
৯ম পটল।

রসেন্দ্র বীজ ব্যতীত কোন রসকার্য্য সম্ভব নয়। সেই বীজ রক্তবর্ণ ও আরো দুই প্রকার, পীত ও শুক্ল বর্ণ, রস কার্য্যে নিয়োগ করিলে সিদ্ধ হয়। শুক্লবর্ণ বীজ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় বা পীতবর্ণ বীজ কাহাকে বলে তাহা বিশেষরূপে এ গ্রন্থে বর্ণিত নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর রসার্ণব নামক গ্রন্থের জারিত পারদের উৎপত্তি প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

কাসীস তুবরী সিন্ধু টঙ্কণ ক্ষার সংযুতঃ।
পূর্ব ভেষজ যোগেন সূতক শ্চরতি ক্ষণাৎ॥ ১১।২৪

"হিরাকষ, ফট্‌কিরি, সৈন্ধব ও সোহাগার সহিত পারদ সহজেই জারিত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা রস কর্পূর বা শ্বেত ভস্ম উৎপন্ন হয়। ইংরাজীতে উহাকে মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড বা ক্যালোমেল বলে। ইহাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত মদনান্তদেব সুরির রসচিন্তামণি গ্রন্থে শ্বেত ভস্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

সৈন্ধবং তোরিকাং সূতং কাসীসং লকুচদ্রবৈ।
বিমৃদ্য খল্বভাণ্ডস্থং সর্ব্বশ্লক্ষ্ণং দিনত্রয়ম্॥ ৭৬
হণ্ডিকায়াং তদারোপ্য কাষ্ঠ বহ্নি র্বিধীয়তে।
দিন ত্রয়েঽপ্যতি ক্রান্তে ভস্ম শ্বেত তরং ভবেৎ॥ ৭৭

সৈন্ধব, তোরিকা (ফট্‌কিরি ?) পারদ, হিরাকষ লকুচ বৃক্ষের রস দ্বারা তিন দিন মর্দ্দিত করিয়া ভাণ্ডস্থিত ধূলার মত পদার্থকে হাঁড়ি মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিতে হইবে। তিন দিন অতিক্রান্ত হইলে ভস্ম পূর্ব্বাপেক্ষা শুভ্র হইবে।

এই শ্বেত ভস্মই কপূররস বা রস কর্পূর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যশোধর বিরচিত রস প্রকাশ সুধাকরে কর্পূর রস নাম ও তাহার প্রস্তুত পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে। (১)

ষোড়শ শতাব্দীর রসপ্রদীপ গ্রন্থে আমরা রস কর্পূর নাম প্রাপ্ত হই। যথা—

গৈরিকং রস কর্পূরম্ উপলাচ পৃথক্ পৃথক্।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্বেত ভস্মের (বা রস কর্পূরের) উল্লেখ একাদশ শতাব্দীর রসহৃদয়ে ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় ঐ কালেও উহা প্রস্তুত করা হইত। তবে পরে উহার নানা প্রকার প্রস্তুত বিধি ও গুণাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রসরত্ন সমুচ্চয় গ্রন্থে ফট্‌কিরি পারদ জারণে সক্ষম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সা ফুল্ল তুবরী প্রোক্তা লেপাৎ তাম্রং চরেদয়ঃ। ৬২
শ্বিত্রাপহা নেত্রহিতা ত্রিদোষ শান্তি প্রদা পারদজারণীচ। ৬৩

ফুল্ল তুবরী (ফট্‌কিরি) লেপ দ্বারা তাম্র জারণ করে। ইহা শ্বেত রোগ নষ্ট কারী, চক্ষের হিতকারী, ত্রিদোষশান্তি প্রদায়ী এবং পারদ জারণকারী। ফট্‌কিরিদ্বারা উৎপন্ন পারদ ভস্ম শুভ্রবর্ণ মার্কুরিক সলফেট। ইহা অল্প উত্তপ্ত হইলে পীত বর্ণ ধারণ করে। সমধিক উত্তপ্ত হইলে রক্ত বর্ণ হইয়া পড়ে। শ্বেত বর্ণ মার্কুরিক সলফেট জল সংযোগে পীত বর্ণ চূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। ইহাও উত্তপ্ত হইলে রক্ত বর্ণ হইয়া থাকে। অতত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে তখন মার্কুরিক সলফেট প্রস্তুত হইয়াছিল! এই পীত বর্ণ পারদ ভস্মই রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল কজ্জলি (১) বা কৃষ্ণবর্ণ মার্কুরিক সলফাইড, রক্ত ভস্ম বা মার্কুরিক সলফাইড (২) ও মার্কুরিক অকসাইড (৩), শ্বেত ভস্ম বা কেলোমেল (মার্কিউরিয়স ক্লোরাইড) (৪), ও পীত ভস্ম বা মার্কুরিক সলফেট (৫) সেকালে প্রস্তুত করা হইত। এতদ্ভিন্ন পারদ ও অপরাপর ধাতুর মিশ্রণে জারিত ধাতু ও প্রস্তুত হইত।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

(১) বিমল সূতবরো হি পলাষ্টকং
তদনু ধাতু বটী পট কাংক্ষিকাঃ।
পৃথগিবাশ্চ চতুঃ পল ভাগিকাঃ
স্ফটিক শুভ্র পলাষ্ট সমন্বিতাঃ।
সহজলেন বিমর্দ্দ্য চ যাবকং
লবণ কার জলেন বিমিশ্রিতম্।
উদিত ধাতু গণস্ত চ মূষিকাং
হূরু রসং বিনিবেশয় তত্রবৈ।
তদনু কান্তিব যন্ত্র বরেণ তং
দ্বিদশ যাম মজাচয় বহ্নিনা। ইতি কর্পূর রসঃ।

(১) Hgs; (২) Hgs; (৩) Hgo; (৪) Hg_2cl_2; (৫) $Hgso_4$.

সাহিত্য সেবক।

শ্রী উমেশনারায়ণ চৌধুরী—১২৫১ সালে পাবনা জিলার অন্তর্গত ভারাঙ্গা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৮ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইনি পাবনা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। এণ্ট্রেন্স পড়িবার সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি পাঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাল্যকাল হইতে চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। প্রথম জীবনে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকরে প্রবন্ধ লিখিতেন। বর্ত্তমানে নব্যভারতে সময় সময় লিখিয়া থাকেন। "রামায়ণের সমালোচনা" ও "আর্য্যদিগের আদিম নিবাস" নামক দুইখানা পুস্তিকা লিখিয়াছেন। গীতা ও মহাভারত অবলম্বনে সম্প্রতি আর একখানা গ্রন্থ লিখিতেছেন। ইহার চেষ্টায় তাহার স্বগ্রামে একটী সাহিত্য সভা স্থাপিত আছে। ইনি জমিদারের ষ্টেটে ম্যানেজারের কার্য্য করেন।

বিষয় সুচী।

১।	তিব্বত অভিযান (সচিত্র) ...	১৩৭
২।	কীটভূক তরু (সচিত্র) ...	১৪২
৩।	প্রমাণ না বিশ্বাস	১৪৫
৪।	রামায়ণীযুগের রাজ্যশাসন ...	১৪৭
৫।	জর্ম্মাণ সম্রাট	১৫১
৬।	ব্যর্থ সাধনা (কবিতা)	১৫৪
৭।	স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ (সচিত্র) ...	১৫৪
৮।	শান্তি (কবিতা)	১৫৭
৯।	নবযুগের অবতার (সচিত্র) ...	১৫৭
১০।	বড়শী শিকারী (গল্প)	১৫৮
১১।	বাঙ্গালীর অন্তঃপুর	১৬০
১২।	ভারতে পারদ	১৬২

বাঙ্গালার ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কার গ্রন্থরূপে অনুমোদিত—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার

প্রণীত

বাঙ্গালির ভাষার ও গদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

"সারস্বত কুঞ্জ"

যাঁহারা মনে করেন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য শত বৎসরের নবীন সাহিত্য, তাঁহারা 'সাহিত্য কুঞ্জে' সহস্র বৎসরের প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের নমুনা পাঠ করিয়া সে ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। "সারস্বত কুঞ্জে" প্রতি শতাব্দীর গদ্য সাহিত্যের নমুনা ও পরিবর্ত্তনের ধারা বাহিক ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত

বাঙ্গালার প্রাথমিক যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদিগের চিত্রসহ তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য এণ্টিক কাগজে ছাপা সাধারণ সংস্করণ আট আনা, উৎকৃষ্ট আর্ট পেপারে ছাপা সিল্কের বাঁধাই এক টাকা।

সৌরভ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

Published by Keder Nath Mazumder, Research house Mymensingh
Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat art Press, Dacca.

মুস্কিল আসান বড়ী,
জ্বরের গলায় দড়ী।
২৪ বড়ী বার আনা,
খেয়ে কেন দেখ না॥

এস. রায় এণ্ড কোং
৯০। ৩এ হেরিসন রোড—কলিকাতা।

ময়মনসিংহের গৌরব প্রাচীন কবি—
৺ মুক্তারাম নাগ প্রণীত।
৺শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ।

ইহা দুইশত বৎসরের প্রাচীন ভক্ত কবি ৺ মুক্তারাম নাগের অমৃতময় লেখনী প্রসূত সরল সরস ছন্দে রচিত প্রেমাশ্রুপ্রবাহ কারিণী সঙ্গীত মালায় অনুরঞ্জিত কাব্য। এই পুস্তকে জগন্মাতার ত্রিদিবস ব্যাপিনী অর্চ্চনার গভীর তত্ব, হিমালয় পত্নী ও হিমালয় নন্দিনীর কথোপকথন বেভোলা ভোলানাথের হাস্যজনক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি দর্শনে পাঠক যুগপৎ প্রেমাশ্রু প্রবাহে ও আনন্দ সাগরে ভাসিবেন।

আমরা বহু অর্থব্যয়ে ও অনুসন্ধানে এই লুপ্ত প্রায় গ্রন্থের আহরণ করিয়া ময়মনসিংহবাসীগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। আশা করি প্রত্যেক জেলাবাসী এক খণ্ড ক্রয় করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট ১৬ খানি চিত্র সম্বলিত

মূল্য—কাপড়ে বাধাই ১৷৹
কাগজে বাধাই ১।৵৹

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযুধিষ্ঠিরনাথ উকীল—নেত্রকোণা।

সৌরভ সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত
বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক।

সচিত্র আদর্শ ভূগোল—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রায় দেড় শত চিত্রে পরিশোভিত। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য।
মূল্য ।৵১০ আনা।

বাঙ্গালা সহচর—৩য় শ্রেণীর জন্য। মূল্য তিন আনা।

ময়মনসিংহ সহচর ও ঢাকা সহচর—২য় শ্রেণীর জন্য
মূল্য দুই আনা।

আদর্শ গণিত—নিম্ন শ্রেণী সমূহের জন্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক ২৭শে আগষ্টের কলিকাতা গেজেটে অনুমোদিত ও ময়মনসিংহ ডিঃ বোর্ড কর্ত্তৃক পাঠ্য তালিকা ভুক্ত।
মূল্য পাঁচ আনা।

বাঁধাই মানচিত্র।

বাঙ্গালার ছোট মানচিত্র— ॥০
ময়মনসিংহের মানচিত্র— ॥০
ঢাকার মানচিত্র— ॥০
ঢাকা জেলার সিট ম্যাপ— ৵৫

বাঁধাই বড় মানচিত্র।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মানচিত্র— ২॥০
ময়মনসিংহের মানচিত্র— ২॥০
Bengal Presidency— ৩

আদর্শ ভূচিত্রাবলী।

এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভূচিত্রাবলী এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহাতে প্রায় চল্লিশখানা মানচিত্র আছে।
মূল্য দশ আনা মাত্র।

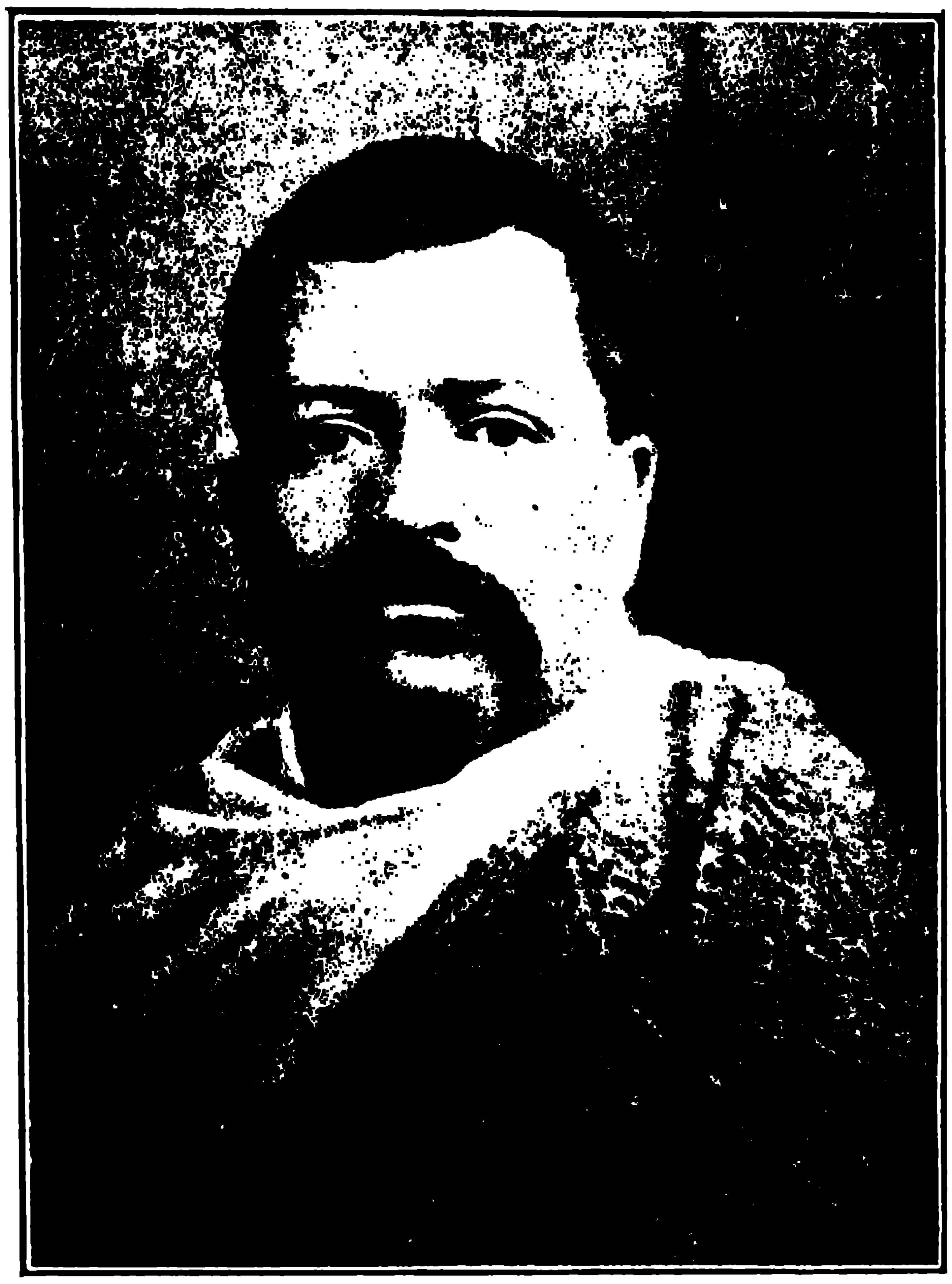

স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২১। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাচীন বঙ্গীয় রাজগণের মুদ্রা।

(ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টার মিঃ. এইচ্, ই, ষ্টেপলটন, এম,এ, বি, এস সি. লিখিত)

সম্প্রতি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্ত্তী এক গ্রামে ৯টী পুরাতন রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৩টী মুদ্রা জনৈক বিস্মৃত প্রায় প্রাচীন হিন্দু রাজার নামাঙ্কিত, সুতরাং ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান্। মধ্যযুগের বঙ্গীয় শাসন কর্ত্তা দিগের আমলের প্রাচীন মুদ্রা নিতান্তই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্যই 'সৌরভ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের অনুরোধে উপরিউক্ত ৯টী মুদ্রা সম্বন্ধীয় এই বিবরণী লিখিতে অতিশয় আনন্দ সহকারে স্বীকৃত হইয়াছি। যে সকল রাজার নাম অঙ্কিত আছে, তাহাদিগের শাসনকালের ক্রম অনুসারে মুদ্রাগুলির বর্ণনা করা গেল।

(১) সিকান্দরসাহ্, (সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ সাহর পুত্র) ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ইবন্ তোগলক কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ পুনরায় দখল হইলেও তাহার শাসনকাল দীর্ঘ স্থায়ী হয় নাই; কারণ তৎ কর্ত্তৃক যে সকল শাসনকর্ত্তা লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও ও সোণারগাঁও—বাঙ্গালার এই তিন প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অল্পকাল মধ্যে পরলোক গমন করেন অথবা নিহত হয়েন। যাহারা বল পূর্ব্বক বঙ্গদেশ করতলগত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও সাঙ্ঘাতিক বিবাদ চলিতে থাকে। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে বিবাদকারীগণ মধ্যে হাজি ইলিয়াস সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাজিত করিয়া সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ সাহ্ নাম গ্রহণে স্বয়ং বাঙ্গালার সুলতান পদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। হিজরী ৭৪০ হইতে ৭৫৮ সন পর্য্যন্ত সময়ের তাহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় (১৩৩৯—১৩৫৬ খৃঃ)। সামসুদ্দিনের পর তৎপুত্র সিকান্দর বাঙ্গালার সুলতান পদে অভিষিক্ত হয়েন। টমাস সাহেব প্রণীত Chronicles of the Pathan Kings of Delhi নামক পুস্তকের ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে হিজরী ৭৫০—৭৬০সনে ফিরোজাবাদ টাঁকশাল হইতে এবং ৭৫৬—৭৫৭ সনে সোণারগাঁও হইতে সিকান্দরের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত হইত। সুতরাং ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সিকান্দর তাহার পিতার জীবদ্দশায়ই নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্নবর্ণিত ১নং মুদ্রাটী ৭৮৪হিঃ সনের, সুতরাং বহু পরবর্ত্তী কালের।

১নং চিত্র ১ এবং ১' দ্রষ্টব্য।

সম্মুখভাগ।

১। আল-ওয়াতিখ্-বিতাইদ্

২। আল রহমান আবুয়াল-মুজাহিদ

৩। সিকান্দর-সা ইবন ইলিয়াস্

৪। সাহা অল সুলতান

মুদ্রার পার্শ্ব অস্পষ্ট, কেবল ইমাম্ আলীর নাম পড়া যায়।

অনুবাদ—দয়াবান্ পরমেশ্বর বিশ্বাসী যোদ্ধার পিতা, সিকান্দর সাহ সুলতান ইলিয়াস্ সাহ্‌র পুত্র।

পশ্চাদ্ভাগ।

১। ইয়ামিন

২। খালিফাত আল্লা নাসির

১নং চিত্র—সম্মুখ ভাগ।

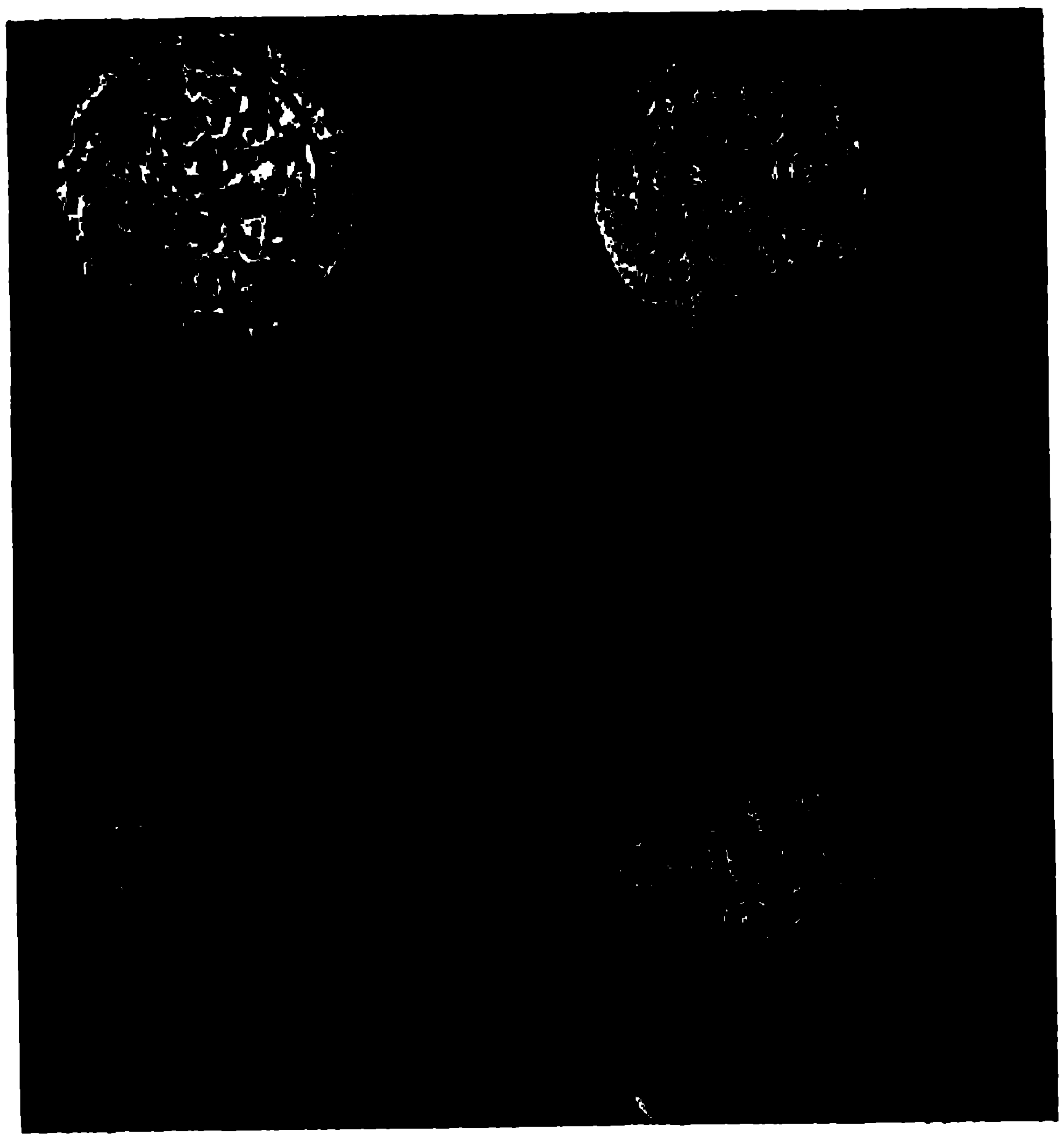

১নং চিত্র—পশ্চাদ্ভাগ।

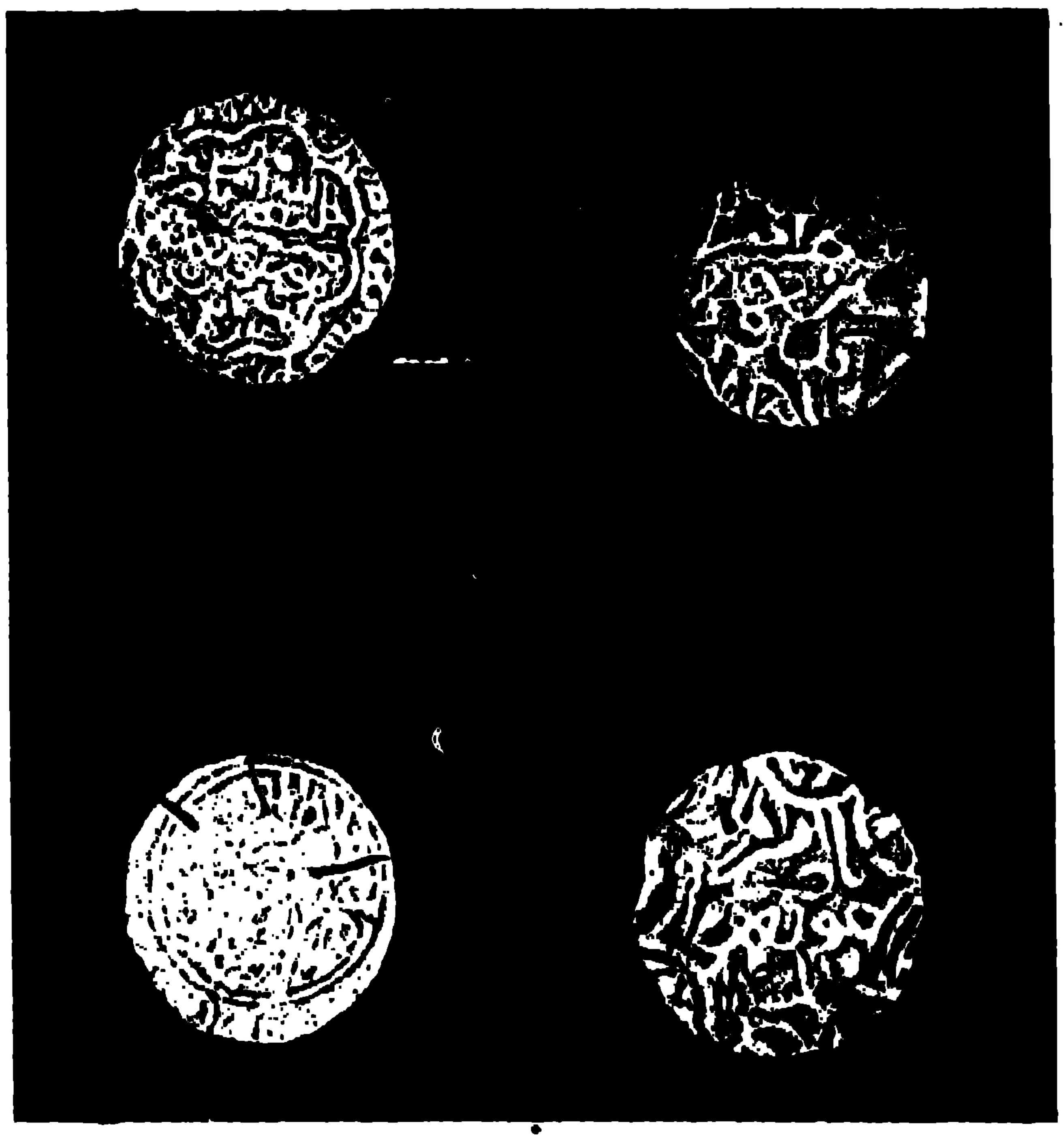

৩। অমর-অল-মুমিনিন ঘাউথ-অল ইছলাম

৪। ওয়াঅল মাছলিমিন খালাদত খিলাফাতুহু।

পার্শ্ব—ধরব হাদ অল-সিকা-অল মুবারিক সাহা অরবা ওয়া থামানিন ওয়া সবা মিয়াটিন।

অনুবাদ—ঈশ্বরের প্রতিনিধির দক্ষিণ হস্ত, বিশ্বাসীর নায়ক, ইছলাম ও মুসলমান দিগের সাহায্যকারী, ঈশ্বর তাহার খালিফী রক্ষা করুণ।

পার্শ্ব—এই প্রসিদ্ধ মুদ্রা ৭৮৪ হিঃ সনে (১৩৮২ খৃঃ)... ....প্রস্তুত।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কেটালগের ৫২ নং মুদ্রার সহিত এই মুদ্রাটীর সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইহা ফিরোজাবাদের টাঁকশালে প্রস্তুত হইয়াছিল, এক্ষণে টাঁকশালের নামটী উঠিয়া গিয়াছে।

রাজত্বের প্রারম্ভে সিকান্দর সাহ দিল্লীশ্বর ফিরোজ সাহার সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। একডালার দুর্গে তিনি অবরুদ্ধ হয়েন এবং পরিশেষে ৪০টি হস্তী দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া এবং বার্ষিক কর প্রদানে সম্মত হইয়া ফিরোজ সাহাকে বাধ্য করেন। এই আক্রমণের পরেও সিকান্দরের উদ্যমশীলতা ও সাহসিকতা ব্যর্থ হয় নাই।

পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর মধ্যেই তিনি কামরূপ আক্রমণ করেন ও তথায় নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন : (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কেটালগের ৩০নং মুদ্রা দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালার মসনদে ইঁহার সুদৃঢ় অধিষ্ঠানের পরিচয় স্বরূপ গৌড়ের সমীপবর্ত্তী পাণ্ডুয়ার আদানা মস্‌জিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ৭৭০ হিজরী সনে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। সিকান্দর ৭৯২ সন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ২০ বৎসর পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রিয় পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজমের সহিত একত্র মিলিত হইয়াই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রিয়াজ উস সালাতিনে লিখিত আছে যে তাহার পুত্রের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধক্ষেত্রে সিকান্দর হত হয়েন।

(২) গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ—পিতার জীবিত কালেই গিয়াসুদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এ বিষয়ের প্রমাণ কেবল তৎসাময়িক মুদ্রাগুলি নহে; পারস্য কবি হাফিজ তাহার নামে "সুলতান" উল্লেখে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতই ৭৯১ সনের পূর্ব্বে লিখিত, কারণ এই সনেই হাফিজের মৃত্যু হয়। রিয়াজ উস্‌ সালাতিনে' যে কাজির গল্প আছে, তাহা প্রায়শঃই উচ্চ ইংরেজী

বিদ্যালয়ের ব্যবহার্য্য ইংরেজী সংগ্রহ গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ গল্পাংশ হইতেই উপলব্ধি হয় যে গিয়াসুদ্দিন ন্যায়বান্ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ৭৭২ হইতে ৮১২ সন পর্য্যন্ত তাঁহার সময়ের মুদ্রা পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ৭৯৯ হইতে ৮১২ এই কয় বৎসরের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে না, ইহার কারণ কিছুই বুঝা যায় না। নিম্নলিখিত মুদ্রাটীর তারিখ যদিও উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি বোধ হয় ইহা এই মধ্যবর্ত্তী সময়ের কোনও এক বৎসরের হইবে, কারণ উহার সম্মুখ ভাগ ডাঃ ব্লকম্যান লিখিত History and Geography of Bengal শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধে (এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেল, ১৮৭৩, ২৮৭ পৃঃ) উল্লেখিত ৮১২ সনের মুদ্রাটীর অনুরূপ।

১নং চিত্র ২ ও ২´ দ্রষ্টব্য।

গিয়াসুদ্দিন আজম সাহের মুদ্রা :

সম্মুখ ভাগ।

১। গিয়াসুদ্দনিয়া

২। ওয়া অল দ্দিন আবু অল-মুজাফর

৩। আজম সাহ ইবন সিকন্দর

৪। সাহ অল সুলতান

পার্শ্ব—অস্পষ্ট

পশ্চাদ্ভাগ (গোলাকারে)

১। নাসির অল ইমাম অল-মুমিনিন

২। ঘাউথ অল ইছলাম

৩। ওয়া অল মছলিমিন

৪। খালাদ আল্লাহু মুলকহু

পার্শ্ব—মুদ্রাপ্রস্তুতের স্থান—সাতগাঁও ও মুদ্রাপ্রস্তুতের সময়ের একটী অঙ্ক (সম্ভবতঃ ৪) ব্যতীত আর সমুদায়ই অস্পষ্ট ও অপাঠ্য।

(৩) সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহ্

গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর (অথবা সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্ব হইতেই) বঙ্গে অরাজকতা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু পরবর্ত্তী ১০ বৎসর কালের ঘটনা পরম্পরা সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান অতি অল্প। নিম্ন বর্ণিত মুদ্রাগুলি হইতে বুঝা যায় যে ইলিয়াস্ সাহ্‌র বংশ প্রায় লোপ হইয়া যায়, তৎস্থলে সিহাবুদ্দিন নামক একজন মুসলমান এবং পরে জালাল-উদ্দিন মহম্মদ বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। এই জালালউদ্দিন মহম্মদ রাজা কংশ নামক এক হিন্দুর পুত্র। জালালউদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার ফলে তৎকালীন মুদ্রাতে দুইটী হিন্দু রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়কার ঘটনা সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক এতদ্বিষয়ক বহু মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন।

১নং চিত্রের ৩ এবং ৩´ দ্রষ্টব্য।

সিহাবুদ্দিন বায়াজিদের মুদ্রা :—

সম্মুখভাগ

(ক) কর্ত্তিত ও অস্পষ্ট তারিখযুক্ত

১। অল মুয়াইদ বিতাইদ অল-রহমান

২। সিহাবুদ্দিনিয়া ওয়া অল-দ্দিন

৩। আবু অল মুজাফর

৪। .. ..

পশ্চাদ্ভাগ (প্রায় অস্পষ্ট)

১। নাসির আমির অল মুমিনিন

২। ঘাউত অল ইছলাম

৩। ওয়া অল মুছলিমিন

পার্শ্ব—অস্পষ্ট।

১নং চিত্র ৪ এবং ৪´ দ্রষ্টব্য।

সম্মুখভাগ

(খ) চারিদিকে ষোলটী ছোট ছোট বেষ্টনীযুক্ত

(১) অল মুয়াইদ বিতাইদ অল-রহমান

(২) সিহাবুদ্দিনিয়া

(৩) ই-দিন আবু অল-মুজাফর

(৪) বায়াজিদ সাহ

(৫) অল-সুলতান

পশ্চাদ্ভাগ

চারিদিকে ৮টী বেষ্টনীযুক্ত রেখা পূর্ব্বোক্ত মুদ্রার ন্যায়। পার্শ্ব প্রায় অস্পষ্ট কিন্তু সময়—৮১৬ বলিয়া বোধ হয়।

৮১২ এবং ৮১৭ সনের তারিখ যুক্ত সিহাবুদ্দিনের মুদ্রারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

২নং চিত্র—সম্মুখ ভাগ।

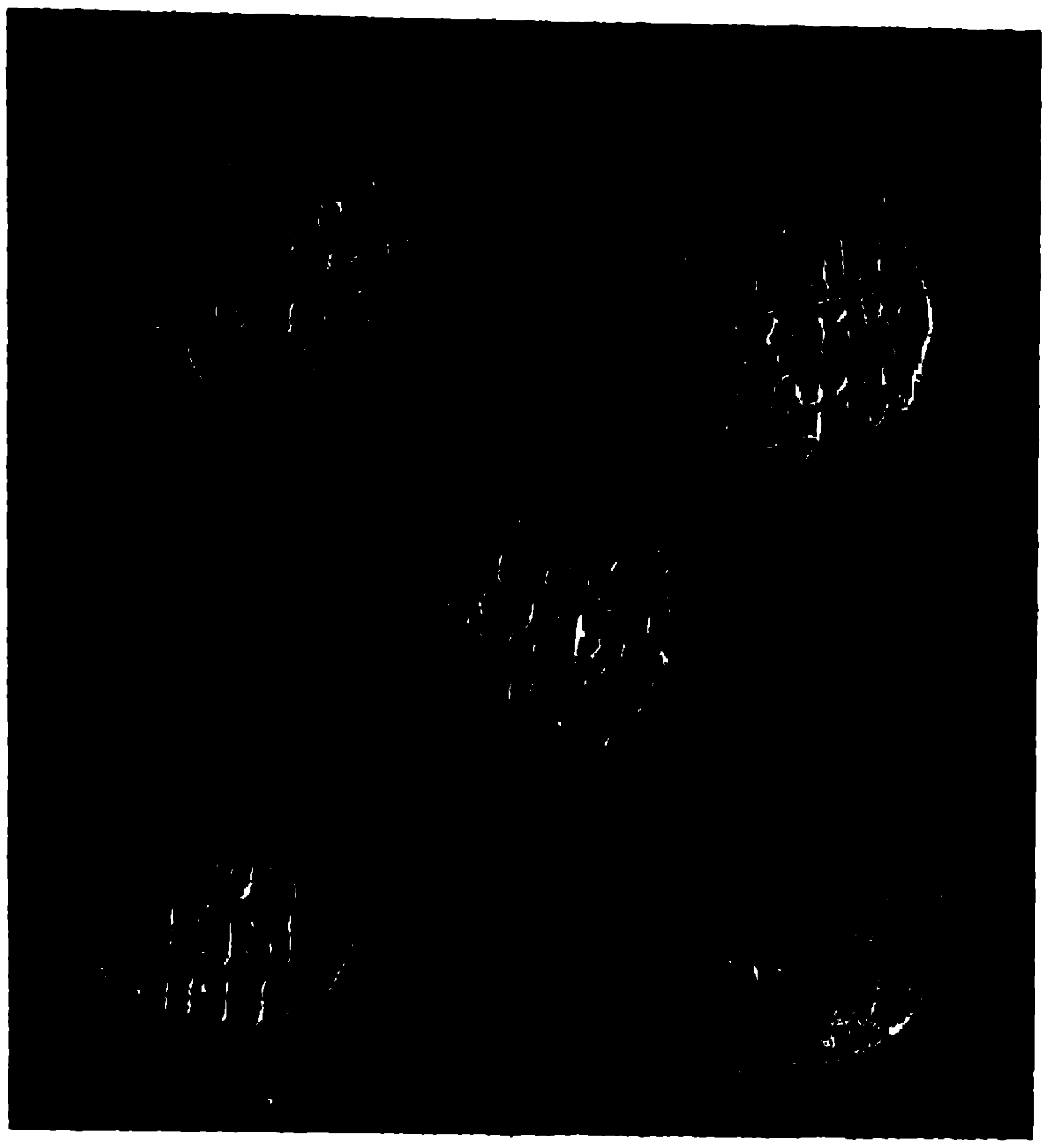

৯

২নং চিত্র - পশ্চাদ্ভাগ।

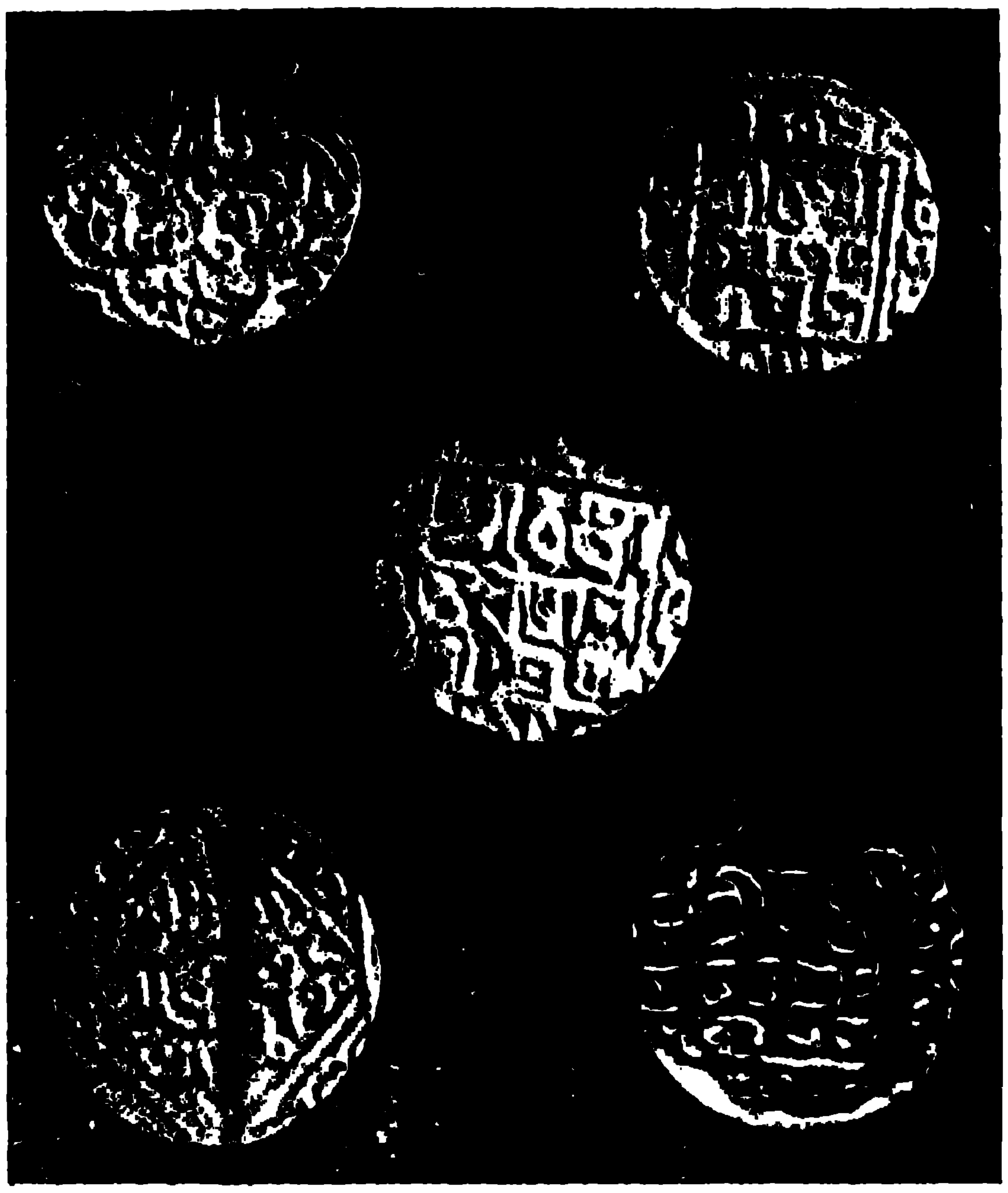

৯

(৪) জালালউদ্দিন মহম্মদ—প্রাচীন কাগজ পত্রে ইঁহার পিতৃপরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সিহাবুদ্দিনের ন্যায় ইনি অস্‌-সুলতান বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ইতিবৃত্তে ইঁহাকে ভাটুরিয়ার রাজা কংশের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজসাহী ও পাবনা জেলার সমগ্র ভূভাগে ভাটুরিয়ার স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কথিত আছে যে রাজা কংশ সমগ্র বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে থাকেন যে সিদ্ধ পুরুষ নূর কুৎবুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সারকিকে বাঙ্গালা আক্রমণ পূর্ব্বক অত্যাচারীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আহ্বান করেন। রাজা কংশ ইহাতে ভীত হইয়া পড়েন এবং সিদ্ধ পুরুষের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া জৌনপুর রাজের সহিত তাহার সন্ধি স্থাপন করিয়া দিতে প্রার্থনা করেন। রাজা কংশ মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ না করিলে সন্ধি স্থাপনে কুৎবুল আলম অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কংশ ইহাতে সম্মত হইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে তাহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র যদুকে ধর্ম্মান্তর করিতে আদেশ করিলেন। "কুৎবুল আলম তখন তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ যদুর মুখে দিলেন, তাহাকে কল্‌মা পড়াইলেন এবং জালাল উদ্দিন নামকরণ পূর্ব্বক তাহাকে মুসলমান করিয়া দিলেন। রাজার ইচ্ছানুসারে তিনি সহর ময় ঘোষণা করিয়া দিলেন নূতন রাজার নামে জুম্মার নেমাজ পড়িতে হইবে।" সুলতান ইব্রাহিম্‌ তৎপর বাধ্য হইয়া জৌনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই রাজা কংশ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। কথিত আছে যে বঙ্গের রাজপদলাভ করিয়াই তিনি জালালকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান। এজন্য তিনি বহু সংখ্যক স্বর্ণ নির্ম্মিত গাভী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল গাভীর মুখ গহ্বর দ্বারা জালালকে তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাৎ দ্বার পথে নির্গত করাইয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণগণকে ঐ সকল স্বর্ণগাভী বিতরণ করা হইয়াছিল। জালাল নব ধর্ম্মেই বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, এবং অল্পকাল পরেই রাজপদ লাভ করিয়া স্বর্ণ গাভী গুলির জন্য হিন্দুদিগের উপর ক্রোধ বহ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন এবং বল পূর্ব্বক গোমাংস ভক্ষণ

করাইতে লাগিলেন। যাহা হউক মোটের উপর ইহাই নিশ্চিত যে সিহাবুদ্দিনের পরে ৮১৮ হিজরী সনে জালাল উদ্দিন সিংহাসনারোহণ করেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মে তাহার অত্যধিক গোঁড়ামির দরুণ পূর্ব্ব বর্ণিত হিন্দুদিগের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

জালাল উদ্দিন মহম্মদের আমলের মুদ্রাঃ—

২নং চিত্র ৫ এবং ৫´ দ্রষ্টব্য।

(ক) সম্মুখ ভাগ চারিদিকে ১২টী বক্র রেখায় বেষ্টিত

১। জালাল
২। অল-দুনিয়া ওয়া অল-দিন
৩। আবু অল-মুজাফর
৪। মহম্মদ সাহ
৫। অল-সুলতান

পার্শ্বে কোন লেখা নাই।

পশ্চাৎভাগ

১। নাসির
২। অল-ইস্লাম
৩। ওয়া অল মছলিমিন
৪। খালাদ মুলকহু

পার্শ্বে— ৮১৮ হিজরা (১৪১৫ খৃঃ) জ্ঞাপক ΛIΛ অঙ্ক চিহ্ন ব্যতীত আর কিছু পড়া যায় না।

(খ) ২নং চিত্র —৬ ও ৬´ মুদ্রা দ্রষ্টব্য।

সম্মুখ ভাগ—

১। অল সুলতান
২। অল আদিল জালাল অল দুনিয়া
৩। ওয়াল দিন আবু
৪। অল-মুজাহিদ মহাম্মদ সাহ
৫। অল সুলতান

পশ্চাদ্ভাগ—

চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে ক চিহ্নিত মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে লিখিত লিপির অনুরূপ।

পার্শ্ব—মুদ্রার সময় সূচক প্রথম দুইটী অঙ্ক—৮১ ব্যতীত আর সমস্তই অস্পষ্ট।

(৫) দনুজমর্দ্দন দেব [এবং (৬) মহেন্দ্র দেব]

এই হিন্দু রাজদ্বয়ের মাত্র ৩টী মুদ্রা এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটী ১৩৩৯ শকাব্দা তারিখ ও রাজা দনুজমর্দ্দনের নাম যুক্ত খুলনা জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুর হইতে প্রাপ্ত। মুদ্রাটীর আবিষ্কার স্থান চন্দ্রদ্বীপের সমীপবর্ত্তী, এজন্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র ১৩১৯ সনের শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী" পত্রিকাতে লিখিয়াছেন যে চন্দ্রদ্বীপেই উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। অপর দুইটী মুদ্রা—একটী দনুজমর্দ্দনের ও একটী মহেন্দ্রদেবের; গৌড়ের ১২ মাইল উত্তরবর্ত্তী বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পাণ্ডুয়ার নিকটে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই দুইটী মুদ্রা সম্বন্ধে "প্রবাসী"র পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায়ই বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়" প্রদত্ত চিত্র হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। উভয় মুদ্রাই পাণ্ডু নগরে মুদ্রিত হইয়া থাকিলেও, মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাটীর তারিখ—

(১) ১৩৬ শকাব্দা। নিম্নলিখিত ৩টী মুদ্রার পাঠোদ্ধার হইতে বুঝা যায় যে দনুজমর্দ্দন ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দায় পাণ্ডু নগরে মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং ১৩৪০ শকাব্দায় আরও একটী পৃথক টাঁকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

দনুজমর্দ্দনের মুদ্রাঃ—

২নং চিত্রের ৭ এবং ৭´ মুদ্রা দ্রষ্টব্য

(ক) সম্মুখভাগে চক্রাকার—

১। শ্রীশ্রী দ
২। নুজ মর্দ্দ
৩। ন দেবস্য

পার্শ্বে—কোন লেখা নাই।

পশ্চাদ্ভাগে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে

১। শ্রীচণ্ডী
২। চরণ প
৩। রায়ণ

পার্শ্বে—নীচদিক হইতে পড়িলে—পা (নডু)। নগরাৎ। শকাব্দা। ১৩৩৯

২নং চিত্র ৮ ও ৮´ দ্রষ্টব্য।

(খ) লেখা উপরিউক্ত মুদ্রার অনুরূপ কেবল মুদ্রার তারিখ ১৩৩৯ স্থানে ১৩৪০

২নং চিত্র =৯ ও ৯´ দ্রষ্টব্য

(গ) সম্মুখ ভাগ উপরিউক্ত মুদ্রার অনুরূপ, কেবল ৩য় পংক্তিতে শেষ শব্দ 'দেব'।

পশ্চাৎ ভাগে—প্রথমোক্ত মুদ্রাটীর অনুরূপ কেবল সময় ১৩৪০, লেখার বামে না হইয়া দক্ষিণে লিখিত।

চতুর্দ্দিক কর্ত্তিত বিধায় কোন অক্ষর পড়া যায় না, এই মুদ্রার টাঁকশালের নাম অন্য দুটী মুদ্রা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয়।

১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দায় হিজরী ৮২০ ও ৮২১ সন হয়। ইহা বিশেষ বিবেচ্য যে উক্ত দুই বৎসরে ফিরোজাবাদ অর্থাৎ পাণ্ডুয়া হইতে মুদ্রিত জালাল উদ্দিনের কোনও মুদ্রা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ক্যাটালগে দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জালালউদ্দিন পাণ্ডুয়া হইতে এই সময়ে স্থানচ্যুত হইয়াছিলেন এবং দুইটী হিন্দুরাজার (খুব সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মীয়দ্বয়) সহিত বিরোধ ক্রমে রাজ্য পুনরায় অধিকার করেন। তৃতীয় মুদ্রাটীর পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে সম্প্রতি আমি বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু একথা বলিতে পারি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৃহে রক্ষিত যে বাসুদেবপুরের মুদ্রাটী অল্পদিন হয় আমি পরীক্ষা করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই চন্দ্রদ্বীপে মুদ্রিত হয় নাই। মাত্র প্রথম দুইটি অক্ষর পাঠ করা যায়, তাহা স্পষ্টই—"চা"। আমার সংগৃহীত একটী মুদ্রাতে টাঁকশালের স্থান চাটীগ্রাম বলিয়া অঙ্কিত আছে, ঐস্থানে জালালউদ্দিন মহম্মদের টাঁকশাল স্থাপিত ছিল (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ক্যাটলগ মুদ্রা নং ১১০—মিঃ নেলছন রাইট্ তাহা ৮৩৪ হিজরীতে চাটগাঁওএ মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। মহেন্দ্রদেবের পাণ্ডুয়ার মুদ্রাটী ১৩৩৬ শকাব্দায় মুদ্রিত বলিয়া রাখাল বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার সন্দেহ রহিয়াছে, কারণ মহেন্দ্রের যে সকল মুদ্রা আমি পাইয়াছি, সকল গুলিতেই ১৩৭০ শকাব্দা অঙ্কিত আছে। আমি অবগত হইলাম, এই মুদ্রাটী অধুনা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হস্তগত হইয়াছে, এবং আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আমি তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইব।

H. E. Stapleton.

মাননীয় লেখকের ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। (সৌঃ সঃ)

তিব্বত অভিযান।

লাসা প্রবেশ—সহর ও অধ্যান্।

লাসা বৌদ্ধ জগতের এক প্রধান তীর্থ। দলাইলামা এই তীর্থের জীবন্ত দেবতা। বৌদ্ধেরা ইঁহাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া মনে করেন। তাঁহার জন্ম নাই,

খাম্পাং মঠ হইতে লামারা শান্তি পতাকা হস্তে ইংরেজের নিকট আসিতেছে।

তিনি মৃত্যুর অতীত। তিনি যাহা বলেন, তাহা অভ্রান্ত, কেহই অমান্য করিতে সাহস করেন না। লাসায় প্রবেশ করিলে প্রথমেই এই দেবতার প্রাসাদের অত্যুচ্চ স্তম্ভ নবাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কইনদী অতিক্রম করিলে প্রথমে দুইটা পর্ব্বত দৃষ্টি গোচর হয়। একটির নাম 'লৌহ পর্ব্বত', অপরটী 'পটল পর্ব্বত' নামে পরিচিত। 'পটল' শব্দের অর্থ 'দলাইলামার প্রধান রাজ প্রাসাদ'। লামার রাজ প্রাসাদ ঐ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত বলিয়া উহার এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। নদীর পরই এই দুই পর্ব্বত, তাহার পর সহর। এইজন্য নদী হইতে সহর দেখা যায় না। নদীর দিক হইতে সহরে গমন করিতে হইলে পশ্চিম ফটক বা 'পর্গো কলীং' অতিক্রম করাই শ্রেয়স্কর। এই ফটকের পর সহরের

প্রায় সম্পূর্ণ দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হয়। বাম দিকে রাজ প্রাসাদ—ইহার প্রধান দ্বার। পর্ব্বতের যে স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ৩৫০ ফুট। ইহা অবিকল দুর্গের আকারে প্রস্তুত হইয়াছে। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর প্রাচীরের স্থানে ২ এমন ভাবে গুম্বজ করা হইয়াছে যে প্রয়োজনের সময় বড় ২ তোপ তাহার উপর সহজে রক্ষিত হইতে পারে। প্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলে পাঁচটি বৃহৎ গুম্বজাকার ছাদ। ইহাদের জন্য সমস্ত প্রাসাদকে লাল প্রাসাদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রাসাদের অপরাপর অংশের বর্ণ কিন্তু দুধের ন্যায় সাদা।

লাসা উপত্যকা—ডক্কা।

পটল এবং লৌহ পর্ব্বত একই পর্ব্বতের দুই ভাগ। উভয় পর্ব্বত এক স্থানে ঘোড়ার জিনের মত অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে নামিয়া আসিয়া আবার অর্দ্ধচন্দ্রের মত উঠিয়া গিয়াছে। এই জিনের এক দিককার পর্ব্বত লৌহ ও অপর দিককার পর্ব্বত পটল পর্ব্বত নামে পরিচিত। প্রথমটি পটল পর্ব্বত অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এই পর্ব্বত দুইটির পর সহরের বড় লোকদের বাগান বাড়ী সকল অবস্থিত। তাহার পর প্রকৃত সহর।

৪ঠা আগষ্ট আমরা সসৈন্যে লাসার সম্মুখে উপস্থিত হই। সন্ধি দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, আমাদের সৈন্য এবং অপরাপর সামান্য কর্ম্মচারী ভৃত্য প্রভৃতি কেহই সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু তিব্বতীয়েরা সন্ধির সর্ত্তানুসারে কাজ করিল না বলিয়া আমরাও উহা রক্ষা করিলাম না। তৎপূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময় লাসার সর্ব্বপ্রধান চীন কর্ম্মচারী অম্বান্ মহাশয় আমাদের শিবিরে আগমন করাতে আমাদের কর্ণেল সাহেব প্রায় ১০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া আজ প্রাতঃকালে অম্বানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ভিন্ন দেশীয় সৈন্যের লাসা প্রবেশ এই প্রথম।

পর্গোকীলং (পশ্চিম ফটক) পার হইয়া আমরা লাসার সর্ব্বপ্রধান রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইলাম। বৌদ্ধ জগতের ভিন্ন ২ স্থানের যাত্রীরা এই সহরে উপস্থিত হইয়া এই পথ দিয়া দলাইলামার প্রাসাদে গমন করে। আমরা সহরের বাগানবাড়ী সকল অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকারের অট্টালিকা ঐ পথের দুই দিকে দেখিতে পাইলাম। প্রধান ২ কর্ম্মচারীরা এই সকল স্থানে বাস করেন। এই সকল বাড়ীর নীচে বিপণি। শ্রেণী। বিস্ময়ের কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে কসাইর দোকানই অধিক। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান সহরের পবিত্রতম ব্যক্তির প্রাসাদের ঠিক সম্মুখে কসাইরা নির্ব্বিবাদে আপন কার্য্য করিতেছে! অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই সহরের সমস্ত কসাইই স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক কসাই সভ্যজগতের বোধ হয় আর কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সময় সহসা আমার দৃষ্টি রাজপ্রাসাদের উপর পতিত হইল। দেখিলাম, উহার সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ। ভিতরে যে কেহ আছে, তাহা বোধ হইল না। ঐ দিন শিবির ত্যাগ করিবার সময় আমরা শুনিয়াছিলাম যে, দলাইলামা গোপনে লাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রাসাদের অবস্থা দেখিয়া সংবাদটা নিতান্ত অলীক বলিয়া মনে হইল না।

ইহার পর আমরা এক প্রস্তর স্তম্ভের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। উহার উচ্চতা ১৪।১৫ হাতের কম নয়।

বেড় ৫।৬ হাত। মৃত্তিকার নীচেও যে অনেকখানি আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমস্তটা একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। উহার উপর পূর্ব্বে যে কিছু লিখিত হইয়াছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। আমাদের সাহেবেরা অনুমান করিলেন যে, ইহা অশোক স্তম্ভ। বারাণসী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে যে অশোক স্তম্ভ আছে, ইহা অবিকল সেই রকম বটে, তথাপি ইহা যে অশোক স্থাপিত, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিলাম না। তবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, অশোক প্রেরিত প্রচারকেরা তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই স্তম্ভ যদি অশোক নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি যে, এক সময়ে তাঁহার সাম্রাজ্য এই নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই স্তম্ভের নিকট হইতে রাজপথ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আমরা উত্তর দিককার পথ অবলম্বনে কিয়দ্দূর গমনের পর সহরের সাধারণ অংশে প্রবেশ করিলাম। বলা বাহুল্য—লাসা দুই অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশে রাজপ্রাসাদ, বড়লোকের বাগান বাড়ী ও আবাস ভবন; দ্বিতীয় অংশে সাধারণ লোকের বাস। এতক্ষণ পর্য্যন্ত পথের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু এইবার আমাদিগকে নিতান্ত বিকৃত মুখে রুমাল বাহির করিতে হইল। রাশি ২ ময়লা রাস্তার মাঝখানে রক্ষিত। রাস্তার উপর যে সকল বাড়ী অবস্থিত তাহাদের সমস্ত আবর্জ্জনা পথের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, উহা রাজপথ হইতে সরাইবার কোনও প্রকার বন্দোবস্ত নাই। প্রত্যহ বাড়ীর সম্মুখে ময়লা জমা করিলে ৪।৫ বৎসরে কি প্রকার হয়, তাহা অনুমান করা খুব সহজ। লাসার প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই এই অবস্থা। যেখানে বাড়ীর বহির্ভাগের অবস্থা এই প্রকার তাহাদের ভিতরকার অবস্থা যে নন্দন কানন নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহার পর আমরা চীনা পাড়ায় প্রবেশ করিলাম। রাস্তার অবস্থা প্রায় সেই প্রকার, তবে ততটা ঘৃণাকার জনক নয়। এ পাড়ার সমস্ত বাড়ী একতালা। অম্বান্ এইস্থানে বাস করেন। তাঁহারও একতালা বাড়ী, তবে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। আমরা উপস্থিত হইবা মাত্র অম্বান্ স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আমাদের সমস্ত প্রধান ২ কর্ম্মচারী দিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমাদের সম্মানের জন্য কয়েকটা ফটাকার আওয়াজ করা হইল এবং ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। অম্বান্ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইলেন। অল্পক্ষণ পরে সকলে এক প্রশস্ত হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

আমাদের লাসা প্রবেশ।

সজ্জিত চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জল যোগের আয়োজন হইল। কাহাকেও স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইল না। প্রত্যেক অতিথির সম্মুখে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র টেবিল স্থাপিত হইল। কয়েকজন চীনা চাপরাসী আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে এক পেয়ালা চা, এক একখানি ডিসের উপর দুইখানি বিস্কিট্ ও দুইটী নারিকেল সন্দেশ রাখিয়া গেল। চা পান করিতে গিয়া দেখি, উহাতে চিনি নাই। মনে করিলাম, হয়ত তাড়াতাড়িতে আমার চা'তে

চিনি দেয় নাই। এই সময় সহসা দৃষ্টি আমার সঙ্গীদিগের উপর পড়াতে দেখি, সকলেই বিকৃত মুখে চা পান করিতেছেন। আমি সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিলাম। অবসর বুঝিয়া চা'টা একদিকে ক্ষিপ্রহস্তে ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একজন চীনা কর্ম্মচারী আমার এই কুকর্ম্ম দেখিয়া ফেলিলেন। সে সময়ে তিনি এপ্রকার মুখ ভঙ্গি করিলেন যে, আমার মনে হইল বুঝি এখনি আসিয়া আমাকে প্রহার করিবেন। আমি কিন্তু নিতান্ত ভাল মানুষের মত আমার অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন সুবেদারের সহিত বিশেষ মনোযোগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়াদিলাম। জলযোগের পর চুরুট এবং সিগারেট দেওয়া হইল।

এইবার অম্বানের বিষয়ে দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিব। ইনি চীনের এক উচ্চ ও প্রাচীন বংশের সন্তান। আমরা যখন তিব্বতে গমন করি তখন চীন সম্রাটের জননীই সাম্রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি ইংরাজ জাতির প্রতি কখনও সদয় ছিলেন না। ইংরাজ তিব্বতে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতেছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। ইংরাজ যাহাতে লাসায় প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহার উপযুক্ত আয়োজন করিবার আদেশ দিয়া তিনি অম্বানকে লাসায় প্রেরণ করেন। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, তিনি যদি এই কর্ম্মে বিফল মনোরথ হন, তাহাহইলে তাঁহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইচ্ছা দলাই লামার ছিল না। শুধু অম্বানের বিশেষ উপদেশে তাঁহাকে এই কার্য্যে সম্মত হইতে হয়। অম্বান্ যদি ঐ সময় লাসায় না যাইতেন,তাহা হইলে আমাদের অভিযান লাসা পর্য্যন্ত যাইত না।

অম্বান্ নিজে অবশ্য এমন কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। জলযোগের পর কর্ণেল সাহেবের সহিত অম্বানের নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। অম্বান্ সমস্ত দোষ দলাই লামার উপর চাপাইলেন, এবং নিজে যে 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' তাহা নানা উপায়ে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কর্ত্তারা যদি ভিতরের কথা না জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে অম্বানের সমস্ত কথা অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তাহার পর সন্ধির কথা উঠিল। এতদিন সন্ধি হয় নাই বলিয়া অম্বান যে প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিলেন তাহাতে বুঝি পাষাণও গলিয়া যায়। লোকটার এই অদ্ভুত কপটতা দেখিয়া সাহেবেরা কি মনে করিলেন বলিতে পারি না, তবে আমি যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা আমি অস্বীকার করি না! আমাদের চলিয়া আসিবার সময় অম্বান পুনঃ২ বলিলেন যে, সন্ধি যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিবেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল।

"শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য প্রেমময় চরিত গ্রন্থ, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বিশ্বগোষ্ঠী গরিষ্ঠ পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শাস্ত্র ও প্রেম সমুদ্র মন্থন করিয়া কৃষ্ণ প্রেমরস পিপাসু ভক্ত মহানুভবগণের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য এই সঞ্জীবনী সুধা সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যের হিসাবেও এই গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য কাননের প্রস্ফুট পারিজাত। প্রেমময় চৈতন্য দেবের জীবনীগ্রন্থ মধ্যে এই গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান; যতদিন বঙ্গভাষার আদর থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুন্নত মন্দিরে চরিতামৃতের প্রেমময় নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব জ্ঞাপন করিবে! যমুনানিলকম্পিত, তরুপল্লব শোভিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রেমধাম বৃন্দাবনে বসিয়া গৌরহরির প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণদাস নিপুণ চিত্রকরের মত যে কোমল তুলিকা পাত করিয়াছেন, তাহার গুণে চৈতন্য চরিতামৃতের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রেমভক্তির এক অভিনব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-জনোচিত প্রভূত বিনয়, প্রেমভক্তির সুন্দর ব্যাখ্যা, প্রেমভক্তির সহিত দার্শনিকতার সংস্পর্শ

প্রভৃতি বিবিধগুণে প্রপঞ্চের মনোহর দৃশ্য পাই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত— এই দুইখানি গ্রন্থই চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। দার্শনিকতার সহিত প্রেমভক্তির পুণ্যময় সম্মিলনে এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবত হইতেও অধিকতর গৌরবশালী। চৈতন্য চরিতামৃত প্রেমিক ভক্তগণের অমূল্য সম্পদ। ইহার প্রশংসা বর্ণন মানব ভাষার অতীত। যে ইহা পাঠ না করিয়াছে, তাহার নিকট ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল দর্শকের মুখে শ্রুত হইয়া শারদ শশীর কমনীয়তা কদাচ জন্মান্ধের অনুভব গোচর হইতে পারে না। চৈতন্য চরিতামৃতের সমালোচনা মাদৃশ অনভিজ্ঞ লেখকের সর্ব্বথা অসম্ভব। বিশেষতঃ গ্রন্থ সমালোচনা এ প্রবন্ধের বহির্ভূত; কেবল মাত্র প্রবন্ধের মুখবন্ধে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ চৈতন্যচরিতামৃতের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

সংপ্রতি চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল নিয়া বৈষ্ণব সমাজে আন্দোলন চলিতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চৌদ্দ শত পাঁচপান্ন শকাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন, তাহার অন্তর্দ্ধানের চল্লিশ বৎসর পর অর্থাৎ চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন;—যথা প্রেমবিলাসের চব্বিশবিলাসে—

"চৌদ্দ শত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥"

এই চৈতন্য ভাগবতও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যময় লীলাগ্রন্থ, মহাপ্রভুর জীবনী গ্রন্থ মধ্যে প্রামাণিকতায় চৈতন্য চরিতামৃতের সমকক্ষ। এই চৈতন্য ভাগবত প্রথমতঃ চৈতন্য মঙ্গল নামে প্রচারিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য মঙ্গল নামেই ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

যথা—চৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে—

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥

* * * *

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তার আজ্ঞা লঞা দেখি যাহাতে কল্যাণ।
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তার কৃপাবিনে অন্যের না হয় প্রকাশ॥

বৃন্দাবনের মোহান্তগণ চৈতন্যমঙ্গলের চৈতন্য ভাগবত নাম প্রদান করেন।

যথা—প্রেমবিলাসের ঊনবিংশ বিলাসে—

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে মোহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥
ভাগবতের অনুরূপ দেখিয়া সকলে।
চৈতন্য ভাগবত নাম বলে কুতূহলে॥

কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তলীলা বিষদভাবে বর্ণিত না হওয়ায় বৃন্দারণ্য বাসী কতিপয় বৈষ্ণব মহাত্মার অনুরোধে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের করচা প্রভৃতিকে সূত্র করিয়া এবং দেশপূজ্য শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্টগোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্য গণের নিকট চৈতন্য লীলার পুণ্য কাহিনী অবগত হইয়া, কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। সুতরাং চৈতন্য চরিতামৃত যে চৈতন্য ভাগবতের পরে রচিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই।

যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল সম্বন্ধে লেখনী চালনা না করিতেন, তাহা হইলে পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনীষিগণ চৈতন্য ভাগবতের পর চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হইয়াছে, এই সাধারণ তত্ত্ব মাত্র অবগত হইয়া চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল নির্ণয়ে সমধিক কুতূহলাক্রান্ত থাকিতেন, কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণদাসই চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল নির্দ্দেশ করিয়া তত্ত্বান্বেষী পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। পরন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, লিপিকর প্রমাদ বশতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল নিরূপক কৃষ্ণদাস কবিরাজের মূল উক্তিও রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। আমরা হস্ত লিখিত প্রাচীন বহু পুস্তক

আলোচনা করিয়া দেখিলাম, সেই সেই পুস্তকে চরিতামৃতের রচনা কাল নির্ণায়ক শ্লোক দ্বিবিধ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আমরা দ্বিবিধ পাঠেরই উল্লেখ করতঃ প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

কোন কোন পুস্তকে —

শাকে সিন্ধগ্নি বাণে ন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যো হহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাংগ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাংগত॥

এই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। এই নির্দ্দেশ অনুসারে চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল হয়—১৫৩৭ শকাব্দ। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে—

"শাকেহগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাংগ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাংগতঃ॥"

এতাদৃশ পাঠের উল্লেখ আছে। এই পাঠ অনুসারে চৈত্যন্যচরিতামৃতের রচনা কাল হয় ১৫০৩ শকাব্দ। এই পাঠদ্বয়ের কোনটী সত্য, কোনটী মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সত্য নির্ণয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অধুনাতন বঙ্গ ভাষার কৃতী লেখকগণও চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল নির্ণয় ব্যাপারে ভ্রান্ত পথে পদার্পণ করিয়াছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রথমোক্ত শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ" এই মতের সমর্থন করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যানভিজ্ঞ দিগের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন। আশাকরি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভাবি সংস্করণে দীনেশ বাবু এই বিষয়ের মূলতত্ব অনুসন্ধান করিবেন।

প্রেম বিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস "শাকেহগ্নি বিন্দু বাণে ন্দৌ" এই দ্বিতীয় মতের পক্ষপাতী। তিনি নিজের রচিত প্রেম বিলাসের চব্বিশ বিলাসে—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দের যখন॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে॥"
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে॥

এই প্রকারে উল্লেখ করিয়া চৈতন্য চরিতা মৃত হইতে নিম্নলিখিত সময় নিরূপক শ্লোকও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"শাকেহগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাংগতঃ॥

'প্রেম বিলাস' প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ, প্রামাণিকতার হিসাবেও চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতের পরে প্রেম বিলাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ প্রেম বিলাসের মত উপেক্ষা করিবার সন্তোষ জনক কারণ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল ১৫০৩ শকাব্দ ধরিয়া লইতে সম্ভবতঃ কাহারও কোনও আপত্তি হইবেনা। নিত্যানন্দ দাস প্রেম বিলাসের বহু স্থানে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ ও তাঁহার রচিত চৈতন্যচরিতামৃতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের প্রশংসা বর্ণন উপলক্ষে প্রেম বিলাসে লিখিত হইয়াছে—

প্রভু রামানন্দ সঙ্গে যত প্রত্যুত্তর।
লিখিলেন কবিরাজ আনন্দ অন্তর॥
রস ভক্তি কৃষ্ণ তত্ব প্রেমের আখ্যান।
কতেক লিখিব তার যতেক প্রমাণ॥ ১৩ বিলাস
কৃষ্ণ দাস কবিরাজ যবে গৌড় দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥
একদিন ঝামটপুর নামে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥ ১৮ বিলাস

প্রেম বিলাসের অন্যত্রও লিখিত আছে.—

এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থানে চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত কয়॥ ১৯ বিলাস

সুতরাং চৈতন্য চরিতামৃত যে প্রেম বিলাসের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ অবিদ্যমান।

প্রেমবিলাসের রচনা কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সুখ কর হইবে এবং প্রথমোক্ত মত (শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ" যে, লিপিকর প্রমাদ তাহাও অনায়াসেই বোধ গম্য হইবে।

নিত্যানন্দ দাস ১৫২২ শকাব্দে "প্রেম বিলাস" প্রণয়ন করেন, ইহা প্রেম বিলাসের লেখা হইতেই জানা যায়। যথা—

"পনরশত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেম বিলাস॥ ২৪ বিলাস।

এই সম্বন্ধে প্রেম বিলাসের শেষে একটী শ্লোকও আছে ;—

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন পক্ষদ্বি তিথি সম্মিতে।
শাকে প্রেম বিলাসোঽয়ং ফাল্গুনে পূর্ণতাংগতঃ॥

১৫২২ শকাব্দের রচিত এই প্রেম বিলাসে চৈতন্য-চরিতামৃতের নাম ও রচনা কাল নির্দ্দিষ্ট থাকায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত ১৫২২ শকাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 'শাকেসিন্ধগ্নিবানেন্দৌ' এই পাঠ অসঙ্গত। এই পাঠ স্বীকার করিলে চৈতন্য-চরিতামৃত, প্রেম বিলাসের পরে রচিত হইয়াছে বুঝা যায়। তাহা হইলে প্রেম বিলাসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং চৈতন্যচরিতামৃতের নাম থাকা সঙ্গত হয় না। এই মতের সদসৎ বিবেচনার ভার সুধী পাঠক বৃন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কারণান্তরের অবতারণা করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। তিনি কর্ণানন্দ, গোবিন্দলীলামৃত, রসকদম্ব ও কৃষ্ণ কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রত্নদ্বারা বৈষ্ণব সাহিত্য ভাণ্ডারের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। গোবিন্দলীলামৃত,—চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ের রচিত সংস্কৃত গোবিন্দলীলামৃত নামক গ্রন্থের মূল অবলম্বন করিয়া পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ মাত্র।

কৃষ্ণকর্ণামৃতলীলা শুকমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের উক্ত কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সারঙ্গরঙ্গদা নাম্নী টীকার পয়ারাদি বিবিধছন্দে অনুবাদ। রসকদম্ব, শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ প্রণীত বিদগ্ধ মাধব নাটকের পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ। কর্ণানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী ও তদীয় পুত্রকন্যাদির বিবরণ এবং শাখাবর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ।

গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থত্রয় কোন সময় রচিত হয়, তাহার কোনরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলেও কর্ণানন্দের রচনাকাল গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রন্থকার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থিত বুধই-পাড়া গ্রামে থাকিয়া ১৫২৯ শকাব্দে বৈশাখের পূর্ণিমাতে কর্ণানন্দ রচনা করেন; ইহা কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্য্যাসে উল্লেখ আছে। যথা—

"বুধইপাড়াতে বসি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥

সেই কর্ণানন্দে যদুনন্দন দাস চৈতন্য চরিতামৃত ও প্রেমবিলাসের নাম উল্লেখ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত ও প্রেমবিলাসের রচনাকাল সম্বন্ধীয় যাবতীয় সন্দেহ দূর করিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ কিছু শুন একচিতে।
ব্যক্ত করি লিখিলেন চৈতন্য চরিতামৃতে॥
কর্ণানন্দ-সপ্তম নির্য্যাস।

যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা।
প্রেমবিলাস গ্রন্থমাঝে বিস্তারি কহিলা॥
লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবী আদেশে।
গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে॥
কর্ণানন্দ-ষষ্ঠ নির্য্যাস।

প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবী আদেশে।
রচিলেন প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দাসে॥
কর্ণানন্দ-সপ্তম নির্য্যাস।

চৈতন্যচরিতামৃত ও প্রেমবিলাস সম্বন্ধীয় বহু বিষয় যদুনন্দন দাস কর্ণামৃতে বিবৃত করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানু-সন্ধিৎসু পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, কর্ণা-নন্দের পূর্ব্বে প্রেমবিলাস ও প্রেমবিলাসের পূর্ব্বে চৈতন্য-চরিতামৃত রচিত হইয়াছিল।

প্রমাণ সহকারে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে,—১৫২৯

শকাব্দে যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দ ও ১৫২২ শকাব্দে নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে চৈতন্যচরিতামৃতের নানাবিধ সমালোচনা থাকায় চৈতন্যচরিতামৃত যে ১৫৩৭ শকাব্দে রচিত নহে, ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতেছে। চৈতন্যচরিতামৃত ১৫৩৭ শকাব্দে রচিত হইলে ১৫২২ শকাব্দের রচিত প্রেমবিলাসে এবং ১৫২৯ শকাব্দের রচিত কর্ণানন্দে তাহার নাম নির্দ্দেশ এবং সমালোচনা সর্ব্বথা অসম্ভব। অতএব "শাকেঽগ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ" (১৫০৩) এই পাঠই সুসঙ্গত। চৈতন্যচরিতামৃত ১৫০৩ শকাব্দেই রচিত হইয়াছিল। কি কারণে এই পাঠ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় দুষ্কর হইলেও আমাদের বোধ হয়, লিপিকর প্রমাদেই এই পাঠ বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

শ্রীবনমালী গোস্বামী বেদান্তরত্ন, সাঙ্খ্যতীর্থ।

পত্রের পাঠ।

কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে পত্র লিখিবার বহুবিধ পাঠ বিদ্যমান ছিল। এখনও একেবারে না আছে এমন নহে; তবে পূর্ব্বের ন্যায় অসংখ্য পাঠ নাই। পাঠের সংখ্যা ও বিচিত্রতা ক্রমেই কমিয়া গিয়াছে এবং উহার সম্বন্ধে বিচার বিবেচনাও লোপ পাইয়া আসিতেছে। এখন বাঙ্গলা ভাষায় তিন শ্রেণীর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়:—১ম, শ্রীচরণকমলেষু ও পরম পূজনীয়; ইহা পূজ্য ব্যক্তির নিকট লিখিত হয়। ২য়—সুহৃদ্বরেষু ও আত্মীয়বর, সমতুল্য ব্যক্তিকে লেখা যায়। ৩য়—কল্যানীয়েষু ও পরমকল্যানীয়, স্নেহভাজন কনিষ্ঠদিগকে লিখিত হইয়া থাকে। যাহারা ইংরাজী জানেন না, অথবা ইংরাজী জানিয়াও বাঙ্গালার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখেন, তাঁহারা প্রায়শঃ এই সকল পাঠ বা এইরূপ পাঠই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূজা, প্রীতি ও স্নেহের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ আছে, তাহা ইঁহাদের পাঠে ব্যক্ত হয় না। পূর্ব্বে কিন্তু পাঠে তাহা সবিশেষই ব্যক্ত হইত। পূজ্য হইলেও সকল পূজ্যের নিকটেই একরূপ পাঠ লিখিত হইত না। যিনি যেমন পূজ্য, তাঁহার নিকট সেইরূপ পাঠই লিখিত হইত। স্নেহ, আশীর্ব্বাদ, প্রীতি বা সখ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ বহুবিধ শ্রেণী ছিল, বহুরূপ পাঠ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে অনেক ভাল জিনিষ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অনেক ভাল জিনিষ মাটী করিয়া ফেলিয়াছে। 'পত্রের পাঠ' তাহারই একটি। এখন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী, My dear কি Sir অথবা কেবল অমুক বাবু লিখিয়াই পাঠের দায়ে অব্যাহতি পান। পত্রের পাঠে আগে যে ভক্তি, বিনয়, স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, সখ্য, গৌরব, সম্ভ্রম ও দৈন্য প্রকাশ পাইত, পরস্পরের মধ্যে ভাবের একটা সূক্ষ্মভেদ, একটা সূক্ষ্ম বিচার, সম্বন্ধের একটা সূক্ষ্মবোধ অভিব্যক্ত হইত, এখন আর তাহা হয় না। ইংরাজীতে, বাঙ্গালী সে সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করিতে পারিবে বা করিবে, কি করিবার প্রয়োজন অনুভব করিবে, সে আশা নাই। বাঙ্গালার কথাই বলি। পিতা পূজনীয়, খুড়া ও পূজনীয়, কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে পূজা বিষয়ে ভেদ আছে। পূর্ব্বে সে ভেদ টুকু কায়মনের মত বাক্যে—পত্রের পাঠেও প্রকাশ করা হইত। সে কালে খুড়ার নিকট যদি লেখা হইত—

সেবক শ্রীরাধাগোবিন্দ শর্ম্মণঃ প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন ঞ্চাদৌ—

তাহা হইলে পিতার নিকট লিখিত হইত:—

সেবক শ্রীরাধাগোবিন্দ শর্ম্মণঃ ভূমৌ নিপত্যে দণ্ডবৎ শতসহস্র প্রণামাঃ নিবেদন ঞ্চাদৌ—

"ভূমৌ দণ্ডবৎ নিপত্য প্রণামাঃ" লিখিতে বসিয়া বাস্তবিকই দণ্ডবৎ প্রণামের ভাব, ভক্তির একটা উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে উঠিত। তাহাতে পিতার মান বাড়ুক কি না বাড়ুক পুত্রের কল্যাণ হইত। এখন পিতার নিকটও যে পাঠ, খুড়ার নিকট ও সেই পাঠ, পাড়া-পরশীর নিকটও তাহাই। মনে পূজার বোধ কমিয়া আসিয়াছে, কাজেই তাহার ভেদাভেদের পাত্রগত পরিমাণের ভাবনা কাহার ও মনে উঠে না। সখ্য, বাৎসল্য, প্রীতি, দৈন্য ও বিনয় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

কিন্তু এ সকল ভাবের বিচার কিছুদিন আগে ও খুব বেশী ছিল। পত্রের পাঠের একটা বাঁধা নিয়ম

ছিল, কাহাকে কি লিখিতে হইবে তাহার একটা বিধি ব্যবস্থা ছিল। এখনও সকল ভাষাতেই অল্পাধিক এ সব বিচার আছে; গৃহধর্ম্মেও আছে, রাজকর্ম্মেও আছে। বাঙ্গালায় ও ছিল। হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষার রীতি ব্যবস্থা মানিয়া হিন্দুর নিকট, এবং পারশী প্রথানুসারে মুশলমানের নিকট পত্র লিখিতেন। মুসলমানেরা, তাঁহাদের আদব-কায়দা অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের নিকট পত্র ব্যবহার করিতেন। পত্রের পাঠেই সে কালের রাজা ও ভৌমিকগণের মুনসীদিগের পাণ্ডিত্য বা মুন্‌সী-আনা প্রকাশিত হইত। আমরা অন্নদামঙ্গলে দেখি বীরসিংহ রাজার সভায় চোরের পরিচয় লইতে মন্ত্রিগণ অকৃতকার্য্য হইলে—

"মুন্‌সী বলিছে আমি রাজার মুন্‌সী,
পরিচয় দেহ চোর ছাড়হ খুনসী।"

কিন্তু চোর ও সামান্য নহে। মুন্‌সীর এই ধমকেই সে 'খুন্‌সী' ছাড়িয়া পরিচয় দিল না। বরং পালটিয়া মুন্‌সীকেই জিজ্ঞাসা করিল :—

চোরবলে মুন্‌সী যদি পণ্ডিত হইবে।
জামাই হইলে চোর, কি পাঠ লিখিবে?

জামাই চোর হইলে তাহাকে কি পাঠ লিখিতে হইবে, ভারতচন্দ্র, সে কথা বলিয়া মুন্‌সীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যদি চোর-জামাইকে পত্র লিখিতেই হইত, তাহা হইলে মুনসী জীকেই সে পাঠ রচনা করিতে হইত, এবং সে পাঠও যে জামাই চোরের পক্ষে সমুচিতই হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদিও পাঠশালায় 'পত্র-দলিল শিক্ষার' অভাব নাই, তথাপি বলিতে হয়, একালে পত্র রচনা একটা প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় নহে। মনের ভাব যে কোন রকমে প্রকাশ করিতে পারিলেই একালের পত্র লিখিত হইতে পারে। কিন্তু সেকালে পত্র-রচনা লিখিত হইত। কাব্য-রচনার মতই পত্র-রচনার কলা-কৌশল প্রদর্শিত হইত। এই কলা-কৌশলের মুসলমান আমলের নাম ছিল 'মুন্‌সী আনা'। মুন্‌সী-আনা সহজ লভ্য ছিল না। কিন্তু উহা না থাকিলে কেহ রাজা, নবাব বা ভুঞাদিগের সরকারে মুন্‌সীর পদ প্রাপ্ত হইত না। মুনসী-খানা বলিয়া জমিদার দিগের স্বতন্ত্র একটা সেরেস্তা ছিল। এই সেরেস্তা হইতেই পত্র লিখিত হইত। এখনও সকল জমিদারের সরকারেই মুনসী-খানা আছে, কিন্তু মুনসী-আনা অনেক স্থলেই নাই।

আটীয়া পরগণার ৯ম ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় সাদত আলী খাঁ সাহেব, যাঁহার নিকট যেরূপ পাঠ লিখিতেন, করটীয়ার মুনসী খানায় উহার একখানি খাতা পাওয়া গিয়াছে। এই খাতা হইতে ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে আটীয়ার মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরে যেরূপ আদব-কায়দা প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ আটিয়ার পাঠান জমিদারগণ সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট যেরূপ পাঠে পত্র লিখিতেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্র পাঠের মধ্যে সে কালের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সম্পর্ক ও বন্ধুতার গাঢ় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সাদতআলী-খাঁ, পাঠান হইলেও কাগমারি (সন্তোষ), অলোয়া, কাশিমপুর, রোওয়াইল, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের হিন্দু জমিদার দিগের সহিত ভাই, ভাতিজা প্রভৃতি সম্পর্কে সম্বদ্ধ ছিলেন। আপনার শোণিত সম্পৃক্ত স্বজন গণের মতই এই সকল জমিদার দিগের নিকট সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতেন। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে দেখি, কাজিসাহেব, বিশ্বম্ভর মিশ্রকে বলিতেছেন –

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয়েন মোর চাচা,
দেহ সম্পর্ক হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা।"

সে কালে হিন্দু ও মুসলমান, দেহ সম্পর্ক হইতে ও গ্রাম সম্পর্ককে অধিক বলিয়া মনে করিয়া পরস্পরের আত্মীয় হইত। রক্ত সম্পর্ক না থাকিলেও ভালবাসার সম্পর্ক পাতাইত। এই পাতান সম্পর্কও ধর্ম্ম-প্রথায় রক্ষা করা হইত। সে কালে হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ ভাব ছিল না, পর বোধ ছিল না। হায়, আমাদের সে দিন কেন গেল?

সাদত আলী খাঁ সাহেবের পত্র-পাঠ, পারশী ভাষার সহিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মিশ্রণে রচিত। এই পারশী-বাঙ্গলা-সংস্কৃতের মিশ্রপাঠ, বাঙ্গালার এক যুগের ভাষার নমুনা। আমরা এই ভাষায় এখনও দলিল লিখিয়া থাকি। মুসলমান সমাজে এখনও এই ভাষায় পত্র লিখিত হয়। সুতরাং ভাষার ইতিহাসে এই পাঠ গুলির মূল্য অল্প নহে। কোন্ মুন্‌সী এই সকল পাঠের এই পারশী শব্দের সহিত 'সু' এবং 'বিশেষ' ও

অত্রানন্দ প্রভৃতির মিলন ঘটাইয়াছিলেন. আমরা তাঁহার নাম জানিনা। কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তাঁহার যুগ, মিলনের যুগ ছিল, ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গমে সেই যুগে হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া যাইতেছিল, ইহা বুঝাযায়।

সাদতআলা খাঁ সাহেব যাঁহার নিকট যেরূপ পাঠ লিখিতেন নিম্নে উহা প্রদর্শন করিতেছি। বলা বাহুল্য ইহা করটীয়ার পত্র পাঠের খাতা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

যাহার নিকট—	গর্ভ—	শিরোনামা
১। শ্রীযুত চৌধুরী হোসেনউদ্দীন সাহেব। মোঃ বলিয়াদী।	আদাব তছলিমাত হাজার হাজার আরজ্জাদৌ হুজুরের জনবাশীর্ব্বাদে এজনার খএর বিশেষ।	বহুজুর ফয়েজ গঞ্জুর বন্দেগান আলীশান জনাব শ্রীযুত চৌধুরী হোসেন উদ্দীন সাহেব কেবলা আলী জনাবেষু।
২। শ্রীযুত সৈয়দ নজীবদ্দী হোসেন চৌধুরী। মোঃ বগুড়া।	দোওা বহুত বহুত আপনার খএর খুশি এলাহির দরগায় সোনাজাত করি যাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ।	বরখোরদার বখত বেদার নুরন আপহার শ্রীযুত সৈদয় নজীবদ্দী হোসেন চৌধুরী, দামাদ বাবাজীউ ওল ওমরাহু ওকন্দরহু।
৩। শ্রীযুত খোদানেওাজ চৌধুরী মোঃ শ্রীফলতলী।	দোওা বহুত বহুত আপনার খএর খুবি এলাহির দরগায় সোনাজাত করি যাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ।	বেরাদর আজিজল কদর শ্রীযুত খোদা নেওাজ চৌধুরী বেরাদরজীউ আজিজল কদরেষু।
৪। শ্রীযুক্ত মহম্মদ মজাফর চৌধুরী সাহেব। মোঃ দিনাজপুর।	সেলাম নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।	বখেদ মতে ওয়ালা কদর আলি-শান শ্রীযুত মহম্মদ মজাফর চৌধুরী সাহেব। খেদমতেষু।
৫। শ্রীযুতা জাহ্নবী চৌধুরাণী সাহেবা। মোঃ সন্তোষ।	কদরদানীয়ায়েষু।	ওয়ালাকদর কদরদানীয়া বেলায়ান শ্রীযুতা জাহ্নবী চৌধুরাণী সাহেবা কদরদানীয়ায়েষু।
৬। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী সাহেব মোঃ সন্তোষ	কদর দানেষু	ওয়ালা কদর কদরদান শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী সাহেব কদরদানেষু
৭। শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী শ্রীযুতা দিনমণি চৌধুরাণী মহাশয়া	ওয়ালা মরাতবেষু	ওয়ালা মরাতব মঞ্জনত সেনাছ শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী ওয়ালা মরাতবেষু।
৮। শ্রীযুত বাবু হরনাথ রায় চৌধুরী ভাই শ্রীযুতা ব্রজমোহিনী চৌধুরাণী মোঃ অওলা।	মেহেরবানেষু	মোসফেক মেহেরবান ও কদর দান শ্রীযুত বাবু হরনাথ রায় চৌধুরী ভাই মেহেরবানেষু

৯। শ্রীযুত বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ জীউ মোঃ পাঠন্দ ছোট তরফ	আজিজল কদরেষু	আজিজল কদর শ্রীযুত বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ জীউ আজিজল কদরেষু
১০। শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মোং বালিয়াটী	দোওা বহুত বহুত বিজ্ঞাপঞ্চ আগে	এজ্জতাছার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী
১১। শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মোঃ মুক্তাগাছা	সেলাম নিবেদন মিদং	বহোছনে মোতালয়ে শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়
১২। শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায় বাহাদুর মহাশয় কলিকাতা।	সেলাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ ঃ	মোসফেক মেহেরবান শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর রায় বাহাদুর মহাশয় মেহেরবানেষু
১৩। শ্রীযুত মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর সাহেব। মোঃ সুসঙ্গ।	আদাব তছলীমাত বহুত বহুত নিবেদনঞ্চ বিশেষ ঃ—	বনজরে ফয়েজ গোস্তার শ্রীযুত মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর সাহেব খেদমতেষু।
১৪। শ্রীযুত বাবু সুধেন্দুমোহন রায় ভাতিজা মোঃ রোওয়াইল।	আজিজল কদরেষু। (আপনে শব্দ ব্যবহৃত হইবে)	আজিজল কদর শ্রীযুত সুধেন্দুমোহন রায় ভাতিজা আজিজল কদরেষু
১৫। মুক্তাগাছা। শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী	সেলাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ ঃ - (এই পাঠ মুক্তাগাছার সকলের নিকট)	বাহাছনে মতালয়ে শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় মতালয়েষু
১৬। বালিআটী। শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী	সম্ভ্রান্তবরেষু (এই পাঠ বালিআটীর সকলের নিকট)	সম্ভ্রান্তবর শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী সম্ভ্রান্তবরেষু
১৭। ভাওয়াল। শ্রীযুত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	ছাদতমন্দেষু	ছাদতমন্দ একবাল নেশান শ্রীযুত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর বাবাজীউ ছাদতমন্দেষু।

১৮। কাশিমপুর।
শ্রীযুতবাবু শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী

দোয়া বহুত বহুত আপনার বর খোরদার বখত বেদার নুরল খএরাফিয়ত নিয়ত এলাহির সমীপে আবছার শ্রীযুত বাবু শ্যামাপ্রসাদ রায় প্রার্থনীয় যাহাতে সর্ব্বব শুভ　　চৌধুরী, ভাতিজা বরখোরদারেষু।

১৯। গয়হাটা।
শ্রীযুতা উদয়তারা চৌধুরাণী

দোয়া লিখনং　　সকল মঙ্গলালয়
বিশেষঃ　　শ্রীযুতা উদয়তারা চৌধুরাণী
সকল মঙ্গলালয়েষু

২০। এলাঙ্গা।
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দোওা বহুত বহুত　　ব মোতালে ছাদতমন্দ একবাল নেশান শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

কবিগান সংগ্রহ।

গত বৈশাখের "সৌরভে" শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় তাঁহার "মালীর যোগান" শীর্ষক প্রবন্ধে ময়মনসিংহের প্রচলিত কয়েকটী কবিওয়ালার গান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, "যদি কেহ এই সব গান সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট একখানা গীতিকাব্য রচিত হইতে পারে।" এই উৎসাহবাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া নিম্নে কয়েকটী গান সংগ্রহ করা গেল। যদি এই সব গান সেই সুমহৎ কার্য্য সাধনে কথঞ্চিত কার্য্যকরি হয়, তবে নিজকে কৃতার্থ বোধ করিব।

পূর্ব্বে ময়মনসিংহের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু প্রধান গ্রামেই সখের] কবির দল ছিল। ময়মনসিংহ-সমাজের শীর্ষ স্থানীয় জমিদারবর্গ এই সব দলের উৎসাহদাতা এবং মধ্যবিত্ত তালুকদার ও ভদ্র সম্প্রদায় ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রত্যেক দলেই নূতন নূতন গান হইত। একদল একটী গান গাহিলে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ঐ গানের জবাব বা উত্তর অন্য একটী পাল্টা গানদ্বারা দিতে হইত। এইরূপে অনেক সরস ভাবপূর্ণ গান ময়মনসিংহের পল্লীভবনে রচিত হইত। কালচক্রের বিবর্ত্তনে ও লোকের রুচি পরিবর্ত্তনে আজ সেই কবি-ওয়ালার আসর থিয়েটার ও বাইনাচের আসরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাবস্রোতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই বিলাস স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তাই আজ কবিওয়ালার আদর নাই; সুতরাং কবিগান ও লুপ্তপ্রায়। এখনও লোকমুখে বিভিন্ন গ্রামে যে সকল গান সচরাচর শ্রুতি-গোচর হয়, তাহারই কয়েকটী সংগ্রহ করা গেল।

ডাক্ মালসী।

(১)

হে মা তারা গো, তুমি কল্লে শিবে
জীবের অবিচার।
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হইয়ে
যমকে দিলে বিচারের ভার।
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, ব্রহ্মাণ্ড হয় তোমার প্রজা।
যম রাজা কি প্রজা নয় তোমার?
আমায় খাস তালুকে বসত করে,কর দিতে হয় যম রাজার।

(২)

তারা বলে ডাক্‌রে একবার, ওরে আমার মন উরপাখী,
দেহ পিঞ্জিরার কত ভরসা দেখ, ঐ আছে ঐ নাই।
মায়া ছিকল দিয়ে গলে, নিজ নামটী যাচ্ছ ভুলে হে,
গুরুর বাক্য হৃদে ঐক্য নাই।
সাধের পিঞ্জরা যখন, ভাঙ্গবে তখন, উপায় দেখি নাই॥

নিমাই সন্ন্যাস।

নদীয়া বিহারী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বা নিমাই মস্তক মুণ্ডন করতঃ ভারতী গোঁসাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণান্তর বাটীতে

শচীমাতার নিকট সন্ন্যাসে যাওয়ার বিদায় নিতে আসেন। তখনকার শচীমাতার করুণ ক্রন্দন কবি সরল ভাষায় গাহিয়াছেন—

(৩)

কাঞ্চননগরে গিয়ে, চাঁচর কেশ মুড়াইয়ে,
(কল্লেন) গৌরাঙ্গ করঙ্গ ধারণ।
শচী ব্যাকুল হয়ে, নিমাইর কাছে গিয়ে,
হইলেন ধরায় পতন।

ওরে নিমাইরে, নিমাইরে, তুইরে আমার সাধের ধন,
নিমাই সন্ন্যাসী তোরে কে সাজাইল, আমার সাধের ধন।
ও তোর চাঁচর কেশ কে মুড়াইল, ডোর কৌপীন কে পড়াইল
ওহে দণ্ডধারী!

সন্ন্যাসে যাবে নিমাই আমায় ছাড়ি?
হইল দীনের সে, দীনের অধীন আমায় ছেড়ে,
শোকে শক্তিশেল হেনে দিলে নিমাই বক্ষঃস্থলে,
এই ছিল আমার কপালে?

আমার কে আছে, যাই আমি কার কাছে, এমন লক্ষ্য নাই.
আমায় মা বল্‌তে কেউ নাই।
ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ে, প্রবোধ দিব আমি কি ধন দিয়ে,
কি ধন লইয়ে থাকব ঘরে, দেখব রে কার চাঁদ বদন।

ঝুমুর।

নিমাই তোর শোকেতে আমার মরণ।
যেমন সিন্ধুর শোকে অন্ধের পতন॥
ভারতী কি মন্ত্র দিল, সোণার নইদে আঁধার হল,
পুত্র শোকে, পাষাণ বুকে, দিয়ে গেলিরে জনমের মতন।
তোর শোকেতে আমার মরণ।

———

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর মুনির রথারোহণে, কর্ত্তব্যানুরোধে ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরায় যাত্রা করেন; তখন কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী গোপিগণ ও কৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা, ভাবী বিরহের আশঙ্কায় কিরূপ ব্যাকুলা হইয়া রথের অনুসরণ করিয়াছিলেন, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

(৪)

(যখন) কৃষ্ণ ব্রজ ছাইরে, অক্রূর মুনির রথে চইরে,
চল্লেন মথুরায়;
(তখন) গোপীগণ সব চক্র কইরে, মুনির রথের চক্র ধইরে,
চক্র ছারেনা;
তারা চক্রীর চক্র বুঝেনা।
কেউ বলে রাই হওগো শান্ত, হয় ধরিগে হবে ক্ষান্ত,
ইথে হয় যদি সই জীবনান্ত;
তবু কান্ত যেতে দিবনা।
কৃষ্ণ গোপীকার জীবন, কৃষ্ণ গোপীর জীবনের ধন হরি
অক্রূর তুমি নিওনা হে সেই ধন হরি।
ওহে অক্রূর মুনি, নিওনা নিলকান্ত মণি,
এই বলে রাই ধল্লেন রথে।
গোপীর মন রথের ধন, মদন মোহন,
কাষ্ঠ রথে কল্লেন গমন।
একি সর্ব্বনাশ, তোমার কি রীতিহে পীতবাস;
রথীর ধর্ম্ম লোকে বলে, প্রাণান্তেও রথ যায় না ফেলে.
তুমি (রাইর) যৌবন রথের কি দোষ পেলে;
তাঁতে রথ দিয়ে যাও বনবাস।
চড়ে আজ কাষ্ঠ রথে, কোথায় যাও কষ্ট পেতে,
ছি ছি বন্ধু! এই রথ কি যৌবন রথের তুলনা।
এস মনোরথে, চড়ে বন্ধু মুনির রথে,
কোথায় যাবে বল না!

———

প্রভাস যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্র সহ নারদ মুনি গোকুল নগরে নন্দালয়ে আসিয়া যশোদাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। পুত্রশোকাতুরা যশোদা গোপালের কণ্ঠস্বর বিবেচনা করিয়া নারদকে গোপাল জ্ঞানে বলিতেছেন:—

(৫)

যজ্ঞের পত্র নিয়ে নারদ গোকুলে উদয়।
মনের কি ছলে নন্দালয়ে গোকুলে,
মা বল বলে ডাকছে যশোদায়।
রাণী ভ্রান্তে ভুইলে, গোপাল বইলে,
স্বর্ণ থালে নিয়ে নবনী;
বলে খেয়ে যারে নিলমণি!

না হেরে তোর চন্দ্র বদন, যে কষ্টে রেখেছি জীবন,
চেয়ে দেখ বাপ জন্মের মতন ও যাদু মণি।
না হেরে তোর মোহন বেণু, ধেনু বৎস সব,
কেশব, ভেবে সে সব ধেনু, মথুরার পথ চেয়ে আছে;
এতদিনে নিল মণি তোর, মায়ের কথা মনে পড়েছে।
তোর শোকেতে কেঁদে কেঁদে নয়ন গিয়াছে।
(যেদিন) ব্রজ ছেড়ে, গেলিরে বাপ মধুপুরে,
সেইদিন অবধি, তোর শোকেতে অকূলে ভাসি;
না হেরে তোর চন্দ্র বদন, যে কষ্টে রেখেছি জীবন,
চেয়ে দেখ বাপ জন্মের মতন, অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে।
এতদিনে নিলমণি তোর, মায়ের কথা স্মরণ হইয়াছে।
যেদিন ব্রজছাড়ি, অক্রুর মুনির রথে চড়ি,
গেলে প্রভাসে, কেবল প্রাণ ছিল বাপ তোর আশে;
যার ছেলে তার কোলে দেখি, প্রাণের গোপাল বলে ডাকি,
মুখ পানে তার চেয়ে থাকি, মা বলে না সে।

ঝুমুর।

আর গোপাল আয়ঃ কোলে, একবার ডাকরে মা বলে।
(মামা) ছেড়ে যেওনারে বাপ, দিয়ে মনস্তাপ
(দিয়ে) দুঃখিনীরে বিসর্জ্জন জলে॥

এই সব গান সংগ্রহ করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। এবং অনেককে তোষামোদও করিতে হয়। গানের সৌন্দর্য্য ভাব ও ভাষা বিশেষজ্ঞ গণ বিশ্লেষণ করিবেন। লেখকের সংগ্রহ করা ব্যতীত আর কিছুই সামর্থ্য নাই।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সোম।

নিমেষ

নিমেষের হাসি নিমেষে ফুরায়
দিবসের আলো দিবসে;
জলদ আবৃত গগণে লুকায়
চপলা হাসিয়া নিমেষে।
আলো নিভে যায় নিবিড় আঁধারে
নিমেষের মাঝে গগণে।
জীবন নিশায় কোন পারাবারে
নিমেষের মাঝে মরণে॥

শ্রীবিভাবতী সেন।

৺হরচন্দ্র চৌধুরী।

পৌরভের পুরোভাগে যাঁহার চিত্র প্রদত্ত হইল তিনি সেরপুরের অন্যতম ভূম্যধিকারী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী। আকৃতি হইতে প্রকৃতি এবং চিত্র হইতে চরিত্র অনেক সময়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে প্রজ্ঞা এবং প্রতিভার চিহ্ন আছে। প্রকৃতই তিনি একজন স্বকৃত, সর্ব্বজন-স্বীকৃত স্বনাম ধন্য-পুরুষ ছিলেন। আমি তাঁহার বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিব না, সংক্ষেপে জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, সাহিত্যিক হরচন্দ্র চৌধুরী, সংস্কারক হরচন্দ্র চৌধুরী, সজ্জন হরচন্দ্র চৌধুরী চৌধুরী মহাশয়ের চারিটী দিকের চারিটী ছায়া চিত্র প্রদান করিব।

সেরপুরের ভূম্যধিকারী বংশ প্রাচীন। প্রাচীন বলিয়া উহার প্রতিপত্তির শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত। এই বংশে সিদ্ধ পুরুষ রাজচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশে দেবী চৌধুরাণী "রমণী পতিবর্ত্মগার' অলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ সহমৃতা হইয়াছিলেন। এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ ও পুরোমহিলাগণের ব্যবহৃত তীর ধনুক, বীরভার-সহ প্রকাণ্ড কাষ্ঠপাদুকা, মহাসতীর সিন্দূর কৌটা, ধ্যান নিরত রাজচন্দ্রের চিত্র এবং বসন ভূষণাদি যাঁহারা দেখিয়াছেন; তাঁহারা ইহাঁদের অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য এবং পতিপরায়ণতা, বিত্ত এবং বৈভবের চিহ্ন দেখিয়া অবশ্যই চমকিত হইয়াছেন। ইহাঁদের নাট মন্দিরে—যে মন্দির গত ভীষণ ভূকম্পে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—ইহাঁদের সেই নাট মন্দিরে দেবীযুদ্ধের দুইখানি বিশাল চিত্র চিত্তকে পলকে পৌরাণিক যুগে লইয়া যাইত। ইহাঁদের বাস্তুভূমির চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে বেষ্টিত পরিখা প্রাচীন দুর্গের পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

৺হরচন্দ্র চৌধুরী দত্তক পুত্র। তাহা হইলেও তিনি বংশানুগত প্রাচীন প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী। এই চৌধুরী বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হেতু তেওতা নিবাসী ৺ভোলানাথ সেনের পূর্ব্ব পুরুষ সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হন। ভোলানাথ সেনের চারি পুত্র—রাধানাথ,

গোপীনাথ, চন্দ্রনাথ ও হরিনাথ। ৺রাধনাথ বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। গোপীনাথ গোবিন্দ কুমার চৌধুরী নামে সেরপুরের অন্য অংশের ভূম্যধিকারিণী ৺রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হন। ইঁহার ন্যায় কঠোর এবং সুদূর তীর্থপর্য্যাটক তৎসময়ে দুইজন ছিলেন না। কনিষ্ঠ ৺হরিনাথ স্বভাব কবি ছিলেন। ৺চন্দ্রনাথ ১২৫৩ সনের ১০ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১২৫৮ সনে শ্রীমতী তারামণি চোধুরাণী কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হন। ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর পূর্ব্বনাম চন্দ্রনাথ।

৺হরচন্দ্র চৌধুরী যে জমিদারী শাসন সংরক্ষণ জন্য দত্তক নীত হইয়াছিলেন ঐ জমিদারীর অবস্থা তখন সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছল ছিল না। জমিদারী সংক্রান্ত দুরূহ কার্য্যে তাঁহাকে দীক্ষার্থ কোন আয়োজনেরই ত্রুটী হয় নাই। শৈশব কালেই তাঁহার চিত্তে কুলোচিত উচ্চ শিক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সুশিক্ষা ব্যতীত সম্পদ আপন এবং অপরের সুখের হয় না। যে সময়ে হরচন্দ্র চৌধুরী শ্রীমতী তারামণি চৌধুরাণীর অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করেন সে সময়ে সেরপুরে নিম্নশ্রেণীর একটী বিদ্যালয় ছিল। উহাতে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয়েরই অধ্যাপনা হইত। জমিদার তনয়গণের পক্ষে তখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সঙ্গত প্রথা বলিয়া গণ্য হয় নাই। ঐ স্কুলে যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আদর্শ-চরিত্র ৺ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। হরচন্দ্র চৌধুরী একদিকে যেরূপ পুস্তক লইয়া কাল কাটাইতেন অন্যদিকে জমিদারীর কীটদষ্ট জীর্ণ জমা খরচ এবং ওয়াশীল তহশিলের হিসাব পত্রের প্রতি তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ৺ হলধর মজুমদার—যিনি সময়ে দেওয়ান পদে বৃত হন—হরচন্দ্র চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শ্রীমতী তারামণি চৌধুরাণীর মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ৺হরচন্দ্র এবং ৺হলধর মজুমদার মহাশয়ের যত্নে জমিদারীর জঞ্জাল অচিরে দূর হইয়া যায়। ১২৬৯ সনে হরচন্দ্র চৌধুরীর নামজারী হয় এবং তিনি স্বহস্তে জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইনি জমিদারী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, উহা তাঁহার দক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং নিপুণতার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ১৮৭৭ সনে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ কালে হরচন্দ্র চৌধুরী শিক্ষিত এবং রাজভক্ত জমিদার বলিয়া সম্মানসূচক প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন। জামালপুরের জয়েন্ট মেজিষ্ট্রেট্ মেঃ নন্দকৃষ্ণ বসু লিখিয়া গিয়াছেন :—

As a Zamindar he is considerate towards his ryats and does not apparently think that money is the sole nexus that binds a landlord and his tenants.

হরচন্দ্র চৌধুরী সাহিত্যে অনুরাগী এবং সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইংরেজী, বাঙ্গলা এবং পারস্য ভাষায় তাঁহার সমান অধিকার ছিল। এরূপ অক্লান্ত পাঠক আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। ইঁহার লাইব্রেরী বিবিধ ভাষার বহু পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। কোন পুস্তক তিনি না পড়িয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। মহামহোধ্যায় পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ইঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায় একজন প্রধান সহায় ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় তাঁহাকে "বিদ্যা-বিনোদ" উপাধি প্রদান করেন। বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুরে সাহিত্য চর্চ্চার অতি উত্তম সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সভা হইতে ১৮৬৫ সনে "বিদ্যোন্নতি সাধিনী" নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "শ্রীবৎসোপখ্যান" তাঁহার লিখিত প্রথম পুস্তিকা; "সেরপুর বিবরণ" তাঁহার প্রণীত প্রধান পুস্তক। "বংশানুচরিত" তাঁহার অন্য একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক। সেরপুর বিবরণ ১২৭৯ সালে মুদ্রিত হয়। হিন্দুপেট্রিয়ট্ হিন্দুহিতৈষিণী, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী, ঢাকাপ্রকাশ রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি পত্রে উহার ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল। ৺ প্যারীচরণ সরকার, ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৺ রামদাস সেন, ৺ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রফেসার ব্লকমেন্ উহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। উক্ত বিবরণ লিখিয়া তিনি সাহিত্যে সুযশ অর্জ্জন করেন। ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল।

তথ্যসংগ্রহে তাঁহার ন্যায় নিপুণ লোক অতি বিরল। কোন্ ঘটনা, কোন্ সামগ্রী ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে তাহা তিনি যথাকালে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কেবল সেরপুরে তাঁহার সাহিত্য-সেবা আবদ্ধ ছিলনা। তাঁহার বিশেষ যত্নে প্রথমত এবং প্রধানত তাঁহার সাহায্য ১৮৮৪ সনে ময়মনসিংহ নগরে "সাহিত্য সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সঙ্গে সংশ্রব রাখিয়া সেরপুরের বহু পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন।

সংবাদ সাহিত্য প্রচারে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১২৭৩ সনে ময়মনসিংহ নগরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র "বিজ্ঞাপনী যন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৮৮ সনে তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্রের নামে সেরপুরে চারু যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ যন্ত্র হইতে "চারুবার্ত্তা" নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। বাবু অদ্বৈত চরণ বসু বি, এল, উহার প্রথম সম্পাদক। ক্রমে 'রাজস্থান" অনুবাদক বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বি, এ, কবি দীনেশ চরণ বসু, বাবু অমর চন্দ্র দত্ত চারুবার্ত্তার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৬ সনে ৺কালীনারায়ণ সান্যাল তাঁহার ভারত মিহির যন্ত্র এবং "ভারত মিহির" লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলে হরচন্দ্রবাবু চারু প্রেস্ ও চারু বার্ত্তা ময়মনসিংহ নগরে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কয়েক বৎসর পর পুনরায় উহা সেরপুরে নীত হয়। ১৩০০ সনে ৺দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, বাবু অনাথ বন্ধু গুহ এবং বাবু অমর চন্দ্র দত্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি প্রেস্ ও সংবাদপত্র উকীল বাবু জানকী নাথ ঘটক, উকীল বাবু শ্রীনাথ রায় (ম্যানেজার), উকীল ৺শ্রীকণ্ঠ সেনের হস্তে অর্পণ করেন। অর্পণ পত্রের কিয়দংশের অনুলিপি এই :—

Gentlemen,

I have to ackowledge with thanks the receipt of your favour under date the 13th instant which reached me sometimes ago, * * * As you, gentlemen, wished to have my press and paper under your able and efficient management, proposing to conduct the same from the sudder station while I was on my way to Calcutta, I gladly accepted your proposal on the belief that the paper would be more popular and useful than perhaps, it had hitherto been, and I doubt not that it will prove so when placed in the hands of men of your high education, vast experience and sound judgment.

Calcutta 26 8-93

১৮৯৩ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি ঐ পত্রানুযায়ী এক দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দেন। উহার কয়েকটী ধারা এই—

একটী কলম্বিয়ান সুপার রয়েল ও একটী এল-বিয়ন রয়েল ও ঐ দুই প্রেস সম্বন্ধীয় একটী হট্ প্রেস ও সরঞ্জামসহ যাহার মূল্য সাড়ে তিনহাজার টাকা এবং ঐ চারু যন্ত্র হইতে বর্ত্তমানে চারুবার্ত্তা নামে যে একখানি সাপ্তাহিক বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় তত্তাবতের স্বত্বাধিকার নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে আপনাদিগকে অর্পণ করিলাম। আপনারা এই মুদ্রাযন্ত্রের নাম চারু যন্ত্র ঠিক রাখিয়া তাহা হইতে প্রতি সপ্তাহে বর্ত্তমান চারুবার্ত্তা সংবাদ পত্র অন্যূন বর্ত্তমান আকারে চারু-মিহির নামে ময়মনসিংহ নগরে প্রকাশ করিবেন। ঐ মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের সহিত আমার কোন সংশ্রব থাকিবে না। আমার কি আমার উত্তরাধিকারীর কি স্থলবর্ত্তীর অনুমতি ব্যতীত ঐ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের নাম ও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৫। আপনারা কোনও কারণে ঐ সংবাদ পত্র না চালাইলে আমার নিয়মানুসারে অর্পিত মুদ্রাযন্ত্র আমাকে ও আমার উত্তরাধিকারী কি স্থলবর্ত্তীকে ফেরত দিবেন।

৮। আপনারা যে কোন অংশী স্বীয় ইচ্ছামত ঐ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং এই পত্রের সর্ত্তাধীনে আপনারা ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে আপনাদিগের মধ্যে কাহারো স্থলে অথবা অতিরিক্ত রূপে ঐ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের অংশীদার করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান এবং অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সেরপুরের ভিন্নতা বহু। ইহার নাম পুর্ব্বে দশ কাহনীয়া সেরপুর ছিল। জামালপুর হইতে সেরপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ বিস্তৃত ছিল। ইহার পারাপারের জন্য দশ কাহন কড়ি দিতে হইত বলিয়া উহার ঐ নাম হয়। ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর যত্নে নগরের উন্নতি হইয়া উহার নাম ১৮৬৯ সন হইতে "সেরপুর টাউন" হইয়াছে। চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, রথ্যাদির সংস্কার, পোষ্টাফিসের উন্নতি এবং স্কুলের উন্নতি তাঁহার চেষ্টার ফল। ১৮৬৯ সনে সেরপুর মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুদিন তিনি যোগ্যতার সহিত উহার চেয়ারম্যানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের শাসন বিবরণীতে লিখিত আছে "He is a well acquainted and accomplished gentleman whose influence is always extended for good. ১৮৮৭ সনে সেরপুর মধ্য ইংরেজী স্কুল উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নতি হয়। এই উন্নতি প্রধাণতঃ তাঁহার যত্নেই হইয়াছিল। তিনি বহুদিন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং নানারূপে উহার সাহায্য করিতেন। তাঁহার গৃহে প্রথম পুত্র ৺হেমচন্দ্রের নামে একটী চিকিৎসালয় এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীমান হেমাঙ্গচন্দ্রের নামে "হেমাঙ্গ লাইব্রেরী" পরিচালিত হইতেছে।

তৎকালে কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে রাজনীতি চর্চ্চার কোন সুযোগ ছিল না। তিনি ১৮৬৬ সনে সেরপুরে "কলিকাতা বৃটিশ ইণ্ডিয়া সভার" এক শাখা-সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে দেশহিতকর বহু কার্য্যের সূচনা হইত। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ধর্ম্মমতেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সেরপুর এই পরিবর্ত্তনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহার গৃহে ধর্ম্মসভা নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় উহার অধিবেশন হইত। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রচারিত পুস্তক ও পত্রিকাদি পঠিত হইত। ৺হরচন্দ্র মহাত্মা কেশব চন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তিনি তাঁহার গৃহে স্ত্রীশিক্ষা এবং দেশ কালোপযোগী স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ এবং ময়মনসিংহের ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মাণে তিনি এককালীন আটশত টাকা দান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সন্নিধ্য লাভ করিয়া তিনি আপনার ও সেরপুরের বহু উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরপুরে ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্ বেঞ্চ তাঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহুদিন দক্ষতার সহিত অনারেরী মেজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন।

সহৃদয় হরচন্দ্র চৌধুরী। তাঁহার বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে "রংমহল" নামে সুসজ্জিত সুন্দর একটী বাঙ্গালা ছিল। এই বাঙ্গলায় প্রাতঃসন্ধ্যায় বহু ছাত্র তাঁহার নিকট ইংরেজী পড়িত। শিক্ষাদানে তাঁহার অবসাদ ছিল না। তিনি উচ্চশিক্ষার আস্বাদ পাইয়াছিলেন। সে সম্পদ বিতরণে তাঁহার কি আগ্রহই না দেখিয়াছি। বহু ছাত্র তাঁহার অধ্যাপনা এবং তাঁহার অর্থ সাহায্যে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। আথিতেয়তা তাঁহার প্রধান গুন ছিল। সৌজন্যে তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না। চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বহু দুস্থ রোগী ঔষধ পথ্যে তাঁহার সাহয্য পাইত। সেরপুরে ব্যাটবল খেলা যখন অধিক মাত্রায় প্রচলিত হয় নাই, তখন তথায় "হুমালী" খেলা প্রচলিত ছিল। নিম্নস্তরের লোকই অধিক পরিমাণে এই খেলায় যোগ দিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বলবান ব্যক্তিগণ ও সময়ে সময়ে এই খেলায় প্রতিযোগিতা করিতেন। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী এই খেলায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান এবং অর্থ সাহায্য করিতেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৺স্বর্ণময়ী চৌধুরাণী কতিপয় বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺হেমচন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীমান চারুচন্দ্র চৌধুরী, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র শ্রীমান হেমাঙ্গচন্দ্র ও শ্রীমান হিরণ চন্দ্র বর্ত্তমান আছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হৈমবতী চৌধুরাণী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী। কনিষ্ঠা কন্যা ৺বাসন্তী দেবীর সঙ্গে ডাঃ শ্রীমান বনওয়ারী লাল চৌধুরীর পরিণয় হইয়াছিল। বাসন্তীদেবী একটী কন্যা রাখিয়া

অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। মাতা শ্রীমতী তারামণি চৌধুরাণী জীবিত আছেন।

৺হরচন্দ্র চৌধুরী ১৩০৫ সনের ১৭ বৈশাখ পরলোক গমন করেন। সাধুজনে শ্রদ্ধাশীল, বিদ্যানে অনুরাগী, দীনে মুক্তহস্ত এরূপ অধিক লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বিদ্যা ও বৈভবের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিনয় এবং অহঙ্কার তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। প্রথম জীবনে তিনি ময়মনসিংহ নগরে দরিদ্র ব্রাহ্মগণের জীর্ণ কুটীরে কত বিনিদ্র রজনী অতি বাহিত করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার উঠিবার অভ্যাস ছিল। ফুল বিল্বদলে তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেবতার আরাধনা করিতেন। সে আরাধনা ঋষিগণ রচিত মন্ত্রে। জীবনের অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এই নিত্যপূজা তিনি এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

নিবেদন।

পূর্ণ হ'ল কত আশা, অপূর্ণ যে কত আর,
জ্বলেছে আলোক কোথা, কোথা তীব্র অন্ধকার!
কত দীর্ঘ পথ নাথ, এমনি এসেছি বাহি'
বরিয়াছি অশ্রু হাসি তব মুখ পানে চাহি!
আজি প্রভু সাধ যায়, থাক্ আশা নিরাশা সে,—
ধরণীর সুখ দুঃখ ভুলে যাই অনায়াসে!
মঙ্গল স্বরূপে তব— সৌন্দর্য্যের পারাবারে—
নিঃশব্দে আনন্দে শুধু মগ্ন করি আপনারে!
প্রেমময়, এস তুমি, এস তুমি আরো কাছে
তৃষিত হৃদয় মোর কাতরে তোমারে যাচে।
তোমারি অমৃত করে কর মোরে পরশন,
জীবন সফল হোক্, হোক্ যাত্রা সমাপন।
কেটে গেছে বহুকাল বৃথা পথে ঘুরে ঘুরে,
এবার শরণ দাও রাখিও না ফেলি দূরে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দিব্য দৃষ্টি

(১)

গঙ্গারাম যখন গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইমেরি পরীক্ষা পাশ করিয়া দুর্গাচরণকে আসিয়া প্রণাম করিল, দুর্গাচরণ তখন হাতের হুকাটীতে সজোরে টান দিয়া কাশিতে কাশিতে পুত্রের মস্তকে মুখে স্নেহ ভরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই আনন্দ সংবাদে বৃদ্ধ দুর্গাচরণ কি যে করিবে. তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

আজ বার বৎসর দারিদ্যের ক্ষুধিত তৃষিত আক্রমণ হইতে প্রাণপণ যত্নে যে মাতৃহীন শিশু শাবকটীকে সে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, হৃদয়ের প্রতি স্নেহকণায় অভিষিক্ত করিয়া বক্ষ পঞ্জরের ছায়ায় ছায়ায় যে কোমল শিশুটীকে গড়িয়া তুলিয়া এত বড় করিয়াছে, সত্যই কি সে এখন মানুষ হইতে চলিয়াছে? বৃদ্ধের যেন তখন সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল? বৃদ্ধের আজ এই আনন্দের দিনে তাহার সুখে দুঃখের সমভাগিনী কোথায়? স্নেহ হর্ষ করুণার ত্রিবেণী সঙ্গমের পবিত্র জল ধারায় বৃদ্ধের নয়ন প্লাবিত হইয়া গেল। তাহার আকুল আকাঙ্ক্ষা অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য লুটাইয়া পড়িল।

এই শূন্য সংসারের একমাত্র সম্বল পুত্রটীকে গ্রামের সরকার কিম্বা জমিদারী কাছারির পাটুয়ারি পদে নিযুক্ত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক দিন ধরিয়া দুর্গাচরণের বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত জরাগ্রস্থ ক্ষীণ দেহটীকে কোন রকমে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল; আজ কিনা সেই সম্মানিত উচ্চপদের অধিকারী হইবার বিদ্যাবুদ্ধি বহন করিয়া তাহার বংশের দুলাল তাহার সম্মুখে। তারপর এই চরপাড়া গ্রামে আর কেহই এপর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের দুর্গম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, একমাত্র গঙ্গারামই প্রথম। তাই আজ বৃদ্ধের হৃদয়ে আনন্দের প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সে দুচার দিন পাড়ায় পাড়ায় ছোট বড় নিকৃষ্ট বর্দ্ধিষ্ট সকলের বাড়ী গিয়া পুত্রের অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা ও অসামান্য সিদ্ধ-বিদ্যার প্রচার কার্য্য

যতটুকু পারিল, শেষ করিয়া সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া আসিল। তৎপর সর্ব্বমঙ্গলের অব্যর্থ মহৌষধী শিরোমণিঠাকুরের শ্রীচরণের ধুলি ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গা সংসার পুনরায় গড়িবার আয়োজন করিল।

আজ বৃদ্ধের মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে। বার্দ্ধক্যের পীড়নে সে যে সমস্ত জোত জমি প্রতিবেশীদের নিকট আধ-বর্গায় পত্তন দিয়া রাখিয়াছিল, আজ অকাল বসন্তের সমাগমে তাহা মুক্ত করিয়া নিজ হালে আনিল। ঘরের চালে ছন দিয়া, ভিটি ও বেড়া বাঁধিয়া, ঝার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাড়ীটাকে চক চকে ঝক ঝকে করিয়া তুলিল; এবং চঞ্চলাকে কায়েমি ভাবে বাঁধিবার জন্য, সতর গণ্ডা বাঁশ পণ স্বরূপ দিয়া, পার্ব্বতীকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া আনিয়া তার দায়িত্বের বোঝা কমাইল।

তারপর বর্ষার প্রথম চুম্বনে পল্লবিত প্রকৃতির ললিত হাস্য যখন প্রতি কুসুম স্তবকে বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহারই এক মধুর প্রভাতে দুর্গাচরণ গঙ্গারামের করে তাহার যথা সর্ব্বস্ব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিল।

শেষ মুহূর্ত্তে যখন দুর্গাচরণ পুত্র বধূ পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—মা, আমার ঐ চার পাঁচ খানা ক্ষেতে বহু অর্থ রাখিয়া গেলাম; ভাল করিয়া গঙ্গারামকে চালাইও আমার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইবে। তখন পার্ব্বতী কিছুই ভাবিবার ও বলিবার অবসর পাইল না; সে শুধু সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়া অধোবদনে নিকটে বসিয়া রহিল।

(২)

আজ কাল লোক একটু লেখা পড়া শিখিলেই প্রায় পৈত্রিক ব্যবসায় ত্যাগ করে এবং পরের দাসত্বের চাপরাশ মাথায় বাঁধিতে জীবন উৎসর্গ করে। তখনও দেশের সে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসে নাই। গঙ্গারামের সে দুর্ম্মতি হয় নাই। তাহার অনেকগুলি ক্ষেত। দুইখানা লাঙ্গল। চার পাঁচটা বলদ। বেতনভোগী একটা রাখালকের সাহায্যে গঙ্গারাম স্বয়ং চাষ আবাদ করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস ছিল লাঙ্গলের ফলার স্পর্শে ভূমি অকাতরে স্বর্ণকণা প্রসব করে। চাকুরীতে দারিদ্র ঘুচেনা—বরং মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতে হয়।

গঙ্গারামের সংসার খানা আয়নার মত নির্ম্মল। কোন বিষয়ে অপ্রতুল নাই। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গাভী, ক্ষেত্র ভরা কমলার অচলা দৃষ্টি, আর পুষ্করিণীর মাছ, গৃহে আজ্ঞাবহ পত্নী-পার্ব্বতী। পত্নিক্রোড়ে একবৎসরের সুকুমার শিশু, অঞ্চলে ধরা ৪ বৎসরের একটী কন্যা, এদিকে গঙ্গারাম সদানন্দ, সাহসী, মিষ্টভাষী, কর্ম্মক্ষম যুবক।

সুখের ভিতর দিয়া গঙ্গারাম ও পার্ব্বতীর দিনগুলি যাইতে লাগিল। গঙ্গারাম যখন নিদাঘ দীপ্ত দ্বিপ্রহরে শ্রমকাতর-ক্লান্ত দেহে লাঙ্গুলের খুঁটা ধরিয়া বলিবর্দ্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া বেড়াইত, তখন পার্ব্বতী ভাতের থালা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইয়া তাহার প্রতীক্ষায় ক্ষেত্র পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত এবং স্বামী নিকটে আসিলে তাহার ঘর্ম্মাক্ত মুখের উপর স্বীয় অঞ্চল বুলাইয়া তাহার অবসাদ রাশি দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত। গঙ্গারাম যখন দুধের দোনা লইয়া গাভীর নীচে দুগ্ধদোহনে রত থাকিত, পার্ব্বতী তখন একহাতে বাছুরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অপর হাতে অঞ্চলের বাতাসে গঙ্গারামের তৃপ্তিদান করিত।

গঙ্গারামও প্রতিদানে পার্ব্বতীকে যথেষ্ট আদর যত্ন ও সাহায্য করিত। পার্ব্বতী যখন ধান ভানিতে ভানিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন গঙ্গারাম লোক-চক্ষুর অগোচরে ঢেঁকি ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সাহায্য করিত; পার্ব্বতী তাহার ঈষৎ হাস্য মুখ বঙ্কিম ভঙ্গিতে ফিরাইয়া নিলেও গঙ্গারাম পার্ব্বতীকে ধুতির অঞ্চলে মুছাইয়া দিতে ছাড়িত না। দ্বিপ্রহরে রান্নাঘরের উনুনের আঁচের সম্মুখে যখন নেসপাতিটীর মত পার্ব্বতীর মুখখানা একটা উজ্জ্বল রক্তিম ছায়ায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তখন আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া যাইয়া গঙ্গারাম তাহাকে বাতাস করিত, গঙ্গারাম অনেক দিন পাড়া প্রতিবেশীর নিকট ধরা পড়িয়াগিয়াছে। এইরূপ আমোদ আহ্লাদে যৌবনের সে সুখের দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল।

(৩)

গঙ্গারামের চক্ষের সম্মুখ হইতে একটা পরিবর্ত্তনের চাকচিক্যময় বিরাট যবনিকা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। গঙ্গারাম দেখিল যে, সে দিন আর নাই—পিতার কথানুসারে হালের খুঁটী ধরিয়া বসিয়া থাকিলে আর সমাজে কেহ গ্রাহ্য করিবে না। ছেলের বিবাহ করান, মেয়ের বিবাহ দেওয়াও সহজে জুটীয়া উঠিবে না। দেশ কালের অবস্থা ভাবিয়া গঙ্গারাম গ্রামের এক আমীন বাবুর পিছু ধরিল। আমীন বাবু সহরে যাতায়াত করিতেন, তিনি গঙ্গারামকে হালের খুঁটীর পরিবর্ত্তে একেবারে খাস কোম্পানি বাহাদুরের একখানা চামরার চাপরাশের আশ্বাস প্রদান করিলেন। সেই উড়োপাখীর সন্ধানে উগ্রম আকাঙ্ক্ষা লইয়া গঙ্গারাম তাহার পরদিনই পার্ব্বতীর প্রেমবন্ধন কাটিয়া, পল্লিগৃহের মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র ও কন্যার স্নেহ ভক্তি দূরে রাখিয়া, গোয়ালের গাভীগুলির দুগ্ধের ও ঘোলের সকল প্রলোভন দূরে সরাইয়া—সেই আমিনের সঙ্গে সহরে ছুটীল।

(৪)

কূপমণ্ডূক সহসা নদীতে পড়িলে যেমনটা হয়, গঙ্গারামের দশাও সহরে আসিয়া তেমনি হইল, সে সহরের কোলাহলের মধ্যে তাহার নিজকে কোনরূপে ডুবাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইল কিন্তু পারিল না। প্রথম প্রথম যখন খাইতে বসিত, তখন পার্ব্বতীর স্বহস্তে প্রস্তুত নবনীত, ঘোল আর সর্ব্বোপরি আগ্রহপূর্ণ ভালবাসার কথাই তাহার মনে পড়িত। তারপর যখন ঘুমাইতে যাইত, তখন তাহার মনে পড়িত—সুকুমার ছেলে মেয়ে দুইটীর কথা। কতদিন সে ঘুমে ছেলের কান্না শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া রাত্রের অন্ধকারে বিছানা অনুসন্ধান করিয়াছে, তারপর আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গারামের কিছুই ভাল লাগিত না। সহর তাহার নিকট কারাগৃহের ন্যায় বোধ হইত। গঙ্গারাম বাড়ী যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিত।

সময়ে সব সহিয়া যায়। গঙ্গারামের ও ধীরে ধীরে সহোরে হাওয়া সহিয়া আসিতে লাগিল। এখন গঙ্গারাম জেলা কালেক্টরীর একটা 'আছালতন' চাপরাশ দখল করিয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহার কাজের একটা মামুলী বন্দোবস্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

গঙ্গারাম অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া থাকে। গাত্রোত্থান করিয়া সে একবার বেশ করিয়া একটা তামাক সেবন করে। তারপর হাত মুখ প্রক্ষালন ও ঘাটে বসিয়া ইষ্ট নাম জপ করিয়া আসিয়া তাহার সাধের হুকাটী বেশ করিয়া একটা লৌহ শলকা দ্বারায় বারংবার ঘসিয়া পরিষ্কার করে। পরিষ্কার করিয়া তাহাতে জল ভরে এবং পুনরায় আর একটা নূতন তামাক সাজাইয়া লয় এবং একখানা জল চৌকীর উপর বসিয়া মনের সুখে তামাক টানিতে থাকে। তামাক খাওয়া শেষ হইলে হুকাটী যথা স্থানে রাখিয়া গঙ্গারাম তাহার সাধের চাপরাশটীকে চকের গুঁড়া দিয়া ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করে, তারপর সেটা চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, তখন তাহা কাঁধে ফেলাইয়া নাজির বাবুর বাসায় যায়! সেখানে তাহার কাজের অভাব নাই। নাজির বাবুর ছোট নাতিনটীকে কোলে লইয়া কতক্ষণ চুমু খায়, মেয়েটীকে হাত ধরিয়া উঠান পার করিয়া দেয়, নাজির বাবু 'কে রে' ডাকিলে 'হুজুর' বলিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তারপর তাঁর প্রয়োজনীয় আদেশ সকল সানন্দচিত্তে তামিল করিয়া আসিয়া স্নান আহার করে, রীতিমত কাছারীতে যাইয়া ভাল পরওয়ানা লাভের জন্য যাহা করিবার তাহা করে। রাত্রে পিয়ন মহলে যাইয়া হরিসংকীর্ত্তন করে, দুই এক বাজি তাস পাশা খেলিয়া "সহোরে" জীবন কাটাইয়া দেয়।

এখন আর গঙ্গারামের পার্ব্বতীকে ও ছেলে মেয়েকে স্মরণ করিবার অবসর নাই। প্রয়োজনও নাই। কেননা গঙ্গারামের সংসার অচল নহে।

এ দিকে পার্ব্বতী ও প্রত্যহ ভোরে উঠে। গোয়ালের গাই বাহির করে, গোয়াল পরিষ্কার করে, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গোময় ছিটাইয়া দেয়, ঘর বাড়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে। তারপর গাই দোহায়, ঘোল ঘৃত তৈরি করে। এখন যে দুধ ঘৃত হয়, তাহা পার্ব্বতী সযত্নে ছেলে মেয়েকে দেয়, উদ্বর্ত্ত টুকু বিক্রয় করে; তাতে মাসে তার বেশ দু পয়সা আয় হয়। সে এখন বেশ দু

পয়সা লাগান বাজানও আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গারামও মাসে মাসে যাহা দিতেছিল, তাহার এক পয়সাও পার্ব্বতী না ভাঙ্গিয়া লাগাইতে লাগিল। এইরূপে সুস্থ শরীরে ছেলে মেয়ে নিয়া পার্ব্বতীর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

গঙ্গারামেরও অভাব বোধ নাই, পার্ব্বতীরও অভাব জ্ঞান নাই। তাই তাহাদের দূরত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। দম্পতির পরস্পরের বিচ্ছেদ একদিন যে এক সূক্ষ্ম ব্যবধানের রেখাপাত করিয়া দিয়াছিল, সুদীর্ঘ কাল অদর্শনে ক্রমে তাহা বিশাল ব্যবধানে পরিণত হইল। একের মন হইতে অন্যকে যেন নির্দ্দয়কাল নির্ম্মম ভাবে অল্পে অল্পে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক বছর কাটিয়া গেল। কাহারও সহিত কাহার সাক্ষাৎ হইল না। কেবল গঙ্গারাম বুঝিত, পার্ব্বতী আছে; পার্ব্বতীও বুঝিত, গঙ্গারাম আছে।

(৫)

গঙ্গারাম মেয়ে বিবাহের কোন খোজ খবরই লইল না দেখিয়া পার্ব্বতী নিজ ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ করিল। দরিদ্র ভ্রাতা নিজ লাভের প্রত্যাশা দেখিয়া একটী পাত্র স্থির করিল। যথা সময়ে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলে; গঙ্গারাম পত্র পাইল।

গঙ্গারাম সহরে যে নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, এখন তাহার মায়া কাটান তাহার পক্ষে দায় হইল। নিজের ছেলে মেয়েও সে ভুলিতে পারিয়াছিল, কিন্তু নাজির বাবুর নাতি ও নতিনীটীকে সে ভুলিতে পারে কৈ? এক দিন তাহাদিগকে না দেখিলে গঙ্গারামের প্রাণটা যেন কেমন ধড়ফর করে, আর সে শিশু দুটীও গঙ্গারামকে একদিন না পাইলে নানা ভাবে তাহাদের কি একটা অব্যক্ত অভাব দেখাইয়া দেয়।

মানুষ থাকিলেই কাজে লাগে। যখন এই নূতন পিয়ন গঙ্গারাম নাজির গৃহের কোন খবরই রাখিত না, তখন ও নাজির বাবুর সংসার লোকাভাবে অচল ছিলনা। এখন গঙ্গারামকে ছাড়িতে গেলে নাজির-গৃহিণীর চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিতে হয়। সর্ব্বদা ডাকে হাঁকে যাহাকে কাছে পাইয়াছেন, সে চলিয়া গেলে চলিবে কি করিয়া? এ দিকে গঙ্গা রামের মেয়ে বিবাহ না গেলেই ব হয় কেমনে? তাই নাজির গৃহিণী তাহাকে মাত্র সাত দিবসের জন্য বাড়ী যাইতে অনুমতি করিলেন।

যথা সময়ে গঙ্গারাম কন্যা বিবাহে বাড়ী আসিল। পার্ব্বতীও তাহার ভ্রাতার চেষ্টায় বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন সকলই প্রস্তুত ছিল। বাড়ী আসিয়া গঙ্গারাম তাহার কষ্ট সঞ্চিত অর্থগুলি পার্ব্বতীর হাতে দিল। পার্ব্বতী কোন কথা না বলিয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইল। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল।

বিবাহের জের যাইতে না যাইতেই গঙ্গারামের বিদায় ফুরাইয়া আসিল। পার্ব্বতী এই নব অতিথিকে প্রাণ খুলিয়া দুটী কথা বলিল না, বলিবার অবসরও পাইল না।

গঙ্গারাম এতদিন পরে গৃহে আসিয়া পত্নি পার্ব্বতীর নিকট কত কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাহার পার্ব্বতী তাহাকে এতদিন পরে দেখিয়া কত না যত্নে, কত না সোহাগে, কত না আগ্রহে বরণ করিয়া লইবে; তাহার উন্নতিতে কত না আনন্দ অনুভব করিবে। তারপর সে যখন তাহার এই সুদীর্ঘ প্রবাস যাপনে সঞ্চিত টাকাগুলি বস্ত্র নির্ম্মিত লম্বা কোমর বন্ধটী হইতে একে একে খুলিয়া পার্ব্বতীর হাতে দিবে, তখন না জানি পার্ব্বতী কত আনন্দের গদ গদ ভাষায় তাহার মনের হর্ষ ও ভালবাসা প্রকাশ করিবে। প্রত্যাশা করিয়াছিল গঙ্গারাম অনেক। কিন্তু পাইল না সে কিছুই বরং তৎপরিবর্ত্তে সে অনুভব করিল; পার্ব্বতীর সগর্ব্ব উপেক্ষা। পার্ব্বতীর এই আচরণ গঙ্গারামের নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। গঙ্গারাম মরমে মরিয়া গেল।

এদিকে পার্ব্বতীও স্বামীর নিকট অনেক আদর সোহাগ ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করিয়া পথের দিকে চাহিয়া দিন গুণিতে ছিল। পার্ব্বতী বহু কষ্ট সহ্য করিয়া শিশুগুলিকে মানুষ করিয়াছে। মেয়েকে কষ্টে লালন পালন করিয়া এখন নিজ যত্নে চেষ্টায় বিবাহ পর্য্যন্ত দিতে বসিয়াছে, সুতরাং গঙ্গারাম তাহার নিকট সেজন্য অনেক খানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, এ আশা পার্ব্বতী সর্ব্বদা মনে পোষণ করিত।

গঙ্গারাম যেমন পার্ব্বতীর নিকট হইতে আদর ও ভালবাসা প্রত্যাশা করিতেছিল, পার্ব্বতীও সেইরূপ গঙ্গারামের নিকট প্রশংসা ও সহানুভূতি আশা করিতেছিল! কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া দুই জনের চিন্তাকে ঠিক দুই বিপরীত পথে লইয়া চলিল।

সহরে আসিয়া কতক দিন গঙ্গারামের কিছুতেই মন বসিল না। সে কেবল ভাবিত পার্ব্বতীর উপেক্ষার কথা। পার্ব্বতীর ব্যবহার একটা জগদ্দল পাথরের মতো গঙ্গারামের বুকে চাপিয়া রহিল। সে পাথর চাপায় কিছু দিন তাহার কোন কাজই ভাল লাগিত না।

সময়ে সব সহিয়া যায়। ক্রমে গঙ্গারামের বুক হইতেও ধীরে ধীরে সে পাথর নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীর স্মৃতিও ধীরে ধীরে তাহার মন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

(৬)

তারপর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গারাম এখন আর স্ত্রী পুত্রের খবর করে না।

সে দিন পৌষের কোয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। গঙ্গারাম ঘটী হস্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে ঘাটে যাইতেছিল, এমন সময় সম্মুখে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পুত্র বলরাম ডাকিল "বাবা"।

হঠাৎ পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া এবং তাহার মলিন মুখের দিকে দৃষ্টপাত করিয়া গঙ্গারামের অন্তর কোন অজ্ঞাত কারণে কাঁপিয়া উঠিল; তারপর স্নেহ কম্পিত স্বরে গঙ্গারাম বলিল "তুই কেন আসিলিরে বল।" বাড়ীর সকলে ভালতো?"

বলাই বলিল--"তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

গঙ্গারাম সস্নেহে ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল—"যা বস গিয়া, আমি আসিতেছি।"

গঙ্গারাম হাত মুখ ধুইয়া ঘাটেই সন্ধ্যা করিতে লাগিল। আজ সন্ধ্যায় তাহার মন নিবিষ্ট হইতেছে না। সে ভাবিতেছিল, সেই পুরাতন প্রেমের পুরাতন অভিমানের কথ——তবে পার্ব্বতীর অভিমান এতদিনে দূর হইয়াছে। সে যখন ছেলেকে পাঠাইয়াছে, তখন আমাকে এবার বাড়ী যাইতেই হইবে! এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গারামের বহু সময় চলিয়া গেল।

গঙ্গারামের যখন সন্ধ্যা শেষ হইল, তখন চারিদিক বেশ ফর্শা হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া বলাইকে ডাকিল। কেহ কোন উত্তর দিল না। গঙ্গারাম এঘর, সেঘর, অনুসন্ধান করিল; বলাই কোথায়? ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। তাহার কোন সন্ধান নাই। যখন স্নান আহারের সময় হইল, গঙ্গারাম ঘরের অন্যান্যের নিকট বলাইর অনুসন্ধান লইল; কেহই বলাইকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া কহিল না। ক্রমে গঙ্গারামের মনে নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। স্ত্রীর প্রতি তাহার বহু দিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও অভিমানের দুর্জ্জয় বাঁধ পুত্র স্নেহের প্লাবনে কোথায় ভাসিয়া গেল। সারাদিন সহর ময় পাতি পাতি অন্বেষণ করিয়া অপরাহ্নে গঙ্গারাম পুত্র অন্বেষণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

(৭)

গাড়ী হইতে নামিয়া গঙ্গারাম পথ চলিতে লাগিল, আর অশান্তির নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। রজনীর সূচী ভেদ্য অন্ধকার মাথায় করিয়া গঙ্গারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল।

গঙ্গারাম যখন গৃহে পৌঁছিল, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। গৃহস্থের কুটীর দ্বার রুদ্ধ। ক্বচিৎ কোথাও ক্ষীণ আশার মত রন্ধ্রচ্যুত আলোক রশ্মি মাত্র দেখা যাইতেছিল। কম্পিত দেহে গঙ্গারাম বাড়ী পৌঁছিল। তখনও তাহার গৃহ মধ্যে মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। একটা পেচক ভীষণ শব্দে গঙ্গারামের মাথার উপর ডাকিয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ শব্দ করিতে সাহসী হইল না। তারপর ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিল। ধীরে ধীরে ডাকিল—"সজাগ আছ কি—তুমি? উঠ, বলাই বাড়ী আসিয়াছে কি?"

পার্ব্বতী বিনিদ্র নয়নে রাত্রি কাটাইতেছিল। হঠাৎ গঙ্গারামের অপ্রত্যাশিত আগমন তাহাকে বিহ্বল করিয়া

ফেলিল। তাহার বিদীর্ণ বক্ষের জমাট শোণিত খণ্ড গুলি যেন গঙ্গারামের উষ্ণ নিশ্বাসে গলিয়া নির্ঝরের ধারার মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। পার্ব্বতী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল; "তুমি আসিয়াছ, সব সাঙ্গ করিয়া তুমি আসিলে। আমার বলাই কি আর আছে? সে যে কাল রাত আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

গঙ্গারাম কিছুই বুঝিল না। সে বলিল—"কাল প্রাতে বলাই আমার নিকট গিয়াছিল। সে কি বাড়ী আসে নাই? আমি যে তাহাকে খুজিয়াই বাড়ী আসিয়াছি।"

* * * * *

(৮)

গঙ্গারাম বুঝিল, বলাই অপূর্ণ আশা লইয়া মরিয়াছিল, তাহার আশা পূর্ণ করিয়া গিয়াছে—সে পিতৃচরণ দর্শন করিয়া গিয়াছে।

পুত্রশোকে গঙ্গারাম শয্যাশায়ী হইল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, জীবনের আশা নাই ভরসা নাই, গঙ্গারামের দিন যাইতে লাগিল। দিন সুখেও যায়, দুঃখেও যায়; দিন কাহারও জন্ম বসিয়া থাকে না। গঙ্গারামের জীবনে একদিন সুখের জোয়ার আসিয়াছিল, এখন ভাটার টান পড়িয়াছে।

এখন সংসারে গঙ্গারামেরও কোন আশা নাই, পার্ব্বতীরও কোন আশা নাই। স্ত্রীর উপর গঙ্গারামের যে অভিমান ও ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতায় ও পুত্রশোকের আঘাতে তরল হইয়া ঝড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু গঙ্গারামের উপর পার্ব্বতীর যে অশ্রদ্ধা গোপনে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা এখন সাক্ষাতে আত্ম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং গঙ্গারাম তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল।

মানুষ গৃহে যখন শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়া ব্যর্থ মনোরথ হয়, তখন তাহার জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে। গঙ্গারাম যখন গৃহে শান্তির পরিবর্ত্তে প্রতি মুহূর্ত্তে তাচ্ছিল্যের বাণে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, তখন ক্রমশঃই অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে পার্ব্বতী দিন দিন অভিমানের প্রেত মূর্ত্তিতে গঙ্গারামের সম্মুখে প্রকটীত হইতে লাগিল। গঙ্গারাম আকুল হইয়া উঠিল।

ক্রমে গঙ্গারামের উত্থান শক্তি রহিত হইল। কবিরাজ গঙ্গারামের জন্ম দুগ্ধ পথ্য বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পার্ব্বতী গঙ্গারামকে এক বিন্দুও দুগ্ধ দিতে প্রস্তুত হইল না। পার্ব্বতী অকালে উপযুক্ত পুত্র হারাইয়া, স্বামীর অতীত ব্যবহার ও ভাবি পরিণামের বিষয় চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষার সঙ্কল্প করিল। সে ভাবিল বুড়াতো মরিতেই বসিয়াছে;—দুধ খাইলে কি আর থাকিবে? আমার পুত্র গেল, পতি বুড়া, সেও যাইবে; তারপর আমি—যদি দুই দিন বাঁচিয়াই যাইতে হয়, দুটা কড়িতো চাই? সে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে লাগিল। নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পার্ব্বতী গঙ্গারামের দিকে তাকাইল না।

এদিকে বৃদ্ধের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই যেন তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আজ একটু দুধ, কাল একটু ভাল মাছ, পরশু একটু মাখন, সর, খাইতে সাধ হইতে লাগিল। এদিকে কিন্তু পার্ব্বতী তাহাকে কিছুই দিতে রাজি হইল না; বরং সর্ব্বদা বাক্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিতে কিছু মাত্র ইতস্তত করিত না।

গঙ্গারামের হাতে যে কয়টী টাকা ছিল, তাহা ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। পত্নির ব্যবহার দেখিয়া তাহার নিকট একটী পয়সাও চাইতে সাহসী হইল না। সেদিন ঘরে কিছুই নাই। পার্ব্বতী জবাব দিল, তাহার হাতে একটী পয়সাও নাই। গঙ্গারাম ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পার্ব্বতী সে দিন টাকাটী দিয়া বলিল—"শিরোমণি হইতে হাওলাত করিয়া আনিয়াছি, সোমবার বাজারের পূর্ব্বে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে।" গঙ্গারাম আপততঃ সুস্থ হইল।

এখন গঙ্গারামের দ্বারে দারিদ্রের হাস্ত বিরল পাণ্ডুর মুখচ্ছবি কটুস্মিতার তত্ত্ব পাইয়া ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গারাম এই অযাচিত অনাহূত অতিথিটীর শুভাগমনে বড়ই বিপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এইরূপে গঙ্গারাম দিন দিন নিপীড়িত হইতে লাগিল।

একদিন তাহার বড় সাধ হইল, সে একটু দুধের পায়স ও ভাল মাছের ঝোল খায়। গঙ্গারাম পুরোহিত শিরোমণি ঠাকুরকে খবর দিয়া ডাকাইয়া আনিল। শিরোমণি আসিয়া শিয়রে বসিল। গঙ্গারাম মৃদুস্বরে বলিল "ঠাকুর মরিতে বসিয়াছি, এখন চারিটা প্রসাদ পাইলে শেষ প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারি। আমার একটু পায়স খাইতে সাধ ছিল, ঘরে তাহা পাইবার আশা নাই। আপনার নিকট কয়টী টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি, দিতে পারিব, সে ভরসাও আর নাই. ভয় হয়, ঋণ পাপ রাখিয়া যাইতেছি তাহা হতে উদ্ধার—

শিরোমণি শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন—"গঙ্গারাম আমার নিকট তুমি কোন ঋণ কর নাই, তোমার নিজের অর্থই খরচ করিয়াছ। তুমি পার্ব্বতীকে ক্ষমা করিও, সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। ইহা তোমারি টাকা, আমার নিকট হাওলাত ছিল,তাহাই তাহাকে দিয়াছি।"

গঙ্গারাম শিরোমণির হাত ধরিয়া বলিল – 'দাদা পার্ব্বতী অবোধ স্ত্রীলোক আমি তাহার মনে অনেক আঘাত দিয়াছি। তার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। সে অপরাধ তার নয়, অপরাধ আমিই করিয়াছি। পার্ব্বতীকে আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিও।"

শিরোমণি গঙ্গারামের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইলেন। যাইবার সময় বলিলেন "কোন চিন্তা নাই,— এই আমি প্রসাদ লইয়া নিজেই আসিতেছি।"

পার্ব্বতী দ্বারের পার্শ্বে দাড়াইয়া গঙ্গারামের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। তারপর সে দিব্য দৃষ্টিতে তাহার স্বামীদেবতার অতুল আসন তাহার বক্ষের ভিতরে উজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে কি মহান্ সে মূর্ত্তি পাইল!

পার্ব্বতী বিহ্বল চিত্তে একেবারে ঘাটে চলিয়া গেল। স্নান করিয়া শুচিসম্পন্ন হইয়া আসিয়া কেঁড়ে ভরা দুধ, যাহা বিক্রয় করিবার জন্য রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়া পতিদেবতার জন্য পরমান্ন পাক করিতে লাগিল। চঞ্চল চরণে পার্ব্বতী পতিকে সাধ মিটাইয়া আহার করাইবার বাসনায় নানা তরকারী প্রস্তুত করিল। তারপর তাহা থালায় সাজাইয়া, গলায় বস্ত্র খণ্ড জড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আসিয়া পতি দেবতার চরণে নিবেদন করিল। সে আজ তাহার হৃদয়ের সমস্ত কলুষ কালিমা স্বামী দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া প্রাশ্চিত্ত করিবে, ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; সে কাঁদিয়া বলিবে. ওগো দেবতা, তুমি আমাকে ক্ষমাকর, চরণে স্থান দেও আমি তোমায় চিন্তে পারি নাই। অবোধ স্ত্রী আমি,—তোমারই আশ্রিত নাথ।

পার্ব্বতী চঞ্চল হস্তে স্বামীর চরণ ধরিয়া যখন নাড়িল, তখন গঙ্গা রামের দেহ অসার হইয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর আর কোন শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শিরোমণি যখন প্রসাদের থালা লইয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ডাকিলেন, তখন কেহ উত্তর করিল না। শিরোমণি ঘরে প্রবেশ করিলেন। এ কি? গঙ্গারামের বুকের উপর বাহু বেষ্টনে পার্ব্বতী শায়িত; তাহাদের একের বাহু যেন অন্যকে দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে।

উভয়ের দেহ অসার—স্পন্দনহীন তাহাদের অনিমেষ নেত্র যেন একে অন্যকে মনের আবেগে নিরিক্ষণ করিতেছে। তাহাদের সে বিষাদ পাণ্ডুর ক্লান্ত চাহনির উপর তখনও যেন স্নিগ্ধ মাধুরী ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি পলক হীন—যেন দিব্য দৃষ্টি।

৺গোপালকৃষ্ণ গোখেল

ভারতের ভাগ্যগগনের কোণে
হে গোখেল ! শুক তারা,
দুর্দ্দিনের নিশি প্রভাত না হতে,
তোমারে হইনু হারা।
দুর্ভিক্ষ, মারীতে হাহাকার ধ্বনি
ভীষণ আহবে অস্ত্র ঝন্‌ঝনি
লুলুপ রসনা মেলিয়া রাক্ষসী
পিয়িছে শোণিত ধারা,
এমন কুক্ষণে ডুবিয়ে গিয়াছে
ভারতের শুক তারা।
আশার কিরণে ছেয়ে ছিলে দেশ
অকাতরে কত সহিয়াছ ক্লেশ
অলস বাঙ্গালির ভাঙ্গিতে ঘুম
দ্বারে দ্বারে দিয়ে সারা।
স্বার্থের কালিমা পশেনি তোমায়,
ব্রত নিয়েছিলে দেশের সেবায়,
যে সিদ্ধার বীজ রোপিলে যতনে
আজিও জন্মেনি চারা।
দুর্দ্দিনের নিশি প্রভাত না হতে
তোমারে হইনু হারা।
সুদূর 'পুনাতে' তব জন্ম ভূমি
মনে হয় যেন সহোদর তুমি
করিয়াছ বন্ধু সকল জাতিরে
প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা।
আজ সবাকার কাঁদিছে পরাণ
মরিয়া, অমর তুমি গরিয়ান,
হৃদয়ে হৃদয়ে বহিছে তোমার
গুণের আসিয়া ধারা।
অকালে খসিয়া পরিলে তুমি, হে
ভারত গৌরব তারা।

শ্রীসুরমা সুন্দরী ঘোষ।

স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখেল।

যে মহাত্মা যাবজ্জীবন কেবল মাত্র স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান জন্য ৭০টী টাকায় ফারগুসন কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী অধ্যাপনার পর মাসিক ৩০টী টাকা মাত্র পেন্সন লইয়া

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল।

স্বদেশ বাসীগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বায়ের প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই ভারত মাতার সুসন্তান, স্বদেশ বৎসল অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, স্বনাম খ্যাত মহাত্মা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল বিগত ৭ই ফাল্গুন পুণা নগরীতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত জননী যথার্থই একটী দেশ হিতৈষী, আত্মত্যাগী, পরার্থ-উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাপুরুষকে হারাইয়াছেন। মহাত্মা গোখেলের মৃত্যুতে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

সে দিন আমাদের মাননীয় বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মহাত্মা গোখেলের জন্য দুঃখ করিয়া তাঁহার কর্ম্মের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"২০শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে এই সভার সদস্য মাননীয় মিঃ গোখেলের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। আমি শুনিয়াছিলাম, অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার দিল্লীতে আসিতে বিলম্ব হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সভাধিবেশনের সময় সময় কালে তিনি দিল্লী আসিয়া পৌঁছিবেন! আজ কোথায় তাঁহাকে সভার মাঝে দেখিব, তা না হইয়া শুনিলাম, তিনি মর্ত্তধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মাননীয় মিঃ গোখেল ১৮৬৬ অব্দে কলহাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার কার্য্য-জীবনের সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার আবশ্যক বোধ করি না, তবে এইমাত্র বলিতেছি, ১৮৮৪ অব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সময় হইতেই শিক্ষাবিভাগে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। ২০ বৎসরকাল তিনি পুণা ফার্গুসন কলেজে লেক্‌চারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই কলেজে তিনি ইতিহাস ও অর্থনীতি শিক্ষা দিতেন, এবং এই ইতিহাস ও অর্থনীতেই তিনি এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন যে উক্ত বিষয়ক কোন জটিল মীমাংসা উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিত। তিনি যে শুধু শিক্ষকতাই করিতেন, তাহা নহে, কালেজটী যাহাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই শিক্ষকতাকালে তিনি সাধারণের হিতসাধনে সদাই ব্যস্ত ছিলেন এবং চারি বৎসর ধরিয়া বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া ছিলেন। ১৮৯৭ অব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন এবং বহু দিন ধরিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৮৯৭ অব্দে রয়েল কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি বিলাতে গমন করিয়া যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অতীব মূল্যবান। ১৯০০ অব্দে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া ১৯০২ অব্দে বোম্বাই কাউন্সিলের প্রতিনিধিস্বরূপ বড় লাটের পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সদস্যগিরি তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৪ অব্দে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ অব্দে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে বরিত হইয়া ঐ বৎসরেই রাণাড়ে একনমিক ইন্‌ষ্টিটিউট এবং ভারতীয় ভৃত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর তিনি অনেক বার ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার মনোগত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমি যত দূর জানি, তাহাতে তিনি এই ব্যবস্থাপক সভার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি লইয়াই অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন।

"অবশেষে ১৯১২ অব্দে তিনি পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি অতিশয় দক্ষতা, বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বক্তৃতা করিতেন, তাঁহার উৎসাহ এবং ন্যায়বিচারে সাধারণ মুগ্ধ ছিল। মাননীয় মিঃ গোখেল যে একজন বাগ্মী ছিলেন, সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তিনি অতিশয় রাজভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু রাজকীয় শাসননীতির সমালোচনা করিতে তিনি কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সমালোচনার গুরুত্ব ছিল; গবর্ণমেণ্টের যে কোনও নিয়ম পদ্ধতি তাঁহার নিকট অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত, তাহারই তিনি দোষগুণ দেখাইতেন। শিক্ষা, ও অর্থ নীতি সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ্ণ নজর ছিল; এই কয়টী বিষয় লইয়া যখন তিনি তর্ক আরম্ভ করিতেন, তখন তাহার বিপক্ষদিগের তাঁহার সম্মুখে টিকিয়া থাকা দায় হইত। যাঁহারা তাঁহার বিপক্ষবাদী হইতেন, তাঁহাদিগকে তিনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন বটে, কিন্তু কখনও তিনি কাহারও মর্য্যাদাহানি করেন নাই বা তর্কস্থলে অশিষ্টাচারের লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। কোনও তর্কে অকৃত কার্য্য হইলে, তিনি কুণ্ঠিত না হইয়া বলিতেন, "আমার মতে যাহা যুক্তি সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম।" সকল তর্কেই তিনি নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতেন। আমার কার্য্যকালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি অকৃতকার্য্য হইলেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই মোহাবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি লইয়া মিঃ গোখেল

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; আমার বিশ্বাস তাঁহার চেষ্টার ফলেই অবশেষে প্রশ্নের সন্তোষ জনক মীমাংসা হইয়াছে।

"আমি মিঃ গোখেলকে কেবলমাত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান সদস্য বলিয়াই জানিতাম, তাহা নহে, তাঁহাকে আমি বন্ধু বলিয়াও জানিতাম। অনেক সময় তাঁহার উপদেশমতে কার্য্য করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি. দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণে ও তাহার সুষ্ঠ মীমাংসা করিবার সময় তিনি যে আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা অতীব মূল্যবান্। ছয়মাস পূর্ব্বে মিঃ গোখেলকে কে সি আই ই উপাধি দান করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু গোখেল স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টতা সহকারে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা আছি তাহাই থাকি।" গোখেল আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; এখন তাহার স্থান পূর্ণ করিতে ভারতে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।

গত ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই ফাল্গুন রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়া) নগরে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন নাটোরের মহারাজ। সংবর্দ্ধনা এবং ষোড়শ উপচার-আতিথ্য যে মহারাজোচিত হইয়াছিল. বলাই বাহুল্য। সভাপতি ছিলেন—সবুজ পত্রের সম্পাদক বারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তাঁহার অভিভাষণ সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিতে চাই। সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার দিন তাঁহার কোন শুভার্থী বন্ধু তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন – যে সভাস্থলে "বীরবলী" ঢং চা'লবে না। বীরবলী ঢং যে চলে নাই, আমরা এ কথা বলিতে পারি না। তবে বীরবলী ঢংএ যে রং ও রস আমরা সময় সময় উপভোগ করিয়া আসিয়াছি সে রং ও রস আমরা ইহাতে পাই নাই। সভাপতি মহাশয় সম্ভবতঃ বসিয়া লিখিয়া থাকেন। সাহিত্য সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা এই তাঁহার দ্বিতীয়। বসিলে মানুষ কিছু হ্রস্ব হয়, দাঁড়াইলে দীর্ঘ। এই জন্য হয়ত সভাস্থলে আমরা "করছে" স্থলে 'করিয়াছে' শুনিতে পাইয়াছি। তাঁহার অভিভাষণে আমরা সাহিত্যিক রস প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা পালক শূন্য পাখীর ন্যায় শোভা হীন বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি যে দুই একটী উপদেশ দিয়াছেন তাহা অবশ্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তিনি ভাষায় প্রাদেশিকতার বিরোধী নহেন। তিনি প্রতিভার পক্ষপাতী। প্রতিভা পূজনীয়া, প্রাদেশিকতা নিন্দনিয়া নহেন। কোন প্রাদেশিক লেখক প্রতিভা দেখাইতে পারিলে, তিনি সাহিত্য জগতে সমাদৃত হইবেন এ আশ্বাস বাণী ঘোষণা করিয়া সভাপতি মহাশয় উত্তম কার্য্য করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় "আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান ক্রটী, তাহার বৈচিত্রের অভাব।" বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? আমাদের ত মনে হয়, প্রকৃত অবস্থা তাহার বিপরীত। আমরা দেখিতেছি, উৎকট অসহণীয় বৈচিত্র্যাধিক্যে, বঙ্গভাষা জননীর কোন কোন একনিষ্ঠ সাধককে ভীষণ মর্ম্মযাতনা দিতেছে। সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত ও আমার শ্রদ্ধাভাজন একটি সাহিত্যিক বন্ধু সম্প্রতি আমার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন "সুধীবর কালীপ্রসন্নের অন্তর্ধানের পর হইতে বাঙ্গলার সাহিত্য সরোবর হংস কারণ্ডব পরিশূন্য সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন ও প্রভাহীন হইয়া রহিয়াছে; উহার জলে আর মিষ্টতা নাই, জলের স্বচ্ছতা ও শীতলতা আর সে প্রকার অনুভূত হয় না, কুমুদ কমলদলের পরিবর্ত্তে উহা এখন কতকগুলা সাঁজ ও সেওলার আশ্রয় স্থল হইয়া পড়িয়াছে। হংস কারণ্ডব দিগের পরিবর্ত্তে পালে পালে কাক ও কাদা খোঁচা পাখী আসিয়া ঐ সরোবরের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছে। আর অধিক কি লিখিব?" বন্ধুবরের আক্ষেপ যে অকারণ, তাঁহার ভাষা যে অতিরঞ্জন দুষ্ট, তাহা বলিতে পারি না।

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, "সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থির বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এই কঠোর অপ্রিয় সত্যকে বাঙ্গালার আধুনিক "সাহিত্যিক" সম্প্রদায়, এবং বক্তা স্বয়ং ও ধীর

স্থিরচিত্তে প্রণিধাণ করিবার কিংবা তদনুসারে আচরণ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই ! তাহা হইলে তিনি সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির সম্ভ্রান্ত আসনে সমাসীন হইয়াও, সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়কে, সর্ব্বপ্রকার শীলতার মাত্রা উল্লঙ্ঘন করিয়া, এ ভাবে আক্রমণ করিতে পারিতেন না। "সভ্য সমাজে উপস্থিত হইতে হইলে, সমাজ সম্মত ভদ্র বেশ ধারণ করাই সঙ্গত—ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন। এ সভা স্থলে বীরবলী ঢং চলিবে না! যে কোন সভাতেই হউক না কেন, বিদূষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিম্নে, সে জ্ঞান যে আমার আছে, তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসা টুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না।" দুঃখের বিষয় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে "স্থির বুদ্ধির অপেক্ষা রাখিয়া," অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে, অন্ততঃ নিজের লেখা অভিভাষণটার আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা লেখক বুঝিলে তাহার অভিভাষণে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপর এত গুলা "বীরবলিক অ্যাসিড" নিক্ষিপ্ত হইত না। সরকার মহাশয়ের "কথার মূল্য যে কত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে কোন রূপ মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা নাই" কি আছে, তাহার বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই কিন্তু "মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে," এমনকি একটা বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনের মত প্রসিদ্ধ ও গণনীয় সভার সভাপতির কাজও যে করা যাইতে পারে, বীরবলের এই অভিভাষণই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

বিদায়—১৩২১।

ওগো বিদেশিনি, এসেছিলে তুমি
পথ কিনারার দেশে,
তরুণ দিনের অরুণ আলোকে
হেরিনু তোমারে কবে চোখে চোখে,
মৃদু কুয়াসার গুণ্ঠন তলেঃ-
নব বধূটির বেশে।

ফুলে ফুলে তুমি ঢালিয়া আসিলে
নব জীবনের মধু,
ছড়ায়ে আসিলে গগনের গায়
পরাণের আলো বরণ বিভায়
কাঁপায়ে আসিলে তরু পল্লব
পরাণ পরশে বঁধু!

জানাশোনা ওযে দুদিনের ওগো
বিদেশ বঁধুয়া মম!
অঙ্গন ঘিরি, ওগো বিদেশিনি,
বাজিল নূপুর তব রিণি ঝিনি,
তা'রি তালে বুক উঠিল পড়িল
মুগ্ধ পূজারী সম।

সারা হয়ে গেছে দুদিনের তরে
চপল চরণ ফেলা,
সারা হয়ে গেছে দুদিনের গান,
হাসি কান্নার দান-প্রতিদান,
সারা হয়ে গেছে পথ কিনারায়
ক্ষণিক দিনের খেলা।

বিরহ রাতের কতখানি সুর
অন্তরে করি জমা,
কত কল্পের কত আয়োজন,
একটি পলকে হলো সমাপণ,
আপনারে তুমি নিবেদিয়া গেলে,
হে প্রিয়, প্রেমিকোত্তমা!

তুমি এসেছিলে ঐ টুকু বুকে
ব'য়ে অসীমের বাণী,
তুমি এসেছিলে চপল চরণে,
গোধুলীর শেষে নীরব মরণে,
এনেছ গো পথ কিনারার দেশে
পথের বারতা খানি।

তোমার বাঁশরী বেজেছিল ওগো
সেই বাঁশরীর সুরে —
উদাস ব্রজের হৃদয়ের তলে
যে বাঁশী বাজিত প্রীতি আঁখি জলে,
হাজার পরাণ বাহিরিত পথে
লাজ ভয় রাখি দূরে।

বেজেছে সে বাঁশী অন্তরে মম,
বেজেছে গোধুলী শেষে,
তাই আজি শুধু ক্ষণিকের তরে
বিমনার মত চা'ব পথ পরে
যেই পথে যাব পিছনে রাখিয়া
পথ কিনারার দেশে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বিষয় সূচী।

১।	প্রাচীন বঙ্গীয় রাজগণের মুদ্রা (সচিত্র)	১৬৫
২।	তিব্বত অভিযান (সচিত্র)	১৭০
৩।	চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল	১৭৩
৪।	পত্রের পাঠ	১৭৭
৫।	কবিগান সংগ্রহ	১৮১
৬।	নিমেষ (কবিতা)	১৮৩
৭।	৺হরচন্দ্র চৌধুরী (সচিত্র)	১৮৩
৮।	নিবেদন (কবিতা)	১৮৭
৯।	দিব্য দৃষ্টি (গল্প)	১৮৭
১০।	মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলে (সচিত্র)	১৯৪
১১।	উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন	১৯৬
১২।	বিদায় ১৩২১ (কবিতা)	১৯৭

মুস্কিল আসানবড়ী,
জ্বরের গলায় দড়ী
২৪ বড়ী বার আনা,
খেয়ে কেমন দেখ না॥

এস. রায় এণ্ড কোং
৯০। ৩এ হেরিসন রোড—কলিকাতা।

উপহারের অপূর্ব্ব সুযোগ

হিন্দু গৃহের নিত্য সহচর
শৈব্যা, মহরম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত
সচিত্র

ব্রত-কথা

কথা—হিন্দু কুললক্ষ্মীর দৈনন্দিক জীবনের সহায়
গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্ম বিশ্বাস, গৃহধর্ম্মে
আস্থা, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি মহৎগুণ
শিক্ষার সোপান—কথা।

এক এক খানা গ্রন্থ রাখিয়া আপনার
অন্তপুর উজ্জ্বল করুন।

গৃহ লক্ষ্মীর বার ব্রতের ফটো ও চিত্র গুলি
উজ্জ্বল অভিনব।

প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী ঢাকা।

Published by Keder Nath Mazumder, Research house Mymensingh
Printed by Sat ish Chandra Roy, at the Jagat art Press, Dacca.

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি—সাহিত্য শাখা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি—দর্শন শাখা।

মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমান
সভাপতি—অভ্যর্থনা সমিতি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি—বিজ্ঞান শাখা।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
সভাপতি—ইতিহাস শাখা।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২২। { ৭ম সংখ্যা।

বর্ষ-বরণ।

আলোর রথ গগন-পথ বাহিয়া,
হৃদয়তীরে নামিল কিরে কুহেলি-নীরে নাহিয়া ?
এসেছ আলো, হরষধারে
এসেছ মেঘ-মুকুতা-হারে,
চপল-চল বিজুলী-ঝল নয়ন-কোণে চাহিয়া।

পলক শুধু গুণিছে ধূধূ বালি গো !
আঁখির পরে কাঁদিয়া মরে ব্যথার ভরে খালি গো !
কেবল তব নয়ন পাতে
গোলাপ-মোহে গগন মাতে,—
পথের ধূলে মুকুলে ফুলে স্বপন দেহ ঢালি গো !

বরষ ভরে ধূলার পরে বসিয়া
গড়ার মত ভাবিনু যত, গেল যা তত ধ্বসিয়া,
দেখাও কেন ধূলার পরে
ধূলার আশা ভাঙ্গিয়া পড়ে,
স্বপন, পরে এলায়ে পড়ে স্বপন-গড়া খসিয়া।

কাহার আঁখি শুকাতে বাকী আজি গো,
তরীর পরে লুটায়ে পড়ে জীবনঝড়ে মাঝি গো !
দেখাও শোক নিশাস বায়
হৃদয় শুধু উড়িয়া যায়,
পরাণ পুরে উদাস সুরে মরণ উঠে বাজি গো !

প্রতিটি ধূলি' কণিকা তুলি' আঁখিতে,
দেখাও কিছু নহেযে নীচু সবার পিছু রাখিতে।
অরুণ তব আঁখির আলো
ব্যথার পরে ঢালো গো ঢালো,
ভুলেরে তুলে লওগো কোলে দিওনা লাজে ঢাকিতে।

অনাদি হতে পেলে যা পথে কুড়ায়ে
জানিগো জানি যাবেনা জানি একটু খানি উড়ায়ে।
জানি গো বঁধু পরশে তব
ফুটিবে হাসি, উঠিবে রব ;
পথের পরে পরের তরে আপনা যাবে ফুরায়ে।

হৃদয় লীন ছিন্ন বীণ পরশে
গানের রেশে এসগো ভেসে দাঁড়াও এসে হরষে।
কল্যাণ চির করুণ ছন্দে
এসগো মাধুরী, এসগো গন্ধে।
এসগো গগন করিয়া মগন চির শুভাশীস্-বরষে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

তিব্বত অভিযান।

বিবিধ কথা।

লাসা সহর আয়তনে খুব ছোট। রাজপথ সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত। জল নিকাশের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে এস্থানে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব; তাহার উপর এখানকার লোক অত্যন্ত অপরিস্কার। সহরের রাস্তা ঘাট মধ্যে মধ্যে ধৌত করা আবশ্যক, তাহা ইহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমস্ত পথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড এবং মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত। শুনিলাম এস্থানে Public work Department এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ অবগত নয়। প্রয়োজন হইলে সহর-পুলিশ রাস্তা ঘাট প্রস্তুত এবং মেরামত করিয়া থাকেন। বাড়ী ঘর সমস্ত পাথরের। এখানকার লোক অত্যন্ত অপরিস্কার বটে, কিন্তু বাড়ীর বহির্ভাগটা সর্ব্বদা পরিস্কার রাখে। প্রায় সমস্ত বাড়ীর সম্মুখের প্রাচীর চুন কাম করা। সহরের বড় রাস্তাটি নিতান্ত মন্দ নহে। বড় আশ্চর্য্য যে, বাজারটি বেশ পরিস্কার, সারি সারি দোকান গুলি বেশ সাজান। এই সুদূর লাসার বাজারে নানা প্রকার বিলাতি, জার্ম্মণি ও জাপানি দ্রব্য দেখিলাম। কয়েকটা মদের দোকানও আছে। তাহাদের অবস্থা বেশ উন্নত বলিয়া মনে হইল। বাজারের মধ্যে অনেক চীনা ও নেপালী দোকানদার দেখিলাম। দুই চারিজন ভারতের মুসলমান রহিয়াছে। শুনিলাম ইহারা সকলেই লাসার স্থায়ী অধিবাসী।

জো পাং লাসার সার্ব্বপ্রধান মন্দির। বৌদ্ধ জগতে ইহার সম্মান ও স্থান বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা দর্শন করিবার জন্য সুদূর জাপান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানের যাত্রীরা দলে দলে লাসায় উপস্থিত হয়। মন্দিরটি দেখিয়া কিন্তু অত্যন্ত নিরাশ হইলাম। বাসা হইতে আমি ইহার যে প্রকার বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে একটা বিরাট কাণ্ড দেখিব বলিয়া আশা ছিল। মন্দিরের চারিদিকে বহুতর দরিদ্র লোকের বাড়ী। মন্দিরটি এত নীচু যে, উহার জন্য দূর হইতে উহা একবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরের ছাদ সোনালী রং করা। প্রবেশ দ্বার নিতান্ত সামান্য রকমের। আমরা যখন ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন দ্বারের নিকট কয়েকজন লামা দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন যে, দলাই-লামার বিনা অনুমতিতে ভিন্ন ধর্ম্মের কোন লোক উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা অগত্যা বিরত হইলাম। ইহার পর আমরা উহার ভিতর গমন করিবার আর অবসর পাই নাই। তবে শুনিলাম, উহার মধ্যে এক বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু দেখিবার নাই। উহার পুস্তকালয়ের মধ্যে নাকি বহুসহস্র পালি ও সংস্কৃত পুস্তক রক্ষিত আছে।

আমাদের লাসায় প্রবেশ করিবার দুই দিন পরে আমরা সকলে সহরের সর্ব্বত্র অবাধে ভ্রমণ করিবার আদেশ পাইলাম। কিন্তু সহরের কোনও মন্দির বা মঠের মধ্যে দলাইলামার বিনা অনুমতিতে গমন করিবার হুকুম পাইলাম না। সহরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি বাহির হইল বটে, কিন্তু জেনারেল সাহেব আমাদের সকলকে একা বা বিনা অস্ত্রে সহরের মধ্যে গমনাগমন করিতে নিষেধ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, তিব্বতীয়েরা চীনা, জাপানী, গুর্খা প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গোলিয় শাখা (stock) ভুক্ত। বিশেষ বিস্ময়ের কথা এই যে, জগতের সমস্ত মঙ্গোলিয় জাতিই (নেপালী, চীনা, জাপানী, সায়ামী, ভূটানী প্রভৃতি) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। শুনিয়াছিলাম, সদা প্রফুল্ল ভাব এই খাঁদানাক ও খর্ব্বাকার জাতির এক বিশেষত্ব। কথাটা যে নিতান্ত অতিরঞ্জিত নয়, তাহা লাসায় আসিয়া বুঝিলাম। এই সহর বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া এখানে সমস্ত মঙ্গোলিয় জাতিই উপস্থিত হয়। এই সকল যাত্রী লাসার বাজারে অবস্থান করিয়া থাকে, তথায় ইহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। ইহারা যে কত খোস্‌মেজাজের লোক তাহা যখনই বাজারে গিয়াছি, বুঝিতে পারিয়াছি। সর্ব্বদাই হাসি হাসি মুখ কারণ অকারণে মানুষ এত হাসিতে পারে, তাহা আমার ধারণাই ছিল না। মুখ 'গোঁজ' করিয়া থাকা ইহারা মোটে ভাল বাসে না। তিব্বতীয়দিগের স্বভাবও ঠিক এই প্রকার। আমি

যতদিন লাসায় ছিলাম, আষাঢ় মাসের আকাশের মত মুখ বোধ হয় কাহারও দেখি নাই।

স্ত্রীলোক অধিক হইবার আর একটি প্রধান কারণ, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ। এদেশে প্রায়ই সমস্ত ভাই মিলিয়া একজনকে বিবাহ করে। পাণ্ডবেরা যেমন পালা করিয়া দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এখানেও স্বামীরা সেইভাবে স্ত্রীর নিকট গমন করে। শুনিলাম, এ প্রথা এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। একজন প্রবীন লামা বলিলেন যে, এই প্রথা ভারতবর্ষ

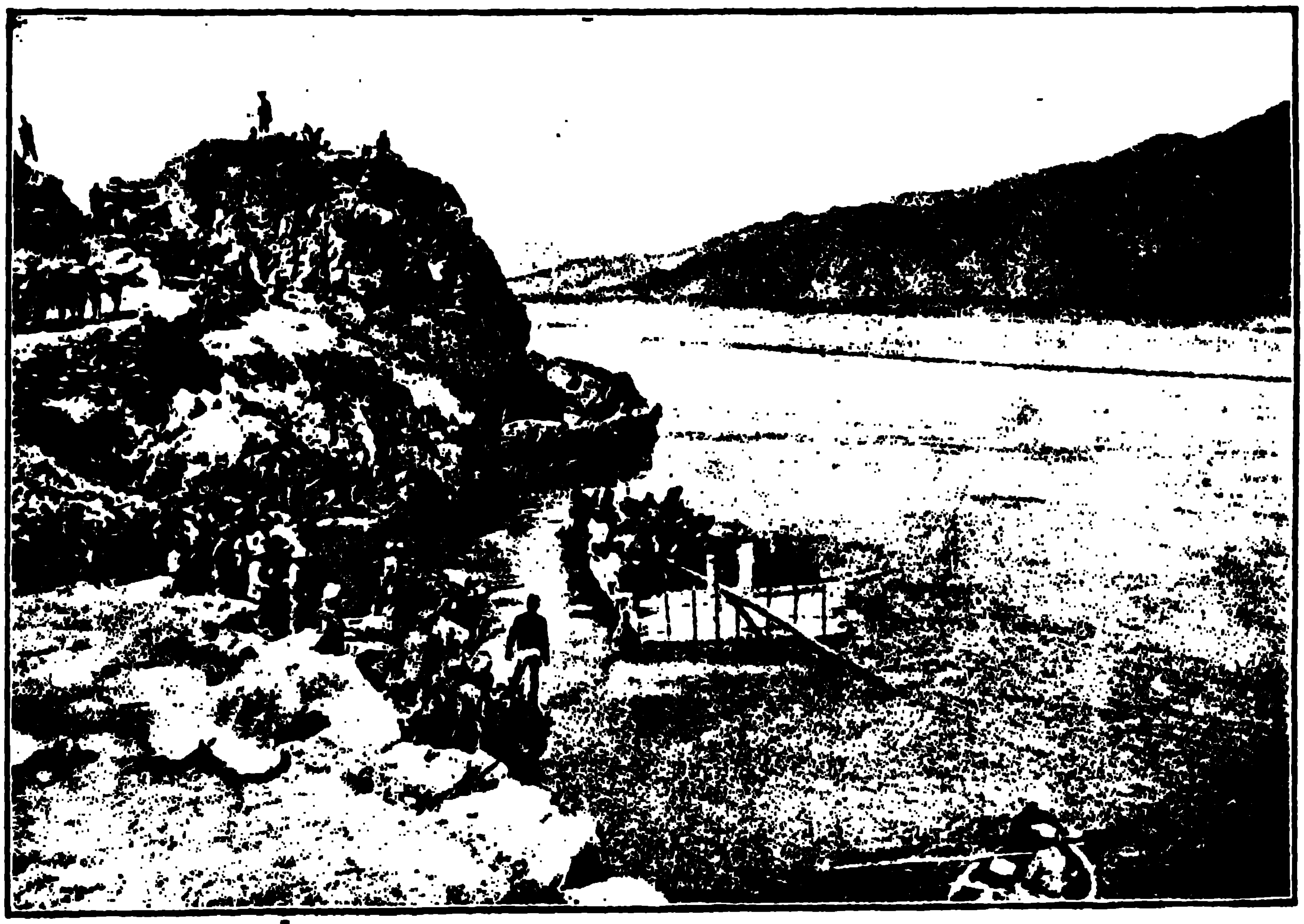

সেংপুনদীর খেয়ায় ইংরেজ সৈন্ত পার হইতেছে।

হইতে তাঁহাদের দেশে আসিয়াছে। একথাটা কতদূর সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন। তবে ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে আজ পর্য্যন্ত যে এই ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকেই জানেন।

লাসায় প্রধানত দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়, এক শ্রেণীকে দেখিতে অবিকল মঙ্গোলিয়দিগের ন্যায়—নাক চেপ্টা, বাদামী রং, গোল মুখ এবং দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ২।২॥ ইঞ্চির অধিক নয়। অপর শ্রেণীরা ইহাদের অপেক্ষা সুশ্রী। এই দুই প্রকার গঠন দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিব্বতীয়দিগের মধ্যে একাধিক জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, যে সকল ভারতবর্ষীয় প্রচারক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আর দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহাদের সংমিশ্রণে লাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিবাসী উৎপন্ন হইয়াছেন। লাসার উচ্চশ্রেণীর লোক প্রায় সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত।

এখানকার নরনারী উভয়েই অত্যন্ত অলঙ্কার ও রেশমী বস্ত্র প্রিয়। নিতান্ত দরিদ্র পর্য্যন্ত দুই এক খানি অলঙ্কার ও একখণ্ড রেশমী বস্ত্র সংগ্রহ করিতে একান্ত ব্যস্ত। এই রেশমীবস্ত্র প্রিয়তা সমস্ত মঙ্গোলিয় জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীন, জাপান, বর্ম্মা, তিব্বত—যেখানেই যাওনা কেন, ইহার একান্ত বাড়াবাড়ি দেখিবে। গহনার মধ্যে লাসার মুক্তা বসানো এয়ারিং, মোটা ২ রূপার বালা, অঙ্গুরি, পান্না বসান গলার হার—বড় লোকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। অবস্থা খুব ভাল হইলে এই এয়ারিংএর এবং হাড়ের সংখ্যা অধিক হয়। এখানকার মেয়েরা খোঁপা বাঁধে না। মস্তকের সমস্ত

কেশকে তিনভাগে বিভক্ত করে। দুইভাগ দুইদিকে অমনি 'আলুথালু' ভাবে পড়িয়া থাকে, আর এক ভাগ শিঁথির উপর মুকুটাকারে রক্ষিত থাকে। ঐ মুকুটের উপর ক্ষমতানুসারে মুক্তা, পান্না প্রভৃতি সাজান হয়।

এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই লুঙি পরে। উহা আটকাইবার জন্ত বেণ্ট ব্যবহৃত হয়। বড় লোকদের বেণ্টের সম্মুখভাগে পান্না, মুক্তা প্রভৃতি বসান থাকে। অঙ্গের অন্যান্য অংশ জ্যাকেট-আঁটা থাকে।

সাধারণ লোকের বাড়ীতে দুইখানা ঘর থাকে। একখানায় শয়ন ও অপর খানায় রন্ধন এবং ভোজন হয়। ঘর দুইখানি ঠিক পাশাপাশি নির্ম্মিত হয় এবং রন্ধনগৃহে ধূম বাহির হইবার কোনও উপায় না থাকাতে রন্ধনের সময় বাড়ীর কি প্রকার অবস্থা হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উঠান রাখিবার প্রথা বড় একটা নাই। বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনা প্রথমে রাস্তার উপর ফেলা হয়। যখন আর তথায় স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন বাড়ীর মধ্যেই উহা জমিতে থাকে। রাস্তার ময়লা পথিকদিগের পায়ে ২ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত রাস্তার উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি করে। এইভাবে তিব্বতের অধিকাংশ বাড়ীর প্রবেশ দ্বার রাস্তার সমতল (level) হইতে অনেক নীচু হইয়া যায়।

চা এ দেশের সর্ব্বপ্রধান পানীয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ সকলের গৃহে উহা সর্ব্বদা প্রস্তুত দেখিতে পাইবে। জল বড় একটা কেহ পান করে না। ইহারা চা'র সহিত চিনি আদৌ ব্যবহার করে না। যব বা গমের রুটি সকলেই ব্যবহার করে। যবসিদ্ধ দরিদ্র দিগের প্রধান খাদ্য। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা মাংস, আলু, ফুল ও বাধাকপি, শালগম প্রভৃতি সচরাচর ব্যবহার করেন। কপি এবং আলু বারমাসই পাওয়া যায়। সুখের বিষয় সুরাপানের প্রচলন খুব কম।

তিব্বতীয়েরা কি প্রকার অপরিষ্কার তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আর একটা মহৎ দোষ এই যে, ইহারা জল স্পর্শ করিতে আদৌ ভাল বাসে না। বৎসরের মধ্যে অনেকে একবার বা দুইবারের অধিক স্নান করে না। তাহাও নাম মাত্র - মস্তকে এক ঘটির অধিক জল ঢালে না। অঙ্গাদি মার্জ্জনা করিবার প্রথা আদৌ নাই। আহারাদি এবং প্রাতঃকৃত্যের পর অপরিষ্কার অঙ্গ মুছিয়া ফেলে, এক বিন্দু জল ব্যবহার করে না। লাসায় এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা পাঁচ ছয় বৎসর যাবত জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। ইহাতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে কি পরিমাণ ময়লা জমে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। দাঁত মাজিবার বা মুখ ধুইবার প্রথা তিব্বতে একেবারে নাই। অধিকাংশ সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মুখের উপর প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ ময়লা জমিয়াছে। পাঠক! বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। তাহাদের মুখ হইতে এমন এক নরকের গন্ধ বাহির হয় যে, পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড়াইলেও তাহাদের সহিত কথা কওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। বাধ্য হইয়া নাকে রুমাল লাগাইতে হয় অথবা ঘন ঘন চুরুটের ধূম ছাড়িতে হয়।

এ দেশের মেয়েরা এ বিষয়ে পুরুষদেরও অধম। তাহারা মস্তকের কেশে ও মুখে চর্ব্বি মর্দ্দন করে। ইহাতে দুর্গন্ধ ও ময়লার পরিমাণ কি প্রকার বৃদ্ধি পায়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এ দেশের মেয়েদের মুখ পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত লজ্জার কথা। দাঁত মাজিলে বা মুখ পরিষ্কার করিলে, সকলে তাহাকে বারবনিতা মনে করে এবং তাহাকে সমাজের মধ্যে বাস করিতে দেয় না। আমার বোধ হয়, তিব্বতীয় রমণীদিগের ন্যায় অপরিষ্কার নারী পৃথিবীর আর কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইহাদের এই প্রকার স্বভাব বলিয়া আমরা ইহাদের সহিত বেশ খোলা খুলি ভাবে মিশিতে পারিলাম না। যদি কোনও তিব্বতীয় ভদ্রলোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাহা হইলে আমরা অতি কষ্টে তাহার নিকট কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিয়া থাকিতাম। এক এক সময়ে এমন অসহ্য হইয়া পড়িত যে, একটা বাহানা করিয়া উঠিয়া যাইতে হইত। বড় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ইহারা মোটে ভাল বাসে না। উহাদের গন্ধে তাহারা এমন মুখ বিকৃত করে যে আমরা বিষ্ঠার দুর্গন্ধেও তাহা করি না।

তিব্বতে একটা কিম্বদন্তি আছে যে, লাসায় লামা, স্ত্রীলোক ও কুকুর ভিন্ন আর কেহই নাই। কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে; এই সহরের লোক সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। ইহার মধ্যে লামার সংখ্যা প্রায় ৪০০০ এবং স্ত্রীলোক প্রায় ২০,০০০। স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত অধিক হইবার কারণ এই—তিব্বতের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা (administrative power) লামাদের হাতে; ইঁহারাই এদেশের শাসন কর্ত্তা। এই জন্য দেশের অধিকাংশ লোক লামা হইবার চেষ্টা করেন। লামাদিগকে চিরকুমার থাকিতে হয়। এইজন্য সহরের অনেক রমণী বিবাহ করিবার অবসর পায় না। চিরকুমার লামা এবং অবিবাহিতা যুবতীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এখানে ব্যভিচারের পরিমাণ খুব বেশি।

এখানকার দোকানে দ্রব্যাদি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। কোন বিশেষ দ্রব্যের আবশ্যক হইলে খুজিয়া পাওয়া কঠিন তিব্বতের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ কোনও দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য আমরা কয়েকটা বড় ২ দোকান ঘুরিলাম। কিন্তু মনের মত কিছু পাইলাম না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ দেশের লোক শিল্প বা কারুকার্য্যে আদৌ দক্ষ নহে। শিল্প চর্চ্চা এদেশে নাই বলিলেও হয়। তবে নানা প্রকার আরণ্য ও গৃহ পালিত জন্তুর লোম এবং চর্ম্ম লাসায় যথেষ্ট আনীত হয়। আমরা কয়েকটা চিতা, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও বন্য বিড়ালের চামড়া খুব অল্প দামে সংগ্রহ করিলাম। বিদেশী দেখিয়া দোকানদার বিশেষভাবে আমাদের মাথায় হাত বুলাইতে চেষ্টা করিলেন। অর্থাৎ জিনিষ গুলা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, উহা ঘরে রাখিলে লক্ষ্মী চিরদিন অচলা থাকিবেন এ জিনিস বাজারে আর নাই প্রভৃতি কথায় চিড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলেন। এ প্রকার ঘটনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া অবশেষে তাহাকে সোজা পথে চলিতে হইল।

বাজারে দ্রব্যাদি সচরাচর "বিনিময় প্রথায়" ক্রয় বিক্রয় হয়। মুদ্রার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু তাহা খুব কম। লাসায় একটি ছোট টাঁকশাল আছে। তথায় ক্ষুদ্র ২ রজত মুদ্রা প্রস্তুত হয়। ইহার আকার ও মূল্য নেপালী ক্ষুদ্রা—তঙ্কার মত। ইহার নামও তঙ্কা। ভারত বর্ষীয় টাকার আদর এখানে খুব অধিক। চীনা ও রুষীয় মুদ্রাও বাজারে প্রচলিত আছে।

এই সময় একদিন আমি একজন ইংরাজ সংবাদদাতার সহিত নেপালী কন্‌সলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি নেপালের একজন উচ্চশ্রেণীর লোক। বহুদিন হইতে লাসায় বাস করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। আমাদিগকে তিনি যথেষ্ট আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। সামান্য জল যোগের পর তিনি আমাদিগকে অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনাইলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই; তিব্বতের জন সাধারণ ইংরাজের আগমনে বিশেষ সন্তুষ্ট। লামারা ও কয়েক জন উচ্চশ্রেণীর লোক কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। জনসাধারণ লামাদিগের অত্যাচারে অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাদিগের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, অর্থ, অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই লামাদিগের সেবায় নিয়োজিত। যখন যে প্রকার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার কেহই নাই। ইংরাজ কিভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাহা প্রায় সকলেই জানে। এইজন্য সাধারণের একান্ত ইচ্ছা যে, ইংরাজ তিব্বত অধিকার করিয়া ভারতের ন্যায় ইহাকেও শাসন করেন।

দলাইলামা যে প্রকৃতই লাসা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা কন্‌সল্ মহাশয়ের নিকট আমি বিশ্বস্ত ভাবে জ্ঞাত হইলাম। তিনি নাকি মঙ্গোলিয়া অভিমুখে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তাঁহার প্রিয় সচিব দর্‌জিফ ভিন্ন আর কোনও বিশিষ্ট লোক নাই।

লাসায় মুসলমান সওদাগর দিগেরও একজন কন্‌সল্ বাস করেন। উপস্থিত কন্‌সল্ মহাশয় লড্ডাকের একজন প্রধান ব্যবসায়ী, প্রায় ৩৫ বৎসর যাবত তিনি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। সহরের ইনি একজন বিশেষ মান্যগণ্য লোক। মুসলমান অধিবাসীদিগের কৃত অপরাধের বিচার ইহাঁর নিকট হইয়া থাকে।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

মানবকৃত ভৌগলিক পরিবর্ত্তন।

এমন একটা সময় নিশ্চয়ই ছিল, যখন সকলেরই সমস্ত পৃথিবীর উপরই অধিকার ছিল, যখন এটা আমার জায়গা, ওটা তোমার জায়গা, এইরূপ ভেদ বুদ্ধির জন্ম হয় নাই। তার পর ক্রমে ক্ষমতা সম্পন্ন জাতিগুলি পৃথিবীর এক একটা অংশ দখল করিয়া বসিল; এবং সেই হইতেই পৃথিবীটা নানা খণ্ডে, নানা দেশে বিভক্ত হইয়া গেল। এই বিভাগে যে জাতির যেমন শক্তি, সে সেই অনুসারেই আপন স্বত্ব বিস্তার করিল। কিন্তু এই খানেই শক্তির পরিচয় শেষ হইল না। এর পরেও যে যে দিক্ দিয়া পারিল, অন্যের অধিকৃত ভূমি গ্রহণ করিতে ছাড়িল না। মহাশক্তি এইরূপে আপন মহিমা এখন পর্য্যন্ত জগতে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের কতকগুলি লোকের মাথায় খেয়াল চাপিল, তারা তাদের অধিকৃত ভূমিতে অন্য দেশের লোকের কোন স্বত্ব স্বীকার করিবে না। ফলে চীনের বিরুদ্ধে অষ্ট বজ্র মিলন হইল; ইউরোপ ও আমেরিকার শক্তিনিচয় অস্ত্র-ন্যায় দ্বারা চীনকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে—যদিও কোন আদিম কালে চীনবাসীরা আপনার শক্তিতে পৃথিবীর ঐ অংশটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তথাপি শক্তি এখন আর তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবে না; পরাক্রান্ত শক্তিদিগকে কতক কতক স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেই হইবে। চীন কথাটা বুঝিল; সুশীল ও সুবোধ ছেলের মত মাথা পাতিয়া বলিল 'তথাস্তু।' সুতরাং সকলেই কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া চীনকে কৃতার্থ করিলেন, এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, 'তোমার কোনই অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; আমরা থাকিতে কেহই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না; তোমার বন্দরগুলিতে সকলকেই অবাধে বাণিজ্য করিতে দিও।' চীন মনে করিল, 'অনুগৃহীত হইলাম; সভ্য না হইলে এমন কৃপা কেহ দেখাইতে পারে না।'

জর্ম্মণী চীনের নিকট হইতে নিরনব্বই বছরের জন্য পাট্টা করিয়া কিউ-চৌউ প্রদেশটা গ্রহণ করিলেন; সেখানে কেল্লা ইত্যাদি নির্ম্মিত হইল; জার্ম্মাণী মনে মনে ভাবিলেন, 'যাহা হউক তবু একটু বসিবার স্থান পাওয়া গেল; এখন শুইবার স্থানের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

পরাশর যখন সংহিতা লিখিয়াছিলেন তখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা তাঁহার পূর্ব্বেও যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। তিনি অতীতের দিকে দৃষ্টি করিয়া যাহা বুঝিয়া ছিলেন, ভবিষ্যৎ তাহা সমর্থন করিল "খড়েগনা ক্রম্য ভুঞ্জীত, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

হঠাৎ ইউরোপে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। জাপান ভাবিলেন, কিউ-চৌউতে জর্ম্মণীর থাকিবার কি অধিকার আছে, তাত জানি না। জর্ম্মণকে লিখিয়া পাঠান হইল, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কিউ-চৌউ আমায় প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, আমি উহা চীনকে ফিরাইয়া দিব; যদি না দেওয়া হয়, বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করা হইবে।" বল পূর্ব্বকই উহা গৃহীত হইয়াছে। চীন এখন বলিতেছে, 'কই আমাকে যে উহা ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল, তার কি হইল? যার বল নাই, তার বুদ্ধিও থাকে না। জাপান বলিলেন, কি আহাম্মক, জর্ম্মণী যদি উহা আপোসে ছাড়িয়া দিত, তবেইত উহা ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল; কারণ, তাহাতে আমার কোন লোকসান ছিল না। এখন আমি অর্থ ও রক্তপাত করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছি; ইহাতে জর্ম্মণীর স্বত্ব নষ্ট হইয়া আমারই স্বত্ব জন্মিয়াছে। তুমি পূর্ব্বে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই তৃতীয় পক্ষই থাকিয়া যাইবে। নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করা হয়, তাহা কেহ অন্যকে ছাড়িয়া দেয়—এমন কথাতো কোথাও শুনি নাই।" চীনের কতটা বুদ্ধি, তাহার পরিমাণ করা শক্ত। আগে ছিল অহিফেন ভক্ত, এখন হইয়াছে অন্তঃ সংস্কারের ভক্ত। এই সাধারণ ন্যায়টা চীন বুঝিয়াছে কিনা সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা কিন্তু বুঝিয়াছেন এবং সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতার জন্য জাপানকে ধন্যবাদ দিতেছেন। চীনকেও বুঝান বেশী কঠিন হইবে না; কারণ মূর্খেরা এক প্রকার যুক্তি অতি সহজেই বুঝে, যাহা কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

পরাশর মরিয়া অমর হইয়াছেন, কারণ তিনি না হইলে একথা কে বলিতে পারিত যে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"।

কয় হাজার বছর ঠিক গুণিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু অনেক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ গ্রহান্তর হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে পৃথিবীর দিকে চাহিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, জলে স্থলে বিভক্ত, পর্ব্বতে সরিতে পরিশোভিত, বৃক্ষে লতায় পরিপূর্ণ আমাদের এই বসুন্ধরায় বহু প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি দ্বিপদ প্রাণীও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর, ইহাও দেখিতে পাইত যে এই দ্বিপদ জন্তু গুলি কখনও বা বন্য ফল মুল, কখনও বা বন্য জন্তুর আম মাংস আত্মসাৎ করিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে! তখন বৃক্ষটী ভাবিত, সে যেখানে আছে সেই খানেই থাকিতে পারিবে; নদী ভাবিত, তাহার স্বাধীন গতি, যেদিক দিয়া ইচ্ছা চলিতে পারিবে; পর্ব্বত ভাবিত, তাহার দেহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে; জল ভাবিত, স্থলের কোন ভয় আমি রাখি না; আর, স্থল ভাবিত, জল আমাতে ব্যপ্ত হইবে কেমন করিয়া? কিন্তু কে জানে কেমনে, হঠাৎ এই দ্বিপদ জন্তুগুলি মনে করিল পৃথিবীটা ঠিক পছন্দ মত নয়; ইহার উপর কিছু কারুকার্য্য করিয়া নিজের মনোমত গঠন করিয়া নিতে হইবে! চরাচর কম্পিত হইল! চেতন অচেতন সকলই ভীত হইল! বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা, না জানি কি হয়! সেই হইতে মানুষ কত রকমে যে আপনার শক্তির পরিচয় দিতেছে, কত পরিবর্ত্তন যে পৃথিবীতে আনয়ন করিতেছে, বলা কঠিন। নিতান্ত মাটীর মানুষ বসুন্ধরা, নীরবে সমস্তই সহিয়া যাইতেছেন।

এত সব বিবিধ প্রকারের জীব জন্তুর যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন সকলেরই এই পৃথিবীতে স্থান হইবে কিনা, স্রষ্টা একথা ভাবিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, কাজে ত দেখা যায় যে সকলের এখানে থাকিবার সুবিধা হইতেছে না। অন্যান্য জন্তুর সম্বন্ধে মানুষ চিরকালই মনে করিতেছে যে মানুষের স্থান হইয়া যদি কিছু অতিরিক্ত হয় তবে, ইহারা বসবাস করিতে পারিবে; অথবা মানুষের চিত্ত বিনোদন, করিতে পারিলে, মানুষের তৈয়ারী গৃহে ইহাদের কাহারও কাহারও স্থান করিয়া দেওয়া যাইবে। ইহারা যে যেখানে খুসী ঘুরিয়া বেড়াইবে, সে সুবিধা ইহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে না। অন্য জন্তুর সম্বন্ধীয় সমস্যাটীর এইরূপ মীমাংসা করিয়া মানুষ বুঝিল 'আমাদেরই সকলের এখানে সুবিধামত স্থান হয় কই। পৃথিবটা যে ছোট হইয়া গিয়াছে তা নয়; তবে, সব খানে ত সুবিধা মত বাস্তব্য করা যায় না। আর, ভাল ভাল স্থান গুলি যে সে দখল করিয়া রাখিবে, সেই বা কোন্ কাজের কথা! সুতরাং ফলে হইতেছে এই যে একজন নিজের সুবিধা ও রুচি অনুসারে ঘর বাড়ী, সহর বাজার তৈয়ার করিয়া বাস করিতে আরম্ভ না করিতেই আর একজন আসিয়া বলে এখানটা আমাকে দিতে হইবে।' তারপর, করালী শক্তির লীলা এবং অন্তিমে বসুন্ধরা বীরকেই বরণ করেন।

শিল্প নির্ম্মাণ শেষ হইলে তাই দেখিয়া শিল্পী আপনার কৃতিত্বে আত্ম প্রসাদ অনুভব করে। লুভেঁ সহরটীকে জ্ঞান বিজ্ঞানে সুসজ্জিত করিয়া বেল্জিয়ম্ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু জর্ম্মণী মনে করিল, ইহাকে ধূলিসাৎ করা আমার দরকার সুতরাং বেল্জিয়মের হৃদয় হইতে লুভেঁ অন্তর্হিত হইল। একজন গড়ে, অন্যে তাহা ভাঙ্গে। রাখিতে না পারিলে কোনো স্থানই কারও নয়; এবং যে যতটুকু রাখিতে পারে, তার তত টুকু স্থান। এবং যখনই হস্ত পরিবর্ত্তন হয়, তখনই অনেক ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টি হয়। কিউ-চোউ'তে জর্ম্মণী যাহা গড়িয়াছিল তাহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; আবার যে নূতন নির্ম্মাণ হইবে, তাহার ধ্বংস কবে হইবে, মহাকালই বলিতে পারেন।

কতকাল যাবৎ যে পৃথিবীর অঙ্গ এইরূপে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আসিতেছে, কে জানে? ধরিত্রী যখন মানব নামক দ্বিপদ জন্তুকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন যে বড় হইয়া এই শিশু তাহার দেহের উপর এত অত্যাচার করিবে, তবে ইহাকে বক্ষে ধারণ করিতেন কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর অংশ বিশেষ নিয়া নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করিয়া মানুষ যে কেবল সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংস ও ধ্বস্ত বস্তুর সৃষ্টি

করিতেছে, এমন নহে ; আরও কত রকমে, কত চেতন অচেতন বস্তুর উপর মানুষ অত্যাচার করিতেছে, কে তাহার অভিযোগ আনিবে ?

এক একটা জাতি পৃথিবীর এক একটা অংশ অধিকার করিয়া বসিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর যে চেহারা ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে সমাজের ভিতর থাকিয়া আমরা কদাচিৎ তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। এই যে আমরা সুখপ্রদ সুসজ্জিত গৃহে বাস করি, এতো বিধাতার নিজের সৃষ্টিতে কোথাও ছিল না ; ইহা তো সম্পূর্ণই মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্ট গৃহ সমূহ দ্বারা গ্রাম ও নগরের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ফলে, কত অরণ্যানী বিলুপ্ত হইয়াছে, কত নদী স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, কত জল স্থলে ও স্থল জলে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? যেখানে নিতান্তই প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ সৃষ্টি বিরাজ করিত সেইখানে মানুষ আপন সৃষ্টি মিশাইয়া দিয়া কি যে অভিনব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, লোকালয়ের বহির্ভূত পর্ব্বত বা অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাহার কতকটা ধারণা করা যায়। নীরব পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদ করিয়া কত প্রস্তর খণ্ড আহৃত হইতেছে, কত সরস মৃত্তিকা দগ্ধ হইতেছে, কত বৃক্ষ কর্ত্তিত হইতেছে, তবে তো মানবের আবাস গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু মানুষ কেবল বাস করিতেই চায় না, সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চায়। যাহার বাস করিবার উপযুক্ত স্থান দিতে গিয়াই পৃথিবীকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে পৃথিবীর লাঞ্ছনা কত হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না।

ইন্দ্রের বজ্র যাহার দুইখানা পক্ষ ছেদন ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে নাই, মানবের ঈপ্সিত পথ রোধ করিতে গিয়া সেই ভূধরেরই বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মানুষ যে খান দিয়া জল পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে, স্থল সেখানে জলে পরিণত হইয়াছে। লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল যে ভূভাগ, মানবের খনিত্র সেখানে খনন ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। সে দিন আবার পানামার ভিতর দিয়া এক জল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আট্‌লান্টিক্ ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে নৈকট্য সম্পাদন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও কত শত ছোট ছোট জল পথ মানুষ দরকার মত করিয়া নিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ? প্রকৃতি যে খানে স্থল সৃষ্টি করিয়াছিল, মানুষের কৃতিত্ব সেখানে জলের স্থান করিয়া দিতেছে। এক ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনেই ৪৬০০০ হাজার মাইল পরিমিত ভূমি খালে পরিণত হইয়াছে।

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।" কবি মনে করিয়াছিলেন যে ঈপ্সিত অর্থ পাইতে দৃঢ়সংকল্প যে মন তাহাকে নিম্নাভিমুখ জলের সহিত তুলিত করিয়া একটা ভাল উপমারই সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের মনই আবশ্যক মত নিম্নাভিমুখ জলের গতিও রোধ করিবে। স্বয়ং ঐরাবৎ যাহার ঢেউ সহ্য করিতে পারেন নাই, সেই ভাগীরথীকেই মানুষ কত রকমেই না বাঁধিয়াছে। সারাতে সে দিন কি কাণ্ডই না হইয়া গেল। জল যেখানে স্থলে ২ ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রয়োজন মত মানুষ সে ব্যবধান দুর করিয়া দিতেছে।

জলে স্থল, স্থলে জল উৎপাদন করিয়াই মানুষ ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ না থাকিলে যে স্থান নিতান্ত অসমান থাকিত, সেই বন্ধুর ভূমিকে সমতল করিয়া মানুষ আপনা রুচিমত পথ সৃষ্টি করিতেছে ; এবং প্রয়োজন মত উচ্চকে নীচ ও নীচকে উচ্চ করিতেছে। সাগরের প্রণয়িনীরা ভাবিতেন, তাঁরা তাঁদের অভিরুচি অনুসারে যার তার পথে সাগর সঙ্গমে যাইবেন ; কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া তাঁদের অনেককেই ন্যুনাধিক অভিসারের পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। প্রিয়সঙ্গমে বিলম্ব অসহনীয় মনে করিয়া যে নদী চারিদিকের ভূমির সমস্ত রস সংগ্রহ করিয়া সোজা পথে প্রিয়কে উপঢৌকন দিতে চলিয়াছিল, মানুষ আবার সেই নদীরই মধ্যপথে গতিরোধ করিয়া উষর ভূমি উর্ব্বর করিয়া নিতেছে। মিশরের নীল-নদী, উড়িষ্যার মহানদীর ভাগ্যে এই শাস্তি ঘটিয়াছে। আমেরিকার মিসিসিপি ও সেণ্ট লরেন্স, ইউরোপের এলব্ ও রাইন্, প্রভৃতি নদীরও মানুষের হাতে কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হইয়াছে।

দাশরথি যেমন ধ্যান নিমগ্ন ধূমপায়ী শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন, মানুষ ও তেমনই প্রবীণ তপস্বীর মত দণ্ডায়মান কত উন্নতশির অরণ্যানীর বিনাশ করিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? দাশরথির সে তপস্বী-হত্যায় নাকি জগতের হিতই হইয়াছিল; কিন্তু মানুষের এই হত্যা ক্রিয়ায় মানুষেরই অনিষ্ট হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশের দক্ষিণভাগে আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত সংলগ্ন বৃক্ষরাজি কর্ত্তন করিয়া সেখানে মেষ চারণের সুবিধা করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, অধিত্যকা ভূমি মরুপ্রায় হইয়া যায়, এবং একান্ত বৃষ্টির জন্য উপত্যকা জলাক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষেও লৌহপথ প্রভৃতির জন্য বহুকাষ্ঠের প্রয়োজন হওয়ায় অনেক বৃক্ষ কর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল, এবং অনেক স্থলে ভূমিকে কর্ষণোপযোগী করিবার জন্য ঘাস ও তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের ক্ষুদ্র ২ অঙ্কুরগুলি অগ্নিসাৎ করা হইতেছিল। ফলে, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও অতিরিক্ত জলপ্লাবন হইয়া দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছিল। সেই জন্য গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে গবর্ণমেণ্ট অরণ্যানী রক্ষারই বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু নীবিড় অরণ্যানী রক্ষারই চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, গ্রামের ক্ষুদ্র ২ বনগুলি এখনও মানুষের হাতে নিস্তার পাইতেছে না। বৃক্ষের কর্ত্তন যে হারে হইতেছে, তাহার তুলনায় রোপণ হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইন্ধন কাষ্ঠের বর্দ্ধমান অভাব তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অরণি ও উত্তরারণির আশ্রয়ে যে দেশে প্রথম সর্ব্বভুকের আবির্ভাব হইয়াছিল, আর কিছু দিন পরে সে দেশে কাষ্ঠ আর তাহার আশ্রয় হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এরই মধ্যে ভূমধ্যস্থিত দগ্ধীভূত অরণ্যানী অঙ্গার রূপে মানুষের গৃহে হুতাশনের আবাহন করিতেছে; কিন্তু অমিতব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হইতে পারে। সুতরাং কবে ইহারও তিরোধান হইবে, এখনই তাহা চিন্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভূধর, অরণ্যানী ও তরঙ্গিনী যে মানুষ তুচ্ছ করিয়াছে, মরুই আর তাহার ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ক'দিন টিকিবে? কোন কোন জায়গায় নাকি মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারাই মরুর সৃষ্টি করিয়াছে। ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ নামক এক ব্যক্তি বলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি নামক মরুভূমি মানুষের চেষ্টার ফলেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলিকে বিনাশ করিয়া মানুষই তাহার পরিসর বৃদ্ধির উপায় করিয়া দিয়াছে। ইনি আরও বলেন যে মানুষ চেষ্টা করিলে আবার বৃক্ষ রোপণ ও কর্ষণের সাহায্যে মরুটীকে আরও সংকীর্ণ করিয়া আনিতে পারে। ভূমির অভ্যন্তরস্থ রস সংরক্ষণ করিয়া বৃষ্টির সাহায্য ছাড়াও আমেরিকাতে শস্য উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া কোন ২ মরুতে শস্য উৎপাদনের কথা ইতিমধ্যেই উঠিয়াছে। তা-ছাড়া, কূপও খাল খনন করিয়া মরুতে জল সুলভ করিয়া দিলে মরুর মরুত্ব লোপ পাইবে। আল্‌জেরিয়ার ভিতরে সাহারার যে অংশ পড়িয়াছে, সেই অংশেই কূপোদকের সাহায্যে ১৯০২ সনের এক হিসাব অনুসারে ২২০০০ বর্গ মাইল ভূমি শস্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতেও কূপ খনন করিয়া মরুভূমির অনেকাংশ শস্য শ্যামল করা হইয়াছে।

ভূধর ভেদ করিয়া যদি লৌহ পথ চলিতে পারে, তবে মরুর দগ্ধ-হৃদয় বিদীর্ণ করা আর কঠিন হইবে কেন? দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াকে ব্যবহিত করিয়া রাখিয়াছিল যে মরু, মানবের লৌহ-পথ শীঘ্রই তাহার ভিতর দিয়া গমন করিয়া সে ব্যবধান দূর করিয়া দিবে।

সাহারার বিস্তীর্ণ মরু অনেকদিন পর্য্যন্ত মানুষের অজেয় হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু চিরকালই থাকিবে, একথা বলা যায় না। এর মধ্যেই কথা উঠিয়াছে—খাল কাটিয়া ভূমধ্য সাগরের জলরাশি দ্বারা সাহারাকে প্লাবিত করিয়া দেওয়া যায়; এক যুগে যাহা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র, যুগান্তরে তাহাই শীতল মস্তিষ্কের ধ্রুব সত্য। বিজ্ঞান কালে কি করিবে, কে জানে?

এই সমস্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা মানুষ স্থানবিশেষের স্বাস্থ্যেরও পরিবর্ত্তন করিতেছে। বৃক্ষ কর্ত্তন বা বৃক্ষ রোপণ দ্বারা মানুষ স্থান বিশেষের তাপ বা শৈত্য ইচ্ছা মত বৃদ্ধি করিতেছে। মানবের অধিবাসের অনুপযুক্ত স্থানকেও বিজ্ঞান উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

প্রকৃতির উৎপাদিনী শক্তিকে নিয়া মানুষ কি ক্রীড়াই না করিতেছে! প্রকৃতিতে যেখানে যে জিনিসটী হইত না, মানুষ সেইখানে সেই জিনিসটীই উৎপন্ন করিতেছে; প্রকৃতিতে যেখানে যে জিনিসটী যে আকারের বা যে প্রকারের হইত, মানুষ ইচ্ছামত সেখানে সে জিনিসের আকার ও প্রকার পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইতর জন্তুকে ভূমি হইতে উচ্ছিন্ন করিয়াই যে মানুষ ক্ষান্ত হইয়াছে, এমন নহে; নিজেদের মধ্যে ভূমি লইয়া হস্তাহস্তিই যে মানব-শক্তির চরম বিকাশ, তাহাও নহে, ভূমি যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারই সঙ্গে মানুষ লড়াই করিতেছে। ভৌগলিক পণ্ডিতেরা পৃথিবীটা যেমন সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন; কিন্তু পৃথিবীর এই বীর-শিশুর বিচিত্র ক্রীড়ায় যে অসংখ্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কবে ভূগোলে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে? অথচ, এখনই এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যে আর কিছুদিন পরে হয় ত আর ভূগোলের পৃথিবীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ছোটনাগপুরী হো।

বড় নাগপুর মধ্য-প্রদেশে, আর ছোট নাগপুর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে। বিহার ও উড়িষ্যার মাঝখানে চাপা পড়িয়া 'ছোটনাগপুর' নামটির ক্রমেই ছোট ও অপ্রকট হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে।

'নাগপুর' নাম কেন? রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে যে সব নাগ তক্ষকের সঙ্গে আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা লাভ করেন, পুণ্ডরীক নাগ তাঁহাদের অন্যতম। আসন্ন-মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পুণ্ডরীক নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। অবশেষে কাশীতে যাইয়া তিনি ব্রাহ্মণ বালকের ছদ্মবেশে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। তাঁহাকে আর গুরুদক্ষিণা দিতে হইল না। বরং গুরুমহাশয়ই পরম দাক্ষিণ্য সহকারে স্বীয় অনুপমা কন্যা পার্ব্বতীকে সম্প্রদান করিয়া শিষ্যকে বিদায় করিলেন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কুমার ওরফে পুণ্ডরীক নাগ আর কাল বিলম্ব না করিয়া পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশ দাক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীর তখন গর্ভাবস্থা, তিনি স্বামীকে জগন্নাথ তীর্থ দর্শন করার বাসনা জানাইলেন। পুণ্ডরীক পুরীর পথ ধরিয়া ঝারখণ্ড নামক আরণ্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। স্ত্রীর কাছে ছদ্মবেশ আর কতদিন গোপন থাকিবে? হাজার পণ্ডিত হউন, নাগ তো বটেন, গায়ের গন্ধটা অনিবার্য্য। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই পার্ব্বতীর মনে একটু সন্দেহের আবির্ভাব হইল। হা কপাল, ব্রাহ্মণের হাতেই পড়িলাম, না চণ্ডালের হাতে পড়িলাম ঠিক কি? পুণ্ডরীকের নানা শাস্ত্র 'মুখস্থ' ছিল; মুখের ভিতর শাস্ত্র থাকায় তাঁহার সর্প-জিহ্বাটি সর্ব্বদা ঢাকা থাকিত। একদিন প্রেমালাপের পর দম্পতি-কলহ উপস্থিত। দম্পতি-কলহ কাহার ভাগ্যে না ঘটে? পুণ্ডরীক বিনাদোষে পার্ব্বতীর প্রতি অশাস্ত্রীয় কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন। এই অবসরে পার্ব্বতী পতির মুখের ভিতর দ্বি-জিহ্বা দর্শন করিয়া অতিশয় চকিতা হইলেন, এবং বারংবার পতির প্রতি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত। পতি পরম গুরু বটেন; কিন্তু তিনিই গুরু যিনি সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এবার পুণ্ডরীকের অব্যাহতি নাই; প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—"বল, বল প্রাণ নাথ! শীঘ্র বল, সদুত্তর প্রদান করিয়া অধীনীর কৌতুহল চরিতার্থ কর।" পতি গর্ভিণী পত্নীর সাধ পূর্ণ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া পুণ্ডরীক পত্নীকে আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। আর প্রিয়তমার নিকট মুখ দেখান দুষ্কর। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বমূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে এক জলাশয়ের জলে ঝম্প প্রদান করিয়া লজ্জায় ডুবিয়া গেলেন। পার্ব্বতীও তখন তীরে পুত্র প্রসব করিয়া দীঘির অতল জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এই সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের পাষাণ মূর্ত্তি মাথায় বহন করিয়া ঐ পথে গমন করিতেছিলেন। রাস্তার ধারে ভাল পুকুর দেখিতে পাইলে পথিকদের

পিপাসা প্রবল হয়। ব্রাহ্মণ মাথা হইতে দেব মূর্ত্তি ভূতলে নামাইয়া পুকুরের জলে পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। কিন্তু তারপর মূর্ত্তি তুলিয়া লইবার শক্তি শত চেষ্টাতেও তাঁহার আর হইল না। তিনি দ্বিতীয় পথিকের সাহায্য প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে উক্ত সম্ভপ্রসূত শিশুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ নাগ শিশুর মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক তদুপরি ফণা বিস্তার করিয়া উহাকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ইনিই সেই পুণ্ডরীক নাগ, শিশুর জন্মদাতা পিতা। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহাশয়, এই শিশু এই দেশের ভাবী রাজা, আপনার সূর্য্যদেব ইহার গৃহ দেবতা। আপনি দেবমূর্ত্তি স্থানান্তর করিতে পারিবেন না; বরং আপনি রাজমন্ত্রী ও পুরোহিত হউন। ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। শিশুর নাম হইল ফণি-মুকুট রায়। ইনিই ছোটনাগ পুরের নাগ বংশীয় রাজাদের বীজি পুরুষ। উক্ত ঘটনা হইতেই তাঁহার রাজ্যের নাম নাগপুর। পূর্ব্বনাম ঝাড়খণ্ড, রাজধানী কোকড়া। অদ্যাপি কোকড়ার রাজবাড়ীতে উক্ত সূর্য্যদেবের পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজমান। এখনও এই রাজবংশীয় পুরুষগণ বিশেষ উদ্যম ও ধৈর্য্য সহকারে মস্তকে সুশোভন বস্ত্র-রজ্জু বন্ধন করিয়া অপরূপ উষ্ণীষ রচনা করিয়া থাকেন। দেখিলেই বোধ হয় যেন কুণ্ডলীকৃত সর্প মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক তদুপরি সম্মুখে মণিময় ফণা বিস্তার করিয়া ভাগ্যবান পুরুষ প্রবরকে দুর্ভাবনা-সন্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ছোট নাগ পুরের মহারাজার মোহর ও চাপরাশেও নাগ মূর্ত্তি অঙ্কিত। যে স্থানে জগজ্জ্যোতি মহারাজ ফণি-মুকুট রায় জন্মগ্রহণ করেন সে স্থান সুতিয়াম্বা পরগণার অন্তর্গত পীঠরিয়া গ্রামে। এই গ্রাম রাঁচি সহরের দশ মাইল উত্তরে। প্রতি বৎসর "ইন্দ্র পর্ব্ব" উপলক্ষে এই স্থানে এক মেলা হইয়া থাকে।

ঝাড়খণ্ডের এই রাজবংশ বহু সহস্রাব্দি পর্য্যন্ত শ্রীরাম সৈন্তের বংশধরদের উপর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তারপর আধুনিক ইতিহাসের দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। নাগ বংশের রাজা মধুসিংহ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত লইয়া দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। অনন্তর ইং ১৭৬৫ সনে বিহারের সঙ্গে ছোট নাগপুর ও ইংরেজের করে সমর্পিত হয়। অতঃপর স্থানীয় রাজাদের মধ্যে জ্ঞাতি বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামগড় নামক স্থানে এক বড় নূতন জেলা স্থাপিত হইল। রামগড় বর্ত্তমান হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত। রামগড়ে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিলেন। এই নূতন বন্দোবস্তে পঙ্গপালের মত বহু দেশীয় কর্ম্মচারা উজীর নাজির বকশী আসিয়া কোলদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। ফলে ১৮৩১ সনে ভীষণ কোল বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ১৮৩৩ সনে "দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ" নামকরণে এস্থানে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইল। তখন কলিকাতা কেন্দ্রে ধ্রুবতারা রাখিয়া দিক নির্দ্দেশ করা হইত। এখন যাহার সংশোধিত নূতন নাম যুক্ত প্রদেশ (Unit d Pr.vi ces) কএক বৎসর পূর্ব্বে তাহারই নাম ছিল—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ। কিন্তু এই ব্যয় সাধ্য ব্যবস্থাতেও আশানুরূপ সুশৃঙ্খলা হইল না। সুতরাং ১৮৫৪ সনে আবার নূতন করিয়া ছোটনাগপুর কমিশনরী বিভাগ সৃষ্টি হইল। তার পর ১৮৫৭ সনের পালা। সে কথা পরে উল্লেখ করিতেছি।

ছোটনাগপুরের অনার্য্যদিগকে আমরা সাধারণতঃ ধাঙ্গড় বলিয়া থাকি। প্রকৃত নাম কোল। কোলদের তিন শ্রেণী বলা যাইতে পারে। প্রথম মুণ্ডারি; ইহারা রাঁচি ও হাজারিবাগে বাস করে। দ্বিতীয় ভূমিজ; ইহারা মানভূম ও ধলভূমে এবং কতকটা হিন্দু ভাবাপন্ন। তৃতীয় লড়াই-কোল বা হো জাতি; ইহারা সিংহভূমের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। ইহা ছাড়া ওড়াওঁ বলিয়া আর একজাতি আছে। সিংহভূম জেলা ছোটনাগপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে অবস্থিত। ইহার প্রায় চারিদিকেই পাহাড়, এজন্য এ জেলার কোলগণ (হো-জাতি) অন্য স্থানের কোলদের অপেক্ষা অসভ্য উগ্র এবং কতকটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাবাপন্ন। এ জন্য ইহাদের লড়াই কোল বলা যায়। আমরা সিংহভূমের হো-দের কথা কিছু বলিব মনে করিয়াই এতখানি উপক্রমণিকা করিলাম।

সিংহভূম জেলার সদর সহর চাঁইবাসা। স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। এখনও তথায় ডাক্তার কবিরাজের আমদানী হয় নাই; কেবল সরকারী ডাক্তার আছেন। আর দুই ডাক্তার আছেন জল এবং বায়ু। বি-এন্ রেলওয়ের ঘাটশীলা ও চক্রধরপুর ষ্টেশন সিংহভূমের অন্তর্গত। চক্রধরপুর হইতে দক্ষিণে চাঁইবাসা ১৮ মাইল। চক্রধরপুর হইতে তোমার আমার জন্য গো-যান কিম্বা "পুষ পুষ" যানের ব্যবস্থা। এখন ঘোড়ার গাড়ীও হইয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় কেহ কেহ 'পুষ-পুষ' কথাটি কি বুঝিলেন না। ইহা পুষ্পক রথ নয়। একখানি বড় পাল্কী, দুই ধারে দুই চাকা, অগ্রপশ্চাতে থাকিয়া কত গুলি মানুষ টানিয়া ও ঠেলিয়া লইয়া যায়। রাত্রে বেশ সটান লম্বা শুইয়া আরামে যাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গাড়ীতে ঘোড়ার বদলে মানুষ দেওয়া চলে; চাবুকের আবশ্যক হয় না।

চক্রধরপুরের নিকটবর্ত্তী একস্থানের নাম পোড়াহাট। পোড়াহাটের রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। শ্রীকেল্লা বা শেরাই কেল্লা ও খরশোয়াঁ নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যদ্বয় ও ইঁহাদের শাসনভুক্ত ছিল। পোড়াহাটের নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় বর্ণ ও সিংহ উপাধিধারী। ইহাদের সিংহ উপাধি হইতেই দেশের নাম সিংহভূম। এরূপ জনশ্রুতি—পূর্ব্বের রাজাগণ সততই রুক্মিণী হরণের ন্যায় বিবাহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, এজন্য নাগপুর, গাঙ্গপুর হইতে বহুসহস্র কোল সৈন্য আসিয়া যোদ্ধ বেশে সুসজ্জিত থাকিত। ইহারাই বর্ত্তমান হো।

১৮৫৭ সনে দেশব্যাপী মিউটিনীর সময় ছোটনাগপুর রামগড়ের সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়। তাহাদের এক দল চাঁইবাসায় ছিল; তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠে এবং সরকারী খাজানা খানা লুট পাট করিয়া রাঁচি যাত্রা করে। পোড়াহাটের রাজা অর্জ্জুন সিংহ হো দের সাহায্যে তাহাদের সদলে গ্রেফতার করিয়া ইংরেজের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইল; তিনি নিজেই বিদ্রোহী হইলেন, বহু সহস্র হো তীর ধনু লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। পার্ব্বত্য প্রদেশে সম্মুখ সমর হয় না, এজন্য বিদ্রোহানল কিছুকাল প্রজ্বলিত রহিল। ১৮৬৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা ধৃত হইয়া কাশীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন উন্মত্ত হোগণ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ১৮৯০ সনে অর্জ্জুন সিংহের কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্রের নাম রাজা নরপৎসিংহ; ইনি পোড়াহাটেই আছেন। আয় সামান্য। কিন্তু তাঁহাকে রাজস্ব দিতে হয় না। সম্প্রতি পথকর ধার্য্য হইয়াছে। ইঁহার অধীনে কেড়া ও আনন্দপুরের ঠাকুর এবং বাঁধগাও ও চৈনপুরের তালুকদারগণ। সিংহভূমে আর একটী উল্লেখ যোগ্য স্থলের নাম ধলভূম। ইহা পূর্ব্বে মানভূমের অন্তর্গতছিল। এস্থলে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। স্থানের ভূম্যধিকারী ঘাটশীলার জমিদার। প্রজাদের বার্ষিক খাজানা এতটি বোদা (পাঁঠা), এত সের ঘৃত, এতমণ কাষ্ঠ ইত্যাদি। ডেপুটী বাবুরাই বাকী খাজানার মোকদ্দমা করেন। এখন ক্রমেই টাকা আনায় খাজানার পরিমাণ নির্ণিত হইতেছে।

হোগণ এখন গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের প্রজা। খাস মহালের নাম কোল্‌হান। সমগ্র কোলভূমি অনেকগুলি পীর বা উপবিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক পীরের সামাজিক কর্ত্তার নাম মান্‌কী। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পীর। প্রত্যেক গ্রামের মোড়লের নাম মুণ্ডা। মুণ্ডা ও মান্‌কীগণ খাজানা আদায় করিয়া সরকারী খাজানা দেয়। ইহারা পোলিসের কার্য্যও করে। সুতরাং ইহারা অনেকটা স্বায়ত্ব শাসন উপভোগ করিতেছে। বাহিরের লোক ইহাদের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। হো ভাষায় হো বা হোরো শব্দের অর্থ মানুষ। আর সকল হিন্দু মুসলমান বিদেশী লোক "দিকু" সংজ্ঞায় অভিহিত। কোল্‌হাণে "দিকু" দের একরূপ প্রবেশ নিষেধ; অর্থাৎ তাহারা জমীতে কোনরূপ স্বত্ব উপার্জ্জন করিতে পারিবে না।

হোদের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে এক গল্প আছে। সিঙ্গবোঙ্গা বা সূর্য্যদেব ইহাদের সর্ব্ব প্রধান উপাস্য-দেবতা। তিনিই আকাশ, মৃত্তিকা পর্ব্বত ও জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বৃক্ষ এবং পশু পক্ষী তাঁহারই সৃষ্ট। অবশেষে তিনি একটী বালক ও একটী বালিকা সৃষ্টি করিয়া এক পর্ব্বত গহ্বরে স্থাপন করেন। উহারা বড় হইল, কিন্তু উহাদের

'বুদ্ধি শুদ্ধি' হইল না। অথবা উহাদের যে বুদ্ধি ছিল, তাহার ভিতর শুদ্ধি ছিল; এজন্য উহারা মিথুন ধর্ম্ম আচরণ করিল না। তখন ভগবান সিঙ্গবোঙ্গা উহাদের প্রবৃত্তি জাগরিত করিবার জন্য ইলি (পাচুই মদ) প্রস্তুত করিলেন। বৃদ্ধ হো গণ অল্প বয়স্ক নাতি নাতনিদের কাছে অশ্লীল ভাবে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া এই গল্পের উপসংহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহারা পাচুই মদের পরম ভক্ত।

আদি মাতাপিতা যখন ১২টি পুত্র ও ১২টি কন্যা উৎপাদন করিলেন, তখন সিঙ্গবোঙ্গা ঠাকুর তাহাদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। নূতন মানব মানবীগণ যুগল রূপে বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। যাহার যেরূপ ডিস পছন্দ হয়, খাও; আয়োজনের ক্রটী নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগল—মাংস ও মহিষ মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোল জাতি (হো ও মাটকুম) উৎপন্ন হইল। ভূমিজদিগকে হো গণ 'মাটকুম' বলে। তৃতীয় নরনারী নিরামিষ ভোজন করিল, তাহারাই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির জনক জননী। চতুর্থ যুগল—ছাগমাংস ও মৎস্য আহার করিল; তাহারা হিন্দুদের শূদ্রজাতির মাতাপিতা। যাহারা শূকর মাংস ভক্ষণ করিল তাহারা সাঁওতাল ইত্যাদি। সর্ব্বশেষ দম্পতির ভোজনে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল; তাহারা আর কিছু না পাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় যুগলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া উদর তৃপ্ত করিল। তাহাদের হইতে ঘাসি জাতির সৃষ্টি হইল। এদেশে ঘাসিরা নিকৃষ্ট জাতি, মেথরের কার্য্য করে, পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ ও পরমুখপ্রত্যাশী। সিংহভূমে কুক্কুটের অভাব নাই, সকলেরই আহার্য্য। হৃষ্টপুষ্ট বন্য কুক্কুট গুলি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বেড়ায়। 'ফাউল' কারি কাহার ভাগ্যে যুটিয়াছিল, গল্পে তাহার উল্লেখ নাই।

সিঙ্গবোঙ্গা (সূর্য্যদেব) চন্দ্রকে বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্র কলঙ্কিণী বা ব্যভিচারিণী। এজন্য সূর্য্য তাহাকে টাঙ্গি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া কাটীয়া ফেলেন। তাহাকেই তোমরা আমরা চন্দ্রগ্রহণ বলি। নক্ষত্র গুলি তাহাদের কন্যা। সিঙ্গবোঙ্গার পর বুড়ো বোঙ্গা প্রধান দেবতা। ইনি পাহাড়ের কর্ত্তা। পাহাড় হইতে জল আইসে, জল বিনা কৃষিকার্য্য হয় না সুতরাং বুড়োর তৃপ্ত্যর্থে পাহাড়ের উপর ছাগ মহিষ ও মোরগ বলি দিতে হয়। প্রতেক গ্রামে বৃক্ষাদি জঙ্গল পূর্ণ একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেখানে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজ করেন। এক গ্রামের দেবতার অন্য গ্রামে কর্ত্তৃত্ব নাই। ইনি গ্রামের শস্য ও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী। ইঁহাকে তুষ্ট রাখিতে হয়। নদী পুষ্করিণী ও কূপের পৃথক পৃথক দেবতা আছে। ইহারা অসন্তুষ্ট হইলে গ্রামে পীড়ার আবির্ভাব হয়। সুতরাং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা চাই। কিন্তু কোন দেবতা কুপিত হইয়াছেন কাহাকে পূজা দিতে হইবে, তাহা ঠিক করা আবশ্যক। এজন্য গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ একত্র হইয়া একটা জল পূর্ণ পাত্রে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্দিগ্ধ দেবতাদের নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। যাহার নামের তৈল বিন্দু ছড়াইয়া না যাইয়া বিন্দুবৎ ভাসিতে থাকে। তাহার নামেই পূজা দিতে হইবে। যদি কাহারও পুত্র কন্যার ব্যারাম কিছুতেই না সারে, কিম্বা অপ্রত্যক্ষ কারণে গরু বাছুর মরিয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিবেশী শত্রুদের মধ্যে কাহাকে ডাইন (নাজম) স্থির করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করা হয়। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। হত্যাই হউক কিম্বা চুরীই হউক, অপরাধ করিয়া থাকিলে ইহারা প্রায়ই সত্য গোপনের কৌশল ভুলিয়া যায়। সুতরাং সত্য নির্ণয়ের জন্য হাকিমেরা উকীলের সাহায্য যাচঞা করেন না।

উপরি-উক্ত দেবতা ছাড়া পিতৃ পুরুষের প্রেতাত্মাদের ও অর্চ্চনা করিতে হয়। কারণ আহার্য্য না পাইলে তাহারা এখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বড় উৎপাত আরম্ভ করে। প্রেতাত্মার নাম—হাম হো।

হো দের মধ্যে অনেকগুলি কিলি বা গোত্র আছে। সগোত্রে বিবাহ হয় না। কিলির নাম গুলি জন্তুর নামানুযায়ী। যাহার যে কিলি, তাহার সেই নামীয় জন্তুর মাংস খাওয়া নিষেধ। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা নাই। কারণ কিলিগুলি প্রায়ই সর্প বেঙ্ ইত্যাদির নাম। আমাদের মধ্যে যাঁহারা গয়াধামে গিয়া ফল উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের নাকি কেহ কেহ জাম্বুরা, আমড়া প্রভৃতি সুফল উৎসর্গ করিয়া আইসেন; এই কড়ারে—জীবনে আর এই সুরসাল গুলি খাইতে পারিবেন না।

পুরুষেরা এখনও বেশী কাপড় চোপড় পরা ভাল বাসে না। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে চাঁইবাসা সদরে আসিতে হইলে একটু গা ঢাকা গোছের বস্ত্র খণ্ড লইয়া সভ্য ভব্য হইয়া আসিতে হয়। স্ত্রী লোকেরা বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা শীলতা রক্ষা করিতেছে। হো রমণীদের কবরী বন্ধনের বিশেষত্ব আছে। চুলের খোপা কৃত্রিমতা সহকারে বড় করিয়া লইয়া মাথার পেছনে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কর্ণের দিকে (পেছনের ঠিক মাঝখানে নহে) টানিয়া বন্ধন করে এবং চুল গুজিয়া দেয়। কাঁসার বালা ও মল পরার এক বাতিক উঠিয়াছে। এগুলি খুব ভারী ও ছোট; এক বার পরিলে আর জীবনে খুলিতে পারা যায় না। বাজারে বালিকারা ও যুবতীগণ কাঁসারিদের হস্তে অসহ্য লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া গহনা পরিধান করে। বহুকষ্টে ও যাতনায় পরিধান কার্য্য হইয়া গেলে অশ্রুসিক্ত বদনে সহসা হাসি বিকসিত হয়। তখন দেখিতে কি সুন্দর! স্ত্রী লোকের অলঙ্কার প্রিয়তা সর্ব্বত্র সমান।

হো রমণীগণের গোদনা বা উল্কী পরিতেও উৎকট বাসনা। হে বঙ্গের নবীন পাঠকগণ, উল্কী কি তাহা যদি তোমরা না জান, তবে অবিলম্বে কাশী বা বৃন্দাবনে গমন কর। তোমাদের পিতামহী কি প্রপিতামহী যাঁহারা সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের বদন মণ্ডল পরীক্ষা কর। কৃষ্ণবর্ণা হইলে সম্ভবতঃ magnifying glass আবশ্যক হইবে। ললাট, নাসিকা প্রান্ত, বা চিবুকে নীলরেখার চিত্র দেখিতে পাইবে। উহারই নাম উল্কী। সাহেবদের শ্বেতচর্ম্মে নানা রঙ্গের লতা পাতা, পশু পক্ষী ও "সুইট হার্টের" ছবি দেখিতে বড় সুন্দর। কিন্তু তাহা সার্ট কোর্টে আবৃত, আস্তিন না গুটাইলে দেখিবার সুবিধা নাই।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে মাতা পিতার ৮ দিন অশৌচ হয়। এই ৮ দিন বাড়ীর অন্যান্য লোকদের অন্যত্র যাইয়া থাকিতে হয়। স্বামী স্ত্রীর জন্য রাঁধা-বাড়া করিবে। আট দিন পর বাড়ীর আর সকলে ফিরিয়া আসিবে। তখন ভোজ হইয়া শিশুর নাম-করণ হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রায়ই পিতামহের নাম দেওয়া বিধি। তবে একাধিক নাম বাছাই করিয়া রাখিতে হয়। নাম উচ্চারণ করিয়া জল পূর্ণপাত্রে মটর বা কলাই ফেলিবে। যদি একটু ভাসে, ভাল। আর যদি ডুবিয়া যায়, তবে আর একটী নাম লইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করিবে। আমাদেরও অন্ন প্রাশনের সময় ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দুইটি নির্ব্বাচিত নামের কোন্‌টি বাহাল থাকিবে তাহার পরীক্ষা হয়। হো-দের নামকরণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বলা যাইতেছে। খৃষ্টান মিসনারিদের এ অঞ্চল বিশেষ কার্য্য ক্ষেত্র। অনুগ্রহ করিয়া ইঁহারা আছেন বলিয়াই রক্ষা। নতুবা হোগণ ক্রমেই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইয়া যাইত। দীক্ষার সময় মিশনরীগণ খৃষ্টান পদবীটি নামের সঙ্গে চিরকালের জন্য গাঁথিয়া দেন। যথা হরিদাস খৃষ্টান। যেন আর কালে কস্মিনে সে কিম্বা তাহার পুত্র পৌত্র স্বজাতির দলে ভর্ত্তি না হইতে পারে। কিন্তু হো-দের মধ্যে যাহারা খৃষ্টান নয় তাহারাও সখ করিয়া ইংরাজী নাম গ্রহণ করে। কাপ্তেন টিকেল্, টুইডেল, লেজ, ডালটন ইত্যাদি। এ গুলি লোকপ্রিয় ডেপুটী কমিশনার ও অন্যান্য রাজ পুরুষদের নাম। হো-রা এইরূপ সরল ভাবেই তাহাদের নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

এই সমাজে বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা নাই। অবিবাহিতা যুবতীর সংখ্যা বেশী। তাহার কারণ পণ প্রথা। কন্যার পিতা অল্প পণে বিবাহ দিতে নারাজ। এই পণ গো-মহিষাদিরূপে গৃহীত হয়। পীরের সানকী বা গ্রামের মুণ্ডা প্রত্যেক কন্যার জন্য ২৯ হইতে ৪০ টি গোধন চাহিয়া বসেন; যত বড় ঘর, তত বেশী পণ। অনুমান হয়, এই পণ প্রথা, মুদ্রা প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রেমিক প্রেমিকার গান্ধর্ব্ব বিবাহও হয়। প্রকৃত পক্ষে পণ প্রথার প্রাবল্য বশতঃ অষ্টবিধ বিবাহই প্রচলিত।

হো-জনপদ দেখিতে সুন্দর। চারিদিকে বড় বড় তেঁতুল, আম্র ও কাঁটাল বৃক্ষে সুশোভিত। গৃহগুলি ক্ষুদ্র হইলেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মৃন্ময় প্রাচীরগুলি সমতল ও মসৃণ। মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থলে ইহারা পাহাড় জঙ্গল সুলভ বৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভের ন্যায় প্রোথিত করে। যে যত বড়, তাহার সমাধির প্রস্তর তত উচ্চ।

হো-গ্রামে প্রবেশ করিলে এই সমাধি প্রস্তরগুলি প্রথমে চোখে পড়ে।

আশ্চর্য্যের বিষয় ইহারা দুগ্ধপান করে না। মানুষ হইয়া গোরু মহিষের দুধ খাওয়া—অতি ঘৃণার বিষয়। হাঁ, যদি খেতে হয়, মাংস খাও, কিন্তু দুধ! ছি। সেখানে দেখিয়াছি পাশাপাশি বসিয়া হো-বিক্রেতাগণ একই দ্রব্যের ভিন্নরূপ দর চাহিতেছে। কেহ পয়সায় দুইটা দিবে, কেহ একটা, কেহ পাঁচটা। তোমার মন হয়, ক'এর কাছে লেও; আর যদি মন না হয়, না লেও; আমি (খ) সে দরে দিবেক না, কিছুতেই না। সেনোমে

হো দিগের নৃত্য।

হোগণ সভ্য জাতির ন্যায় নৃত্য প্রিয়। আমাদের আনন্দ হইলে তবে নৃত্য করি। আগে আনন্দ, তারপর নৃত্য। হো এবং অন্যান্য জাতি নৃত্য করে আনন্দ লাভের জন্য। আগে নৃত্য, তারপর আনন্দ লাভ। ইহারা জ্যোছনা রজনীতে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া পৃষ্টের দিকে হাতে হাতে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে। কখন কখন পুরুষেরা মাদল বাজায় এবং কেবল রমণীগণ—যুবতী বালিকা বৃদ্ধা একত্রসারিবদ্ধ হইয়া নৃত্য করে। কলিকাতা হইতে বায়স্কোপ বা আর কিছু আমোদ আনয়ন করা সকল সময় হইয়া উঠে না। এজন্য কোন রাজপুরুষের সম্মানের জন্য পার্টি দিতে হইলে কোলদের নৃত্য প্রায়ই হইয়া থাকে। চাঁইবাসা সহরের বার্ষিক মেলায় (ডিসেম্বরে) নৃত্য করিবার জন্য অসংখ্য হো স্ত্রী পুরুষ দূর দূরান্ত হইতে আগমন করে।

ইহারা অতি সরল। অনেকে বাজার-দর বুঝে না। চাঁইবাসার জেলের নিকট সাপ্তাহিক হাট বাজার বসে। আলপে এড়িবা। (Senome alpe erisa) (অর্থাৎ, যাও গোল করিও না।)

পাঠক! হো-ভাষা শুনিতে চাহেন? নমুনা দিতেছি।

তোমার কি নাম?	আমা চিকণ নুমু?
তোমার বাড়ী কোথায়?	ওকো হাতুরে সেনাপেয়া?
তুমি কি কর?	চিকনম চেকাতনা?
এখন তবে আসি।	অইংগ নাদো চালাকানা।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

প্রলয়।

(মাননীয় লি সাহেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।)

একদিন যাহা কবি কল্পনা বলিয়া সকলে উপহাস করে, তাহা সময়ে সত্যে পরিণত হইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

অদ্য আমরা যাহার আলোচনা করিব, তাহা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

আমাদের বাল্যকাল হইতেই সংস্কার আছে যে মহাপ্রলয়ে এই সংসার ধ্বংস হইয়া যাইবে। এইরূপ প্রলয়ের বর্ণনা আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। এক জল প্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু বিনাশ হইবে ইহাই আমাদের প্রলয়ের কল্পনা। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে ঐরূপ প্রলয়ের বর্ণনা আছে। আমাদের মহাভারতে আছে, কলিযুগান্তে মানব যখন অল্পায়ুঃ হইবে তখন বহু বৎসর-ব্যাপি অনাবৃষ্টিতে লোক সকল ধ্বংস হইতে থাকিবে। সে সময় সপ্ত মারুত নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া নদী ও সাগরের সমস্ত জল শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। তখন তৃণ পল্লব সমস্ত দগ্ধ হইয়া ভষ্মিভূত হইয়া যাইবে।

এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী খৃষ্ট ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায়। ইসায়া বলিয়াছেন—"অধিকন্তু চন্দ্র সূর্য্যের মত কিরণ দিবে এবং সূর্য্য কিরণ সপ্তগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।'

এই সকল ভবিষ্যৎবাণী কখনও সত্যে পরিণত হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা বিচার করিবার জন্যই আমরা বিজ্ঞানের দিক দিয়া এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিব।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীন তাপ।

কখন কখন মনে হয় যে পৃথিবীর ভিতরের উত্তাপ কোন কারণে উপরে আসিতে পারে কিনা।

গভীর খনির ভিতর দেখা গিয়াছে যে গভীরতা অনুসারে তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খনিতে কি অনুপাতে তাপ বৃদ্ধি হয়, দেখিবার জন্য খনির প্রস্তরের তাপ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে।

গভীর খনি কিম্বা ছিদ্রের (Borehole) ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভার্জ্জিনীয়াতে ৩০০০ হাজার ফিট গর্ত্তে. ৭৪ ফিট অন্তর, লাক্কোসায়ারে ৫৬০০০ ফিট গর্ত্তে ৬৬ ফিট অন্তর, ও লিপজিকে ৫, ৬০০ ফিট গর্ত্তে ৬৭ ফিট অন্তর তাপের পরিমাণ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায়। এইরূপ ভাবে তাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয় কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই। কত নিম্নে গেলে আমরা সর্ব্বোচ্চ তাপ পাইতে পারি, তাহাও আমরা জানি না। আমরা প্রায় ১½ মাইল পর্য্যন্ত গভীর খাদের মধ্যে দেখিয়াছি যে পৃথিবীর সকল স্থানেই গভীর হইতে গভীর তর প্রদেশে তাপ সমান ভাবে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে ভূগর্ভে আরও প্রবেশ করিলে তাপ ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যাইবে। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে যানা যায় যে ১ মাইল ভূগর্ভের নীচে তাপ প্রায় ৭৫° ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়। এই অনুপাতে চলিলে ৭½ মাইল নিম্নের তাপে শীস্ দ্রব হয়। ১৫ মাইল নিম্নে লৌহ ও ২৩ মাইল নিম্নে প্লেটিনাম দ্রব হইবে। যে ৪,০০০ হাজার ডিগ্রি ফাঃ হিঃ তাপে কোক গ্রেফাইটে পরিণত হয়, সেইরূপ তাপ ৫৩ মাইল নিম্নে পাওয়া যায়।

বোর্ডে ২ ফিট পরিধির একটী বৃত্ত আঁকিয়া যদি আমরা পৃথিবী বুঝাইতে যাই তাহা হইলে চকের দাগটীর গভীরতা প্রায় ১০০ মাইল হইবে এবং ৫৩ মাইল মাত্র চকের দাগের অর্দ্ধেক হইবে। ইহা হইতে আমরা কল্পনা করিতে পারি যে পৃথিবীর ভিতরে কত অধিক উত্তাপ রহিয়াছে। সেই উত্তাপ কোন উপায়ে উপরে আসিতে পারিলে, পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

পৃথিবীর উপরিস্থ পর্ব্বতের এক ঘন ফুট পাথরের ওজন ১৫০ হইতে ১৮০ পাউণ্ড হইয়া থাকে। গড়ে ১৭০ পাউণ্ড ধরিয়া লইলে ভূগর্ভের ১ মাইল নিম্নে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে চাপের পরিমাণ ২¾ টন হইবে। সেই হিসাবে ৫০ মাইল নিম্নে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১৩০ টনের উপরে চাপ পরিয়া থাকে এবং ১০০ মাইল নিম্নে চাপের পরিমাণ প্রায় ২৭৫ টন হইবে। এরূপ গুরু চাপে প্রস্তর কোমল হইয়া যায় এবং শীতল ইস্পাত ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। ভূগর্ভের নিম্ন প্রদেশ শীতল না হইয়া বরং অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় আছে সুতরাং এত অধিক চাপে উষ্ণ অবস্থায়

আমাদের সংসারের যাবতীয় বস্তুই দ্রব হইয়া যাইবার কথা।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে চাপ ও উত্তাপের সহযোগে ভূগর্ভস্থ যাবতীয় পদার্থই তরল অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহাতে চাপের সাম্যতা রক্ষা করিতেছে। কখন কখন পৃথিবীর বহিরাবরণের দুই এক স্থান এক আধ টুকু বিপর্য্যস্থ হওয়াতে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। এই কম্পনের গভীরতা কখনও ২০ মাইলের নিম্নে যায় না।

এখন প্রশ্ন এই যে যদি কোন কারণে এই ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থের সাম্যতার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই কঠিন-স্তর ভেদ করিয়া উক্ত তরল পদার্থ পৃথিবীর উপরে উঠিয়া পরিতে পারে কিনা?

শীতল হওয়ার দরুণ পৃথিবীর উপরে যে অভিঘাত পরে, তাহা দ্বারা বহিরাবরণ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হয় মাত্র; কিন্তু সে শক্তিতে উক্ত আবরণ বিদীর্ণ হইতে পারে, এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদিও বহিরাবরণের উপরি ভাগ কঠিন, ভিতরের দিক নরম এবং স্থিতিস্থাপক, সেজন্যই ঐরূপ শীতলতা জনিত কুঞ্চনের অভিঘাতের ফলে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয় মাত্র।

পৃথিবীতে কিম্বা সৌরজগতে এরূপ কিছু দেখা যায় না, যাহা দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

অন্ধকার নক্ষত্র।

সৌর জগতের বহির্দ্দেশে যে সকল নক্ষত্র মণ্ডলী মাঝে মাঝে দৃষ্টি পথে পতিত হয় এখন আমরা তাহাদের বিষয় চিন্তা করিব। ১৯০১ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হারভার্ডে উত্তরাকাশে নক্ষত্র পুঞ্জের কিয়ৎ অংশের এক আলোক চিত্র উঠান হইয়াছিল। ঐ আলোক চিত্রে একাদশ স্তরের নক্ষত্রের চিত্র পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে এডিনবার্গ হইতে একটী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাঝা মাঝি নক্ষত্র দেখা গেল। ইহার পরে দুই দিবসের মধ্যে উহা কেপেলা (Capella) হইতে উজ্জ্বল-তর হইয়া উঠিল। তাহা হইতে তিন দিবসের মধ্যে উহা একাদশ হইতে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল অর্থাৎ উহার জ্যোতি তিন দিবসে দশ সহস্র গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। একটী নূতন নক্ষত্রের অত্যল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠা একটী বিরল দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রজ্বলিত হওয়ার নানারূপ কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা যদিও অনেকটা যুক্তি যুক্ত বোধ হয়, কিন্তু বর্ত্তমান মত এই যে উক্ত নক্ষত্র অপর একটী পদার্থের সঙ্ঘর্ষে জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল। এই নব নক্ষত্রটীর জ্যোতি এরূপ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল যে উহা (Spectroscope) যন্ত্রের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনায়াসে পরীক্ষা করা গিয়াছে। নক্ষত্রটীর উপাদানের পরিবর্ত্তন ও উহার বায়বীয় পদার্থের গতি লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দুইটী পদার্থের সঙ্ঘর্ষে অগ্ন্যোৎপাত হইলে যাহা হয়, ইহাতেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

মাঝে মাঝে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা এইরূপ দুইটী পদার্থের সঙ্ঘর্ষ দ্বারা জ্বলিয়া উঠে বলিয়াই বিবেচিত হয়।

এখন আমাদের মনে হইতে পারে যে এই শূন্য মার্গে ভ্রাম্যমান তমসাচ্ছন্ন পিণ্ড সকল কি? আমরা ক্ষুদ্র কায় জ্যোতিঃ-বিহীন পিণ্ড সকলের কথা জানি। উহারা যখন পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের সঙ্ঘর্ষে জ্বলিয়া উঠে, আমরা তখন তাহাদিগকে উল্কা বলি। ইহাদিগহইতে বৃহত্তর জ্যোতিহীন পিণ্ডসকলের জ্ঞান আমাদের যথেষ্ট আছে। চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সৌর জগতের গ্রহগণ ঐ জাতীয়। উহারা মারুত কিরণে উদ্ভাসিত হয় মাত্র।

এইরূপ নভোমণ্ডলে বিগত-তেজ বহু পিণ্ড বর্ত্তমান থাকা কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা যতদূর জানি আমাদের সূর্য্যমণ্ডল ও অন্যান্য নক্ষত্র সমূহ তেজ বিকীরণ করিয়া ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ ভাবে চলিতে থাকিলে হয়ত তাহারা একদিন নভোমণ্ডলের জ্যোতিহীন পিণ্ডরূপে পরিণত হইবে। আমরা যে সকল নক্ষত্র দেখিতেছি, তাহাদের অনেকগুলি যেন হীনপ্রভ হইয়া গিয়া ক্রমে শীতলতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহারা সত্বরই অন্ধকার শীতল পিণ্ডে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য নক্ষত্র যে এইরূপ জ্যোতিহীন শীতল পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে তাহার গণনা কে করিবে? হয়ত তাহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে দৃশ্যমান নক্ষত্র মণ্ডলী হইতে অধিকও হইতে পারে।

সূর্য্য তাহার গ্রহ উপগ্রহ সহ অন্যান্য নক্ষত্রের মত অনন্ত নভোমণ্ডলে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের এই গন্তব্য পথে এইরূপ একটী শীতল পিণ্ডের সহিত সাক্ষাত হওয়া অসম্ভব নহে।

যদি এইরূপ একটী বৃহৎ শীতল পিণ্ড সূর্য্যমণ্ডল ঘেসিয়া চলিয়া যায় অথবা সূর্য্যমণ্ডলে আঘাত করে, তাহা হইলে যে তাপ রাশির উদ্ভব হইবে, তাহা বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করা অসম্ভব নহে এবং তাহা হইলে মুহূর্ত্তে পৃথিবী বিলীন হইবে। ঐ আঘাতের বেগ কিঞ্চিৎ কম হইলেও সূর্য্যমণ্ডলে তাপের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে উহা দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত জল শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তু দগ্ধ হইয়া যাইবে।

এইরূপ একটী ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইলে আমাদের সৌর-জগৎ ও পূর্ব্বোল্লিখিত নবোদ্ভাসিত তারকার মত ভস্ম হইয়া যাইবে।

ঐ ভীষণ পিণ্ড সূর্য্য কিম্বা উহার গ্রহগণকে স্পর্শ না করিয়া যদি সূর্য্যের নিকট দিয়া হাইপারবলিকা গতিতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্যমণ্ডলের তেজরাশির মধ্যে এরূপ এক আলোড়ন উদ্ভব হইবে যে তাহা দ্বারা সূর্য্য-মণ্ডলের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি ঐ পিণ্ড পৃথিবীর নিকট দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেও উহার আকর্ষণে এই ভ্রাম্যমান পৃথিবীতে এরূপ আঘাত লাগিবে যে উহাদ্বারা পৃথিবীর অবয়বের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে এবং ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর বহিরাবরণ বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভস্থ অগ্নিময় তরল পদার্থ ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইয়া পৃথিবী ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

কিরূপে ধ্বংস সাধন হইবে।

ইহা স্থির যে নভোমণ্ডলে এক ধ্বংসের অভিনয় হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। এখন প্রশ্ন এই যে ঐ ধ্বংসের কতদিন পূর্ব্বে আমরা উহার খবর জানিতে পারিব।

মনে কর যেন আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের মত বৃহৎ একটী পিণ্ডের সহিত আমাদের সঙ্ঘর্ষ হইবে। শীতল ও শক্ত হওয়াতে উহার আয়তন কুঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। ধরিয়া লও, উহার পরিধি ৫৫০,০০০ মাইল অর্থাৎ আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের প্রায় ৬০ অংশ।

এরূপ একটী পদার্থ যখন আমাদের সূর্য্যের এত নিকটে আসিবে যে উহাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইতে পারে, তখনই আমরা উহাকে দেখিব। উহা ২২০০কোটি মাইল দূরে থাকিতেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমরা ১০ম কিম্বা ১১শ শ্রেণীর নক্ষত্রের মত দেখিব।

মনে কর প্রথমতঃ উহা আমাদের সূর্য্য যে গতিতে চলিতেছে, সেই গতিতে সেকেণ্ডে ১০ মাইল বেগে ধাবিত হইয়াছে।

বিশ বৎসরে ঐ পিণ্ড ক্রমশঃই আমাদের নিকটে আসিতে থাকিবে এবং ক্রমেই উহার বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বিশ বৎসর পরে উহাকে ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রের মত খালি চক্ষেই দেখা যাইবে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে উহাকে শনি গ্রহের অর্দ্ধেক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইহার পূর্ব্বেই দূরবীক্ষণ দ্বারা গণিত সাহায্যে পিণ্ডের পরিমাণ করা যাইবে। ক্রমে যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত আমরা দেখিতে পারিব এবং উহা যে সূর্য্যমণ্ডলের দিকে ধাবিত হইতেছে তাহাও জানা যাইবে। কবে ইহা সূর্য্যমণ্ডলে পতিত হইয়া আমাদের পৃথিবীর ধ্বংস সাধন করিবে, তাহাও গণনা দ্বারা বাহির করা যাইবে। ইহার ৪ বৎসর পরে পিণ্ডটী আরও নিকটে আসিবে; তখন উহাকে দেখিতে ১ম শ্রেণীর নক্ষত্রের মত বোধ হইবে। বৃহস্পতি পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে থাকিলে তাহার পরিধি যত বড় দেখা যায়, দূরবীক্ষণে উহাকেও তত বড় দেখা যাইবে।

ইহার ১০ বৎসর পরে উহা ইউরেনসের (Uranus) সমদূরবর্ত্তী হইবে। তখন ২।১টী নক্ষত্র (Serius and Canopus ব্যতীত ইহাকেই সর্ব্বোজ্জল নক্ষত্র বলিয়া মনে হইবে। তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাকেবড়ই সুন্দর দেখা যাইবে।

আর এক বৎসর পরে উহা বৃহস্পতির সমদূরবর্ত্তী হইবে। তখন উহা সিরিয়াস (Serius) হইতে ১০০ গুণ অধিক আলো দিবে এবং ইহাকে বৃহস্পতির ৬ গুণ বড় অর্থাৎ চন্দ্রের ⅙ পরিধির মত দেখা যাইবে। এ সময়ে ইহার গতি উত্তরোত্তর এতবৃদ্ধি পাইবে যে আর দুই মাসের মধ্যে উহা সূর্য্য মণ্ডলে আসিয়া পতিত হইবে।

শেষ মাসে উহাকে নভোমণ্ডলে একটী অত্যুজ্জল

পদার্থের মত দেখাইবে। উহা প্রায় সূর্য্যের মত উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইবে এবং উহা দিবা ভাগে উজ্জ্বল রবি কিরণের মধ্যেও দেখা যাইবে। জলীয়পদার্থ সকল বাষ্প হওয়াতে উহার চতুর্দ্দিকে মেঘাচ্ছন্ন থাকিবে এবং আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। তখন মেঘপটলে-আচ্ছাদিত থাকাতে মূল পিণ্ডটীকে আর দেখা যাইবে না।

সঙ্ঘর্ষ।

সঙ্ঘর্ষের পূর্ব্বে পৃথিবী যদি এরূপ স্থলে থাকে যে ঐ পিণ্ড ও সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে একটী রেখা টানিলে পৃথিবীর গন্তব্য পথ উক্ত রেখার উপরে লম্বভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে সঙ্ঘর্ষের ব্যাপার ঈষৎ অনুমান করা যাইতে পারে।

সূর্য্য ও পিণ্ড উভয়ের নিকটস্থ অংশ স্ফীত হইয়া উভয়ের সহিত মিলিত হইতে আসিবে এবং উক্ত অংশও মিলিয়া যাইবে। ১৫ মিনিটের মধ্যে উভয় পিণ্ড একত্র হইবে। ক্ষুদ্রটী বৃহতের ভিতর প্রবেশ করিবে। বৃহৎটীর কিয়দংশ উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িবে। কতক অংশ উভয় পিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ প্রবলবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে যে উহা আর ফিরিয়া না আসিয়া অনন্ত আকাশে ছুটিয়া চলিবে।

তখন প্রভূত তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল পিণ্ডটী একেবারে বাষ্পাকারে পরিণত হইবে। আমরা সূর্য্যের অনুপাতে এ শীতল নক্ষত্রের যে গতি কল্পনা করিয়াছি, তাহা দ্বারা উহা পৃথিবীর সান্নিধ্যে আসিবে না; কিন্তু উহার গতি দিগন্তরে হইলে পৃথিবীর নিকট দিয়া যাওয়াও কিছু বিচিত্র নহে।

তাহা হইলে পৃথিবী তাহার নিজ কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবার সম্ভব। হয়ত উহা সূর্য্যের অতি নিকটে আসিয়া পড়িবে। তাহার ফলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণী ধ্বংস হইয়া যাইবে। সূর্য্য কিম্বা শীতল নক্ষত্রের ঘাত প্রতিঘাত কিম্বা সূর্য্য মণ্ডলের পরিবর্ত্তন ব্যতীতই পৃথিবীর বিনাশ সাধন হইবে।

যদি আগন্তুক পিণ্ডটী সূর্য্যের মত বৃহৎ না হইয়া বৃহস্পতির সমান হয়, তাহা হইলে উহা ৬০ হাজার লক্ষ মাইল দূরে থাকিতেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট হইবে এবং ৩০ হাজার লক্ষ মাইল দূরে থাকিতে খালি চক্ষে দেখা যাইবে।

দেখা যাওয়ার পর হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে উহা সূর্য্য মণ্ডলে পতিত হইবে। ঐ পিণ্ড ইউরেনাসের (Uranus) মত বড় হইলে দেখা যাওয়ার ৩ বৎসরের মধ্যে সূর্য্য মণ্ডলে পতিত হইবে। যদি কখনও সূর্য্য মণ্ডলের সহিত এরূপ কাহার সঙ্ঘর্ষ হয়, যাহা দ্বারা পৃথিবী ধ্বংশ হইতে পারে, তবে তাহার সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিব। এ পিণ্ড যতই বৃহৎ হইবে সঙ্ঘর্ষের ফল ততই ভীষণ হইবে এবং উহার আগমন বার্ত্তা আমরা তত অধিক দিন পূর্ব্বে জানিতে পারিব। যাহার আঘাতে পৃথিবী ধ্বংশ হইতে পারে, সূর্য্যমণ্ডলে এরূপ পিণ্ডের ক্ষুদ্রতমটীর আগমন সংবাদ আমরা সঙ্ঘর্ষের দুই বৎসর পূর্ব্বে জানিতে পারিব।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

শান্তি

সবাই যবে বিমুখ হবে
কেউ না রবে আপনা,
তোমারি জয় হৃদয়ে রয়ে
ভুলাবে ভয় ভাবনা!
কেমনে জানি তোমার বাণী
পরাণ খানি পরশে,
ঘুচিয়া যায় বেদনা, হায়,
অন্তর গায় হরষে।
কাটেরে দিন, ভাবনা হীন
তোমাতে-লীন-অন্তরে,
উঠেরে সুর, কিযে মধুর
দুঃখ-বিধুর-যন্তরে!
জীবন শেষে মধুর হেসে
মিলিব এসে চরণে,
ঘুচিবে ক্লান্তি সকল ভ্রান্তি
লভিব শান্তি মরণে!

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

কথা-সাহিত্যে লোক-শিক্ষা।

কথা সাহিত্যের এক রাজা ছিলেন বিষ্ণু শর্ম্মা। আর এক রাজা ছিলেন ইসফ্। ইসফ বিষ্ণু শর্ম্মার নিকট ঋণী কিনা, এ তর্ক এখানে তুলিব না। ইঁহাদের উভয়ে ইতর জন্তুর মুখে মনোহর দুর্ল্লভ বচন সকল আরোপ করিয়া কেবল বালক বালিকাদের সুশিক্ষা এবং মন হরণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, যুবক বৃদ্ধেরও নৈতিক দৈন্য পূরণের পথ করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে মনে হয়—দীর্ঘশ্মশ্রু ধর্ম্মাচার্য্যগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা, তদনুরূপ অজপুত্রগণের সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ উপদেশের নিকট দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পশুর কথায় কত শত বৎসর হইতে মানব শিশু মানুষ হইতেছে। সকল দেশেরই সকল ভাষা—কথাসাহিত্যে ভরপুর। সারভেন্টিসের "ডন কুইক জট" এমন ভাষা নাই, যাহাতে অনূদিত হয় নাই। মহাভারতের কথা-সাহিত্য হিন্দু জাতির সর্ব্বস্তরে কত মহামূল্য রত্নই না ছড়াইতেছে।

পুস্তকস্থ কথা-সাহিত্যের প্রসার বিস্তৃত এবং বহুকাল স্থায়ী। আমাদের দেশে মা, মাসী, দিদিমার মুখে কথা সাহিত্যের অতি সুন্দর বিকাশ হইয়াছিল; সে সকল উপকথার বিষয় গুলি ভাবিলে এ বয়সেও আমাদের মন সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ এবং ভয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে। এখন সে দিদিমাও নাই, সে রূপ কথাও নাই। সে বেঙ্গমা বেঙ্গমী কোথায় কোন্ পাহাড়ে উড়িয়া গিয়াছে; সে রাজার পুত্র, সে উজিরের পুত্র, সে কুঁচ বরণ কন্যা, সে মেঘবরণ চুলের কথা, এখন আর তেমন শুনিতে পাওয়া যায় না।

এখন মা মাসীর স্থান অধিকার করিয়াছেন, বাঙ্গলা মাসিক পত্র ও নিত্য নূতন গল্প পুস্তক। মাসিক আসিলেই অধিকাংশ পাঠক দেখিয়া থাকেন উপস্থিত সংখ্যার কথা-সাহিত্য কি? তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের পাতা কাটা নাই, কিন্তু গল্পের পাতা হাতে হাতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এখন সে কবিতার ও সে মান মর্য্যাদা নাই। কালিদাস এবং কুমুদরঞ্জন, করুণা, নিধান এবং রমণীমোহন, জীবেন্দ্র দত্ত এবং গোবিন্দ দাস দূরের কথা, কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথও এখন তেমন আসর জমাইতে পারিতেছেন না। পাঠকের মন মজাইতেছে—গল্প।

এই কথা-সাহিত্যের ঘোর প্লাবনে সমাজের সন্নীতি লোক-শিক্ষার পথে কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চাঙ্গের উপন্যাস গুলিও কথা সাহিত্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিম-উপন্যাসের কোন কোন চিত্র সুধী সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। সার গুরুদাস উঁহার অনেক চিত্র লোক-শিক্ষার বিরোধী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। "সমাজ ও সাহিত্যে" বঙ্কিমের একাধিক চরিত্রের কুশিক্ষার তীব্র সমালোচনা আছে। কথাসাহিত্য উপলক্ষে বঙ্গভাষা নানা রস এবং মনের বিবিধ ভাব ব্যক্ত করিবার উপযোগী পুষ্টি লাভ করিতেছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। "মানসীর" "রক্ত গোলাপ" মৌলিক না হইলেও অতি মনোহর। সিদ্ধ-হস্ত রবীন্দ্রনাথের বহু ক্ষুদ্র গল্প অতুলনীয় এবং অতি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার 'চোখের বালি' সুশিক্ষাদানের গর্ব্ব করিতে পারে না। দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথকে অনেকে ঋষি শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য মহাব্যস্ত। চাটুকারের কথা স্বতন্ত্র; বহু লোক "চোখের বালির" গ্রন্থকারকে ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্যের কুশিক্ষা নিরস্ত করিবার জন্য সম্প্রতি কোন কোন মাসিক পত্রে ধারাবাহিক প্রয়াস দেখা যাইতেছে। 'নারায়ণ' এ ক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী। মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার "বিজয়ায়" প্রকাশিত অনেক গুলি চটুল ও পঙ্কিল গল্পের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বহু পূর্ব্ব হইতে দেবীবাবু অতি সাবধান; কিন্তু তিনিও অন্যদিকে "নব্যভারতে" কোন কোন কুৎসিত কবিতার স্থান দিয়া শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। লোক যখন 'মজালে কনক লঙ্কা মজিলে আপনি', তখন দুই এক জন মহারথ সম্পাদকের অঙ্কুশ প্রহার সমাজের আর কত চৈতন্য জন্মাইতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এখন এক প্রধান ধূয়া কলার সাধনা! কলা কি না—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য কি না—উলঙ্গ বাহার বৃষ্টি। ডাউইনের গ্রন্থ পড়িয়া অবধি এ দেশে কলার প্রতি রসনা অতিশয় লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বকালের কথা সাহিত্যে ও প্রেমের প্রবাহ বিচ্ছেদ-বিরহ কলা ছিল, কিন্তু এত গলিত মর্ত্তমান রম্ভা ছিল না। তখনকার মোটা কাপড়ে মোটা সৌন্দর্য্য ছিল। এখন ঢাকাই তঞ্জাবে রমণীর রূপ ফুটাইয়া বাহির না করিলে লেখকেরও মন উঠে না, পাঠকেরও মন মজে না। গল্প সাহিত্য গুলি রামকৃষ্ণ মিসনের কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা হইবে আমরা এ কথা বলিতেছি না।

ঐ সমস্তই প্রতীচ্য কথা সাহিত্যের অনুকরণ। বাঙ্গলা সাহিত্যে বোকেসিও, ডিকামেরণ চাই; এমিলে জোলা চাই। এমিলে জোলার মন্ত্র-শিষ্যগণের পক্ষ সমর্থনের হেতুবাদ— পাপের চিত্র দেখাইয়া পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক। সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে, পাঠকগণের চিত্ত তাহার সাক্ষী। 'রেনলড্‌স' ইংরেজ ভদ্র সমাজে স্থান পান নাই। বস্তুতন্ত্রতার এরীতি ইংরেজী ভাষা এবং সমাজকে অনেক স্থলে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ভিক্টোরিয়া ক্রস, "ফাইভ নাইটস" উপন্যাসে চিত্রকর ভ্রাতা, যুবতী ভগ্নীকে × × × করাইয়া যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তদ্দেশে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু উহা এদেশে "চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে— ফেলে দাও কর্ম্মনাশা জলের" যোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে কথা-সাহিত্যে বহু বঙ্গ মহিলা উচ্চ অঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। হিন্দু সমাজের বলিয়া, মাতৃজাতি বলিয়া ইঁহারা নির্লজ্জ হইতে চাহেন না। এবং নির্লজ্জ হইতে পারেন না। লেখনীর মর্য্যাদা রক্ষা তাঁহাদের মাতৃধর্ম্মের অনুরূপ। তাঁহারাও যদি মোহে পড়িয়া ভগ্নি ভিক্টোরিয়া ক্রসের অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, তবেই কথা-সাহিত্যে কলা সাধনার ষোল কলা পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে চিত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ ও সমাদর দেখা যাইতেছে। এদিকে চিত্রও ক্রমে ক্রমে বিচিত্র মূর্ত্তি ধরিতেছে। পাঠকগণ "বিজয়া" এবং "মানসীর" দ্বন্দ পড়িয়া দেখিবেন। ভগ্নি চিত্রিকা যদি যুবক ভাইকে + + + করিয়া চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করেন, তবেই কথা সাহিত্যে এদেশে লোক শিক্ষার চূড়ান্ত হয়। পঙ্ক হইতে পঙ্কজ উহা বিধাতার সৃষ্টি। এমন তো আজিও দেখিতে পাই নাই, কার্য্যে বুৎসিৎ, অসভ্য অশ্লীল চিত্র বর্ণ কিম্বা ভাষায় আঁকিয়া কেহ সমাজকে শুচিতার পথে লইয়া গিয়াছে।

লোক শিক্ষক সাহিত্য-রথিগণ-দৃঢ় হস্তে কশাঘাত না করিলে দুষ্টা সরস্বতীর চৈতন্য হইবার নহে। বাঙ্গলা মাসিক পত্রের অধিকাংশ পাঠক বালক এবং স্ত্রীলোক। সুরেন্দ্রনাথ যখন বালকদের গুরু পদে প্রথম বৃত হন, তখন উপন্যাস পাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। উহাতে "অঙ্কল টমস কেবিন" এবং "ডায়ারী অব এ লেইট ফিজিসিয়ান" বালকদের পাঠ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সমাজের অনুরোধে, মাতৃ-ভাষার শ্লীলতার অনুরোধে, সম্পাদকগণ একটু সাবহিত হউন এবং কথা সাহিত্যের লেখকগণ শ্লীলতা সংহার না করিয়া যেন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। কথা সাহিত্য লোক শিক্ষার এক প্রধান উপকরণ। গল্প অল্প হউক, তথাপি কথা সাহিত্যে যেন মাতৃভাষা কলঙ্কিত না হয়, লোক শিক্ষার পথে যেন কণ্টক না পড়ে। বিশ্বতশ্চক্ষু অন্ধ নহেন। কেইন এবং ইভান্স যাহা পারেন নাই, ইউরোপীয় মহাসমর মদ্যপানের অপরাধ অতি উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছে। বঙ্গ সমাজকে অশ্লীল গল্প-প্লাবনের অপকারিতা একদিন বুঝিতে হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

শ্রী—

অগ্নি পরীক্ষা।

(১)

বিশাল রাজপ্রাসাদের পার্শ্বেই এক অনতিবিস্তৃত কলনাদিনী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। তাহার দুই ধারে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার যেন কাহার জন্য সযত্নে সাজানো। তারই এক প্রান্তে রাজবাটীর খিড়কীর পুষ্পোদ্যান। সেখান হইতে নানা জাতীয় ফুলের গন্ধে চারিদিক যেন আনন্দময় হইয়া থাকিত।

ঐ পুষ্পোদ্যানের অনতিদূরে, নদী তটে বসিয়া এক অতি রূপবান ব্রাহ্মণ যুবক নিবিষ্ট চিত্তে একখানি ছবি আঁকিতেছিল। তাহার গলায় ধবল যজ্ঞোপবীত,

কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, শিখায় ফুল। ব্রাহ্মণ যুবকের পরিধানে পরিপাটীরূপে কোঁচান একখানি দরিদ্রোপযোগী কোষের বস্ত্র। মাথায় কোঁকড়ানো চুল ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত।

যুবক একখানি মসৃণ শ্বেত পাথরের উপর ছবি আঁকিতে ছিল। সাঁঝের আলোয় কুটীর-বাসিনী ষোড়শী উৎকণ্ঠিত নয়নে স্বামীর পথ চাহিয়া আছে—ইহাই ছবিখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। যুবকের সুনিপুণ তুলিকায় সন্ধ্যার আকাশ, সান্ধ্য প্রকৃতি, নদীতীর এবং রাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি অতি সুন্দর ভাবে হুবহু ফুটিয়াছে। কুটীরখানি মানানসই হইয়াছে। আঙ্গিনার পার্শ্বের অশোকের ডাল ধরিয়া তরুণী দণ্ডায়মানা।

এই নারীমূর্ত্তি আঁকিতে যুবক পদে পদে বিপন্ন হইতেছিল। বাঞ্ছিতের প্রতীক্ষায় সে কেমন ভাবে দাঁড়াইবে, তাহার হাত পা'র ভঙ্গী কেমন হইবে, তাহার চাহনি, তাহার ওষ্ঠাধর কি ভাবে আঁকিতে হইবে, যুবক তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিল না। অনেক রকম করিয়া আঁকিল; কিন্তু তাহার আপন চক্ষুই তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে অকৃতকার্য্যতার সংবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। অবশেষে অপরাহ্নের ম্লান দিনকর যখন তাহার সুন্দর মুখখানিকে সান্ধ্য কমলের মত করিয়া তুলিল, তখন যুবক তুলি কাণে গুঁজিয়া, পাথরখানি বুকে ধরিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল।

(২)

কয়েকদিন ধরিয়াই বেচারীর ব্যর্থ চেষ্টা তাহাকে একান্তই কাহিল করিয়া তুলিল। যুবক মনের সমুদয় একাগ্রতা জড়াইয়া ঐ ছবিটার পূর্ণতার জন্য উৎসর্গ করিয়াও আশীর্ব্বাদ পাইল না। প্রত্যেক দিনের সোনালী রং করা বিকাল বেলাগুলি যুবকের নিকট নিস্ফল হইয়া যাইতে লাগিল।

সে প্রত্যহ আসে—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আপন ঘরে ফিরিয়া যায়। তাহার কামিনীজন-সুলভ কমনীয় মুখকান্তি ক্রমে যেন রুক্ষ হইয়া উঠিল। প্রত্যাগমকালে যুবক যে মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত - তাহা যেন হাউইর মত সোঁ—করিয়া মুক্ত গগনে উঠিয়া, ছাই হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত।

যুবকের চিত্র শেষ হইল না।

(৩)

"ঠাকুর! এ তোমার কি লীলা দয়াময়? আমায় ত আর কোনও দিন এমন করিয়া দুঃখ দাও নাই? একদিন নয়, দু'দিন নয়, আজ একটী মাস কায়মনপ্রাণে খাটিয়াও ত আমার ছবিখানি শেষ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর! তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি তো জান্‌ছ—এই ছবিখানি পূর্ণাঙ্গ কর্ত্তে না পেরে, আমি মর্ম্মে মর্ম্মে কেমন ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়্‌ছি।" ব্রাহ্মণ গলায় উত্তরীয় জড়াইয়া ভক্তিভাবে গৃহদেবতা গোবিন্দজীকে প্রণাম করিল। তাহার দুটী চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল ভূমিতল সিক্ত করিয়া শুকাইয়া গেল। ঠাকুর যদি মানুষের মত হইতেন, তখনই সেই ভক্তকে দুইহাতে ধরিয়া তুলিয়া কোলে লইতেন।

পূজা শেষ করিয়া সে আজ মনের মতন করিয়া ঠাকুরকে সাজাইল। নানা রঙ্গের ফুল দিয়া সিংহাসন খানি মনোরম করিয়া তুলিল। তারপর একবিন্দু চরণামৃত মুখে দিয়া, পুনরায় প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল -"মা—ওমা।"

"কেন বাপ।"

"দেখে যাও মা, তোমার শ্রীগোবিন্দকে আজ কেমন দেখাচ্ছে। শীগ্‌গীর এসো মা, শীগ্‌গীর—আজ তোমার ঠাকুরকে দেখে, নিতান্ত নাস্তিকেও বলবে যে ওই ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী মূর্ত্তির ভিতর আসল ঠাকুরটী চুপ করে লুকিয়ে আছেন। একবার দেখো মা" —

প্রৌঢ়া জননী আসিয়া ঠাকুর ঘরের দুয়ারে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। "হাঁ বাবা, আজ ঠাকুরকে বড় সুন্দর দেখ্‌ছি। বাবা, ভক্তিতে পূজা কর্‌লেই ওই মূর্ত্তির ভিতর হতে আসল ঠাকুরের জ্যোতিঃ বের হয়ে পড়ে। কেবল ফুল আর চন্দনে ঠাকুরের শোভা হয় না। প্রধানই হচ্ছে ভক্তি। আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর! ঠাকুর, আমার ছেলের মনের সাধ পূর্ণ কর। সে দীর্ঘায়ু হউক।" ঠাকুরের নিকট আর কি কি চাইতে হইবে, বৃদ্ধা জননী তাহা জানিতেন না। তাই পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"যাও বাপ ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—

এনে দাওগে। আহা ঠাকুর! তোমার শাক ভাতের বেশী কিছু দিতে আর জুটল না!"

(৪)

যুবক সায়াহ্নে পূর্ব্ববৎ ছবি আঁকিতে বসিয়াছে। "ঠাকুর, আজ আমার ছবিটী ঠিক করে দিও"—এই বলিয়া তুলিটী হাতে লইল। তারপর কি জানি কেন রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিল—অমনি দেখিল, বাতায়নপথে এক অনিন্দ্যসুন্দরী তন্বঙ্গী ষোড়শী, যেন ঈষৎ হাস্য করিতেছে। অপরাহ্ণ সূর্য্য কিরণে তাহার নাকের মণির টিপ, কানের রতন ঝুম্‌কা, মাথার কনক সিঁথি, কণ্ঠের মণিহার, ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। এই সকল অলঙ্কারের তীব্র জ্যোতিতে রমণীর মুখখানি অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কপালের সিন্দুর বিন্দু সান্ধ্যতারকার মত ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই—তাই সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা সেই ভাস্বর রূপরাশি বাতায়ন পথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ যুবকের চক্ষুর সম্মুখে যেন সারা বছরের অমানিশার অন্ধকার একত্রে ঘনীভূত হইয়া জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ব্রাহ্মণ উদাসীনের মত তখন আপন সাজ সরঞ্জাম লইয়া ঘরে আসিয়াছে। আজ তাহার বহুদিনের সাধনার ছবিখানি সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একবার মাত্র ছবিখানি দেখিয়া গদ গদ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"হাঁ, ঠিক হইয়াছে—ঠাকুর।"

আজ তাহার সফলতা অত্যন্ত অজ্ঞাতসারে তাহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া গিয়াছে। ঠাকুর আনন্দিতচিত্তে গোবিন্দজীর আরতি করিতে গেল।

(৫)

ঐখানে বসিয়া ব্রাহ্মণ আরও ছবি আঁকিয়াছে। ঐ রূপসীকে আরও কতবার দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার হৃদয় আর ছবিতে পরিতৃপ্ত নহে। কারণ, যতই বিভিন্ন ভাবের ছবি আঁকিতে সে চেষ্টা করিয়াছে, সকল ছবিতেই—ঐ সুন্দরীর মুখখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে ব্রাহ্মণ আপন তুলিকা, রঙ্ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে গেল। আর সে ছবি আঁকিবে না স্থির করিল।

এবার সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঠাকুরের পূজায় মন দিল। রাজবাটীর ফুল বাগানে ভোর বেলায় প্রবেশ করিয়া সাজি ভরিয়া ফুল তুলিত, আর গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গায়িত।

একদিন ব্রাহ্মণ দেখিল খিড়কী-বাগানের দরজা খোলা। সেই খোলা দরজায় দেখা গেল—বাগানের ভিতর বড় বড় গোলাপ, বেলী প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সে লঘু পদক্ষেপে সেখানে প্রবেশ করিয়া কয়েকটা ফুল তুলিয়া সাজিতে সাজাইল। অমনি বাগানের মালী হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল,—ঠাকুর! কি সাহস তোমার—যে রাজবাড়ীর ভিতরে ঢুকেছ? যাও—এখনি বের হয়ে—এখানে ফুল তুল্‌লে গর্দ্দান যাবে—জান নাকি?

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মনে মনে কহিল—"শ্রীগোবিন্দ! এই মনোহর ফুলে যদি তোমার পূজা করিতে পারি তো করিব—নতুবা আজই পূজার শেষ। আহা! কি চমৎকার ফুলগুলি।"

*　　*　　*

"কর্ত্তা ঠাকুর! ও কর্ত্তা ঠাকুর! বাড়ী আছ কি?" বাহিরে ঘন ঘন ডাক পড়িতেছিল। ঠাকুর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—সেই মালী। তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। কি—আমার বাড়ী পর্য্যন্ত মালী বেটা তাড়া করছে? এতদূর!'—কিন্তু ততক্ষণ মালী যোড়হাতে সজল নয়নে কহিল—"ঠাকুর আমার অপরাধ মাপ কর। ঐ বাগানের সব ফুল তোমার! রাণী মা'র হুকুম। চল ঠাকুর—ফুল আন্‌তে চল।"

"আজ আর ফুল চাই না। কাল যাব।"

"না দেবতা! তবে আমার জান্ থাকবে না। ঠাকুর! আমায় মাপ কর—এখনি যাইতে হইবে।"

জয় শ্রীগোবিন্দ—বলিয়া ব্রাহ্মণ ফুল তুলিবার সাজি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

(৬)

ঠাকুর ফুল তোলে, পূজা করে—আর বিকাল বেলায় বসিয়া কবিতা লেখে। সকাল বেলায় সেই কবিতা গুণ্ গুণ্ করিয়া গায়—আর সাজি ভরিয়া ফুল কুড়ায়।

এক দিন ব্রাহ্মণ ফুল তুলিতে তুলিতে অন্যমনস্ক হইয়া গাহিয়া উঠিল—

"সজনি! অপরূপ পেখনু বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল,—হরিণহীন হিমধামা।"

"কে তুমি ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—ফুল বাগানের কুঞ্জ বাটিকার সোপানে দাঁড়াইয়া, তাহার সেই বাতায়ন-পথবর্ত্তিনী সুন্দরী!

ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। সে পাথরের মূর্ত্তির মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কুঞ্জবনে বিদ্যুৎ বৃষ্টি করিয়া পুনরায় কহিলেন—"ব্রাহ্মণ! তুমি তো বেশ গাইতে পার।—একটা গান গাও শুনি ঠাকুর।"

কষ্টে ঢোক গিলিয়া সে উত্তর করিল—আজ্ঞে—আজ্ঞে—না—তা—

"না ঠাকুর গান করিতেই হইবে।"

"আজ্ঞে—আমার—গান—হয় না।"

"বেশ হয়।—গাও।

"না—আমি গান গাইতে পারি না।"

"পার বই কি?"

"আজ্ঞে তবে আমি যাই। আর এখানে অসিব না।"

"যাবে কোথায়? দাঁড়াও। গান কর্ত্তেই হবে। আমি তোমায় ছাড়্ব না।"

"কে তুমি রমণী, আমার উপর অমন কড়া হুকুম দিচ্ছ।"

"আমি রাজমহিষী—লক্ষ্মী।"

ঠাকুর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। বটেই ত এতরূপ কি রাজমহিষী ছাড়া আর কাহারো হয়। হায়! হায়! আমি কেন এই সিংহ-বিবরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। গোবিন্দজী আমায় মুক্ত করে দাও।"

রাজমহিষী ব্রাহ্মণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ রাজমহিষীকে গান শুনাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া গেল।

(৭)

ব্রাহ্মণ এখন দুই বেলাই রাজার খিড়কী বাগানে মর্ম্মর সোপানে বসিয়া মধুর স্বরে গান গায়। সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি রাজ অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া রাজ-কর্ম্মচারী এবং পথিকগণের কর্ণে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। কত পথিক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই গান শুনে। কত মুন্সী মুহরী কলম হাতে লইয়া বেকুবের মত বসিয়া থাকে।

কথাটা ক্রমে বড় মন্দ হইয়া লোকের কাণে উঠিল। মুখে মুখে খুব কথাটা ক্রমেই বাড়িয়া গেল। শেষে স্বয়ং মহারাজও সেই কথাটা শুনিলেন।

রাজা যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি রাণীর অলোকসামান্য রূপ, অসীমগুণ এবং অতুলনীয় পতিভক্তিতে চিরমুগ্ধ। তাই তিনি রাণীর কোনও কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন না। ব্রাহ্মণ গান গায়, রাজা প্রত্যহই দ্বিতলে শুইয়া শ্রবণ করেন। রাণী যাহাতে সন্তুষ্ট—রাজার তাহাতে দুঃখ কি? কিন্তু আজ আর রাজা নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি রাণীকে ডাকিয়া কহিলেন—"লক্ষ্মি! লোকে বড় দুর্ণাম রটাইতেছে।"

"শুনিয়াছি প্রভু।"

"বেশ সহজ ভাবে বল্লে বটে। কিন্তু—

"কিন্তু কি স্বামিন্?"

"লোকের এ বিশ্বাসের মূলে কি জানো?"

"জানিবার দরকার নাই। মন্দ লোকে কত কি না কহে।"

"রাজ্যের সবাই মন্দ—লক্ষ্মি!"

"তবে আমি মন্দ?" রাণীর স্বর একটু তিক্ত।

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত। দশজনের কথা কি অগ্রাহ্য করা চলে?"

"কি করিতে চাও দেবতা।"

"আমি ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া দিব।"

"তাতে দুর্ণামটা কায়েম হবে মাত্র।"

"তবে ব্রাহ্মণকে আর রাজ বাটীতে প্রবেশ কর্ত্তে দিব না।"

"তাতেও সমান ফল।"

"তুমি কি মনে কর লক্ষ্মি?"

"ব্রাহ্মণ নির্দোষ—আমি নির্দোষ।"

"আমি বিশ্বাস করি কিন্তু জনরব যে ভয়ঙ্কর।"

"আচ্ছা স্বামী! আমি কাল তোমায় কলঙ্ক মুক্ত কর্‌ব। তুমি প্রজা সাধারণকে প্রকাশ্য দরবারে আহ্বান কর।"

(৮)

রাজবাটীর বিস্তৃত অঙ্গনে প্রজাগণ, রাজ্যের প্রধানগণ, মন্ত্রীবর্গ সমবেত হইয়াছেন। কেন যে এই মহতী সভার অনুষ্ঠান, তাহা কেহই বুঝিল না। সভায় কেহ বা কাণে কাণে কহিল—"কি ভাই, আজতো গান শুনা যাচ্ছে না। কেহ কহিল "আজ হয়ত রাজা আমাদিগকে গান শুনাবেন।" বড়ই চাপা গলায় এ সকল কথা হইতেছিল। এমন সময় মহারাজ সভায় প্রবেশ করিলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের জয় ঘোষণা করিল।

রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিলে—অন্তঃপুরে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল—রমণীগণ পঞ্চমে হুলুধ্বনি করিলেন। সকলে বুঝিল—আজ রাজরাণী সভায় প্রজাগণকে দর্শন দিবেন। তিনি বৎসরে একদিন রাজ সভায় উপবেশন করিয়া থাকেন। বহুকাল হইতে এই রাজ্যে এই রীতি প্রচলিত।

রাজ রাণী সভায় উপনীতা হইলে সকলে তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিল। রাণী রাজার বাম পার্শ্বে আসিয়া সিংহাসন খানি ধরিয়া নত মুখে দাঁড়াইলেন, বসিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাণী মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"মহারাজ—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দশদিক আনন্দ তরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া এক মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক কমনীয় কান্তি উন্নত বপু যুবক গান গায়িতে গায়িতে ধীরে ধীরে সভাস্থলে প্রবেশ করিতেছে। যুবকের পরিধানে গৈরিক বসন, স্কন্ধে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায়, বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা। মস্তকের কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধোপরি সুবিন্যস্ত। আয়ত চক্ষুদ্বয়ে সরলতা বিজড়িত প্রতিভার চিহ্ন দেদীপ্যমান। যুবক উচ্চ কণ্ঠে গায়িল—

"তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।"

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া, মঞ্চের উপরে দাঁড়াইল। তার পর সভাস্থ জনগণের দিকে চাহিয়া, বামহস্তে ললাটের কেশ পাশ সরাইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল—"মা, সতীরাণী রাজলক্ষ্মী! তুমি আজ অগ্নি পরীক্ষা দিতে এসেছ! শোন সমবেত জন-সঙ্ঘ, শোন মহারাজ! আমি সামান্য চিত্রকর ছিলাম। এই মহিমময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, আমি নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছি। আজ আমার রচিত সঙ্গীতে দেশ প্লাবিত। কিন্তু দুর্ব্বল চিত্ত মানবেরা মহারাণীকে মন্দ চক্ষে দেখিয়া পাপী হইয়াছে। আজ ব্রাহ্মণ সন্তান আমি রাজ সিংহাসন স্পর্শ করিয়া, ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি—রাজ্যেশ্বরী লক্ষ্মী দেবীকে আমি ভগবতীর অংশ স্বরূপা মনে করি। অতরূপ গুণ মানুষের হয় না।" তার পর ব্রাহ্মণ রাণীর সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিলেন—"মা, মা লক্ষ্মী, আমি তোমার সন্তান! তুমি আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি অবতরণকারিণী দেবী।"

সভাস্থ জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া মহারাণীকে অভিবাদন করিল।

রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ঠাকুর তুমি যথার্থ কবি—তুমি কোথায় থাক, কি কর?"

"আমি রাজবাটীর পার্শ্বেই এক কুটীর বাঁধিয়াছি। গান করিয়া দিন কাটাই।"

"আজ হতে তুমি আমার সভাসদ্ হইলে।"

উপস্থিত জনগণের কৌতুহল বাড়িয়া উঠিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন——"ঠাকুর, তুমি কে? যার মধুর গানে মিথিলা ভূমি আজ প্লাবিত, তুমি কি সেই—"

"হাঁ, আমার নাম বিদ্যাপতি।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলন।

বিদ্যাপতি, দাশরথি, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের সাধনার মহাতীর্থ, কবিকঙ্কন, কাশীরামের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত, হাস্য রসিক ইন্দ্রনাথের হাস্য তরঙ্গ মুখরিত পুণ্য ক্ষেত্র—বর্দ্ধমান-রাজলক্ষ্মীর পাদপীঠে বঙ্গবাণী মাতার ভক্ত উপাসক মণ্ডলীর অষ্টম মিলনোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য গত ১লা এপ্রিল আমরা ১২টার গাড়ীতে রওয়ানা হইলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল। সহসা অর্দ্ধপথে গাড়ী থামিয়া গেল। আমরা গভীর আশঙ্কার সহিত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে শুনিলাম, গাড়ীর নীচে পড়িয়া একটা গো-হত্যা হইয়া গিয়াছে! যাত্রার পথে এই অশুভ ঘটনায় মনটা একটু চঞ্চল হইয়া গেল। আমরা একটা অভাবনীয় বিপত্তির আশঙ্কা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে সান্তাহারে পৌঁছিলাম। এইখানে আমাদিগকে দার্জ্জিলিং মেল ধরিতে হইবে। ট্রেণ আসিয়া সান্তাহার ষ্টেশনে লাগিবার পূর্ব্বে গাড়ীখানা থামিয়া পড়িল। বুঝিলাম ষ্টেশন মাষ্টারের কৃতিত্বে আমাদিগকে April fool ই সাজিতে হইবে। গো-হত্যার ফল হাতে হাতে ফলিবে। পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম, দার্জ্জিলিং মেইল ট্রেনখানা আমাদের মনে 'এপ্রিল ফুলের' স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে সুতরাং আইনতঃ আমরা fool বনিলাম না সত্য কিন্তু গো-হত্যার পরিণাম —এই দুর্ভোগের কথা ভাবিতে ভাবিতে সারা রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম।

শিলং মেল আসিয়া পৌঁছিল। তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। তপনের তরুণ আলো পল্লীগ্রামের অবাধ পথে, গাছে গাছে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়া শিশুর শুভ্র হাস্যের মত প্রকৃতিকে শোভাময় করিয়াছে। লোক উঠা নামা করিতেছে। গাড়ীতে গাড়ীতে লোকের ভিড়। আমরা রাত্রেই গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় ভিড় ঠেলিয়া একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। তাঁহার নাকের উপর চশমা বসান, গায়ে কোট বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি শ্যামনগরের যাত্রী। সপরিবারে লাঙ্গলবন্দে অষ্টমী স্নান করিয়া চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা ঘুরিয়া এখন বাড়ীতে ফিরিতেছেন। তিনি তাঁহার দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! সীতাকুণ্ডটা কোন বিভাগে।" অমনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক উত্তর করিলেন "সে যে রঙ্গপুর বিভাগে মশায়!" শুনিয়া আমরা হাসিয়া ফেলিলাম। পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গীয় লোকের এইরূপ শোচনীয় অনভিজ্ঞতার কথা এদিক ওদিকের দুই একটী বন্ধুর কাণে কাণে বলিলাম; দেখিয়া ভদ্রলোকটী একটু চটিয়া গেলেন। ভদ্রলোকটী তখন একটু জেদের সহিতেই বলিলেন "সীতকুণ্ডযে রঙ্গপুরেই—আপনি জানেন না।" আমাদের মধ্যে একজন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম বিভাগে।" তখন সেই ভ্রমণকারী বলিলেন "হাঁ মশায় আপনার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্চে, কেননা সীতাকুণ্ড স্থানটা চাঁটগাঁর সন্নিকটে বলিয়া শুনা গেল।" এইরূপ নানা গল্প গুজবে বেলা চড়িয়া উঠিল, গাড়ী চলিতে লাগিল।

ক্রমে গাড়ী সারা ব্রীজের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পাহাড়ের মত উচু পাথরের রাস্তা নিম্নে ঘর বাড়ীগুলি ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল। মাইল খানেক এই উচু রাস্তা দিয়া চলিয়া গাড়ী সারা ব্রীজ বা হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উপর পঁহুছিল। পোনরটী বিশাল arch সম্বলিত এই বিরাট পুল, দেখিলেই মনে হয় যেন লৌহ প্রস্তর ও ইষ্টকাদির এক বিরাট পীড়ামিড ভাগিরথীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার গর্ব্বিত দেহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিতেছে। যে ভাগিরথী একদিন স্বীয় তরঙ্গাভিঘাতে গর্ব্বিত ঐরাবতের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার সেই গর্ব্বিত স্রোত ইংরেজের কল কৌশলে ও বিজ্ঞানের যন্ত্রে-মন্ত্রে আবদ্ধ!!

গাড়ী আসিয়া রাণাঘাটে থামিল। ডাকগাড়ী নৈহাটীতে অপেক্ষা করিবে না বলিয়া আমরা রাণাঘাটেই

গাড়ী বদল করিলাম। এইখানে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য বহু সাহি-

ষ্টার অব ইণ্ডিয়া গেট্।

ত্যিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তারপর নৈহাটী আসিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বাণ্ডেলে আসিয়া ২½ টায় বর্দ্ধমানযাত্রী গাড়ী ধরিলাম। সে দিনের সে গাড়ী বর্দ্ধমানযাত্রী ছোট বড় সাহিত্যিক দ্বারা পূর্ণ ছিল। কষ্টে সৃষ্টে গাড়ীতে স্থান করিয়া লইলাম। গাড়ী বর্দ্ধমানাভিমুখে হু হু করিয়া ছুটীল।

বেলা ৪½ টায় আসিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ষ্টেশনে সবুজ বেজধারী স্বেচ্ছা সেবক দল অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়াই, দেখিলাম, "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান। আমাদিগকে দেখিয়াই জলধর বাবু বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। আমরা তাঁহার নিয়োজিত স্বেচ্ছা সেবকগণের নির্দ্দেশ অনুসারে অশ্বযানে যাইয়া রাজকলেজে উপনীত হইলাম।

আমরা আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেছি এবং বিছানা পত্র গুলি ঠিক মত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম বিনয়ের অবতার বাঙ্গালার গৌরব বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ কর যোড়ে আমাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। মুখ ফিরাইয়া অভিবাদন করিবা মাত্র তিনি বলিলেন "আপনারা বহু কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন, আপনাদের নিজ বাড়ী মনে করিয়া দ্বিধা শূন্য মনে যখন যাহা আবশ্যক হয় চাহিয়া লইবেন।" এইরূপে তিনি জনে জনে অনুরোধ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সে আতিথেয়তা, দীন সাহিত্য সেবিগণ জীবনে ভুলিতে পারিবে না। এর পর জলযোগ করিয়া আমরা বর্দ্ধমান সহর দর্শন করিতে বাহির হইলাম।

বর্দ্ধমানের প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান।

ষ্টার অব ইণ্ডিয়া গেট—রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের বর্দ্ধমানে যাওয়ার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ এই সিংহদ্বার নির্ম্মান করান।

মহাতাব মঞ্জিল—মহারাজাধিরাজের প্রধান রাজ প্রাসাদ। এই প্রাসাদ অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। ইহা উৎকৃষ্ট চিত্রাবলি, সুদৃশ্য আসবাব পত্র ও বিশাল পুস্তকালয়ে পরিশোভিত। এই গৃহের সুবিশাল দর্পণগুলি দেখিলে পাণ্ডব প্রাসাদে দুর্য্যধনের বিপত্তির কথা স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠে।

দেলকুশা বাগ—মহারাজাধিরাজের চিড়িয়াখানা অতি মনোরম। রাস্তা ঘাটের শৃঙ্খলায় আলিপুরকেও যেন পরাস্ত করিয়াছে। ইহার ভিতর একটী মনোরম বাস ভবন আছে। ইহাতে অতিথি রাজ-প্রতিনিধিগণ আসিলে বাস করিয়া থাকেন।

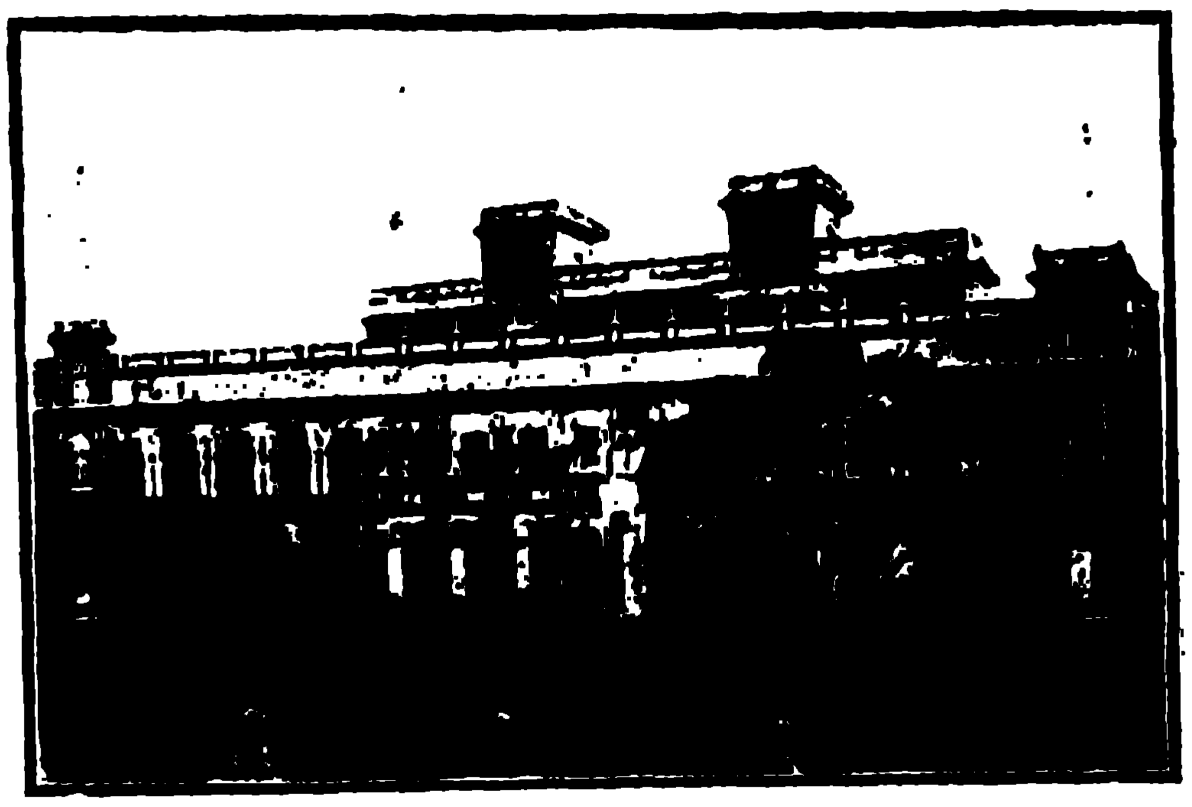

মহ্‌তাব মঞ্জিল।

কৃষ্ণসায়র ও তাহার তীরস্থিত আফ্‌তব ভবন—বর্দ্ধমানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সায়র বা সরোবর

আছে। তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালায় যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, সেই

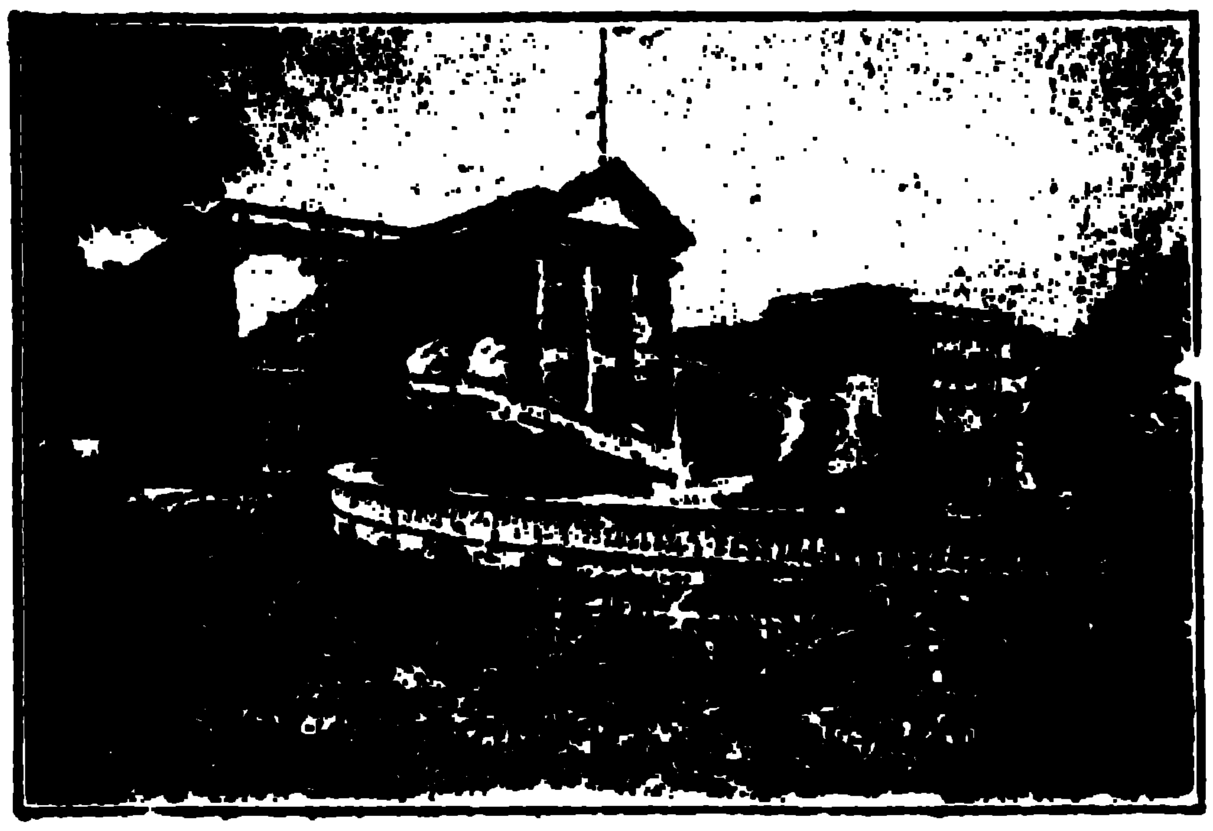

বেলকুণা রাজপ্রাসাদ।

সময় বর্দ্ধমান রাজ বংশের রায় কৃষ্ণরাম দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট নর নারীকে পোষণ করিবার জন্য এই সরোবর খনন করাইয়া ছিলেন। ইহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষ রাজিতে পরিশোভিত এবং উত্তর ও দক্ষিণ পারে দুইটী প্রাসাদ আছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল। ইহাতে বহু মৎস্য আছে।

নবাব হাট—১০৯ শিব মন্দির। বর্দ্ধমান সহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে এই মন্দিরগুলি অবস্থিত। ১০৮টী মন্দির চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যে দুইটী পুকুর। প্রত্যেক মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত। বাহিরে একটী মন্দির। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদের মহিষী বিষ্ণুকুমারী দেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃষ্ণ সায়র।

সের আফগান ও কতুবউদ্দীনের সমাধি——সের আফগান বর্দ্ধমানের জায়গীরদার ছিলেন। অলোক সামান্য রূপবতী মেহেরুন্নেসা তাঁহার পত্নী। সম্রাট জাহাঙ্গীর বল পূর্ব্বক ইহাকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য কুতুবদ্দীনকে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। কুতুবউদ্দীন সের আফগানকে নিহত করিয়া মেহেরুন্নেসাকে দিল্লী পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। ফলে সের আফগান ও কুতুবুদ্দীন উভয়েরই মৃত্যু হইল। মেহেরুন্নেশা দিল্লীতে নীত হইলেন এবং কিছু দিন পর জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী হইলেন। এই মেহেরুন্নেসাই —জগত বিখ্যাত নুরজাহান।

সমাধি গাত্রে যে প্রস্তর ফলক আছে তাহাতে লিখিত আছে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সের আফগান ও কতুব মৃত্যু মুখে পতিত হন।

সম্মিলন।

রাজপুরীর অভ্যন্তরে, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর বাড়ীর

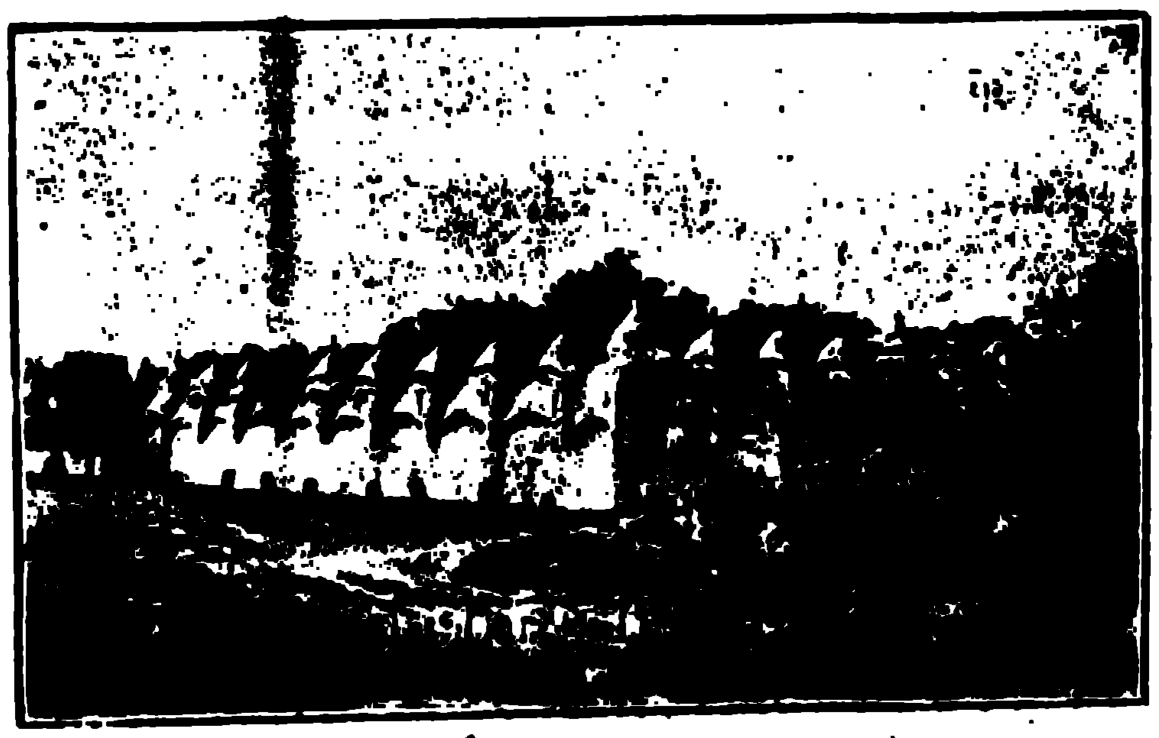

নবাব হাট—১০৯ শিব মন্দির।

প্রশস্ত চত্বরে, সম্মিলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দুইটী আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর প্রাঙ্গন। শ্বেত রক্ত ও নীল বসনে মণ্ডপের উর্দ্ধদেশ ও চারি পার্শ্ব সুশোভিত ছিল। মণ্ডপের মাঝামাঝি জায়গায় সভা-বেদিকা। বেদীর উপর সভাপতি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং রাজা মহারাজাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সম্মিলনে প্রায় নয় শত প্রতিনিধি সহ আড়াই হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এত অধিক প্রতিনিধি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই। নিদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রখর উত্তাপ সহ্য করিয়াও সেই বিশাল জন সঙ্ঘের মুখে উৎসাহের দীপ্তি, বিরাজ করিতেছিল। ২০শে চৈত্র ঠিক

আড়াইটার সময় উদ্বোধন গীতির সহিত সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে সমাগত সারস্বতবর্গ ও বিদ্বজ্জন মণ্ডলীকে একটী নাতি দীর্ঘ সুন্দর অভিভাষণে সাদর সম্ভাষণ করেন। তারপর সংবর্দ্ধনা সূচক কবিতা পঠিত হইলে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া মহারাজাধিরাজস্তোত্র নামক তাঁহার "সম্বোধন" পাঠ করিলেন। তাঁহার সম্বোধনে ঐতিহাসিক গবেষণা ছিল, যাহাতে সাধারণের হস্তগত হয়, সমিতির কার্য্য পরিচালনা সমিতি ভবিষ্যতে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

তাহার ফলে এবার অভিভাষণ গুলি মুদ্রিত হইয়া সভামণ্ডপে বিতরিত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু জানিনা কোন্ স্বার্থের প্রণোদনে কোন কোন অভিভাষণের পশ্চাতে "লেখকের অনুমতি ভিন্ন এই প্রবন্ধ কেহ মুদ্রিত বা ভাষান্তরিত করিতে পারিবেন না" এইরূপ মার্কা মারা হইয়াছে। এইরূপ সংকীর্ণতা লইয়া আমরা কতকাল চলিব!

সের আফ্গান ও কতুবউদ্দীনের সমাধি।

কিন্তু সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির 'সম্বোধনের' উপযুক্ত কিছু ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অহেতুকী খোসামুদের অংশ পরিত্যাগ করিয়া এই মূল্যবান প্রবন্ধটী ইতিহাস বিভাগে পাঠ করিলে প্রবন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা হইত।

বিগত বৎসর আমরা বলিয়াছিলাম "আমরা ময়মনসিংহ সম্মিলন হইতে দেখিতে পাইতেছি সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পত্রিকা বিশেষের জন্য লিখিত হইতেছে; ইহা জন সাধারণে জন্য প্রচারের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। সভাপতির অভিভাষণ গুলি

এই দিন সন্ধ্যার পর মহারাজাধিরাজ এক উদ্যান সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। সেখানে বৈঠকী গান, বাউল সঙ্গীত, চণ্ডীর গান, সোডা-লিমনেড-চা-বিস্কুট-মীহিদানা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েরই ব্যবস্থা ছিল। সেখানেও রাজা সাহেব বনবিহারী কর্পূর ও মহারাজাধিরাজ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া আতিথেয়তার সম্যক পরিচয় প্রদান করেন। রাত্রে মহারাজের লিখিত "শিবশক্তি", "ত্রিচিত্র" ও "চন্দ্রোজিৎ" নাটকের অভিনয় হয়।

২১শে চৈত্র রবিবার হইতে মূল সভা,—সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এই চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া

যায় এবং দুইবেলা সভার অধিবেশন হয়। সাহিত্য বিভাগে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দর্শন বিভাগে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ইতিহাস বিভাগে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং বিজ্ঞান বিভাগে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মূল সভামণ্ডপ কে যবনিকা দ্বারা বিভক্ত করিয়া সাহিত্য ও দর্শনের স্থান করা হয়। ইতিহাস তাম্বু ক্রোড়ে এবং বিজ্ঞান রঙ্গমঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে এক সভা চারিভাগে বিভক্ত হওয়ায় লোকাভাব সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। দর্শকগণ অবসর পাইয়া ডাব ও সোডা-লেমনেডের সদ্ব্যবহার করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং শাখায় শাখায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তখন কোলাহল আর করতালি ব্যতীত অন্য কিছু বড় শ্রুতি গোচর হইতেছিলনা। এইরূপ বিভাগ করিয়াও কিন্তু বহু প্রবন্ধকে "কবন্ধ' করিয়া পাঠ করা হইয়াছিল।

এই সম্মিলনে আমাদের ময়মনসিংহ জেলা হইতে দশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। এই দিন সন্ধ্যায় আমাদের জেলা বাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ ও জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল প্রদর্শন করেন। এই দিবস রাত্রেও নাটকের ব্যবস্থা ছিল।

তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে সভার অধিবেশন হয় এবং বহু প্রস্তাব সমর্থিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখ যোগ্য। (১) মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ের প্রশ্ন বাঙ্গালায় হউক। (২) আই, এ, আই এস সি ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা বর্ক্তৃতা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শুনিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এবং (৩) বাঙ্গালায় যাহাতে এম, এ, পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হউক। (৪) পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য একটা মান মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রস্তাবে দানবীর মহারাজা কাশীমবাজার একটী মানমন্দিরের ব্যয় ভার এবং তাহা পরিচালনের ব্যয় মাসিক দুই শত টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।

এইবার নিমন্ত্রণের পালা। যশোহর হইতে পূর্ব্ব বৎসরই সম্মিলনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, এবার তাহাই পুনরায় শুনাইয়া দেওয়া হইল। তখন মহারাজ কাশীম বাজার উঠিয়া বলিলেন যে আমাদের সৌভাগ্য-সম্মিলন অগ্রিম আর একটী নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যশোহরের পরে আমাদের বাঁকীপুরে আমন্ত্রণ আসিয়াছে।

তারপর ধন্যবাদের পালা। এই ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে মহারাজাধিরাজ যে প্রত্যুত্তরটী করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই বর্ক্তৃতায় তিনি যে পাণ্ডিত্য ও অমায়িকতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা আমাদের দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের অনুকরণীয়। তিনি এই সম্মিলনে যে আদর্শ প্রদান করিয়াছেন, স্বীয়পদ মর্য্যাদা ভুলিয়া দীন সাহিত্য সেবিগণের সহিত যে ভাবে মিলিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ স্থানীয়। সম্মিলনে ক্রমে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অকৃত্রিম সম্মিলন দেখিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইতেছেন।

এই দিন সভা একটু তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিয়া সকলেই বর্দ্ধমান ছাড়িবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়েন। ফলে তিনটায়ই বাণীর সেবকগণের মিলনোৎসব কার্য্য আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সমস্যা।

কাছে গেলে সে কহিত মোরে,
"এ'যে তব রূপের সাধনা,"
না গেলে সে কহিত কাঁদিয়া
"নিরদয় ভালত বাসনা।"
কত মাস—কত বর্ষ হায়!
অতীতের কোলে গেছে মিশি;
এখনো যে পারি নাই তারে
বুঝাইতে কত ভালবাসি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

যুদ্ধক্ষেত্রে—চাঁদসুলতানা।

চিত্রশিল্পী—শ্রীসারদাচরণ রায়।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

কলিকাতা

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। { ৮ম সংখ্যা।

সমাজ ও সমর।

খ্রীষ্ট জন্মিবারও কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো একবার ভাবিয়াছিলেন, আদর্শ রাষ্ট্রটী কিরূপ হওয়া উচিত। তাঁহার পরে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে কেহ একথাটা ভাবিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। প্লেটোর অনেক পূর্ব্বে হইলেও হিন্দুর দার্শনিক চিন্তার গতি বরাবরই অন্যদিকে ছিল; সুতরাং হিন্দুর কাছে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আশা করা যায় না। এই যে একান্ত মৌলিক ভাবুক প্লেটো, তিনি এই নূতন বিষয়ে প্রথম ভাবিতে গিয়া নিতান্তই একটা মৌলিক কথা বলিয়া ছিলেন। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের যে সমস্ত নিয়ম থাকা উচিত তার মধ্যে এমন একটা নিয়মের উল্লেখ করিয়া ছিলেন, যাহাতে আপাততঃ একটু হৃদয়-হীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে পঙ্গু, অন্ধ বা অন্য কোনরূপে হীনাঙ্গ বা অক্ষম-দেহ যারা, তাদের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার হইতে পারে না, সুতরাং রাষ্ট্র তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য নহে; বরং, সমগ্র দেহের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন সর্প দষ্ট বা বিষ-দুষ্ট অঙ্গকে ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়, তেমনই রাষ্ট্রের পূর্ণতা ও স্বাস্থ্যের জন্য হীনাঙ্গ ও অক্ষম দেহকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। মানুষ যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, রাষ্ট্রের ও তেমনই স্থিতি ও উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়; ব্যক্তি সকল এই বিভিন্ন ক্রিয়ার করণ মাত্র; কিন্তু যারা হীনাঙ্গতা বা শারীরিক অক্ষমতার দরুণ এর কোনটাই সম্পাদন করিতে পারিবে না, ন্যায়তঃ রাষ্ট্রে তাহাদের কোন স্থান নাই, এবং তাহাদিগকে মৃত্যু মুখে অর্পণ করাই রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গল।

দুই হাজার বৎসরের ও উর্দ্ধকাল মানুষ একথা শুনিয়াছে। কিন্তু এ নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা কখন ও হয় নাই, কিংবা এ চেষ্টাকে কেহ এ পর্য্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে নাই। বরং মানুষের চেষ্টা বরাবরই এর বিপরীত দিকে গিয়াছে। অনুকম্পা বলিয়া মানুষের একটা প্রবৃত্তি আছে। পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু দুঃস্থ ব্যক্তির চোখের জলে একেবারেই হৃদয় গলে না, মানব-নামের অধিকারী এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। বিকলাঙ্গ যে ব্যক্তি, উদরান্ন সংগ্রহ করিবার মত পরিশ্রম টুকুও যে করিতে পারে না, তাহা দ্বারা সমাজের কোন কাজ হইবে না বলিয়াই সমাজ নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে একেবারে ত্যাগ কখনও করে নাই। তুমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইহাদিগকে খুঁজিয়া ২ সাহায্য না করিতে পারি, কিন্তু সমগ্র সমাজের মধ্যে তাহাদের একটা আশ্রয় আছে। বর্ব্বর জাতির কথা ধরিতেছি না; অসভ্য এবং সমাজ—পরস্পর বিরোধী কথা। সভ্য যে সকল জাতি, যে সকল জাতির মধ্যে একটা সমাজ বন্ধন গঠিত হইয়াছে, তাদের মধ্যে অনুকম্পা ও পরোপকার প্রবৃত্তি চিরকালই আতুরদিগের একটা আশ্রয় করিয়া দিয়া আসিতেছে। নিতান্ত সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত যে সমস্ত ব্যক্তি, যাহারা নিজের দুরবস্থা অন্যে সংক্রামিত করিয়া দিয়া সমাজের

প্রভৃত অনিষ্ট করিতে পারে, সভ্য সমাজে তাদেরও একেবারে যত্নের অভাব হয় না। পৃথিবীতে কত শত ভিক্ষাশ্রম, চিকিৎসাগার প্রভৃতি ইহাদের যত্ন নিতেছে।

কেবল তাই নয়, মূক প্রাণীর প্রতিও মানুষের করুণা ধাবিত হইয়াছে। প্রাণি-জগতের প্রতি অনুকম্পা বৌদ্ধ ধর্ম্মেই প্রথম অত্যন্ত তেজের সহিত বিকাশ লাভ করে। 'দেবানাং প্রিয়দর্শী' অশোক কেবল প্রাণিদের হত্যা নিবারণের চেষ্টাই করেন নাই, দুঃস্থ প্রাণিকে রক্ষা ও যত্ন করাও মানুষের কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিয়া নিয়াছিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় নাই এমন নহে; এখনও পৃথিবীতে প্রাণিদের জন্য কত চিকিৎসাগার, কত "পিঁজরাপোল' রহিয়াছে, কে তাহা না জানে?

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, দুই হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ প্লেটোর নীতির বিরুদ্ধেই গিয়াছে, তাহা অনুসরণের চেষ্টা বড় করে নাই। বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন মানুষকে ত্যাগ করা দূরে থাকুক, ঐরূপ পশুটীকে ত্যাগ করিতেও মানুষের সমাজ সব সময় স্বীকৃত হয় নাই।

কেহ কখনও হিসাব করিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু মানুষের এই অনুকম্পার ফলে পৃথিবীর দুঃখ বেদনা কমিয়া আসিতেছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ হয়, তাহা ধরিতেছি না। কিন্তু জন্মাবধি অঙ্গবৈকল্য বা মহাব্যাধির নিমিত্ত আমরণ যারা দুঃখ ভোগ করে, মানুষের যত্ন ও অনুকম্পা তাদের সংখ্যা কমাইয়াছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এদের সংখ্যা গণনা করা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব, এবং সর্ব্বত্রই অত্যন্ত কঠিন। তথাপি এই সংখ্যা যে কমিতেছে না, এরূপ মনে করিবার একটী প্রবল বৈজ্ঞানিক হেতু আছে।

ডারুইন্ যখন ক্রমবিকাশের শাস্ত্র জগতে প্রচার করিলেন, তখন তার অঙ্গীভূত একটা মস্ত কথা তিনি বলিয়াছিলেন। 'ধত্তে পিতৃগুণং সুতঃ'—এ কথাটা আমরা অনেক দিন হইতেই জানি বটে, কিন্তু ডারুইনের সময় হইতেই তার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া গিয়াছে; এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে পুত্র কেবল পিতার গুণেরই উত্তরাধিকারী—এমন নহে; তাহার দোষ, তাহার শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য বা বৈশিষ্ট—এ সকলও উত্তরাধিকারী সূত্রে পুত্রে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। পিতার মানসিক ও শারীরিক সম্পত্তিতে পুত্রের এই অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত খাটে, বিজ্ঞান এখনও তাহা স্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে না বটে, তথাপি কতকগুলি সাধারণ সত্য অবিসংবাদিত রূপে লাভ করা গিয়াছে। এখন ইহা নির্দ্ধারিতরূপে জানা গিয়াছে যে শুধু পুত্র নয়, সন্তান মাত্রেই.—শুধু পিতার নয়, জনক জননী উভয়েরই, দোষ গুণ, এমন কি কতকগুলি ব্যাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। এবং এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে চিকিৎসা শাস্ত্র আরও স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে ধাতু বা মজ্জাগত যে সমস্ত ব্যাধি, তাহা সন্তানে বর্ত্তিতে পারে; কতকগুলির বেলায় কখনও কখনও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও, এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে, যাহা সন্তানে না জন্মিয়াই পারে না। এই সমস্ত বিশেষ উদাহরণ ছাড়া মোটামুটি ইহা একটা গৃহীত সত্য যে সুস্থ ও সবল পিতা মাতার সন্তান সুস্থ ও সবল হইবে, দুর্ব্বল ও রোগীর সন্তান দুর্ব্বল ও রোগী হইবে। পর্ব্বতের গর্ভে মূষিকের জন্ম একেবারে উপকথা না হইলেও, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র সর্ব্বদাই ছুঁচো হয় না। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে কেবল মাত্র পিতা মাতাকে ধরিয়া বিচার করা এই নিয়মের অনুযায়ী নহে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদেরও গুণাগুণ বিচার করিতে হয়। এক একটী বংশের যে দেহও মনের এক একটা বিশেষ ধারা আছে, যে দেশে প্রায় প্রতি কার্য্যে কুলের বিচার করা হয়, সে দেশের লোকের তাহা জানা উচিত।

এই সাধারণ সত্যটী এত সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে পাঠকের বুদ্ধির প্রতি অসম্মান দেখান হয়। সমস্ত সভ্য সমাজেই ভদ্র ও অভদ্র এই দুইটী শ্রেণীর অস্তিত্ব মানা হয়। এবং শ্রেণী বিশেষ যে গুণ বিশেষের আশ্রয়, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। ডারুইনের পরেও অনেক পণ্ডিতের গবেষণা ও প্রমাণ প্রয়োগের ফলে ইহা একটী সিদ্ধ-সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে—ব্যক্তি বিশেষের শরীর বা মনের বিশিষ্টতার একটা

বংশানুক্রমিক গতি আছে। সুতরাং অঙ্গহীন, রুগ্ন বা শক্তিহীন লোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া দিয়া সমাজ যে ঐরূপ লোকের সংখ্যা না কমাইয়া বরং বাড়াইয়া দিতেছে, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্যই যেখানে এইরূপ লোক কেবল রক্ষিতই হয়, বিবাহ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পায় না, সেখানে আপাততঃ তাহার সঙ্গে ২ সেই ব্যারামটাও শেষ হইয়া যায় বটে কিন্তু যে কোন বড় সহরেই সসন্তান ব্যাধিগ্রস্ত লোক বর্ত্তমান পাওয়া যায়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে ইহারা বংশ বৃদ্ধির একেবারেই সুবিধা পায় না, এমন নহে। তার পর, আমরা এখানে কেবল বংশানুক্রমিক ব্যাধির কথাই ভাবিতেছি না; ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্ত যারা, সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া তারা আপনা আপনি সমাজের বাহিরে সরিয়া পড়ে, এবং সমাজে থাকার যে সমস্ত সুবিধা, তাহা হইতে বঞ্চিত হয় এবং ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে হীনবল বা ক্ষীণদেহ যারা কিম্বা যাদের রোগ লুকায়িত থাকিয়া সমাজের ভর্ৎসনা এড়াইতে পারে, তাদের সম্বন্ধে কথা খাটেনা; তারা ত প্রায়শঃই নিজেদের শারীরিক এবং মানসিক হীনতা উত্তরাধিকারী সূত্রে সমাজে বদ্ধ মূল করিয়া দিতে পারে।

মানুষের সমাজ বন্ধন সাধারণ ভাবে এবং তাহার অনুকম্পা ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষ ভাবে দৈহিক ও মানসিক হীনতার এই শ্রীবৃদ্ধির জন্য দায়ী। সমাজ বন্ধনের ফলে একে অন্যের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে পারে; পুত্র পিতার, ভূম্যধিকারী কৃষকের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে পায়। মোটামুটি এ বন্দোবস্তের ফল ভাল; সকলকেই যদি ক্ষুন্নিবারণের জন্য শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উৎপাদন করিয়া নিতে হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ, কলা বিদ্যার চর্চ্চা, এক কথায় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি করিবার সুবিধা মানুষ পাইত না। কিন্তু অন্য দিকে ইহা হইতে অনিষ্টও কিছু কিছু না হইতেছে এমন নয়; নিতান্তই অসার যে ব্যক্তি—যাহার না আছে বুদ্ধি, না আছে দেহ, এমন ব্যক্তিও এই নিয়ম দ্বারা রক্ষিত ও পোষিত হইতেছে। এবং এই অসারতা বংশানুক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া চলে। অবশ্যই, সমাজ বন্ধনের ভিতরই এমন একটা শক্তি আছে, যাতে একান্ত অসার ব্যক্তি অন্যের উপার্জ্জিত ধন লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে পারে না, এবং উত্তরোত্তর এই অসারতার বৃদ্ধি হইলে এবং প্রতি ক্রিয়াদ্বারা এই শ্রেণীর লোকের ক্রমে পুনরুজ্জীবন না হইলে, বিলোপই হইয়া যায়। শ্রেণী বিশেষের ধ্বংশের কথা প্রায় সব সমাজের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অনেক কারণে তাহা হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই শ্রেণীর উপযুক্ত কর্ম্ম করিবার শক্তির অভাব তার মধ্যে অন্যতম। শ্রেণী বিশেষের ধ্বংস বা পুনরুজ্জীবন পৃথক্ কথা; কিন্তু সমাজ গঠনের ফলে যে অসার লোকের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই আমাদের প্রামাণ্য; এবং ইহা বোধ হয় যে কোন সমাজের দিকে চাহিলেই দেখা যাইবে যে অনেক দুর্ব্বল, মেরুদণ্ড বিহীন, অন্তঃসার শূন্য লোকের তাহাতে থাকিবার এবং বৃদ্ধি পাইবার সুবিধা আছে।

দয়া যে কিরূপে অসমর্থ সুতরাং অনাবশ্যক লোকের জীবন ধারণের এবং বৃদ্ধি লাভের সুবিধা করিয়া দেয়, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু এই কার্য্যে চিকিৎসা শাস্ত্রও প্রভূত সাহায্য করে, একথা বোধ হয় সকলের বিদিত নহে। পশু পক্ষীর ভিতরে দেখা যায়, যে কার্য্যে অপটু, যে রুগ্ন, সে পরিত্যক্ত। তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার কোন চেষ্টা করা হয় না। স্বভাব যদি তাহাকে রোগের আক্রমন হইতে উদ্ধার পাইবার মত শক্তি দিয়া থাকে, তবে সে বাঁচিয়া উঠিবে, আবার দশজনের এক জন হইবে; কিন্তু তাহাকে 'হুতাশন-বটী' বা 'সর্ব্বজ্বর গজসিংহ' খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া তুলিতে তার সমাজে কোন ব্যগ্রতা দেখা যায় না। মানুষও যখন প্রাকৃতিক অবস্থায় ছিল, যখন সমাজ গঠিত হয় নাই, তখন, তার বেলাও এই ব্যবস্থাই ছিল; অসভ্য সমাজে এখনও তার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। যে রোগের আক্রমন হইতে দেহ আপন শক্তিতে উদ্ধার না পাইবে, উদ্ভিদাদি হইতে শক্তি ধার করিয়া আনিয়া সে রোগ হইতে তাহাকে রক্ষা করা অস্বাভাবিক। এই অবস্থার ফলে, যে শক্তি সম্পন্ন, রোগ যাহাকে সহজে অবসন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না, তাহার জীবন দীর্ঘ হয় এবং তাহারই বংশের বৃদ্ধি হয়; আর যে সহজেই

রোগের আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে বেশী দিন তাহার স্থান হয় না, এবং তাহার বংশও কদাচিৎ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র এই স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী। সমাজে কত জন ধার করা শক্তি নিয়া বাঁচিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? স্যানাটোজেন কিংবা ওভেলটাইন্, অশ্বগন্ধা কিম্বা অগ্নি-কুমার রস কত জনের ম্রিয়মান দেহ জীবিত করিয়া রাখিতেছে! কিন্তু ইহারাত জীবন যুদ্ধে পরাজিত, প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীতদাস; ইহাদেরত আবার জয়-লাভের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, আবার যে ইহারা রোগের মাথায় পা রাখিয়া স্ফীতবক্ষে আপন শক্তিতে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহার ভরসা কত? বলহীনের সন্তান বল হীনই হইবে; সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্র দুর্ব্বলকেই প্রশ্রয় দিতেছে, এবং তাহার বৃদ্ধিরও সুবিধা করিয়া দিতেছে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে সমাজে কতকগুলি প্রবল শক্তি দুর্ব্বলের শুশ্রূষায় নিয়োজিত রহিয়াছে। এই শক্তিসমূহের এক কথায় নাম 'সভ্যতা'। সভ্যতা মানুষের সমাজে দুর্ব্বলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। যদি কেবল তাহাই হইত তা হইলেও অত আশঙ্কার কারণ থাকিত না; কেন না ভবিষ্য-সংঘর্ষে সবলের হস্তে দুর্ব্বল পরাজিত হইয়া নির্ম্মূল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সভ্যতা নামে যে সমস্ত শক্তি বুঝায়, আমরা সে সব গুলির নাম করি নাই বটে, কিন্তু সে গুলি যে সবলকেও দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে! দয়া মানুষের মনে একটা মৃদুভাই আনয়ন করে, বলাধিক্য, শৌর্য্য এবং পরিপূর্ণ জীবনী শক্তির ফল একটা অদম্য বিজিগীষা জাগাইয়া তুলে না। তা ছাড়া, সভ্যতার অঙ্গীভূত কলাচর্চ্চা প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম, সে সমস্তই মানুষের চিত্তকে কোমলতার দিকেই টানিয়া নেয়, বীর-রসের প্রাচুর্য্যে জীবনটা ভরিয়া দেয় না।

সমাজ আছে বলিয়া, সমাজের সাহায্য ও রক্ষকতা পায় বলিয়া, মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবনতি যে কতকটা হয়, তাহা নিবারণ করা অসম্ভব; কারণ, সমাজ আমরা কখনও ভাঙ্গিতে পারি না, সমাজের বাহিরে থাকায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশী। কিন্তু সমাজের ভিতরে কতকগুলি অবান্তর শক্তি জুটিয়া মানুষের যে অবনতির বিবিধ প্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছে, সমাজ রক্ষা করিয়াও সেই সমস্ত শক্তির গতি রোধ করা যাইতে পারে। মাছের বা পশুপক্ষীর চাষ যে সমস্ত দেশে হয়, যে সমস্ত দেশে এই সকল জন্তুর বংশ বৃদ্ধির ভার স্বভাবের উপর না দিয়া মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আবশ্যক অনুসারে প্রজননের ব্যবস্থা করিয়া দেয়, সে সমস্ত দেশে ইহা জানা আছে যে সবল স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই সবল সন্ততির উৎপত্তি হয় এবং তদ্বিপরীত স্ত্রী-পুরুষ হইতে বিপরীত সন্ততিরই লাভ হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই গৃহপালিত পশু পক্ষীর বেলায় এই নিয়ম ন্যূনাধিক অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধিমান্ পশুরক্ষক মাত্রেই সবল ও সুস্থ পশু দিগেরই বংশ রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং দুর্ব্বল গুলিকে মিলনের সুবিধা না দিয়া ক্রমে বিনাশের উপায় করিয়া দেয়। প্রতীচীর বৈজ্ঞানিকদের কাহারও কাহারও চক্ষে ইহা পড়িয়াছে যে মানুষ কুকুর বা গো-বংশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যতটা প্রয়াস, যতটা যত্ন এবং বিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া থাকে, আপনার বংশের উন্নতির জন্য তাহার একাংশও করে না। যে বিবাহ বন্ধনে মানুষ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সুবিধা করিয়া দেয়, তাহাতে উভয় পক্ষের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষাপকর্ষের প্রতি বড় লক্ষ্য করা হয় না। প্রেম নামক একটা অন্ধ শক্তি যৌবনে স্ত্রীপুরুষের চিত্তকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে, এবং অনেক স্থলেই তাহার ফলে আপাত-দৃশ্য কোন অনিষ্ট হয় না বটে কিন্তু তা হইলেও ইহা একটা অন্ধ শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে এবং ইহা মোটেই বিজ্ঞানের অনুশাসন মানিতে প্রস্তুত নয়। আর যেখানে চারিদিক্ বিবেচনা করিয়া অভিভাবকেরা বিবাহের কর্ত্তা হন, সেখানেও অন্য সব কথাই ভাবা হয়, কেবল যাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত, তাহারই বিচার করা হয় না;— বিবাহ নরমিথুনের দৈহিক ও মানসিক উপযোগিতার কথাটাই বাদ পড়িয়া যায়।

বিবাহ-বন্ধন সমাজ-বন্ধনের একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহ প্রণালীর

সংস্কার করা চলে। বিবাহপ্রণালীতে যদি কোন সমাজে কিছু বিজ্ঞান নিযুক্ত হইয়া থাকে, তবে হিন্দু সমাজেই তাহা হইয়াছে। গোত্রের বিচার, বংশের বিচার, বয়সের বিচার—এ সমস্তেরই মূলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু একটা নিয়মের অর্থ ও উপকারিতা না বলিয়া, কাহাকেও যদি কেবল ঐ নিয়মটী মানিতেই আদেশ করা হয়, তাহা হ'লে সে কখনও বুদ্ধিমানের মত এই নিয়ম পালন করিতে পারে না। নূতন অবস্থায় পড়িলে নিয়মটী অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে পারে কিন্তু তার বাস্তবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না ও হইতে পারে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিবাহ পদ্ধতিতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়, পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে আমরা শাস্ত্র মানি বটে কিন্তু শাস্ত্রের মূলস্থিত বিজ্ঞানটী মানি কিনা সন্দেহ। অথচ শাস্ত্র মানিয়াও যে বিজ্ঞান মানা চলে, একথাটা বুঝা কি খুব শক্ত? বিজ্ঞানই যে শাস্ত্রের হেতু,—তার যুক্তি!

সভ্য সমাজ মাত্রেই বিবাহ বিষয়ে সম্বন্ধাদির কতকটা বিচার করিয়া থাকে; কিন্তু হিন্দু সমাজের মত অত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার অন্য কোন সমাজ করে বলিয়া জানি না। তথাপি, আমরা যে বিজ্ঞানের দিক্ হইতে তত বিচার করি না একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইউরোপে, চক্ষুরাগই অভিভাবকের আসন প্রায় গ্রহণ করে, ভূতভবিষ্যৎ বিচার যদি কিছু করা হয়, প্রেমই তাহা প্রায় করে; অর্থাৎ সাধারণ বিবাহে ভবিষ্যতে খাওয়া পরার চিন্তা ছাড়া অন্য বিচার বিশেষ কিছু করা হয় না।

কিন্তু আসল কথাটা প্রায় সকল সমাজই ভুলিয়া গিয়াছে যে 'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা।' কোন্ বিবাহে কয়টী সন্তান হইবে, তাহা কেহ না জানিতে পারে, এবং কোনও বিবাহে সন্তান হইবে কি না, তাহাও অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু সন্তান যে বিবাহ-বৃক্ষের ফল; এ কথাটা-ত মনে থাকা উচিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের কেহ কেহ বলিতেছেন—এইটাই সর্ব্বতো-ভাবে মনে রাখা উচিত; এবং ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় এই অনুশাসন গ্রহণ করিবে না, তখন সমাজেরই এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। উত্তর-বংশের কায়িক ও মানসিক সবলতা সমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশ্রয়। এই উত্তরবংশ যে বিবাহের ফলে সৃষ্ট হইবে, তাহা নিতান্তই ব্যক্তির বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখা সমাজের পক্ষে ভুল। কাহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হওয়া উচিত এবং কাদের একেবারেই বিবাহ করা উচিত নয়, সমাজ তাহা বিচার করিবে এবং তদনুযায়ী চেষ্টা করিবে; তা না হইলে, অনুপযুক্ত এবং অবাঞ্ছনীয় লোকের বৃদ্ধি নিবারিত হইবে না। পশু পালনের বেলায় যে নিয়ম অনুসরণ করা হয়, নিজের বেলায় তাহা গ্রহণ না করিয়া মানুষ নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করিতেছে। দুর্ব্বল, রুগ্ন বা বিকলাঙ্গকে সমাজ রক্ষা করুক, আপত্তি নাই; কিন্তু ইহাদের বৃদ্ধির পথে কণ্টক দেওয়া সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত একান্ত দরকার।

চিকিৎসা শাস্ত্র রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে, এবং কোন কোন স্থলে রোগেরও উৎপাটন করিতে পারে বটে, কিন্তু অনেক রোগ আছে, যে গুলির বীজ একেবারে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের অসাধ্য। অথচ সে গুলি বংশ পরম্পরায় চলিতে পারে। তা'ছাড়া, চিকিৎসা শাস্ত্র জীবনী শক্তির সহায়তা করিতে পারে মাত্র, দেহটাকে ইচ্ছামত সবল ও তেজস্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। হাজার চিকিৎসা করিলেও খর্ব্বকায় ব্যক্তি কখনও দীর্ঘদেহ লাভ করিতে পারে না; কিংবা কুব্জ কখনও 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' হইতে পারে না। অথচ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেছেন যে কোন সমাজের উন্নতি এবং স্থিতি উভয়ের জন্যই 'ক্ষাত্রকর্ম্মক্ষমং বপুঃ' না হইলেই নয়; যে সমাজে ঐ প্রকার লোকের সংখ্যা যত বেশী, সেই সমাজই তত বলবান্ এবং অন্য সমাজের সহিত প্রতিযোগীতায় তাহারই স্থিতির সম্ভাবনা তত বেশী।

প্রাণিজগতে দেখা যায়, যে শক্তিশালী, তারই জয় এবং স্থিতি, পরাজিত দুর্ব্বলের স্থান বিজেতার অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। ইতর জন্তুর মধ্যে অনুকম্পার ক্রিয়া অতি কম, সুতরাং পরাজিতের জন্য বিনাশেরই ব্যবস্থা হয়। মানুষের ইতিহাসেও সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের বিনাশ অনেক হইয়াছে, আরও হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক সমাজেরই হিতাকাঙ্ক্ষীরা চিন্তা করিতেছেন, কিসে তাঁহাদের সমাজ বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইবে। এবং

তাহা করিতে হইলে যে দুর্ব্বলের স্থান সবলকে দিতে হইবে, ইহা কে না বুঝে?

প্লেটোর ভুল হইয়াছিল, তিনি রোগের মূল নষ্ট না করিয়া তাহার ফল নষ্ট করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। জন্মিয়াছে যে মানুষ,—মানুষ নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। নিজের জন্মের উপর কাহারও প্রভুত্ব নাই; একজন যে রুগ্ন হইয়া জন্মিয়াছে, সে ত তাহার দোষ নয়; অপরাধী ত তার পিতা মাতা। সুতরাং মানুষের সমাজ নির্ম্মম ভাবে তাহাকে পশুর মত হত্যা করিবার কি অধিকার রাখে? তারপর অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন কেবল নহে, মানুষ এমন নিষ্ঠুর হইবে কেমন করিয়া? অথচ, এরূপ লোককে যখন সমাজ চায় না, তখন এরূপ সন্তান যাদের হয়, সেই ব্যক্তির প্রজাসৃষ্টিই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। সমাজ-বদ্ধ ব্যক্তির ক্রিয়া সংযত করিয়া দিবার অধিকার সমাজের আছে। অথচ, জাত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মৃত্যু মুখে অর্পণ করায় যে নিষ্ঠুরতা আছে, সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তি বিশেষের ভোগলালসা সংযত করিয়া দেওয়ায় তা নাই।

প্রত্যেক সমাজেই এইরূপ অনাবশ্যক সুতরাং অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা যায়, যারা পৃষ্ঠাঘাতের মত সমাজ দেহের ক্ষয় করে ভিন্ন তার পুষ্টির কোন সহায়তা করে না। ইংলণ্ডের কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহাদিগহইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য বিবাহের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে পরামর্শ দিতেছেন। বিবাহেচ্ছুদিগের সন্ততি কিরূপ হইবে, তাহা বলিয়া দিলে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইবে, অথবা, আবশ্যক হইলে অনুমতি স্থগিত থাকিবে। জাতি হিসাবে ইংরেজ কবিতার স্বপ্ন পছন্দ করে না; ইংরেজ যখন উপদেশবিধি দেয়, তখন তাহার সম্ভব দেখিয়াই দেয়। ইংরেজের দেশে এই নিয়ম গ্রহণ করা যে একেবারেই অসম্ভব, তা নয়। কিন্তু যে দেশে অপরিণীতা কন্যা গৃহে থাকিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়া নরকের সদর দরজা খুলিয়া যায়, সে দেশে সহস্র রোগ থাকিলেও তাহা গোপন করিয়া কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতেই হইবে; বিবাহের ফলে কিরূপ সন্ততির সৃষ্টি হইবে, কাহার তাহা ভাবিবার অবসর আছে? এবং কন্যকাগণ সকলই যদি পাত্রসাৎ হন, তাহা হইলে পাত্রও সকলকেই পাণিগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া সকল সমাজই যে আপনাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে পারে, তা নয়।

পরন্তু, প্লেটোর চিকিৎসার চেয়ে এই ব্যবস্থা একটু উন্নত হইলেও ইহাও রোগের চিকিৎসাই করিবে, রোগের জন্ম একেবারে অসম্ভব করিয়া দিবে না। অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিরা এই নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধি পাইবে না সত্য, কিন্তু আর কখনও তাহারা জন্মিতেও পারিবে না, এমন নয়। কিছু আগে যারা রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিরা তাহাদিগকে আর বাড়িতে দিল না সত্য; কিন্তু সকলই যে দুর্ব্বলতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে; কেহ আগে, আর কেহ পিছনে, এই মাত্র তফাৎ! সভ্যতা নামের অন্তর্ভুক্ত শক্তি নিচয় যে সকল মানুষকেই অবনতির দিকে টানিয়া নিতেছে; সুতরাং একটু আগে যারা অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দিয়া সমাজ যে চিরতরে আপনার অবনতির পথ রোধ করিতে পারিবে, এমন নয়। বর্ত্তমানে যারা সবল ও সতেজ, ক্রমে ইহাদেরই সন্তানেরা দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িবে। সমাজ হইতে নির্জ্জীবতা দূর করিয়া যদি উহাকে বীর সমাজ করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে উপায়ান্তর দেখিতে হইবে।

নীট্‌চে (Nietzsche) প্রভৃতি জার্ম্মেনীর কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই উপায়ান্তর সমর ভিন্ন আর কিছু নহে। ইংরেজেরা বলেন, ইনি এবং এর মত অধার্ম্মিক আর কয়েকটী লোকের শিক্ষার ফলেই জার্ম্মেনী এই অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অভিযোগের সত্য মিথ্যা বিচারের ভার আমরা রাখি না; খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম ও নীতির উপর নির্দ্দয় আক্রমণ, এবং এক অভিনব শিক্ষার প্রচার জন্য এই যুদ্ধের পূর্ব্বে নীট্‌চের বই বড় কেহ পড়িত না; এখন গালি দিবার জন্য তাহার কথা মনে হইয়াছে। যাহা হউক,

এই অদ্ভুত ভাবুকের মতে যুদ্ধ ছাড়া সমাজের বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না। অর্জ্জুনকে উপদেশ করা হইয়াছিল, 'যুধ্যস্ব বিগতস্পৃহঃ'। কিন্তু নীট্‌চের উপদেশ তা নয়; কামনা ত থাকিবেই, কামনা ছাড়া ক্রিয়া কেমন করিয়া হয়? বরং, 'দ্বিসো জহি', – দুর্ব্বলকে পরাজিত করিয়া মুষ্টিগত করিয়া নেও, আপনার শক্তির উপর দাঁড়াও, যত রকমে পার, চারিদিকে আপন শক্তির প্রতিষ্ঠা কর। পৃথিবীতে যদি সৃষ্টি স্থিতির ভিতরে কোন অন্তঃপ্রেরণা থাকে, তবে তাহা শক্তি লাভ এবং শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জড়, চেতন, মানুষ, অমানুষ, সকলের ভিতরেই ঐ এক ইচ্ছা সক্রিয় রহিয়াছে। শক্তির আধিক্যেই সৃষ্টি, শক্তির উপরই স্থিতি এবং শক্তির খর্ব্বতায়ই বিনাশ। সুতরাং মানুষকে যদি তাহার কর্ম্মের জন্য কোন নীতি দিতে হয়, তবে তাহা শক্তির অনুসরণ করা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব, 'যুধ্যস্ব' যুদ্ধে শৌর্য্য বীর্য্য, সাহস বল, বৃদ্ধি পায় এবং রক্ষিত হয়। যুদ্ধদ্বারাই জাতির উন্নতি; যুদ্ধ দ্বারাই তাহার উন্নত অবস্থায় স্থিতি হয়। গুটীকয়েক লোকের বিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়া সমাজের স্থায়ী উন্নতি লাভ হইতে পারে না; সমাজের সকল স্তরে ক্ষাত্র ধর্ম্ম সঞ্চারিত করিয়া দিলে তবে ত উহার জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

গরলেরও উপকারিতা আছে; যুদ্ধ দ্বারা কোনই উপকার হয় না, ভাবিয়া চিন্তিয়া একথা কেহ বলিবে না। পৌরাণিকদের মতে যুদ্ধ দ্বারা ভূভার হরণ হইত। কিন্তু নীট্‌চে যুদ্ধেতে যে সর্ব্বব্যাধিবিনাশন গুণ দেখিতে পান, তাহা প্রকৃত কিনা, ন্যায়ত সন্দেহ করা চলে।

প্রাণিজগতে যে তুমুল জীবন যুদ্ধ চলিতেছে, ডারুইন্ কথিত ক্রমবিকাশের রীতি অনুসারে সেই যুদ্ধের জেতা বলিষ্ঠ জাতিরাই বাঁচিয়া যায়, এবং ফলে, ক্রমে বিজিত দুর্ব্বল জাতিগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু মানুষের যুদ্ধ প্রণালীতে তাহার বিপরীত ফলই হওয়ার কথা। কারণ মানুষ সমাজ হইতে বাছিয়া সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত যে সব ব্যক্তি, তাহাদিগকেই সমর ক্ষেত্রে প্রেরণ করে, সুতরাং তাহাদেরই আশু বিনাশের সুবিধা করিয়া দেয়। আর, যারা নিকৃষ্ট এবং অনুপযুক্ত তাহারাই দীর্ঘ জীবন পায় এবং পিতৃত্বের অধিকারী হয়। যে সকল বৃক্ষের পুষ্ট ফল হইতে পারিত, সে গুলি কর্ত্তিত হইয়া যায়, আর অপুষ্ট এবং অপূর্ণ ফল দান করিবার জন্য নিকৃষ্ট বৃক্ষ গুলিই রক্ষিত হয়। কেহ২ মনে করেন, অতিরিক্ত যুদ্ধ করায়ই রোমের পতন হইয়াছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরপুরুষদিগকে যুদ্ধে বলি দিয়া রোম অনুপযুক্ত কাপুরুষ গুলিকেই লোকবৃদ্ধির জন্য রাখিয়া দিয়াছিল; ইহার ফলে কিছু দিন পরে এমন এক শ্রেণী লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, যারা রোমের পূর্ব্ব-গৌরব আর রক্ষা করিতে পারে নাই। সম্প্রতি বিলাতের "কন্‌টেম্‌পরেরি রিভিউ" (মার্চ্চ ১৯১৫) মাসিক পত্রিকায় একজন লেখক বলিতেছেন যে—বর্ত্তমান যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যেরা ইংরেজ ও জর্ম্মান সৈন্যের তুলনায় হ্রস্বকায় এরূপ দেখা যায়; ইহার অনুমিত কারণ ফরাসী দেশের অতীত যুদ্ধে শালপ্রাংশু মহাভুজ যোদ্ধারা অত্যধিক পরিমাণে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় এরূপ সন্তানের পিতা হইবার উপযোগী লোক অনেক কমিয়া গিয়াছে। এবং এই যুদ্ধের পরেও ইহাতে সংসৃষ্ট জাতিদের ন্যূনাধিক এই অবস্থা হইবে, ইতিমধ্যেই অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন।

এই যুক্তিতে একটা মস্ত দোষ রহিয়াছে। যুদ্ধে যারা গমন করে, তাদের সকলই অবিবাহিত এবং বংশহীন, এবং তাদের কেহই যুদ্ধ হইতে ফিরিবে না, এমত মনে করিবার কোন হেতু নাই। অথচ, তাহা মনে না করিলে এই যুক্তির ভিত্তি অত্যন্ত শ্লথ হইয়া যায়। যুদ্ধে লোক ক্ষয় হয়, এ কথা কে না জানে? কিন্তু যাদের লয় হইয়া যায়, তাদের ত শিশু সন্তান থাকিয়া যায়; ভবিষ্যতে তারাই এদের স্থান অধিকার করিতে না পারিবে কেন?

তা ছাড়া এ যুক্তিতে কেবল শরীরের দিকেই লক্ষ্য রাখা হইতেছে, মন এবং শরীরের উপর মনের যে ক্রিয়া, তার প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে না। যুদ্ধ প্রিয়তায় যে একটা উত্তেজনা আছে, যে একটা ক্ষাত্র ভাব মনে জাগে, তার কি কোন ক্রিয়া নাই? অতি ক্ষীণজীবী ব্যক্তিও উত্তেজিত হইলে দ্বিগুণ বল দেখাইতে পারে। ক্ষাত্রধর্ম্ম একটা পাশবিক শারীর বল মাত্র নহে, ইহাতে মানস বলের ভাগই বেশী।

এই মানসিক বল যে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, কেবল তারই যে হয়, এমন নহে; যুদ্ধে সংসৃষ্ট জাতির অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যেও তাহা সংক্রামিত হইতে পারে। ইউরোপের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনেক বাঙ্গালী পর্য্যন্ত যে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। সুতরাং যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত, যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক জাতি যে সাহসী এবং সেই হেতু বলীয়ান্ হইবে, এরূপ মনে করা যুক্তি-হীন নহে।

স্বার্থের জন্য মানুষে মানুষে সংঘর্ষ করে ক্ষান্ত হইবে, এবং মোটে কোন দিন ক্ষান্ত হইবে কিনা, কেহ জানে না। সুতরাং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বল প্রয়োগ মানুষকে মাঝে ২ করিতেই হইবে। পৃথিবীতে বৈশ্য ভাবাপন্ন যে সমস্ত জাতি তাঁরা মাঝে ২ সৈন্য সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন বটে, কিন্তু কবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে কে জানে? কবে যে একটী সুপরিচালিত আফিসের মত কাগজ কলমে মানব জাতির সমস্ত কাজ নির্ব্বাহিত হইবে, সমস্ত তর্কের মীমাংসা হইবে, সমস্ত বিবাদের বিচার হইবে, —কে তাহা বলিতে পারে? কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত বলরক্ষা মানুষকে করিতেই হইবে। বিশেষতঃ ইতর জন্তু এখনও নির্ম্মূল হয় নাই; তাহাদের উপর আধিপত্য লেখনী বা রসনা দ্বারা হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষাত্রবীর্য্যের অত্যধিক লোপ, সমাজের পক্ষে কখনও মঙ্গল জনক নহে।

ক্ষাত্র-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যুদ্ধ প্রিয়তাও রক্ষা করিতে হইবে। যুদ্ধ-ভীরু ক্ষত্রিয় নহে। যুদ্ধে অভি-লাষ না করিবার অন্য সহস্র কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু সহস্র বৎসরে একবারও যে জাতি যুদ্ধে গমন করে নাই, সে জাতি যে কিরূপে যুদ্ধের সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারে, বুঝা কঠিন। পিঞ্জরাবদ্ধ, মানব প্রদত্ত আহার্য্যে পরিপোষিত শার্দ্দূল-শাবক সহজেই পশুবধে অসমর্থ হইয়া যায়; বহুকাল অন্ধকূপে শৃঙ্খলা বদ্ধ থাকার পর কোনও ব্যক্তিকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল, তখন সে মুক্ত পদে হাঁটিতে পারিত না, এমন শোনা যায়। অনভ্যাসে যে বিদ্যা হ্রাস পায়, তাহা ক্রম বিকাশ শাস্ত্রের একটী গৃহীত সত্য। সুতরাং ক্ষাত্র-বীর্য্য যদি রক্ষণীয় হয়, তবে যুদ্ধও করণীয়।

যুদ্ধ কখনও করা উচিত নহে—এমন কথা বড় কেহ বলে না। তবে, যুদ্ধে বাছা বাছা লোকগুলি নিহত হইয়া যাওয়ায়, সমাজে ঐরূপ লোকের সংখ্যা কমিয়া অসমর্থ ব্যক্তির সংখ্যাই বাড়িয়া যায়, ইহা যুদ্ধের একটী কুফল। কিন্তু এই কুফলেরও পরিমাণ অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান সম্ভব। অন্ধ বা খঞ্জ যারা যুদ্ধ ক্রিয়া চলিতে পারে না; সুতরাং বাধ্য হইয়াই বলবান্‌কে তথায় পাঠাইতে হয়। আর, অস্ত্রের সম্মুখীন হইলে মরণও ঘটিতে পারে। কাজেই, যুদ্ধে বলীয়ান্‌দের বিনাশ নাহইয়া পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে ঐরূপ লোকের বীজ ও অঙ্কুর সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়, এমন নহে।

লোকক্ষয় রূপ যুদ্ধের কুফলকে যতটা বাড়াইয়া তুলা সম্ভব, বাস্তবিক উহা তাহা না ও হইতে পারে। তা ছাড়া, যুদ্ধের শিক্ষা, উদ্যম ও উজ্জীবনের ফল ত সমস্ত জাতিতেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। তাহার ফলে, যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহাদের ভিতরে একটা পরিপূর্ণ, তেজোময় জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয় না কি? অধিকন্তু, যুদ্ধে বীর্য্যশালী পুরুষদেরই বিনাশ হয়, ঐরূপ পুরুষের মাতা হইতে পারে, এমন স্ত্রীলোকেরা ত বাঁচিয়া যায়।

সুতরাং যুদ্ধের অন্য কুফল যাহাই হউক না কেন, উহা দ্বারা জাতির শারীরিক সৌর্য্যবীর্য্যের অবনতি না হওয়ারই কথা। অবশ্যই, অতিরিক্ত কোনও কাজই ভাল নয়; অতিরিক্ত ব্যায়ামে ব্যক্তির শরীরের অপচয় হয়; অতিরিক্ত যুদ্ধ-ব্যায়ামে জাতিরও তাহা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ক্ষত্রোচিত অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার মত বলবীর্য্য যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের মত আর ব্যায়াম নাই। সমাজ-হিতৈষীরা যে দৈহিক উন্নতি কামনা করেন, কেবল বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা তাহা হইবার নহে। বিবাহ-সংস্কার অবনতি নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু উন্নতি বিধান করিতে পারে না। জাতির শারীরিক বলবীর্য্যের উন্নতি বিধায়ক যুদ্ধের মত আর কি আছে? অবশ্যই, উন্নতি বিধান এবং অবনতি নিবারণ—উভয়েই জাতির স্বাস্থ্যের জন্য দরকার।

সুতরাং বিবাহ-সংস্কারকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। তথাপি এই বিষয়ে যুদ্ধের যেমন উপকারিতা, তেমন আর কিছুর নাই।

ইহা হইতে যেন কেহ সিদ্ধান্ত না করেন যে, সব যুদ্ধই ভাল, এবং সর্ব্বদাই যুদ্ধ করা উচিত। অসংযত শারীরিক বল চিরকালই অত্যাচার প্রিয়। সেই জন্য ক্ষাত্রবীর্য্যকে ব্রহ্মণ্য জ্ঞানের অধীন করিয়া রাখা উচিত। জার্ম্মনী অবশ্যই বর্ত্তমান যুদ্ধে বলিতেছেন যে তাঁহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাঁহার সভ্যতা, জগতে প্রচার করার জন্যই এই আয়োজন। কথাটা কতদূর সত্য, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। কিন্তু জাতি বিশেষের গূঢ় উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, একটা ধর্ম্ম সঙ্গত লক্ষ্য না থাকিলে যে সমরে প্রবৃত্ত হওয়া পাপ, ইহা আমরা জানি। সুতরাং সময়ে অসময়ে যে কোন উপলক্ষ্য ধরিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ কেহ দিতে পারে না। এই মাত্র যুদ্ধের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ইহা দ্বারাই ক্ষাত্র-ধর্ম্ম রক্ষিত ও উন্নমিত হয়।

আর, একমাত্র দৈহিক বলের বৃদ্ধি করাই সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। সুতরাং যুদ্ধই মানবের একমাত্র করণীয় বলিয়া কখনও গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি ব্যক্তির যেমন শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা আছে, জাতির ও তেমনই যুদ্ধাদি যে সমস্ত ক্রিয়ায় শারীরিক বল ও সাহসের প্রয়োজন হয়, তাহার উপকারিতা আছে। যে কোন দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার, সত্যতার আভাস কতকটা উপলব্ধি না হইয়া পারে না। দেওয়ানী কর্ম্মচারীদের প্রায়ই ম্লান, বিরস চেহারা, অন্ততঃ একটা মৃদুতা তাহাদের অঙ্গে মাখান রহিয়াছে। আর ফৌজদারী কর্ম্মচারীদের দ্রুত-দৃপ্ত গতি তাহাদের তেজোদৃপ্ত, তাহাদের প্রভুত্ব-লোলুপ চলন—অন্ততঃ একটা উৎসাহ ও আত্ম-নির্ভর, তাহাদের জীবনের ক্ষিপ্রতা প্রকাশ করে। সুতরাং কোন দেশের সমস্ত লোকই যদি কেবল কোমল ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের যে একটা সুকুমার ভাব বাড়িয়া চলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সমাজের দৈহিক বল রক্ষণ একটী চিন্তনীয় বিষয়। প্লেটোর মতানুযায়ী দুর্ব্বল দিগকে বিনাশ করিলেই তাহা হইতে পারে না; বিবাহের অধিকার সংযত করিয়া ইহাদের বৃদ্ধি বারণ করিলেও তাহা সম্পূর্ণ রূপে হইতে পারে না; এক সময়োপযোগী শিক্ষা দ্বারা তাহা হইতে পারে। কিন্তু যোদ্ধগণ যদি ধর্ম্ম ও নীতির অধীন থাকে, ক্ষাত্র শক্তি যদি ব্রহ্মণ্য জ্ঞানের অধীন থাকে, তবে ত যুদ্ধের অন্যান্য কুফল প্রতিবিদ্ধ হয়। 'ক্ষাত্রং দ্বিজত্বং চ পরস্পরার্থং।'

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নীলিমা।

নমো নীল কলেবর জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত অম্বর!
অনাদি-অনন্তরূপ! দেবাদির কল্পনা সুন্দর!
তুমি বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, চরাচর প্রবিষ্ট তোমায়,
জয়! জয়! জ্যোতির নিধান! জ্যোতির্ম্ময় পদ্ম হস্তে জ্বলে!
নীলবক্ষে কৌস্তভের মালা—রবিচন্দ্রগ্রহ তারকার,
মহাকাল-জলধি শয্যায় ধ্বনিতেছে প্রণব ওঙ্কার!
শব্দবহ মহাশঙ্খ তব পদ্মহস্তে শোভা পায়!
বিশ্বচক্র অনুক্ষণ বিঘূর্ণিত তব চক্র তলে,

তুমি ব্রহ্মা রক্তরূপ!- শরতের লোহিত সন্ধ্যায়,
পশ্চিম আকাশ তলে অমরার দ্বার খুলি যায়!
মণি-মুক্তা-মাণিক্য খচিত দেখা যায় সুর-সৌধ রাশি,
তারি মাঝে চতুর্ম্মুখ! হেরি তোমা' ত্রিদিব উদ্ভাসি,
সমাপি' দিবস কৃত্য, সদ্যঃস্নাত স্বর্ণ-দী ধারায়,
বর অঙ্গে রক্তবস্ত্র, বসিয়াছ সায়াহ্ন পূজায়!
পার্শ্বে হেম কমণ্ডলু রক্তরবি জল জল জ্বলে,
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মনাম গাহিতেছ মহা কুতূহলে!

তুমি সৌম্য মহেশ্বর! হেরি পুনঃ প্রভাতের কালে,
দাঁড়াইয়া দিব্যকান্তি, দীপ্তিমান্ পূর্ব্ব চক্রবালে!
বালারুণ ধিকি ধিকি জ্বলি ওঠে শ্বেত ভালতলে,
হে পিনাকি! ভাস্বর পিনাক ঊর্দ্ধমুখ ঝিকি ঝিকি জ্বলে!
শীর্ণ শীর্ণ শুভ্রঘনস্তর বিলম্বিত গগন যুড়িয়া,
পশ্চিম আকাশ প্রান্ত হ'তে, যেন বিষ্ণুপদ দিয়া
সফেন জাহ্নবী-বারি লক্ষধারে ঝরিছে মায়ায়,
এলায়িত নীল জটাজুট আলুথালু চৌদিকে লুটায়।

নমামি অনন্তরূপ। অনন্তের সুন্দর ব্যঞ্জনা,
হে উজ্জ্বল নীলাম্বর! পুরাণের পরম কল্পনা।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

মোসলমান বীরাঙ্গনা।

আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে, মোসলমান রমণী কুসুম কোমল দয়া স্নেহ প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত; কিন্তু তাঁহাদের স্বভাবে দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতার অভাব আছে। এই মত যথার্থ নহে। মোসলেম রাজন্য কুলের অনেক বেগম ও শাহজাদী মন্ত্রণাকক্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। এই সকল বেগম ও শাহজাদীর মধ্যে কেহ কেহ আবশ্যক মত রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কীর্ত্তি মন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছেন। আমাদের নির্দ্দেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অদ্য চাঁদবিবির কীর্ত্তি কাহিনী সৌরভের পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

চাঁদবিবি আমেদ নগর রাজ্যের অধিপতি ইব্রাহিম নিজাম শাহের পিতৃব্য পত্নী ছিলেন। ইব্রাহিম নিজাম শাহ বিজাপুরার অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। ইব্রাহিম সমস্ত রাত্রি মদ্যোৎসবে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন জন্য উদ্যোগী হন এবং যাত্রার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তীব্র সুরাপান করেন। ঈদৃশ অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাহার জীবন লীলার অবসান হয়।

ইব্রাহিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমেদনগর রাজ্য ব্যাপিয়া অরাজকতা উপস্থিত হয়। মিঞানমঞ্জু নামক একজন দুরাকাঙ্ক্ষ রাজ পুরুষ ইব্রাহিমের একমাত্র শিশুপুত্র বাহাদুরকে চাবন্দ দুর্গে আবদ্ধ করিয়া একজন দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালককে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নামে নিজে সমস্ত রাজক্ষমতা গ্রাস করেন। মিঞান মঞ্জুরের অনুসরণ করিয়া আর দুইজন ক্ষমতালোলুপ রাজপুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইঁহাদের তাণ্ডবে সমগ্র আমেদনগর রাজ্য ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। এরূপ সময়ে ইব্রাহিমের পিতৃব্য পত্নী চাঁদবিবি রাজ শিশু বাহাদুরের স্বত্ব রক্ষার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

চাঁদবিবির গৃহীত রাজক্ষমতা মূলহীন ছিল, প্রবল বাত্যার প্রথম বেগেই উহার ভূপতিত হইবার আশঙ্কা ছিল। রাজপুরুষগণ রাজবংশের রক্ষার ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন স্বার্থ সাধন জন্য নিরত ছিলেন। কেবল কতিপয় হাবসী সেনা নায়ক চাঁদবিবির পক্ষাবলম্বী ছিলেন। চাঁদবিবি ইঁহাদের সহায়তায় দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষ দিগকে দমন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অসাধারণ মনস্বিতা, অতুল কার্য্য কুশলতা এবং অসম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

চাঁদবিবির কার্য্য কুশলতা দেখিয়া রাজক্ষমতা প্রয়াসী রাজপুরুষগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একজন আকবর পাদশাহকে চাঁদবিবির ধ্বংশ সাধন করিয়া আমেদ নগর রাজ্য স্বাধিকার ভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ লিপি পাঠাইলেন। আকবর পাদশাহ পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণাপথের রাজ্য তিনটির (আমেদনগর, গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর) ধ্বংশ সাধন জন্য প্রয়াসী ছিলেন। এই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া পাদশাহ হৃষ্ট হইলেন।

রাজকুমার মুরাদ মিরজা ত্রিশ সহস্র অশ্বরোহী সৈন্যসহ আমেদনগর রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। প্রবল শত্রু দ্বার দেশে উপনীত হইলে চাঁদবিবি বিপুল বিক্রমে তাহার গতিরোধ জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এবং স্বয়ং যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য রাজধানী অবরোধ করিল। তিন দল ভুক্ত রাজপুরুষই আপনাদের অনুসৃত নীতির ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া রাজধানীর উদ্ধার সাধন জন্য ধাবিত হইলেন। রাজকুমার মুরাদ মিরজা এই সম্মিলনের নিম্নে সুবৃহৎ বারুদপূর্ণ গহ্বর সকল প্রস্তুত করিলেন। দুর্গবাসীরা দৈবাৎ এই সংবাদ অবগত হইয়া চাঁদবিবির আদেশে কয়েকটি গহ্বর হইতে বারুদ তুলিয়া ফেলিল। তাহারা একটি গহ্বর হইতে বারুদ তুলিয়া ফেলিতেছিল, এরূপ সময়ে রাজকুমার মুরাদ মিরজা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে অগ্নি প্রদান মাত্র উত্তোলনকারী দুর্গবাসীরা মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এবং প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তন্মুহূর্ত্তে মোগল সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত

হইল। দুর্গবাসী সেনানায়কগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বীরাঙ্গনা চাঁদবিবি অসীম সাহস সহকারে উন্মুক্ত তরবারি করে ভগ্ন স্থল রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এইদৃশ্য দেখিয়া পলায়নপর সেনানায়কগণ সাহসী হইয়া উঠিলেন এবং চাঁদবিবির সহিত যোগদান পূর্ব্বক মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। চাঁদবিবির উজ্জল যশোরাশিতে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর চাঁদবিবি চাঁদ সুলতানা উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং আমেদনগর রাজ্য রক্ষার্থ সম্মিলিত রাজপুরুষদিগকে দ্রুতবেগে আগমন করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

মুরাদমিরজা এই সংবাদ অবগত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তিনি বেরার প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেই সৈন্য সহ প্রস্থান করিতে সম্মত হইলেন। চাঁদ সুলতানা প্রথমে এই সর্ত্তে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন না। কিন্তু সম্মিলিত সৈন্যের পরাজয় ঘটিলে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে বিবেচনা করিয়া অবশেষে সন্ধি সংস্থাপনই সমীচীন বোধ করিলেন। রাজকুমার বাহাদুরের নাম সন্ধি পত্রে স্বাক্ষরিত হইল। অতঃপর মোগল সৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিলেন।

মোগলগণ কর্ত্তৃক রাজধানীর অবরোধ পরিত্যক্ত হইবার তিন দিন পরে সম্মিলিত রাজপুরুষগণ রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা আমেদনগর রাজ্য আপদমুক্ত দেখিয়া আপন আপন স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। চাঁদ সুলতানা তাঁহাদের বিষ দন্ত ভগ্ন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কৌশলে পতিত হইয়া মিঞান মঞ্জুর সমস্ত ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। তিনি ভগ্ন মনোরথ হইয়া স্বীয় মনোনীত রাজবালক সমভিব্যাহারে বিজাপুর রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মিঞান মঞ্জুর ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইবার পর অপর দুইদল ও ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল।

অতঃপর চাঁদ সুলতানা চাবন্দ দুর্গ হইতে রাজশিশু বাহাদুরকে উদ্ধার করিয়া মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মোহাম্মদ খাঁ নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। মোহম্মদ খাঁ প্রাচীন কর্ম্মচারীগণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আপন আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সর্ব্বত্র অসন্তোষ ধ্বনি উত্থিত হইল। চাঁদ সুলতানা এই বিষয় অবগত হইয়া মোহম্মদ খাঁকে পদচ্যুত করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন; মোহম্মদ খাঁ আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগল সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সেনা নায়কগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া চাঁদ সুলতানার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মোহম্মদ খাঁর বিষ দন্ত ভগ্ন হইলেও মোগল সেনাপতি খান খানান তাঁহার সহায়তায় আমেদনগর রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যে উদ্যোগ করিয়া ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সন্ধির সর্ত্ত বিস্মৃত হইয়া আমেদনগর রাজ্যের কিয়দংশ গ্রাস করিয়া বসিলেন। মোগল সেনাপতির এই কার্য্যে দক্ষিণাপথের অপর দুইটি রাজ্য,—বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার অধিপতিদ্বয় ও আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মোগল শক্তি প্রতিহত করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এজন্য তাঁহারা মোগলের দমন জন্য চাঁদ সুলতানার সহায়তার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ষাইট হাজার সম্মিলিত সৈন্য মোগলের গতিরোধ জন্য ধাবিত হইল। সোনপত নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন বিজয় লক্ষ্মী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইলেন, সম্মিলিত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু এই সময় মোগল শিবিরে দারুণ মত ভেদ উপস্থিত হওয়াতে মোগলের বিজয়োদ্যম পরিত্যক্ত হইল। আমেদনগর রাজ্য রক্ষা পাইল।

কিন্তু একবিপদ দূরীকৃত হইতে না হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। মোহম্মদ খাঁ পদচ্যুত হইলে নেহাঙ্গ খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিয়া ছিলেন। তিনিও ক্ষমতার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং চাঁদ সুলতানাকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করিতে উদ্যোগী হইলেন। চাঁদসুলতানা

এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। অধিনেত্রীও মন্ত্রীর মধ্যে ঘোর মনোমালিন্য চলিতে লাগিল।

এই মনোমালিন্য দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই আকবর শাহ মোগল শিবিরের মত ভেদের সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিণাপথে আগমন করিলেন। আমেদ নগর রাজ্যের বহির্ভাগে প্রবল শত্রু দণ্ডায়মান, অভ্যন্তরে রাজপুরুষগণ অবাধ্য ও অবিশ্বাসী—চাঁদসুলতানা এই সঙ্কটে পতিত হইয়া আকবর শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়া তদ্বিষয়ে হামিদ খাঁ নামক একজন হাবসী খোজার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। হামিদ খাঁ সুলতানার অভিপ্রায় অবগত হইয়া দ্রুত বেগে রাজ পথে বহির্গত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া নগরবাসীদিগকে তৎসংবাদ পরিজ্ঞাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে নগরবাসীরা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চাঁদ সুলতানার হত্যা সাধন করিল; রমণীরত্নের রক্তে আমেদনগর রাজ্য কলঙ্কিত হইল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ভক্তি ও ভক্ত।

যে দেশে ভগবানে বিশ্বাস আছে সে দেশেই ভক্তি ও ভক্ত আছেন। মহাপুরুষ কিম্বা আবতার এদেশে ওদেশে একের তুলনা অন্য আছেন কিন্তু কোথাও শ্রীচৈতন্যের তুল্যও নাই তুলনাও নাই। ভারতে ভক্তির এবং ভক্তের স্তর কোথায় কত উচ্চে উঠিয়াছিল শ্রীচৈতন্য তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভারতে উপাসক সম্প্রদায় যত অন্য কোন দেশে তত আছে কি না জানি না। ভক্তি-ভগবৎ ধারণার অনুযায়িনী। ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ভারতবাসীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভক্তির অনুকূল। উত্তুঙ্গ হিমালয় যেন উত্তান পাণি এবং নাসাগ্র নিবিষ্ট দৃষ্টি। যেন তিনি অচল যোগাসনে বসিয়া অটল একান্ত মনে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারই ভক্তি ধারা যেন যমুনা এবং জাহ্নবী। অহিংসা ভারতের প্রকৃতি; সেই প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ বুদ্ধে। বুদ্ধের পরিণিত চৈতন্য। ভক্তি এবং ভক্তের এমন আদর্শের দেশ আর কোথায় পাইব।

ভক্তির লক্ষণ কি? এবং ভক্তেরই বা লক্ষণ কি? ভক্তি আগে কি ভক্ত আগে বীজ আগে কি গাছ আগে ও কথা তুলিয়া ফল নাই। কিন্তু ভগবান যে সকলের আগে ইথে কোন সংশয় নাই। ভগবানকে আশ্রয় করিয়াই ভক্তি এবং ভক্ত। ভক্ত যে পরিমাণ ভগবানকে ধারণা করিতে পারেন, সেই পরিমাণ তাঁহার ভক্তি। ভক্তি- "পরানুরক্তি রীশ্বরে।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরে একান্তানুরক্ত সেই ব্যক্তিই পরম ভক্ত। প্রভো, আমি কাহাকে পরম ভক্ত বলিয়া বুঝিব?

শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন"

যাহাকে দেখিলে হয় কৃষ্ণ নামোদয়।
তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব নিশ্চয়।

শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবে এবং ভক্তে ভিন্ন করেন নাই। শ্রীচৈতন্য-কথিত ভক্তের এ লক্ষণ বড়ই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। ভক্তের মুখশ্রী গড়িয়া থাকেন ভক্তি। বিষয়ানুযায়িনী ভাবনা; ভাবনানুযায়িনী মুখশ্রী। সকল বিষয়ের সেরা বিষয়—ভগবান। সকল ভাবনার সার বিষয় ভগবৎ ভক্তি। মুখের শ্রী, রাজনীতিকের এক, মোক্তারের এক, ডাক্তারের এক, শিক্ষকের এক, পুলিসের মুখের শ্রী কটুকথা কহিতে কহিতে কর্কশ হইয়া যায়। প্রতি নিশ্বাসে মা জগদম্বা বলিয়া ডাক, হা কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ বলিয়া ডাক. আল্লা জেহোবা কিম্বা লর্ড বলিয়া ডাক, পর ব্রহ্ম বলিয়া ডাক। কত দেশে কত কত নাম জপিয়া কত কত মানুষ ভক্ত হইয়াছেন যে নামেই ডাক লাল মেঘ, কাল মেঘ শাদা মেঘ, বৃষ্টির জলের রং এক। ভগবানকে ভাবিতে ভাবিতে ডাকিতে ডাকিতে দেখিতে পাইবে তোমার মুখের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। মা ভক্তি আসিয়া তোমার মুখ মণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। মাএর মত সুন্দরী কে?

বুদ্ধজ্ঞানে. চৈতন্য ভক্তিতে। চারিশত ত্রিশ বৎসর হইল ভক্তি চৈতন্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তি কি এবং ভক্তকে ভারতের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন নহে।

কিন্তু ভক্তি লাভ করা এবং ভক্ত হওয়া বড় কঠিন। যিনি অনন্য গতি হইয়া, তৃণের ন্যায় দীন হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া ভগবানে আপনাকে সঁপিয়া দিতে পারেন, তাঁর ভক্ত হইতে দেড়ি কি? ভক্তি হইলে তোমার চোখের চাহনি ফিরিবে, তোমার কর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িবে; তবে না ভক্ত। মাধবকে জপিয়া জপিয়া তুমি মধু হইলে মানুষের দল পিপড়ার সারির মতন তোমার দিকে ছুটিবে। ইহাতেও ভক্তকে চিনা যায়। ঢালিবে আলকাতরা জুটিবে অলির দল,—তাও কি কখনও হয়? শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণের নামে যে শত শত লোক ছুটে কেননা তাঁহারা মাধবে মজিয়া মধু হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে মরফিয়া সেবা কিম্বা মূর্চ্ছা রোগের বিকার বলিয়া পাপের বোঝা বাড়াইও না। কলিতে তাঁহাদের ন্যায় ভক্ত অধিক জন্মিয়াছেন কি?

রাজা রামমোহন বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞানী, ভীষ্মের ন্যায় ধর্ম্মবক্তা। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ জনকের ন্যায় যোগী। কেশবচন্দ্র ভক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন। একদিন তিনি মধু হইয়াছিলেন তাই তাঁহার ভক্তের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। হায় কোথায় গেলেন তাঁহারা?

শান্ত, দাস্য, সৈখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ভক্তির ও ভাবের এই পঞ্চ লক্ষণ। মন শান্ত ও সমাহিত—এই ভক্তির অটলাসন রচিত হইল। হে প্রভো! তোমার সেবার জন্যই আমার এই মানব জন্ম—ভক্তির ঐ আর এক সিঁড়ি। হে সখা, তোমাতে ও আমাতে—ভক্তির পথে অনেক দূর উঠিয়াছ। ভগবান তুমি আমার গোপাল, আমি মা যশোদা। তুমি মা যশোদা, আমি তোমার প্রাণগোপাল দুধের গোপাল—অলকার আলোক ঐ দেখা যাইতেছে। মধু লইয়া মধুর—এই সতী, এই পতি। এই মহা মিলনেই ভক্তির চরমোৎকর্ষ। এই মহাভাবেই মানবের মহামুক্তি ও মহাগতি। স্বেদোদগম রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত ও সমাধি ভক্তির এই কয়েকটী বাহ্য লক্ষণ। ভণ্ড-লোকে অভিনয় করে করুক। যা খাটী,- তাহা আজও খাটী,—কালও খাটী।

ধনীর সংখ্যাও জ্ঞানীর সংখ্যা গণিয়া লোকে সমাজের শক্তির পরিমাণ করে। ভক্তি এবং ভক্ত দেখিয়া লোকে ধর্ম্ম সমাজের বল বুঝে। সম্প্রতি প্রায় সকল ধর্ম্ম সমাজেই ভক্তির স্রোত মন্দা, ভক্তের সংখ্যা কম। কপটাচার এবং কৃত্রিমতার দিনে অহমিকা এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার যুগে, এইরূপ হইবারই কথা। তোমাদের নূতন অভিধানে ভক্ত এবং ভক্তির সংজ্ঞা যাহাই কেন হউক না, কে ভক্ত বুঝিতে যত যুক্তিই কেন দেও না ভক্ত বুঝিতে ভারতবাসী চৈতন্যের আদর্শ, বাবা নানকের আদর্শ, ভক্ত রাম প্রসাদ, বিজয়কৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণের আদর্শ চাহিবে। অন্য কোন আদর্শে ভারতবর্ষ ভুলিবার নয়। সকলেরই সুকৃতি ইঁহাদের মত হইবে তাহা নহে কিন্তু ঐ আদর্শের দিকে লক্ষ্য থাকা চাই জ্ঞান ও ভক্তি। ধোঁয়ার তাপে পোকা মরে কিন্তু জল বিনা, রস বিনা গাছ বাড়ে না।

সাহারায় যত রাজ্যের বালু পশ্চিমা হাওয়ায় আসিয়া ভারতের উপর উড়িয়া পড়িতেছে হৃদয়ের রস বস্তু সব শুষিয়া লইতেছে। রস ছাড়া ভক্তি নাই। "রসঃবৈসঃ" ধর্ম্ম সম্প্রদায় মাত্রই অবধূতগণ অন্যকে ভজাইতে যত্ন করিয়া থাকেন। ভক্তি যদি না থাকে তবে ভজাইবে কি দিয়া? মৃদঙ্গ সেই বাজে কিন্তু আর ত তেমন বাজে না। করতাল সেই চলে, আর ত তেমন চলে না। গলা গায়, আর ত তেমন গায় না। শুষ্ক জ্ঞান ও কর্ম্মের বাঁশ তলে দিয়া ডাঙ্গার ডিঙ্গি টানিয়া নদীতে ভাসান যাইতে পারে কিন্তু তাতে তলা ফাটিবার সম্ভবনা বিস্তর। চড়ার নৌকা ভাসাইতে বন্যা চাই। হাতুড়ি পিটিয়া লোহায় ও কাঠে জাহাজ গড়ে—শুকনা ডাঙ্গায় ডক ইয়ার্ডে। তৈয়ার হইলেই ডকে জলের বান ডাকাইতে হয়। তাহাতেই তরী সহজে ভাসে। সহজে সুগমে নদীতে মহাসাগরে চলিয়া যায়। শুষ্ক জ্ঞান অহঙ্কার এবং অসুদারতার আঁইকা বাঁশ তলে দিয়া মানুষের প্রাণ গুলাকে টানা হিচড়া করো না, অনেক যে কাটিয়া ফাঁটিয়া গিয়াছে, আরো যাইবে। যিনি যে সমাজের ধর্ম্ম বক্তা হউন না, শান্ত দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে সিক্ত শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে আগে ভক্তি গঙ্গাকে লইয়া আসুন। যত সব প্রাণ পাপে সাপে ছাই হইয়া আছে সমস্তই পতিত পাবণীর স্পর্শে ভক্তি-বন্যার টানে বাঁচিয়া নাচিয়া উঠিবে। জাহ্নবীর মত নদী নাই, হিমালয়ের মত উচ্চ অটল অচল পর্ব্বত নাই। ভক্তির মতন শক্তি নাই ভক্তের মতন কেহ নয়।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

ধরণী।

তোমার আকাশে উঠে যে চন্দ্র, ফুটে যে জোছনা জাল,
হৃদয়-গগন উজলি' আমার হাসে সে যে চিরকাল!
বাগানে তোমার ছড়া'য়ে সুবাস পুষ্প রয় সে ফুটে,
বিজন জীবন-কানন আমার গন্ধে ভরিয়া উঠে।
তোমার পাখীর কণ্ঠে ছুটে যে সুধা সঙ্গীত-ধারা,
কি যেন পুলকে পরাণ আমার ক'রে দেয় মাতোয়ারা!
পর্ব্বত বাহি, উচ্ছল গানে নির্ঝর তব ঝরে,
হৃদয়ে আমার করুণার শত ধারা সিঞ্চন করে!
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে বাজে মঙ্গল বাঁশী
হর্ষ-মুখর ধরণী যে যায় মিলনোৎসবে ভাসি!'
বাহু মেলি' ধরা চারিদিক হ'তে শত বন্ধনে. বাঁধে,
হেরি' তা'রে দুই আঁখি অকারণে উছলিয়া উঠে কেঁদে।
হাসি যত হাসি হরষে ডুবিয়া, ফেলি যত আঁখিধার,
তোমারি বক্ষে ফুল হ'য়ে ফুটে ধরিত্রি, মা আমার!
ধরনি, আমার সাধের ধরনি – জীবন শোণিতে আঁকা;
সুখ দুঃখ ভাঙি গড়েছি তোমারে হাসি কান্নায় মাখা।

শ্রীগনেশচন্দ্র রায়।

বিচার যে ভাবে করেন, তাহাতে য়ুরোপীয় জাতি ভিন্ন আর কেহই সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে না! এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার অবসর আমাদের নাই। তবে এই উপলক্ষে একটি পুরাতন গল্পের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহাত্মা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তিনি অবসর সময়ে সেখানকার নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। এই ভাবে বহুদিন তাহাদের সহিত মিশিবার পর, তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—ভারতের নিম্ন শ্রেণীর সহিত আমি বাল্যকাল হইতেই আলাপ পরিচয় করিতেছি। বিলাতের এই শ্রেণীর লোকের সহিত আমি যথেষ্ট মিশিলাম। এখন আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে. এখানকার এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা আমাদের দেশের ঐ শ্রেণীর অবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে হীন। ভারতের লোক যতই হীন হউক না কেন। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের নীচ লোকদের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব একবারে নাই। নীতি সম্বন্ধে ও ভারতের নিম্ন শ্রেণীর লোক ইহাদের অপেক্ষা অত্যন্ত উন্নত। এক বিষয়ে অবশ্য এখানকার ছোট লোকেরা আমাদের ছোট লোকদের অপেক্ষা ভাল—ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অনেক উন্নত।

তিব্বত অভিযান

সৈন্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাণিজ্য প্রভৃতি।

তিব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

ইয়মডক তীরে ইংরেজ ছাউনী।

পাশ্চাত্য জগতে তিব্বত অসভ্য বলিয়া পরিচিত। আধুনিক পশ্চিম জগতের লোকেরা সভ্য অসভ্যের

আমাদের বোধ হয়, পরিচ্ছদই আজকালকার সভ্যাসভ্যের প্রধান চিহ্ন। তুমি হয়ত ঘোর অধার্ম্মিক, চরিত্রেও অত্যন্ত ঘৃণিত, সংস্ত্রীর সহিত চিরদিন তোমার ঘোর বিবাদ, কিন্তু তুমি যদি কোট, প্যাণ্ট হ্যাট, নেক্‌টাই, কলার লাগাইয়া ব্যবহার কর, সকলেই তোমাকে সম্মান করিবে। তোমার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। তুমি তখন সভ্য চূড়ামণি। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি চিরদিন অসভ্য হিন্দু থাকিবার প্রার্থনা করি। যাহা হউক, তিব্বতীয়েরা য়ুরোপীয় প্রণালী মত অসভ্য হইতে পারে কিন্তু অনেক বিষয়ে তাহারা যে, য়ুরোপের কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। ইহাঁদের সৈন্যাদি যে বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত সংগঠিত তাহা আমাদের মধ্যে প্রায় সমস্ত সামরিক কর্ম্মচারীই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

অম্বান্ সমগ্র তিব্বতীয় সৈন্যের অধিনায়ক। এখানে সৈন্য পরিচালনার সমস্ত পরিভাষা চীনা ভাষা হইতে সংগৃহীত। চীনা সৈন্য দলের কর্ম্মচারীদিগের পদ যেমন তাঁহাদের টুপির বোতামের সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হয়, তিব্বতেও অবিকল সেই প্রকার।

লাসায় দুই জন অম্বান্ থাকেন। একজন প্রবীণ (senior) ও অন্যজন নবীন (junior)। উভয়েই পিকিন হইতে প্রেরিত হয়েন। অনেকে হয়ত জানেন, চীনের রাজবংশ ও সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোক মাংচু বংশোদ্ভব। (পাঠক, মনে রাখিবেন যে, যখন এই কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়, তখনও পর্য্যন্ত চীনে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী স্থাপিত হয় নাই।) অম্বানেরাও এই বংশ হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন। তিব্বতীয়দিগকে যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দেওয়া অম্বান দ্বয়ের এক প্রধান কর্ম্ম। ইহার জন্য লাসায় মধ্যে ২ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উহাতে পাশ হইলে সৈনিক দলে ভর্ত্তি করা বা প্রমোশন দেওয়া হয়।

সাধারণত, সৈনিক পুরুষদিগকে তিব্বত হইতে সংগ্রহ করা হয়। তবে অম্বান দ্বয়ের সঙ্গে কয়েকদল সৈন্য আছে, তাহারা সমস্তই চীনা সৈন্য লইয়া সংগঠিত। অবশ্য ইহাদের কর্ম্মচারীরা ও চীনা। তাঁহাদিগকে 'টংলিং' বলা হয়। সমস্ত তিব্বতীয় সৈন্যের সংখ্যা মোট ৬০০০। তবে প্রয়োজন হইলে ১৬ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক সকলকেই যুদ্ধ করিতে হয়। লাসা, গিয়াংৎসী ও সিগাৎসীতে এক এক হাজার সৈন্য অবস্থিতি করে। অবশিষ্ট তিন হাজার দেশের চারিদিকে ছড়ান থাকে।

তিব্বতের সৈন্যেরা সচরাচর তিন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। উহাদের পৃষ্ঠ দেশে একটা বন্দুক, দক্ষিণ হস্তে বল্লম্ ও কটিদেশে তরবারি লম্বমান থাকে। কখনও কখনও বন্দুকের পরিবর্ত্তে তীর ও ধনুক ব্যবহৃত হয়। তবে ইহা দিন দিন লোপ পাইতেছে। তিব্বতের কয়েক স্থানে বন্দুক প্রস্তুত হয়। আমাদের

তিব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

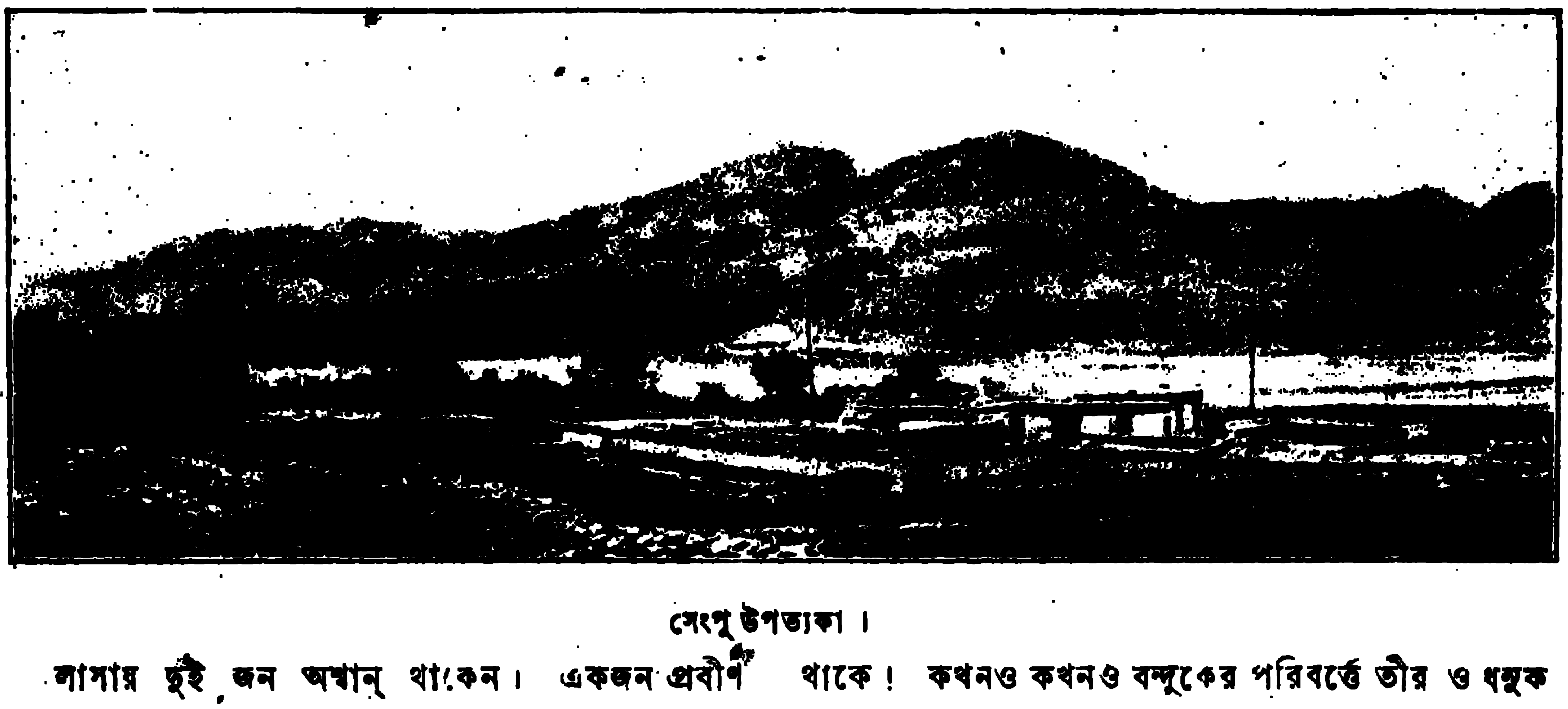

সেংপু উপত্যকা।

সাহেবদের মুখে শুনিয়াছি যে এই সকল বন্দুক যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। ছোট ছোট তোপও এদেশে প্রস্তুত হয়। শুনিলাম, ভারতের কয়েকজন কারিকর এই সকল তোপ ও বন্দুক নির্ম্মাণ করে। ইহারা নাকি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গমন করে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গোপনে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে। বারুদের জন্য ও এদেশের লোক পরের দ্বারস্থ হয় না।

তিব্বতীয় সৈন্যদের কমিসেরিয়েটের বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক সৈন্যের সহিত একটি ছোট থলে থাকে। ১০।১২ দিনের উপযুক্ত গম বা যবসিদ্ধ উহার মধ্যে রক্ষা করিয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখে। কুচের সময় পথি মধ্যস্থ গ্রাম বাসীদিগকেই সৈন্যদের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। সৈন্য পোষণের জন্য প্রজাদিগকে কোনও প্রকার কর দিতে হয় না বলিয়া তাহারা এই ভার অনায়াসে বহন করে।

তিব্বতীয় সৈন্য ও কর্ম্মচারীগণ।

সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বেতন বড় কম। সচরাচর তাঁহারা ৭৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু একই শ্রেণীর চীনা কর্ম্মচারীরা প্রায় দ্বিগুণ অধিক বেতন পান। অনেক কর্ম্মচারী বেতনের পরিবর্ত্তে নিষ্কর জাইগীর ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। সাধারণ সৈনিকেরা নির্দ্দিষ্ট ওজনের যব বা গম ছাড়া আর কিছুই পায় না। অনেক সময় তাহাদিগকে পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত ঘর হইতে দিতে হয়।

তিব্বতীয় সৈন্যগণের শিক্ষার ভার অধিনায়কের উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অধিক নয়। শুনিলাম চীন গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াই অজ্ঞ লোক পাঠান। উদ্দেশ্য—দেশের লোক যুদ্ধ বিদ্যায় অজ্ঞ থাকিলে তাহারা সহজে বশীভূত থাকিবে। তিব্বতীয়েরা যে ভাবে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা পাঠক জানেন। তাহারা যদি যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে যে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইত, তাহা ইংরাজ কর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছিলেন।

শাসনের সুবিধার জন্য সমস্ত তিব্বতকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) মধ্য তিব্বত—রাজধানী লাসা। (২) নরী বা পশ্চিম তিব্বত—রাজধানী গরটক্। মরিয়ম বা ময়ুস গিরিসঙ্কটের পশ্চিম দিককার সমস্ত অংশ নরী নামে খ্যাত। সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র এই স্থান হইতে উত্থিত হইতেছে। (৩) পূর্ব্ব তিব্বত—কংবো ইহার রাজধানী শ্যাম দেশ এই অংশে অবস্থিত। এই তিন ভাগ ব্যতীত আর এক ভাগ আছে—ইহা পূর্ব্ব তিব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা 'সিচুয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা খাস চীনের অধীন। দলাই লামার এখানে কোনও প্রভুত্ব নাই বলিয়া ইহ মানচিত্রে 'চীনা—তিব্বত' নামে উল্লিখিত হয়। চেংটুও ইহার রাজধানী।

তিব্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ অধিত্যকা। ইহার

উত্তরে প্রসিদ্ধ কুয়নলন্ পর্ব্বত মালা। এই অভ্রভেদী পর্ব্বত তিব্বতকে তুর্কিস্থান হইতে পৃথক করিতেছে। দক্ষিণে ভীমকান্তি হিমালয়—ভারতবাসীর নিকট তিব্বতকে ভীষণ দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস পর্ব্বত পশ্চিম তিব্বতে অবস্থিত। গর্‌টক্ হইতে এই পর্ব্বত প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে। লাসা হইতে গর্‌টক্ যাইতে হইলে কৈলাস অতিক্রম করিতে হয়। তিব্বতের পশ্চিম দিকে কাশ্মীর এবং পূর্ব্ব দিকে চীন অবস্থিত।

কুয়েন্‌লন ও হিন্দুকুশকে কারাকোরম্ পর্ব্বত সংযোজিত করিতেছে। এই হিন্দুকুশ তিব্বতের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এইস্থানে কারাকোরম্ সঙ্কটও অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৮৫৫০ ফুট। ইহার ১৫০ মাইল পূর্ব্বে কিজিলজিল্লা পর্ব্বত। ইহার উচ্চতা ১৬৩৫০ ফুট। এই পর্ব্বতের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সাবোল হ্রদ পুঞ্জ। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ ছয়টি হ্রদ আছে। সকলগুলিই এক নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে খোক্‌দউরকপ হ্রদ। এই হ্রদের দক্ষিণে কয়েকটি পর্ব্বতের মধ্যে ৩টি সোণার খনি আছে। কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে ইহা হইতে তিব্বত গভর্ণমেন্ট বিশেষ লাভবান হইতেছেন না।

সকল হ্রদের মধ্যে টেংগ্রি হ্রদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার আশে পাশে অনেক গুলি হ্রদ আছে। প্রসিদ্ধ মানস সরোবর হ্রদ কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত। এই হ্রদ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের নিকটই পবিত্র। ইহার পাশেই আর একটি তুল্য আকারের হ্রদ আছে। ইহা রাক্ষসতাল নামে অভিহিত। ইহাদের প্রত্যেকের চারিদিককার বেড় প্রায় ৫০ মাইল। এই উভয় হ্রদই পবিত্র কৈলাস পর্ব্বতের পাদ মূল ধৌত করিতেছে। ইহাদের অপর তিনদিক সবুজ বর্ণ ময়দানে আবৃত। এই সকল ময়দানে সর্ব্বদা সহস্র ২ ছাগ, মেষ প্রভৃতি চড়িয়া থাকে। যে তিব্বত দেশীয় ছাগলের কথা আমাদের ছেলেদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে হয়, তাহাদের বাসস্থান এই দুই হ্রদের তীরে। সহস্র ২ টাকার লোম এইস্থান হইতে পৃথিবীর চারিদিকে প্রেরিত হইতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের কোনও কোনও স্থান হইতে সোহাগা ও লবণ বাহির হয়।

এই দুই হ্রদের তীরে অনেক গুলি বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত আছে। হিন্দুযাত্রীরা এই সকল মঠের ভিক্ষুদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিব্বতীয়েরা মানসসরোবরকে 'চো মাপন' এবং রাক্ষসতালকে 'চো লাগন' বলিয়া অভিহিত করে। এই দুই হ্রদ শুধু যে পাশাপাশি অবস্থিত, তাহা নহে—একটি ক্ষুদ্র

দালাই লামার প্রাসাদ।

তিব্বতে হ্রদের সংখ্যা অনেক। সকলগুলির জলই লবণাক্ত। অনেকে মনে করেন, এক সময়ে সমগ্র তিব্বত বঙ্গোপসাগরের গর্ভে অবস্থিত ছিল। এই স্রোতস্বিনী উভয়কে সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। ইহা মানসসরোবর হইতে বাহির হইয়া রাক্ষসতালে পতিত হইতেছে।

মানস সরোবর বৌদ্ধরাজ্য তিব্বতে অবস্থিত বলিয়া ইহা হইতে কেহ মৎস্যাদি ধরিতে পারে না। অথচ ইহার মধ্যে বহুতর মৎস্য এবং ইহার তীরে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে লক্ষ ২ হংস রাজহংস এবং অন্যান্য বহুবিধ জলচর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ঘটনাক্রমে কোনও মৎস্য স্রোতের বেগে বা অন্য উপায়ে বাহিরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে গ্রহণ করিয়া রবিতাপে শুষ্ক করে; এই মৎস্য তখন অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হয়। কাহাকে কোনও অপদেবতা আশ্রয় করিলে (সোজা কথায় ভূতে পাইলে) ঐ মৎস্যের একখণ্ড কয়লার আগুণে নিক্ষেপ করা হয়। উহা হইতে যে ধুম বাহির হয়, তাহা রোগীর নাসিকার নিকট ধরা হয়। ইহাদের বিশ্বাস এ প্রকার ধুম ভূত মহাশয় কোনও মতে সহ্য করিতে পারেন না। আশ্রিত জনকে ছাড়িয়া অন্য শীকারের সন্ধানে বাহির হন।

কৈলাসের ন্যায় পর্ব্বতের ৩০ মাইল বড় সহজ কথা নয়। খুব দ্রুত গমন করিলেও ৭।৮ দিনের কমে ইহা সম্পন্ন হয় না। এই প্রদক্ষিণ পথে গৌরিকুণ্ড নামক এক হ্রদ অবস্থিত। ইহা চিরদিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে। যাত্রীরা স্নানের পরিবর্ত্তে ইহা হইতে এক খণ্ড বরফ লইয়া মস্তকে রক্ষা করে।

যাত্রী অর্থশালী হইলে এই প্রদক্ষিণ কার্য্য ডুলি বা ডাণ্ডির সাহায্যে করিতে পারেন। কিন্তু দরিদ্র যাত্রী দিগকে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। বদ্রি-কেদারের পথেও তাঁহারা যথেষ্ট কষ্ট পাইয়া থাকেন কিন্তু তথায় ৩।৪ মাইল অন্তর মঠ এবং ধর্ম্মশালা থাকাতে কষ্ট লাঘবের অনেক উপায় আছে। কিন্তু কৈলাসে এসব কিছুই নাই। রাত্রি যাপনের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত নাই। কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য এমন কি এক ছটাক জ্বালানি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত পাইবার উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত

লাসার দৃশ্য।

শুনিলাম হিন্দু যাত্রীরা মানস-সরোবরে স্নানাদি কার্য্য সারিয়া কৈলাস অভিমুখে গমন করেন। কৈলাস পতি মহাদেব যে স্থানে স্বীয় বাসস্থান প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহা চির তুষারাচ্ছন্ন বলিয়া অগম্য হইয়া পড়িয়াছে! লোকে বলে যে, ভক্ত-যাত্রী এক ২ সময় মহাদেবের ডম্বুর ধ্বনি, ও বলদ মহাশয়ের চীৎকার স্পষ্ট শুনিতে পান। পবিত্র স্থান প্রদক্ষিণ করা হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রথা। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও এই প্রথা আছে। কৈলাস যাত্রীরাও অবশ্য এই নিয়ম যথাযথ পালন করিয়া থাকেন। চিরতুষারাবৃত শিবালয় প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রী দিগকে প্রায় ৩০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে হয়।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যদি এই পথের মধ্যে মধ্যে বাস না করিতেন, তাহা হইলে এই পথ হয়ত একবারে অগম্য হইয়া পড়িত। এই জন্য কৈলাস, মানস-সরোবরের যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। নিতান্ত কষ্টসহিষ্ণু হইতে না পারিলে কেহ এপথে আসেন না।

মানস সরোবরের পশ্চিমদিকে দর্শন নাথ। এইস্থানে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হ্রদে স্নান করিয়া যাত্রীরা ঐ মহাদেবের পূজা করেন। এই দর্শন নাথের পশ্চিমে তীর্থপুরী মহাদেব। ইহা হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ। অনেকের বিশ্বাস প্রসিদ্ধ শতদ্রু নদী। (Sutlej) এই স্থানের নিকটে, একটি ক্ষুদ্র প্রবল ধারা হইতে নির্গত

হইতেছে। ইহা শতদ্রুর উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ধারার বামদিকে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জলে গন্ধকের গন্ধ অনুভূত হয়।

আধুনিক ভূগোল বিদেরা কিন্তু তীর্থপুরীকে শতদ্রুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করেন না। তীর্থপুরীর কয়েক মাইল দূরে দলজু মঠ। এই মঠের মধ্যে একটি প্রস্রবণ আছে। ইহাই শতদ্রুর জননী। যাহা হউক, তীর্থপুরীর ধারা যে এই প্রস্রবণ হইতে নির্গত হইতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই প্রস্রবণ হইতে একটি ধারা বাহির হইয়া রাবণতালে পতিত হইতেছে। ইহা বৎসরের অধিকাংশ সময় শুষ্ক থাকে।

তিব্বত অধিত্যকা বটে, কিন্তু ইহার সর্ব্বত্র সমান নহে। চারিদিকে পর্ব্বত। ইহার ভিতরেও ছোট বড় অনেক পর্ব্বত আছে। সিন্ধুনদ পশ্চিম মুখে এবং ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব মুখে ইহার প্রায় মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সলউইন্, মেকং এবং ইয়ং-টি সি কিয়ং তিব্বতের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। মাচু বা হোএং-হো নদী পূর্ব্ব উত্তরদিকে প্রবাহিত। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ২ নদনদী অনেক আছে। এসিয়া মহাপ্রদেশে ইয়ংটি-সি কিয়ং হোএংহো, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধু চারিটি সর্ব্ববৃহৎ নদী। ইহারা সকলেই তিব্বতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এত ক্ষুদ্র দেশের এমন ভাগ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিব্বত পর্ব্বতময় বটে, কিন্তু নদী মাতৃক বলিয়া অত্যন্ত উর্ব্বরা। ভারতের প্রায় সমস্ত শস্য এখানে অল্পায়াসে প্রচুর উৎপন্ন হয়। এজন্য এখানে অন্নকষ্ট নাই বলিলেও চলে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান প্রায় সকলেরি আছে। যব, গম, মটর, ছোলা, অড়হর, চাউল প্রভৃতি এখানকার প্রধান উৎপন্ন। কয়েক স্থানে চাও জন্মে। আঙ্গুর, বাদাম, কিস্‌মিস্, লেবু প্রভৃতি সরস সুমিষ্ট ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়।

দেশে পর্ব্বত অনেক বলিয়া এখানে নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ অভাব। সেইজন্য উহাদের মধ্যে অধিকাংশ আজ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার নিম্নে পড়িয়া আছে। তবে শুনিলাম, সম্প্রতি কয়েকজন ভারতবর্ষীয় খনিজবিদ্ ঐ দেশে যাইয়া কয়েক স্থানে মূল্যবান খনি বাহির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সুবর্ণ, লৌহ, সোরা, সোহাগা, এবং লবণ প্রধান। লাসার উত্তর পূর্ব্বদিকে চংটং প্রদেশ। সেখানে কয়েকটি সোণার খনি বাহির হইয়াছে। সিমলার পূর্ব্বদিকে সোক্‌জালং নামক স্থানে শুনিতেছি দুইটি সোণার খনি পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ, নেপাল, সিকিম, ভুটান, চীন, তুর্কিস্থান ও কাশ্মীরের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। ইহার মধ্যে বার আনা ভাগ ভারতের সহিত। তিব্বতের লোম ও চামড়া আমাদের সওদাগরের সাহায্যে য়ুরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়। ১৮৯৯ সালের তিব্বতের আমদানি রপ্তানির একটা খস্‌ড়া হিসাব নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। ইহা হইতে ব্যাপারটা কিছু ২ বুঝিতে পারিবেন।

আমদানী।

তুলার দ্রব্যাদি	…	…	১৭৪৭৯৪ গজ।
নীল রংএর কাপড়	…	…	৯৭৮৪৬ গজ।
বিবিধ প্রকারের ছিট		…	৩৯,৩০৫ গজ।
ভাল ছিট	…	…	২৬২০৮৪ গজ।
গরম কাপড়	…	…	২১৭১০ গজ।
ধূপ ধূনা প্রভৃতি	…	…	৭৯ মন।
নানা প্রকারের রং	…	…	৯১ মন।
ময়ুরের পাখা	…	…	৯ মন।

এতদ্ব্যতীত কেরাসিন তেল, এবং ঘড়ি যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোনও হিসাব নাই। কয়েক বৎসর হইতে এখানে সৌখিন দ্রব্যাদি আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে, দর্পণ, সূচ, ছাতা, ছুরি, কাঁচি, সাবান, এবং তোয়ালে প্রধান। আশা আছে যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিব্বত আমাদের মত সভ্য হইয়া পড়িবে, এবং তখন তাহাদের বেশ ভূষার খরচ ক্রমে ২ আহারের খরচ অপেক্ষা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হইয়া পড়িবে। হয় ত এমন দিন আসিবে, যখন দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী সভ্যতার সহচরীরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তিব্বতে বাস করিতে আরম্ভ করিবে।

তিব্বতের লোক অত্যন্ত চা-প্রিয়। প্রত্যেক বৎসর প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড চা ইহারা পান করে।

ইহার অধিকাংশ চীন হইতে আমদানি হয়। অথচ আসাম তিব্বতের অতি নিকট প্রতিবাসী এবং ইহার চা চীনের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুলভ। তথাপি প্রতিযোগীতায় আসাম চীনের সহিত পারিয়া উঠে না। কারণ এই যে, আসামের চার উপর অত্যধিক শুল্ক বসান আছে। বলা বাহুল্য চীনের প্ররোচনায় তিব্বত এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

লাসার বাজারে আফিং বড় দুর্ম্মূল্য। টাকায় এক ভরি দরে বিক্রয় হয়। তিব্বতীয়েরা চীনাদের মত চণ্ডপান করে না বটে, কিন্তু আমাদের মত কাঁচা আফিং ব্যবহার করে। আসামের সমস্ত আফিং চীন হইতে আমদানি হয়। ভারতবর্ষীয় আফিংএর উপর উচ্চহারে শুল্ক বসান আছে।

রপ্তানি—এখান হইতে সুবর্ণ, লবণ, পশম; গরম কাপড়, কম্বল, নানা প্রকারের লোম, ভেষজ দ্রব্য, মৃগনাভি, শিলাজতু, সোরা, সোহাগা, নানাবিধ চামড়া অন্যত্র প্রেরিত হয়। নেপালের পথে সোরা, সোহাগা, এবং টাট্টু ঘোড়া রপ্তানি হয়।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

কথা-সাহিত্যে লোক শিক্ষা।

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্," দুঃখের বিষয় সকল সময়ে এ নীতি অনুসরণ করা সুসাধ্য নহে। তাই আমরা গত চৈত্র সংখ্যায় "সৌরভে" উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণের অপ্রিয় সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শুনিতেছি তাহার ফলে সৌরভ সম্পাদক, তৎপর হইতে সৌরভের বিনিময়ে "সবুজ পত্র" পাইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অপ্রিয় সত্য বলিয়া সাহসিকতার প্রতিফল স্বরূপ এ শাস্তিও, সাহিত্যিক সম্পাদকের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। তথাপি সাহিত্য, সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গল কামনায়, সময় সময় এরূপ অপ্রিয় সত্য বলিতে আমরা নিরস্ত থাকা সমীচীন মনে করিনা।

আজকাল বাঙ্গালার মাসিক পত্রিকা গুলিতে গল্পের প্রভাব সামান্য নহে। "নব্যভারত" "গৃহস্থ" প্রভৃতি ২।১ খানা মাসিক ভিন্ন, অপর অধিকাংশ পত্রিকাতেই প্রায় প্রতি সংখ্যায় একাধিক গল্প, কোন কোনটাতে ধারা বাহিক রূপে একাধিক উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে; দেখিতে পাই কোন মাসিকের এক শত পৃষ্ঠার মধ্যে অন্যূন আশি পৃষ্ঠাই গল্প ও উপন্যাসে পরিপূর্ণ। গত বৈশাখ সংখ্যায় "সৌরভে" প্রবীন লেখক, "কথা-সাহিত্যে লোক শিক্ষা" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে অনেক কাজের কথার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, এই কথা সাহিত্যের ঘোর প্লাবনে, সমাজের সন্নীতি, লোক শিক্ষার পথে কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম চন্দ্রের অনেক চরিত্র চিত্রই, লোক শিক্ষার বিরোধী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। "সমাজ ও সাহিত্য" নামক সুলিখিত গ্রন্থে, ভূত পূর্ব্ব "পারিজাত" সম্পাদক আমাদের ময়মনসিংহের অন্যতম সুলেখক শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। শক্তিশালী সুলেখকেরা পূতসংযতভাবে, সমাজের সুশিক্ষার সহিত আনন্দ ও ভাবার সম্পদ বৃদ্ধি করিবার সংকল্প নিয়া, সাহিত্য চর্চ্চা করিলে তাহার ফল অবশ্যই উপাদেয় হইবার কথা। কিন্তু যাঁহারা কল্পনা—কুল শক্তিশালী সুলেখক হইয়াও, সাহিত্যে সমাজবিধ্বংশী অপকৃষ্ট চরিত্র চিত্রিত করিয়া সুখ বোধ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সমাজের হিতৈষী বলিতে পারিব না। সৌভাগ্যের বিষয় অধুনা শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মত ২।১ জন চিন্তাশীল সুধী ব্যক্তি গল্প সাহিত্যের সংস্কার কার্য্যে শক্তি প্রয়োগ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। তাহারই ফলে রবীন্দ্র নাথের সাধের "মৃণালের" তেমন একটা বিস্ময় কর সদ্গতি হইয়াছে দেখিয়া আজ আমরা বিপিনচন্দ্রকে এত ধন্য ধন্য করিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রতিভার বিরাট বিগ্রহ বলিয়া জানি ও মানি এবং কত গৌরব বোধ করি। তিনিও আত্মবিস্মৃত হইয়া কেন মৃণাল চিত্র অঙ্কিত করিয়া

সুখ বোধ করিলেন, তাহা ভাবিয়া পাইনা। যাহা হউক, তাহা আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব? তিনিইত "শেষের রাত্রিরও" রচয়িতা! শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "দর্পচূর্ণে" এ দেশের স্ত্রী সমাজে যে সুশিক্ষাদান করিয়াছেন, অপর যে সকল গল্প লেখক সেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিবেন, তাঁহারা সমাজে ঘৃণার জনক নীচ আদর্শ আর সৃষ্টি না করিয়া নিরস্ত থাকিলেও মহা লাভ।

গত মাঘ সংখ্যায় "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু "শ্রীহরিদাস ভারতীর" বেনামীতে "কল্যাণী" শীর্ষক একটি ছোট গল্প লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিপিন বাবুর "কল্যাণী" আমাদের সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি না করিয়া বরং কলহ এবং অশান্তিই বৃদ্ধি করিবে, আমাদের এরূপই আশঙ্কা হইতেছে। বিপিন চন্দ্রের এই নূতন স্মৃতির পাঁতি পড়িয়া, আমাদের অপশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা নব নারী-বৃন্দ, সমাজে আবার একটা নূতন খেলার ঢেউ তুলিবেন বলিয়া ভয় হইতেছে। সহমরণের নাম শুনিলেই যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন এবং হিন্দু সমাজকে শত ধিক্কার দেন, তাঁহারাও সে দিন স্নেহলতার আত্মহত্যার সময় তাঁহাকে "স্বর্গের দেবী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া কতই না করতালি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিষময় ফল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া নিত্য নূতন কিরূপ ভীষণ ও শোচনীয় স্ত্রীহত্যার সহায়তা করিতেছে! তাহা কে না জানে? তবে এ দেশে "সফরজিষ্ট" মহিলা দিগের আবির্ভাব হইলেই সমাজের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইল বলিয়া যাঁহারা মনে ভাবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। বিপিন বাবুর অভিমত এই যে "আদর্শ হিন্দুস্ত্রীর পক্ষে স্বামীত্যাগ সর্ব্ব অবস্থাতেই দোষণীয়। তবে যখন স্বামীর উদ্দাম-স্ত্রী-সঙ্গ-সুখভোগ-লালসা প্রভৃতি, স্ত্রীর মাতৃধর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটায়, তখন স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। স্ত্রী যতদিন কেবল 'রমণী' থাকিবে, ততদিন স্বামীর সেবা, স্বামীর সন্তোষ বিধানই তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কিন্তু সে যখন 'মাতৃপদে' উন্নীত হইল, তখন তাহাকে পূর্ব্বের সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়াইয়া নূতন নিয়মে চলিতে হইবে। এবং সেই নূতন ধর্ম্মের অনুরোধে যদি স্বামীকে ত্যাগও করিতে হয়, তবে সে ত্যাগ দোষণীয় মনে করি না। তখন যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিল, তাহা তাহার নিজের জন্য নহে, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের কল্যাণের জন্য।" আমাদের বিবেচনায়, পতি-পদাভিষিক্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ যুবক দিগকে সুসংযত করিবার নিমিত্ত, সুচিকিৎসক বিপিন বাবু অপর কোন উপায় প্রদর্শন করিতে পারিলেই উত্তম হইত। আমাদের শাস্ত্রে "ঋতু কালাভি গামী স্যাৎ স্বদার নিরতঃ সদা" এবং "গুর্ব্বিণী নাস্তু সেবনং" ইত্যাদি ভূরি ভূরি সদুপদেশও ত আছে? তবে এখন কথা এই যে, আজকাল এ দেশের লোকের ধর্ম্ম ভয় ক্রমশঃ ক্ষীণই, হইতেছে। লোকভয় এবং রাজভয় যতই কেন প্রবল হউক না কেন, ধর্ম্ম-ভয় বাড়াইতে না পারিলে, শুধু লোক ভয় বা রাজভয়ে প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করা সুকঠিন, বোধ হয় অসম্ভব বলিলেও বলিতে পারা যায়। যে দেশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, মানব মাত্রেরই জীবনারম্ভের অবশ্য সেবিত গঠন ভূমি ছিল—এবং যে দেশে চিরকুমারের সংখ্যা ও সমাদর কিছুই কম ছিল না, সে দেশের নবশিক্ষা-গর্ব্বিত স্বামী-সম্প্রদায়কে সংযত করিবার জন্য, স্বেচ্ছা-বিহারিণী জীবন সঙ্গিনীর সৃষ্টি করিলে, সমাজের সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, আজও যাহা কিছু আছে, তাহা অচিরেই বিলুপ্ত হইবে এবং অনেক "কল্যাণীই" "মৃণালের" ন্যায় বিষম প্রেমিকের হস্তে লাঞ্ছিতা ও হৃতসর্ব্বস্ব হইবে এরূপই মনে হয়। নরেনের মত উদ্ধারকর্ত্তা অধিকাংশ স্থলেই না যুটিবার কথা। সুপ্রজনন বিস্তার (Engenies) সমর্থন করিতে গিয়া, সমাজকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতে দেখিলে, বিপিন বাবু এবম্বিধ প্রতিকার অপেক্ষা বোধ হয় ব্যাধিটাকেও বরণ করিয়া নিতে অধিকতর সম্মত হইবেন। দার্শনিক পণ্ডিত বিপিন বাবুর কল্যাণী চিত্রণের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তাহা আমরাও স্বীকার করিতেছি। কিন্তু বিপিন বাবু এভাবে অস্ত্রোপ্রচার করিলে সমাজ শরীরে আর একটা ভীষণতর নূতন ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাই অধিক।

বিপিন বাবুর মঞ্জরী "গোবরে পদ্মফুল" কিন্তু সেটিত বিপিন বাবুর মানস-কন্যা। ললিতের ন্যায় মোহমত্ত যুবা পুরুষকে সর্ব্ব প্রকার সম্ভাবিত ধ্বংশ হইতে রক্ষা

করিবার জন্যই, বিপিনবাবু তাঁহার এই মানস-কন্যাটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব জগতে এরূপ দেবীর দর্শন লাভ ঘটে কি? বিপিন বাবুর ঐকান্তিক সদিচ্ছা-প্রণোদিত এবম্বিধ প্রয়াসের ফল এই হইবে যে, সমাজে আমরা একটিও মঞ্জরী পাইব না, অধিকন্তু বিপিন বাবুর পাতি পাইয়া কল্যাণীর ন্যায় স্বেচ্ছাবিহারিণীর সংখ্যাই বৃদ্ধি হইবে এবং ললিতের ন্যায় পতঙ্গকুলের সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সে কালের কথা।

'সৌরভ' সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে এবার সাহিত্য সেবী হইয়া বর্দ্ধমানে যাইবার জন্য ১ লা এপ্রিল 'সৌরভ' কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে চলিলেন, আমাদের পৈত্রিক ভাণ্ডারী বৃদ্ধ রামচরণ দে। রামচরণ কে আমরা বুড়া দাদা বলিয়া ডাকি, বয়স তাহার ভীমরতি পাঠ শেষ করিয়া আশির কোঠায় বিশ্রাম করিতে ছিল। আমার এহেন পুরুষানুক্রমিক বৃদ্ধ সঙ্গীকে দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—আপনি এ প্রত্নতত্ব লইয়া চলিয়াছেন; সুদুর বর্দ্ধমানে যাইয়া বিপদে ফেলিবেন দেখিতেছি। আমি বলিলাম—"দাদা আমার হাড়ে শক্ত ছোট বেলায় বিদ্যাসুন্দরের পালা গাইয়াছে—শেষ বেলায় বর্দ্ধমানের সুরঙ্গটা স্বচক্ষে দেখিয়া মরিতে চায়। আপনি ভয় করিবেন না।"

অল্পক্ষণের ভিতরই সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বৃদ্ধের বহু কথা বার্ত্তা হইয়া গেল। সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—বৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ সুতরাং ঐতিহাসিক; কাজেই সাহিত্যিকতো বটেনই; তবে সাহিত্য সেবী না হইলেও মিহিদানা এবং সীতাভোগ সেবী যে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সান্তাহারে আসিয়া অদৃষ্টের দোষেই হউক আর রেল কোম্পানীর বন্দোবস্তের ত্রুটাতেই হউক ১ লা এপ্রিলের যাত্রার ফল ফলিল। আমরা গাড়ী ফেল করিয়া অনাহারে ও অনিদ্রায় তদোপরি মশা ও ছার পোকার তীব্র দংশনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। বুড়া দাদা নরেন্ ভায়াকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তীস্তামুখে যে হোটেলে খাইলেন কত দিলেন?" নরেন্ বলিল—"পাঁচ আনা।" বুড়া দাদা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "পাঁ—চ—আ—না!" আমি বলিলাম "তবে তুমি কি বল?"

বুড়া অবসর পাইয়া তাহার ঐতিহাসিক ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ধরিল। আমরা সকলে অতিশয় নিবিষ্ট মনে তাহার সে কালের কথা শুনিতে লাগিলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—দাদা! তোমাদের নিকট সে সব কথা বলিলে, তোমরা কি আর বিশ্বাস করিবে? সে কথা এখন আমাদের নিকটই স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হয়। আমি টাকায় ৭/ মণ ধান্য ক্রয় করিয়াছি। বিক্রেতা আমার বাড়ীতে ধান্য বহন করিয়া আনিয়া মাচা বান্ধিয়া ধান্য উঠাইয়া টাকা নিয়া গিয়াছে। আর এখন টাকায় /৭ সের /৮ সের ধান্য ও দেখিতে হইল! মুগ কালাই ১।০ আনা মণ এবং মাষ কালাই ৷৷৵০ মণ কিনিয়াছি। তখন মুসুরী দাইলের প্রচলন ছিলনা। খেসারী দাইলের অত্যন্ত প্রচলন ছিল। খেসারী দাইল প্রতিসের ৫ এক পয়সা হিসাবে বিক্রী হইত। তৈল সিক্কের ওজনে (১২০ সিক্কায় এক সের=৮০ তোলায় দেড় সের) প্রতি সের ।০ আনা ছিল চিনি গুড় ১০ পয়সা সের কিনিয়াছি। দুগ্ধ ১০ সের ছিল। লোকে বাড়ী বাড়ী দুগ্ধ লইয়া যাচিয়া বিক্রয় করিত। অত্যন্ত বৃহৎ মৎস্যও একটী একটাকার অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত না। এখন কার বাজারে সে রূপ মৎস্য ১০৲ টাকায়ও পাওয়া যায় না। তখন আমাদের মাছ বড় একটা কিনিতে হইত না; খাল বিলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত। তোমার বুঁড় দিদি মাছ ছাড়া খাইতে পারিত না; তাহার জন্য আমাকে প্রত্যহ বরশী দ্বারা মাছ মারিতে হইত। হোটেলে এক বেলায় ১০ পয়সায় মাছ ভাজা, মাছের ঝোল ও ডাল এই তিনটা খাওয়া যাইত।

পূর্ব্বে জিনিষে যেরূপ স্বাদ ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পূর্ব্বে, একবাড়ীতে মুগ বা মাষের দাইল রন্ধন

করা হইলে, পাড়াশুদ্ধ তাহার আঘ্রাণ পাওয়া যাইত। এখন পাতে পড়িলেও তদ্রূপ আঘ্রাণ পাওয়া যায় না। ঘি এর এখন সেরূপ গন্ধ নাই। তোমাদের বাড়ীতে স্বর্গীয় কর্ত্তারা পর্ব্ব ও উৎসবাদি উপলক্ষে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন; তখন যে রূপ আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া লোক জনে সন্তুষ্ট চিত্তে উহার প্রশংসা করিত, এখন তাহা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়াও লোকের মুখে সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাই না। তখনকার নিমন্ত্রণে খেসারী দাইলের মুক্তা, কচুশাক, খেসারী দাইল মাষের দাইল, মৎস্য ও মাংসের ঝোল এবং কচু পাতার অম্বল রন্ধন করা হইত। তখন পাঁঠাও অত্যন্ত সস্তাছিল; আমি টাকায় ৩টী পাঁঠা খরিদ করিয়াছি। আর এখন তিন টাকায়ও একটী পাওয়া যায় না! তখন ভদ্রলোকের জল খাবার বুট, আক্ড়ি (কাঁচামুগ ভিজান) বাতাসা নারিকেলের তক্তি, নারিকেলের লাড়ু, ক্ষীরের ছাপের লাড়ু এবং নারিকেলের প্রস্তুত চিড়া জিড়া ছিল। গ্রাম দেশে তখন এত মিঠাই মণ্ডার ছড়াছড়ি ছিল না। ভদ্র লোকেরা ইহাতেই পরম প্রীতি লাভ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা চিড়া গুড়ে সন্তুষ্ট হইত।

বিবাহ।

বিবাহের ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"আমি ১১৲ টাকা পণ দিয়া তোমাদের বুড়ি দিদিকে বিবাহ করি। তখন ছেলের উপর পণ ছিল না মেয়ের উপরই পণ লাগিত। তখন ২।১ টা বাঁশের ঝাড় ও টাকার পরিবর্ত্তে পণ স্বরূপ দেওয়া হইত। ১৫৲ টাকার উপর বিবাহের পণ ছিলনা। ছেলে ও মেয়ের অভিভাবকেরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেন; ছেলের মতামতের আবশ্যক হইত না। ছেলে, বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েকে দেখিতে পাইত না। সাধারণতঃ পুরুষেরা ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিত না। মেয়েদের ৮।৯ বৎসর বয়সেই বিবাহ হইত; এমন কি ৪।৫ বৎসর বয়সের মেয়ে বিবাহও দেখিয়াছি। পূর্ব্বে, বিবাহ উপলক্ষে 'পাকস্পর্শের' খাওয়ার সময় তুমুল তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইত। তর্কের মীমাংসা হইয়া পরদিন বাসি ভাত ও ব্যঞ্জন আহার করা হইত। ঐদিন আহারান্তে পাতের ভাত ব্যঞ্জন একে অন্যের গায়ে ছিটাইয়া দিত এবং তাহাতে অত্যন্ত আমোদ পাওয়া যাইত। বিবাহ উপলক্ষে গুড়মার গান অবশ্য করণীয় ছিল। তাহাতে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে যোগদান করিয়া অশ্লীল গান শুনিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

পোষাক পরিচ্ছদ।

বস্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বৃদ্ধ বলিতে লাগল—"আমরা ৯।১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উলঙ্গই থাকিতাম। সময় ২ লেংটী পরিতাম। তৎপরে বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে যুগীর প্রস্তুত কাপড় পড়িতাম। যুগীর কাপড় অত্যন্ত খস্‌খসে ছিল; কিন্তু এখনকার কাপড় অপেক্ষা ঐ কাপড় অধিক টেঁক সই ছিল। শীতের সময়ে যুগীর প্রস্তুত ২২ হাত লম্বা 'গিলাপ' দুই ভাঁজ করিয়া গায় দিতাম। তখন পিড়াণের এত প্রচলন ছিলনা। সধবা স্ত্রীলোকেরা যুগীর প্রস্তুত পাইর ধার কাপড়পড়িত। অবস্থাপন্ন লোকেরা গনফেস্ মেঘডুম্বুর, বধুরা ঢাকাই তাঁতের কাপড় 'তোলা কাপড় রূপে ব্যবহার করিতেন। আমরা গায়ে চাদর ব্যবহার করিতাম; তবে অধিকাংশ সময় কোমরেই আবদ্ধ থাকিত। কার্য্যোপলক্ষে, গ্রামান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, আমরা জোতা জোড়া হাতে নিয়া যাইতাম; পরে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে পা, ধুইয়া জুতা পায় দিয়া উঠিতাম। তখন আমাদের কালীগঞ্জের মুচীর তৈয়ারী জুতা ৵০ আনায় কিনিতাম। নূতন জুতা খরিদ করিয়া উহাকে দুইদিন পোয়া খানেক তৈলে ভিজাইয়া রাখিতে হইত; নচেৎ নরম হইত না। কাঁচা চামড়া দ্বারা জুতা প্রস্তুত হইত বলিয়া নূতন নূতন কয়েকদিন জুতা পায় দিয়া রাস্তায় বাহির হইলে, গন্ধে কুকুর পাছে ২ দৌড়াইয়া যাইত! তখন কাপড়ের ছাতি ছিলনা। বাঁশের ছাতির প্রচলন ছিল, কৃষকেরা ডাণ্ডাহীন ছাতি (পাতলা) ব্যবহার করিত। স্বর্গীয় কর্ত্তারা রাস্তায় বাহির হইলে, বেহারা প্রকাণ্ড আরাণী ছাতি মাথার উপর ধরিত। তাঁহারা গায়ে 'আঙ্গরাখা' ব্যবহার করিতেন। শীতের সময় তাঁহারা শাল, জামদানী, রাজাই প্রভৃতি পশমী বস্ত্র

ব্যবহার করিতেন। তখন মাথায় বাবড়ী রাখাই বিলাসিতা ছিল; ভদ্র লোকেরা বাবড়ী রাখিতেন। এখনকার পাটের ন্যায় সেকালে একবার সারঙ্গ ইক্ষুর চাষ হইয়া ছোট লোকের হাতে টাকা হইয়া ছিল। তখন কিছু দিনের জন্য তাহারা ও বাবু সাজিয়া ছিল। আমরা কবিতে গাহিয়াছি "এদেশে সারঙ্গ এসে ভদ্র লোকের ঘটল দায়। যত সব মুটে মজুর নেংটে দাড়ি গলফেস্ পড়ে বেড়ায়।" স্ত্রীলোকেরা নাকে নথ, বোলাক; কাণে কর্ণফুল; গলায় হাঁসুলী, কোমরে গুট, হাতে কঙ্কণ, মটর দানা ও চারি অঙ্গুলী প্রস্থ শাঁখা ব্যবহার করিতেন। পায়ে বেক্‌খাড়ু, গোলখাড়ু, পালংপাতা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির বাসনায় উল্কি ব্যবহৃত হইত। কাহারও কাহারও ললাটে নাসিকায়, কপোলে, চিবুকে ফুল লতাপাতাদি উল্কি দ্বারা অঙ্কিত দেখা যাইত। পুরুষেরা ললাট দেশে উল্কি দিয়া 'রাখাল ফোটা' অঙ্কিত করিত। নিম্নশ্রেণীর পুরুষেরা হস্তে নানাবিধ মাদুলী ব্যবহার করিত।

সামাজিক রীতি নীতি।

বয়ঃ বৃদ্ধেরাই, স্ব স্ব সমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের কথা অনুসারে সমাজ পরিচালিত হইত। কেহ কোনও সামাজিক অপরাধ করিলে তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করা হইত; তাহার হুকা বন্ধ করিয়া শাসন হইত। সময় ২ গ্রামে বৈঠক বসিত, তাহাতে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হইত। দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীতে দেখা শুনা হইত না। স্ত্রীলোকেরা গুরুজনের নাম মুখে আনিত না। কাহারও গুরুজনের নাম কালী থাকিলে কালী পূজার উল্লেখ করিতে হইলে মৈলা পূজা বলিত। তখনকার বউয়েরা অনেক সময় সামান্য কারণে শাশুড়ীর হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিত। স্ত্রীলোকেরা ছিকা পাকান, কাঁথা সেলাই করা, বাঁশ দ্বারা পাখা ও ডালা নির্ম্মাণ করা প্রভৃতি শিল্প কার্য্য করিত। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে তামাক খাওয়ার প্রচলন ছিল। নিম্নশ্রেণীর পুরুষেরা গাঁজা, চাণ্ডু প্রভৃতির ভক্ত ছিল।

চিকিৎসা ও পথ্য।

চিকিৎসাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বৃদ্ধ বলিতে লাগিল "দাদা! এখন যেমন উৎকট বিকট নামযুক্ত নানাবিধ রোগের নাম শুনিতে পাই, পূর্ব্বে তেমন শুনি নাই। পূর্ব্বের লোকেরা স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া চলিত কাজেই রোগও কম ছিল। ছেলে পেলের চিকিৎসা বাড়ীর প্রৌঢ়া গৃহিণীরাই সম্পন্ন করিতেন; ডাক্তার কবিরাজের বড় একটা আবশ্যক হইত না। জ্বর হইলে ৭ দিন লঙ্ঘন দিত; পরে আবশ্যক হইলে কবিরাজ ডাকিত। তখন কবিরাজ মহাশয়কে ৷৷০ আনা দর্শনী দিলেই চলিত এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা দুই টাকা দর্শনীর কমে পা' বাড়ান না। কবিরাজ আসিয়া "পাঁচ" করিত। তখন "নিমাই" একটা মহৌষধের মধ্যে গণ্য ছিল। অস্ত্র চিকিৎসায় আবশ্যক হইলে সাধারণতঃ নাপিত দ্বারাই সম্পন্ন করা হইত। এখন যেমন নানাবিধ পথ্যের কথা শুনিতে পাই পূর্ব্বে সে সব ছিল না। সাগু বার্লির অধিক প্রচলন ছিল না; আমরা রোগ হইলে মুগের যুস, খৈয়ের মণ্ড, চিঁড়ার মণ্ড প্রভৃতি পথ্য করিয়াছি। শিশুদিগকে গরম "আলুই" খাওয়ান হইত। তাহা গৃহিনীরাই নানা সজ মসলা দ্বারা প্রস্তুত করিতেন।

গান বাজনা।

পূর্ব্বেও গান বাজনার যথেষ্ঠ আদর ছিল। যাত্রা, ভাসান যাত্রা, কবি, গুড়মার গান, ভক্তিয়া, ঘাঁটু, বাই ও কাওলাতের গান হইত। তখন খেমটার প্রচলন ছিল না। পূর্ব্বের যাত্রা গানে রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, স্বপ্নবিলাস প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ের পালা গীত হইত। সে সব পালা শুনিয়া আমরা আসরে কান্দিয়া ফেলিয়াছি; আর এখনকার যাত্রা গান ত বুঝিতেই পারি না, শুধু লম্ফ ঝম্ফ দেখি! পূজা পার্ব্বণ ও উৎসবাদি উপলক্ষে তোমাদের বাড়ীতে পূর্ব্বে বিদেশ হইতে কবির দল আসিত; তখন কবি গানের খুব আদর ছিল। তবে তখনকার কবি গানে অশ্লীলতা বেশীছিল। দোলের সময় হোলির গান হইত। কবির মত উভয় দলের উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। হোলির দিন আবির ও কুঙ্কুমে সব 'লালে লাল' হইয়া যাইত। মাতিয়া হোলির

দিন পচা কাদা, মজা সুপারীর জলে গুলিয়া বাঁশের পিচকারী দ্বারা লোকের মুখে চোখে মারা হইত। কোনও ব্যক্তিকে মাটীয়া হোলির 'রাজা' সাজান হইত! রাজা বাহাদুরের কিছু আর্থিক প্রাপ্তি ছিল। তাহার পোষাক ছিল -মাথায় ভাঙ্গা খালই; মুখে কালী চুণ; গলায় ছেঁড়া জুতা ও ভাঙ্গা খরমের মালা! ছেলের দল রাজার সঙ্গে যাইত, তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই একটী করিয়া বাঁশের পিচকারী থাকিত। রাস্তায় ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে পিচকারী মারিত। রাজা বাহাদুর সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার সৈন্যগণ—ছেলের দল কর্ত্তৃক 'তলপ' দিতেন। গৃহস্থের নিকট অর্থ আদায় করা হইত এবং এইরূপে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা বয়স্থেরা নেশা খাইত আর ছেলেরা বাতাসা খাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিত। এখন "হোলির রাজা" নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে।"

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

পুত্রলাভ।

অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুরাশির ফেণোর্ম্মি বিমণ্ডিত ক্ষুদ্র দ্বীপের সৈকত ভূমিতে একজোড়া বালক বালিকা খেলা করিতেছিল। তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ সুকুমার বালকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রায় সমবয়স্কা শ্যামাঙ্গিনী বালিকা অভিমানের স্বরে বলিতে ছিল--"মেরু! আমার ঠোঙ্গা কাত হইয়া পড়ে কেন?"

মেরু, মেরা অথবা স্পষ্ট ভাষায় মেড়া সম্বোধন করিলে আমরা যে স্ত্রী জাতিকে অবধ্য বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিব, এতখানি তুষার-শীতল শোণিত প্রবাহের স্থান আমাদের ধমনীতে নাই। এক্ষেত্রে আমরা বীর্য্যবান্।

মেরু কিন্তু চটিল না একটু হাসিয়া কহিল "কি করিবে সমুদ্রের তরঙ্গের চোট সামলাইতে পারা কি একটা ঠোঙ্গার কাজ? আমরা ঠোঙ্গা জলে ভাসাইব--সমুদ্র তাহা এক ধাকায় কাত করিয়া ফেলিয়া দিবে—না হয় বালুর চড়ের উপর উঠাইয়া ফেলিবে।"

দুই জনের কথাবার্ত্তার মধ্যখানে তৃতীয়ব্যক্তি আসিয়া ডাকিল "মেরু—কেবল খেলবি—লেখাপড়া কর্‌বিনা। কানা ত অনেক শিখে ফেলেছে।

মেরু হাতে মাটী মাখিতে মাখিতে উত্তর করিল—"আমি কাণার নিকট সব শিখিয়া লইব।"

আগন্তুক বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "কাণা! তোরে যে বিদ্যা শিখান হইতেছে তা মেরুকে শিখতে দিবি না। আমরা তাকে অন্য বিদ্যা শিখাইব। আমরা যখন কেহই থাকিব না তোদেরে এই স্বর্ণ দ্বীপের রাজা রাণী করিয়া দিয়া যাইব। তোদের জয় জয়কার পড়িয়া যাইবে। চল্ ঘরে যাই।"

আগন্তুকের বিশালদেহ, মাথায় পৃষ্ঠাচ্ছাদিত দীর্ঘকেশ মুখমণ্ডল কর্কশ শ্মশ্রুতে আবৃত! লোকটা কদাকার চক্ষু দুইটী রেলের এঞ্জিনের আলোর মত। তাহার বলিষ্ঠদেহের গঠন দেখিলে পাথরের মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারিত।

(২)

"মেরু এর উপায় কি?"

বিস্মিত হইয়া মেরু কাণার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল অমন সুন্দর মুখখানিতে উদ্বেগের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট, চক্ষু দুটী বড় সশঙ্ক দৃষ্টিযুক্ত।

"কি কাণা কি হইয়াছে?"

"বড় ভয়ঙ্কর কথা।। আজ ভোর বেলা আমি তখনও শুইয়া আছি। চক্ষু দুটী মুদিয়া তোমাকে ভাবিতেছি এমন সময় শুনিলাম বাবার সঙ্গে আর একটা লোকের কি ফিসির ফিসির কথা হইতেছে। তোমার নামও বলে আমার নামও বলে। শেষটা শুনিলাম কিজানি কোন দেশের রাজার ছেলের সহিত আমার বিবাহ হবে। আমার বদলে বাবা অনেক ভাল ভাল জিনিস এবং একপাল জানোয়ার পাবেন। আচ্ছা মেরু বিবাহ হইলে কি আমি আর তুমি একত্রে এই খানেই থাকিতে পাইব না?"

"না কাণা। তোমাকে ঐ রাজার বাড়ীতেই যাইতে হইবে। আমি যাইতে পাইব না।"

"ইস্ তুমি যাইবেনা তবে আমিও যাইব না।"

মেরু উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর দুই বাহু প্রসারণ করতঃ কাণাকে আপন বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করিয়া সে কাণাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"কাণা! এখন আর আমরা বালক বালিকা নহি। কৈশোরও যায় যায়। তুমি মেয়ে মানুষ সব কথা বুঝিতে চেষ্টা কর না। গভীর চিন্তায় অধ্যয়ণকর, না হয় হাসিয়া ছড়া আওড়াইয়া দিন কাটাও। আমি আজ কয়টী বৎসর কেবলই ভাবিতেছি। কাণা—একটা কথা বলিব সাবধান যেন আর কেহ না শোনে। শুনিলে তোমারও বিপদ আমারও বিপদ।"

"বল মেরু—কি বলিবে।"

"তবে বসো—"

প্রণয়ী যুগল সেই সমুদ্রকূলে একবৃক্ষ ছায়ায় বসিল। মেরু কহিতে লাগিল—"কাণা" আমাদের চেহারা আর আমাদের প্রতি পালকের চেহারায় সাদৃশ্য কতটুকু ?"

"সবটুকুই। আমাদের শরীরে যা যা আছে, তাহাদেরও তাহাই আছে।"

"না তা নাই। আমাদের দেহের গঠন ও তাহাদের গঠন পৃথক। আমাদের মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে মিলেনা।"

"তাতে কি যায় আসে মেরু?"

"খুব যায় আসে। আমি দৃঢ়রূপেই বুঝিয়াছি আমরা দুইজন এই দেশের মানুষ নহি। কোনও গতিকে আসিয়া পড়িয়াছি। ইতিমধ্যে ইহারা একটী সুন্দরী বালিকাও চুরি করিয়া আনিয়াছে। ঠিক আমাদের মত চেহারা।" কাণা সবিস্ময়ে বলিল—"তবে আমরা কোন দেশের মানুষ গো! আর দেশ আবার কোথায় ?"

"কেন কাণা ঐ যে পাল উড়াইয়া বড় বড় তরীগুলি সমুদ্রে চলাফিরা করে ওরা কোথাও থাকেত নিশ্চয়।"

"হাঁ তা তো সম্ভবই।"

ওরা ভয়ে এদিকে আসেনা। আমি একদিন বাবার সঙ্গে নৌকায় চড়ে অনেক দূর সমুদ্রে গিয়াছিলাম তখন দেখিয়াছি আমাদের মত মানুষ আরও অনেক আছে। আর সেই দেশটা বড় সুন্দর।

"থাক্। আমরা এখানেই বেশ আছি।"

"কাণা! বেশত আছি। কিন্তু একথাটী ঠিক জানিও যে দিন তোমাকে আমার হাত ছাড়া করিবে সেই দিন আমি সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।"

"দুর! তুমি আমি দুই খানে থাকিতে পারি কি ?"

কাণা! এত বিদ্যা শিখিলি—কিন্তু ভাবিবার জন্য একটু সময় ব্যয় করিলি না। এখনও হৃদয় খানি নির্মেঘ উষার মত স্বচ্ছ রইল—কিন্তু যখন মেঘ উঠিবে তখন উপায় খুজিয়া পাইবি না।

'তবে কি করিতে বল।'

"চল্ পালাইয়া যাই।'

'ও মা—সে কি কথা।'

'ঠিক কথা।'

"আমার মনটা যেন বড় কেমন কেমন করে। কাণা তোর বয়স হইয়াছে। কিন্তু তবু বড় হলিনে। একটু বড় হ। এই দেখ আমার গলায় যে সোণার বড় মাদুলিটা, আমি সেটা খুলিয়া ছিলা'ম। তা'হাতে একখানি পাতলা পাতায় লাল অক্ষরে অনেক কথা লিখা। সে ভাষা এদেশের নয়। উহাতে কি লিখা আমি তা না বুঝিতে পারিলে শান্তি পাইব না। চল কাণা আমরা পালাই।"

"কবে, কখন।"

"আজই শেষ রাত্রিতে। যখন ওরা ঘুমাইতে আইসে। একখানা বেতের ডিঙ্গিতে চড়িয়া সমুদ্রে পাড়ি জমাইব।"

"পারিবে ?"

"পারিব। তুই তোর বইগুলি সঙ্গে লইবি মাত্র। আর কিছু না।"

(৩)

'মেরু!

'আবার মেরু! কেন আমার কি ভাল নাম নেই।"

'মুখে আসেনা—মেরু নামটাই বেশ।—মেরু কি সুন্দর এই দেশ। চারিদিকে এর শ্যাম সৌন্দর্য্য, নদীর নির্ম্মল জল রাশিতে সৌরকর খেলা, বিহঙ্গমের সুমধুর কাকলী আর স্বভাব সরল অধিবাসীগণের আনন্দ দা'য়ক ব্যবহার—দেখে আমার মনে হয় ইহাই স্বর্গ। আমরা

সম্পূর্ণ অচেনা দুটী প্রাণী আজ সারাটা বছর এই দেশটায় ঘুর্‌ছি, যেন সবাই আমাদের আপন। সব ঘরই যেন আমাদের নিজের। কি চমৎকার আতিথেয়তা। শিক্ষার কি উচ্চ আদর্শ! মেরু! চল আমরাও এখানে কুটীর তৈরি করি। আমরাও শিক্ষাদান করিব। এদেশের শিক্ষা প্রণালী এই একবছরে অনেকটা আয়ত্ত করেছি। কাণা, আমি যে পর্য্যন্ত না আমার পিতার সন্ধান পাই, যত দিন না তাঁর সহিত মিলিত হই, ততদিন আমার সকলি ব্যর্থ। কোথায় মালবদেশ—তা এদেশের নরনারী জানে না এক বছর ঘুরলাম—কত অধ্যাপকের নিকট পড়লাম—সবা'ই বলে—এটা বঙ্গদেশ। মালব দেশের সংবাদটী পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌লাম না। আমার মাদুলীটার ভিতরের পাতার লেখা এখন আমিও পড়তে পারি। বুঝিয়াছি, এই ভারতবর্ষেই সে দেশ। আমি মালব খুজে বাহির কর্‌ব।"

"তবে চল স্বামিন্!—কিন্তু কি সুন্দর দেশ ছেড়ে যাচ্ছি।"

"কেন প্রিয়তমা! যেখানে আবাল্য পালিত সেই সুন্দর দ্বীপ ছেড়ে আস্‌তে পার্‌লে, আর এই দু'দিনের জানা শুনা দেশটায় মমতা বসে গেল। চল্। মন ঠিক কর।"

(৪)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। সভাসদ্‌গণ নানা বিষয়িনী আলোচনা করিতেছিলেন। মহাকবি কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি কত উপদেশ মূলক শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে ছিলেন। নানাদিগ্ দেশাগত দর্শকবৃন্দ সভায় রাজ সম্ভাষণ করিয়া কৃতার্থ।

এমন সময় একটী সুন্দর যুবক রাজ সভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে অভিবাদন করিল। তাহার উত্তরীয় প্রান্ত ধরিয়া এক যুবতী আনত চক্ষে দণ্ডায়মানা। কালিদাস ঠাকুর আড় নয়নে এই সুন্দরীর পানে চাহিলেন—সম্ভবতঃ তাঁহার মনে হইতে ছিল।

"তন্বী শ্যামা শিখর দশনা পক্ব বিম্বাধরোষ্ঠী"

সভার সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া এই যুবক যুবতীকে দেখিতেছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে—কি চাও!

যুবক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল "মহারা'জ সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছি। মালব রাজ্যে বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিশেষ পরিচয় না পাইয়া এরাজ্যের অধিবাসী আমাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহেন না। আমরা ক্ষুৎপিপাসায় এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে সত্বর আমাদের বিশ্রাম ও আহার্য্যের ব্যবস্থা না করিলে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। নিতান্ত অসমর্থ না হইলে এমন সময় পত্নী সহ রা'জ সভায় প্রবেশ করিতে সাহসী হইতাম না।"

"তোমার পরিচয়?"

"আগামী কল্যকার সভায় আমায় পরিচয় দিব।" রাজা বিক্রমাদিত্য যুবক দম্পতীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

(৫)

এক জোড়া নূতন মানুষ আসিাছে শুনিয়া রাজ সভায় দেশের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই যুবক সভাতলে প্রবেশ করিল। তাহার উন্নত সুগৌর কান্তি, প্রশান্ত ললাট, প্রতিভা দীপ্ত নয়ন যুগল, আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় এবং সুবিন্যস্ত আস্কন্ধ বিলম্বিত কেশ পাশ দর্শকগণের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করিল। যুবক ধীরে ধীরে সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইয়া নতজানু হইল এবং রাজাকে অভিবাদন করতঃ সিংহাসন মূলে উপবেশন করিল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রথমেই যুবকের শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় চাহিলেন। যুবক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া সাহিত্য, গণিত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সুন্দর সুন্দর বিষয়ের কতিপয় সরল ব্যাখ্যা করিল। সভার পণ্ডিত মণ্ডলী যুবকের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য অনিমেষ নয়নে যুবকের মুখ দেখিতে ছিলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন—'যুবক এখন তোমার জাতি কুলের পরিচয় প্রদান কর।"

"মহারাজের সভায় জ্যোতির্ব্বিদ কেহ নাই কি? তিনিই বলিবেন।"

"আছেন— বরাহ!"

'বরাহ দাঁড়াইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিলেন।'

"উহু—ইনি পারিবেন না। ইঁহার গণনায় বড় ভুল হয়।'

"সাবধান যুবক। উজ্জয়িনীর সিংহাসন পার্শে দাঁড়াইয়া এই প্রগল্‌ভতা প্রাণদণ্ডের যোগ্য জান না।" বরাহের স্বরে যথেষ্ট ক্রোধের পরিচয় ছিল।

'আর ইহাও জানি যে এই রাজ সভায় সত্য সর্ব্বদা সমাদৃত।'

'তুমি ভুল প্রমাণ করিতে পার, প্রগল্‌ভ যুবক!'

'পারি।'

বিক্রমাদিত্য যুবকের মুখের দিকে নির্নিমেশ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

'কর'। বরাহের এই ক্ষুদ্র কথাটীতে উপেক্ষার ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

"আচ্ছা আপনার নিজের ছেলের জন্ম পত্রই আলোচনা করুন।"

'আমার ছেলে নাই।'

"নিশ্চয় আছে।"

"প্রগল্‌ভ বালক, তবে তুমিই বল।' আমি বলিতেছি আমার কোন ছেলে নাই।"

'ছেলে জন্মেই নাই কি?

"জন্মিয়াছিল মরিয়া গিয়াছে।"

'কবে?'

'জন্মিবার দিনই।'

"কবে জন্মেছিল বলিতে পারেন?"

'পারি।'

বরাহ পুত্রের জন্মদিন সময় প্রভৃতি নির্ণয় করিলেন।

'সেই পুত্র কিসে মরিল?'

'আমি তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছি।"

'কেন?'

"আমি গণনা করিয়া দেখিলাম তার জীবনকাল মাত্র ১০ বৎসর। দশ বৎসর পুত্রকে লালন পালন করিয়া যমকে উপহার দেওয়ার চাইতে তৎক্ষণাৎ দিলে দুঃখ কম হইবে. এই ভাবিয়া।"

'এজন্য ছেলেটাকে জলে ডুবাইয়া মারিলেন?'

'না ডুবাই নাই। একটা উৎকৃষ্ট আবরণীতে বদ্ধ করিয়া ভাসাইয়া দিয়েছিলাম।'

এখন একবার ঐ দিন, সময় নিয়া ঐ পুত্রের আয়ুষ্কাল পুনরায় গণনা করিয়া দেখুন দেখি।"

"অনাবশ্যক"

"ইহাই উজ্জয়িনী রাজ সভার জ্যোতির্ব্বিদ মহাপণ্ডিত বরাহের পরীক্ষা আমি দেখাইব, আপনার গণনায় ভুল হয়।"

বরাহের মেজাজ রুক্ষ হইয়াছিল। গণনা করিতে বসিয়া পুনরায় ভুল করিলেন। সেই দশ বৎসর।

যুবক চীৎকার করিয়া কহিল আবার সেই ভুল! দশের ডাইনে আর একটা শূন্য দিন্।

ঠিক ঠিকই বটে। বরাহ কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পরিতে লাগিল। তিনি কাঁদিয়া কহিলেন "হায়, মহারাজ আমি পুত্র হন্তা, আমায় শাস্তি দিন, কি কর্ম্মই করিয়াছি।" বরাহের চক্ষু দিয়া অবিরল জল পড়িতেছিল।

যুবক পুনরায় কহিল সেই পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন?

"ঠিক মনে নাই। প্রায় দুই যুগের কথা।"

"কিছু চিহ্ন ছিল।"

'হাঁ! ভূর্জ্জপত্রে আমার পরিচয়, পুত্রের নাম. জন্ম সময় সকলই লিখিয়া সোণার কবচে পুরিয়া তাহা পুত্রের গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছিলাম। কেন যুবক এতকাল পরে এ কথা; আমার পুত্র কি জীবিত আছে?"

বিক্রমাদিত্য বরাহের অশ্রুসিক্ত মুখ এবং যুবকের মুখ যুগপৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

যুবক কহিল—"ছেলে ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে পতিত হয়,। দ্বীপবাসী দস্যুরা তাহাকে পালন করে এবং নানাশাস্ত্র শিক্ষা দেয়। তাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। সেই যুবক পিতার অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে আসিয়া এক বৎসর কাল বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিয়া সে সম্প্রতি মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীতে আগমন করিয়াছে।"

'কৈ সে কৈ? আমি তাহাকে চাই।'

'একটু অপেক্ষা করুন. সে তাহার পত্নী সহ আগমন করিয়াছে। অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিলে পুত্রকে পাইবেন।'

'করিব। নিশ্চয় করিব, কৈ আমার মিহির কৈ?'

যুবক স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে কবচ খুলিয়া হস্তে দিয়া পিতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

পিতা পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর রাজসভায় পিতা পুত্রকে বরণ করিয়া লইল।

ব্রতের স্মৃতি।

'যম পুকুর'।

সে ছোট বেলার কথা। তখনও পিসী মা জীবিত। বাবা ও মা শৈশবেই ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পিসী মাও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

সেবার ধূম ধামের সহিত আমাদের বাড়ীর শারদীয় পূজা শেষ হইয়াছে। আমিও আমার ছোট, ভাই পারুল কত উৎসাহে কত আগ্রহে পূজা দেখিয়াছি। পিসীমা চক্ষে জল লইয়াও পিতৃপুরুষের বার্ষিক পূজা পার্ব্বন সকলই বজায় রাখিয়াছেন।

সে দিন বাড়ীতে আচার্য্য ঠাকুর আসিয়াছে। তার নিকট পিসীমা বলিলেন এবার মারুলের ব্রত তার জন্য কয়টা পুতুল তৈয়ারী করিয়া দিও।

শুনিয়া অবধি পিসীমার পিছু পিছু জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম কি ব্রত কর পিসীমা? তখন কত আগ্রহ কত উৎসাহ। সে উৎসাহ ও আগ্রহের ভিতর একটা ধর্ম্মভাব ছিল কিনা জানি না তথাপি আগ্রহ ও আবেগ এত বেশী ছিল যে পিসীমা আমার কথার জবাব না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সে দিন কোন তারিখ মনে নাই, বুঝিবার তখনও জ্ঞান হয় নাই। আচার্য্য ঠাকুর আসিয়া চারিটী কাক একটা চিল। একটা ছেলে কোলে মা রাখিয়া গেল। পিসী মা বলিলেন এই যমের মা। ইহারই পূজা কর্ত্তে হবে।

কয়েক দিন পর পিসী মা আদেশ করিলেন কাল থেকে তোমাকে যমপুকুর ব্রত কর্ত্তে হবে।

সে দিন আশ্বিনের সংক্রান্ত। প্রাতে যখন কাক ডাকিয়া গেল তখনই উঠিলাম। পিসীমা যাইয়া তুলসী তলায় একটা পুকুর কাটিলেন ও আমাকে তাড়াতাড়ি প্রাতঃস্নান করিতে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহার কথামত স্নান করিলাম। স্নান করিয়া ঘটী দিয়া এক ঘটী জল একটী পানা হাতে করিয়া আসিয়া দেখি পিসীমা উঠানে তুলসী তলায় পুকুর পারে আচার্য্যের প্রদত্ত পুতুল গুলি সাজাইয়া সম্মুখে একটা মুচির মধ্যে এক মুচি চাউল ও একটা সুপারি রাখিয়া দিয়াছেন। আমার ছোট ভাই পারুল ও অন্যান্য নিকটেই দাড়ান। আমি তাড়াতাড়ি পুকুরে জল ঢালিয়া পানা ছাড়িয়া দিলাম ও একটা তুলসী পাতা লইয়া পুকুরের জল নাড়িতে লাগিলাম। পিসীমা ব্রতের কথা বলিতে লাগিলেন।

সেই এক দিন যে কথাটী শুনিয়াছি তাহাই পরে আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। পিসীমা, আর নাই কিন্তু তথাপি তাঁহার কথাগুলি আজও ভুলিতে পারি নাই।

ব্রতকথা—

এক যে গৃহস্থ তার সাত ছেলে। বড় সংসার গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, ধনে জনে গৃহস্থের মত বড় আর সে গ্রামে কেও ছিল না। তার ছয় ছেলের বিবাহ হইয়াছে। এইবার ছোট ছেলের বিবাহ; খুব ধূম ধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। একটী ছোট দিব্বি সুন্দর বউ ঘরে আসিল।

সে বউটী যমপুকুর ব্রত করিত। আজ সেই আশ্বিনের সংক্রান্ত দিন। ছোট বউ যমপুকুর ব্রতের আয়োজন করিয়া তুলসী গাছের নীচে বসিয়া ব্রত করিতেছে এমন সময় শাশুড়ী দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তিনি "তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন" বউ একি করে! তাই আসিয়া সে ব্রতের উদ্যোগ পা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। বউ আর কিছু বলিতে সাহসী হইল না, শুধু কাঁদিতে লাগিল। বউ এর ব্রত ভাঙ্গা গেল; সঙ্গে সঙ্গে কুলক্ষণও দেখা দিল। আজ গোপালে গাই মরে, কাল বাছুর মরে; আজ চাকর মরে, কাল চাকরাণী মরে, চারিদিকে কেবল অমঙ্গল। দিন কয়েকের মধ্যেই গৃহস্থের স্ত্রী মারা গেল, মা মারা গেল। সাত পুত্রে খুব দান ধ্যান করিয়া ব্যয় বাহুল্য করিয়া মায়ের শ্রাদ্ধ করিল। করিলে কি হয়? মরিয়া এখন শাশুড়ী স্বর্গেও ঠাঁই পায় না, মর্ত্তেওনা জল পিপাসায় তিনি পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও এক ফোটা জল পাইলেন না।

শেষে দিন যায়, রাত যায়, আর পিপাসায় ছটফট করে। কোথায় যায়! পরে তার ছোট ছেলেকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, বাবা আমি বড় কষ্টে আছি, কোথাও এক ফোটা জল পাই না, যে খানে যাই জল শুকাইয়া

যায়। আমি বউমার যমপুকুর ব্রত ভাঙ্গিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দশা। বৌকে দিয়া যমপুকুর ব্রত করাও। এত ব্যয় বাহুল্য করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেও কিছু হইবে না।"

সেই দিন আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। যমপুকুর ব্রতের দিন। তখন তখন ছোট ছেলে ও বউ উঠিলেন। রোদ উঠিতে না উঠিতেই সোনার চিল কাক তৈয়ারী করিয়া ব্রতের উদ্যোগ করিলেন। ব্রত সমাপ্ত হইতে

যম পুকুর।

স্বপ্ন দেখিয়া ছোট পুত্র অস্থির। কি করে? তখন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল "মা আসিয়া আমায় বলিয়া গেলেন তিনি নাকি তোমার ব্রত ভাঙ্গিয়া ছিলেন? তা সে ব্রত আবার তোমায় কর্ত্তে হবে, নতুবা তিনি জল পিপাসায় ছটছট করিতেছেন।

না হইতে তার শাশুড়ী জল পাইতে লাগিলেন। এখন যেখানে যান প্রাণভরে পিপাসা মিটাইয়া জল পান করেন জল খাইয়া শাশুড়ী স্বর্গে গেলেন। সেই হইতে চারিদিকে যমপুকুর ব্রত ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীমতী—

সাহিত্য-সংবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখক সুসঙ্গের রাজকুমার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ বি, এ মহাশয় "মৃগনাভী" বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি আগামী পূজার পূর্ব্বেই মৃগনাভীর মধুর সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য প্রাঙ্গণ সুরভিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "ব্রতকথা" নববর্ষের প্রথম দিনে বাহির হইয়াছে। ব্রতকথা হিন্দু গৃহের নিত্য সহচর। গ্রন্থকারের শৈব্যা তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

প্রবীন সাহিত্যক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ শিশুদের জন্য "অঞ্জন" বাহির করিয়াছেন। অভিভাবকদের ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

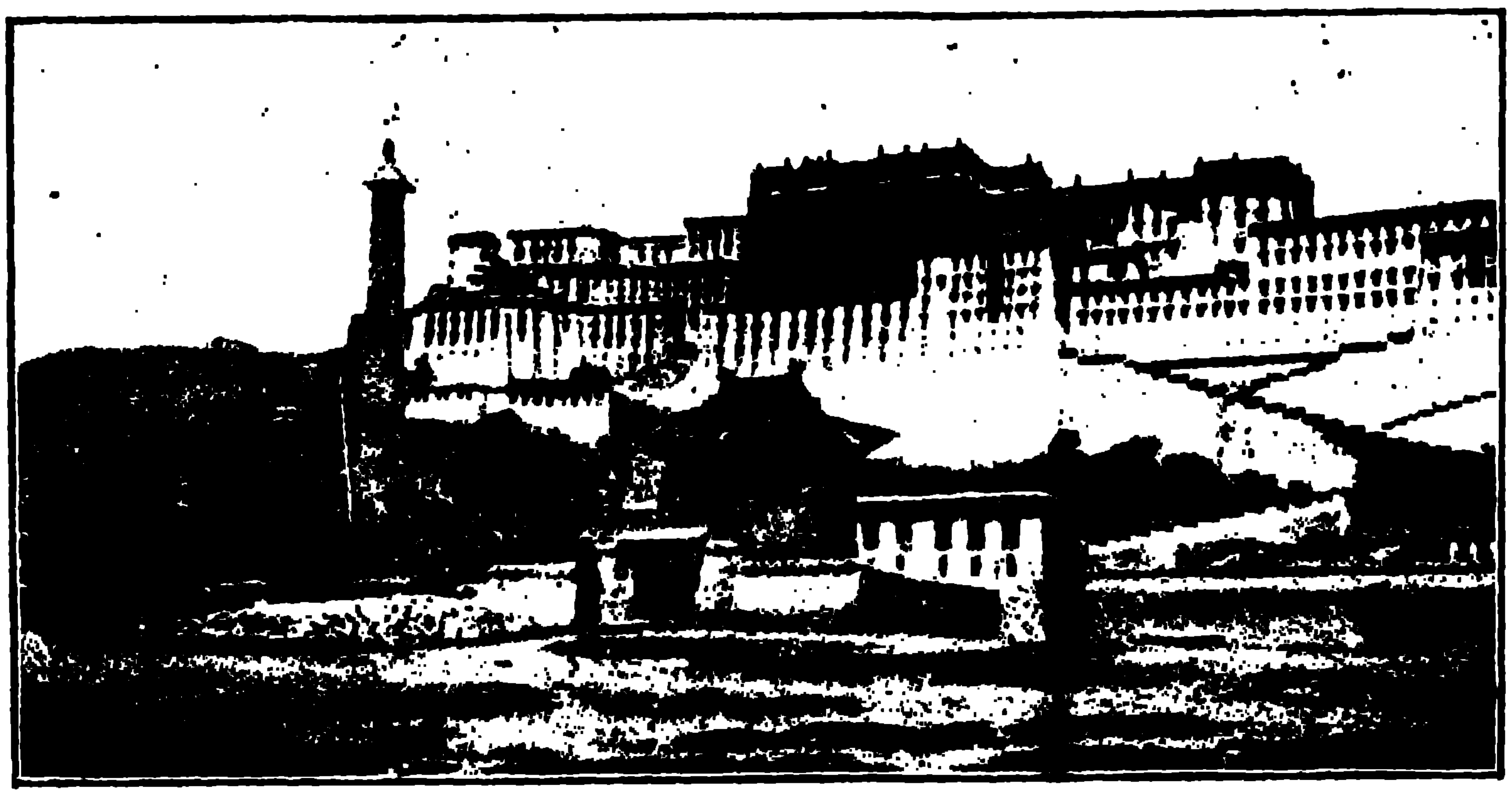

দলাইলামার রাজপ্রাসাদের সম্মুখ-দৃশ্য।

দূর হইতে দলাইলামার রাজপ্রাসাদ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩২২। { ৯ম সংখ্যা।

বৈষ্ণব দর্শন।

দর্শনের অনুশীলন সভ্য সমাজের একটী প্রধান কার্য্য। যুক্তিবলে তত্ত্ব নির্ণয়ই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য; অতএব আস্তিক নাস্তিক সাধারণের চক্ষেই দর্শনের সারবত্তা সমভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং দর্শন সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যে দর্শনে পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেই দর্শন আস্তিক দর্শন নামে অভিহিত, এবং যে দর্শনে পরলোক স্বীকৃত হয় নাই, সেই দর্শন নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। আস্তিক দর্শন প্রভৃত ভেদে বিভক্ত, তন্মধ্যে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই কয়টী দর্শন অনেকের নিকট ষড়্দর্শন বলিয়া পরিচিত। ষড়্দর্শন সমুচ্চয় নামক জৈনগ্রন্থে ষড়্দর্শনের অন্যপ্রকার সমন্বয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। হরিভদ্র সূরি উক্ত গ্রন্থে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, কাপিল, জৈন, বৈশেষিক ও জৈমিনীয়, এই ছয়টী দর্শনকে ষড়্দর্শন নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভক্তিপ্রধান পুরাণশাস্ত্রে অন্যপ্রকার ষড়্দর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে পুরাণসারবর্ণিত এই ষড়্দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা— "শৈবঞ্চ বৈষ্ণবং শাক্তং সৌরং বৈনায়কন্তথা।
স্কান্দঞ্চ ভক্তিমার্গস্থ দর্শনানি ষড়েবহি॥"

শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৈনায়ক অর্থাৎ গাণপত্য ও স্কান্দ ভক্তিপথের এই ছয়প্রকার দর্শন। যে দেবতার প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক যে দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই দর্শন তত্তদ্দেবতার নামানুসারে পরিচিত। ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার মনিভদ্র বৌদ্ধাদি দর্শনের এইপ্রকার নিরুক্তি দেখাইয়াছেন; "বুদ্ধ যাহার দেবতা, তাহা বৌদ্ধদর্শন, জিন যাহার দেবতা, তাহা জৈনদর্শন ইত্যাদি।"

আস্তিক দর্শনের মধ্যে হিন্দুদর্শন মাত্রই শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত; দার্শনিকদিগের মনীষাবলে এক শাস্ত্রেরই বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈত নাই। ইঁহারা সকলেই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভক্তি পথের দর্শনে পুরাণ প্রমাণের বাহুল্য সত্ত্বেও বেদ-স্মৃতি প্রভৃতি বিশেষরূপে অপেক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত তন্ত্রের সম্বন্ধও নিতান্ত অল্প নহে।

ভক্তি পথের উক্তষড় দর্শনের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনই অধিকতর পল্লবিত বলিয়া মনে হয়, এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত দর্শনানুযায়ি উপাসনা পদ্ধতির সহিত দর্শনান্তরের কোনও বিরোধ নাই। পঞ্চরাত্র গ্রন্থই এই দর্শনের মূলভিত্তি; অতএব এই দর্শন পাঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ ইহার লক্ষ্য; সুতরাং এই দর্শন ভাগবত নামেও কথিত হইয়া থাকে। এই মতে বিষ্ণুই সর্ব্বময়; তিনি জগতের কারণ ও জীবের আশ্রয়, অতএব এই দর্শন বৈষ্ণব নামেও কথিত হইয়া থাকে।

পঞ্চরাত্রানুযায়ী ভজন পদ্ধতি বৈষ্ণব দর্শনের সারবান অংশ বলিয়া মনে হয়। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে পঞ্চরাত্রের বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; বৌধায়ন

প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চরাত্রানুমোদিত অর্চ্চা-পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। এমন স্মৃতির গ্রন্থ প্রায় দেখা যায় না, যাহাতে দেবগৃহ দেবপ্রতিমা প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই। তন্ত্র পুরাণেও পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবেই নিহিত হইয়াছে। কাপিলাদি ষড় দর্শনের এবং ভক্তি দর্শনের প্রভেদ এই যে, ইহাতে স্থূলোপাসনার সারল্য এবং বাহুল্য দেখা যায়; এবং তৎপ্রসঙ্গে ভক্তির প্রকার ভেদও প্রতিমাদির বিবিধ তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরাশর সংহিতায় গৃহস্থের দৈনিক ষট্ কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে হোমের অনন্তর দেবপূজা বিহিত হইয়াছে, যথা –

"সন্ধ্যাস্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ষট্ কর্ম্মাণি দিনে দিনে॥"

এইরূপ অন্যান্য সংহিতায়ও স্থানে স্থানে দেবতা মাত্রের অথবা দেবতা বিশেষের দৈনিক পূজাবিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধবাচার্য্য পরাশর ভাষ্যে দেবতার একত্ব বহুত্ব বাদের সমাধান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রাণশব্দ বাচ্য পরমাত্মাই একমাত্র দেবতা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সর্ব্বব্যাপী এক দেবতা সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থান করেন। তিনি কর্ম্মের অধ্যক্ষ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান, সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ, কেবল ও নির্গুণ। বৈদিক মন্ত্র বিশেষেও কথিত হইয়াছে যে, কবি ব্রাহ্মণগণ পরমার্থত এক দেবতাকেই অনেক প্রকারে কল্পনা করেন, কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রবলেন, কেহ মিত্র, কেহবা বরুণ অথবা অগ্নিনামে নির্দ্দেশ করেন। কাহারও উক্তিতে তিনি দিব্য সুপর্ণ গরুড়, কেহবা এককেই বহু প্রকারে নির্দ্দেশ করেন, যেমন অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে, ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন দেবতার বাচক, এই সকল শব্দ এক দেবতাকে বুঝাইতে পারে না; কারণ যদি দেববাচক সমস্ত শব্দ একই দেবতাকে বুঝায়, তবে কি বারুণ যাগে অর্থাৎ বরুণ দেবতার যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্র দৈবত-মন্ত্রের প্রয়োগ হইতে পারে? ইহার উত্তরে মাধব বলিয়াছেন, এই দোষের অবসর নাই; কেননা দেবতার একত্ব সত্বেও মূর্ত্তি ভেদানুসারে মন্ত্রভেদ ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে। যেমন শৈবাগমে শিবের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, অথচ প্রতিমা ভেদানুসারে দক্ষিণামূর্ত্তি চিন্তামণি মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি মন্ত্রবিশেষ মূর্ত্তি বিশেষের জন্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে! অথবা বৈষ্ণবাগমে যেমন মূর্ত্তিভেদে একবিষ্ণুর গোপাল বামন প্রভৃতি বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যবস্থা দেখা যায়, বেদেও তেমন ব্যবস্থা হইতে কোনও আপত্তির কারণ নাই। একদেবতা হইতে কি প্রকারে ফলভেদ উপপন্ন হয়? এই আশঙ্কার ও অবসর নাই; কেননা উপাসনার প্রকার ভেদে ফলের তারতম্য হইতে পারে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" যেমন একই রাজা ছত্র-চামর প্রভৃতির দ্বারা সেবা বিশেষানুসারে বিভিন্ন ফলের ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ ছত্রগ্রাহীর চামর গ্রাহীর বেতনাদিগত যেমন তারতম্য হয়, বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের সেবক বর্গেরও তেমনই ফলতারতম্য বুঝিতে হইবে।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে স্বয়ং ভগবানের মুখে বৈষ্ণব দর্শনানুযায়ি পূজার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, হে পাণ্ডব! আমার সমস্ত পূজন-ক্রম শ্রবণ কর। স্থণ্ডিলে অষ্টাদশ পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমাকে স্থাপন করিয়া অষ্টাক্ষর অথবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র অথবা আমার সূক্ত ইহাদের অন্যতম মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। হে যুধিষ্ঠির! বৈখান সমতাভিজ্ঞ আমাকে পুরুষ সত্য অচ্যুত ও অনিরুদ্ধ এই সকল নামে নির্দ্দেশ করে। হে রাজন্! অন্য পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ-গণ আমাকে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ম্মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করে। এই সকল মূর্ত্তি এবং নাম ভেদে অন্যান্য যে সকল মূর্ত্তি আছে, সেই গুলিকে পরমার্থত অভেদ বলিয়াই মনে কর। পণ্ডিত ব্যক্তি এই প্রকারে আমাকে পূজা করিবে। ধর্ম্ম সূত্রকার বৌধায়নও দৈনিক বিষ্ণুপূজার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পূজা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা বৈদিকানুষ্ঠানে বিহিত হইয়াছে। বৌধায়ন কথিত বৈদিকানুষ্ঠানেও প্রতিকৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। সুতরাং পঞ্চরাত্রানুমোদিত মূর্ত্তি পূজার বীজ বেদেই নিহিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বেদের ব্রাহ্মণ বিশেষেও প্রতিমার নাম

দেখিতে পাওয়া যায়। বৌধায়ন বিহিত পূজায় ভগবান্ বিষ্ণু মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। যথা—

"অথাতো মহাপুরুষস্যাহরহঃ পূজন-বিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। স্নাত্বাশুচিঃশুচৌদেশে গোময়েনোপলিপ্য প্রতিকৃতিং কৃত্বা ফলপুষ্পৈর্যথ লাভ মর্চ্চয়েৎ" এই পূজায় স্বাগত প্রভৃতি উপচার দানে বৈদিক মন্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, 'হাতে শঙ্খ চক্র গদা বনমালা শ্রীবৎস গরুড় শ্রীসরস্বতী পুষ্টি ও তুষ্টি এই কয়টি আবরণের কল্পনা দেখা যায়। ছয়টি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা মহাপুরুষের স্নান সম্পাদন করিয়া জলের দ্বারা কেশব নারায়ণ মাধব গোবিন্দ বিষ্ণু মধুসূদন ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হৃষীকেশ পদ্মনাভ ও দামোদর, এই দ্বাদশ নামে তর্পণ বিহিত হইয়াছে।

বৌধায়ন এইরূপ বৈদিকানুষ্ঠানে শিবপূজারও বিধান করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, প্রতিমা স্থানে অর্থাৎ স্থিরতর প্রতিমাতে জলে ও অগ্নিতে পূজা করিতে হইলে আবাহন বিসর্জ্জন করিবে না, অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই সমান, এই কার্য্য মহৎ স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ। অগ্নি পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, জল অগ্নি হৃদয় সূর্য্য স্থণ্ডিল ও প্রতিমা, এই ছয় স্থানে মুনিগণ হরির পূজা বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্রিয়াবানদিগের দেবতা অগ্নিতে মনীষীদিগের দেবতা সূর্য্য মণ্ডলে, অল্পবুদ্ধিদিগের দেবতা প্রতিমাতে এবং যোগিদিগের হৃদয়ে হরি অবস্থিত আছেন।

প্রথিত যশা রামানুজ আনন্দতীর্থ নিম্বার্ক শ্রীনিবাসাচার্য্য কেশব কাশ্মীরিভট্ট বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ বিষ্ণুপক্ষে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর মত ভেদ সত্বেও পঞ্চরাত্রের উপজীব্যতা কেহই অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনা করিতে হইলে পঞ্চরাত্রের মুলমর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। এই মতে ভগবান বাসুদেব জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনি এক নিরঞ্জন জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি নিজকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করেন। এই চারি ভাগ যথাক্রমে বাসুদেবব্যূহ সঙ্কর্ষণব্যূহ প্রদ্যুম্ন ব্যূহ ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ, নামে অভিহিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বাসুদেব পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। বাসুদেবই পরাপ্রকৃতি, তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মঙ্গলকর গুণশালী বাসুদেবই পরং ব্রহ্ম, তিনি ভুবনের উপাদান এবং কর্ত্তা, তিনিই জীব-সমূহের সুখ দুঃখাদির নিয়ামক। সেই পরম কারুণিক ভক্তবৎসল পরম পুরুষ বাসুদেব স্বকীয় উপাসকবর্গের উপযোগি তত্তৎ ফলদানের অভিপ্রায়ে লীলাবশতঃ অর্চ্চা-বিভব-ব্যূহ-সূক্ষ্ম-অন্তর্যামী ভেদে পাঁচ প্রকারে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে প্রতিমা প্রভৃতি অর্চ্চা, রাম প্রভৃতি অবতার বিভব, সঙ্কর্ষণাদি বারিব্যূহ সম্পূর্ণ ষড়্গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী অর্থাৎ সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদের নিয়মনকারী। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনার দ্বারা পুরুষার্থ বিরোধি পাপ-নিচয়ের ক্ষয় হইলে, পর পরবর্ত্তি মূর্ত্তির উপাসনার অধিকার হয়। যে উপাসনার অভিপ্রায়ে ভগবানের বিভিন্নাকারে অবস্থান, সেই উপাসনা পাঁচ প্রকার, অভিগমন, উপাদান. ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। তন্মধ্যে বাক্য কায়মন সংযত করিয়া দেবতা গৃহে গমন অভিগমন নামে কথিত, দেবগৃহের ও দেব পথের মার্জ্জন লেপন প্রভৃতিও অভিগমনের অন্তর্গত, পূজোপকরণ পত্র পুষ্প নৈবেদ্যাদি সংগ্রহ উপাদান, ইজ্যা পূজা, অর্থ জ্ঞান পূর্ব্বক মন্ত্রজপ বৈষ্ণবসূক্ত স্তোত্রপাঠ নাম সংকীর্ত্তন ও তত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রানুশীলন স্বাধ্যায় নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং ধ্যান নামক দেবতার রূপ চিন্তা যোগনামে কথিত হইয়াছে। যিনি প্রদর্শিত উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান এই উভয়ের দ্বারা ভগবৎ পরায়ণ হন, সেই ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল পরমকারুণিক পুরুষোত্তম অনন্ত আনন্দ স্বরূপ স্বপদ প্রদান করেন।

স্থানান্তরে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, এই প্রকারে দৈনিক শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্মানুসারে উপাসনারত ভক্তের প্রতি ভগবান বাসুদেব তুষ্ট হন, এবং নিদিধ্যাসনরূপ ভক্তির দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তিনি ভক্তের কর্ম্ম সমূহ রূপ অবিদ্যা নিবৃত্তি করেন, তখন জীবের সংসার তিরোহিত

স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতিগুণ আবির্ভূত হয়। প্রদর্শিত পঞ্চরাত্রমতে ভক্তির জয় সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইয়াছে। সংপ্রতি অবান্তর ভেদ কথিত হইতেছে। রামানুজ প্রবর্ত্তিত দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈত নামে পরিচিত। ইহাঁর মতে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর, এই তিন প্রকার মূল পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে চিচ্ছব্দে জীব নিবহ কথিত হইয়াছে, ইহারা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন অথচ নিত্য, ইহারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়াও শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভোগ্য ভোগায়তন ভোগোপকরণ ভেদে ত্রিবিধ জড়জগৎ অচিৎ পদার্থ রূপে বিবেচিত হইয়াছে। চিদচিদাত্মক জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রামানুজ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত স্বকীয় ভাষ্যে বিশদ ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষ্যের উপক্রম পাঠেই জানা যায় যে, তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বৌধায়ন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভাষ্যের অবতারণা করিয়াছেন; সুতরাং বলিতে হয় বিশিষ্টাদ্বৈতের বীজ বৌধায়নাদির সময়েও ভক্ত সমাজে পরিচিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে অদ্বৈত বাদের অভ্যুত্থানে উক্ত মত বিপর্য্যস্ত হইলে রামানুজ তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

অদ্বৈত মতের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতের বিরোধ অতি প্রবল, এই মতে অদ্বৈতবাদিসম্মত বাক্যার্থ জ্ঞান অর্থাৎ বাক্য জন্য ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধি মাত্র মুমুক্ষুর অভিপ্রেত নহে; পরন্ত ধ্যানোপাসনাদি শব্দবাচ্য জ্ঞান অর্থাৎ যাহাকে ধ্যান নামে অথবা উপাসনাদি নামে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাই জ্ঞান শব্দে অভিহিত হইয়াছে, এবং বেদান্ত বাক্যের দ্বারা তাহার বিধান অভিপ্রেত হইয়াছে। তৈল ধারার মত অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণ প্রবাহ ধ্যান নামে এবং বেদন শব্দে উপাসনা কথিত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদেই বেদন শব্দে বাচ্য উপাসনা মোক্ষের সাধনরূপে উক্ত হইয়াছে। এই মত বাক্যকার সম্মত।

রামানুজ ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ, এই ত্রৈবিধ্যের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে জাগতিক যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্মের শরীর; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে পরমার্থতঃ এক ব্রহ্মই অবস্থান করিতেছেন; অতএব অভেদ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে এক ব্রহ্মই চিৎ অচিৎ নানা প্রকারে বিরাজমান, কাজেই তাঁহাতে ভেদাভেদ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; কারণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ চেতন ও জড় এক হইতে পারে না। কিন্তু উভয়ই যখন ব্রহ্মাত্মক তখন বাস্তবিক অভেদ মানিতেই হইবে। চিৎ অচিত ও ঈশ্বর এতত্রিতয়ের পরস্পর বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ইহাদের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহাঁর মতে জগতের বাস্তবিক সত্তা আছে, তথাপি ব্রহ্ম হইতে অভেদ নিবন্ধন অদ্বৈত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। জগদ্বিশিষ্ট হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন; অতএব ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উপেক্ষা করিয়া আনন্দতীর্থ দ্বৈতবাদ সমর্থক পূর্ণ প্রজ্ঞ দর্শনের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাঁর মতেও ঈশ্বরেরও জীবের সেব্য-সেবক ভাবসমর্থিত হইয়াছে, এবং ভক্তির জয় বিঘোষিত হইয়াছে। ইনি স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র এই দুই প্রকার পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে দোষলেশ হীন অশেষ সদ্‌গুণাধার ভগবান বিষ্ণুই স্বতন্ত্র, অন্যান্য পদার্থ অস্বতন্ত্র। ইহাঁর প্রদর্শিত প্রমাণটি এইরূপ—

"স্বতন্ত্র মস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্ব মিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু নির্দ্দোষোঽ শেষ সদ্‌গুণঃ"

ইনি ভক্তির বড়ই গোড়া। যুক্তিবলে রামানুজ সম্মত অভেদ বাদত খণ্ডন করিয়াছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ হেতুক উপনিষদ্বর্ণিত অদ্বৈতবাদের অন্যথাত্ব স্থাপনেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাঁর মতে জীবের পক্ষে "আমি ঈশ্বর" এই অভেদ কল্পনাও বিশেষ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইনি দেখাইয়াছেন যে যদি কোনও প্রজা নিজকে রাজা বলিয়া প্রচার করে, তবে রাজা তাহার উৎসাদন করেন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাজার স্তুতি করে, রাজা তাহাকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন।

"ঘাতয়ন্তিহি রাজানো রাজাহ মিতিবাদিনঃ।
দদত্যখিল মিষ্টঞ্চ সগুণোৎকর্ষবাদিনাম্॥"

ইনি আরও বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নতা লাভের লালসায় অদ্বৈত বাদিগণ বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষকে মৃগতৃষ্ণার মত তুচ্ছ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করেন, ইহা যেমন প্রচুর কদলি ফল খাইবার লোভে জিহ্বা ছেদন করা। আনন্দতীর্থ নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, এবং ইহাদের অনুকূলে যে সকল গ্রন্থ সেই গুলিরও শাস্ত্রত্ব স্বীকার করেন, তদতিরিক্ত গ্রন্থকে কুবর্ত্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। ইনি স্বমত সমর্থনের জন্য স্কন্দ পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাচ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূল রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানু কূল মেতস্যতচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতো হন্যো গ্রন্থ বিস্তারো নৈবশাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥'

এইরূপ অনেক বিষয়েই ইঁহার স্বতন্ত্র মত পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত ইঁহার সময় হইতেই বৈষ্ণব দর্শন সর্ব্বতোভাবে অদ্বৈতবাদের গন্ধ রহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইনি ব্রহ্ম সূত্রের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে যে সকল পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই গুলির সমষ্টিই একটি স্বতন্ত্র দর্শন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

প্রদর্শিত বিষয়ে এবং অন্যান্য অবান্তর বিষয়ে রামানুজের সহিত পূর্ণপ্রজ্ঞের বিরোধ সত্ত্বেও ঈশ্বরের সেবা বিষয়ে ফলতঃ পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইঁহার মতে সেবা সাধারণতঃ অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবন্নারায়ণের অস্ত্র প্রভৃতি চিহ্নধারণ অঙ্কন, অঙ্কনের উদ্দেশ্য চিহ্ন দর্শনে ভগবানের স্মরণ ও বাঞ্ছিতার্থ লাভ, এই সকল চিহ্ন বিশেষ ধারণের ফল ও মন্ত্র শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

স্বকীয় পুত্রাদির কেশব গোবিন্দ প্রভৃতি নামে ব্যবহার নাম করণ, সর্ব্বদা ভগবানের নামানুস্মরণই ইহার উদ্দেশ্য, অজামিলোপাখ্যান প্রভৃতিতে এই নামকরণের ফলবিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভজন সাধারণতঃ দশভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বাচিক চারিপ্রকার, সত্যবাক্য বলা, হিতবাক্য বলা, প্রিয়বাক্য বলা ও স্বাধ্যায়। কায়িক তিন প্রকার, দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। মানসিকও তিন প্রকার দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা, ইহাদের মধ্যে এক একটি সম্পাদন করিয়া ভগবানে সমর্পণ করিতে হয়।

ইঁহার মতে মুক্তাবস্থাতেও জীব ঈশ্বরের তুল্য হইতে পারে না, কারণ তখনও এতদুভয়ের বিরূপতা অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য বিলুপ্ত হয় না। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও পূর্ণ, জীব ক্ষুদ্র ও পরতন্ত্র; সুতরাং পূর্ণত্বাপেক্ষ নিবন্ধনও স্বাতন্ত্র্য পারতন্ত্র্য নিবন্ধন বিরূপতা থাকিয়াই যায়। এই বিষয়ে পরমা শ্রুতিই প্রমাণ, যথা—

"ন স্বরূপৈকতা তস্য মুক্তস্যাপি বিরূপতঃ।
স্বাতন্ত্র্য পূর্ণতেঽল্পত্ব পারতন্ত্র্যে বিরূপতা॥"

ইনি মুক্তি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে জীব সর্ব্বগুণপূর্ণ বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হইয়া, সংসার সম্পর্ক রহিত হইয়া দুঃখলেশরহিত আনন্দানুভব করে, এবং বিষ্ণু সমীপে সুখে অবস্থান করে। বিষ্ণু মুক্তজীব সমূহের আশ্রয়, তিনি তাহাদের অধিপতি, জীবসমূহ মুক্তাবস্থাতেও ঈশ্বরেরই অধীন, বিষ্ণু সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্য পূর্ণভাবে অবস্থান করেন। এই বিষয় মহোপনিষদে কথিত হইয়াছে।

"বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জ্জিতঃ!
নির্দুঃখানন্দভুগ্নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে॥
মুক্তানাঞ্চাশ্রয়ো বিষ্ণু রধিকাধিপতি স্তথা।
তদ্বশা এব তে সর্ব্বে সর্ব্বদৈব স ঈশ্বরঃ॥"

আনন্দ তীর্থ ভজনীয় বিষ্ণু হইতে ভক্ত জীবের পার্থক্য সমর্থনাভিপ্রায়ে "তৎত্বমসি" প্রভৃতি অভেদবাদি মহাবাক্যের অন্যপ্রকার উপপত্তি করিয়াছেন। ইনি দেখাইয়াছেন "তৎত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যে জীবেশ্বরের সাদৃশ্য মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে; সর্ব্বতোভাবে অভেদ প্রতিপাদন এই বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। এই বাক্যের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও দেখাইয়াছেন, তাহাতে "স আত্মাতৎত্বমসি শ্বেতকেতো!" এই স্থলে অকারপ্রশ্লেষ করিয়া—"অতৎত্বং অসি" এই প্রকার পাঠ কল্পনা করিয়া জীবেশ্বরের অত্যন্ত ভেদ প্রতিপাদনে এই বাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। পরিকল্পিত পাঠের ব্যাখ্যাটী এইরূপ,—স্বাতন্ত্র্যাদিগুণবত্তানিবন্ধন সেই ঈশ্বরই আত্মা, তোমাতে সেই সকল গুণ নাই; অতএব তুমি অতৎ অর্থাৎ

তাহা নহে। এইরূপ অভেদ মতসমর্থক একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান শ্রুতি'রও ভেদবাদ সমর্থনেই তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যাখ্যা-কৌশল দেখাইতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে; অতএব তাহা উপেক্ষিত হইল।

ভক্তের সাময়িক রুচি অনুসারে ভগবানের বিশেষ বিশেষ লীলাব্যঞ্জক মূর্ত্তির উপাসনা উদ্‌ভাবিত হয়; তদনুসারে ভক্তদার্শনিকগণও দর্শনের ধারা স্বকীয় উপাস্যের দিকেই প্রবাহিত করিয়া থাকেন, ক্রমনিবদ্ধ বৈষ্ণব দর্শনে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যান কার্য্যে অনেক ভক্তই ব্যাপৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বিষ্ণু বাসুদেব প্রভৃতি মূর্ত্তি বিষয়েই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তি দার্শনিক গোপবেশ কৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রতিই সূত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। গোবিন্দ ভাষ্যে ইহার বিশেষ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে অথর্ব্বশিরো নামক উপনিষদে কোথাও গোপরূপ তমালশ্যামলবর্ণ পীতবসন ধারী বংশীধারী গো-গোপ-গোপীপরিবৃত গোকুলাধিদৈবত ব্রহ্মস্বরূপ পঠিত হইয়াছে। এমন কি, গোবিন্দ ভাষ্যকার মাধুর্য্যপূর্ণ লীলাও বেদান্তভাষ্যে উপন্যস্ত করিয়া ভক্তের হৃদয় পরিষ্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণলীলার মধুরিমা বেদান্তভাষ্যে নিহিত করিয়া ভক্তের হৃদয়ে এক অভিনব ভক্তি-পীযুষ-তরঙ্গিনী প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার লিপি ভঙ্গীতে যেন অমল ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি রচনা কৌশলে বেদান্ত দর্শনের নীরস তর্ক পাদকেও সরস করিয়া তুলিয়াছেন। তর্ক পাদ ভাষ্যের উপক্রমে তিনি বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ দ্বৈপায়নং নৌমি যঃ সাংখ্যা দ্যুক্তি কণ্টকান্।
ছিত্ত্বা যুক্ত্যাসিনা বিশ্বং কৃষ্ণক্রীড়া স্থলং ব্যধাৎ"॥

যিনি সাংখ্যাদির উক্তিরূপ কণ্টকাবলীকে যুক্তিরূপ খড়েগর দ্বারা ছেদন করিয়া বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াস্থল করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করি। এই কবিতার তাৎপর্য্য বড়ই ভক্তিরস পূর্ণ; যে পর্য্যন্ত কূটতর্ক জনিত পরিপন্থিজ্ঞান উচ্ছিন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধক ভগবানের বিবিধলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং ভূতলাবতীর্ণ ভগবানের চরিত্রের একটা সম্ভবাসম্ভবের বিচার উপস্থিত হয়; তাহার ফলে শাস্ত্রার্থ বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল কণ্টক তুল্য শাস্ত্রের উন্মূলন করিয়া ভগবান ব্যাস সংসারকে কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্র করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবানের সমস্ত লীলাতেই ভক্তের সরল বিশ্বাস স্থাপিত হইবার বাধা বিদূরিত করিয়াছেন। উক্ত ভাষ্যকার "রসোবৈস" এই শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণনে বলিয়াছেন যে, উপাস্য যাদৃশরূপের দ্বারা উপাসকবর্গ ভগবল্লীলারস অনুভব করিতে পারে, ভগবান অচিন্তনীয় শক্তির দ্বারা তাদৃশ রূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। ইঁহার মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই পরমার্থতঃ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য; অতএব ভাগবতানুযায়ী ব্যাখ্যাই সূত্রকার সম্মত, ভাগবতে অহৈতুকি ভক্তির নিরতিশয় মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ও সরল বিশ্বাসের অপ্রতিহত প্রভাব বিঘোষিত হইয়াছে, গোবিন্দভাষ্যে ব্রহ্মসূত্র ভাগবতের একতানতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্নাকার ব্যাখ্যা দেখিয়া "ব্যাখ্যা বুদ্ধবলাপেক্ষা সানোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী" কবিপ্রবর শ্রীহর্ষের এইকথা মনে উদিত হয়। বাস্তবিক ব্যাখ্যা বুদ্ধি বলের অপেক্ষা করে, অতএব যে ব্যাখ্যা সুখদায়িনী সে ব্যাখ্যা উপেক্ষণীয় নহে।

এই সকল ব্যাখ্যার মূলেই শ্রৌতস্মার্ত্ত প্রমাণের অসদভাব নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কৃষ্ণ চরিত্র দেখিয়া ইদানীন্তন কতিপয় ভক্ত ভজনীয়ের কলঙ্ক ভঞ্জন কামনায় ভাগবতাদি বর্ণিত রাসলীলার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে প্রয়াসী কেহবা ইহার আধ্যাত্মিকতা সম্পাদনে নিরতিশয় সাহসী, কিন্তু পুরাণ কবির পুরাতন রুচিতে রাসলীলা অরুচিকর বলিয়া প্রতিভাত নাই; সেই জন্যই মহাকবি কালিদাস ভাগবতের সহিত সুরমিলাইয়া পুষ্পবান বিলাসের মঙ্গলাচরণে প্রকট রাসলীলারই বর্ণনা করিয়াছেন।

কবিপ্রবর মাঘও অসুর ভাবাপন্ন শিশুপাল-দূতের মুখে শ্লেষপূর্ণ কবিতায় রাসলীলা সূচনার অবসর পরিত্যাগ

করেন নাই। এমনকি নৈয়ায়িক প্রবর বিশ্বনাথও গ্রন্থোপক্রমে অভীষ্ট দেবকে "গোপবধূর দুকূল-চৌর" বিশেষণে ভূষিত করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলি বিবৃতি কার হরিদাসকেও গোপতনয়ের চরণ তলে লুণ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

বৈষ্ণব দার্শনিক সম্মত এই মাধুর্য্য পূর্ণ লীলারস ক্রমে বৈষ্ণব কবির কাব্যে মিশ্রিত হইয়া জগতে এক অপূর্ব্ব প্রেমের কথা প্রবাহিত করিয়াছে। তাহারই ফলে আজ ত্রিতাপ পীড়িত সংসারাসক্ত মানবও প্রসঙ্গতঃ মধুর কৃষ্ণ লীলা শ্রবণে, শ্রবণ বিবর পবিত্র করিতে সমর্থ হইতেছে।

ভগবানের অনন্ত মূর্ত্তির মধ্যে কোন যুগে কোন দেশে কাহার উপাসনা বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে, সে কথা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোনও উপায় নাই। আজ বাঙ্গালার মাটী খুঁড়িয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি পাইতেছি না—সুতরাং ইঁহারা অর্বাচীন আগন্তুক, অমর কোষে রাধাঠাকুরাণীর নাম নাই—অতএব ইঁহার প্রসঙ্গ অমর কোষের পরবর্ত্তি কালে উদ্ভাবিত হইয়াছে, এমত বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কারণ সাধারণের অপরিচিত অভিধানে অপরিগৃহীত অনেক দেবতার পরিচয় শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ জ্যেষ্ঠা দেবীর নাম উল্লেখ যোগ্য। শারদা তিলক প্রভৃতি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে ইনি ত্রিশক্তির অন্যতম রূপে পরিচিত, বাণভট্টের কাদম্বরীতে ইহার তাৎকালিক বিশেষ প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞান মার্গের পথ প্রদর্শক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ভক্তি প্রধান বৈষ্ণব দর্শনের সরল উপাসনাংশ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্ম সূত্রের তর্কপাদের ৪২—৪৫ সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাগবত দর্শনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পঞ্চরাত্রাভিমত অভিগমনাদি উপাসনার সহিত আমাদের কোনও বিবাদ নাই, এবং উপাসনার দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ ফলও আমাদের অভিমত, পরমাত্মা নারায়ণ সর্ব্বাত্মা, তিনি নিজেকে অনেকাংশ বিভক্ত করিয়া জগদ্ব্যাপকরূপে অবস্থান করিতেছেন, একথাও শ্রুতিসম্মত, সুতরাং বিরুদ্ধ নহে। ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, একথাও বিবাদ শূন্য, কেবল বাসুদেব পরমাত্মা হইতে জীবস্বরূপ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির উৎপত্তি কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ; সুতরাং স্বীকার করা যায় না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

অগোচর।

তোমায় আমি কি দেব যে, কি যে আমার আছে?
ভয় করিগো মানে তোমার আঘাত লাগে পাছে!
ভয় করিগো দেবার বেলা,
দেখাও যদি অবহেলা,
ফিরাও যদি নয়ন দুটি নীরব উপহাসে!

একটুখানি গান আছেগো, একটু আছে সুর,
তাই দিয়ে এ শূন্য হিয়ে করেছি ভরপুর।
অনেক কাঁদা অনেক হাসি,
অনেক ভালবাসা বাসি,
এরেই নিয়ে অনেক গড়া, অনেক ভাঙ্গাচুর।

তোমায় শুধু শুনতে হবে একটু খানি হেসে,
শুনতে হবে একটু খানি চোকের জলে ভেসে।
হাসির পরে তোমায় সবে
হাসিখানি রাখতে হবে,
আঁখির জলধারে যেন আঁখির জল মেশে।

একলা যবে আঁধার পথে ফিরে যাব ঘরে,
তখন তব চোখে প্রিয় পলক যেন পড়ে।
উৎসবেরি কলরবে
কুটীর যবে মুখর হবে,
হেলার হাসি তখন যেন ফোটে নয়ন পরে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

তিব্বত অভিযান।

জীব-জন্তু প্রভৃতি।

তিব্বতে বানর অধিক নাই। লাসা এবং ইহার চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পুচ্ছহীন এক প্রকার মর্কট দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম, ইহারা তিব্বতের আদিম অধিবাসী নহে। ডারউইন্ সাহেব এদেশে আসিলে হয়ত ইহা-দিগকে তিব্বতীয় দিগের পূর্ব্ব পিতামহ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতেন। বাস্তবিক, নিম্নশ্রেণীর তিব্বতীয়দিগকে এই মর্কট জাতি অপেক্ষা অধিক উন্নত বলিয়া মনে হয় না। এই মর্কটেরা নাকি কোনও সময়ে ভুটান হইতে আনীত হইয়াছিল। এদেশের ভাষায় ইহাদিগকে টিউ বলে।

ব্যাঘ্র—পূর্ব্ব তিব্বতের স্থানে ২ দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম টেক্গং।

তুষার চিতা—ইহারা তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর বাস করে। ইহারা সচরাচর মানুষের কাছে ঘেঁসে না। তিব্বতীয় ও নেপালী ভাষায় ইহারা জিক্ এবং ঠরুয়া নামে প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত, নেকড়ে বাঘ, ভোঁদর, ভল্লুক, হরিণ, মৃগনাভি, বারশিঙ্গা হরিণ, নীল বর্ণের মেষ, ইয়ক্ (একপ্রকার বলদ), বন্য গর্দ্দভ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু তিব্বতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে নেকড়ে বাঘ এবং ভল্লুক ছাড়া আর সকলেই অনেকটা শান্ত প্রকৃতির। নেক্ড়ে বাঘেরা যে কি প্রকার ভীষণ হয়, তাহা আমি যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি।

এখানে ঈগল, চীল, পেচক, চাতক, পারাবত, সারস, হংস, রাজহংস, প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তিব্বতে উপস্থিত হয়। বরফ পড়িবার কিয়দ্দিবস পুর্ব্বে ইহারা ভারতবর্ষ অভিমুখে গমন করে। যে সকল হ্রদের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল ভ্রমণকারী পক্ষী (migratory birds) তাহাদের তীরে বাসা নির্ম্মাণ করে।

পথ ঘাট।

তিব্বতে বহুতর নদনদী আছে বটে, কিন্তু দেশ পর্ব্বত-ময় বলিয়া যাতায়াতের পক্ষে সে স্থান বিশেষ সুবিধাজনক নয়। এই সকল বড় বড় নদীতে যদি নৌকা এবং ষ্টিমারের গমনাগমন সম্ভব হইত, তাহা হইলে আজ এস্থান প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্য স্থল হইত। দেশে পাকা রাস্তারও অত্যন্ত অভাব। বাণিজ্য এবং ভ্রমণকার্য্য পার্ব্বত্য টাটু ঘোড়ায় সম্পন্ন হয় বলিয়া এদিকে গভর্ণমেণ্টের আদৌ দৃষ্টি নাই। লাসার প্রধান রাজপথ —লিংখর।

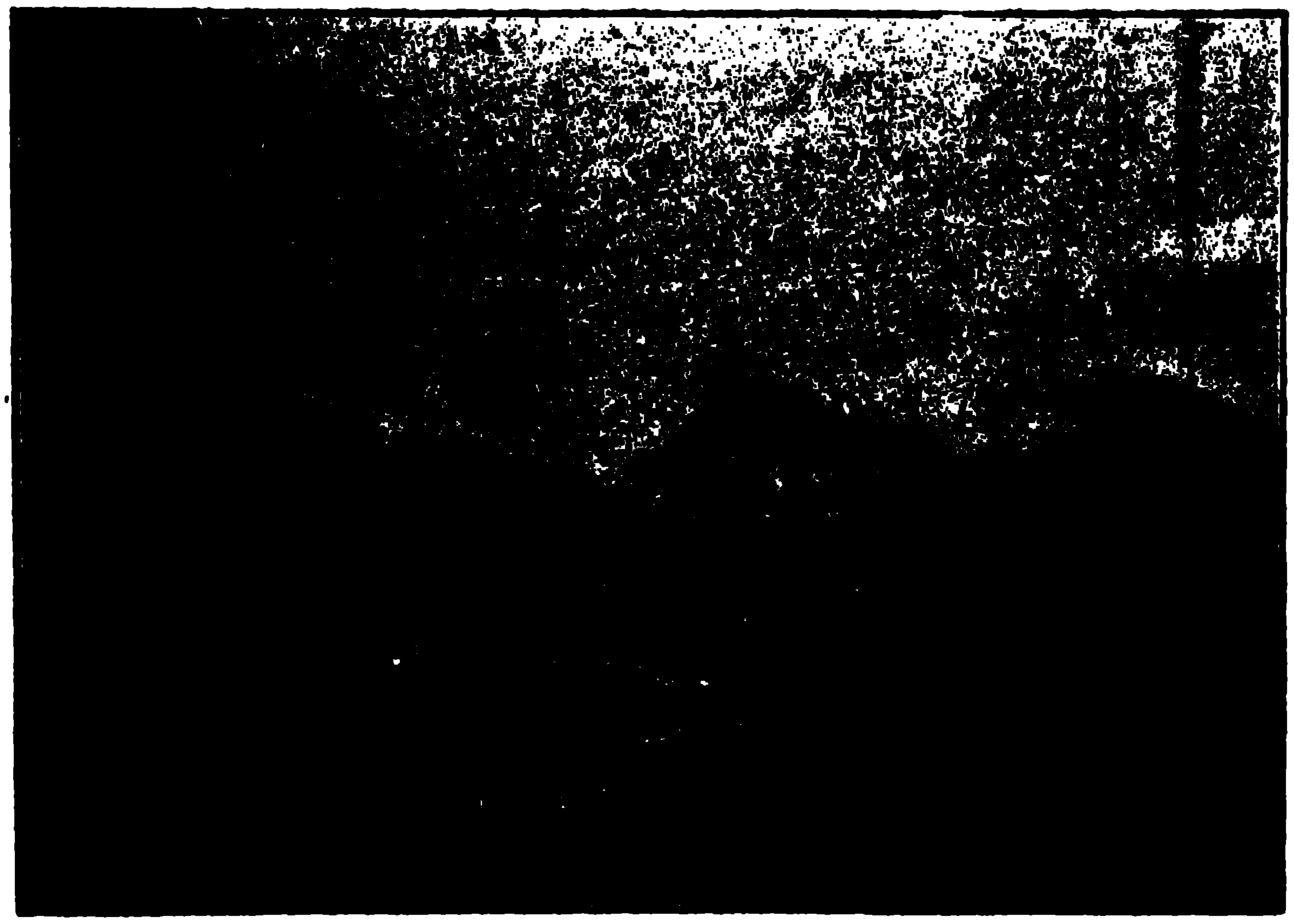

তিব্বত প্রান্তরে মেষ।

বন্য মার্জ্জার—ইহা তিব্বতের সর্ব্বত্র আছে। তিব্বতীয় ভাষায় ইহা—ঊ।

প্রাচীন মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়।

লাসায় গমন করিবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে আমরা সহরের সমস্ত মঠ এবং দলাইলামার প্রাসাদ দেখিবার আদেশ পাই-লাম। দলাইলামা সহরে ছিলেন না। সেই জন্য বড় অথান্ ঐ হুকুম দিলেন। আমরা আর কালবিলম্ব না

করিয়া সেই দিনই সহরের সর্ব্ব প্রধান মঠ দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। সমগ্র তিব্বতের মধ্যে ইহাই নাকি সর্ব্বপ্রধান।

ঠিক ফটকের সম্মুখে এক প্রস্তর স্তূপ দণ্ডায়মান। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে লাসায় একবার ভীষণ বসন্ত রোগের আবির্ভাব হয়। ইহাতে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য চীন সম্রাটের আদেশে সহরে কয়েকটী হাঁসপাতাল ও প্রস্তর স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই সকল স্তম্ভের উপর বসন্ত রোগ নিবারণ সম্বন্ধে অনেক গুলি উপদেশ খোদিত আছে। এইজন্য ইহারা বসন্ত-স্তম্ভ নামে প্রসিদ্ধ। একটি স্তম্ভ এই মঠের দ্বারের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তিব্বতের কৃষক ইয়ক দ্বারা চাষ করিতেছে।

কয়েকটি দালান এবং কক্ষ হইয়া আমরা মঠের প্রধান কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। ইহা অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। শুনিলাম, ইহা ৬৪২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব এবং আরবে ইসলামের প্রথম জন্ম হয়। ঐ সময়ে তিব্বতের সিংহাসনে শ্রংতান উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নেপালরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ রাজকন্যা কয়েকটী বৌদ্ধমূর্ত্তি নেপাল হইতে শ্বশুরালয়ে লইয়া যান। তাহাদের রক্ষার জন্য এই কক্ষ নির্ম্মিত হয়। এই কক্ষের প্রধান প্রবেশ দ্বার পশ্চিম দিকে। তাহাতে বিশেষ কোনও কারুকার্য্য দেখিলাম না। এই দ্বারের সম্মুখে এক পাথরের দালান—ইহার অনেক স্থান অদৃশ্য হইয়াছে।

ঐ দালানে বহুতর যাত্রী উপস্থিত দেখিলাম। তাহাদের অধিকাংশের মুখে যে প্রকার ব্যাকুলতা, যে প্রকার ভক্তিগদগদ ভাব, তাহা ভারত ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব য়ুরোপীয়-দিগের নিকট এ প্রকার ধর্ম্মভাব হয়ত বাতুলতা বলিয়া অভিহিত হইবে। আমরা যখন প্রথম উপস্থিত হইলাম, তখন প্রধান কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই। যাত্রীরা অতি ব্যাকুলভাবে দ্বারের সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান। অনেকে দেখিলাম, ক্রমান্বয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে। আমার সহিত কয়েক জন সাহেব ছিলেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া পরস্পরের গা টিপিয়া হাসিতেছিলেন। এই জন্যই আমাদের বহুদর্শী ঋষিরা বলিয়াছেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত অর্থাৎ অতি গুহ্য। সকলের ধাতে সহ্য হয় না।

অল্পক্ষণ পরেই দ্বার খুলিল। দ্বারের সম্মুখে প্রথমে নাটমন্দির। ইহার বামদিককার একটী কক্ষে দলাই-লামার প্রধান সিংহাসন রক্ষিত থাকে। নাটমন্দিরের উভয়দিকে আর একটী ক্ষুদ্র দালান। এইখানে দেবতার জন্য আনীত উপহার দ্রব্য রাখা হয়। ইহার ঠিক সম্মুখে এক ক্ষুদ্র মন্দির। ইহার মধ্যে লাসার বরুণদেবের মূর্ত্তি। ইহার ঠিক উত্তরে আপল মন্দির। বরুণ দেবের মন্দিরের ভিতর দিয়া যাইবার পথ ছিল না

বলিয়া আমাদিগকে বামদিকে গমন করিতে হইল। একটী ক্ষুদ্র পথে আমরা প্রথমে পশ্চিমদিকে গিয়া আবার উত্তরে ফিরিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া পরে আবার পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

মন্দিরটি খুব বৃহৎ ও উচ্চ। ইহার উত্তরদিকে পর্দ্দা ফেলা রহিয়াছে। পর্দ্দার বাহিরে দুইদিকে দুইটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিককার মূর্ত্তিটি খুব বিশাল। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে রাশীকৃত ফুল। কক্ষের চারিদিকে দেয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। শুনিলাম, ইহাদের সংখ্যা ঠিক এক সহস্র। ইহার পর আমরা প্রধান মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি একবার দর্শন করিলে আর জন্মলাভ করিতে হয় না।

এই সময়ে কয়েক জন লামা দেবতার পার্শ্বে বসিয়া সুস্বর লহরী তুলিয়া কোনও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। শুনিলাম, দেবতার সম্মুখে দিনরাত্রি এই প্রকার পাঠ হয়। আমরা নিতান্ত একালের লোক, তাহার উপর একটু আধটু ইংরাজিও শিখিয়াছি। হয় ত সেইজন্য দেবতা দর্শনে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। শাক্যসিংহ যে সময়ে সংসার আশ্রম ত্যাগ করেন, মূর্ত্তিটি নাকি সেই সময়ের। চীনের কোনও প্রসিদ্ধ কারিকর ইহা প্রস্তুত করিয়াছে। সেইজন্য মুখ চীনার মত হইয়াছে। কারুকার্য্য হিসাবে ইহাপেক্ষা অনেক ভাল ভাল বৌদ্ধমূর্ত্তি যে আমি সিংহল ও বর্ম্মায় দেখিয়াছি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে বোধ হয় ২০।৩০ হাজার টাকার অলঙ্কার আছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট ইহা অত্যন্ত সম্মানের জিনিস। কত শত রাজা, মহারাজ আসিয়া যে ইহার চরণতলে সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢালিয়া দেন, তাহার অন্ত নাই। এইভাবে কত শতাব্দী চলিয়া আসিতেছে। দেবতার আসন সমস্তই রৌপ্য নির্ম্মিত। কক্ষের মধ্যে প্রায় ৪০০ বাতি জ্বলিতেছে। বাতিদান গুলাও খাঁটি রূপার। এই সব দেখিয়া একজন সাহেব বলিয়া উঠিলেন "অর্থের কি বিষম অপব্যয়! ইহা যদি সমস্ত বাণিজ্যে লাগান হইত, তাহা হইলে জগতের কত উপকার হইত।" আর একজন বলিলেন, "কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত, ইহারা অসভ্য।"

ইহার পর আমরা মন্দিরের দ্বিতলে উঠিলাম। তথায় প্রথমেই এক কালিকা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

লিংখর বা পবিত্র রাস্তা।

এই ঘোর বৌদ্ধ দেশে আমাদের এই রক্ত পিপাসিনী দেবীটি যে কি প্রকারে প্রবেশ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম, বৌদ্ধেরা সকলেই ইঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত পূজা করেন। ইঁহাকে সকলে এত ভয় করে যে সহজে কেহ ইঁহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন না। তিব্বতীয়দিগের বিশ্বাস জগতের যাহা কিছু অমঙ্গলকর ও ভীষণ, তাহা ইঁহা দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইঁহার মূর্ত্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ মৃত দেহের চর্ম্মদ্বারা আবৃত; ইনি নর কঙ্কাল ভোজনে নিযুক্তা। দেবীর চারিদিকে নানাপ্রকার পীড়ার মূর্ত্তি। কক্ষের চারিদিকে নানাপ্রকার অস্ত্রাদি, কারণ, ইনি যুদ্ধের দেবী। দেবী

একটা খচ্চরের, উপর আসীনা। প্রত্যহ মানুষের মাথার খুলিতে মদ ভরিয়া দেবীর ভোগ দেওয়া হয়। ইহাঁর ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে আর একটি দেবী মূর্ত্তি। ইহাঁর মূর্ত্তি অতি সুন্দর, অনেকটা আমাদের কমলা মূর্ত্তির ন্যায়। আমার অনুমান মিথ্যা হইল না। শুনিলাম ইনি সৌভাগ্য বা লক্ষ্মী দেবী।

উপর তালায় আরও অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে নানা আকারের দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। আমাদের গাইডের মুখে ইহাঁদের বর্ণনা শুনিয়া বেশ স্পষ্ট বোধ হইল যে, কোনও সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ইহাঁরা এই পার্ব্বত্য দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। যে ভারত এ দেশকে একেশ্বর বাদ বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিখাইয়াছিল, সেই

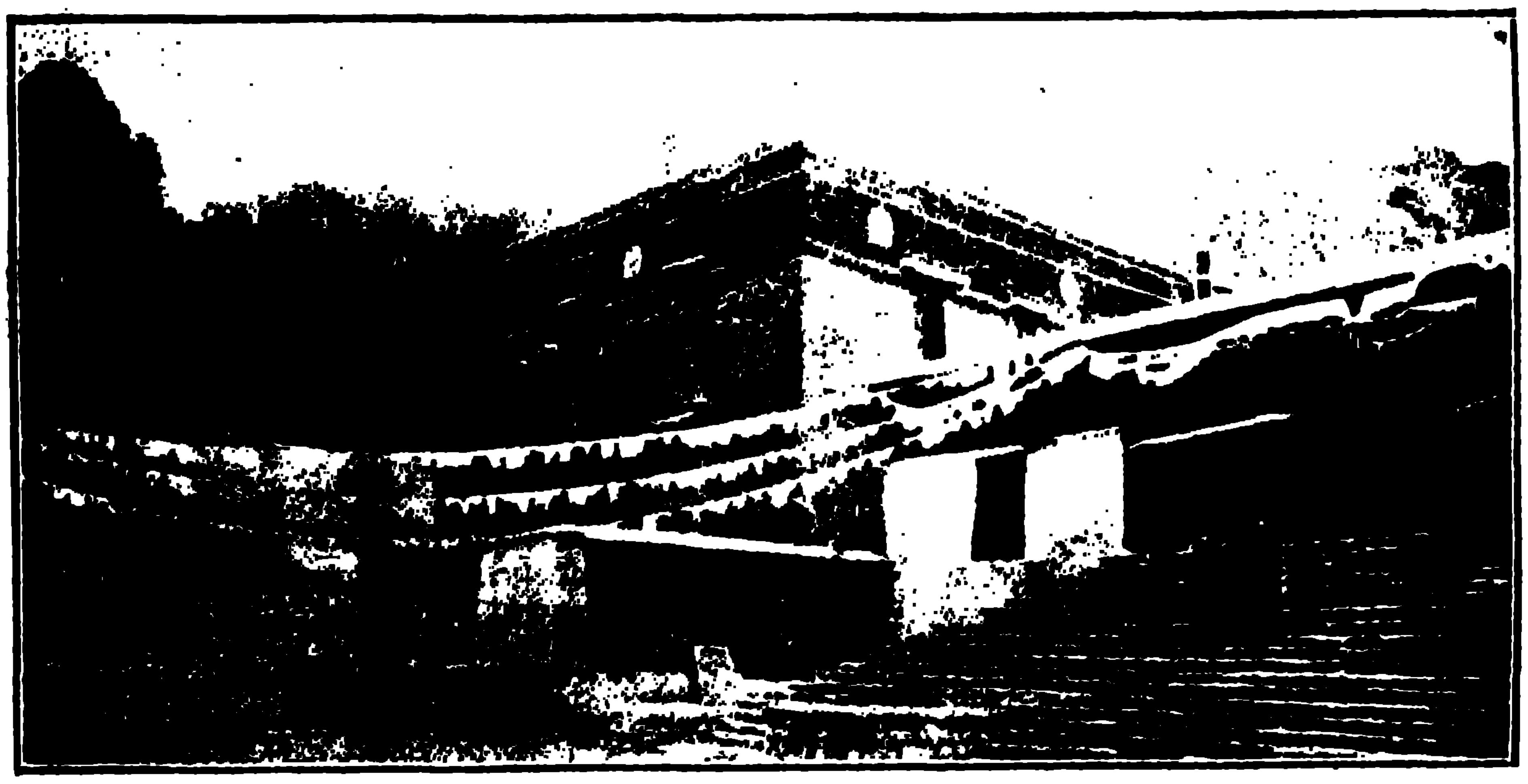

তিব্বতের একটী প্রধান মঠ।

ভারত যে কি প্রকারে এই পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনা প্রণালী শিখাইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম একত্রে প্রবেশ করিয়াছিল কি ভিন্ন ২ সময়ে আসিয়াছিল—কে আগে কে পরে আসিয়াছিল, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় সহজ কথা নয়।

তবে পরিবর্ত্তন যে জগতের সনাতন নিয়ম, তাহা অবশ্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সেই প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্মের কি বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এই পরিবর্ত্তনকে রোধ করিবার জন্য কত শত মহাপ্রাণ কত প্রকারে না চেষ্টা করিয়াছেন? আমাদের চক্ষের সম্মুখে কি না দেখিতেছি? ধর্ম্ম ও সমাজকে পরিবর্ত্তনের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে কি বিষম চেষ্টা ও যত্ন হইতেছে, তাহাত আমরা সকলেই জানি। তিব্বতে ও ধর্ম্মের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? তবে এই প্রধান মন্দিরের মধ্যে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে হয় যে, তিব্বতের ধর্ম্ম জগতে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য ভারত অনেকটা দায়ী।

সেরার মঠ তিব্বতের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রসিদ্ধ জাপানী ভ্রমণকারী কাওয়াগাছি এই স্থানে আসিয়া ছদ্ম বেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই মঠে প্রায় ৬০০০ ভিক্ষু বাস করে। ভিতরটা দেখিলে সাহসা একটি ক্ষুদ্র সহর বলিয়া মনে হয়। ইহা এক তিব্বতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। এই মঠের মধ্যে তিনটি কলেজ আছে। ইহার দ্বিতলের উপর দলাইলামার গ্রীষ্মাবাস। গ্রীষ্মকালে কয়েক দিবস তিনি এইস্থানে বাস করেন। এখানকার সব ছাত্রই ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত। সাধারণ ছাত্র একজনও নাই। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, তিব্বতের জন-সাধারণের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ নাই। যাহাতে ভিক্ষু ও লামা ভিন্ন আর কেহ বিদ্যা শিক্ষা না করিতে পারে, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিলে লামা দিগের প্রভুত্বের খর্ব্ব হয় বলিয়া এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এক সময়ে আমাদের দেশেও নিয়ম ছিল যে, প্রথম দুই জাতি ভিন্ন আর কেহ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে পারিত না। এক সময় য়ুরোপেও এই নিয়ম ছিল। খ্রীষ্টান পাদরীরা জন সাধারণের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা একবারে ভালবাসিতেন না।

দাপং মঠ সেরার মতনই বিশাল। সেটীও একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে চারিটি কলেজ আছে। ইহার ও দ্বিতলের উপর দলাই লামার এক গ্রীষ্মাবাস

আছে। এই আবাসের নাম অমরাবতী। দলাই লামা সেরা অপেক্ষা এখানে থাকিতে অধিক ভালবাসেন। এই স্থানে প্রায় ৫০০০ ভিক্ষু বাস করে।

ইহার পর আমরা ভেষজ মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। এখানে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানকার প্রধান দেবতা ধন্বন্তরী বুদ্ধ। ইঁহাকে পূজা করিলে কোনও প্রকার পীড়ার ভয় থাকে না। মূর্ত্তি বুদ্ধেরই মত। ইঁহার হস্তে এক পাত্র। তাহাতে কয়েকটি ভেষজ দ্রব্য রক্ষিত আছে। এখানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এক কলেজ আছে। ছাত্রেরা সকলেই ভিক্ষু। এই কলেজে শারীর বিদ্যা (Anatomy) সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত মত দেখিলাম। ইঁহারা বলেন - শরীরের ভিতরের অবস্থা শিক্ষা দিবার জন্য মৃত দেহের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ক্লাশে এক এক খানি মানব দেহের চিত্র টাঙ্গান আছে। এই চিত্রে ভিন্ন ২ অংশ চতুর্ভুজাকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। এখানকার অধ্যাপকেরা বলেন, স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ বা ধুক্‌ধুকি যন্ত্র বুকের ঠিক মধ্য-স্থলে অবস্থিত, অথচ পুরুষের ঐ যন্ত্র বামদিকে স্থাপিত। মানবের দেহের বামদিকে পীত বর্ণের ও দক্ষিণদিকে লোহিত বর্ণের রক্ত প্রবাহিত। মানবের দক্ষিণ হাতে লোহিত বর্ণের তিনটি নাড়ী ও বাম হস্তে পীত বর্ণের তিনটি নারী আছে। এখানকার চিকিৎসকেরা এই ছয় নাড়ীর সাহায্যে রোগ নির্ণয় করেন।

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রকে এই কলেজে আট বৎসর কাল থাকিতে হয়। ছাত্রেরা শিক্ষা শেষ হইবার পর, কলেজ ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে পারেন না। ইঁহারা উপযুক্ত দর্শনী ভিন্ন কাহারও চিকিৎসা করেন না। এইজন্য লাসায় দরিদ্রের পীড়া হইলে সচরাচর বিনা চিকিৎসায় মারা পড়ে। তবে সুখের বিষয় এই যে, এখানে পীড়ার সংখ্যা কম।

এখানকার চিকিৎসাশাস্ত্র যে ভারত হইতে আমদানি, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। শস্ত্র চিকিৎসার চর্চ্চা আদৌ নাই।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

বাঙ্গালী সমাজে বীমা।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জেলার নানা পল্লীগ্রামে দুনী ফকিরের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দূরদেশাগত দুষ্ট প্রকৃতির সুচতুর কোন কোন মুসলমান, ফকির সাজিয়া আসিয়া এদেশের অশিক্ষিত বহুল নানা পল্লীগ্রামে স্থানীয় ২।১ জন প্রতিপত্তিশালী দুষ্ট লোকের আশ্রয় লাভ করিয়া সরল প্রকৃতি গ্রামবাসী দিগের নিকট এক মহাবঞ্চনার জাল পাতিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিত। ঐ সকল "দুনি ফকিরের"* নিকট টাকা আমানত রাখিলে, নির্দ্দিষ্টকাল পরে প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ পাইবে, এইরূপ প্রলোভনেই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকে তাহাদের নিকট সরল বিশ্বাসে বহু টাকা আমানত রাখিত। প্রদত্ত টাকার পরিমাণানুসারে প্রত্যর্পণের তারিখেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইত। কেহ ২৲ টাকা দিলে দ্বিতীয় দিবসেই ৪৲ টাকা পাইত, ১০৲ দিলে দশম দিবসে ২০৲ টাকা পাইত, আবার ১০০৲ টাকা দিলে একমাস পরে ২০০৲ পাইবে, প্রতিশ্রুত হইত। অত্যল্প কাল মধ্যে, স্বস্ব প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ পাইবে প্রত্যাশায় প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া, গ্রামের ও নিকট পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানের অধিকাংশ লোকেই দুনী ফকির সাহেবের নিকট যাহার যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা সাধ্য, সে তাহাই আমানত করিত। এই ময়মনসিংহ জেলায় মফঃস্বলের নানা গ্রামেও দুনী ফকিরেরা এ ভাবে অল্প টাকা অপহরণ করে নাই! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফকির সাহেব ক্রীড়া-রম্ভের পূর্ব্বেই এক একজন ক্ষমতাশালী গ্রাম্য মাতব্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং ঐ সকল আশ্রয় দাতাই আমানতী টাকার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিত! প্রথম প্রথম ফকির সাহেবেরা কাহারও নিকট বেশী পরিমাণে টাকা গ্রহণ করিত না। গ্রাম্য লোকেও সহসা বেশী টাকা দিতে সাহস করিত না। ক্রীড়ার সূচনায় ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে বেশী টাকা গ্রহণ করা যে ক্রীড়া সাফল্যের পক্ষে সাহায্য না করিয়া বরং অনিষ্ট করিতে পারে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকে না বুঝিতে পারিলেও

সুচতুর ফকির সাহেবেরা তাহা বেশ বুঝিত। তবে ক্রীড়ারম্ভের কয়েকদিন পরে স্বীয় চক্রী মণ্ডলীভুক্ত ২।১ জনের নামে শতেক দুইশত টাকা আমানত রাখাইয়া, নির্দ্দিষ্ট কাল পরে বহুলোক সমক্ষে তাহাদিগকে দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা গণিয়া দিয়া জন সাধারণের মনে বিশ্বাস বাড়াইবার চেষ্টা করিত। তখন অন্য লোকেও ফকিরের নিকট শত শত টাকা জমা দিয়া, রাতারাতি বড়লোক হইবে আশায় অগ্রসর হইত। প্রথম বেশী টাকা ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে না নিবার একটা বিশেষ কারণও ছিল। প্রারম্ভাবস্থায় ২।৪৲ টাকা দ্বিগুণ পরিমাণে বহু লোককে দেওয়া যতটা সহজ, দুইশত কিংবা তিন শত টাকা দ্বিগুণ হিসাবে ২।৪ জনকে দেওয়া ততটা সহজ নয়। ফলে যাহারা দুনী ফকিরের নিকট প্রথম প্রথম ২।৪৲ টাকা হিসাবে দিত, তাহারা প্রায়শই স্বয় প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ পাইয়া লাভবান হইত। পরন্তু যাহারা স্থূলবুদ্ধি, অথচ অতিশয় লোভী, তাহারাই এককালে অধিক টাকা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত।

এই সকল—"দুনী ফকির" এবং তাহাদের আশ্রয়দাতারা ন্যায় পরায়ণ কোন কোন পুলিশ কার্য্যকারকের দৃষ্টিতে পতিত হইলে কখনও কখনও রাজদ্বারে লোক বঞ্চনার অভিযোগে অভিযুক্ত ও হইত। বোধহয় যে সময় মিঃ হার্ডিঞ্জ ময়মনসিংহের ডিঃ ও সেসন্স জজ ছিলেন, সে সময়ে এক দুনি ফকিরের দল দায়রায় সোপর্দ্দ হয়। ময়মনসিংহের তাৎকালিক ব্যারিষ্টার পরলোক গত মিঃ পালিত দুনী ফকিরের নিকট বহু টাকা পারিশ্রমিক পাইয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন করেন। বিস্ময়ের বিষয়, বিচারে বঞ্চক দুনি সাহেবের দল অব্যাহতি লাভ করে। আইনের কূটতর্ক উপস্থিত করিয়া ব্যারিষ্টার পালিত এইরূপ কারণ প্রদর্শন করেন যে, নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে কোন আমানতকারী স্বীয় টাকা ফেরত না পাইয়া থাকিলে, সে দেওয়ানী আদালতে টাকার দাবীতে ফকির সাহেবের নামে নালিশ করিতে পারে। ফৌজদারীতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কেহ কোন ফল পাইতে পারে না। কারণ এ ক্ষেত্রে দুনী ফকির খাতক স্থানীয় এবং আমানতকারীরা মহাজন স্থানীয়। কোনও খাতক নিকট অত্যধিক সুদ বা লাভ পাইবার প্রত্যাশায় কোন মহাজন স্বেচ্ছায় টাকা দাদন করিয়া, কড়ারের তারিখ মধ্যে টাকা ফেরত না পাইলে, খাতকের বিরুদ্ধে কোন মহাজনের ফৌজদারীতে বঞ্চনা প্রভৃতির অভিযোগ গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল ঐরূপ দুনী খেলার কথা আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে, বিলাতী ধরণের এক নূতন "দুনী" খেলা এদেশে অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। এগুলি রাজানুমোদিত, এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে সুশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ভদ্র সন্তান দিগের দ্বারা পরিচালিত। এগুলির নাম প্রভিডেণ্ট সোসাইটি, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি বা বীমা সমিতি। আজকাল বঙ্গদেশে এমন নগর নাই, যেখানে ২।১ টি বীমা বা প্রভিডেণ্ট সোসাইটীর আফিস বা এজেন্সি না আছে। এদেশে এমন পত্র-পত্রিকা নাই, যাহার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ২।৫ টী প্রভিডেণ্ট সোসাইটী বা বীমা সমিতির বিজ্ঞাপন না আছে। মফঃস্বলের নানা মহকুমায়, এমন কি পল্লী গ্রামেও নানাস্থানে এজেন্সির সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তারখানা, কবিরাজের ঔষধালয় এবং বীমা আফিসের বিজ্ঞাপনের সংখ্যা নিরূপন করিতে গেলে আজকাল বঙ্গদেশে কোন্ শ্রেণীর সংখ্যা যে বেশী হইবে, বলা সুকঠিন। কোন কোন প্রভিডেণ্টকোম্পানী বা বীমা সমিতির ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্ট, সেক্রেটারী প্রভৃতির পদে দেশের ২।৪ জন প্রখ্যাত নামা রাজা, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী ২।৫ জন বি, এ, এম, এর নাম ও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সরল স্বভাব দেশ বাসীদিগকে মুগ্ধ ও প্রতারিত করিতে সহায়তা করিতেছে। পাশ্চাত্য বীমা সমিতির প্রভিডেণ্ট বা সংস্থান সমিতির পন্থানুসরণ করিয়া এদেশে জীবন, বিবাহ, উপনয়ন, তীর্থ যাত্রা, পুত্রাদির শিক্ষা ইত্যাদি কত কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত যে কত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা সুকঠিন।

ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধির ন্যায় এত উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন দেশে নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন বীমা কোম্পানির সেক্রেটারী, ডিরেক্টার ও মেনেজারদের এক এক জন, নাকি বৎসরে ৩।৪ লক্ষ টাকারও অধিক উপার্জ্জন করেন। কেহ কেহ এই সব বীমা সমিতির কর্ম্ম-কর্ত্তা দিগকেও দুনী ফকির সাহেবদের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত এই সব কার্য্য,অনেকটা বিজ্ঞানানুমোদিত এবং জন সাধারণের আর্থিক বিশেষ আনুকূল্যকর, সুতরাং শিষ্ট সভ্য সমাজানুমোদিত এবং রাজানুমোদিত বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের যে সকল প্রভিডেন্ট সোসাইটী বা সংস্থান সমিতি প্রত্যেক সংস্থানকারীকে তাহার প্রদত্ত টাকার ৬গুণ, ৮গুণ, ১০গুণ এমন কি ১২ গুণ পর্য্যন্ত অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া স্বস্ব বঞ্চনা জালে আবদ্ধ করিতেছে, ইহাদের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য দেশের চিন্তাশীল নেতৃরা কেহ বিশেষ কিছু করিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রতি মাসে ॥০ আট আনা, ১৲ টাকা কিংবা ২৲ হিসাবে ২।৩।৪ বৎসর দিলে পুত্র কন্যার বিবাহ কিংবা পিতা মাতার শ্রাদ্ধ সময়ে সমিতি এক এক জনকে প্রদত্ত টাকার ১০।১২ গুণ পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করিবেন, এরূপ দুরাশায় এদেশের বহু দরিদ্র নরনারী, এমন কি নিরাশ্রয়া বিধবারা পর্য্যন্ত, কষ্টার্জ্জিত, ক্লেশ সঞ্চিত, কত শত, সহস্র, লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর এই সব প্রভিডেন্ট সোসাইটীর রাক্ষসী উদরে নিক্ষেপ করিতেছে, কে তাহার সংখ্যাবধারণ করিতে পারে?

পাশ্চাত্য দেশে যে সকল বীমা সমিতি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া থাকে। সে সকল দেশে দেশের জন্ম মৃত্যুর তালিকা হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ ও বিচার করিয়া মনুষ্য-জীবন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া এমন এক একটা প্রিমিয়মের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যে, সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কাজ করায়, কোন বীমা কারীই বঞ্চিত হন না, অপরদিকে কোন বীমা সমিতিও ক্ষতি গ্রস্ত হয় না, অধিকন্তু অধিকাংশ কোম্পানির কর্ম্ম কর্ত্তারা, মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া, কোম্পানিকেও দিন দিন সমৃদ্ধতর করেন এবং নিজেরাও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লাভ করেন। ইহাই হইল বিলাতী বিমা বিদ্যার মর্ম্মার্থ এবং রহস্য। আমাদের দেশের বোম্বাই নগরীর "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া" "ওরিয়েণ্টেল" এবং কলিকাতার "হিন্দুস্থান সমবায় বীমা সমিতি" "লাইট অব এসিয়া" প্রভৃতি ২।৪টী বীমা সমিতি পাশ্চাত্য পন্থানুসরণে কার্য্য করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল সমিতি অগ্র পশ্চাৎ কিছু মাত্র বিবেচনা না করিয়া, দেশের ইষ্টানিষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যে কোন উপায়ে রাতারাতি বড় লোক হইবার তীব্র লালসায় অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়া, দেশে নানা প্রভিডেন্ট সোসাইটী ও এসিওরেন্স-ইন্সিওরেন্স কোম্পানি গঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়, সামান্য কিছু বিজ্ঞাপনের আয়ের হানি হইবে আশঙ্কায়, এ দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা সম্পাদকও এ সম্পর্কে যথোচিত তীব্রভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়া জন সাধারণকে প্রকৃত অবস্থা অবগত করাইতে কিংবা গবর্ণমেণ্টকে কঠোর উপায় অবলম্বন জন্য অনুরোধ করিতে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছেন না!

এদেশের অধিকাংশ প্রভিডেন্ট সোসাইটী বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে চট্টগ্রামের "জ্যোতি" একবার লিখিয়াছিলেনঃ—(১) এজগতে যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় মিলে নাই, তাহারাই ফণ্ড খুলিয়া বসিয়াছে। (২) ডিরেক্টর ও পৃষ্ঠপোষকদের নামের তালিকায় হয়ত মিথ্যা নতুবা অজ্ঞাতনামা লোকের নাম দিয়া তাহাদের সঙ্গে খুব বড় বড় উপাধি সংযুক্ত করিয়া অজ্ঞ লোক দিগকে বঞ্চিত ও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। (৩) ইহাদের কোন মূলধন নাই, কেবল বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দেয়, মূলধন এত লক্ষ টাকা, এত কোটী টাকা। (৪)

ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করে, মাসিক ॥০ আনা ও ১৲ হিসাবে চাঁদা দিয়া ভর্ত্তি হইবার ৬ মাস ৯ মাস পরেই টাকা চাহিলে স্ব স্ব প্রদত্ত ঠাকার ১০। ১২ গুণ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে! (৫) প্রথম প্রথম ২।৪।১০ জনকে ঐরূপ ৩।৪।৫ গুণ পর্য্যন্ত টাকা দিয়াও থাকে, তদ্বারা আরও অত্যধিক গ্রাহক বৃদ্ধি হয়। (৬) ঐরূপ প্রলোভন দেখাইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া অধিকাংশ টাকা নিজেরাই বণ্টন করিয়া আত্মসাৎ করে। (৭) প্রায়ই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকেরা এইসব কোম্পানির এজেন্ট হইয়া নানা বাক্‌চাতুরীতে লোক ভুলাইয়া দালালী দ্বারা নিজেরা উচ্চ হারে কমিশন লাভ করে ও কোম্পানির ব্রহ্মোদর পূরণ করে। (৮) এজেন্ট ও সবএজেন্টেরা পরে আদায়ী অধিকাংশ টাকাই আত্মসাৎ করে। দরিদ্র অশিক্ষিত বীমাকারীরা এ সব রহস্যের কিছুমাত্র জানিতে পারে না! পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া আর্ত্তনাদ করে। বাঙ্গলার কত নরনারী এ ভাবে বঞ্চিত হইয়া হায় হায় করিতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? অনেকে বিবাহ ও মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও দাবীর টাকা পাইতেছে না, তাহাদের আর্ত্তনাদে ও অভিসম্পাতে দেশের বায়ু উষ্ণতর হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। এই সব বীমা ও প্রভিডেন্ট সোসাইটী; এখন এই যুদ্ধের সময়ে একটা সুযোগ পাইয়া, অজ্ঞ বীমাকারী দিগকে অম্লান বদনে বলিতেছেঃ— "দাবীর টাকা কোন্‌দিনই পাইতে, কিন্তু দেখিতেছ না, বিশ্বব্যাপী এই মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের টাকার বাজারেই এক মহা আগুণ লাগিয়াছে। কত বড় বড় ব্যাঙ্ক, কত কোম্পানি, কত বড় বড় কারবার, এই যুদ্ধের ফলে ফেইল পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোম্পানিও বিষম বিপদে পড়িয়াছে। নচেৎ বহু পূর্ব্বেই তোমাদের দাবীর টাকা পাইতে! ইত্যাদি।" যাহা হউক এই বিশ্ব-বঞ্চকেরা যেরূপ ধূর্ত্ত, তাহাতে এসব কথায় ব্যথিত হইলেও বিস্মিত হইবার বিশেষ কিছু আছে, মনে করি না।

গভর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে বীমা আইন যে ভাবে সংশোধিত করিয়াছেন, তাহা সম্যক সুফলপ্রদ হইয়াছে, আমাদের এরূপ মনে হয় না। যাহাতে দুষ্ট স্বভাব বঞ্চকেরা এ ভাবে আর বঞ্চনা করিতে না পারে, বঞ্চনা ব্যবসায়ীদিগের ও তাহাদের সহায়তাকারীদিগের কঠোর কারা-শাস্তি ভোগ করিতে হয়, অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া সেইরূপ রাজবিধি প্রণয়ন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

উপসংহার কালে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এ দেশের সামাজিক প্রাচীন কথা সমূহের অন্তর্নিহিত মহদুদ্দেশ্যের প্রতি প্রণিধাণ না করিয়া কোন কোন "সচলায়তন" উৎকট "সমাজ সংস্কারক"(সংহারক)? এ দেশের যত কিছু সামাজিক প্রথার কেবল নিন্দাবাদ করিতেই বিব্রত। আমাদের সমাজে প্রাচীন সমাজতত্ত্ব-বিদ মনস্বী মহাপুরুষ দিগের কৃপায় এমন সহজ সরল ভাবের পারস্পরিক সাহায্য সংস্থান ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং সকলেরই অনুসর-ণীয়। এ দেশে পুত্র কন্যাদির বিবাহে, উপনয়নে, অন্নারম্ভে, পিতামাতার শ্রাদ্ধে, কর্ম্ম কর্ত্তার আত্মীয় বন্ধু সামাজিক লোকে, প্রায় সকলেই ২।১টি টাকা এবং ধুতি চাদর সাড়ী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি, দধি ক্ষীর মৎস্যাদি সেবা সম্ভার দিয়া "সুহৃদ" ও "বন্ধু" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এ দেশে "কো-অপারেটিভ বীমা সমিতি "ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক বা সোসাইটি", প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতি, ঠিক পাশ্চাত্য প্রণালী সজ্জিত প্রতিষ্ঠান না থাকিতে পারে, কিন্তু এ ভাবে সামাজিক সুহৃদ বান্ধবেরা বিপদাপন্ন সুহৃদের যেরূপ অল্প বিস্তর সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে দাতার পক্ষে সাময়িক সামান্য দানে যেমন ক্লেশ নাই, গৃহীতার ও সেই সাত্বিকদান গ্রহণে কোন নিন্দা, কলঙ্ক বা অপমানের কথা নাই। ২।৪।৬ মাস কি বৎসরান্তে, কোন সুপরি-চিত সুহৃদের বাড়ীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ২।১ টাকা ব্যয় করিতে সামান্যবস্থাপন্ন যে কোন গৃহস্থেরও কষ্ট হইবার কথা নয়; অপর দিকে, দশের নড়ী, একের বোঝা, হইয়া উঠে বলিয়া দান গ্রহীতাও সামান্য উপকৃত হন না। এ প্রথার মহত্ব ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, এ দেশের শুধু হিন্দু কেন, মুসলমান ভ্রাতারাও স্ব স্ব সমাজে

এ প্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন ; এমনকি হিন্দু বন্ধু বাড়ীর ব্যাপারে মুসলমান, এবং মুসলমান বন্ধু বাড়ীর ব্যাপারে হিন্দু ও এ ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরম সুখ বোধ করিতেছেন। দেশে তাহার উদাহরণ অসংখ্য।

কিন্তু কি দুঃখ ও বিস্ময়ের কথা! আজকাল কোন কোন শিক্ষা সভ্যতাভিমানী স্বদেশীয় ব্যক্তি স্ব স্ব পুত্র কন্যাদির বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে, মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রে স্পষ্ট বিজ্ঞাপিত করেন "লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।" যাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করিয়া দেশ ও সমাজের রীতি প্রকৃতি এবং পিতৃ পিতামহের মহানুভব ধারা একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, বৈদেশিক চশমা চক্ষে দিয়া যাঁহারা দেশের যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রতিই প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধানুরাগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যাঁহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজাতীয় বিদেশীয় সমাজ-কূপে আবদ্ধ, যাঁহারা বস্তুতঃই অত্যধিক অনুদার, কিন্তু মুখে বারম্বার বিশ্বোদারতার বড়াই করেন, তাঁহারা মনের সুখে আমাদের সমাজের স্বস্তি-সৌধ ও সুখ-সোপান গুলি একে একে এই ভাবে ভাঙ্গিতেই ব্যস্ত ও বিব্রত। তাঁহারা অপর সকলকেই অন্ধ ও নির্ব্বোধ ভাবিয়া, ধীর বিচার বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া নিজেদের শ্রেয় পথেরই প্রশংসা করেন। তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থানুসরণ করিয়া এ দেশের সনাতন সমাজের সুখ-শান্তি-স্বস্তি-শুদ্ধি যে দিন দিন বিলোপ হইতে চলিয়াছে, সে কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবসর কিম্বা প্রবৃত্তি নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সে কালের কথা। (২)

খেলা ও আমোদ প্রমোদ।

খেলা ও আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে বৃদ্ধ বলিল "আমরা ছোট সময়ে পলাপুঞ্জি, গোল্লাছুট, মইলদার, হাডুডু ইত্যাদি খেলিতাম। তখন ব্যাট্ বল, ফুটবল চোখেও দেখি নাই। তখন ঘুড়ি উড়ান এবং ষাড়ের লড়াই মুরগের লড়াই, বুল্‌বুলের লড়াই, মেষের লড়াই প্রভৃতি দেখা আমোদ ছিল। ভদ্র লোকেরা তাস পাশা সতরঞ্চ প্রভৃতি খেলিতেন। খেলা নিয়া সময় সময় তুমুল বাগ-বিতণ্ডা হইত। দূর হইতে শুনিলে বুঝা যাইত যেন ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছে! সতরঞ্চ খেলায় এক এক জনকে এরূপ মত্ত দেখিয়াছি যে হুকার উপর হইতে কল্কী উঠাইয়া নিয়া গেলেও খালি হুকাই টানিতে থাকিতেন ; সময় সময় কল্কী হইতে অসাবধানতা বশতঃ আগুণ পড়িয়া কাপড় চোপড় পুড়িয়া যাইত ; ভ্রমরা খেলার ধুম অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইহাতে অনেক সর্ব্বনাশ হইত কিন্তু ঐ দিকে কাহার লক্ষ্যই থাকিত না। দুর্গোৎসবের নবমী পূজার দিন মহিষ বলি হইবার পূর্ব্বে একটী খাদ খনন করা হইত ; বলি হইলে উহা রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া একে অন্যকে ঐ খাদে ফেলিয়া দিত, পতিত ব্যক্তির বস্ত্রাদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যাইত! ইহাতে বিশেষ আমোদ হইত। তখন লাঠি খেলা, শরকী ও রাম দা' এর খেলার খুব প্রচলন ছিল। ভদ্র লোকেরাও আত্মরক্ষার্থ লাঠি খেলা অভ্যাস করিতেন।"

চুরি ডাকাতি।

তখন চুরি অপেক্ষা ডাকাতির সংখ্যা অধিক হইত। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"তখন আমাদের অঞ্চলে বদন সেখ নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত ডাকাত ছিল। তাহার নাম শুনিলে লোকে ভয়ে থরথরি কাঁপিত। ঘুমন্ত শিশুকে বদ্‌না ডাকাতের নাম শুনাইয়া ভয় দেখাইয়া ঘুমপাড়ান হইত। তোমাদের স্বর্গীয় কর্ত্তারা বদনা ডাকাতকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বার্ষিক ১ মণ চাউলের সিধা ও তদুপযুক্ত অন্যান্য আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য ও একটী বৃহৎ খাসী উপঢৌকন দিতেন ; সুতরাং তোমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয় নাই। তখন আমরা এরূপ চোর দেখিয়াছি যে বাহির হইতে হাততালি দিলে ঘরের ভিতরের সিন্দুক, বাক্স ইত্যাদি খুলিয়া যাইত। তাহারা লোককে ঘুমে অচেতন রাখারও মন্ত্র জানিত। আবার চোর ধরারও অনেক প্রক্রিয়া ছিল। কাহারও উপরে চুরির সন্দেহ হইলে 'বাটী চালা', 'চাউল পড়া' ইত্যাদির প্রয়োগ করা হইত ; অনেক সময় তাহা দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করা যাইত। তখন চোরের উপর খুব শাসন হইত ; চোরের নখের

নীচে সূচ ফুটাইয়া দেওয়া, মাটীতে শোয়াইয়া একখানা তক্তা উপরে দিয়া ২।৩ জন উঠিয়া লাফান, চোরের চোখে পিপড়া ছাড়িয়া দেওয়া, ঘটীর ভিতরে মাটী পুরিয়া তাহার দ্বারা আঘাত করা, ইত্যাদি শাসন করার নানাবিধ প্রণালী ছিল। চোরাই মাল পাওয়া গেলে, শাসন করিয়া প্রায়ই চোরকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেই প্রহারের চোটে চোরকে প্রায় মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকিতে হইত। জেলে দেওয়া অপেক্ষা তাহাতে শাস্তি কঠোর হইত।"

বন্য জন্তুর অত্যাচার।

আমাদের এ অঞ্চলে ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তুর কিরূপ অত্যাচার ছিল, জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ বলিল "তখন বাঘের বড় উপদ্রব ছিল; দিনের দুপুরে গরু বাছুর বাঘে লইয়া যাইত। তোমাদের খিরকির দ্বারের পুকুরে, বাঘ দিনে জল খাইতে আসিত। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তোমাদের এক দোতালা দালানে বাতি দিতে গিয়া দেখি, একটা বাঘ দোতালার কোঠার চৌকির নীচে শুইয়া আছে, তাহার চোখ দুইটা আগুণের মত জ্বলিতেছে। বাঘ দেখিয়াই আমি তাড়াতাড়ি কপাটে শিকল দিয়া নামিয়া আসিলাম, ডাকাডাকি করিয়া লোকজন সংগ্রহ করিলাম। কেহ লাঠী, কেহ শরকী, কেহ জাঁঠি, কেহ রাম দা হস্তে বাঘ মারিবার জন্য অগ্রসর হইল। একজন নমশূদ্র একটা শরকী দিয়া বাঘের শরীর বিদ্ধ করিল; অমনি সকলে মিশিয়া আঘাত করিয়া বাঘটাকে মারিয়া ফেলিল। বাঘ মারিবার জন্য আমরা খোয়াড় পাতিয়া রাখিতাম। মোটা মোটা বাঁশ মাটীতে পুতিয়া খাঁচার ন্যায় করা হইত; উহাতে দুইটী প্রকোষ্ঠ থাকিত; মধ্যে দৃঢ় বেড়া থাকিত, ইহার এক পাশে একটী ছাগ শিশুকে রাখা হইত। উহার চীৎকারে বাঘ আসিত, পরে কৌশল ক্রমে খোয়াড়ের দরজা ফেলিয়া দিয়া আবদ্ধ করা হইত। বাঘ খোয়াড়ে পড়িয়াই ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিত, তাহা শুনিয়া গ্রামের লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া খোয়াড়ের নিকট আসিত এবং পরে সকলে মিলিয়া আঘাত করিয়া বাঘকে মারিয়া ফেলা হইত। একবার ক্রমে ৭টী বাঘ খোয়াড়ে পড়িল; তাহা দেখিয়া একব্যক্তি 'চোখ লাগাইল'। সে বলিল "তোমরা দেখি রাজ্যের আর বাঘ রাখিবা না"। ইহার পর আর একটা বাঘও খোয়াড়ে পড়িল না; অথচ তখনও বাঘ যথেষ্ট ছিল। তখন বন্য শূকরও বহু দেখা যাইত; অনেক সময় ধান্যাদি শস্য নষ্ট করিত। অসময়ে একাকী পড়িলে লোক জনকেও শূকরে আক্রমণ করিতে ত্রুটী করিত না। নমশূদ্রেরা দড়িদ্বারা জাল প্রস্তুত করিয়া শূকর বেড় দিত; পরে জাঁঠি, শরকী ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিত। শুকরের মাংস তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুও কেহ কেহ গোপনে আহার করিতেন। বন্য মহিষও সময় সময় দেখা যাইত। তোমাদের এলাকার রণ ভাওয়ালের অন্তর্গত কাটিনা, মুচিরা ইত্যাদি গ্রামে বন্য হস্তী আসিয়া প্রজাগণের ধান্যাদি শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিত। তথায় ভল্লুক ও হরিণ যথেষ্ট ছিল। পূর্ব্বের লোকেরা অত্যন্ত সাহসী ছিল। ছোট খাট বাঘকে তাহারা গ্রাহ্যই করিত না; লাঠী দিয়াই তাড়াইয়া দিত। বহুলোক পূর্ব্বে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইত। তখন তীর পাতিয়া ও বাঘ মারা হইত।"

নীল করের অত্যাচার।

নীল করের অত্যাচারের বিষয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"তখন এঅঞ্চলে অনেক নীলের কুঠী ছিল; ওয়াইজসাহেব (G. P. Wise) নীল কুঠীর একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার অধীনে প্রত্যেক কুঠীতে জমিদারী কাছারীর ন্যায়, নায়েব দেওয়ান, গোমস্তা. প্যাদা, পাইক প্রভৃতি থাকিত। সাহেবের অপেক্ষা তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গের অত্যাচার অধিক ছিল। নীলকরের লোকেরা ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে—কাহাকেও কুঠীর সান্নিধ্যে একা পাইলে তাহার দ্বারা বেগার খাটাইয়া লইত। কেহ বেগার খাটিতে অস্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎ কুঠীর প্যাদা-পাইকের হস্তে তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত; ইহার প্রতিকার বড় একটা কিছু হইত না। নীলকরের লোকেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকগণকে প্রলোভনে বাধ্য করিয়া নীলের দাদন দিয়া যাইত। যে হতভাগ্য নীলকরের লোকের নিকট হইতে একবার টাকা করজ লইত, সে ইহ জীবনে প্রায়ই টাকা

পরিশোধ করিতে সমর্থ হইত না; ফলে তাহাকে আজীবন নীলের চাষের কার্য্য করিতে হইত। 'নীলের দাদন আজকাল প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় ভাবখালী নিবাসী স্বরূপ মোদককে নীলকরের লোকেরা ধরিয়া লইয়া গিয়া বেগুণবাড়ীর নীলের কুঠীতে আটক করিয়া রাখে। মাঠে, খাসী পাঁঠা চরিতে দেখিলে নীলকরের প্যাদা পাইকেরা ধরিয়া লইয়া যাইত, পরে সংহার করিয়া আহার করিত। যাহাদের খাসী পাঁঠা এইরূপে লইয়া যাইত, তাহারা নীলকরের লোকদিগের নিকট অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক উহার মূল্য চাহিলে, টাকার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধচন্দ্র নিয়াই ফিরিতে হইত। কৃষকগণকে বলপূর্ব্বক নীলের চাষ করিতে নীলকরেরা বাধ্য করিত। আমাদের প্রজাগণের উপর নীলকরের লোকেরা অত্যাচার করিতে আসিলে ৺দীননাথ সেন মহাশয় লাঠীয়াল দ্বারা উহাদিগকে তাড়াইযা দেন। নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রামে সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাকে হস্তগত করার নানা কৌশল অবলম্বন করিত। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে বল প্রকাশেও কুণ্ঠীত হইত না।"

ওয়াইজ সাহেবের সহিত ভোলানাথ চাকলাদারের ভীষণ দাঙ্গা।

ভোলানাথ চাকলাদারের সহিত ওয়াইজ সাহেবের দাঙ্গার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ বলিল—"ওয়াইজ সাহেব এ জেলায় স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। রণভাওয়ালের অন্তঃর্গত মুখী গ্রাম লইয়া ওয়াইজ সাহেবের সহিত চাকলাদারের বিবাদ হয়; ক্রমে শত্রুতা ঘোরতর হইয়া উঠিল; ওয়াইজ সাহেব চাকলাদার দের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদা অপরাহ্নে ওয়াইজ সাহেব বহুশত লোক লইয়া চাকলাদারের বাড়ী আক্রমণ করেন। চাকলাদারের বাড়ীতে তখন অধিক লোকজন ছিলনা; বিপক্ষের বহু লোকজনের সমাগম দেখিয়া ভোলানাথ চাকলাদার হতাশ হইয়া পড়িলেন। জমির সিং নামক তাঁহার একজন পাঞ্জাবী বরকন্দাজ ছিল; সে স্বীয় প্রভুকে হতাশ হইতে দেখিয়া বলিল "হুজুর আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না; আমি একাকীই সব লোকজন ভাগাইয়া দিতে পারিব। আমাকে দুইখানা তলোয়ার দিন।" জমির সিং তলোয়ার হস্তে কৃতান্তের ন্যায় দেউরীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। চাকলাদারের 'কমল কলি' নাম্নী একটী হস্তিনী ছিল। প্রভুর বিপদ দেখিয়া হস্তিনী ১০।১২ হস্ত দীর্ঘ একটী "রায়বাঁশ" লইয়া শুণ্ড দ্বারা ঘুরাইতে লাগিল। ওয়াইজ সাহেবের পক্ষে বহু লোক আহত হইল ও তিনটী খুন হইল। খুন হওয়ার পরই ওয়াইজ সাহেবের লোকজন রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ভোলানাথ চাকলাদার অবিলম্বে তাঁহার হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ময়মনসিংহে উপনীত হইলেন। কালীবাড়ীর ঘাটে চাকলাদারের পানসী নৌকা বাঁধা থাকিত, তাঁহাকে নৌকায় রাখিয়া হস্তিনী একাকী মাহুত ছাড়া তীরবেগে চাকলাদারের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। খুনের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার মানসে, চাকলাদার সেই দিনই সহরে একটী ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী হইলেন। তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়াই জনৈক ভৃত্যকে চিড়া ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। ভৃত্য চিড়া আনয়ন করিলে তিনি তাহা হইতে কতক চিড়া ফেলিয়া দিয়া যে মুদীর নিকট হইতে চিড়া আনীত হইয়াছিল, তাহাকে নৌকায় ডাকাইয়া আনিলেন। মুদীকে বলিলেন "তুই চিড়া ওজনে কম দিয়াছিস্"। মুদী এ কথা স্বীকার করিল না। কথায় কথায় বিবাদ পাকিয়া উঠিল। চাকলাদার স্বহস্তে মুদীকে খরম দ্বারা প্রহার করিলেন। মুদী তৎক্ষণাৎ থানায় যাইয়া এজাহার দিল এবং তৎপর দিন যথা রীতি ফৌজদারীতে নালিশ রুজু করিয়া দিল। চাকলাদারের তলপ হইল, চাকলাদার প্রহার করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিচারক তাহাকে ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। ও দিকে চাকলাদার আবার খুনের আসামী হইলেন; বিচার আরম্ভ হইল। চাকলাদারের উকিল পূর্ব্ব মোকদ্দমার কাগজাত দেখাইয়া সাব্যস্ত করিলেন, চাকলাদারের বাড়ীতে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকিয়া এই সময়ের মধ্যে ময়মনসিংহে উপনীত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। কারণ চাকলাদারের বাড়ী ময়মনসিংহ হইতে ২২ মাইল দূরে।

তখন রেল ছিল না। এতদূর হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে আইসা একান্ত অসম্ভব। চাকলাদার বেকসুর খালাস পাইলেন।

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের নিকট চাকলাদারের বহু সহস্র টাকা ঋণ ছিল। মহারাজা বাহাদুর মাত্র এই হস্তিনীটী নিয়া ভোলানাথ চাকলাদারকে সমুদয় ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু চাকলাদার তাহার প্রিয় হস্তিনীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; ফলে মহারাজার ঋণের দায়ে চাকলাদারের সর্ব্বস্ব নীলাম হইয়া গেল। হস্তিনী তাহার প্রভুর একান্ত বাধ্য ছিল; তাহার দ্বারা বহু সময়ে চাকলাদার, ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। চাকলাদারের মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরেই হস্তিনীর মৃত্যু হয়। তৎকালে চাকলাদারের হস্তিনীর কথা এ অঞ্চলের সকলেই অবগত ছিলেন।" ভোলানাথ চাকলাদার অতি তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন; তাঁহাকে লোকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত। হায়, কালের কি কুটীলা গতি! এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বস্ব হৃত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

ব্যর্থ-জীবন।

প্রাণের দেবতা তুমি,
 কেবলি রহিলে ধ্যানে,
ধরা নাহি দিলে কভু,
 আসিলে না কভু জ্ঞানে!
বুক ভরা প্রেম মোর,
 আঁখি ভরা অশ্রু রাশি,
নীরবে হেলায় বুঝি
 কেবলি লইলে হাসি'!
কহিলে না কোন কথা,
 শুধালে না একবার,
বুঝিলে না কি তৃষায়
 করিতেছি হাহাকার!
বিকশিত এ জীবন—
 পলে পলে পলে হায়,
ব্যর্থ হয়ে গেল বৃথা
 তব এই উপেক্ষায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জামাই ষষ্ঠী।

ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়া গেলেও যখন প্রফুল্লের বিবাহের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইল না, তখন দরিদ্র পিতা রমাপ্রসাদ বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। এদিকে সংসারেও তাঁহার বড় বেশী শান্তি ছিল না। প্রফুল্লকে দশ মাসের ও সতীশকে আড়াই বৎসরের রাখিয়া তাহাদের মাতার মৃত্যু হইলে, রমাপ্রসাদ শিশু কন্যার ও পুত্রের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে যে দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সচরাচর বিপত্নীক দিগের যেমন হইয়া থাকে, তাঁহারও তেমনি সহায়তা হইয়াছিল। সুতরাং পুত্র কন্যার প্রতি তাহার খাটুনির মাত্রা যে আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এরপর দরিদ্র রমাপ্রসাদ দুই দুইটা বিবাহ করিয়া এবং দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে লাবণ্যের বয়স প্রফুল্লের বয়স অপেক্ষা ৪ বৎসরের ন্যূন হইলেও তাহাকে অগ্রে পাত্রস্থ করিতে বাধ্য হইয়া এবং সে বিবাহে পাত্র পক্ষকে অতিরিক্ত পণ ও মর্য্যাদা দিয়া—একেবারে কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিকন্তু দ্বিতীয়-পক্ষের আব্দার উৎপীড়নে কিছু কিছু ঋণও তাঁহাকে করিতে হইতেছিল। এই ঋণ চিন্তার উপর এই মাতৃহীনা ষোড়শী কুমারী কন্যার চিন্তায় ও গৃহিনীর নিত্য নূতন অতিরিক্ত অত্যাচারে রমাপ্রসাদের সংসার হইতে শান্তি ও লক্ষ্মী উভয়ে যুক্তি করিয়া যেন দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

সে দিন রমাপ্রসাদ আফিস হইতে আসিয়া যখন শুনিলেন, লাবণ্যের মা নূতন জামাই ষষ্ঠীর উদ্যোগ করিয়া বসিয়াছেন তখন দুঃখে ও রাগে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। লজ্জা-নম্র-বয়স্থা-কন্যা প্রফুল্ল তাহার শরীরের মলিন ছিন্ন বস্ত্র এদিক ওদিক টানিয়া লইয়া যখন পিতার খরম ও গাড়ু আনিয়া যথা স্থানে রাখিয়া সঙ্কোচে জড়সর হইয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার পানে চাহিয়া রমাপ্রসাদ চক্ষু মুছিলেন।

এই সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন "বাক্স হইতে চারিটী টাকা নিয়া দুধ, নারিকেল ও চিনি আনাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে কিছুই হইবে না। কাল আরো কয়েক সের দুধ আনিয়া দিতে হইবে।"

রমাপ্রসাদ চাপকান ছাড়িয়া সার্টের বুতাম খুলিতে ছিলেন। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"কাল বলিলে চাল নাই, কয়লা নাই তাই বিধুবাবুর কাছ থেকে চারটী টাকা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম। —তা তুমি দুধ চিনি নারিকেলেই দিলে —দাও, আমার আর গতি নাই। খাও, দুধ খেয়েই থাক। এখনও মাস কাবারের ৭ দিন বাকী কিন্তু—মনে থাকে যেন।"

একটু নরম সুরে গৃহিণী বলিলেন—"নূতন জামাই ষষ্ঠী, তা যেমি হয় করতেইত হবে।"

রমাপ্রসাদ ক্রোধ ভরে বলিলেন—"নিজে না খেয়ে না পরেও কি জামাই ষষ্ঠী করতে হবে, তা আমি পারিব না।" গৃহিণী একটু নরম অথচ গরম ভাবে বলিল "হবে বৈকি?" রমাপ্রসাদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন —"তবে যাও—করগে। আমায় আর জ্বালাতন করিও না। আমি কিন্তু চাউল কয়লার আর পয়সা দিতে পারিব না।"

গৃহিণীর কণ্ঠ উচ্চে উঠিল—"না দাও না খাবে। আমার কোন বাপ ভাই ত আর খাইতে আসিবে না।"

রমাপ্রসাদের বক্ষঃস্থল নিষ্পেষিত করিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইল; একটু নরম হইয়া বলিলেন—"দেখ তোমার ওই রোখামি রেখে দাও, আর লোক হাসাইয়া আমার মাথা নষ্ট করিও না। চারিদিকের লোক গুলি কি বলে, একটু সেটাও লক্ষ্য করিও। অবস্থা বুঝিয়া ব্যব করতি হয়, আমি জামাই ষষ্ঠী করিব না।—করিতে পারিব না।"

রমাপ্রসাদ পেন্টুলন খুলিয়া কাপড় পড়িতে পড়িতে বলিলেন—"দুই ধুপ যাবত কাপড়টা বদলাইতে পারিতেছি না। মেয়েটাকেও দিব দিব বলে একখানা কাপড় আনিয়া দিতে পারিতেছি না। চাউল নাই, কয়লা নাই,— কথা শেষ হইতে না হইতেই গৃহিণী রুষ্টস্বরে বলিল— "ইহাওকি আমার জন্ত পারিতেছ না?"

রমাপ্রসাদ ক্রোধভরে বলিলেন—"নিশ্চয়। নিশ্চয়। তোমার কার্য্য কলাপে আমি লোকের নিকট অপদার্থ বনিয়াছি, শেষে পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছি। থাক্ সে সব, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি ওসবে আছি না।" বলিয়া রমাপ্রসাদ পাখাটা হাতে লইয়া বাহিরে গিয়া একটা জলচৌকির উপর বসিলেন।

রান্নাঘর হইতে একটা ছোট মেয়ে ডাকিয়া বলিল, "মা দুধ উৎলাইয়া পড়িল।" গৃহিণী স্বামীর দোষারূপ হইতে নিজকে মুক্ত করিবার জন্ত প্রমাণ খুজিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ওদিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বামীর কথার উপর সুর চড়াইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন—"আমিই বুঝি তোমাকে পথের ভিখারী করিয়াছি, না! রাজার হালে ছিলেন কি না, আমি এসে পথের ভিখারী করেছি। মরণ আর ছিল না বুঝি।" স্ত্রীর কথা গুলি রমা প্রসাদের অন্তরটাকে পুরিয়া ছাই করিয়া ফেলিতেছিল। একটা আশু বিপদের সূচনা দেখিয়া রমাপ্রসাদ বলিলেন—"এখন যাও, আফিস হইতে আসিয়াছি, এখন বিরক্ত করিও না। ত্রিশটা দিন এরূপ জ্বালা যন্ত্রণা আর কত সহ্য হয়? আমার বাড়ীতে জামাই আসিতে পারিবে না, আমি জামাই ষষ্ঠী; করিব না, বস্।"

গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া প্রতিধ্বনির মত বলিল—"রোজ রোজ তো আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করিতে আসে না; এবার নূতন জামাই, তাই বলিলাম।" রমাপ্রসাদ পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে বলিল—"না, ও হবে না। আমার বাড়ীতে এবার জামাই ষষ্ঠী হইতে পারে না।" গৃহিণী নরমে গরমে বলিল – "লাবণ্য ও সুরেশ কাল আসিবে, আমি যে লিখিয়া দিয়াছি, এখন কি আর না করিলে হয়?" বলিয়া আস্তে আস্তে গৃহিণী সরিয়া পড়িলেন। রমাপ্রসাদ রাগে ও দুঃখে অস্থির হইয়া ঘন ঘন পাখা ঘুরাইয়া নিজ মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

রমাপ্রসাদ একা বসিয়া অনেক কথা ভাবিলেন। মনে পড়িল, তার প্রথমা পত্নীর উদার আনুগত্য ভাব্ তাঁহার প্রতিকার্য্যে প্রতি কথায় একটা বিনয়-নম্র ভাবের হিল্লোল ফুটিয়া উঠিত। প্রতি চাহনীতে যেন সকরুণ মিনতি ঝরিয়া পড়িত। জীবনের যে কয় দিন তাহার সাহচর্য্যে কাটিয়াছে, তার ভিতর একদিন ভুলিয়াও সে কোন উদ্ধত্যের ভাব প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। রমাপ্রসাদ অনেক কথা ভাবিলেন। বিমাতার কঠোর ব্যবহার, কর্কশ তিরস্কার,—প্রফুল্লের

প্রতি সহানুভূতি হীনতা। মেয়েটা সারা দিন রাত খাটিয়াও একটু শান্তি পায় না, অথচ নিজে রমাপ্রসাদ তাহা জানেন, দেখেন, কিন্তু কথা বলিবার শক্তি নাই; কেন না, কিছু বলিলে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত প্রফুল্লকেই অধিক। বহুক্ষণ ধরিয়া রামপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া এগুলি ভাবিলেন। তাহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল।

রমাপ্রসাদ ভাবিয়া ভাবিয়া নিরুপায় হইয়া উঠিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা ভগিনী প্রফুল্ল কি করিয়া বিবাহিতা ছোট ভগিনীর সম্মুখে তাহার এই দীনতা রক্ষা করিবে! কি করিয়া সে তাহার ছোট ভগিনী পতিকে মুখ দেখাইবে! আমরাইবা কি করিয়া এত বড় মেয়ে ঘরে অবিবাহিতা রাখিয়া তাহার সম্মুখে ছোট মেয়ের জামাই ষষ্ঠী করিতে যাইতেছি; ধিক্ আমাদিগকে— ভাবিতে ভাবিতে রমাপ্রসাদের চক্ষের উৎস গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। রমাপ্রসাদ ধীরে ধীরে বাহির হইলেন।

সন্ধ্যার ম্লান আলো যখন অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন রমাপ্রসাদ একখানা গাড়ী লইয়া বাসায় ফিরিলেন। আসিয়াই প্রফুল্লকে ডাকিলেন "মা এদিকে আইস। তোমাকে এখনই তোমার মাতুল বাড়ী যাইতে হইবে। আমিই তোমাকে লইয়া যাইব।"

প্রফুল্ল মাতুলবাড়ী যাইতেছেন শুনিয়া গৃহিণী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। প্রফুল্ল চলিয়া গেলে সংসারের কাজ করিবে কে? তিনি প্রফুল্লকে বলিলেন "প্রফুল্ল তুই এখন কোথায় যাবি? আমার যে হাতে বহুকাজ।"

প্রফুল্ল নীরবে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। রমাপ্রসাদ গম্ভীরস্বরে বলিল "তোমার কাজ তুমি করিতে পার কর। প্রফুল্লকে আর এখানে রাখিতে পারিব না।"

(২)

ষষ্ঠীর দুদিন পূর্ব্বে লাবণ্য ও সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া পহুঁছিল। বিবাহের পর লাবণ্যের এই প্রথম স্বামী সহ পিত্রালয় আগমন। লাবণ্য দিদির নিকট আত্ম গৌরবের অনেক নিদর্শন প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়াই যখন শুনিল প্রফুল্ল মাতুল বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে অগত্যা তাহার গৌরবের পরিচয় গুলি মাতৃসন্নিধানে বিবৃত করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর লাবণ্য পিতৃসন্নিধানে প্রফুল্লের বিবাহের এক প্রস্তাব উপস্থিত করিল। গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াই গৃহিণী কন্যারপক্ষে সায় দিয়া বলিলেন—"সুরেশও এ পাত্রকে বেশ উপযুক্ত বলিয়া মনে করে। সে বলে—" বলিয়া কথা অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুরেশ বলিল—"হাঁ বয়েস খুব বেশী হয় নাই বটে— তবে প্রথম পক্ষের গুটী কয়েক ছেলে মেয়ে আছে, এই যা। অবশ্য সেটা বড় বেশী কিছু নয়; সুখ দুঃখ জানেন কি, অদৃষ্টের কথা।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন "তা ঠিক; তবে পাঁচটা দেখিয়া শুনিয়া দেওয়াই আমাদের পিতামাতার কর্ত্তব্য। পাত্রটির বয়স কি, কর্ম্মই বা করে কি? তোমাদের সঙ্গে পরিচয়ই বা কি সূত্রে?"

সুরেশ বলিল—"বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হইবে। হাইকোর্টে প্র্যোকটীশ করেন। আমিও বি এল পাশ করিয়া ইহারই নিকট ক্লার্ক ছিলাম। লোকটী ভদ্র। ছেলে দুটী ও বেশ উপযুক্ত হইতেছে; বড়টী এবার বি এ পাস করিয়াছে; একটী বয়স্থা মেয়েই তারা চায়।"

প্রফুল্লের কথা হইলেই রমাপ্রসাদের চক্ষে জল জমিত। সকলের অলক্ষ্যে চক্ষের জল মুছিয়া রমাপ্রসাদ একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—"মন্দ কি; তবে কি না—এখানেও বিমাতার সংসার সে খানেও বিমাতা হইতে যাওয়া— লোকে বলিবে—মা নাই তাই—"

এই সময় গৃহিণী আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। তিনি রুষ্টস্বরে বলিলেন "লোকে কি বলিবে যে আমরা তাহাকে হাত পা বাধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছি?"

কথায় বাধা দিয়া সুরেশ বলিল—"তা নয়, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাও অবশ্য ভাবিবার বিষয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমি ততটা ভাবিবার বিষয় কিছু দেখিতেছি না। পাত্র, যোত্র, গোত্র তিনটীই লোকে দেখিয়া থাকে; এস্থলেও তিনটীই অনুকূল। তারপর আপনার অর্থ ব্যয়ের যখন ক্ষমতা নাই, তখন আপনি সর্ব্ব দিক রক্ষা করিয়া এইরূপ পাত্রতো পাইতেই আশা করিতে

পারেন না। তারপর যদি কোন উপযুক্ত পাত্র পণের দাবী না করিয়া নিতান্ত দয়া করিতে চায়, সেওতো পাত্রীর রূপ, গুণ, স্বাস্থ্যটা পরীক্ষা করিবে। সে বিষয় যখন আমাদের অনুকূল নয়, তখন আমার মতে এটা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত না।”

রমা প্রসাদ জামাতার মন্তব্য শুনিয়া ক্ষুন্ন হইলেন। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন, বয়োজ্যেষ্ঠ সত্বে ও যখন প্রফুল্লের বিবাহ হয় নাই, তখন সুরেশ অবশ্যই তাহার রূপ গুণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন ত্রুটী আছে ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া আছে। তিনি সেদিন এ বিষয়ে আর কোন কথা না তুলিয়া কেবল সংক্ষেপে বলিলেন—“যাও দেখ, বিবাহ নিয়তির কথা, যদি তোমরা ভাল বুঝ, কর।”

(৩)

সে দিন রাত্রে সুরেশের শরীরে ভীষণ বেদনা সহ জ্বর হইল। পরদিন প্রাতে দেখা গেল, নাক-মুখ সব ফুলিয়া গিয়াছে; সকলেই বসন্তের আশঙ্কা করিতে লাগিল। গৃহিণী জামাতার এই অবস্থা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তাহার “ভাড়া ভাতে ছাই পড়িল।”

রমাপ্রসাদ এই বিপদে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কায় ক্লেশে সংসার চালাইতেছেন, তার উপর এই অনিচ্ছাকৃত নূতন উপসর্গে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। হাতে একটী পয়সাও নাই, কি উপায়? যাহা হউক রমাপ্রসাদ বহু যোগাড় যন্ত্রে আরও একখানা খত লিখিয়া দিয়া কয়েকটী টাকা আনিয়া আপততঃ মান রক্ষা করিলেন।

বিপদ দেখিয়া গৃহিণীর জেদের মাত্রা কমিয়া গেল। তিনিও অবসাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে চারি দিন চলিয়া গেল। বসন্ত পাকিয়া উঠিল। সুরেশের অবস্থা দিন দিন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। লাবণ্যকে একদিনও তাহার মা ভয়ে রোগীর নিকট আসিতে দিলেন না। লাবণ্য ও ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া রহিল।

দূরে থাকিয়াও লাবণ্য নিরাপদে থাকিতে পারিল না। লাবণ্যেরও জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারও বসন্ত দেখা দিল। লাবণ্যের শুশ্রূষার জন্য প্রফুল্লকে আনা হইল। প্রফুল্ল তাহার আপ্রাণ চেষ্টায়ও লাবণ্যকে বাঁচাইতে পারিল না। সে দিবা রাত্রি তাহার পার্শ্বে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিল। প্রফুল্লের পরিচর্য্যা দেখিয়া সকলেই আশ্চার্য্য হইয়া গেল। এমন করিয়া বসন্তের রোগীর পরিচর্যা হইতে পারে কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারে নাই কিন্তু হায় প্রফুল্লের এত যত্ন এত চেষ্টা সত্বেও স্বামীকে রোগ শয্যায় রাখিয়া, পিতা মাতাকে ফাঁকি দিয়া লাবণ্য চির বিদায় গ্রহণ করিল। গৃহিণীর কান্নার রোলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এইবার গৃহিণী পড়িলেন। চারি দিকে বিপদ যখন ঘেরিয়া আসে তখন মানুষপাগল হয়, নতুবা গাম্ভীর্য্যের আস্বাদ ভোগ করে।

জামাই ষষ্ঠীর জন্য জেদ করিয়া যখন গৃহিণী দেখিলেন, তাহার এই হটকারিতাই আজ নিজের ঘরে সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে, তখন তাহার বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। গৃহিণী বুকের ভিতর বড় অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর নিষেধ অমান্য করিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহারই অন্তরের ব্যথা হইতে এই অমঙ্গলের সূচনা। বাস্তবিক কায়োমন বাক্যে অন্তরতমের কাছে বলিতে পারিলে, তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে।

আজ শোক সন্তপ্ত গৃহিণীর অন্তর মথিত করিয়া এই বাণী উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। তৃষিত নারী প্রকৃতি আজ দুর্জ্জয় কালের হাতে এই প্রত্যক্ষ সত্য অনুভব করিয়া অভিভূত হইল। গৃহিণীর জীবনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত সুখ- দুঃখে অনুভূতি ইহাকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার হৃদয় তন্ত্রীতে এই অনাস্বাদিত পুলক-গুঞ্জন নিশি দিন বাজিতে লাগিল; সেই গুঞ্জন এবং অনুভূতিকে সে কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারিল না। সে নারী জাতির দুর্ব্বলতা প্রত্যক্ষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিল, স্বামী ব্যতীত তাহার পৃথক অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই একটী মাত্র প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে সফলতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার যতটুকু শক্তি প্রয়োজন গৃহিণী তাহা তাহার দীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রযুক্ত করিল। তাহার

ব্যথিত অন্তর আরো কাতর হইয়া পড়িল। নারী হৃদয় এই একটী মাত্র সম্বল লইয়া সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের সমস্ত পথ অতিবাহিত করিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়, একথা এতদিনে গৃহিণী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। তাহার ঔদ্ধত্য, চাঞ্চল্য, অহঙ্কার—একাঘাতে সব চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি স্বামীর পাদোদকের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সেই একবিন্দু জল যেন তাহাকে জীবনের সফলতার দিকে লইয়া চলিল। গৃহিণী দিন দিনই রোগ যন্ত্রণা ও শারীরিক যন্ত্রণার লাঘবতা অনুভব করিলেন এবং একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। রমাপ্রসাদ বেশ লক্ষ্য করিলেন, গৃহিণীর সে চাঞ্চল্য, ঔদ্ধত্য, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। গর্ব্বের প্রতিমূর্ত্তি এখন স্নেহপ্রবণতায় পূর্ণ। আজ গৃহিণীর জলভরা চক্ষু দুটীর প্রশান্ত দৃষ্টি যেন জীবনের পর পার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। রমাপ্রসাদের মনে এ দুঃখের মধ্যেও আজ কি আনন্দ! যাহা হউক প্রফুল্লের প্রাণপণ শুশ্রূষায় ও নিজ অন্যায় কর্ম্মের জন্য অনুশোচনার ফলে, গৃহিণী অল্পেই বাঁচিয়া নবজীবন লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল।

প্রফুল্ল এখন সকলেরই—আশ্রয়স্থল। তাহাকেই এখন লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া সুরেশেরও তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সুরেশ তখনও শয্যাগত, এমন সময় গৃহিণী পড়িলেন। এখন একমাত্র প্রফুল্ল ব্যতীত লোক কোথায়? সুরেশের রোগ ক্লিষ্ট প্রাণে লাবণ্যের দু'দিনের ভালবাসার বিচ্ছেদ যে তীব্র আঘাত প্রদান করিল, প্রফুল্লের কোমল সাহচর্য্যে সে আঘাত তেমন মর্ম্মান্তিক হইয়া সুরেশকে অভিভূত করিতে পারিল না। এখন প্রফুল্ল ধীর-মন্থর গতিতে সুরেশের নিকট আসিত, আসিয়া নিয়মিত সময়ে তাহার পথ্য-ঔষধ দিয়া আবার ধীর-নম্র গতিতে চলিয়া যাইত। কোন দিনও তাহার নিয়মিত কর্ত্তব্যের কোন অন্যথা হয় নাই। সুরেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ব্যারামের পর হইতে সে লাবণ্যকে একটিবারও দেখেনাই কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর হইতে ঘড়ীর—কাঁটার ন্যায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় যেন একখানি ছবি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার মাথার কাছে দাড়াইতেছে এবং তাহাকে ঔষধ-পথ্য প্রদান করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। সে মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই। সহানুভূতির ঢেউ খেলিতেছে।

সুরেশ প্রফুল্লকে ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সুতরাং অনুমানে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার অন্তর মধ্যে একটা নীরব প্রশ্ন সাড়া দিতেছিল—এই সুন্দরীই কি তবে প্রফুল্ল। তা যদি হয়, কৈ তার রূপ, গুণ ও স্বাস্থ্যে তো কোন দোষ দেখিতেছি না; তবে কি সে কালা না বোবা? সুরেশের সন্দেহ ক্রমে গাঢ়হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন সুরেশ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য মাঝে মাঝে শুশ্রূষাকারিণীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিত। স্বল্প ভাষিণী প্রফুল্ল অতি মৃদুভাষায় 'হাঁ' ও 'না' প্রভৃতি সংক্ষেপ উত্তর দ্বারা সুরেশের কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

প্রফুল্লের সেবায় সুরেশ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে থাকিলেও প্রফুল্লের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সে একটা ভীষণ জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। সে ভাবিল যদি ইহার কোন অঙ্গে কোন দোষ না থাকিবে, তবে ইহার বিবাহ এত বিলম্বে হইতেছে কেন? বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিবাহ হয় কেন?

সুরেশ যতই প্রফুল্লের কথা ভাবিতে লাগিল, ততই যেন একটা আকর্ষণ তাহার মাথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। সে আকর্ষণ যেন তাহার জন্য একটা তৃপ্তি ও গৌরব বহন করিয়া আনিল। শোক ও রোগে সে তৃপ্তিও গৌরব তাহাকে উৎফুল্ল না করিলেও একটা নির্ম্মল পুলকধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিল। সুরেশ মনে মনে বুঝিল বিধাতার সংসারে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে!

দিন দিন সুরেশ সকলই বুঝিল। প্রফুল্লের মত ফুল্ল যৌবন-উদ্ভাসিত রূপ ও গুণ সম্পন্না ষোড়শীকে একজন বৃদ্ধের করে তুলিয়া দিবে স্মরণ করিয়া সুরেশের অন্তর দ্বারে ভীষণ আঘাত পড়িল। সে নিজেই এই প্রস্তাবের নায়ক বলিয়া মরমে মরিয়া গেল।

(৪)

সুরেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আজ সে কলিকাতা চলিয়া যাইবে। আহার প্রস্তুত। সুরেশ

আসিয়া আহারে বসিল। রমাপ্রসাদ বাহিরে দাঁড়ান। সুরেশের চক্ষু প্রফুল্লের কর্ম্ম ক্লান্ত মুখ খানির উপর নিবদ্ধ ছিল। প্রফুল্ল চাহিবা মাত্র তাহাদের চারি চক্ষু মিলিত হইল। সুরেশ দেখিল সেই প্রীতি-পুলকিত দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, লজ্জা ও নম্রতা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহা বিষাদে ক্লিষ্ট ও ম্রিয়মাণ।

সুরেশ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিল— "আপনি যথেষ্ট খাটীয়াছেন ও খাটীতেছেন, আপনার ধন্য সাহস।"

সল্পভাষিনী প্রফুল্ল সুরেশের সঙ্গে আলাপ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া মাথা নত করিয়া রহিল। রমাপ্রসাদ বলিলেন— "একা প্রফুল্লইত সবদিক রক্ষা করিয়া চালাইয়াছে; নতুবা মহা বিপদে পড়িতে হইত।"

সুরেশ বলিল "হা এমন খাটুনি আমি আর দেখি নাই।" বলিয়া মাথা তুলিয়া প্রীতি প্রফুল্ল দৃষ্টিতে প্রফুল্লকে নিরীক্ষণ করিল।

(৫)

অবিশ্রান্ত কালচক্রের আবর্ত্তনে আর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আবার জৈষ্ঠ মাস আসিয়াছে।

প্রাতঃকালে রমাপ্রসাদ বাসায় কাজ করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক পিয়ন আসিয়া একখানা "ইনসিওরড" চিঠি দিল। স্নানের সময় হইয়াছে, রমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি ইনসিওরড্ খাম খানা খুলিয়া দেখিলেন এবং সঙ্গীয় চিঠি খানা পড়িতে পড়িতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "চিঠি কোথা হইতে আসিল?" রমাপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"প্রফুল্ল এ মাসেও আমাদিগের জন্য একশত টাকা পাঠাইয়াছে, আর এই মাসেই সকলকে একবার কলিকাতা যাইবার জন্য মাথার দিব্বি দিয়া লিখিয়াছে।"

গৃহিণী হর্ষ গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"প্রতি পত্রেইতো সে আমাকে অনুরোধ করিতেছে। না গেলেই বা কেমন হয়? তার মনে কি হবে না যে মা নাই বলে আমরা তার প্রতি উদাসীন।" রমাপ্রসাদ বলিলেন—"আমাদের ওখ্য তালাপি করিবারও ক্ষমতাই নাই। যাব না, দেখব না, সে কি হয়? এবার যাইতেই হইবে।'

* * * * *

জামাই ষষ্ঠী। রমাপ্রসাদ সস্ত্রীক প্রফুল্লের বাসায় আসিয়াছেন। গৃহিণী এখন রমাপ্রসাদের সম্মতি ব্যতীত কোন কার্য্য করেন না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বামীকে জামাতা ও মেয়ের জন্য দুখানা ভাল কাপড় আনিতে অনুরোধ করিলেন। রমাপ্রসাদ দুইখানা ভাল ঢাকাই কাপড় খরিদ করিয়া আনিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন প্রফুল্ল পূর্ব্ব হইতেই খুব জাঁকালো রকমে ষষ্ঠীর আয়োজন প্রস্তুত রাখিয়াছে।

যথা সময়ে স্বামী স্ত্রীর সম্মিলিত আগ্রহের মধ্যে জামাই ষষ্ঠী শেষ হইল। সুরেশ মস্তকে ধান্য দুর্ব্বা লইয়া যখন শাশুড়ীকে প্রণাম করিল, তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে শাশুড়ী জামাতাকে জামাই ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রফুল্ল ও পিতা মাতাকে মূল্যবান পট্টবস্ত্র দ্বারা ষষ্ঠীর অর্ঘ প্রদান করিল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া সুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল— "মা আমাকে দুইসেট কাপড় দিলেন কেন? সে কি ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান এই দুই হিসাবে নাকি?" প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"মা তোমাকে দিবেন বলিয়া আমি এখানে যে কাপড় রাখিয়াছিলাম, তা ছাড়াও বাবা আজ নিজে কাপড় আনাইয়াছেন সুতরাং ভাগ্যে দুটাই ঘটিল। ভাগ্যবানের বোঝা বাসুদেব নেন।'

সুরেশ বলিল—"মনে রেখো, আইনত আমি কিন্তু একাই দুই। এবং বরাবর দুখানা করিয়াই যেন পাই।"

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়।

"জীবন নশ্বর" এই কথাটা আমরা ছোট কাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। যতই আমাদের বয়স বাড়িতে থাকে, ততই চতুর্দ্দিকে কালের অব্যর্থ নীতির পরিচায়ক প্রমাণপ্রয়োগ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া উপর্য্যুক্ত কথাটীর সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহই রাখিতে পারিনা। তবে একটা বিষয় দেখিয়া যতই আমরা বিস্মিত হই। আমাদের আয়ু দিন দিনই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পিতামহগণ প্রায়

একশত বৎসর বাঁচিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা ৫০ বৎসরও বাঁচিতে পারিব না বলিয়া মনে হয়। কেন যে পারিব না ও কেন যে পারি না তাহারই আলোচনা করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রথম পৃথিবীর আলো দেখিতে পাই, সেই মহা মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের শরীরের একটা বৃদ্ধির যুগ আরম্ভ হয়। যতই দিন যাইতে থাকে, ততই আমরা শারীরিক ও তৎসঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ বশতঃ বয়সের বৃদ্ধি অনুভব করিতে থাকি। এ নিয়ম আমরা জীব জগতে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষও করিয়া থাকি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিপুষ্টি এবং তৎসহযোগে আকৃতির পরিবর্ত্তন সর্ব্বকালে সকল প্রাণীতেই দেখা যায়। অবশ্য জড় জগতে এ প্রকার পরিবর্ত্তন আছে কি না তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছি না। যাহাদের লইয়া আমরা বসবাস করিয়া থাকি, যাহারা প্রতিনিয়ত আমাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রাণী আখ্যা লইয়া বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের সকলের মধ্যে ই এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বকালেই দেখা যায়। তবে এ বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। সেই সীমালাভ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই বাড়িয়া থাকে। সীমার পর পারে আসিলেই বৃদ্ধির ভাব বন্ধ হইয়া যায়। তখনই শরীর আবার কমিতে আরম্ভ করে। মানুষের শরীরের বৃদ্ধিকাল ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত। যখনই ত্রিংশ-বর্ষ উত্তীর্ণ হইল, তখনই সাধারণতঃ শারীরিক বৃদ্ধি থামিয়া যায়। তাহার পর হইতেই ধীরে ধীরে শারীরিক বলহীনতা ও তৎসঙ্গে নানা উপসর্গ জুটিয়া ৫০ কি ৬০ বৎসর বয়সেই শরীরটাকে পরিত্যাগের যোগ্য করিয়া দেয়। এই গেল, যাহারা সুস্থ ও সবলকায় থাকিয়া পরিণত বয়সে কাল-কবলে পতিত হন তাহাদের কথা। এছাড়া অকাল মৃত্যুত আছেই। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহারও কোন আলোচনা করিব না।

যে মানুষ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থকায় থাকিয়াই তৎপরে অস্বাস্থ্যের আগমন বুঝিতে পারে, সে ৩০০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবলকায় থাকে না কেন, সে চিন্তা অনেক সময় অনেকের মনেই আসিয়া থাকে। মানুষের স্বভাবই এই, আর বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে চিন্তা করার সমূহ কারণ ও বর্ত্তমান। আমাদের দেশের কথায় বলিতে গেলে এক কথায়ই ইহার উত্তর দেওয়া চলে। যেমন "শৈশব হইতেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা।" কিন্তু আজকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে কে? যে ঢেউ এখন দেশের আপামর-সাধারণের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের কথা কেহ মনে স্থানও দেয় না। আমাদের এখন আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাস নাই। ডাক্তারের কাছে শিশি ভরা ঔষধ—রাখিতে সুখ আনিতে সুখ, খাইতে ততটা সুখ না হইলেই সভ্যতার খাতিরে সুখ। এখন ইউরোপ আমাদের আদর্শ। সুতরাং এই দীর্ঘ জীবন লইয়া ইউরোপে কি হইতেছে, পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র অবগত করানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগে ইউরোপিয়েরা মনে করিত যে এমন কোনও একটা প্রক্রিয়া আছে, যাহা অবলম্বন করিলে আমরা শত-সহস্র বৎসর বাঁচিতে পারি। ঈশ্বর তাঁহার এই বিশাল সৃষ্টি কেবল শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই তাহা ঠিক। যে মানুষ ৬০ বৎসর বয়সেই কাল-কবলে পতিতহয়, সে যদি ৩০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, তবে তাহাতে তাঁহার সৃষ্টি বৈচিত্রের কোনও অনিয়ম হইবে না। সুতরাং এমন কোনও প্রক্রিয়া আছে, যাহা অবলম্বন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ সুদূর পরাহত হইবে না। ইহার পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আর একটা ভাব আসে। বিজ্ঞান তখন ধীরে ধীরে আপন প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিস্তার করিতে ছিল। ইউরোপ তখন জড়বিজ্ঞান লইয়া মহাব্যস্ত। অবশ্য বর্ত্তমানেও সেই ব্যস্ততার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জড়বিজ্ঞানের মোহে ভুলিয়া অনেকে তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়। সেই দিনে তাহারা মনে ভাবিল, বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনও বস্তু নিশ্চয়ই তিনি রাখিয়াছেন, যাহা খাইলে আমরা বহু বৎসর সুস্থ ও সবল কায় থাকিতে পারিব। এ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। যে রাজ্যে আমরা শরীর রক্ষণোপযোগী এত সমস্ত ঔষধাদি প্রাপ্ত হই, সে

রাজ্যে যে দীর্ঘজীবন লাভের ঔষধও বর্ত্তমান রহিয়াছে, একথা স্বতঃই মনে আসিতে পারে। তখন অনেকেই কোন রাসায়ণিক প্রক্রিয়াতে সেই ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিনা তাহার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। তাঁহারা পৃথিবীর বহুস্থান, বহু বন-জঙ্গল অন্বেষণ করিয়াছেন। অনেক ঝরণার জল লইয়া রাসায়ণিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু এই জীবন-সুধা কেহ কোথাও পাইলেন না।

যে সুধার অন্বেষণে এত অর্থ ব্যয়, এত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, Prof Metchuikoff কতক পরিমাণে সেই সুধার আভাষ পাইয়াছিলেন। Professor Elie Metchuikoff প্যারিস Pasteur Institute এর একজন সদস্য। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদের রক্তের সাদা রক্তবীজাণু (white blood corpusele) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভুবনব্যাপি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনিই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, এই corpusele গুলি শরীরস্থ দুষ্ট বীজাণু সমূহের শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। এবং তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা পক্ষে প্রভূত সহায়তা হইয়া থাকে। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তারী অনেক ঔষধের আবিস্কার হইয়াছে। তাঁহার এই গবেষণার ফলেই তিনি শেষে আমাদের শরীরস্থ tissue সমূহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও নাশ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং পরিশেষে এই আলোচনা হইতেই কি প্রকারে মানুষ বার্দ্ধক্যের হাত এড়াইতে পারে, তাহা নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন।

বুলগেরিয়ার কৃষক সম্প্রদায় অত্যন্ত সবল, সুস্থ, ও দীর্ঘজীবী। ইহাদের দেখিয়াই Metchuikoff এর দৃষ্টি জীবনের এই বিষম সমস্যার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, এই কৃষক সম্প্রদায় প্রচুর পরিমাণে দধি ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন স্বতঃই তাঁহার মনে এই ধারণা উপস্থিত হইল যে হয়ত দধির মধ্যে এমন কোনও জিনিষ আছে, যাহা সর্ব্বরোগের বীজ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘ জীবন দান করিতে পারে। দুধের উপর Lactic acid bacillus নামক একপ্রকার জীবাণুর কার্য্যেতেই দধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং দধিতে নিশ্চয়ই এই জীবাণু প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দধির সঙ্গে এই সমস্ত জীবাণু উদরস্থ হইয়া কি কার্য্য সাধন করে Metchuikoff তখন তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, উদরস্থ হওয়া মাত্রই ইহাদের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। আমরা প্রতিনিয়ত খাদ্য সহযোগে এবং অন্যান্য অনেক প্রকারে এমন অনেক জিনিষ খাইয়া থাকি; যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিষ না হইলেও শরীরের উপর বিষের কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে এই প্রকারে বহুবিধ জীবাণু উদরস্থ করিয়া থাকি। দধির সঙ্গে যে সকল জীবাণু উদরস্থ হয়, তাহারা এই সমস্ত বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিতে পারে Metchuikoff অনেক পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই সমস্ত পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই Metchuikoff দধি প্রয়োগে এক প্রকার চিকিৎসার প্রচার করেন। এই দধি চিকিৎসা প্রায় সকল রোগেই প্রযোজ্য। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অনেক স্থানে এমন কি আমাদের দেশেও এই দধি চিকিৎসা প্রণালী বিস্তার লাভ করিতেছে। তবে ইহা এলোপ্যাথি কিংবা হোমিওপ্যাথির মত এখনও বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ ইহা এখনও শৈশবে।

তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই Lactic acid bacillii সকল সময়ে সম্যক্ কার্য্য কারিতা প্রদর্শনে সমর্থ হয় না। তাহার কারণ এই যে সকল কাজেই একটা ক্ষমতার প্রয়োজন। যদি এই সমস্ত জীবাণু সম্যক্ আহার প্রাপ্তির ফলে জীবন ধারণে সমর্থ হয়, তবেই তাহারা তাঁহাদের কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে পারে। যে সমস্ত খাদ্য এই সকল জীবাণুকে সাহায্য করিতে পারে, সাধারণতঃ আমাদের পাকস্থলীতে সেই সকল খাদ্যের বড় অভাব। সুতরাং তিনি তখন এই অভাব দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। একমাস মধ্যেই তাহার সহকারী M. Woolman কুকুরের পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব অবগত হন। এখন কথা হইতেছে যে এত জীব থাকিতে তিনি কুকুরের পাকস্থলীতে অনুসন্ধান করিতে গেলেন কেন? ইহার

কারণ বোধ করি এই যে কুকুরের আহারে বিরাম নাই, অথচ যাহা খাইতেছে অবাধে তাহাই হজম হইতেছে। যাহা হউক Woolman দেখিতে পাইলেন যে কুকুরের উদরস্থ জীবাণুসমূহ শর্করা জাতীয় পদার্থের উৎপাদনে সম্যক্ সমর্থ। এই কারণে তিনি এই জীবাণু গুলিকে "Glycobacterium" নামে অভিহিত করেন। এদিকে আবার Lactic acid bacillii এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে শর্করা জাতীয় পদার্থ খুব উপযোগী। (এই জন্যই বোধ করি আমাদের দেশে চিনি দিয়া দধি খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত)। সুতরাং মানুষের পাকস্থলীতে কোনও প্রকারে Glycobacterium জীবাণুর চাষ করিতে পারিলেই Lactic acid bacillii নিরুদ্বেগে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিবে, এ সম্বন্ধে Metchuikoff নিঃসন্দেহ হন।

Metchuikoff যে কোনও প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এই স্থির সিদ্ধান্ত প্রচার করেন,তাহা নহে, তিনি যে সমস্ত পরীক্ষার ফলে Glyco-bacteriumএর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিজমত প্রচার করেন, তাহাতে সন্দিহান হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং Metchuikoff এর প্রথম হইতেই বিশ্বাস ছিল যে জীব শরীরে কতকগুলি বিষবৎ পদার্থ রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ আমাদের পাকস্থলীতে প্রতিনিয়তই উৎপন্ন হইতেছে। এই সমস্ত বিষই জীবনীশক্তির উপর স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করতঃ বার্দ্ধক্যের পথসুগম করিয়া দেয়। এই সমস্ত বিষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করিয়া থাকি তাহাদের প্রধান উপাদান অঙ্গার (carbon) অম্লজান (hydrogen) জলজান (oxygen) ও যবক্ষার জান (Nitrogen) এই সমস্ত দ্রব্য যে আমাদের শরীরের পক্ষে বিষ তাহা নহে। তবে ইহারা পরিমাণ মত মিশ্রিত হইলেই শরীরের কাজে লাগিতে পারে। ইহারা বর্ত্তমান থাকাতে খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু হয়। আবার ইহারাই অপরিমিত ভাবে গৃহিত হইলে বহুপ্রকারে শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। মাংস কিংবা রুটী খাইতে ও সুস্বাদু এবং শরীরেরও উপকারী। কিন্তু ইহারা যে সকল উপাদানে প্রস্তুত তাহাদের প্রত্যেকটাই পৃথক পৃথক ভাবে শরীরের উপর বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্যস্থ অঙ্গার (Carbon), জলজানের সঙ্গে মিশিয়া কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস নামক এক প্রকার বিষ-বায়ু উৎপাদন করে। তাহা মানব শরীরের পক্ষে বিষম অনিষ্ট কর। সেই গ্যাস যদি যথা সময়ে ফুসফুস্ হইতে বাহির করিয়া না দেওয়া হয়, তবে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সেই প্রকার জলজানের সঙ্গে মিশিয়া খাদ্যদ্রব্যস্থ অঙ্গার, যবক্ষারজান ও অম্লজান urea, uric acid প্রভৃতি বহু অনিষ্টকর পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। যদি এই urea, কি uric acid মূত্রাশয় হইতে প্রতি নিয়ত বাহির না হইয়া যায়, তবে আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। শরীর তত্ত্বের এই সকল সাধারণ সাধারণ ঘটনা সকলেই অবগত আছেন।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই সকল বিষ কি সম্পূর্ণ প্রকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়? পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে তাহারা সম্পূর্ণ নির্গত হইতে পারে না। আংশিক থাকিয়া যায়। চিকিৎসকগণও অবগত আছেন, আমাদের শরীরস্থ অনেক রোগই এই সকল নির্গমনাবিশিষ্ঠ বিষ হইতেই জাত। এই যে বিষ প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে সঞ্চিত হইতেছে, ইহার কি কোনও কার্য্য হইবে না? Metchuikoff বলেন, এই ভাবে আমরা অহরহ নিজ নিজ শরীরে বিষ পুষিতেছি এবং এই সকল সঞ্চিত বিষের সম্মিলিত কার্য্যকারিতা জীবনীশক্তিকে শীঘ্র শীঘ্র বিনাশের দিকে টানিয়া আনিতেছে। ত্রিংশ-বর্ষ বয়সেই আমরা বার্দ্ধক্যের আগমন বুঝিতে পারি, তাহার কারণই এই।

সুতরাং আমাদের বার্দ্ধক্যের কারণ যে বিষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কতকগুলি জন্তুকে পরীক্ষা স্বরূপ কার্ব্বনিক এসিড সংযুক্ত খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম প্রথম কোনও দোষ গুণ বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু একমাস পরেই এই সকল জন্তুর ধামণিক অসুস্থতা লক্ষিত হয়; যকৃৎ শক্ত হইয়া যায় ও মাঝে মাঝে মূত্রাশয়ের প্রদাহ হইতে থাকে।

Prof. Metchuikoff ও Dr. Henry Smith Williams আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে মাংসাহারে এই সকল অনিষ্ট কর বিষ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে, আর দুগ্ধ ও শাকসবজি আহার করিলে ইহাদের পরিমাণ কমিতে থাকে। এদিকে আবার তৃণভোজী প্রাণীর বেলায় এই সকল বিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অশ্বের নাম করা যাইতে পারে। মানব শরীরেও পরীক্ষা দ্বারা কোনও প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। যাহারা কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জাহার করিয়া থাকেন এবং এমন কি দুগ্ধ পর্য্যন্ত খান না, তাহাদের বেলায় বিষ প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। আর যাহারা মিশ্রখাদ্য খাইয়া থাকেন অর্থাৎ মাঝে মাঝে মাংস ডিম্ব প্রভৃতি খাইয়া থাকেন, তাহাদের বেলায় বিশের পরিমাণ কম হয়। সুতরাং আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব। তবে Paris এর Pasteur Institute এ শ্বেত ইন্দুর নিয়া এক প্রকার পরীক্ষা হয়। শ্বেত ইন্দুর নিয়া পরীক্ষা করার কারণ এই যে ইহারা এক প্রকারের খাদ্য খাইয়াই বহুদিন সুস্থ থাকিতে পারে। এই পরীক্ষার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, আমাদের পাকস্থলীস্থ বিষ সমূহ মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য হইতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তবে ডিমের সাদা পদার্থ আলু প্রভৃতি হইতেও কম অনিষ্টকর।

বহু পরীক্ষার ফলে Metchuikoff এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। এই খাদ্য ইন্দুর প্রভৃতিকে খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের শরীরের বিষের ক্রিয়া ঐ খাদ্যে নষ্ট করিতে পারে। ঐ খাদ্য নিম্ন উপাদান মত প্রস্তুত।

(i) মাংস ও ডিম্ব ... ... বিষোৎপাদক

(ii) শটি ও খেজুর ... ... শর্করা উৎপাদক খাদ্য

(iii) Glycobacterium.

(iv) Lactic acid bacillii (দধি)

ঐ খাদ্য মনুষ্য শরীরে প্রয়োগ করিয়া সবিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এ যাবত Metchuikoff যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আশার তুলনায় কিছুই নহে। কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আশা করিতে পারি যে কালে আমরা বিশেশ্বরের সৃষ্টি হইতেই এমন ভেষজ বাহির করিয়া লইতে পারিব, যাহা খাইলে শরীরস্থ সমস্ত বিষের ক্রিয়া নিবারিত হইতে পারিবে। এবং যদি বিষের ক্রিয়া আমাদের বার্দ্ধক্যের কারণ হইয়া থাকে, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে ইহাই বলিতে পারি যে চির যুবক থাকা আমাদের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

তিনটী টপ্পা।

নেত্রকোণা মহকুমার চন্দনকান্দী নিবাসী হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী একজন কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত বহুতর সখিসংবাদ ও লহর কবি এখন পর্য্যন্তও ময়মনসিংহের শখের দলে সাদরে গীত হইয়া থাকে।

পিতার ন্যায় গিরিশ বাবুরও যাত্রা, নাটক, বাইখ্যামটাতে মন উঠিত না। তিনি অন্যান্য গানাপেক্ষা কবিগানেই অতিশয় আমোদ পাইতেন।

অনেক দিন হইল একবার গিরিশ বাবু,—রায়পুর তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে কবিগানের উদ্যোগ করিয়া, রামু-রামগতি সহ আমাকে আনাইয়া লইলেন।

আমরা আনন্দের সহিত যথা সময়ে আসরে উপস্থিত হইয়া গানারম্ভ করিলাম। ডাক মালসী ও ভবানী বিষয়ক লহর মালসী শেষ হইতেই হুকুম হইল যে, "রামগতি বৃন্দা,—রামু শ্রীকৃষ্ণ, ও বিজয় ঠাকুর কুবজা হইয়া তিন জনে খুব মধুর করিয়া মাথুর পাল্লা গাহিতে হইবে।"

গিরিশ বাবু আরও বলিয়া রাখিলেন যে, "তোমাদের পাল্লার ভাব যেন আদ্যন্ত মানুষী ভাবের মাধুর্য্যামৃত মাখা থাকে। ঐশ্বর্য্য ভাবের সংমিশ্রণে রসভঙ্গ দোষ-দুষ্ট না হয়। অর্থাৎ তোমাদের ছড়া পাঁচালীতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর,রাধাকে আদ্যাশক্তি ঈশ্বরী বোধক কোন শব্দ প্রয়োগ করা না হয়। কৃষ্ণ নন্দঘোষের পুত্র গোয়াল,—রাধা গোপের কন্যা গোয়ালিনী, এবং কুবজা কংসের দাসী সাধারণ মানবী। এই ভাব লইয়া তোমাদের পাল্লা করিতে হইবে।"

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, আমি ও রামু মাধুর্য্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ জন্ত সর্ব্বতোভাবে সতর্কতার আশ্রয় লইলেও, অভ্যাসের অনুরোধে, আমাদের ছড়া পাঁচালীর ফাঁকে ফাঁকে ঐশ্বর্য্যের আভাস উকী মারিয়া গিরিশ বাবুর বদন মণ্ডলে আনন্দ-জ্যোতির অস্ফুট আলো ফুটাইয়া তুলিত। এই প্রসন্নতার কারণ,—"বিজয়-রামু শুদ্ধ মাধুর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না।"

রামগতির কিন্তু তা'ছিল না। তিনি বাবা ভোলা নাথের প্রসাদে বহু দিন হইতে ভুল ভ্রান্তির মাথায় অভ্রান্তির অটল আসন পাতিয়া বসিয়াছেন।

রামগতির একটী কথাতেও ঐশ্বর্য্য ভাবের উন্মেষ মাত্র দেখা গেল না।

এই প্রকারে আমরা পাল্লার উপসংহারে উপস্থিত হইলে, গিরিশ বাবু বলিলেন,—"তোমাদের পাল্লার কথা এখন শেষ হইল, একটী নূতন বিষয় লইয়া তোমরা তিন জনে তিনটী টপ্পা কর। বিষয়টী এই—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রী পূজার সময় সমাগত দেখিয়া, একখান নূতন শাড়ীর জন্ত তাঁহার স্বামীর সঙ্গে কন্দল করিতেছেন, টপ্পাতে কেবল কবির উক্তি থাকিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর উক্তি না থাকা চাই। প্রথম রামগতি, দ্বিতীয় রামু ও তৃতীয় বিজয়, ক্রমে গাহিয়া যাও।"

গৌর ভগবানের কৃপায় আমি তো একটুকু সময় পাইলাম, রামুসরকার ও কিছু, রামগতির মোটেই নাই। দল আসরে উপস্থিত, এখনি গাহিতে হইবে। আমাদের দাওরায় রামগতি অপেক্ষা না করিয়া অমনি গাহিলেন,—

টপ্পা (১)

চেতান,—আশ্বিন মাসে, বঙ্গদেশে,
এসেছে আনন্দের জোঁয়ার।
পারাণ,—মরি হায়রে, যত ধনী লোকে,
কর্ত্তেছে মনের সুখে, সাজ সজ্জা সম্ভার॥
মিল,—তাই দেখে এক নূতন বামনী
বামুনের কাছে শাড়ী চায়।
মহড়া,—কড়ার কাঙ্গাল, (ছিল) বামন বাঙ্গাল,
জঞ্জাল ঘটালো বিধাতায়॥
অন্তরা,—দিন গেল কন্দল করে,—
ব্রাহ্মণ তো ক্ষুধায় মরে,
রাঁধ্‌তে কেটা যায়।
মিল,—(ব্রাহ্মণ) সন্ধ্যা বেলা পাক চড়াইল,
বামনী গে জল ঢেলে নিবায়
আগুন। (কড়ার, ইত্যাদি)

রামগতি ফরমাইস আদায় করিয়া খালাস পাইলেন, এখন রামুর পালা, রামু গাহিলেন,

টপ্পা, (২)

চেতান,—পূজা এলো, ধুম লাগিল,
বাঙ্গালীর ঘরে।
পারাণ,—সকলে, যার যেমন ভাগ্যেতে মিলে.
তেমি বেশ ভূষণ করে॥
মিল,—ছিল মাধু ঠাকুর দক্ষিণ পাড়া,
ভিক্ষা করে দিন কাটায়।
মহড়া,—বিলাসিনী, তার ব্রাহ্মণী,
অমনি নূতন শাড়ী চায়।
অন্তরা,—ঠাকুরাণী রাগ করে,ঠাকুরের চুলে ধরে,
ঠাকুর ধরে পায়,
মিল,—মাঝে পড়ে রামুমালী
দু'জনার বিবাদ ভাঙ্গায়॥
(বিলাসিনী, ইত্যাদি)

রামগতি, রামু কোন মতে পার পাইলেন। এখন আমার পালা, আমি গাহিলাম।

টপ্পা, (৩)

চেতান,—পূজার বেলা, কুলবালা,
সকলে করছে নূতন সাজ।
পারাণ,—মরি হায়রে! একটী গরীব ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণীর শাড়ীর কারণ,
পেলেন বড় লাজ॥
মিল,—শাড়ীর লেগে, উঠছে রেগে,
ব্রাহ্মণী বাঘিনীর প্রায়।
মহড়া, গরীব ব্রাহ্মণ, মরে ভাতের কারণ,
বামনী ঠেকালো তাঁরে দায়॥

অন্তরা,—(হৈল) বকাবকি কতক্ষণ,
তার পরে বাঁধিল রণ,
অগ্নি হু'জনায়,
মিল,—(ঠাকুরের) কাছায় ধরে,
গায়ের জোরে, ঠাকরাণে শাড়ী
কর্ত্তে চায় আদায়॥
(গরীব ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি।)

রামু-রামগতির টপ্পা দুইটী ফরমাইস্ মত শুদ্ধ করিব উক্তিতেই হইয়াছে। এবং টপ্পা দুইটীতে কবিত্বের ঝঙ্কার ও সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। এস্থলে আমার টপ্পাটী লেখা উচিত ছিল না। তবে "এক বিষয়ের তিন টপ্পা, দেখাইবার জন্য অগত্যা অনিচ্ছাতেও লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার এই অনিচ্ছা কৃত ধৃষ্টতার জন্য "সৌরভের" কৃপাময় পাঠক পাঠিকার নিকট কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

গো-ধন।

(সমালোচনা।)

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সংকলিত "গোধন" নামক অতি উপাদেয় গ্রন্থখানা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সাদরে গ্রহণ করতঃ একান্ত আগ্রহের সহিত তাহা আত্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিমলানন্দানুভব করিয়াছি। গ্রন্থ পাঠান্তে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে বঙ্গভাষায় গো-পালন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে গিরিশ বাবুর "গোধন"ই সর্ব্বশীর্ষ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। বঙ্গ ভাষায় গো সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্রেই আমি তাহা পাঠ করিয়া থাকি। ভারতীয় গো সম্বন্ধে ইংরেজী গ্রন্থও আমি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। আমার পিতৃব্য স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরই বোধ হয় বঙ্গ ভাষায় গো-পালন সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রণেতৃগণের অগ্রণী। ইতঃপর এ বিষয় বঙ্গ ভাষায় আরও কতিপয় গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির একখানাও এই গ্রন্থের ন্যায় সুপ্রণালী বদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এবং কোন গ্রন্থেই চিত্র সন্নিবেশিত হয় নাই। এই গ্রন্থে কতিপয় চিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থকার পূর্ব্বাপর ব্যবহারজীবী হইয়াও বিষয় কার্য্যের অবকাশ সময়ে যে গো জাতির উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করতঃ গো পালন বিষয়ক একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা লোক সমাজে প্রচারিত করার অবকাশ পাইয়াছেন, ইহাতে তাহাকে কেবল মাত্র ধন্যবাদ দিলে যথেষ্ট হয় না; সত্যকথা বলিতে কি, গ্রন্থকারকে গো-জাতির পরম হিতৈষী ও অকৃত্রিম বান্ধব বলিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ গো সেবায় নিরত থাকিয়া গো-জাতির যথোচিত উন্নতি বিধান করুন।

বর্ত্তমানে ভারতে গোজাতির অবনতিই আমাদের দুঃখ দারিদ্রের প্রধানতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় বলিয়া মনে হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিকল্পে যত্নপরায়ণ না হইব, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সুখের বিষয় এ বিষয় গিরিশ বাবুর ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আশা হয়, ভারতের গো-জাতির দুঃখ নিশা অচিরেই অবসান হইয়া সুখ সূর্য্যের উদয় হইবে। নাটকসাহিত্য-উপন্যাস-বহুল বঙ্গ সাহিত্যে যে এখন বিজ্ঞান-চিকিৎসা দর্শনেতিহাস প্রভৃতি গভীর বিষয়ে গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, ইহা সাময়িক শুভ লক্ষণ বটে। এই বইখানা বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রন্থের ভাষা সরল ও বিষয়োপযোগী হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কন এবং বহিরাবরণও অতি সুন্দর হইয়াছে। একথাটা বলিতে হয়, তাহাই বলিলাম কিন্তু না বলিলে ক্ষতি ছিল না, কারণ এতদপেক্ষা গ্রন্থখানাবিষয় গৌরবেই অধিক আদরণীয় হইয়াছে। যদিও গ্রন্থকার প্রধানতঃ কতিপয় ইংরেজী গ্রন্থও সংস্কৃত পুরাণাদি অবলম্বনেই গ্রন্থের

অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বঙ্গভাষায় ইহা এক অভিনব ও মূল্যবান গ্রন্থ হইয়াছে। ভরসা করি গো-হিতকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততঃ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গৃহে এক একখানা গো-পালন, গৃহ পঞ্জিকার মত নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়া সাদরে গৃহীত হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে বলিব যে আমাদের জাতির উন্নতির আশা এখনও সুদূরপরাহত। গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ অতএব—

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি।"

এই শ্লোক স্মরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে তাঁহার ন্যায় গো-হিতৈষী কৃতবিদ্য ব্যক্তিই "গোধনের" ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নের উপযুক্ত পাত্র।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ
(সুসঙ্গ)

ভুষণ্ডীর যুদ্ধবার্ত্তা।

কত জায়গা জুড়িয়া সে বট গাছটা ছিল এবং কত উঁচুইবা ছিল, জানি না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর জয়ী পাণ্ডবেরা আপনাদের বীরত্ব জাহির করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন এরূপ যুদ্ধ আর কেহ কখনও করে নাই। আর কোন কালে হয় নাই।

ঐ গাছে বসিয়াছিলেন ভুষণ্ডী কাক। তিনি বালকদের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোমরা ছেলে মানুষ, কি আর যুদ্ধ করিয়াছ? তোমাদের এই যুদ্ধে একটু রক্ত খাইতে, একটু মাংস টানিতে আমার ঠোঁটের ছাল গিয়াছে। হইয়াছিল দেবীযুদ্ধ, আমি হা করিয়া থাকিতাম, স্রোতের মত রক্ত মাংস আকাশ হইতে আমার মুখে আসিয়া পড়িত। তারপর হইয়াছিল রামরাবণের যুদ্ধ। তাহাতে আমার মাথা নীচু করিতে হইয়াছিল, কিন্তু মাটীতে নামিতে হয় নাই। তোমরা আমাকে মাটীতে নামাইয়াছ। আমার ঠোঁটের দফা শেষ।"

এই কাকই কাল এবং ইহাই সে কালের ইতিহাস। কাল তখনও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে যে মহাসমর চলিতেছে আমরা কাল বা কাকের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম। এই বৃত্তান্ত বিলাতের Pearsons' Magazine এ প্রকাশিত হইয়াছে।

সকলই অবগত আছেন, লর্ড কিচ্‌নার আরো ১০ লক্ষ সৈন্য তুলিতে চাহিতেছেন। একদল ব্রিটিশসৈন্যে ১৬ হাজার ঘোড়া চাই। ১০ দশ লক্ষ লোকের জন্য ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ঘোড়ার দরকার। এই ঘোড়াগুলিকে খাওয়াইতে ১২৫০০০ মণ খাদ্য চাই। ইহার জন্য ৪০০ খানা মাল গাড়ী প্রয়োজন। ঐ দশলক্ষ সৈন্য চলিবার জন্য এবং তাহাদের সঙ্গীয় অস্ত্র, শস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদির জন্য ৫হাজার গাড়ী চাই। দৈনিক ৯০৭৫০০ টাকার খাদ্যচাই। এই খাদ্যের ওজন ৪৯৯৮০ মণ। এই খাদ্যের জন্য রুটী প্রস্তুত করিতে ৮৫০০ জন বাবুর্চ্চির দরকার।

এই দশলক্ষ সৈন্যের মধ্যে অনেক লোক মারা যাইবে, অনেক লোক হত হইবে। তাহাদের জন্য ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার বিছানা চাই। ঔষধ পত্র কত তাহা বুঝিতেই পারেন। দশলক্ষ লোকে যে খাকী কাপড় পড়িবে, তাহার দৈর্ঘ প্রায় দুই হাজার মাইল। ঐ কাপড় কলিকাতা নগরের পাঁচগুণ বড় সহরের রাস্তা জুড়িয়া ফেলিতে পারে। কাহারও বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাদিয়া যদি এই দশ লক্ষ লোক যাত্রাকরে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, পনর দিন ও পনর রাত্রিতে অবিশ্রান্ত চলিয়া তবে তাহা শেষ হইবে। বাজার বা জলের কল যদি রাস্তার ও পারে হয়, তবে এই পনর দিবস তোমাকে কলের জল ও বাজার বেসাতির অভাব অনুভব করিতে হইবে। তোমাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ দশ লক্ষ সৈন্য যদি ঘন হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে প্রায় ৩৮ মাইল ব্যাসের একটী বৃত্ত প্রস্তুত হইবে।

এই মহাসমরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া, বেলজিয়াম একদিকে; ইতালিও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। অন্য দিকে জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক। এই ৮টী রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক জলে স্থলে শূন্যে যুদ্ধে নিযুক্ত।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ৩১০৬৬০ হাতী, ৩৯০৬৬০ রথ। ১১৮০৯৮০ ঘোড়া; ১৯৬৮৩০০ পদাতিক নিযুক্ত ছিল। মহাকাল ভূষণ্ডীকাক বলিতেছেন, বর্ত্তমানে একটা মানুষের, একটা ঘোড়ার, একটা হাতীর, একটা রথের পরিমাণ ব্যাপারে যখন দ্বিগুণ, তখন এই সমস্ত সৈন্য সামন্ত এবং আসবাব উপকরণের সংখ্যা এবং পরিমাণ কত তাহা পাঠক অনুমান করুন্।

এসো!

ওগো! বিদেশের বঁধু,
ওগো! জীবনের সখা!
দিয়েছ যে স্মৃতি মধু,
তাই নিয়ে ব'সে একা!
তুমি বাঞ্ছিত, তুমি সুন্দর!
--চির নির্ম্মল তব অন্তর,
তুমি শান্ত-প্রভাত-ভাস্কর,
তুমি উষার আলোক রেখা!
শ্যামল কুঞ্জ মাঝে
তোমারি আবাস তুমি,
এসো ফুল্ল ফুলের সাজে
লইব তোমারে চুমি!
স্মৃতির আলোকে চেয়ো চোখে চোখে
অন্তরে দিয়ো দেখা!
ওগো, জীবনের সখা!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সাহিত্য সংবাদ।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত "লহরীর" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "তীর" ছাপা হইতেছে, পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

আসামের রাণী জয়মতির উপাখ্যান বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। প্রহ্লাদ, মহরম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্তপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জয়মতীর সচিত্র উপাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পূর্ণ বাবুর নূতন সচিত্র বহি "বিক্রমাদিত্য"ও বাহির হইয়াছে। বালক বালিকাগণের জন্য বিক্রমাদিত্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ছেলে মেয়েদের জন্য "শ্রীচৈতন্য চরিত্র" নামক একখানা সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "পূজা ও সমাজ" নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থে বহু গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্দ্ধমান সম্মিলনে "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গৌড়াধিপ রামপালের রাজধানী বিক্রমপুর বর্দ্ধমানে অবস্থিত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ঐতিহাসিকের নিকট সকলই সম্ভব কি?

"ধ্রুবতারা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ, মহাশয় একখানা নূতন সামাজিক উপন্যাস লিখিতেছেন।

করিমগঞ্জ (শ্রীহট্ট) হইতে "শ্রীভূমি" নামক একখানা নূতন সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

ময়মনসিংহ—গফরগাঁও হইতে "সন্তোষ" নামক একখানা ছেলেদের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্র বাহির হইতেছে।

মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর।

(সুসঙ্গ)

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২২। { ১০ম সংখ্যা।

তিব্বত অভিযান।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম।

অনেকে বলেন, অনুমান ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। ইহার পূর্ব্বে এখানে 'তাও' ধর্ম্মের প্রচলন ছিল। এই ধর্ম্ম প্রথমে চীনদেশে খ্রীঃ পূ ৬০৪—৫২৩ এর মধ্যে লাওটস নামক জনৈক সংস্কারক কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা অত্যন্ত কুৎসিত পরিচ্ছদ পরিধান করিত। ইঁহাদের উপাস্য দেবতা সকলের মূর্ত্তি উলঙ্গ ও কুরুচি উদ্দীপক। পূজার সময় উপাসককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে নানা প্রকার কুৎসিত ভাবভঙ্গির সহিত পূজা করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে নরবলী প্রচলিত ছিল। অন্যান্য অনেক প্রাণীকে ইহারা নিতান্ত নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিত। ইহাদের মধ্যে আরও এমন সকল পৈশাচিক আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল যে তাহা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, কর্ণে অঙ্গুলী দিতে হয়। এই জন্য আমরা ইহাকে পিশাচ ধর্ম্ম নামে স্বচ্ছন্দে অভিহিত করিতে পারি। আমাদের দেশে এক সময়ে যে পঞ্চ মকারের সাধন প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা অনেকটা এই পিশাচ ধর্ম্মের মত। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, এই তাও ধর্ম্মই বঙ্গ দেশে গমন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল। এই অনুমান কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম যে ভারত হইতে গমন করিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সময়ে উহা তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শোচনীয় অবস্থা ছিল। একেশ্বর বাদী বৌদ্ধ কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বরবাদ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা এমত সমর্থন করি না; তখন নানা প্রকার দেবদেবীর উপাসনা করিতে শিখিয়াছে। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অনেক কুসংস্কার তখন বৌদ্ধধর্ম্মে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। সেই সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করেন, ও ধীরে ২ তাও ধর্ম্মকে (ইহা তিব্বতে বন্ ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ) দূরীভূত করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতের ইতিহাসের মতে তিব্বত-পতি স্রোন্সন্ গম্‌পো দুইজন নেপালী বৌদ্ধ-রাজকন্যা বিবাহ করেন। রাণী দিগের মন্ত্রণানুসারে রাজা ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে কয়েক জন বৌদ্ধ-প্রচারককে তিব্বতে আহ্বান করেন। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া রাজা, তাঁহার প্রধান ২ অমাত্য এবং সামন্ত বর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু বন্ ধর্ম্মের বদ্ধমূল কুসংস্কার সকল প্রায় অক্ষুন্নই রহিল। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে জনৈক তিব্বত রাজ স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম অবনতি দেখিয়া ভারত হইতে "পদ্মসম্ভব' নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিজের নিকট আহ্বান করেন। পদ্মসম্ভব বিশেষ চেষ্টায় তিব্বতের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি এ দেশের বৌদ্ধদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করেন।

(১) সংসারী, (২) ভিক্ষু—ইহাদিগকে চিরকুমার থাকিতে হয়। (৩) লামা—ভিক্ষু উন্নত হইলে এইপদ প্রাপ্ত হয়েন।

বৌদ্ধ হইবার পরও তিব্বতে দেবদেবীর পূজা বন্ধ হয় নাই। তিব্বতীয়েরা এই সকল দেবতাকে অত্যন্ত ভয় করিত। তাহারা মনে করিত, পূজাদি দ্বারা ইহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিলে ইহারা বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। পদ্মসম্ভব যখন তিব্বতে সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিব্বতের লোক তাঁহাকে পুনঃ২ অনুরোধ করিল যেন তিনি তাহাদিগকে ঐ সকল দেবদেবীর হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ঐ সময়ে তিনি যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ঐ সকল দেবতা তাহাদের অলীক কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহা হইলে আজ হয়ত তিব্বতের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ভাব অবলম্বন করিত। তিনি তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি লামাদিগকে এমন সব মন্ত্র শিক্ষা দিবেন যে, তাহার বলে আর কোনও দেব-দেবী তাহাদিগের নিকট আসিতে পারিবে না। তিব্বতে লামা প্রভুত্বের ইহাই মূল কারণ। সেই হইতে লামারা জনসাধারণের মধ্যে অপদেবতার ভয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে এমন সকল উ[illegible]বন করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, আজকাল এখানকার লোক বুদ্ধদেব অপেক্ষা ঐ অপদেবতাদিগকে সহস্র গুণ অধিক ভয় করে। উহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় তাহারা সদাসর্ব্বদা লামাদিগের স্মরণাপন্ন হয়।

টেটাসং মঠের সন্ন্যাসিগণ।

ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে সন্‌কাপা নামক একজন তিব্বতীয় লামা এক নূতন মত প্রচার করেন। এই মত গেলুম পা নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বতন লামাদিগের পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণের ছিল বলিয়া এই নবীন সম্প্রদায়ের লামারা পীতবর্ণের পোষাক ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান দলাই লামা এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

সন্‌কাপা দেশ হইতে অপদেবতার পূজা দূরীভূত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল কাম হইলেন না। এই সময়ে তিব্বতের প্রায় ১৫ আনা লামা সন্‌কাপার মতাবলম্বী। বড়২ রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই পীত পরিচ্ছদ ধারী লামা। শাসন কার্য্য, সৈনিক বিভাগ, রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই ইহাঁদের হাতে।

তিব্বতের বৌদ্ধদিগের প্রধান মূল মন্ত্র—"ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।" ইহার ভাবার্থ এই; "দলাইলামার চরণ মণিতে প্রণাম!" (ওঁ-প্রণাম, মণি—মণি, পদ্মে—চরণে।) এদেশে যে কোনও শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হউক না কেন, প্রথমে এই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করিয়া চক্র রক্ষিত আছে। ইহার নাম "উপাসনা চক্র।" উহার চারিদিকে নানা প্রকার ধর্ম্ম কথা ও দেবতার নাম লেখা আছে। পূর্ব্বোক্ত মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এই চাকা ঘুরান হয়। লোকের বিশ্বাস, এই প্রকার করিলে অতি মহৎ কার্য্যের ফল লাভ করা যায়। অধিকাংশ মঠের প্রবেশ দ্বারে ঐ মন্ত্র বড় ২ অক্ষরে লিখিত আছে।

এদেশে লামাদিগের এত আধিপত্য বলিয়া অধিকাংশ লোকে নিজের একটি পুত্রকে ভিক্ষুর কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অনেক গৃহস্থ এক একটি কন্যাকে চিরকুমারী রাখে। এই কুমারীদিগের জন্য অনেক গুলি মঠ আছে। কোনও স্থানে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা একই মঠের মধ্যে বাস করে। এই প্রথাটা আমার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। ভিক্ষু লামারা যাহাতে নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে তাহার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ভিক্ষুণীদিগের বিষয়ে কিছুই নাই। এখন এই অশিক্ষিতা ভিক্ষুণী ও অর্দ্ধ শিক্ষিত ভিক্ষুরা যৌবন কালে সর্ব্বদা একত্রে বাস করিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। এই সকল মঠে প্রত্যেক বৎসর যে কি পরিমাণ পাপানুষ্ঠান হয়, তাহা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এই সকল পাপ কর্ম্ম নিবারণের জন্য অনেক রকম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও সুফল প্রসব করে না।

এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার বিশেষ প্রচলন। এক এক সংসারে ৫০।৬০ জন করিয়া লোক। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, এখানে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রচলিত। সব ভাই মিলিয়া এক রমণীকে বিবাহ করে বলিয়া 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এখানে নিয়ম আছে যে, যদি কোনও সংসারের লোক পৃথক হইতে চায়, তাহা হইলে সম্পত্তির অধিকাংশ স্থানীয় শাসন কর্ত্তাকে প্রদান করিতে হইবে। এই জন্য সহজে আর কেহ পৃথক হইতে চায় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দলাইলামা এ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা! চীণ সম্রাট্ বলেন বটে, তিব্বত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তিব্বত সম্পূর্ণ স্বাধীন। দুই জন অশ্বান্ সম্রাটের প্রতিনিধি ভাবে লাশায় অবস্থান করেন বটে, কিন্তু সৈনিক বিভাগ ছাড়া অন্যত্র তাঁহাদের কোনও প্রকার ক্ষমতা নাই।

আমরা জানিতাম, দলাইলামা সমস্ত বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বপ্রধান গুরু। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখিলাম আমাদের এ ধারণা একবারে ভিত্তিহীন। হিমালয় প্রদেশের কয়েকটি রাজ্য, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া ছাড়া অন্য কোনও স্থানের বৌদ্ধেরা তাঁহাকে আদৌ গ্রাহ্য করে না। চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের বৌদ্ধেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি শেষোক্ত স্থান পাঁচটির বৌদ্ধেরা তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অত্যন্ত হীন বলিয়া মনে করে।

এ দেশে লোকের বিশ্বাস দলাইলামার মৃত্যু নাই। তিনি সময়ে সময়ে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের ন্যায় দেহ পরিবর্ত্তন করেন। যখন কোনও দলাইএর দেহ পরিবর্ত্তনের সময় আসে, তখন তিনি স্বীয় অমর আত্মা কোনও নবজাত শিশুকে প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রাচীন দলাইলামার মৃত্যুর (বা দেহ পরিবর্ত্তনের) পর এক কমিটি স্থাপিত হয়। দেশের প্রধান প্রধান লামারা ইহার সভ্য নিযুক্ত হয়েন। কমিটি গণনা দ্বারা স্থির করেন, কোন্ শিশুর মধ্যে দলাইলামার আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক সময় গণনার গোলে একাধিক শিশু নির্ব্বাচিত হয়। তাহার পর এই শিশুদের পরীক্ষা হয়। এই সময়ে শিশুদের অভিভাবকেরা অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। উদ্দেশ্য—যাহাতে তাঁহাদের শিশু ঐ মহৎ পদ প্রাপ্ত হয়। যে সংসার হইতে শিশু নির্ব্বাচিত হয়, তাহার পদগৌরব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই শিশু দলাইলামার নিকটতম আত্মীয়েরা চিরদিন মোটা পেন্‌সন্ ভোগ করেন। তবে এই নবীন দলাইলামার সহিত তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতির কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকে না।

নবীন দলাই-লামা নির্ব্বাচিত হইলে, বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নাবালক থাকেন। ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে একজন অভিভাবক বা গি অল্‌পো নিযুক্ত হয়েন। ইহাঁর কার্য্য, দলাইলামাকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করা। এদেশের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয়। যাহাতে তিনি শত শত লোকের ধর্ম্ম গুরু হইতে পারেন এবং শাসন-কর্ত্তার কার্য্য সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার যথোচিত বন্দোবস্ত করা হয়।

বর্ত্তমান দলাইলামার পূর্ব্বতন চারিজন দলাইলামা অপ্রাপ্ত বয়সে কাল গ্রাসে পতিত হয়েন। দলাইলামা বাল্যকাল হইতেই বিশেষ দূরদর্শী বলিয়া তিনি চারিজন দলাইলামার অকাল মৃত্যুর কাহিনী

অবগত হইবামাত্র গোপনে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার অভিভাবকই ঐ সকল মৃত্যুর কারণ। তিনি ইহা জানিয়া বিশেষ গোলযোগ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি জানিতেন যে যতদিন তিনি নাবালক, তত দিন তিনি ক্ষমতা হীন। এদিকে অভিভাবক মহাশয় অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারী এবং দেশের অনেক বড় লোক তাঁহার হাতে। তিনি যদি প্রকাশ্য ভাবে অভিভাবকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন এবং তাঁহার অভিযোগে প্রমাণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে; এমনকি তাঁহাকেও হয়ত পূর্ব্বতন দলাইলামাদিগের পথে গমন করিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিয়া তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি অভিভাবকের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সুযোগ মত একদিন তাঁহাকে একেবারে নির্ব্বাণের সরল পথে প্রেরণ করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। বর্ত্তমান দলাইলামার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর।

অধিকাংশ ইতিহাস লেখকের মতে ভগবান বুদ্ধ আলেকজান্দরের ভারত প্রবেশের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করেন। খ্রীষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকপতি পঞ্জাবে উপস্থিত হয়েন। তাহা হইলে বুদ্ধদেব আজ (খ্রী ১৯১৫) হইতে ২২৯২ বৎসর পুর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। প্রাচীন পালি পুস্তকের মতে কুশিনগর নামক স্থানে তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই কুশীনগরের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিলক্ষণ মত ভেদ আছে। তিব্বতীয় পণ্ডিতদের মতে, এই কুশীনগর আসামের পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত।

শাক্যসিংহ কপিলাবস্তুতে (আধুনিক Lumbini Garden) জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ গয়ায় তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয় এবং বারাণসীস্থ সারনাথে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। এই জন্য এই সকল স্থান বৌদ্ধ মাত্রেরই মহাতীর্থ। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিব্বতের লোক এই সকল স্থানের খোজ পর্য্যন্ত রাখিতেন না। ১৯০৫।৬ খ্রীষ্টাব্দে তাসীলামা (একজন প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা ও প্রথম শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী) সর্ব্ব প্রথম এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া এখন প্রতি বৎসর বহুতর তিব্বতীয় লামা আমাদের দেশে আসিতেছেন।

বুদ্ধদেবের মতে মানব জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আকর। বিশ্বজগতে চারিটি মাত্র জিনিস নিত্য সত্য (১) দুঃখ ভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব। (২) কামরিপু আমাদের সমস্ত দুঃখের প্রধান কারণ। (৩) কাম জয় ভিন্ন দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। (৪) কামজয়ের জন্য কেবল মাত্র আটটি উপায় আছে। (ক) ভগবানে বিশ্বাস। (খ) সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখা। (গ) সত্যকথা বলা। (ঘ) সত্য কার্য্য করা। (ঙ) সত্য পথে জীবন ধারণ। (চ) সত্য চেষ্টা। (ছ) সত্য অন্তঃকরণ। (জ) সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা।

এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টের ন্যায় তাঁহারও দশ আজ্ঞা আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইহাই মূল ভিত্তি। সেই দশ আজ্ঞা এই: (১) হিংসা করিও না। (২) চুরি করিও না। (৩) পরদার করিও না। (৪) মিথ্যা সাক্ষি দিও না। (৫) অসময়ে আহার করিও না। (৬) মদ্যপান করিও না। (৭) অলঙ্কার বা গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিও না। (৮) উচ্চ স্থানে বসিও না। (৯) নৃত্য গীতাদিতে যোগ দিও না (১০) স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্যের লোভ করিও না।

এই দশ আজ্ঞার সহিত খ্রীষ্টের দশ আজ্ঞার যে পার্থক্য খুব কম তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যে দেশে খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় যে এক সময় বৌদ্ধ প্রচারক গমন করিয়া ছিলেন, তাহা পুরা তত্ত্ব বিদ্‌মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। যিনি বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব গুলি বেশ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি বেশ ভাল করিয়াই আলোচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় আমরা খ্রীষ্ট-জীবনের প্রথম অংশের ইতিহাস আদৌ জ্ঞাত নহি। আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের কোনও পণ্ডিত যদি প্রাচীন হিব্রু ভাষা বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া আসল বাইবেল এবং তৎ সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক গুলিতে এবিষয়ে অনুসন্ধান করেন তাহা

হইলে খ্রীষ্টের ঐ অজ্ঞাত জীবন কাহিনী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বাহির করিতে সমর্থ হইবেন। এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধ এবং হিন্দুর বৈদান্তিক ধর্ম্মের নিকট কি প্রকার ঋণী তাহা একদিন না একদিন আমারা জানিতে পারিব জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম গুলি যে প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম্মের নিকট ঋণী তাহাতে কোন সন্দেহ ও নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের নিকট, খৃষ্ট ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম খৃষ্ট ধর্ম্মের নিকট ঋণী।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতে প্রাণী জগত ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) দেবতা (২) যক্ষ (৩) মানব (৪) নীচজন্তু (৫) প্রেত ও (৬) নারকী জীব। মানব আপনাপন কর্ম্মফল অনুসারে উহার কোনও না কোনও শ্রেণীতে মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা ইহ জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা পরজন্মে যক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেবতা হইয়া জন্মের পর যদি পুণ্যপথে বিচরণ করে, তবে সে নির্ব্বাণ লাভ করে। তির্ব্বতীয়েরা এই মতের উপর রং ফলাইয়া দেবলোককে বিংশতি এবং নরক লোককে ষোড়শ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। এই ১৬টি নরকের মধ্যে ৮টি অত্যন্ত উষ্ণ এবং ৮টি অত্যন্ত শীতল। লামারা এই সকল নরককে এমন ভাবে বর্ণনা করেন,এবং ইহা হইতে মানব জাতিকে রক্ষা করিতে তাঁহারা ভিন্ন যে আর কেহই সমর্থ নহেন, ইহা এমন ভাবে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে তাহারা ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লামাদিগকে নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।

এখন বৌদ্ধধর্ম্ম দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। সিংহল শ্যাম ও ব্রহ্ম যাহা অনুসরণ করিতেছেন তাহা 'দক্ষিণ দ্বিগের বৌদ্ধ ধর্ম্ম' নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বৌদ্ধ দেশের ধর্ম্ম 'উত্তর দেশের ধর্ম্ম' বলিয়া খ্যাত। এই মতদ্বয়কে অনেকে 'মহাযান' এবং 'হীন যান' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা বলেন যে, জগতের অতি অল্প সংখ্যক লোকই নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু অপর দল এবিষয়ে বিশেষ উদার মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এমন দিন আসিবে যখন জগতের সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ সকল'কাহগিয়ুর'নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থের বহুতর টীকা ও টীপ্পনি আছে। তাহারা 'তান গিয়ুর' নামে পরিচিত। শুনিলাম ইহাদের কয়েকটী প্রাচীন মঠে সংস্কৃত ও পালী ভাষার বহু সহস্র পুস্তক রক্ষিত আছে। এই সকল গ্রন্থ যদি কখনও জনসমাজে প্রচার হয়, তাহা হইলে হয়ত প্রাচীন কালের অনেক অজ্ঞাত ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িবে।

ফলিত জ্যোতিষে এদেশের লোকের অগাধ বিশ্বাস। যে সকল লামা বা ভিক্ষু এই শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন,তাঁহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। এখানকার লোকে অপদেবতা দিগকে অত্যন্ত ভয় করে বলিয়া প্রায়ই জ্যোতির্ব্বিদের নিকট গমন করিয়া নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করে। প্রশ্ন সকল প্রায়ই এই প্রকার হয়ঃ— "অমুক স্থানে যাইব, ফল ভাল হইবে কি?" "অমুক অপদেবতা কি এসময়ে আমার প্রতি বিরাগ?" "আমার মেয়েটির বড় অসুখ, কোন্ অপদেবতা এখন তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ? কি উপায়ে তাহাকে শান্ত করিব?" ইত্যাদি। লাসার রাজনৈতিক বিজ্ঞান (Political Department) হইতে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কোনও গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠিলে ঐ মন্দির হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

প্রসিদ্ধ চেঙ্গিসখাঁর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুবলয়খাঁ। ইহাঁর ন্যায় পরাক্রান্ত সম্রাট জগতের ইতিহাসে খুব বিরল। এসিয়া খণ্ডের পূর্ব্ব ও মধ্য ভাগের সমগ্র অংশ ইহাঁর করতল গত ছিল। ইনি নিজে চীন দেশে থাকিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। শাক্য-মঠের মহান্ত মহাশয় পূর্ব্বোক্ত লোহিত পরিচ্ছদ ধারী লামা ছিলেন। ইনি কোনও কারণ বশত কুবলয়খাঁকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি এই মহান্তকে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত বৌদ্ধদিগের সর্ব্ব প্রধান লামার পদে উন্নীত করেন এবং তাঁহাকে সম্মান সূচক 'দলাই লামা উপাধি প্রদান করেন। এই উপকারের বিনিময়ে নবীন দলাই লামা কুবলয় খাঁকে সমস্ত চীন মহাদেশের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে এই সাম্রাজ্য

বাহুবলে পদানত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট বলিয়া কেহ তাঁহাকে স্বীকার করিত না। এক্ষণে ধর্ম্মগুরু দলাই লামার যত্নে তিনি ঐ উচ্চপদ অনায়াসে লাভ করিলেন। এই সময় হইতে তিব্বতে লামাদিগের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। চীন সম্রাট্‌ কুবলয় খাঁ উক্ত মহান্তকে তিব্বতের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত চীন তিব্বতকে করদ রাজ্য বলিয়া মনে করে। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কুবলয় খাঁ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন।

ইহার পর তিব্বতে কি প্রকারে পীত পরিচ্ছদ ধারী লামাদিগের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। লোহিত সম্প্রদায় এই নূতন দলকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে দেশের অধিকাংশ লোক এই নবীন মত অবলম্বন করাতে প্রাচীন লোহিত লামারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইহার কিয়দ্দিবস পরে এক তাতার জাতীয় পরাক্রান্ত নরপতি এই নবীন সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ২ তাঁহার সাহায্যে এই সম্প্রদায়ের একজন লামাকে তিনি দলাই লামার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বয়ং তিব্বতের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে, 'দলাই' শব্দের অর্থ মহাসাগরের ন্যায় বিশাল'।

উপর্য্যুক্ত দলাইলামার নাম লোজং। ইনিই সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন যে, দলাইলামার মৃত্যু নাই। ইনি প্রকাশ করিলেন যে, ভগবানের এমন সময় নাই যে, তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া অবস্থান করেন—অথচ মানব যে সর্ব্বদা দুঃখের মধ্যে থাকে, এমতও তাঁহার অভিপ্রায় নয়। এই জন্য তিনি নিজের এক প্রতিনিধি মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য দলাই লামাই এই প্রতিনিধি। মানব যাহাতে সহজে নির্ব্বাণ লাভের প্রকৃত পথ জানিতে পারে সেই প্রকার উপদেশ দানের জন্য দলাই লামার সৃষ্টি। তিনি ইচ্ছা করিলে মানবের কর্ম্মফলের গতি পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিতে পারেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলে নিতান্ত পাপীও উচ্চতর লোকে গমন করিবার অধিকারী হয়।

দলাইলামা যে প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রতিনিধি তাহা এখানকার লোকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যে কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারিতেন না, দলাইলামা তাহাও পারেন। হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের অধীন। কিন্তু তিব্বতের এই সরদার মহাশয় তাঁহাদেরও উপরে উঠিয়াছেন। তবে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা এইবার বেশ বুঝিয়াছেন যে, দলাইলামার যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, নিজের কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে আমাদের ভয়ে স্বদেশ, স্বরাজ্য ছাড়িয়া, ভিক্ষুকের ন্যায় পথে ২ বেড়াইতে হইত না।

কুবলয়খাঁর সময় তিব্বত যে প্রকারে চীনের অধীন হইয়া পড়ে তাহা আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর কিন্তু চীন সাম্রাজ্যের চারিদিকে নানা প্রকার গোলযোগ আরম্ভ হয়। সেই সুযোগে তিব্বত ক্রমে ক্রমে ঐ অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া ফেলে। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদল তাতার তুর্কিস্থানের উত্তর দিক হইতে উপস্থিত হইয়া লাসা অধিকার করেন। তৎকালীন দলাই লামা উপায়ন্তর না দেখিয়া চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চীন সম্রাট উত্তর দিলেন যে, তিব্বত যদি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি প্রার্থিত সাহায্য প্রদান করিতে কোনও আপত্তি করিবেন না। দলাইলামার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি বাধ্য হইয়া ঐ সর্ত্তে সম্মত হইলেন। তাতারেরা তাড়িত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একদল চীনা সৈন্যের সহিত দুইজন অম্বান লাসায় প্রবেশ করিলেন।

তিব্বত অসভ্যই হউক বা অর্দ্ধসভ্যই হউক, কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ। ঐ সময় হইতে চীনের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য তিব্বতের লোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে তিব্বতে অনেক দিন হইল এক 'জাতীয় দল' গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দলাই লামা এই দল ভুক্ত। গত চীন-জাপান যুদ্ধে যখন চীন ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে

নানাপ্রকারে নিগৃহীত হয়, তখন তিব্বত উপযুক্ত অবসর পাইয়া প্রকাশ্যভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে অম্বানদ্বয়ও লাসা হইতে দূরীভূত হয়েন। আমরা যে সময়ে তিব্বতে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতেছিলাম সেই সময় এই ঘটনা উপস্থিত হয়। আমরা তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, সংবাদ পাইয়া চীন সম্রাট্ (প্রকৃত পক্ষে তাঁহার জননী) দুইজন অম্বানকে লাসা অভিমুখে প্রেরণ করেন। আমাদের লাসা প্রবেশের কয়েকদিবস মাত্র পূর্ব্বে তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ সময় ইংরাজের সহিত গোলোযোগ বাধিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই তিব্বতীয়েরা অম্বানদ্বয়কে সমাদরে গ্রহণ করে।

তিব্বতের মূল মন্ত্র 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁং'র অর্থ আমরা উপরে বিবৃত করিয়াছি। ইহার আর একটি গভীর অর্থ আছে। তাহার মর্ম্ম এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দলাইলামাকে অভিবাদন করা হয়। আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে, এখানকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতে প্রাণী জগত ছয় ভাগে বিভক্ত। মানব আপন কর্ম্মফল অনুসারে এই ছয় ভাগে জন্ম লইয়া থাকে। দলাইলামাকে অভিবাদন করিলে তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার উপাসককে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বাক্য আছে। এক একটী শব্দ এক একটী প্রাণী জগত বোধক। তাঁহার আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম এই—"তুমি ছয়টি প্রাণী জগত অতিক্রম করিয়া যাও অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভকর। মন্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ এই —

ওঁ শব্দের অর্থ দেবলোক
ম " " যক্ষ"
ণি " " মনুষ্য"
পদ " " জন্তু"
মে " " প্রেত"
হুঁং" " " নরক।"

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

বিরহের সুর।

মিলন মোহে অনেক সুর বাজে
একটুখানি আধেক মানা লাজে;
মালা হতে খস্‌ল যদি ফুল,
একটু যদি কাঁপ্‌ল কাণের দুল,
হেলায় যদি একটু হোল ভুল
যত্ন করা রত্নমণির সাজে!

প্রাণের আলো কাঁপ্‌বে রয়ে রয়ে
একটুখানি আধেক জানা ভয়ে;
হাসির 'পরে একটু যাবে দেখা
কাজল ঘন বিষাদ কালো রেখা,
উদাস আঁখি ফিরবে একা একা
ঐ নীলিমার নীরব নীলালয়ে।

সোহাগ তব আমার চিত্তপুরে
জাগ্‌বে ওগো নানান্ সুরে, সুরে।
একটু তৃষার তৃপ্তিহারা গানে,
একটুখানি নীরব অভিমানে,
স্পর্শ যত জাগ্‌বে প্রাণে প্রাণে
ফিরবে হিয়া ফিরবে দূরে দূরে।

আজ্‌কে আমার মর্ম্ম-বীণার তারে
একই যে সুর বাজ্‌ল বারে বারে!
যে কথা আজ গোপন প্রাণের মূলে
সে কথা আজ নদীর কূলে কূলে
লহর পরে লহর তুলে তুলে,
অকাশ ঝরা আঁখির জলধারে।

আঁধার ওগো আঁধার আজি নিশা
কিছুরই আজ পাইনা ওগো দিশা।
আকাশ কোথা' কোথায় ওগো তারা,
কোথায় ওগো জ্যোৎস্না জ্যোতিঃ ধারা?
অন্ধকারে আপ্‌না হনু হারা,
দৃষ্টিহারা কাঁদে আকুল তৃষা!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর।

পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত জমিদার পরিবার আছেন, তন্মধ্যে সুসঙ্গ রাজবংশই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ নিবাসী সোমেশ্বর ঠাকুর পরিব্রাজক বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে গারো পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় সুসঙ্গ পরগণার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যানী দ্বারা আবৃত ছিল। এই অরণ্য প্রদেশের অধিবাসিগণ বাইসা গারো নামক এক ব্যক্তির ভীষণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে ছিল। এই সময় তাহারা নবাগত সোমেশ্বর ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়; তিনি বহু লোকের সহায়তায় বাইসা গারোকে পরাজিত করিয়া সুসঙ্গে রাজ্য স্থাপন করেন। সোমেশ্বর ঠাকুরই সুসঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ।

মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর এই সোমেশ্বর ঠাকুর হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ। ইনি বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ১২৭১ সালের ২০শে আষাঢ় (১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই) স্বর্গারোহন করিলে মহারাজা বাহাদুর ও তাঁহার অপর তিন কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা—রাজা কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর রাজ্য লাভ করেন।

সোমেশ্বর ঠাকুরের সময় হইতে মহারাজা বাহাদুরের পিতামহ রাজা বিশ্বনাথ সিংহের সময় পর্য্যন্ত সুসঙ্গ রাজ-পরিবারে জ্যেষ্ঠানুক্রমিক প্রথা অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল; এই প্রথানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন, অন্যান্য পুত্রগণ সম্পত্তির অংশভাগ করিতেন না, বৃত্তিভোগ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা বিশ্বনাথ সিংহের রাজত্বকালে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা এই চির প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যাইয়া প্রত্যেকের নামে স্বতন্ত্রভাবে নামজারী করান। রাজা বিশ্বনাথ সিংহ এই প্রথা বজায় রাখিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমাই সুসঙ্গের "খান্দানের মোকদ্দমা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা বিশ্বনাথ সিংহের সময় এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়া মহারাজ রাজকৃষ্ণের সময় ইহা শেষ হয়। এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা পরিচালনার পর প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে সুসঙ্গ রাজ পরিবারের এই চির প্রচলিত জ্যেষ্ঠানু ক্রমিক প্রথা রহিত হইয়া যায়। এবং মহারাজা বাহাদুরের অপর তিন সহোদর ভ্রাতাও তুল্যাংশে রাজত্বের অংশ লাভ করেন। জ্যেষ্ঠানুক্রমিক প্রথা রহিত হইয়া গেলেও রাজকার্য্য পরিচালনের সুবিধার নিমিত্ত ১২৮০ বাং সালের ১৭ই পৌষ মহারাজা বাহাদুর ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার মধ্যে এক নিয়ম পত্র সম্পাদিত হয়, তদনুসারে তিনি ১২৮৪ বাং সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ কালেক্টরীতে নাম জারী করিয়া রাজত্বের কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। মহারাজা বাহাদুরের জীবনের দুইটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—এই খান্দানের মোকদ্দমা ও পাহাড়ের মোকদ্দমা।

সুসঙ্গ পরগণার উত্তর সীমা গারো পাহাড়ের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহারাজ রাজকৃষ্ণের পিতা রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের জীবিতাবস্থায় সুসঙ্গ পরগণার এই উত্তর সীমা লইয়া গবর্ণমেন্টের সহিত তর্ক উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহের জরীপ কার্য্য শেষ হইলে গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে ময়মনসিংহের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব সুসঙ্গের উত্তর সীমা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তিনি রাজা প্রাণকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রদর্শিত ও প্রমাণিত গারো পাহাড়ের অন্তর্গত আবল্ গারাই ও সাম্‌ সাম্ গারাই পর্ব্বতমালা সুসঙ্গের উত্তর সীমা নয় বলিয়া স্থির পূর্ব্বক রাজা বাহাদুরের সমস্ত আপত্তি ও আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং উক্ত পর্ব্বত-মালার বহু দক্ষিণে নিম্নভূমিতে অবস্থিত কতিপয় গ্রাম সুসঙ্গের উত্তর সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। অতঃপর রাজা প্রাণকৃষ্ণ যথাক্রমে এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ঢাকা বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের নিকট ও রেভিনিউ বোর্ডে আপত্তি করেন, কিন্তু উভয় স্থলেই তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য হয়। ইহার পর তিনি আদালতে রীতিমত স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই রাজা প্রাণকৃষ্ণ পরলোক গমন করায় মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত

হইয়া এই মোকদ্দমা ও পূর্ব্ববর্ণিত খান্দানের মোকদ্দমা পরিচালন করিতে থাকেন। মহারাজা বাহাদুর জজ ও সদর দেওয়ানী আদালতে এই মোকদ্দমায় সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। ইহার পর ফুলবেঞ্চের বিচারে তরমিম্ ডিক্রী হয়। ইহাতে উভয় পক্ষ প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেন। এই উভয় আপীল নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ২২ আইন প্রণয়ন পূর্ব্বক (Garo Hills Act XXII of 1869) গারো পাহাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদের পক্ষের আপীল উঠাইয়া লন, কিন্তু মহারাজা বাহাদুরের পক্ষের আপীল তাঁহার অনুকূলে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল প্রিভিকাউন্সিল আবল্ গারাই ও সমসম্ গারাই সুসঙ্গের উত্তর সীমা ধার্য্য করতঃ এক রায় প্রকাশ করেন।

এই রায় প্রকাশের পর গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৫০০০০৲ দেড় লক্ষ টাকা দিয়া ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে এক ত্যাগপত্র লিখাইয়া লন; তদবধিই সুসঙ্গের রাজ পরিবার তাঁহাদের বহুকালের অধিকৃত ও নানাবিধ খনিজ পদার্থ ও প্রচুর লাভজনক সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ বিস্তৃত গারো পর্ব্বতের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়াছেন। খান্দানের প্রথা রহিত হইয়া যাওয়ায় রাজ পরিবারে নানাপ্রকার অন্তর্ব্বিবাদের সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার এই প্রভূত লাভজনক এই বহু বিস্তৃত সম্পত্তি হইতে চ্যুত হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতি ও যথেষ্ট পরিমাণে হইল। সুতরাং এই দুইটী মোকদ্দমার ফলে সুসঙ্গ রাজ পরিবারের ভাগ্যচক্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বীয় গৌরব ও মর্য্যাদা অক্ষুন্নভাবে বজায় রাখিয়া এই রাজ পরিবার পূর্ব্ববঙ্গে এতকাল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা রক্ষা করা অতীব কঠিন বিবেচনা করিয়া মহারাজা বাহাদুর চিন্তায় ও দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।

রাজা রাজকৃষ্ণসিংহ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর উপাধি ও ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবারে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে এই মহারাজা উপাধি পুরুষানুক্রমিকরূপে (hereditory) প্রাপ্ত হন। মহারাজা বাহাদুর অতীব উদার প্রকৃতি বিশিষ্ট ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং অতিশয় মিষ্টভাষী, সদালাপী ছিলেন; তাঁহার সহিত আলাপে অতি সহজেই লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তিনি ইংরেজী জানিতেন না। কিন্তু পারসী ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি বিশুদ্ধভাবে পারসী ভাষায় আলাপাদি করিতে পারিতেন। বহু প্রধান প্রধান ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত আলাপে এতদুর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করিয়াও তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছেন। তিনি একজন অতি উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন এবং তাঁহার সন্ধান প্রায় অব্যর্থ ছিল। অনেক বিখ্যাত শিকারী সাহেব তাঁহার শিকার কার্য্যে নৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যে কত ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু শিকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যৌবনাবস্থায় তিনি অশ্ব চালনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় সুসঙ্গদুর্গাপুরে একটী এন্‌ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত ছাত্রাভাবে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নারায়ণদেব বিরচিত পদ্মাপুরাণ (মনসা পাঁচালী) গ্রন্থ নিজে বিশুদ্ধরূপে রচনা করতঃ মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ কাব্য ও শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠে সময়াতিবাহিত করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। জমিদারী কার্য্যে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জমিদারী কার্য্যের নানারূপ সুশৃঙ্খলা বিধান ও উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন রাজবাড়ীর বহু বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় একবার রাজবাড়ী ভীষণ অগ্নিতে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় বহু প্রাচীন দলিলাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে।

তিনি নানাবিধ উপায়ে স্থানীয় উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে দেশের লোক নানাপ্রকার কার্য্যকরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিত্তায় শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের অভাব দুর করিতে পারে তন্নিমিত্ত তিনি দেশস্থ উপযুক্ত লোকদিগকে বিদেশ হইতে ঐ সমস্ত বিত্তায় শিক্ষিত করাইয়া দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষি কার্য্যের ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া একটী বাগান ও নানাবিধ সুস্বাদু ফলের বাগান করিয়াছিলেন এবং গারো পাহাড়ে কয়লা ও চুণের কারবার করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ময়মনসিংহ হইতে দুর্গাপুর যাতায়াতের কোন রাস্তা ছিল না। এই গুরুতর অভাব দুর করার নিমিত্ত তিনি নিজে জেলা বোর্ডের সভ্য হইয়া ময়মনসিংহ হইতে দুর্গাপুর ৩৬ মাইল দীর্ঘ একটী অতি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া যান। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের কোনরূপ কষ্ট দেখিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতেন; প্রজাগণও তাঁহাকে যথার্থ দেবতার ন্যায় পূজা ও ভক্তি করিত।

তাঁহার জীবিতাবস্থায় দুইটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। মহারাজা বাহাদুরের মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ১২৯৫ বাং সালের ৪ঠা চৈত্র রাত্রিকালে সহসা সুসঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺দশভূজা মন্দির হইতে অদৃশ্য হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই যে অশোক বৃক্ষ মূলে সোমেশ্বর ঠাকুর সুসঙ্গ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ অশোক বৃক্ষটীর পাতাগুলি সহসা ঝরিয়া পড়িয়া গাছটি মরিয়া যায়। এই ঘটনাটী রাজ পরিবারস্থ অনেক লোক ও অন্যান্য বহু লোক স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। সোমেশ্বর ঠাকুর সুসঙ্গ রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বে একটী সিদ্ধ-পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষই তাঁহাকে উক্ত অশোক বৃক্ষ মূলে রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই অশোক বৃক্ষটী যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্যের কোনরূপ অমঙ্গল হইবে না; কিন্তু এই বৃক্ষটী মরিয়া গেলেই তোমার রাজ্যের অবনতি ঘটিবে। সোমেশ্বর ঠাকুরের উপদেষ্টা ঐ সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া মহারাজ রাজকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিকই এই অশোক বৃক্ষটী মরিয়া যাওয়ার পর হইতেই সুসঙ্গ রাজ পরিবারে নানারূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজা বাহাদুর ঐ প্রাচীন অশোক বৃক্ষটীর স্থানে ১২৯৬ বাং সালের ১১ই অগ্রহায়ণ আর একটী নূতন অশোক বৃক্ষ রোপণ করান। এই বৃক্ষটী অদ্যাপি জীবিত আছে। (সৌরভ ১ম বর্ষ ৫৪ পৃষ্ঠায় এই অশোক বৃক্ষের চিত্র দ্রষ্টব্য।) প্রাচীনা দশভূজা অন্তর্হিতা হইলে মহারাজা বাহাদুর তৎস্থলে স্থাপনের নিমিত্ত আর একটী নূতন অষ্টধাতু নির্ম্মিতা মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা স্থাপনের পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিমধ্যে কোন এক জঙ্গলে কাজ করিবার সময় কুলিগণকর্ত্তৃক প্রাচীনা দশভূজাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহা আনাইয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহারাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর তাঁহার অংশ পৃথক করিয়া লওয়ার সময় তিনি নূতন দশভূজা মূর্ত্তিটী তাঁহার অংশ মধ্যে প্রাপ্ত হন। প্রাচীন দশভূজা মূর্ত্তিটী অদ্যাপি রাজ পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া রীতি মত পূজিতা হইতেছেন। ইহাপেক্ষা আর একটী বিস্ময়কর ঘটনা মহারাজ বাহাদুরের জীবিতাবস্থায় ঘটিয়াছিল। নিজের তত্ত্বাবধানেরাখিয়া পুত্র ভাতুষ্পুত্র ভাগিনের প্রভৃতিকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি বহুকাল কলিকাতা অবস্থান করেন। এই সময় একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে মা দশভূজা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—তুমি এখানে সুখে কালাতিপাত করিতেছ, আমি যে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছি তাহার কোন সংবাদই রাখিতেছ না। আমার নিয়ম মত পূজা হয় না, রাত্রে গৃহে প্রদীপ থাকে না, মন্দিরের কোণে বৃষ্টির সময় জল পড়ে ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়ের শীঘ্র প্রতীকার কর, নতুবা তোমা' অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। এই স্বপ্ন দর্শনের পর মহারাজা বাহাদুর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাত্রিতেই পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে নিকটে ডাকাইয়া আনাইলেন, তাঁহারা আসিয়া

দেখিলেন মহারাজ বাহাদুরের শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে ও তিনি ভালরূপে কথা বলিতে পারিতেছেন না। সহসা এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। নানারূপ অমঙ্গলের আশঙ্কায় মহারাজা বাহাদুর ও অন্যান্য সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মহারাজা বাহাদুরের আর নিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি স্বহস্তে গোপনে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সমূহের অনুসন্ধান লইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে জানাইবার জন্য ও সত্য হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক পত্র লিখিলেন। পত্র প্রাপ্ত হইয়া কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ পত্রের লিখিত বিষয় সমূহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, পত্রের লিখিত প্রত্যেকটী বিষয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ইহাতে তিনিও অত্যন্ত ভীত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি কালব্যয় না করিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতিবিধান করাইয়া মহারাজা বাহাদুরকে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাইলেন। পাঠক, ইহার অভ্যন্তরে কি গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আপনারা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মহারাজা বাহাদুরের জীবিতাবস্থায় বিদেশ হইতে সুদক্ষ লোক আনাইয়া দুর্গাপুরে একটী স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজা বাহাদুর নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৩৯৭ বাং সালের ১৭ই পৌষ বুধবার অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে সমস্ত পরিবার পরিজন বর্গকে গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া চির বিশ্রাম লাভের আশায় অনন্তের পথে মহাপ্রস্থান করিলেন। মহারাজা বাহাদুরের ৪ পুত্র, মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ, বি, এ, নীরদচন্দ্র সিংহ, নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বি, এ ও তিন কন্যা। সুসঙ্গ রাজ পরিবারের সকলেই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহা মহারাজা বাহাদুরের যত্নেরই ফল।

অন্ধ কবিওয়ালা তারাচাঁদ।

কিছুকাল হইতে "সৌরভ" পত্রে ময়মনসিংহের কবিওয়ালাদের সঙ্গীত-সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যাইতেছে—ইহা প্রত্যেক ময়মনসিংহবাসীর আনন্দ ও আশার কথা সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে যে সকল কবির জীবনী ও তাহাদের সঙ্গীত আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। সৌরভের উদীয়মান লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ও স্বনামখ্যাত কবিওয়ালা শ্রীযুক্ত বিজয়-নারায়ণ আচার্য্য, দুই একজন মাত্র বিখ্যাত কবিওয়ালার সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন—ভবিষ্যতে তাঁহারা আরও লুপ্ত রত্নোদ্ধারের চেষ্টা করিবেন এরূপ আমরা আশা করি।

আমি আজ তাঁহাদের পথানুসরণ করিতে যাইয়া যে একটি কবিওয়ালার জীবনী ও তাঁহার সঙ্গীত আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তিনি হয়তো জনসমাজে তেমন সুপরিচিত নহেন। কবিওয়ালা রামু সরকার বা রাম-গতি সরকারের ন্যায় ব্যবসায় সূত্রে দেশ-বিদেশে গিয়া খ্যাতি লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে ইনি বঞ্চিত—কারণ বিধাতা পুরুষ স্বয়ং ইহাতে বাদ সাধিয়াছেন। এই কবিটির নাম শ্রীতারাচাঁদ দে।

অনুমান বঙ্গাব্দ ১২৪৭ কি ১২৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত রামপুরের সুপ্রসিদ্ধ নন্দীবংশীয় পরলোকগত গোলকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে তারাচাঁদের জন্ম হয়; তাহার পিতার নাম বলরাম দে। ভ্রাতাভগ্নিদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ তারাচাঁদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিশেষ কিছু ভাবিতে হইত না। গ্রামের পাঠশালায় তিনি ভর্ত্তি হইয়াছিলেন—সামান্য অক্ষর পরিচয় মাত্র করিয়াই তাঁহার তথাকার বিদ্যা শেষ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন ১৬ কি ১৭ বৎসর তখন দারুণ বসন্তরোগে তিনি আক্রান্ত হন। বিধাতার বিধানে মৃত্যুর দ্বার হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু "নব্বই হাজার মুদ্রা" মূল্যের দুইটি চক্ষু রত্নই তিনি চির-কালের জন্য হারাইয়া ফেলিলেন। মহাজনের নিকট হইতে "লক্ষ টাকা" কর্জ্জ করিয়া কবি যে ব্যবসায় ফাঁদি-

যেন বলিয়া ধরাধামে আসিয়াছিলেন—সেই মূলধন হইতে দৈব-দুর্ব্বিপাকে যখন "নব্বই হাজার" হারাইয়া গেল, তখন বাকী দশ হাজার মূলধন লইয়া কবি পথ অন্ধকার দেখিলেন —বড় দুঃখে কবি গাহিলেন—

"লক্ষ টাকা কর্জ্জ কইরে ভবের হাটে আই, *
(হায় গো)
পরে হিসাব কিতাব কইরে দেখি, মা, মাগো
আসলে নব্বই হাজার নাই!
আমি দশ হাজারে, কেমন কইরে,
দেনা হ'তে মুক্তি পাই?
তারিণী, দীনতারিণী গো, অধীনের গতি
কেমনে পাই?
হ'ল না আমার হাট-বাজার,
আস্‌তে পথে দিন কাবার,
আমার বিকি-কিনি নাই?
আছি বন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে
পথ দেখনের চক্ষুঃ চাই!"

যৌবনের প্রারম্ভেই অন্ধ হইয়া জীবনের সকল সুখ হইতেই কবি বঞ্চিত হইলেন। সংসারে অকর্ম্মণ্য সন্তানগণই বিধাতার কৃপা বেশি পরিমাণে লাভ করে, ইহা অতি সত্য কথা! একটি ইন্দ্রিয় হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার অপরেন্দ্রিয়ের শক্তি আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকবি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় তাঁহার জীবন-দেবতার চরণে গাহিলেন—

"মাগো, আমারে আনিয়া ভবে
করলে আমার কি সর্ব্বনাশ,
ভবের হাটে, এ সঙ্কটে, দিলে পাঠাইয়ে,
করব বলে সুখের গৃহ-বাস।
তা'তে অন্ধ হ'য়ে বন্ধ থাকায়
চিন্তা হইয়াছে,
ধরায় সুহৃৎ কে আছে, মা আমার গো,
কেবল নামে মাত্র হই তারা চান্‌,
দিবারাত্র রাখ্‌ছ সমান,
তা'তে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান,
মাগো, প্রাণ কেমনে বাঁচে?
দিবানিশি থাকি বসি, কর্ম্ম জানি না,
নাই সুহৃৎ একজন, বাঁচায় এ জীবন,
ঐ চিন্তায় নিদ্রা হয় না!
দুর্গে গো, দিলে সবারে সম্পদ্‌
আমার দুঃখ যে মা—চক্ষু দিলে না!"

গ্রামে গ্রামে তখন সখের কবির দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রামের প্রধান সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্র সম্প্রদায়-ও এই সকল দলের নেতারূপে নিজেরাই আসরে অবতীর্ণ হইতেন। পূর্ব্বে শাস্ত্র-পুরাণ কথাকে মূল সূত্র ধরিয়া কবির আসর জমিয়া উঠিত। বাংলার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য ও আধুনিক কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে সেতু স্বরূপ এই কবিওয়ালাদের গান। গীতি কবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং গীতি কবিতাই বাংলাদেশের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী তাঁহাদের ভাব-সৌরভে ও গঠন-গৌরবে অনুপম। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য এই কবির গানগুলি ভাব-সম্পদে ও গঠন-পারিপাট্যে বৈষ্ণব পদাবলীর সমকক্ষ না হইলেও সাহিত্যে ইহাদের কোথাও স্থান নাই, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা রাজি নহি। হইতে পারে এই সঙ্গীতের পরমায়ু অতিশয় স্বল্প—হইতে পারে, ইহা সাহিত্যের এক নূতন সামগ্রী—তথাপি লোক-সাধারণের মনোরঞ্জনার্থে অবসর-সহচর-রূপে এই ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে—ইহাকে উপেক্ষা করিবার যো নাই। আমাদের মনে হয় সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্ত্তমান বাংলায় এই কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এই প্রসঙ্গের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সুতরাং একণে ইহা পরিত্যক্ত হইল।

চন্দনকান্দী গ্রামের শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও ভবানীপুর নিবাসী পরলোকগত জীবন মজুমদার মহাশয়গণের কবিগান শুনিয়াই কবি তারাচাঁদের কবিগানের প্রতি আসক্তি ও কবিগান শিক্ষার আগ্রহ জন্মে। তৎপরে তাঁহার জন্মভূমি রামপুর পরিত্যাগ করিয়া চন্দনকান্দী গ্রামে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের পিতামহ দেব নন্দীবংশের দুলাল পরলোকগত সূর্য্যকান্ত নন্দী

* 'আই'—গ্রাম্যকথা—অর্থ, 'আসি'।

চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কবি তারাচাঁদ আশ্রয়লাভ করেন। স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার সুযোগ্যপুত্র হাইকোর্টের উকীল মদীয় পিতৃদেব পরলোকগত গিরীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় উভয়েই তদানীন্তন কবিওয়ালাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি রামগতি সরকারও কিছুকাল চন্দনকান্দী গ্রামে উক্ত চৌধুরী মহাশয়দের আশ্রয়ে তাঁহাদের হাটে বাস করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয় নিজেও অনেক গান রচনা করিয়াছেন—এতদঞ্চলে তাঁহার রচিত কবিগান ও হরি সংকীর্ত্তন ঘরে ঘরে আদৃত ও গীত হইয়া থাকে। কবি রামু, রামগতি সরকার সমাজের নিম্নতম সোপানে অবস্থিতি করিলেও কায়েস্থকুল-তিলক কবি সূর্য্যকান্ত ইঁহাদিগকে যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করিতেন ও ইঁহাদের গুণাবলীতে তিনি কি পরিমাণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন,তাহা তাঁহারি রচিত একটি কবি-সঙ্গীতে প্রকাশ পায়—তাহা এই

"গোবরেতে পদ্ম ফোটে সে তো মিথ্যা কথা না,
তা' সাক্ষাতে সব সাক্ষ্য পেলাম, রামু-রামগতি দুজনা।
তারা জন্মকুলের ধর্ম্ম ছেড়ে করেছে উত্তমেরি কাজ;
বাগ্‌দেবীর কৃপাবলে অনর্গল শাস্ত্র বলে
মাথাতে দিচ্চে তুলে সাচ্চা জরীর তাজ!
যেমন, আম্‌ড়া গাছে আম ধরেছে, নিমগাছে বাদাম,
যেমন, ফণীর মাথায় মণি আছে, ঝিনুকেতেও মতি হয়,
ঐ রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয়।
নয় না সে চাম্‌ড়া হাতে,
বেড়ায় না বড় বাজারের পথে পথে--দিনে রাতে,
আবার গৌরবচনের মতে মতে
পাঁচালীতেই ছড়া কয়।
সকলে তাই জানে, দু'জনে দিচ্ছে পরিচয়,
যেমন ডুমুর গাছে ফুল ফোটেনা
কেবল কথামাত্রই হয়!
রামু-ডুমুরের গাছে ভুঁইচাঁপা ফুল ফুটিয়াছে,
রামগতি-প্রতিপদে চন্দ্রেরই উদয়!
যেমন পাশাপাশি দুটি তারা কালিদাস বরুচ,
এসে বাংলা দেশে জংলাতে ভাই
ক'রে গেল দিগ্‌-বিজয়,
রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয়!"

একবার রামগতি ও রামু সরকার যখন আসরে কবির লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইলেন;তখন উভয় দলের একটা মীমাংসা করিয়া কবি সূর্য্যকান্ত যে ছড়াটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"হায়, আমোদে প্রমাদ ঘটায়ে বসেছি
দেখ্ দেখিরে ভাই,
রামগতি আর রামু চাঁদে,
পাঁচালীর ছড়াতে লড়াই!
যেমন শান দিয়ে ক্ষুর প্রাণে হানে,
(নাপিত) রামগতি করছে হাল বেহাল,
রামু (মালী) তাই শান্ দিয়ে চলে ঝাঁকটের কাঁটা খুলে,
রামগতির মাঝ-কপালে বসাবে কোদাল!
কেমন নরসুন্দর ভূমিসুন্দরে বিবাদ,
যেমন, রাক্ষসে বানরে যুদ্ধ কেউ হতে কেউ নয়রে কম,
রামুচাঁদ ভাবছ কিহে, রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম!
যায় জাঁক জমকে ধুয়া গেয়ে
ছড়া কয় চোটপাটে ভ্রুকুটী দিয়ে, কাঁপ্‌ছে হিয়ে,
আবার তোর পানে চায় মিটমিটায়ে,
ঠিক যেমন কালনেমির যম!
রামুচাঁদ ভাবছ কিহে রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম!
এখন ঝক্‌মারি কাজ গেছে
হ'য়েছে সরকারি 'ইন্‌কম্।'
আবার দেখ্ না চেয়ে যাচ্ছে গেয়ে
রামগতির মুখে ক্ষুরের ধার,
যায় আবার ছড়া গেয়ে, চাম্‌টি দেয় র'য়ে র'য়ে,
আড়া, চৌতাল বাগায়ে উড়াচ্ছে বাহার!
এতো মাটী কাটা নয়রে রামু, এক কাটায় কাজ হয়,
তুমি পড়েছ চুল-কাটার হাতে খসাবে তোর খাসা লোম,
রামচাঁদ ভাবছ কিহে রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম!"

এ যাবৎকাল উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণ তাঁহাদের আলয়ে কবি তারা চাঁদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া পিতৃপুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কবি সূর্য্যকান্ত সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

তারাচাদ প্রথম যৌবনে ব্যবস র সখে মুক্তাগাছার বংশধরগণের পূর্ব্বকালায় রাজবাড়ীতে শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে উপর্য্যুপরি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন কবির সরকারের সঙ্গে গান গাহিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামু সরকার ও রামগতি সরকারের সঙ্গেও আঁহাদের এই অদ্ধ কবিওয়ালার প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু রামু রামগতির সহিত তারাচাদের যেমন হৃদ্যতা ছিল, এমন আর কাহারো নহে—তাই, যখন রামগতি সরকার ইহলোক ত্যাগ করেন, কবিওয়ালাগণের আশ্রয়-দাতা ও পৃষ্ঠপোষক "কবির জাহাজ" মদীয় পিতামহদেব সূর্য্যকান্ত চৌধুরী মহাশয়ও যখন নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন রামু সরকার তখনও জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের পরলোক প্রাপ্তিতে কবি তারাচাঁদ বড় দুঃখে গাহিয়াছেন—

"এ লোকে গণ্যমান্য ধন্য ছিল
কবি সে রামগতি সরকার,
তার পরে ঐ রামু সরকার এই
বঙ্গদেশে উড়াচ্ছে বাহার!
ওঁদের কবিত্বগুণ ছিল ভারি,
নামজারি দেশে বিদেশে হয়,
মঙ্গলসিধ্ চন্দ্রনাথ চৌধুরী,
হারাইল্ বিশ্বাস চারগাতিয়া বাড়ী.
ছিল কবির জহুরী
আজও লোকে কয়!
যেমন কালিদাস বরুচের প্রায় - রামু রামগতি,
কেবল আছে মাত্র রামু সরকার
আজও চলে কবির কাজ,
বাবু সূর্য্যকান্তের জীবনান্তে
এককালে ডুব্‌ল কবির জাহাজ!
ছিল হরেকৃষ্ণ সে রামকানাই,
পরাণ মরেছে রামগতিও নাই,
গুণী আর নাই -
ইচ্ছা হয় আমিও ম'রে যাই,
তবে রাখ্‌লে কেন ধর্ম্মরাজ?
বাবু সূর্য্যকান্তের জীবনান্তে
এককালে ডুবল কবির জাহাজ!

(খাদ)—আপশোষে হায় মরি, কি করি
আর যাই না লোক সমাজ!
দেশে হয় না গুণী একটা প্রাণী
এদেশে আর গুণী হবে না,
বিজয় ঠাকুর কবি হলো
এক রকম মন্দ, না ভ'লো,
কালী সরকার শম্ভু ঝালো
ওদের কবি বলি না!
ওদের কবি বলিলে চামচড়াও পাখী বলতে হয়!
এখন তারাচাঁদে বসে কাঁদে
বেঁচে থেকেই হচ্ছে লাজ!
বাবু সূর্য্যকান্তের জীবনান্তে
এককালে ডুবল কবির জাহাজ!"

কুমুরউড়া গ্রামে কবিওয়ালা গোবিন্দ আচার্য্যের সঙ্গে তারাচাঁদের একবার আসরে গানের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। তারাচাদ কুটীলার ভূমিকা ও গোবিন্দ আচার্য্য রাধিকার ভূমিকা লইয়া আসরে নামিলেন। কুটীলা রাধিকাকে বলিতেছেন—

"বউ তোমারে নিষেধ করি
যাস্‌নে যমুনায়।
আছে গোপের এক পোলা.
সেই কদম তলা
আছে দুই বেলা
থাকে ভাজা নায়!
আমি কাল শুনেছি, নন্দের ছেলে
জল ছিটাইল বউ তোর গায়,
বউঠাকরুণ লো এমন হ'লে
তোরে কি আর ঘরে রাখা যায়?
আমি বল্লাম বউ তোরে,
কলস রাখলো মধ্য ঘরে,
বউ লো তুই ফিরে ঘরে আয়!
এমন বউ, হায়, কার ঘরে লো
দিনেতে তিনবার পলায়?"

ইহার প্রত্যুত্তরে রাধিকা অভিমানের সুরে কহিলেন—
"আমার নামে যদি এই বদনাম, তবে আর কখনোই

যমুনায় যাইব না—ঘরে বসিয়া থাকিব, কোনো কাজই আর করিব না, দেখি কেমন করিয়া কাজ চলে?" ইত্যাদি। তখন কুটালা বধূর এই প্রকার অবাধ্যতার কথা শুনিয়া কহিলেন.—

"বউ, তোমারে আন্‌ছি অবধি
(তুমি) আমার কথার অবাধ্য!
যদি কর পরের ঘর,
কাজ করবে বরাবর
'না' করে কার বাপের সাধ্য!
নন্দের ছেলে মন মজাল
মোহন বাঁশি বাজায়ে
গোকুলে কার বউ চলে
এককালে ঘোমটা ফালায়ে!
আমি যাই না আর পাড়া ঘরে,
লোকে মন্দ কয় তোরে,
আসি মাথা নোয়ায়ে,
আজ অপমানী করব তো'।
দাদার কাছে সব ক'য়ে,
গোকুলে কার বউ চলে
এককালে ঘোম্‌টা ফালায়ে।"

তারাচাঁদ হাস্য রসিকতাতেও কম পটু নহেন। উদাহরণ দিলেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে আশা করি। একবার কবিওয়ালা কুটীশ্বর পালের সহিত তারাচাঁদ কবিগানের আসরে নামিলেন। ধর্ম্মালোচনা ছাড়িয়া হঠাৎ কুটীশ্বর পাল তারাচাঁদকে শূদ্র ও সে লোটা গামছা বহন করে বলিয়া একটু বিদ্রূপ করেন। তারাচাঁদ অতি নিপুণ ভাবে তাহার উল্টা জবাব রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষীয় সরকারকে এমন ভাবে শুনাইয়া দিলেন যে তিনি আর এ প্রসঙ্গে কোন কথা কহিবারই সাহস পাইলেন না। তারাচাঁদের গানটি এই—

"আমের গুড়ি বেলের মুথাড়ি *
উপরে তার জড়ি মাকড়ি!
লম্বা তক্তা উপরে পাথর
ঘুরছে ঘুরঘুরি
পালের পুত্‌ বড়াই কর কি?
এক ছটাক্ তেল কম হইলে
বুড়া তেলী-এ চোখ ঘুরায়,
হইল না টাক্. পনেরো ছটাক্
পালের পুত্‌ আর চারটা পাক্ ঘুরিয়া আয়!
কাটা চণ্ডীর মধ্য দিয়া
ঝির্‌ঝিরাইয়া তেল চুয়ায়.
হইল না টাক্ পনেরো ছটাক্
পালের পুত্‌ আর চারটা পাক্ ঘুরিয়া আয়।"

কিছুকাল পূর্ব্বে কোনো কার্য্যোপলক্ষে কবি তারাচাঁদ একজন লোক সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর গিয়াছিলেন। পথ-ভ্রমণে পরিহিত বস্ত্রাদি মলিন হইয়া যাওয়াতে সেখানকার থানার মুন্সি ও এক কনেষ্টবল তাঁহাদিগকে "জংলী" বলিয়া ঠাট্টা করেন। গ্রাম্য-কবি স্বদেশাভিমানে আঘাত পাইয়া একটি রচনা শুনাইয়া দিলেন; তাহাতে মুন্সী ও কনেষ্টবল কবিকে কিছু পুরস্কার দিয়া আপ্যায়িত করিলেন—রচনাটি এই:—

অপ্রিয় কথা অনেক সময়েই শুনিতে হয়। ইহাতে কবিওয়ালাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে আসর জমে না।

"বঙ্গদেশে বাড়ী আমার,
আমি "জংলী" কেম্‌নে হই?
বলেন মুন্সি মহাশয়, আবার কনেষ্টবলেও কয়,
এইদেশে মানুষ পাইনা কই!
যেমন রাম গেছিলেন বনবাসে,
ঠাট্টা করছিল রাক্ষসে,
সেই দশাই ঘট্‌ছে আমার এদেশে!
থানার এক কনেষ্টবল, বুদ্ধি রাখে তিন ডবল,
মরি আপ্‌শোষে!
রাং কি সোণা চিন্‌তে পায় না,
চিন্‌বেই কেম্‌নে বইঁবে!"

বৎসরের শেষে একবার করিয়া পূর্ব্ব ময়মনসিংহের জমিদার মহোদয়গণের নিকট তারাচাঁদ তাঁহার রচনা শুনাইয়া ভুমি, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি পুরস্কার স্বরূপ সংগ্রহ করিতেন। একবার কালিপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী প্রসিদ্ধ "ভারত-ভ্রমণ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া

* মুথাড়ি—গোড়া।

তারাচাঁদ তাঁহার বাড়ীর ও দান-ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত ছড়াটি শুনাইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

(চেতান) হায়, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র
দ্বাপরে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির,
প্রতাপে আদিত্য সম
দানেতে মান্ধাতা সুধীর!
এই কলিযুগে মহারাজা
সকলেই রাজভোগে তৎপর,
দোতালা বালাখানা
দ্বারে রাজপুতের থানা,
ভিখারী যাইতে মানা
কানার হচ্চে ডর!
আসলাম কর্ম্ম-ফেরে ঘুরে ফিরে
(আর) পাইলাম না আশ্রয়,
মরি পেটের জ্বালায় প্রাণ জ্ব'লে হায়
ভাব্‌ছি মনে কোথায় যাই?
(মহড়া) মহারাজ নরপতি, চক্ষুঃহীন
নরের গতি চাই!
শুনি যে সামান্য নাস্তি গতি (?)
অগতি জনার বাণারস গতি,
কাশীপতি,
আমি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র নরের ভূপতি বই গতি নাই,
মহারাজ নরপতি, চক্ষুঃহীন নরের গতি চাই!
(খাদ) আমার যেভাবে দিন যায়, কব কায়,
রাজ-দরবারে জানাই!
আমি হ'য়েছি প্রায় জিতেন্দ্রিয়
নয়নেন্দ্রিয় বিহীনে,
বস্ত্র বই ল্যাংটী-পরা
অন্ন বই ভিক্ষে করা,
কর্ম্মযোগ সাধন করা
হয় প্রতিদিনে!
আবার মৃত্যুকে জয় ক'রে বুঝি হ'লেম মৃত্যুঞ্জয়!
আবার দিন দু'বেলা বিষের জ্বালা
আমার স'য়েও স'য়েও মরণ নাই!
মহারাজ নরপতি, চক্ষুঃহীন নরের গতি চাই!

গ্রাম্য কবি-ওয়ালা তারাচাঁদ গ্রামের কৃষকদের দুর্দশা দুর্গতি দেখিয়া জারিগানের সুরে যে একটি রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে কৃষকদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিবার অবসর পাওয়া যায়। বর্ত্তমান য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রের ফলে বঙ্গীয় কৃষকগণ হাহাকার করিতেছে, আবার অপরদিকে পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে অতি বৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ-মহামারীর সূচনা করিতেছে। এই উপলক্ষ করিয়া তারাচাঁদ কৃষকদের প্রাণের কথা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"এই সব গৃহস্থের মন হ'য়ে গেল কানা,
মাগী পোলার খানা পিনা সকলের চলবেনা,
রে ভাই!
মহাজনেরে কি বুঝাইব, রাজার খাজানা,
দিনে দিনে খাদায় বুঝি উঠাইবেন দানা,
রে ভাই!
(এই) জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষা হৈল এমন আর শুনিনা
শাইল নিল নাইল্যা নিল, সঙ্গে গেল চিনা,
রে ভাই!
নাইল্যা করা গৃহস্থেরা টাকার করে বড়াই,
ইংরেজ-জর্ম্মণে এখন লেগেছেরে লড়াই,
রে ভাই!
খবরের কাগজে শুনি হইল নাকি সন্ধি
ইংরেজে বাণিজ্য করবে রাস্তা করছে বন্দী,
রে ভাই!
কোষ্ঠা কইরা নষ্ট পাইবা পড়বে বিষম ফাঁদে,
সময় থাকতে ধান কর ভাই বলে তারাচাঁদে
রে ভাই!"

এইবার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তারাচাঁদের আরও অনেক রচনা আছে পাঠকগণের ধৈর্য্যের সীমা কতদূর এই প্রবন্ধে তাহার পরীক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

নর-সেবা।

(গল্প)

সহরের একটি বড় রাস্তার ধারে মার্টিন্ এভ্‌ডিসের ক্ষুদ্র একখানি কুটির। জুতা মেরামত মার্টিনের ব্যবসা। রাস্তারদিকে জীর্ণ দেওয়ালে একটী জানালা। ঐ জানালার নিকটে বসিয়া মার্টিন কাজ করিত। সেখান হইতে পথের লোকের পায়ের জুতার উপরে আর দৃষ্টিগোচর হইত না। দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ কুটিরে মার্টিন বাস করিতেছে। এইজন্য ব্যবসা সম্পর্কে তথাকার অনেক লোকই তাহার পরিচিত ছিল। আর মেরামতের জন্য তাহার হাতে আসে নাই এমন জুতাও সে অঞ্চলে অল্পই ছিল। ক্ষুদ্র জানালার পাশে বসিয়া সে অনেক সময় পথিকের জুতায় তালি ইত্যাদি নিজ হাতের বিচিত্র কারু-কার্য্য লক্ষ্য করিত। মার্টিনের কাজের অভাব ছিল না। নিজ ব্যবসায় তাহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল, তাহার চাম ভাল, মজুরীও অধিক চাহিত না আর সে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজটী সম্পন্ন করিয়া দিত। সময় মত কাজ সারিবার সম্ভাবনা না থাকিলে কাজ লওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না।

মার্টিন যেমন অতি সৎলোক ছিল তেমনি বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার আত্মার উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরানুরাগ বাড়িতে লাগিল। মার্টিন্ যখন অন্যের কারখানায় কাজ শিখিতেছিল সেই সময়েই তাহার প্রিয়তমা পত্নী একটী তিন বছরের ছেলেকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করে। তাহার আরও কয়েকটি সন্তান ইতঃপূর্ব্বে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পত্নী বিয়োগের পর মার্টিন্ তাহার প্রাণাধিক প্রিয় ক্ষুদ্র শিশুটীকে গ্রামে তাহার এক ভগ্নীর নিকট রাখিয়া আসিবে মনে করিয়াছিল। তারপর ভাবিল "না, নূতন স্থানে গিয়া তাহার কষ্ট হইবে; আমিই ওকে লালন পালন করিয়া মানুষ করিব।" মার্টিন্ কারখানার কাজ ছাড়িয়া এই কুটিরে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল। ক্ষুদ্র শিশুটীই তাহার জীবনের একমাত্র বন্ধন। এইটীই তাহার স্নেহের উৎস, শোকের সান্ত্বনা, নৈরাশ্য-আঁধারে ক্ষীণ আলোক রেখা। কিন্তু এই সুখ হইতেও ভগবান্ তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। দিবানিশি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যখন মাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশু নবযৌবনে পদার্পণ করিয়া জনকের আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল তখন হঠাৎ সে এক সপ্তাহের জ্বরে হতভাগ্য পিতার ক্রোড় শূন্য করিয়া প্রস্থান করিল।

মার্টিন্ স্বয়ং স্বীয় একমাত্র পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিয়া অরুন্তুদ শোকে উন্মত্ত প্রায় হইল। ভগবানের নিকট দিবারাত্র সে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান্ তাহার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন তাহার মনে বিজাতীয় ঈশ্বর বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত হইল! বিধাতার রাজ্যে ন্যায় বিচার নাই! শোক-দগ্ধ দুঃখ-ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ পিতাকে রাখিয়া কোমল মতি বালককে লইবার কি প্রয়োজন ছিল? মনের খেদে সে গির্জায় যাওয়া বন্ধ করিল।

ইহার পর একদিন তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে একজন বৃদ্ধ কৃষক যাত্রী আসিয়া মার্টিনের কুটিরে আশ্রয় লইল। কথা প্রসঙ্গে মার্টিন আগন্তুকের নিকট আপন সকল দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল,—"ভাই, বাঁচিয়া থাকিবার আর আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি এখন ঈশ্বরের নিকট মৃত্যুর কামনা করিতেছি, সংসারের সকল আশাই আমার জন্মের মত ফুরাইয়াছে।"

আগন্তুক বৃদ্ধ দুঃখিত হইয়া কহিল- "মার্টিন, এসকল কথা ঠিক নয়। ভগবানের বিচার ভাল কি মন্দ আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব? ইহা আমাদের চিন্তারও অতীত। তাঁহার ইচ্ছা যে তোমার ছেলে মরিবে আর তুমি বাঁচিয়া থাকিবে। তোমার এবং তোমার সন্তান উভয়ের পক্ষেই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর বিধান। তুমি মনে করিয়াছিলে আত্মসুখের জন্যই তোমার জীবন, এই জন্যই তুমি এখন নিরাশ হইয়াছ। "কাহার জন্য তবে মানুষ বাঁচিবে?" মার্টিন জিজ্ঞাসা করিল। ভগবানের জন্য, মার্টিন! তিনিই তোমাকে জীবন দিয়াছেন সুতরাং তাঁহার কাজে জীবন উৎসর্গ করিলে তোমার আর কোন দুঃখই থাকিবে না।

মার্টিন্ কিছুক্ষণ নীরব রহিল; তারপর আবার

জিজ্ঞাসা করিল—কিরূপে মানুষ ভগবানের জন্য বাঁচে? "যীশু খ্রীষ্টই আমাদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। একখানা বাইবেল কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ কর তবেই কিরূপে ভগবানের জন্য জীবন ধারণ করিতে হয় জানিতে পারিবে। উহাতে সবকথা বুঝাইয়া লিখিত হইয়াছে।"

বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীর কথাগুলি মার্টিনের হৃদয়ে যেন অনল সংযোগ করিল। সেই দিনই সে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত একখানি বাইবেল্ কিনিয়া আনিল এবং অদম্য উৎসাহে পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমে তাহার ইচ্ছা ছিল কেবল পর্ব্বদিনেই বাইবেল্ পাঠ করিবে কিন্তু যতই সে পড়িতে লাগিল ততই তাহার মন উহাতে এমনই আকৃষ্ট হইল যে প্রত্যহ না পড়িয়া সে আর থাকিতে পারিত না। সন্ধ্যার সময় মার্টিন্ পড়া আরম্ভ করিত আর যে পর্য্যন্ত প্রদীপ নিঃশেষে তৈল শোষণ করিয়া নির্ব্বাপিত না হইত সে পর্য্যন্ত তাহার আর বিরাম ছিল না। ভগবানের জন্য জীবন ধারণ কি, ভগবান মানুষের নিকট কি প্রত্যাশা করেন, বাইবেল্ পড়িতে পড়িতে মার্টিন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল। দিন দিন তাহার শোকভার লঘু হইতে লাগিল। পূর্ব্বে রাত্রি-কালে পত্নী-পুত্রশোকে বিনিদ্র-নয়নে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছে এখন "তোমার নাম জয়যুক্ত হউক ভগবান্, তোমারই ইচ্ছাপূর্ণ হউক" বলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে তাহার অধিক বিলম্ব হয় না!

দিন দিন মার্টিনের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে সে হোটেলে গিয়া চা পান করিত; মদেও অরুচি ছিল না। তাহার সে অভ্যাস এখন আর নাই, মদ্য সে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে। নুতন পথে তাহার জীবন শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একদিন মার্টিন্ বাইবেলের লুক লিখিত সমাচারের একস্থানে পাইল- "যে তোমার এক গালে চড় দেয় তাহাকে তুমি অপর গাল ফিরাইয়া দিও।" এই কথাটী সে বারবার পাঠ করিল। তার পরই আবার লিখিত আছে 'তোমরা আমাকে হে প্রভো বলিয়া ডাক কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা তোমরা পালন করনা।"

লুকের সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত একটী ঘটনা পাঠ করিয়া মার্টিনের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল ও সন্তপ্ত হইল। ঘটনাটী এই,—মহাত্মা যীশু একদা সিমন্ নামক একজন ধনী য়ীহুদী গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া একটী অনুতপ্তা পতিতা রমণী তাহাকে দর্শন করিতে আইসে। সে সুগন্ধ তৈল যীশুর চরণে মাখিয়া অশ্রুদ্বারা তাহা ধৌত করিল ও নিজের চুল দ্বারা পদ যুগল মুছাইয়া দিল। কিন্তু যাহার গৃহে যীশু অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সিমন্ তাহাকে পা ধুইবার জলও দিল না। যীশু সিমনকে কহিলেন—"আমি তোমার বাটীতে আসিলাম তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলে না। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী চক্ষের জলে আমার চরণ ধৌত করিয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন করিলে না কিন্তু যে অবধি আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি এ আমার চরণ চুম্বন করিতেছে। তুমি তৈল দ্বারা আমার মস্তক অভিষিক্ত করিলে না কিন্তু এ সুবাসিত তৈল দ্বারা আমার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছে।" এই পর্য্যন্ত পড়িয়া মার্টিন চক্ষু হইতে চশ্‌মাটী খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং গম্ভীর ভাবে, বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"আমিও সিমনের মত কেবল আত্মসুখ লইয়াই বিব্রত রহিয়াছি। কৈ! অতিথি অভ্যাগতকে ত আমি সাধ্যমত যত্ন ও সেবা করি না! সিমন্ নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের কথা ভাবিল কিন্তু অতিথিকে সমাদর করিল না। সেই অতিথি কে? স্বয়ং ভগবান্। তিনি যদি আমার গৃহে আসেন তবে কি আমিও তাঁহাকে ঐরূপ অনাদর করিব? মার্টিন করতলে মস্তক স্থাপন করিয়া নীরবে মুদ্রিত নয়নে ভাবিতে লাগিল। অজ্ঞাতে তাহার একটু তন্দ্রার আবেশ হইল। সহসা তাহার কানে কানে কে যেন ডাকিল—'মার্টিন!' মার্টিন চমকিয়া উঠিল 'কে'? চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহই নাই। আবার সে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রামগ্ন হইল। আবার সেই ধ্বনি—'মার্টিন! মার্টিন!' এবার সে অতি পরিষ্কার শুনিতে পাইল। "মার্টিন! আমি কাল আসিব, তুমি রাস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিও!"

মার্টিনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে নিজ চক্ষু ভাল করিয়া রগড়াইয়া বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে জাগ্রতাবস্থায় কি নিদ্রাবেশে ঐ সকল কথা শুনিয়াছে তাহাই স্থির করিতে পারিল না। তখন মার্টিন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রদীপটী নির্ব্বাপিত করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মার্টিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়া আহার করিল এবং আহারান্তে জানালার পাশে কাজে বসিল। কাজ করিতে করিতে তাহার মনে কেবল আগের দিনের রাত্রের কথাগুলি জাগিতে লাগিল। সে কি স্বপ্ন দেখিয়াছে না, সত্যই শুনিয়াছে। তাহার ধারণা হইল যথার্থই সে ঐ সকল কথা জাগ্রতাবস্থায় শুনিয়াছে।

মার্টিন কাজ করে আর কতক্ষণ পরেই ঐ জানালা দিয়া রাস্তার দিকে তাকায়। যখনই কোন অপরিচিত জুতা দেখে তখনই সে জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া পথিকের মুখ দেখিয়া লয়। প্রথমে নূতন জুতা পরিয়া একজন দারোয়ান গেল, তারপর একজন পণ্যবাহী তারপর সাবল হস্তে অতি জীর্ণ জুতা পরিহিত একবৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ তাহার জানালার নিকট আসিল। মার্টিন উহার জুতা দেখিয়াই চিনিল, এ ব্যক্তি ষ্টেপেন্নুক্। ষ্টেপে-ন্নুক্ এক দোকানীর আশ্রয়ে পালিত। সে মজুরের কাজ করে। ষ্টেপেন্নুক মার্টিনের দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং নীরবে 'সাবল' দিয়া রাস্তার জমাট বরফ সরাইতে লাগিল। মার্টিন্ তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় নিজ কাজে মনোনিবেশ করিল। কাজ করিতে করিতে মার্টিন্ মনে ভাবিল—"আমার বয়স বাড়িতেছে আর আমি নির্ব্বোধ হইতেছি। কোথায় আমি যীশুর আগমন প্রত্যাশা করিতেছি আর এ কি না একটা মজুর! মূর্খ আমি! অলসের ন্যায় অসার কল্পনা করিতেছি।" মার্টিন্ এ কথা ভাবিতে ভাবিতে আরও দশ ঘা সেলাই করিল। তারপর জানালার কাছে মাথা নিয়া আবার বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল ষ্টেপেন্নুক দেওয়ালের গায় সাবলটী হেলান দিয়া রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে আর নিজ শীতল দেহ উত্তপ্ত করিতেছে। মার্টিন্ ভাবিল 'বুড়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে, আর কাজ করিবার উহার শক্তি নাই। একটু চা একে দিলে কেমন হয়!' অমনি সে তাহার সেলাইর যন্ত্র রাখিয়া উঠিল, গরম জলের কেট্‌লিটী টেবলের উপর রাখিয়া উহাতে কতকগুলি চা নিক্ষেপ করিল এবং জানালার কাছে গিয়া বৃদ্ধ ষ্টেপেন্নুককে গৃহে আসিতে সংকেত করিল।

এস ভাই! একটু গরম হয়ে যাও। তোমার শরীরটা একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। ষ্টেপেন্নুক্ দরজার নিকট আসিয়া থামিল। পাছে বরফে ও কাদায় ঘর অপরিষ্কার হয় সেই আশঙ্কায় সে জুতা মুছিতে চেষ্টা করিল কিন্তু দুর্ব্বলতা হেতু কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

"এর জন্য ভাবনা কি? আমি মুছাইয়া দিতেছি। আর ঘর পরিষ্কার করা ত আমার নিত্য-কর্ম্ম। তুমি ভিতরে আইস।"

ষ্টেপেন্নুক্ ভিতরে গিয়া বসিল। মার্টিন তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে এক পেয়ালা চা ও এক টুক্‌রা রুটি আনিয়া উপস্থিত করিল। ষ্টেপেন্নুক্ রুটির টুক্‌রা খানিকটা কামড়াইয়া লইল এবং এক নিঃশ্বাসে চা'র পেয়ালাটী শূন্য করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। মার্টিন্ আর এক পেয়ালা চা তাহার সম্মুখে রাখিয়া বিনীতভাবে কহিল—"আর একটু চা খাও।" ষ্টেপেন্নুক্ চা খাইতে খাইতে মার্টিন্ যে ঘন ঘন জানালার দিকে তাকাইতেছে ইহা লক্ষ্য করিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মার্টিন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, তুমি কি কাহারও আগমন প্রত্যাশা করিতেছ?"

"আমি ভাই, তা এখনও ঠিক জানি না। আশা করি ও বল্‌তে পারি না, নাও বলিতে পারি না। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি কি না তা বুঝিতে পারিলাম না।" তখন মার্টিন্ পূর্ব্ব রাত্রের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক তাহার নিকট বিবৃত করিয়া কহিল—"দুইবার শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন মার্টিন্ পথের দিকে তাকাইয়া থাকিও, আমি কাল আসিব। ভাই, তোমার কি বিশ্বাস হয়? আমার

নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজকেই ধিক্কার দিতেছি তবু আশায় আছি বুঝিবা তিনি আসেন।

ষ্টেপেসুক্ মাথা নাড়িল কিন্তু কিছু কহিল না। ইতি মধ্যে তাহারা চা'র পেয়ালা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। মার্টিন্ আর এক পেয়ালা চা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল—"এইটাও খাইতে হইবে। এতে তোমার শরীরের উপকার হইবে। ভাই, ঘৃণা করিও না, আমাদের পিতা যখন পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই। গরীব দুঃখীকে তিনি আরও বেশী দয়া করিয়াছেন। যে নিজকে বড় করিতে চায় সে ছোট থাকিবে। যীশু বলিয়াছেন—"তোমরা আমাকে প্রভু বলিয়া ডাক কিন্তু আমি তোমাদের পা ধুইয়া দেই। যাহারা শ্রেষ্ঠ হইতে চায় তাহারা আগে সকলের ভৃত্য হউক।" এই জন্যই প্রভু বলিয়াছেন, যাহারা শান্তি স্থাপক, আর যাহারা দীন-দুঃখী তাহারাই ধন্য।"

ষ্টেপেসুক্ অতিশয় দুঃখী কিন্তু তাহার হৃদয়টী বড়ই করুণ। মার্টিনের কথায় তাহার অন্তর গলিয়া গেল, নীরবে তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। চা খাইবার কথা সে ভুলিয়াই গেল। মার্টিন তাহাকে আবার অনুরোধ করিল কিন্তু সে আর চা খাইলনা পেয়ালাটা দূরে সরাইয়া মার্টিনকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল— ভাই, তোমার নিকট আসিয়া আমার আত্মা এবং শরীর উভয়ই সুস্থ ও সবল হইয়াছে। এখন আসি।

ভাই, দয়া করিয়া আবার আসিও। অতিথি পাইলে আমি বড় সুখী হই। ষ্টেপেসুক প্রস্থান করিলে মার্টিন আবার কাজে বসিল। কিন্তু দৃষ্টি তার ঐ পথের দিকে। দুইটী সৈনিক পুরুষ রাস্তাদিয়া গেল। তারপর পাশের বাড়ীর কর্ত্তা গেল, তারপর একটি রুটিওয়ালা, তারপর একটী স্ত্রীলোক দেখা দিল। স্ত্রীলোকটীর পরিচ্ছদ অতি মলিন, অতি জীর্ণ। মোজা ও জুতা একেবারে ছিড়িয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত! নিদারুণ শীতেও তাহার গায় গ্রীষ্মকালীন পাতলা জামা। কোলে একটী ক্ষুদ্র শিশু। স্ত্রীলোকটী বাতাসের দিকে পিঠদিয়া একটা দেওয়ালের উপর আনত হইয়া শিশুটীকে ভাল রূপে কাপড়ে জড়াইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তদোপযোগী প্রচুর কাপড় ছিলনা। শিশুটী শীতে কাঁদিতে লাগিল, স্ত্রীলোকটী কিছুতেই উহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইলনা। মার্টিন্ কাজ ছাড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া কহিল-শিশুটীকে নিয়ে এই শীতে বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন মা? ভিতরে আইস। ঘরে আসিলে শিশুটীও শান্ত হইবে।

স্ত্রীলোকটী চাহিয়া দেখিল এক অপরিচিত বৃদ্ধ নাকে চশ্‌মা দিয়া কুটিরের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে নির্ভয়ে তাহার নিকটে গেল। তখন উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটীকে বিছানা দেখাইয়া দিয়া কহিল এখানে আগুনের কাছে বস, শিশুটীকে একটু গরম কর তারপর উহাকে খাওয়াইবে।

বৃদ্ধ ক্ষিপ্র হস্তে আল্‌না হইতে একখানি কাপড় লইয়া টেবিলের উপর পাতিল, একটী ডিস্ আনিল, কয়েক টুক্‌রা রুটি ও কিছু তরকারীর সূপ টেবিলের উপর সাজাইল, তারপর স্ত্রীলোকটীর কাছে গিয়া বলিল— 'তুমি কিছু খাইয়া লও; আমি তোমার শিশুটীকে রাখি। আমারও সন্তান ছিল। কিরূপে সন্তানের যত্ন করিতে হয় আমি জানি!'

স্ত্রীলোকটী খাইতে বসিল। মার্টিন শিশুটীকে খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিল। খাইতে খাইতে স্ত্রীলোকটী তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে মার্টিনের নিকট কহিল,—

"আমি একজন সৈনিক পুরুষের স্ত্রী। বিবাহের আট মাস পর আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার সন্তান হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক বাড়ীতে পাঁচিকার কার্য্য করিতাম। আজ তিন মাস যাবৎ আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই। স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছি। যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম সমস্তই খাইয়া শেষ করিয়াছি। আমি wet nurse (স্তন্যদাত্রী ধাত্রী) হইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমাকে শীর্ণা দেখিয়া কেহ রাখিল না। আমার পিতামহী এক বণিকের বাড়ীতে থাকেন, সেখানে আমার থাকিবার সুবিধা হইয়াছে। বণিকের স্ত্রী অতিশয় দয়াবতী। তিনি আশ্রয় না দিলে এ দুর্দ্দিনে কোথায় যাইতাম?

আজ সেইখানেই যাইতেছিলাম। শীতে একবারে মরিয়া গিয়াছি, শরীর অবশ হইয়া গিয়াছে। মার্টিন্ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তোমার গরম কাপড় নাই বুঝি!

'বাবা! শীত পড়িয়াছে, এখন গরম কাপড়েরই সময় বটে। কাল পাঁচ পেন্সের জন্য আমার শালখানি বন্ধক দিয়া আসিয়াছি।'

মার্টিন্ নীরবে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একটা পুরাতন জ্যাকেট বাহির করিয়া আনিল এবং তাহা স্ত্রীলোকটীর হাতে দিয়া কহিল—দেখ্‌তে খারাপ হইলেও উহাতেই তামার বেশ শীত মান্‌বে।

স্ত্রীলোকটী জ্যাকেট্‌টী হাতে লইল এবং বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মার্টিন্ তাহাকে কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার নীচ হইতে একটী ট্রাঙ্ক টানিয়া উহা হইতে কি বাহির করিয়া আনিল। ইত্যবসরে স্ত্রীলোকটী বিছানা হইতে ছেলেটীকে তুলিয়া কোলে লইল এবং বৃদ্ধ গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল,—বাবা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তিনিই আমাকে তোমার জানালার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন, তিনিই জানালার দিকে তোমার চক্ষু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

মার্টিন্ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—তিনিই সব করেছেন। জানালা দিয়া তাকাইয়া থাকা আমার নিষ্ফল হয় নাই। তারপর সে তাহার স্বপ্ন-শ্রুত আশ্বাস-বাণীর কথা বিবৃত করিল।

স্ত্রীলোকটী শুনিয়া কহিল—কিছুই অসম্ভব নয়। তারপর সে জ্যাকেট্‌টী গায় দিল, শিশুটীকে ভাল করিয়া জড়াইল এবং বৃদ্ধকে আবার ধন্যবাদ প্রদান করিল। মার্টিন্ তখন তাহার হাতে পাঁচটী পেনি দিয়া কহিল—যীশুর দোহাই, মা লও, তোমার শালখানি ছাড়াইয়া নিও।

স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেলে মার্টিন্ খাদ্য দ্রব্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল আহার করিল, এবং পাত্র সকল ধুইয়া আবার কাজে বসিল। জানালার দিকে তেমনি দৃষ্টি! পরিচিত অপরিচিত কত লোক গেল, কিন্তু লক্ষ্য করবার মত কেহই গেল না।

কিছুকাল পর এক ফলওয়ালী বৃদ্ধা সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাহার মাথায় একটা বুঝাই ছালা, হাতে একটা আপেলের ঝুড়ি। অধিকাংশ আপেল্‌ই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। ঝুড়িতে কয়েকটা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ছালাটার মুখ ভাল করিয়া বাঁধিবার জন্য সে উহা রাস্তায় নামাইল এবং আপেলের ঝুড়িটী একটী খুটির উপর রাখিল। বৃদ্ধা যখন ছালা বাঁধিতে ব্যস্ত ছিল তখন এক দুষ্ট বালক সেই সুযোগে তাহার ঝুড়ি হইতে একটা আপেল্ লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। অমনি বৃদ্ধা তাহার জামার আস্তিনে ধরিয়া ফেলিল বালক ছুটিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা অন্য হস্তে বালকের মাথার টুপিটা ফেলিয়া দিয়া তাহার লম্বা চুলে বেশ দৃঢ় করিয়া ধরিল। বালকও বুড়ীকে অবিশ্রান্ত পদাঘাত করিতে ক্রটী করিল না। ব্যাপার দেখিয়া মার্টিন্ গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। ব্যস্ততায় সিঁড়ির উপর তাহার চশ্‌মাখানি পড়িয়া গেল, সে লক্ষ্যই করিল না। বালকটী চেঁচাইয়া বলিতেছিল—আমি তোর আপেল্ নেই নাই। কেন আমায় ধরিয়াছিস্। আমাকে ছাড়।

মার্টিন্ উভয়কে ছাড়াইবার চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বৃদ্ধাকে কহিল—মা! একে ক্ষমা কর, ছাড়িয়া দাও।

বৃদ্ধা—আমি একে এমন ক্ষমা করবো যে চাবুকের আস্বাদটা তার অনেক দিন মনে থাক্‌বে। এখনই ওকে পুলিশে নিয়া যাইতেছি।

ছেড়ে দে মা, ও আর এমন কাজ করবে না। যীশুর দোহাই একে ক্ষমা কর, মা!

বৃদ্ধা তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বালক তখন পালাইবার জন্য পথ দেখিতেছিল। কিন্তু মার্টিন্ তাহার বাহুতে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল, সে পালাইতে পারিল না। মার্টিন কহিল—বৃদ্ধার নিকট ক্ষমা চাও। আর এমন কাজ করিওনা আমি তোমাকে আপেল্ নিতে দেখিয়াছি।

বালক তখন কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিল। বেশ, বাবা! এই লও একটা আপেল্। এই বলিয়া মার্টিন্ ঝুড়ি হইতে একটা আপেল্ আনিয়া বালকের হাতে দিল এবং বৃদ্ধাকে কহিল—,'মা আমি তোমাকে দাম দিব।'

বৃদ্ধা রুষ্ট হইয়া কহিল—এমনি তুমি দুষ্ট ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিবে। আমি হলে এমন পুরস্কার দিতাম যে সাত দিন সে সোজা হইয়া বসিতে পারিত না।

মার্টিন—মা, আমরা এই রকম বিচারই করি। কিন্তু ভগবানের বিচার অন্য রকম। একটা আপেলের জন্য যদি এমন করে চাবুক দেওয়া উচিত হয় তবে আমরা যে প্রতিদিন শত শত গুরুতর পাপ করিতেছি তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট আমরা কি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য একবার ভাবিয়া দেখ।

বৃদ্ধা নীরবে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর কহিল তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু ছেলেগুলি এর মধ্যেই বদ্ হয়ে উঠিয়াছে।

মার্টিন্—তা'হলে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ওদের সৎ করা বুড়াদেরই কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধা—"আমারও সেই মত। আমার সাতটী সন্তান ছিল এখন একটী মাত্র মেয়ে আছে।" তারপর বৃদ্ধা তাহার আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। তার মেয়ে তাহাকে কেমন ভালবাসে, তার কয়টী নাতি নাত্‌নি ছিল, ওরা বৃদ্ধাকে কিরূপ যত্ন করিত ইত্যাদি ইত্যাদি। বলিতে বলিতে বৃদ্ধার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। তারপর সে অপরাধী বালকটীকে দেখাইয়া কহিল—'ওর আর দোষ কি? বালক ত বালকের মতই হইবে।

তারপর বৃদ্ধা যখন যাইবার জন্য তাহার ছালাটী মাথায় তুলিতে উদ্যত হইল তখন সেই বালক তাড়াতাড়ি তাহার নিকট আসিয়া কহিল,—তুমি আর এইটা নিবে কেন? আমার মাথায় তুলিয়া দাও। আমিও ঐ পথেই যাইব।

বালক ছালাটী মাথায় তুলিয়া লইল এবং উভয়ে হাসিমুখে গল্প করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। বুড়ী যাইবার সময় মার্টিনের নিকট হইতে আপেলের দাম নিতে ভুলিয়া গেল।

মার্টিন্ রাস্তায় দাঁড়াইয়া অতৃপ্ত নয়নে সেই প্রীতিপূর্ণ মিলন দৃশ্য দেখিতে লাগিল। যখন তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল তখন সে ঘরে আসিয়া কাজে বসিল। কিছুক্ষণ কাজ করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাতি জ্বালাইল এবং আবার কাজে বসিল। যখন একটা 'বুট্' তৈয়ার শেষ হইল তখন সে উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভালরূপ পরীক্ষা করিল, তারপর অস্ত্র বুরুস্, চামড়া টুক্‌রা ইত্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া বাইবেল্ পড়িতে বসিল। গত রাত্রে যে পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছিল সেইখানে একটা মারকো চামড়ার টুক্‌রা দিয়া চিহ্ন রাখা হইয়াছিল। মার্টিন্ যখন ঐ স্থানটী বাহির করিল তখনই তাহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। অমনি তাহার বোধ হইল যেন তাহার পশ্চাতে কে পদচারণ করিতেছে। সে চমকিত হইয়া ঐদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অন্ধকার গৃহকোণে সত্য সত্যই কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পরিষ্কার চিনা যাইতেছে না। তখন তাহার কানে কানে আবার ধ্বনি হইল—"মার্টিন্, মার্টিন্ আমাকে চিনিতে পারিলে না। আমি আসিয়াছি।" অন্ধকার হইতে হাসিমুখে ষ্টেপেনুক্ বাহির হইয়া আসিল। ক্ষণকাল পরে সেই মূর্ত্তি আকাশের মেঘের ন্যায় মিলাইয়া গেল!

'আমি আসিয়াছি'!—মার্টিন্ সেই ধ্বনি শুনিয়া আবার দৃষ্টি ফিরাইল। এবার অন্ধকার হইতে একটী স্ত্রীলোক শিশু কোলে করিয়া বাহির হইল। স্ত্রীলোকটীর মুখে হাসি। শিশুটীও খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল!

'আমি আসিয়াছি! আমি আসিয়াছি! আবার সেই ধ্বনি! তখন একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও আপেল হস্তে একটী বালক দেখা দিল। উভয়ের মুখে হাসি। মুহূর্ত্ত মধ্যে উহারাও শূন্যে মিলাইয়া গেল!

এই দৃশ্য দেখিয়া মার্টিনের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে চশমাটী পরিয়া প্রবলতর উৎসাহে বাইবেল্ পড়িতে আরম্ভ করিল। সে যে পৃষ্ঠা খুলিয়াছিল তাহার প্রথম পংক্তিতেই আছে যীশু বলিতেছেন—"আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলাম তুমি আমাকে পান ও ভোজন করিতে দিয়াছ। আমি অপরিচিত পথিক তবু তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়াছ।"

সেই পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিটী পড়িল—"আমার দীনতম ভ্রাতার জন্য যাহা করিয়াছ তাহা আমার জন্যই করা হইয়াছে।"

মার্টিন্ বুঝিল তাহার স্বপ্ন ব্যর্থ হয় নাই। নর-সেবাই ভগবানের সেবা। ভগবান্ সত্যই তাহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সে তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিয়াছে! *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

তৈল মর্দ্দন।

অনেকের বিশ্বাস অনুকরণ প্রিয়তার প্রভাবে তৈল মর্দ্দন আমাদের দেশে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। আমাদের দেশে গুণনিধি সাবানই এখন তৈলের প্রতিনিধি, অথবা অমূল্য নিধি। অন্ততঃ ২।১ খানা সাবানও যাহার ঘরে নাই, তিনি সভ্য লোকের মধ্যেই পরিগণিত নহেন। তাই দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকেই এখন সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতেছেন। দেশের ধনী বা শিক্ষিত লোক তৈলের কারখানা খুলিতে নারাজ, তৈল যেন একটা ভয়ঙ্কর কুসংস্কারী অসভ্য, তাই কেহই তাহার ছায়া মাড়াইতে চায় না।

যিনিই যাহা বলুন আর যিনিই যাহা করুন্ আমরা কিন্তু চির দিনই তৈলের পক্ষপাতী। তৈলছাড়া আমাদের চলে না' বাবুদেরও কিন্তু তৈলমর্দ্দন না হইলে চলে না, তবে বাহিরে সাবানের ছড়াছড়ী আছে বটে। যাহা হউক আজ আমরা তৈল মর্দ্দন সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিতেছি।

তৈল মর্দ্দনে পোষাক পরিচ্ছদ মলিন হয় বলিয়া অনেকেই আপত্য উত্থাপন করেন কিন্তু বুঝিবার ভুলেই এই আপত্য।

প্রথমতঃ তৈলের পরিবর্ত্তে সাবান ক্রয় করিলে দেশের অর্থ প্রায়ই বিদেশে যায়, দ্বিতীয়তঃ সাবান তত পবিত্র পদার্থও নহে; তৃতীয়তঃ পোষাক পরিচ্ছদ মলিন হইলে সামান্য অর্থ ব্যয়েই তাহা পরিষ্কৃত হইতে পারে; কিন্তু তৈল মর্দ্দনের অভাবে যে আমাদের দৈহিক মানসিক অনিষ্ট ঘটে, তাহা আর আমরা কিছুতেই ফিরিয়া পাই না।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন প্রতিদিন তৈলমর্দ্দন করিলে শরীরে সহজে জরা ও রোগ প্রবেশ করিতে পারে না, শ্রান্তি দূর হয়, সুনিদ্রা হয়, আয়ুবৃদ্ধি পায়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, শরীর দৃঢ় কর্ম্মক্ষম ও পুষ্ট হয়। চর্ম্ম কোমল হয় ও চর্ম্মরোগ বিদূরিত হয়। *

মস্তকে কর্ণে ও পাদযুগলে বিশেষ রূপে তৈল মর্দ্দন করিবে। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে শিরঃশূলাদি রোগ বিদূরিত হয়, কেশ কোমল দীর্ঘ ঘন স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ়মূল হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধিপায়, যৌবনেই চস্‌মা ধরিতে হয় না, মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ থাকে সুতরাং স্মরণ চিন্তা ধারণাদি শক্তি বৃদ্ধি পায়, মস্তকের অবসন্নতা দূর হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে বাতজন্য রোগ হয় না, হনুমূলে ও ঘাড়ে কোন রোগ হয় না। পাদতলে তৈল মর্দ্দন করিলে সুনিদ্রা হয়, পাদতলের চর্ম্ম স্ফুটিত হয় না দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠব্যাপী দুইটী শিরা চক্ষুর সহিত মিলিত হইয়াছে, অতএব যাঁহারা দৃষ্টিশক্তি দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছুক তাহারা নিত্যই পদতলে তৈল মর্দ্দন করিবেন।

মহর্ষি চরক বলেন মৃণ্ময় কুম্ভ যেরূপ তৈল মর্দ্দনে দৃঢ় ও ঘাতসহ হয় দেহও সেইরূপ তৈল মর্দ্দনে দৃঢ় ও ঘাতসহ হইয়া থাকে। কথাটা একটা উদাহরণ দেখাইয়া বলিতেছি।

বরিশালে অনেকে পাকা মট্‌কী মাটীর নিচে গাড়িয়া তাহাতে বালাম চাউল রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রথম লাভ এই যে মট্‌কীর মুখে একখানা পাথর চাপা

---

* টলষ্টয় হইতে।

---

* অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং সজরাশ্রম বাতহা।
দৃষ্টিপ্রসাদ পুষ্ট্যায়ুঃ স্বপ্ন সুত্বকত্ব দার্ঢ্যকৃৎ॥
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ। বাগ্‌ভটঃ—

শিরোগতাংস্তথা রোগান্ শিরোঽভ্যঙ্গোঽপকর্ষতি।
কেশানাং মার্দ্দবং দৈর্ঘং বহুত্বং স্নিগ্ধ কৃষ্ণতাং॥
করোতি শিরসস্তৃপ্তিং সুত্বক মপিচালয়েৎ।
সন্তর্পণং চেন্দ্রিয়ানাং শিরসঃ প্রতি পূরণং॥ সুশ্রুতঃ—

থাকায় ঘর পুরিয়া গেলেও চাউলের ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয়তঃ মটকীর চাউল কখনও কীট জগ্‌ধ হয় না এবং ৪।৫ বৎসর গত হইলেও টাট্‌কা ও সুরস থাকে। তৈলের কলে যে সকল মটকীতে বহু দিন তৈল রাখা হয়, তাহাই পাকা মট্‌কী বলিয়া কথিত।

মট্‌কীর কণ্ঠে রসি লাগাইয়া তাহাতে জল ভরিয়া পাকা রাস্তাদিয়া সজোড়ে দ্রুত বেগে টানিয়া নিলে যে মটকী ভাঙ্গেনা, তাহাই পাকা মট্‌কী বলিয়া স্থিরীকৃত। পাঠক! এখন দেখুন সামান্য মাটীর মট্‌কী তৈলেরগুণে কতদূর ঘাতসহ ও দৃঢ় হইয়া উঠে। মহর্ষিচরক এই কথারই অবতারণা করিয়া বলিলেন যে তৈল মর্দ্দনের গুণে মট্‌কীর ন্যায় শরীরও দৃঢ় ঘাতসহ ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। অতএব যাহারা শরীরকে ক্লেশসহ, কর্ম্মঠ, দৃঢ়, ও সবল করিতে ইচ্ছুক তাহাদের তৈলমর্দ্দন একান্ত কর্ত্তব্য, আর যাহারা ননীর পুতুল সাজিতে ইচ্ছুক তাহাদের কথা পৃথক্‌।

আয়ুর্ব্বেদ আর একস্থানে বলিয়াছেন—

"অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।
পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতং॥
ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনান্নতু ভক্ষণাৎ।

অন্ন হইতে অষ্টগুণ বলকর পিষ্টক, পিষ্টক হইতে অষ্টগুণ বলকর দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে অষ্টগুণ বলকর মাংস, মাংস হইতে অষ্টগুণ বলকর ঘৃত, ঘৃত হইতেও অষ্টগুণ বলকর তৈল। এই বলপুষ্টি তৈল মর্দ্দনে, ভক্ষণে নহে।

আমাদের দেশে যাহারা হৃষ্ট পুষ্ট দৃঢ়কায় মহাবলী মল্ল, তাহাদের তৈল মর্দ্দনই দেহ রক্ষার প্রধান উপায়। পঞ্চম লাল পাঠক নামক একজন গয়ালী মহাকায় মহা বলশালী পুরুষ রামগোপালপুর প্রভৃতি রাজধানীতে অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তিনি রোজ অর্দ্ধ সের তৈল শরীরে মালিশ করাইয়া থাকেন। তাহার দেহ দেখিলে ভীমসেন বলিয়া ভ্রম হয়, তিনি একজন প্রধান ডন্‌গির ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, তৈল মর্দ্দনের গুণেই তিনি এই বিপুল শারীরিক শক্তি লাভ করিয়াছেন।

এহেন তৈল মর্দ্দনের গুণ আয়ুর্ব্বেদে যাহা আছে তাহা আমরা কিছুতেই প্রচুর মনে করিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিদিগের আমলে তৈল মর্দ্দনের সকলগুণ প্রকাশিত হয় নাই, পরবর্ত্তী যুগে ক্রমেই তাহা বাহির হইয়া পড়িতেছে। আজ যদি প্রাচীন ঋষিগণ থাকিতেন, তবে তৈল মর্দ্দনের আরও যে কতগুণ বাহির করিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা প্রত্যক্ষে দেখিতেছি তৈল মর্দ্দনে না হয় এমন কাজই নাই। তৈল মর্দ্দনে বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়, সুতরাং অন্ধের চক্ষুঃ ফোটে। অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, মান গৌরব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, তৈল মর্দ্দনে বড় বড় উপাধি লাভ হয়, পদ বৃদ্ধি হয়। মানুষের পদ বৃদ্ধি হইলেই তিনি সিংহবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। কেবল কি ইহাই, তাহা নয়, এই বিশাল জগৎ কেবল তৈল মর্দ্দনের উপরেই চলিতেছে। তৈল মর্দ্দন বিনে গরুর গাড়ী চলেনা, কল কারখানা চলে না, রেলের গাড়ী চলেনা, বাষ্পীয় পোত চলেনা, আবার মহামাষ তৈল মর্দ্দন না করিলে বাত-ব্যাধি রোগীর হাত পাও চলে না।

অনেকে বলেন গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিও তৈলের বলে হয়। কথা বড় অসম্ভব মনে করি না, আমাদের শাস্ত্রমতে সূর্য্য যখন সাত ঘোড়ার গাড়ীতে চলেন, তখন তৈল মর্দ্দন ব্যতীত গাড়ীর এত দ্রুতগতি হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন সূর্য্য "জবাকুসুম সংকাশ", ঠিক কথা, জবাকুসুম তৈল মর্দ্দনের বলেই সূর্য্যদেব প্রত্যুষে অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। বৃহস্পতি গ্রহ সুরগুরু, ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাই তাঁহার শিষ্য। এতবড় একটা গুরুতর পদ তৈল মর্দ্দন ব্যতীত হয় না, সুতরাং বৃহস্পতি ও তৈলের বলে তেজীয়ান্‌। শুক্রাচার্য্য সমস্ত দৈত্যের গুরু, সুতরাং তিনিও তৈল মর্দ্দন না করিয়া এই উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদের শাস্ত্রমতে শনি খোঁড়া, তিনিতো আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল মর্দ্দন না করিলে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। একব্যক্তিই বিষ্ণুচক্রে দ্বিখণ্ড হইয়া কেতুর মাথা, রাহুর দেহ হইল। তাহারা অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া মরিল না, শাস্ত্রের রূপক বর্ণনার অমৃত কেহ কখনও দেখি নাই, অনেকে অনুমান করেন অমৃত আর কিছুই নহে, ইহা কেবল

পারিজাত বৃক্ষের বিশুদ্ধ তৈল। সুতরাং কেবল মর্দ্দনে নয়, তৈল পানেও দুইটা গ্রহ জীবিত রহিয়া গেল। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ দক্ষপ্রজাপতির কথা, চন্দ্রের সোহাগের সহধর্ম্মিণী, সুতরাং তাহাদের সুগন্ধি কেশতৈল না হইলে চলেনা একথা আর কেহকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। অঞ্জনার নয়ন-রঞ্জন প্রভঞ্জন দেব যে চিত্তরঞ্জন তৈলের ধার ধারেন না, একথাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কাজেই দেবগণও তৈলের জন্য লালায়িত।

কিছুদিন হইল কুন্তল-কুন্ত তৈল মালিশ করিয়া আমাদের দেশে অনেক মহিলার এত সুনিদ্রা হইয়াছিল যে তাঁহারা ১২।১৪ দিন পরে একবার মাত্র জাগিতেন। তাই দেশহিতৈষিগণ গাহিলেন—"না জাগিলে তোরা ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা।" পাঠক! এখন অবশ্য বুঝিয়াছেন যে জগতে তৈলের অসাধ্য কিছুই নাই।

তৈলের মধ্যে তিল তৈলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহাদের চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠাদি রোগ আছে, তাহাদের সর্ষপ তৈল মর্দ্দন বিধেয়, কিন্তু রক্তপিত্তে ও পিত্তরোগে সর্ষপ তৈল অপকারী।

নারিকেল তৈল কফবর্দ্ধক, যাহাদের আমবাত ও কফ কাস শিরঃশূলাদি আছে, তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অপকারী। গুণের মধ্যে কেবল কেশ বর্দ্ধক ও রুখী নাশক, নিমের তৈল—কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও অন্যান্য চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী। রেড়ীর তৈল রেচক বায়ুনাশক কটীশূলে মর্দ্দনে উপকারী। যাহাদের বমন বিরেচন হইতেছে কিংবা ঔষধ দ্বারা যাহারা বমিত বা বিরিক্ত, যাহারা প্রতিশ্যায়াদি কফরোগে আক্রান্ত, যাহাদের অজীর্ণ রোগ আছে, তাহারা এবং নবজ্বরী, তরুণ আমবাতের রোগী তৈল মর্দ্দন করিবে না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

আঁধারের আলো।

আঁধার মাঝে আলোর মত
বিপদ মাঝে তুমি—
জাগিয়া উঠ হৃদয় পটে
আমার অন্তর্য্যামী!
ঝঞ্ঝাবাতে, বাদলা রা'তে
তোমার অভিসারে
পরাণ চায়, কেন যে হায়,
চরণ নাহি সরে!
তোমার বাঁশী, মরমে পশি
যেদিন মূর্চ্ছনায়
আবেগ ভরে ভুলায়ে মোরে
মিলন গীতি গায়।
যাহারে ধরি, ছিলাম পড়ি
সে ধরা ধীরে ধীরে
নয়ন হ'তে সেদিন যেন
কোথায় সরে পড়ে।
দেখি আমার হৃদয় খালি—
শূন্য দেবাগার,
সেথায় শুধু করছে ধূ ধূ
মরুর অধিকার!
ব্যাকুল প্রাণে তোমার পানে
ক্ষণেক চাই আমি,
আঁধার মাঝে আলোর মতো
বিপদ মাঝে তুমি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব।

ব্রহ্মকে যিনি ভজনা করেন তিনি ব্রাহ্ম। বিষ্ণুকে যিনি পূজা করেন তিনি বৈষ্ণব। কৃষ্ণই বিষ্ণু। কৃষ্ণে যাঁহার পরাভক্তি আছে তিনিও বৈষ্ণব। রাধা-প্রেম পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে নদিয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি গৌরাঙ্গ-প্রেমে মগ্ন তিনিও বৈষ্ণব।

আদি কাল হইতে বিষ্ণু। বৈষ্ণবও আদিকাল হইতে। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ বিষ্ণু ভক্ত—হরিভক্ত; কৃষ্ণ দ্বাপরে। দ্বাপর হইতে বৈষ্ণব, কৃষ্ণের বহু লীলায়, ভক্ত কবিগণের বহু কবিতায় ও কীর্ত্তনে গড়িয়া উঠিয়াছেন। বৈষ্ণব-জীবনে প্রেম-যমুনার কূল নাই, ভক্তি-বৃন্দাবনের পরিধি নাই। গৌরাঙ্গে ত্রিকাল বর্ত্তমান। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও রাধাকৃষ্ণ সব গৌরাঙ্গে। চৈতন্যেই নিত্যানন্দ। "অদ্বৈতকো পাকড়ো, চৈতন্য মিল্ যাগা, চৈতন্য হোনেসে নিত্যানন্দ আপ্‌সে আওয়েগা।"

রাজা রাম মোহন রায় বেদান্তের চক্‌মকি পাথরে তন্ত্রের ইস্পাত ঠুকিয়া ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ তুলিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ স্ফুলিঙ্গ আপনার উগ্র তপস্যার ধুনিত শুভ্র তুলায় ধরিয়া বিস্তৃত ও উজ্জ্বল করিয়া যান। ঐ ব্রহ্মালোকে স্নিগ্ধতা দিয়াছেন—বিজয়কৃষ্ণ এবং কেশব চন্দ্র। কেশবচন্দ্র বৈদ্য—পরিষ্কার বৈষ্ণব। বিজয়-কৃষ্ণ অদ্বৈতের বংশধর, ভক্তি-প্লাবিত নদিয়ার ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মে শুদ্ধি দেখিতে পাই, সিদ্ধি দেখিতে পাই, সে ব্রাহ্মকে গড়িয়াছেন বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ—কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ ও কেশব উভয়ে গৌরাঙ্গের প্রেম দিয়া ব্রাহ্মকে দীক্ষিত করিয়াছেন। কেশবের প্রেমে মুঙ্গের মাতিয়া উঠিয়াছিল, মুঙ্গেরের গঙ্গা উজান বহিয়াছিল। পাছে নরপূজা প্রবেশ করে এই ভয়ে বিজয়কৃষ্ণ কেশব-ভক্তির বিরোধী হইয়াছিলেন। শেষ-জীবনে কিন্তু বিজয়ই কেশব। কেশব আদি, মধ্য এবং শেষ-জীবনে গৌরাঙ্গ প্রদর্শিত প্রেম ও ভক্তির উপাসক। আদিকালের ঋষিদের ব্রাহ্ম মহর্ষি পর্য্যন্ত। কৃষ্ণ ও কেশবের ব্রাহ্ম বৈষ্ণব ভাবে ভরপুর।

ব্রাহ্ম এবং বৈষ্ণবে বাহিরের সমতার দিক দেখা যাউক। সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবের একটী প্রধান সাধন। ব্রাহ্মেরও তাহাই। সে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন উভয়েরই ভাব-প্রধান। রবীন্দ্র নাথের যে সকল সঙ্কীর্ত্তন ইদানিং ব্রাহ্মসমাজ জুড়িয়া বসিয়াছে, উহাদের অধিকাংশ বৈষ্ণব-ভাবে গড়া। তাঁহার ভানু সিংহের কবিতা হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত পর্য্যন্ত বহু স্থানে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে ও লয়ে রাধা এবং কৃষ্ণ ভাবের তরঙ্গ তর্ তর্ করিতেছে। কৃষ্ণ ও কেশব ব্রাহ্ম-সমাজে বৈষ্ণবের খোল আনিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্ম-সমাজে খোল বাজনার বিরুদ্ধে অনুশাসন ছিল। কীর্ত্তনের সঙ্গে কর্ত্তালের, রোলের সঙ্গে খোলের নিত্য সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের অনুরোধে অনুশাসনের লোহার শিকল ছিঁড়িতে হইয়াছে। নববিধানের একতারা তো বৈষ্ণবের সঙ্গ-যন্ত্র।

নামধারী এবং নিরন্তরের ব্রাহ্মদের কথা স্বতন্ত্র। সাত্বিক ব্রাহ্ম নিরামিষ ভোজী। বৈষ্ণব জীবে দয়ার অবতার। জনসমাজে ব্রাহ্ম যে অতি অল্প দিনে আদৃত হইয়াছিলেন, নিরামিষ আহার উহার একটী প্রধান কারণ। কৃষ্ণ-কেশবের দৃষ্টান্ত, ব্রাহ্মসমাজে যে পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছে তাহা সহজে মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণব বিলাস বর্জ্জিত। ব্রাহ্মের বিলাসে রুচি থাকিতে পারে না। এক সময়ে ছিলও না। বেশ ভূষায় বৈষ্ণবের বিলাস বর্জ্জন ব্রাহ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মকে নগ্ন পদে দেখা যাইত। অনেকে অঙ্গরাখা ব্যবহার করিতেন না; শুভ্র উত্তরীয় মাত্র অনেকের গাত্রাবরণ ছিল। এই বিলাস-বর্জ্জন ব্রাহ্মকে জনসমাজের অতি উচ্চস্তরে তুলিয়া দিয়াছিল।

স্ফটিক জলের পুকুরের তলে পাঁক থাকে থাকুক। কিন্তু বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবী; ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা। এ দিকে বৈষ্ণবের সাধন ব্রাহ্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যুগল রূপ না ধরিলে আত্মা ও পরমাত্মা—যুগল রূপের সাধনা হয় না। "প্রেম কর রাধা ভাবে, অসম্ভব সম্ভব হবে,

নেহারিবে যুগল রূপ অন্তর বাহিরে।” ব্রাহ্ম সমাজের এ সঙ্গীত অর্থহীন নহে। শেষ রক্ষা না পাইলেও কেশবের ভারত-আশ্রম ঐ উচ্চ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতি-সম্ভাষণ জন্য গৌরাঙ্গের ছোট হরিদাস বর্জ্জন, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ভাবের বিরোধী নয়। উহা পাপাচারী লোকের জন্য ভয়প্রদ কঠোর শাসনের দৃষ্টান্ত বিশেষ।

জাতিভেদ—বৈষ্ণব মতে “চণ্ডালাপি দ্বিজোশ্রেষ্ঠঃ হরি ভক্তি পরায়ণঃ।” তত্ত্বতঃ বৈষ্ণব মতে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মমতেও নাই।

এ সমস্ত বাহিরের লক্ষণ। ব্রাহ্ম এবং বৈষ্ণবের ভিতরের লক্ষণাও এক। ব্রাহ্ম-দেবতা মানেন না, ব্রাহ্ম আবির্ভাব মানেন। যে আবির্ভাব মানে সেই বৈষ্ণব। কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্ম আবির্ভাবের প্রকট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্ত ব্রাহ্মের কেন্দ্র স্থানে কৃষ্ণ-কেশব আছেন। দ্বিদল ছাড়িয়া দাইল হওয়া সম্ভবপর হইলেও কৃষ্ণ-কেশবের বৈষ্ণব-ভাব এড়াইয়া ব্রাহ্ম হওয়া সম্ভবপর নয়।

বৈষ্ণবের গতি মহাভাবের দিকে। ব্রাহ্মের গতিও মহাভাবের দিকে। “জীবে দয়া, নামে রুচি” বৈষ্ণবের মূল কথা। “তাঁতে প্রীতি, তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন” ব্রাহ্মের বীজ মন্ত্র। এই নামে রুচি হইতে “কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” এই নামে রুচি হইতে “অবিরাম ব্রহ্মনাম।” যিনি অবিরাম হরিকে ডাকেন, মহাভাব তাঁহাকে ত্বরিতে আশ্রয় করে। যিনি অবিরাম ব্রহ্মকে ডাকেন, মহাভাব তাঁহাকে পলকে রস-সাগরে ডুবাইয়া দেয়। কৃষ্ণ-কেশবের মহাভাবে চটুল লোকের চঞ্চল চিত্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইত। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পার্ষদগণের মহাভাবের উচ্ছ্বাস দেখিয়া জনসমাজ ব্রাহ্মসমাজের দিকে হেলিয়া পড়িতেছিল। শরীর হইতে মন বড়, মন হইতে আত্মা বড়। আত্মা যখন পরমাত্মায় লগ্ন হয়, তখন উহা মহাভাব। ঐ ভাব দেখিবার জন্য জগৎ পাগল। কিন্তু সকল বৈষ্ণব এবং সকল ব্রাহ্মে এই মহাভাব সম্ভবে না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তাহা হইলেও ব্রাহ্মসমাজ মহাভাবের ভাবুক। ভজন সঙ্গীতের ভাব গতি, সাধন মন্ত্রের নাড়ী নক্ষত্র দেখাইয়া দেয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৭১৭ টী ভজনসঙ্গীতের ৫৪টী মহাভাব, ৫১টী বাৎসল্য, ২৬টী সখ্য, ৩৭৮টী দাস্য এবং ২০৮টী শান্ত ও মিশ্র ভাব সূচক। তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন লিপ্সু সমাজে দাস্য ভাবের সঙ্গীত সংখ্যা অধিক হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ব্রাহ্মসমাজের এক অঙ্গে মাত্র অর্দ্ধশত মহাভাবের সঙ্গীত মহাভাবে মহাধনী না বুঝাইলেও দরিদ্র বুঝাইতেছে না। তবে কেহ কেহ ঐ সব সঙ্গীত ভাব-সম্পদের গভীরতায় বৈষ্ণব সঙ্গীতের তুল্য বলিয়া মনে করেন না। এই মহাভাবের মহা সমুদ্রে ব্রহ্মনাম ও হরি নামে ভেদাভেদ নাই। এই মহাভাবের মহা সমুদ্রে ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব এক এবং অভিন্ন।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

ক্রেকাটোয়ার আগ্নেয় গিরি।

আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গমের আশু কারণ সম্বন্ধে নানারূপ মত রহিয়াছে। কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতে যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, ঐ শক্তি যে আদি নিহারিকা পুঞ্জের সঙ্কোচনের দ্বারা উদ্ভূত হয়, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অগ্নির উদ্গম সময়ে আগ্নেয় গিরি যে কিরূপ ভীষণ ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেয়, তাহা ক্রেকাটোয়ার অগ্ন্যুদ্গমে দেখা গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে আগ্নেয় গিরির যেরূপ উদ্গম হইয়াছিল, এরূপ আর পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় নাই।

১৮৮৩ সন পর্য্যন্ত ক্রেকাটোয়া দ্বীপের নাম খুব কম লোকেই জানিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি যাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে সাণ্ডা (Sunda) প্রণালীতে অবস্থিত। ইহাতে মনুষ্যের বসতি ছিল না, কেবল কখন কখন সুমাত্রা কিম্বা যাভা দ্বীপ বাসীরা নৌকা যোগে এখানে আসিয়া বন্য ফল মূল আহরণ করিত।

পূর্ব্বকালের ভৌগলিকগণ, নগণ্য বিধায় এই দ্বীপের উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যে সকল

নাবিক সাণ্ডা প্রণালীর মধ্য দিয়া চলাফেরা করিত কেবল তাহারাই এই দ্বীপকে একটী মারাত্মক ও বিপদ সঙ্কুল স্থান বলিয়া তাহাদের মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া রাখিত। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে যে এখানে আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ইহার আগ্নেয় গিরি চির নির্ব্বাপিত হইয়াছে বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল। ইহা পৃথিবীর অপরাপর নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরি কিম্বা চন্দ্র মণ্ডলের আগ্নেয় গিরির মত বিবেচিত হইত।

১৮৮৩ খৃঃ অঃ ক্রেকাটোয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিল। ঐ বৎসর বসন্তকালে সুদীর্ঘ বিশ্রামের পর ক্রেকা-টোয়াতে অগ্ন্যোদ্গমের লক্ষণ দেখা দিল। ভূমিকম্প হইয়া এবং পৃথিবীর ভিতর হইতে একরূপ গুরু গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইয়া আশু অগ্ন্যোদ্গমের জন্য সকলকে সতর্ক করিতে লাগিল। প্রথমতঃ আগ্নেয় গিরির উৎপাত যে একটা বিশেষ কিছু হইবে, তাহা কেহ মনে করেন নাই। ভয়ের কথা দূরে থাক এমন কি বাটাভিয়ার লোক তামাসা দেখিবার জন্য এবং ক্রেকাটোয়া দ্বীপে যাইয়া বন ভোজন করিবার জন্য একখানা জাহাজ ভাড়া করিল। ঐ দলের মধ্যে যাহারা সাহসী তাহারা শব্দ অনু-সরণ করিয়া আগ্নেয়গিরির উপরে উঠিয়া তামাসা দেখিতে গেল। তাহারা দেখিতে পাইল যে প্রায় ৩০ গজ পরিধির এক মুখ হইতে ভীষণ শব্দের সহিত ধূম উদ্গীরীত হইতেছে।

গ্রীষ্মকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেকাটোয়ার শব্দ ও উৎপাত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথমতঃ ঐ শব্দ ১০ মাইল পরে ২০ মাইল দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে বিপদের আরও লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। প্রতি কম্পনের সহিত আকাশে ধূলিরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। বাতাস এই ধূলি পটল অপসারিত করিতে না পারায় আকাশে উহা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল।

ক্রমে নিকটস্থ সমুদ্র ও দ্বীপ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। এই ধূলি পটল এরূপ ঘনীভূত হইয়াছিল সে ক্রেকাটোয়ার ১০০ মাইল পারিধির মধ্যে দিবা দ্বিপ্রহরেও অমানিশার ঘোর অন্ধকার অনুভূত হইতে লাগিল। ইহার পরে ক্রেকাটোয়া ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল। যাভা ও বাটেভিয়ার সমুদ্র তীরবর্ত্তী সহস্র সহস্র অধিবাসী আর ইহ জন্মে সূর্য্যের মুখ দেখিল না, ক্রেকাটোয়ার কম্পনে নিকটস্থ সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের উদ্ভব হওয়াতে তাহারা তাহাতে ভাসিয়া গেল।

আগ্নেয় গিরির উৎপাতের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র তটের অধিবাসীদের উৎকণ্ঠা ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে জুলাই মাস শেষ হইল এবং আগষ্টের মাঝামাঝি উৎকট অভিনয়ের দিন আসিল।

১৮৮৩ সনের ২৬শে আগষ্ট রবিবার রাত্রিতে সাণ্ডা প্রণালীতে ধূলি-মেঘ ঘনীভূত হইল এবং উহা যাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং মাঝে মাঝে আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গমে সে সব স্থান ঈষৎ আলোকিত হইতে লাগিল। ক্রেকাটোয়ার বজ্রনিনাদ ক্রমে গম্ভীর হইতে লাগিল। ১০০ শত মাইল দূরবর্ত্তী বাটেভিয়া সহর ও শান্তভাবে নিশা যাপন করিতে পারিল না।

তথায় অট্টালিকা সমূহ ভূগর্ভের কম্পনে দুলিতে লাগিল, এবং গৃহের দরজা জানালা ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও তাণ্ডব লীলার পূর্ব্বাভাষ মাত্র। ১৮৮৩ সনের ২৭শা আগষ্ট সোমবার বেলা ১০টার সময়ে সেই ভীষণতা যেন পূর্ণাভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। সে সময়ে ২।৩টী প্রবল শব্দ ও ভীষণ কম্পনের সহিত ক্রেকাটোয়া দ্বীপের এক বিশাল খণ্ড উর্দ্ধাকাশে বিক্ষিপ্ত ও চূর্ণীকৃত হইয়া বায়ু মণ্ডলে মিলাইয়া গেল।

ইতঃপূর্ব্বে ভূমণ্ডলে এরূপ ভীষণ বিস্ফারণ আর কখনও হয় নাই। এই বিদারণে যে প্রবল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা জগতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

যদি আমরা বলি যে আগ্নেয় গিরির শব্দ একশত মাইল দূরবর্ত্তী বাটাভিয়া নগর হইতেও শুনা গিয়াছিল, তাহা হইলে ক্রেকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণতা কিছুই বুঝান হইল না।

ক্রেকাটোয়া হইতে প্রায় ৩০০০ হাজার মাইল

দূরবর্ত্তী রড্রিগজ দ্বীপে সমুদ্রের তীরে এক ব্যক্তি পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সে ঐ আগ্নেয় গিরির শব্দ শ্রবণ করিয়া যথা সময়ে তাহা লিপি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিস্ফারণের ৪ ঘণ্টা পরে সে ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। কারণ শব্দ তথায় পৌঁছিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় লাগে।

যদি বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের শব্দ ক্রেকাটোয়ার মত ভীষণ হইত তাহা হইলে সে শব্দ ইংলণ্ডের অধীশ্বরের শ্রুতিগোচর হইত, কাইসার ও জর্ম্মানগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইত, আর তাহা শ্রবণ করিতেন, ইহা মক্কায় মুসলমান যাত্রিগণের এবং সুদূর সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হতভাগ্যদের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করিত। যে সকল জাহাজ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর দিয়া যাতায়াত করে তাহার অর্দ্ধেকেও ইহা শ্রবণ করিত। কিন্তু এরূপ হয় নাই।

ক্রেকাটোয়াতে যে শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার কম্পন বায়ুমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর অপর প্রান্তে— আমেরিকার মধ্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে তরঙ্গের প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়া পুনরায় উহা ক্রেকাটোয়াতে আসিয়া পৌঁছে। এইরূপ বায়ুর কম্পন ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীকে দুইবার প্রদক্ষিণ করে এবং ক্রমে ঐ কম্পন মন্দীভূত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এই কম্পন কেবল অনুমান নয়, ইহা বেরমিটার (Barometer) যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল।

এই ক্রেকাটোয়ার ঘটনা আমাদিগকে আর একটী নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আমরা আমাদের বায়ুমণ্ডলের ১০ মাইলের অধিক উর্দ্ধের অবস্থা কিছুই জানিতাম না। ২০ মাইল উর্দ্ধে যেখানে কোন ব্যোমযান পৌঁছিতে পারে না, যাহা উচ্চতম পর্ব্বত হইতেও ৪ গুণ উচ্চ, তথায় বাতাসের অস্তিত্ব আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? ক্রেকাটোয়া আমাদিগকে এবিষয়ে সাহায্য করিয়াছে।

যখন ক্রেকাটোয়ার ধূলিরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পশ্চিম বাহিনী হইল, তখন সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে উহা দেখিতে লাগিল। বাণিজ্য বাতাসের বিষয় সকলেই জানে। উহা আমাদের কত কাজে আসিতেছে। কিন্তু এইরূপ এক বাতাস বায়ু মণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে চির প্রবাহিত হইতেছে। উহাকে বাণিজ্য বাতাস না বলিলেও পারি, কারণ উহাদ্বারা আমাদের বাণিজ্যের কার্য্য কিছুই হয় না, অধিকন্তু উহা নিম্নস্তরে থাকিলে আমাদের জীবন ধারণ করা দায় হইত। কারণ উহা হারিকান বা প্রবল ঝড়ের মত দ্রুত গতিতে প্রবাহিত। উহার আঘাতে আমাদের গৃহ, বন, উপবন, সমস্ত ভূমিস্মাৎ হইয়া যাইত। যখন এই ২০ মাইল উর্দ্ধের চির প্রবহমান ঝড়ে ক্রেকাটোয়ার ধূলিরাশি উড়াইয়া লইয়া চলিল তখনই আমরা ঐ বায়ুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলাম।

তখন দেখা গেল যে বিষুব রেখার উপরে ঐ বাতাস প্রায় ১৩ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। ১৮৮৩ সনের হেমন্ত কালে সংবাদ পত্রে নভোমণ্ডলের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। সিংহল ও প্রশান্ত মহাসাগরের ইণ্ডি দ্বীপপুঞ্জ হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ও একইরূপ বর্ণনা বাহির হইতে লাগিল। কখনও সূর্য্যমণ্ডলকে একটু নীলাভ বোধ হইত, কখন চন্দ্রমণ্ডল যেন সবুজবর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া যাইত।

যাহারা এই নৈসর্গীক পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিতেছিলেন, তাঁহারা ক্রেকাটোয়ার বিষয় তখনও অবগত ছিলেন না। যখন এই বিভিন্ন স্থানের ঘটনাবলীর তারিখ তুলনা করিয়া দেখা গেল, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, যে উহা ক্রেকাটোয়ার আগ্নেয় গিরির কাণ্ড। উহা ধূলিরাশি ২০ মাইল উর্দ্ধে বায়ু মণ্ডলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাদ্বারাই ঐ সকল নৈসর্গীক দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

এই বিশাল ধূলিরাশি একত্র করিলে ১ মাইল দীর্ঘ, ১ মাইল প্রস্থ ও এক মাইল গভীর একটী পাত্রের প্রায় ১০ পাত্র হইত।

প্রায় একপক্ষ কাল ঐ ঘূর্ণীবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল ধূলিরাশি পৃথিবীকে প্রায় দ্বাদশবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে মাধ্যাকর্ষণের ফলে ঐ ধূলি ক্রমে নীচে নামিয়া গিয়াছে।

এই ধূলিকণা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়াতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিম্নে পড়িতে প্রায় ২ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮৮৩ সনের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে সে অভিনব সৌন্দর্য্যের

সহিত সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল, ক্রেকাটোয়ার অভিনয়ই তাহার একমাত্র কারণ।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

করটীয়ার শিলালিপি।

করটীয়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ওয়াজেদআলী খান পন্নি সাহেবের উদ্যোগে, যত্নে ও অর্থানুকূল্যে করটিয়ার বর্ষীয়ান মৌলবী (অধুনা পরলোকগত) গোলাম সারওয়ার সাহেব অনেকদিন পর্য্যন্ত আটীয়া পরগণার ইতিহাস অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। আটীয়া গ্রামে অনুসন্ধান কালে এই মৌলবী সাহেব একখানি প্রস্তর ফলক দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় সইদখান পন্নির সুপ্রসিদ্ধ মসজিদের পূর্ব্বদিকে জঙ্গল মধ্যে প্রাপ্ত হন।

মৌলবী সাহেব পারশী ও আরবীতে সুপণ্ডিত এবং স্বয়ং ইতিহাসজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই দ্বিখণ্ডিত প্রস্তর মিলাইয়া উহার পাঠোদ্ধার করেন এবং প্রস্তর দুইখানি সযত্নে করটীয়া লইয়া আসেন। শ্রীযুক্ত ওয়াজেদ আলি খান্ পন্নি সাহেব উহা করটীয়ার মসজিদের সম্মুখে এক প্রাচীরের গাত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

অযত্নে জঙ্গলে পড়িয়া থাকিলেও ঐতিহাসিকের নিকট এই ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের মূল্য দুর্ল্লভ রত্ন অপেক্ষাও অধিক। এই প্রস্তর ফলকে পারসী ভাষায় লিখিত আছে:—

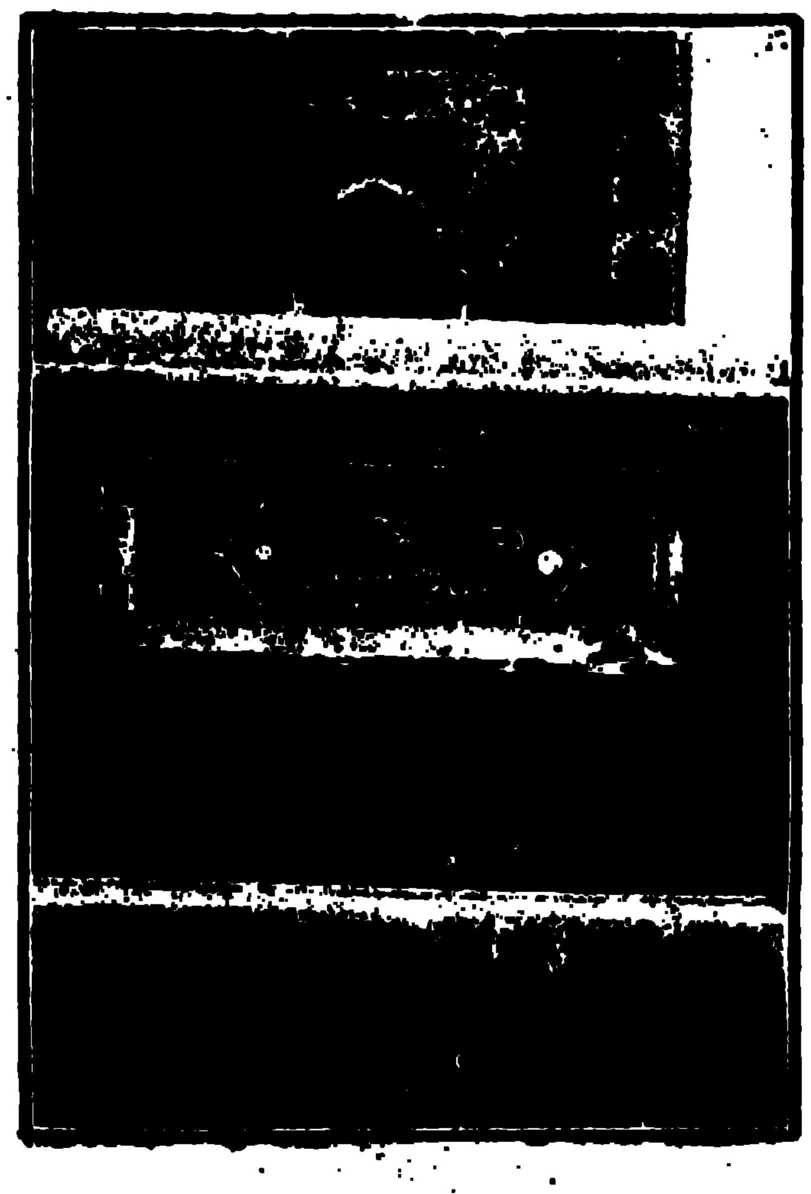

"১০১৯ হিজরীতে নুরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজীর রাজত্বকালে সইদ খান্ পন্নির মসজিদ সুসম্পন্ন হইল।"

প্রস্তর ফলকের এক পৃষ্ঠে এই লিপি, অপর পৃষ্ঠে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

যে সুদৃশ্য মসজিদ, এখনও আটীয়ার মুকুট ভূষণ, উহা সইদখান পন্নি কর্ত্তৃক ১০১৮ হিজরীতে নির্ম্মিত হয় বলিয়া উহার গাত্র সংলগ্ন শিলাফলকে লিখিত আছে। এই একটি মসজিদ ব্যতীত সইদ খান্ পন্নি আরও কোন মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া এতদিন কেহ জানিত না। করটীয়ার এই নূতন প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে, সইদ খান্ পন্নি আরও একটি মসজিদ ১০১৯হিজরীতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মসজিদ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজিও তাহা নির্ণীত হইতেছে না। খুব সম্ভবত উহা একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

আটীয়ায় একটা প্রবাদ আছে,—সইদ খান পন্নির অধিকার মহাস্থান গড় হইতে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের তটপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাস্থান গড়ের শেষ নৃপতির নাম পরশুরাম। সইদ খান, এই পরশুরামকে পরাজিত করিয়াই হউক কি পরশুরামের মৃত্যুর পরই হউক, মহাস্থান গড় অধিকার করেন এবং মহাস্থান গড়ের মন্দিরের ইষ্টক ও প্রস্তর আনয়ন করিয়া আটীয়ার বিচিত্র মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

এতদিন এই প্রবাদ, প্রবাদ মাত্রই ছিল। ইহার সমর্থন যোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। করটীয়ার শিলাফলক, এক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে এই প্রবাদ সমর্থন করিতেছে। শিলা ফলকের অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝাইতেছে, ইহা কোনও বৌদ্ধ মন্দিরে নিবদ্ধ ছিল। পরশুরামকে পালবংশীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পালবংশীয় না হইলেও তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আটীয়ার বৃদ্ধ লোকের নিকট শুনা যায়, আটীয়ার মসজিদে যে ইষ্টক ও প্রস্তর ফলক আছে, তাহারও অপর পৃষ্ঠে বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। করটীয়ার শিলাফলক, বৃদ্ধগণের বাক্য সমর্থন করিতেছে।

মহাস্থান গড় হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। প্রসিদ্ধ "শ্রীবিক্রমপুর"—যে খানে পাল ও সেন রাজারা স্কন্ধাবার সমাবেশ করিয়া পুণ্যতীর্থ ব্রহ্মপুত্রের নির্ম্মল জলে পবিত্র হইয়া ভূমিদান করিতেন—তাহা এই প্রদেশেরই পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। পাল ও সেন রাজারাই

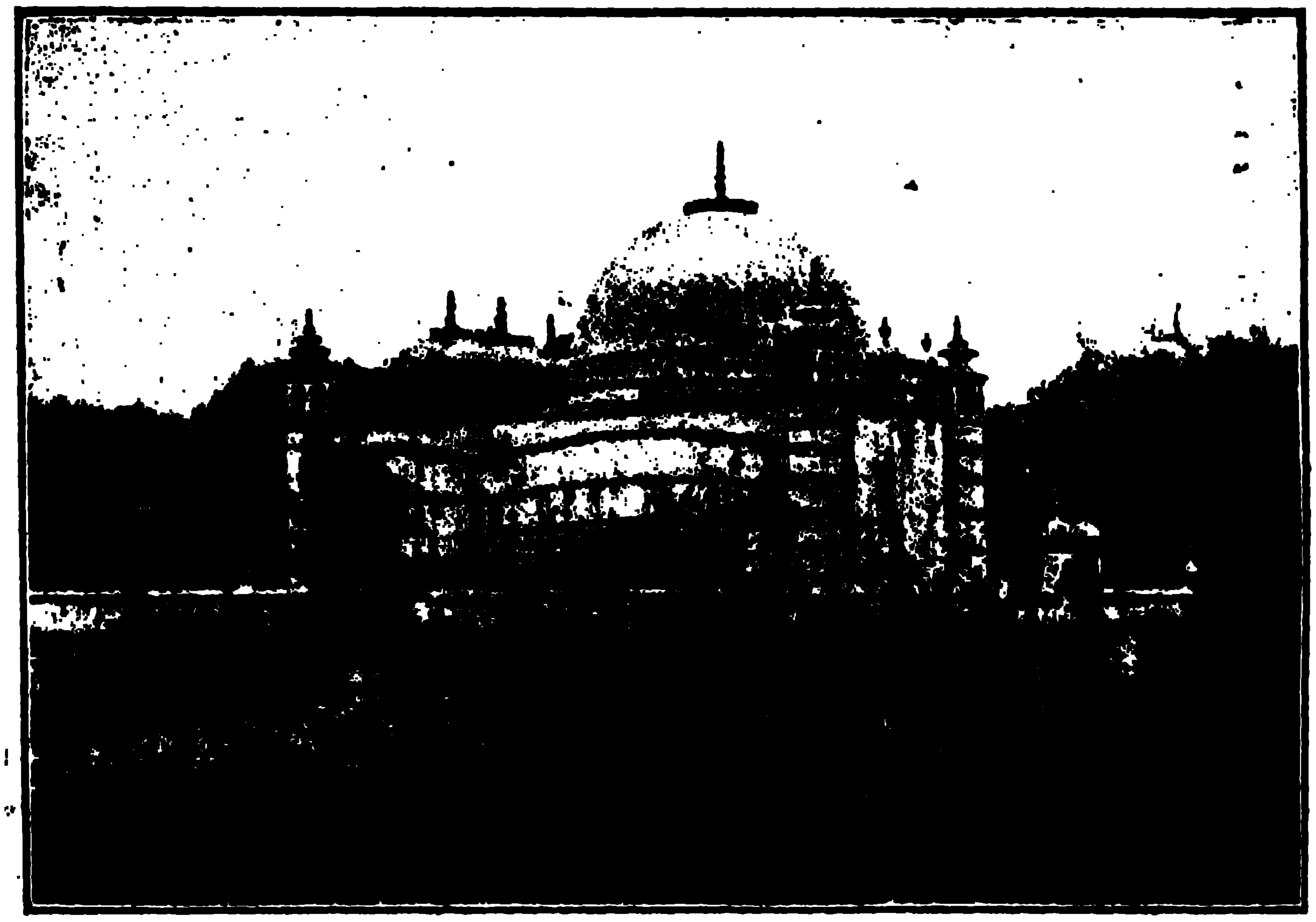

আটিয়া-মসজিদ।

মুসলমান-অধিকারের পূর্ব্বে এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের শেষ সময়ে এবং পাঠান রাজত্বে এই প্রদেশের কোন কোন অংশ কখন কখন কামরূপ ও কোচবিহারের অধীন বা করদ হইত। বাদশাহ আকবরের সময়েই ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর শাসনাধীন হয়। সইদ খান্ পন্নিই এই প্রদেশের প্রথম মোগলাধীন অধিপতি। বাদশাহ আকবরের সময়ে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সইদ খান পন্নি নুরউদ্দীন জাঁহাগীর বাদশাহের সময়ে আপনার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। করটীয়ার শিলা-ফলক সইদখা পন্নির ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার এক নিদর্শন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

"হিরালী"।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে "হিরালী" নামীয় এক শ্রেণীর লোক আছে, উহারা প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের প্রারম্ভে অদ্ভুত বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণে বাহির হয়। আগামী বর্ষের ঝর বৃষ্টি, অশনি সম্পাত ও শিলাপাতের পরিমাণ সূচক ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করাই উহাদের কর্ত্তব্য ও তখনকার ব্যবসায়। হিরালীর ভবিষ্যৎবাণী অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত পল্লী বাসীর হৃদয়ে বেশ একটু বিস্ময় ও আশ্বাস প্রদান করে।

"হিরালী" শব্দটী "শিলারি" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের ধারণা। হিরালী যখন গ্রামবাসীর দ্বারে ২ উপস্থিত হয়, তখন শালি ধান্য পাকার সময়। এই সময় শিলাপাত হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। এই শিলাপাত হইতে সুপক্ক শালিধান্য রক্ষা করাই হিরালীর মুখ্য কর্ম্ম। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে গ্রাম্য ভাষায় অনেক স্থলে 'শ' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়। অক্ষরের স্থান ব্যতিক্রমও গ্রাম্য ভাষায় যথেষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—রাণা হিজল—নারাহিজল সুতরাং হিরালী শব্দ যে

শিলারী শব্দের অপভ্রংশ, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের শোভাসম্পদ অনন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ মাঠগুলির উপর দিয়া যখন বসন্ত কালে মলয়ানিল মৃদু-মন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়, তখন সুপক্ব শালিধান্যের অভিনব তরঙ্গায়িত অবস্থা সন্দর্শন করিয়া কাহার না মন আনন্দ রসে আপ্লুত হয়! তখন এই সমস্ত শস্য ক্ষেত্রের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন লক্ষ্মী তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তখনই আমরা তাঁহার সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সক্ষম হই। বসন্তাবসানে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষভাগে এ অঞ্চলের কৃষকগণ তাহাদের সম্বৎসরের খাদ্য শালীধান্য বোরধান্য প্রভৃতি কিরূপে নিরাপদে ঘরে আনিতে পারিবে, তজ্জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কেন না তখন শিলা বৃষ্টি ও ঝড়ের সময়। শিলা পাতে ও প্রবল বাত্যা শালিধান্যের যথেষ্ঠ ক্ষতি করে। সুপক্ব ধান্যের উপর শিলাপাত হইলে কিম্বা প্রবল বাতাস লাগিলে শিলের আঘাতে ও বাতাসের ঘাত প্রতিঘাতে ধানগুলি ডাঁটা ছিঁড়িয়া খসিয়া গাছের গোড়াস্থিত কাদায় পড়িয়া যায়। সুতরাং এই বিপদ সঙ্কুল সময়ে হিরালী আসিয়া কৃষকগণকে শিলা বৃষ্টি ঝড় প্রভৃতি সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করে। কৃষকগণও হিরালীর বাক্যে অনেকটা আস্থা স্থাপন করে। হিরালী তাহার অদ্ভুত মন্ত্র প্রভাবে ইচ্ছামত ঝটিকা, শিলাপাত, বজ্র প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে বলিয়া কৃষকগণের দৃঢ় বিশ্বাস।

একহস্তে লৌহ ত্রিশূল ও অপর হস্তে মহিষ-শৃঙ্গ ধারণ করিয়া, ললাট সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া প্রকাণ্ড পাগড়ী শোভিত হিরালী চৈত্রমাসে প্রত্যেক বাড়ীতে আগমন করে। তাহার অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র যখন গম্ভীর রবে বাদিত হয়, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলেই হিরালীর আগমন বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকটস্থ হয়। হিরালী গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়াই তাহার বাদ্যযন্ত্র বাজায়। তৎপর কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে হস্তস্থিত লৌহদণ্ড দ্বারা গৃহের বায়ুকোণে ভিটের উপর একটা গর্ত্ত করে এবং সেই গর্ত্তে ২।৪টা সরিষা ছড়াইয়া দিয়া তাহা পুনঃ উক্ত দণ্ডদ্বারা আঘাত করে। তৎপর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের চাল দণ্ডদ্বারা স্পর্শ করে। তাহার এই কার্য্যে গৃহস্থ মনে করে, তাহার গৃহ ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত, অশনি সম্পাত প্রভৃতি হইতে নিরাপদ হইল। এবম্প্রকারে গৃহ রক্ষিত হইলে পর হিরালীর চতুর্দ্দিকে সমবেত কৌতুকপ্রিয় বালক বালিকা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ আগামী বর্ষের শিলাপাত, বজ্রপাত, ঝড় তুফান প্রভৃতি কি পরিমাণে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করে। হিরালী ভাবী বৎসরের একটা মোটামুটি রকমের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া ভবিষ্যতের একটা ছায়াচিত্র দিয়া যায়। সমবেত জনমণ্ডলী হিরালীর কথা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে। হিরালীর কথায় কৃষকগণের মনে বিস্ময়, ভয়, ও আশ্বাস এই ত্রিগুণাত্মক এক অদ্ভুত ভাব প্রবাহ প্রবাহিত হয়। এবম্বিধ ভবিষ্যদ্বক্তা হিরালীকে গৃহস্থগণ অতি প্রীতির চক্ষে দেখেন ও আদর করিয়া তাহার প্রাপ্য সিধা (চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাদ্য সম্ভার) ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া থাকেন। হিরালী যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ ভাগে "মা চণ্ডির আজ্ঞা" বলিয়া একটা উপসংহার সংযোগ করিয়া দেয়।

পূর্ব্ব কথিত কার্য্যগুলি হিরালীর গৌণ কর্ম্ম। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রত্যেক কৃষিজীবী যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য হিরালীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যেক কার্য্য কলাপ বিস্ময় পূর্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ করে সেই মুখ্য কার্য্য চৈত্র মাসের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হয়।

চৈত্রের অসহ্য মার্ত্তণ্ড তাপে ধরণী দগ্ধ প্রায় হইলে হঠাৎ এক দিবস অপরাহ্নে বায়ুকোণে আকাশ মণ্ডলে দুই চারিটী ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড মিলিত হইয়া কৃষিজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে; দেখিতে দেখিতে সেই সামান্য কয়েক খণ্ড মেঘ পশ্চিম উত্তর গগন আবৃত করিয়া চপলা চমকের সঙ্গে সঙ্গে গভীর গর্জ্জণে পৃথিবী কম্পিত করিয়া প্রত্যেক কৃষিজীবীর প্রাণে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত করে। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মেঘ মালা হইতে শিলা সম্পাতে অথবা প্রবল ঝটিকায় কৃষকের সুখের স্বপ্ন এবং সমস্ত বৎসরের

আহার্য্য ধ্বংস করিয়া দিতে পারে তাহা কৃষক বিশ্বাস করে। এই দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের স্বর্ণ বর্ণাভ সুপক্ক শালি ধান্যের ক্ষেত্রগুলি যদি তাহারা নিজের বক্ষে আবৃত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তবে কৃষক বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রকৃতির এই বিকট তাণ্ডব অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বুক পাতিয়া দেয়। এইরূপ সঙ্কট সময়ে কৃষকের একমাত্র পার্থিব সাহায্য হিরালী তাহার আশ্রিত কৃষকের জন্য সত্য সত্যই নিজের বক্ষের শোণিত দ্বারা শালিধান্য রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

প্রকৃতির বিরাট তাণ্ডব নৃত্যের পূর্ব্বাভাস পাইবা মাত্রই হিরালী তাহার দীর্ঘ কেশরাশি উর্দ্ধে বন্ধন করিয়া কপালে সিন্দুর দিয়া উলঙ্গ বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শালি ধান্যের ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করে। দীর্ঘকালের পর্য্যবেক্ষণের ফলে হিরালী মেঘের বর্ণ দেখিয়াই কোন মেঘ হইতে শিলাবর্ষণ হইবে তাহা সহজে বুঝিতে পারে। হিরালী তাহার রক্ষিত শালি-ধান্য ক্ষেত্রের উপর শিলা-সম্ভব কোন মেঘ দেখিতে পাইলেই তাহার ঠিক নিম্নস্থলে লৌহ ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া নানাবিধ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে এবং ঐ মেঘকে "জৈতা" যাইবার জন্য অনুরোধ মিশ্রিত আদেশ করে। "জৈতা" সম্ভবতঃ জয়ন্তিয়া শব্দের অপভ্রংশ।

যতক্ষণ শিলা-সম্ভব মেঘের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া সাধারণ মেঘের বর্ণ প্রাপ্ত না হয়, অথবা ঐ মেঘ স্থানান্তরে পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ হিরালী তাহার লৌহ ত্রিশূল মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখে। যদি ঐ মেঘ অল্প দূর সরিয়া শালিধান্য ক্ষেত্রের অপর কোন অংশে উপস্থিত হয়, তবে হিরালা তাহার লৌহ ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া সবেগে ধাবিত হইয়া পুনরায় ঐ মেঘের নিম্নদেশে লৌহ ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির এই বিরাট তাণ্ডব নৃত্য হিরালী অকাতরে সহ্য করে। এইরূপে শিলা-সম্ভব মেঘ শালিধান্যের ক্ষেত্রের উপরিভাগ হইতে বিতাড়িত করিয়া অথবা মেঘের শিলা বর্ষণের আশঙ্কা তিরোহিত করিয়া হিরালী বিজয় গর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

উলঙ্গ বেশ ধারণ জন্য হিরালীকে বিশেষ লজ্জা পাইতে হয় না; যেহেতু এইরূপ ঝড় বৃষ্টির আভাষ পাইবা মাত্র মনুষ্য এমন কি পশু পক্ষী প্রভৃতি পর্য্যন্ত প্রাণ-ভয়ে প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া আবাসাভিমুখে ধাবিত হয়।

এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য হিরালীকে অনেক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। কার্ত্তিক, মাঘ, চৈত্র এবং বৈশাখ মাসের ১৫ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে শুচি ভাবে থাকিয়া নিরামিষ আহার করিয়া প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় শিলাবৃষ্টির দেবতার উদ্দেশে ভোগ প্রদান করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল যাবৎ হিরালী ক্ষৌরী হইতে কিংবা তৈল ব্যবহার করিতে পারে না। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসেও চৈত্র মাসের ১ লা তারিখে রাত্রিকালে গগনমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হিরালী আগামী বৎসরের ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাতের পরিমাণ নির্ণয় করে। এই দুই রাত্রিতে হিরালী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একদৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া থাকে।

হিরালী শিলাবর্ষী মেঘ বিতারণে যে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার মর্ম্ম অথবা শক্তি আমাদের জ্ঞাত নহে। মন্ত্রের শক্তি আছে কি নাই, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব না। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদ্বারাই যে হিরালী শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। শিলাবর্ষী মেঘ বিতাড়ণে হিরালীর হস্তস্থিত লৌহ ত্রিশূল যে কার্য্য-করী. প্রাচীন মঠ, মন্দির ইত্যাদির উপরিস্থিত লৌহ ত্রিশূলের ব্যবহার দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মেঘে কোন কারণ বশতঃ তাড়িতের আধিক্য হইলে হঠাৎ শৈত্য উৎপন্ন হইয়া মেঘ শিলারূপে পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। মেঘে তাড়িতাধিক্য হইবা মাত্রই হিরালী ঐ মেঘের ঠিক নিম্ন স্থলে তাহার সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট লৌহ ত্রিশূল মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া মেঘের তাড়িতাধিক্য দূর করিয়া তাহা সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে এবং মেঘের শিলা বর্ষণের ক্ষমতা দূর করিয়া দেয়। প্রকৃত পক্ষে হিরালীর ক্ষমতা তাহার লৌহ ত্রিশূলে নির্ভর করে। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রামবাসির বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিয়া তাহাদের মনোযোগ

বিশেষরূপে আকর্ষণ জন্য হিরালী অদ্ভুত বেশভূষা পরিধান ও মহিষের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া থাকে।

কৃষকগণ শালিধান্য কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া গোলাজাত করিবার পর অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শেষভাগে হিরালী তাহার পারিশ্রমিক আদায় করিবার জন্য প্রত্যেক গৃহে গৃহে গমন করে। বৎসরের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের উপর হিরালীর বিদায়ের পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রত্যেক গৃহস্থ হিরালীকে একমণ হইতে চারি মণ ধান্য বাৎসরিক পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রদান করে।

শ্রীযুধিষ্ঠির নাথ।

আর্য্যসঙ্গীত ও মিঞাতানসেন।

সঙ্গীত ও ফুল সকল দেশের লোকেই ভাল বাসে, প্রাশ্চাত্য দেশে ফুল গৃহ রচনায়, টেবিল সজ্জায় এবং দেহ বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়। আমাদের হিন্দুর দেশে ফুল দেব কার্য্যে লাগে। ফুলের ন্যায় সঙ্গীত ও এক মাত্র শ্রীভগবানের ভজনার উদ্দেশ্যে রচিত হইত। গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটীকে একত্রে আর্য্য ভাষায় সঙ্গীত বিদ্যা বলা হয়। আর্য্য সঙ্গীত শাস্ত্রের সহিত পাশ্চত্য সঙ্গীত শাস্ত্র পরষ্পর বিরোধী। পাশ্চত্য দেশে স্বর লিপির সাহায্যে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। গাথক অথবা বাদক তাঁহার সম্মুখে স্বর লিপি না রাখিয়া গাইতে অথবা বাজাইতে পারেন না। আর্য্য-নিয়ম এই যে সুরকে কানে শুনিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। এবং সুর আয়ত্ত হইলে তখন গায়ক গান করিবে বা বাদক বাজাইবে। সঙ্গীত অধ্যাপক এনায়েৎ হোসেন বলেন যে আমাদের প্রথা পাশ্চত্য প্রথা হইতে উৎকৃষ্ট। কারণ, এই প্রথা অনুসারে শিক্ষকের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করা যায় তাহার সঙ্গে, তাঁহার নিজের কিছু যোগ করিয়া সে নুতন নুতন সুর গান করিতে পারে ও নুতন ভাবের অবতারণা করিতে পারে। স্বর-লিপিতে এই সুবিধা হয়না। বাঁধা বাঁধি যাহা আছে, তাহাই উচ্চারণ করিতে হয়। সেই জন্য তাহাদের যন্ত্রাদি দ্বারা আর্য্য সঙ্গীতের গমক ও মূর্চ্ছনা দেখান যাইতে পারে না এবং তাল মান সম্বলিত একটি রাগ বা রাগিণীর আলাপ অসম্ভব হয়।

ইউরোপীয়েরা বলেন যে আর্য্য সঙ্গীত এক ঘেয়ে এবং উহা দ্বারা কোনও ভাবের অবতারণা করা যায় না, আর একটী দোষ এই যে একটী সুরেরই বারংবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। ইহার উত্তরে ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন বলেন যে এই পুনরাবৃত্তি দ্বারাই ভাবের স্ফুর্ত্তি সম্ভব। মনে করুন একটী লোক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিল, শ্রোতাগণের মধ্যে কেহ সমস্ত শুনিল, কেহ সমস্ত কথা শুনিতে পাইল না। আবার কেহ যাহা শুনিল, তাহাও সমস্ত বুঝিল না। যদি উহা পুনরায় পাঠ করা হয়, তাহা হইলে শ্রোতাগণ সমস্তই শুনিতে পান ও বুঝিতে পারেন। হিন্দু সঙ্গীতে বার বার এক রাগিণী আলাপ করিবার সময় গায়ক প্রত্যেক বার নুতন নুতন ভাবের সৃষ্টি করেন। ইহাতেই নুতন নুতন রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল—ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী, এখন ছত্রিশ রাগিনী স্থলে প্রায় চারিশত রাগিণী গীত হইয়া থাকে। এই চারিশত রাগিণী মূল ছয় রাগের শাখা মাত্র। কোন্ রাগিণী কোন্ সময় গান করিতে হইবে, দিবা ভাগে কোন্ রাগিণী গান করা যাইবে এবং রাত্রে কোন্ রাগিণী গান করা হইবে কোন্ ঋতুতে কোন্ রাগিণীকে আহ্বান করিতে হইবে ঋষিগণ এবং তৎপরে ওস্তাদগণ ইহা অতি কারিগিরীর সহিত বিভাগ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক যুগে মিঞা তান সেন অপেক্ষা আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকতর ব্যুৎপন্ন কাহার ও নাম উল্লেখ নাই। ইনি দিল্লীর দরবারে আকবর বাদ সাহের প্রধান সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যায় যে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাহাও সকলে জানেন। তানসেন হিন্দু ও বৈষ্ণব ছিলেন। আকবর বাদসাহ তাহাকে মিঞা উপাধি দিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি মিঞা তানসেন নামে পরিচিত ছিলেন। এই মিঞা শব্দ ধর্ম্ম জ্ঞাপক নহে। তানসেন যে কেবল সঙ্গীত অধ্যাপক ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার রচনা চাতুর্য্য ও যথেষ্ট ছিল। তিনি যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, উহা ভগবদ্

ভক্তি পরিপূর্ণ এবং সেই জন্যই তাঁহার গান গুলি শুনিলে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে ভগবদ্ ভক্তির উদ্রেক হয়।

মধ্য ভারত প্রদেশে রিয়া (Rewah) নামক একটী করদ রাজ্য আছে। এলাহাবাদ হইতে বোম্বাই যে রেলপথ গিয়াছে উহার (Sutna) সাটনা নামক ষ্টেসন হইতে সেখানে যাইতে হয়। ঐ রিমা রাজ্যের মধ্যে তালা ও মুকুন্দপুর নামক স্থানে প্রতিবৎসর মিঞা তান সেনের স্মৃতি উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। তান সেন বাদসাহ আকবরের দরবারে কখনও আগ্রা কখনও দিল্লীতে থাকিতেন। তাঁহার স্মৃতি মধ্যভারতে কি জন্য রক্ষা হয়? ঐ মুকুন্দপুরে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। সেই জন্য উহাকে তালাও মুকুন্দপুর বলা হয়। ঐ পুষ্করিণীর নিকট একটী অতি পুরাতন মসজিদ্ আছে। ঐ প্রদেশের কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে তানসেন ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অপর একটী বহু পুরাতন কিম্বদন্তী আছে, তাহা নিয়ে উল্লেখ করিতেছি।

কোনও সময়ে আকবর বাদসাহের সহিত তান সেনের মনোমালিন্য হয়। বাদসাহ বলেন যে তিনি মিঞা সাহেবকে যেরূপ আদর যত্ন করেন, এরূপ আদর যত্ন আর কোনও স্থানে তিনি পাইবেন না। মিঞা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "যদি গুণগ্রাহী কেহ থাকে তবে কেন করিবে না?" ইহা বলিয়া তিনি আপন তানপুরা লইয়া দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। তানসেন বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে রিমা রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সেই পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া আপন মনে তানপুরার সহিত একটী রাগিণী আলাপ করিতে-ছিলেন। অনতিদূরে একটী স্ত্রীলোক আপন শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে একখানি বটী লইয়া লাউ কুটিতেছিল। হতভগিনী তানসেনের সঙ্গীতে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, যে, লাউয়ের পরিবর্তে সে নিজ পুত্রের শরীরের অংশ বিশেষ কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সংবাদ রাজার নিকট পৌছিল। রিমার রাজা রামচন্দ্র অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন, সম্ভবতঃ ইহা শুনিয়াই তানসেনও সেখানে গিয়াছিলেন। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া তানসেনকে আপন দরবারে লইয়া গেলেন এবং অতি যত্নের সহিত তাহাকে সেখানে রাখি-লেন। সেই সময় তান সেন যে গীত রচনা করিতেন তাহাতে রাজা রামের নাম উল্লেখ থাকিত।

ও দিকে তানসেনের জন্য আকবর সাহের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি চতুর্দ্দিকে মিঞার সন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন। রিমা রাজ্যে মিঞা আছেন খবর আসিলে বাদসাহ আর তাঁহার অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই সেখানে গেলেন। কথিত আছে তিনি যাইয়া দেখিলেন, রিমা রাজ রামচন্দ্র তানসেনকে কাঁধে করিয়া নাচিতেছেন। তাহার পূর্ব্বক্ষণে তানসেন একটী নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইয়াছিলেন। রাজা উহাতে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে আনন্দে বিহ্বল হইয়া তান সেনকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

আকবর তানসেনকে ফিরিয়া যাওয়ারজন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। তান সেন বাদসাহের দরবারে যাইতে স্বীকার করিলেন; কিন্তু দুইটী সর্ত্ত করিয়া লইলেন। তাহার প্রথমটী এই যে আর দক্ষিণ হস্তদ্বারা তিনি বাদসাহকে সেলাম করিবেন না। অপরটী এই যে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া আর কোনও সঙ্গীত রচনা করিবেন না। আকবর বাদসাহ তাহাতেই সম্মত হইলেন।

আকবর বাদসাহ তানসেনের শিক্ষা গুরুকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তানসেন বলিলেন "তিনি সাধু বৈষ্ণব; আপনি রাজবেশে যাইলে তিনি সাক্ষাৎ করিবেন না।" বাদসাহ হীনবস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার সহিত ব্রজমণ্ডলের এক জঙ্গলে সেই সাধুর নিকট গেলেন। বাদসাহের ব্যবহারে সাধু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তানসেন অবশ্য বাদসাহের মনের ভাব জানিতেন যে সাধুর কণ্ঠ নিঃসৃত একটী গীত শুনিবার জন্যই তিনি তথায় গিয়াছেন। এ অনুরোধ করিতে তান সেনের সাহস হইল না। কিন্তু কার্য্য উদ্ধারের জন্য তিনি একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আপন তানপুরায় সুর বাঁধিয়া একটী রাগিণী আলাপ করিলেন। ইচ্ছা করিয়াই উহাতে একটু ভুল করিলেন। রাগিণী আলাপ করিয়া তানপুরাটী গুরুর সম্মুখে রাখিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু ভাবে জানাইলেন যে রাগিণীটী ঠিক আলাপ হইল কিনা গুরুদেব বলিয়া দিন। সাধু তানপুরাটী লইয়া সেই রাগিণী আলাপ করিয়া একটী গান করিলেন। বাদসাহ দেখিলেন যে তানসেন অপেক্ষা তাঁহার গুরুর গান সহস্রগুণে মিষ্ট।

একদিন বাদসাহ তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিঞা," তোমার গুরুর গান শুনিয়া আমি যেরূপ আত্ম-হারা হইয়াছিলাম, তোমার গানে সেরূপ উন্মত্ততা আসে না কেন?" মিঞা উত্তর করিলেন, "জাহাপনা আমি গান করি আপনাকে শুনাইবার জন্য, আর আমার গুরু গান করেন—ভগবানকে শুনাইবার জন্য।"

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরী প্রকাশিত।

কলেজ পাঠ্য

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

১। কুমারসম্ভবম্‌ ১—৮ সর্গঃ ৪৲

২। রঘুবংশম্‌ ১০—১৫ ৩৲

By Probodh Chandra Sen M. A.

A Text book on Graphs for School and and College 10as
approved Cal. T. B. C. separately for School only 4as.

বিদ্যালয় পাঠ্যোপযোগী পুস্তক।

শ্রীমতী সুনীতি বানার্জি কৃত

১। হাতের লেখা—Bengali Copy books for class I—III approved by Govt. for girls school. প্রতি খণ্ড /০

ঢাকা কলেজের ড্রিল শিক্ষক বসন্তকুমার দেব প্রণীত

২। ড্রিল ও দেশী কসরৎ শিক্ষা ।/০

৩। ভাষাশিক্ষা অভিধান—রসিকচন্দ্র কাব্যরত্ন approved by T. B. C. ৸০

৪। সংস্কৃতশিক্ষা (সচিত্র) রসিকচন্দ্র কাব্যরত্ন ।০ class VIII.

৫। নীতি প্রবন্ধ (সচিত্র) রসিকচন্দ্র কাব্যরত্ন approved by Govt. ।০ class IV & V.

৬। পদ্যশিক্ষা (সচিত্র) রসিকচন্দ্র কাব্যরত্ন approved by Cal. T. B. C. class III—IV ৶০

৭। নীতিশিক্ষা class III—IV ।০

৮। জ্ঞানাঙ্কুর (সংস্কৃত) রজনীকান্ত কাব্যরত্ন প্রণীত approved by Govt. class VII ৶০

৯। An Elementary **English Grammar** by S. M. Datta B. A. B. T. approved by Govt. class IV—V ।০

১০। শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ by S. M. Dutta কলিকাতা টেক্সটবুক কমিটী অনুমোদিত class III—VI ৵০

১১। Manual of Paraphrase for matriculation boys by S. M. Dutta B. A. B. T. ।৵০

১২। Select papers for the matriculation boys with answers by B. K. Sen M. A. ৷০

১৩। Advanced Lessons in Translation by the same 2nd Edition. ১৲

১৪। Initial Lessons in Translation by the same sixth Edition. ৷০

১৫। Short talks on familiar Subject by by the Same forth Edition. ।০

১৬। (ক) Primary Lessons in translation by the Same third Edition. ।০

১৭। প্রাথমিক প্রবন্ধপ্রণালী by by the Same ।০

১৮। মৌখিক ইতিহাস R Mukherji ৶০

১৯। স্বাস্থ্য সমাচার by R. Mukherji ৶০

২০। কথোপকথন by P. Basak B.A. B.T. ৶০

২১। নববাল্যশিক্ষা সারদা প্রসন্ন সেন /০

২২। পদার্থ পাঠ (object Lessons) Do ৶০

২৩। সরলবাল্যশিক্ষা—ঈশানচন্দ্র মজুমদার /১০

২৪। A Typical English primer C. M. Karmaker B.A. ৶০

২৫। নূতন প্রাথমিকপাঠ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় approved by Govt class IV ।৵০

২৬। The Beginners lessons on words and Translation By N. C. Sen ৶০

২৭। Progressive Lessons and translation by the same ৷০

২৮। বাঙ্গালা পাঠ ১ম ভাগ জনৈক মহিলা class II ৶০

approved by the Govt. and Calcutta T. B.C.

২৯। রচনা বিকাশ কাশীনাথ কর /০

৩০। পত্র-দলিল ঐ ।/০

৩১। ব্যাকরণ মঞ্জুষা ৮ করুণাকান্ত সেন ।৵০

প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ approved by the Govt class VII

৩২। সংস্কৃত শিক্ষা সীতানাথ বসাক class VII approved y T.B.C. ।০

৩৩। ভূগোল বিজ্ঞান (তৃতীয় ও চতুর্থ মানের জন্য)

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, বি, টি প্রণীত ৷০

৩৪। ভূগোল বিজ্ঞান (৫ম ৬ষ্ঠ মানের) approved by T.B.C.

৩৫। পরীক্ষা যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত approved by Govt. class VII—VIII. ।৵০

৩৬। প্রকৃতি প্রকাশ যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷০ approved by Govt. for class VI

৩৭। ভারতের লোক ইতিহাস ঐ ১৷০

৩৮। সাহিত্য প্রসূন—বিশেশ্বর দাস ৶০

৩৯। শৈশব সঙ্গীত ঐ ৶০

approved by calcutta T. B. C,

৪০। Children's companion by Do ।৵০

৪১। প্রাথমিক উর্দ্দু ব্যাকরণ by M. Hossain approved by Govt. for class V. VI. ।/০

৪২। A hand book of persian grammar by the same (Revised by Hossain Ali) 2nd Edi ১৲

৪৩। রচনাশিক্ষা by নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য approved by T. B. C. Late Headmaster, Dhalla H. E. School. ১৲ স্থলে ৸০

৪৪। প্রাথমিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ by শ্রীনাথ কাব্যতীর্থ বরবক্তা (গবর্ণমেন্টের) /০

৪৫। সংযম ও প্রতিভা—শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত হেড মাষ্টার নারায়ণগঞ্জ স্কুল। ৷০

৪৬। তালিমে উর্দ্দু—সীতানাথ বসাক প্রকাশিত approved by T. B. C. মূল্য /০

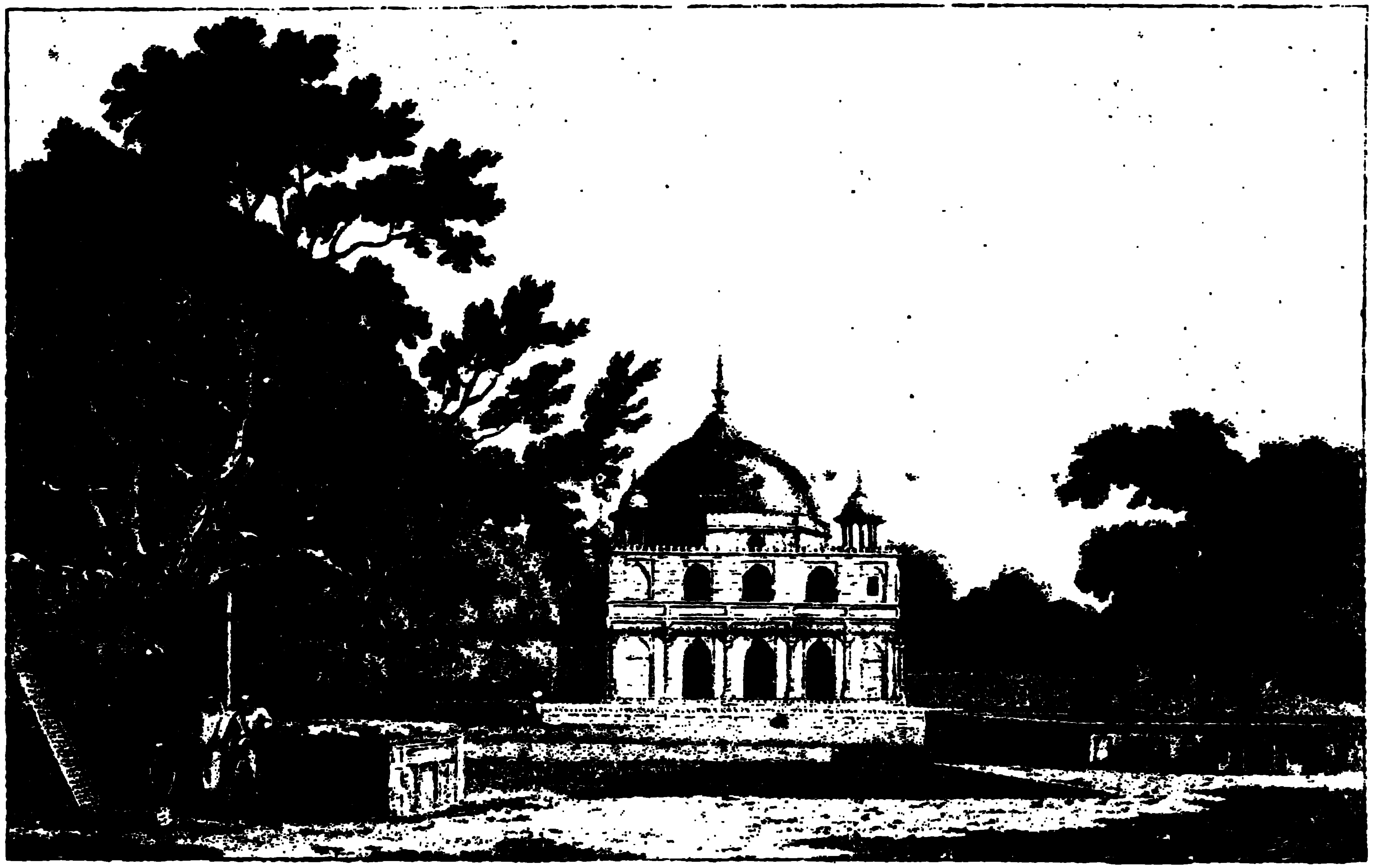

খস্রু-সমাধি—এলাহাবাদ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ } ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২২। { ১১শ সংখ্যা।

জাতির অস্তিত্বে প্রয়োজন।

প্রতীচীর বিজ্ঞান একটা মস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, এই বিরাট জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে কোন জিনিষই অনাবশ্যক নয়; সামান্য ধূলিকণা হইতে উত্তুঙ্গ গিরিশিখর, সামান্য তৃণ হইতে নিবিড় অরণ্যানী,—সকলেরই এই বিশ্বরক্ষায় সহায়তা প্রয়োজন। কেবল তাই নয়, প্রত্যেকটাই প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ এবং সকলের সমষ্টি—এই বিশ্বের সহিত প্রত্যেকেরই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। মানুষের দেহ হইতে তাহার কোন একটী অঙ্গ বাদ দিলে, তাহার অপূর্ণতা ঘটে, অথচ দেহ বলিতে আমরা কোনও একটী বিশেষ অবয়ব বুঝি না, পরস্পর-সম্বদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি বুঝি; এই সমষ্টিতে একই জীবনের স্রোত ধাবিত হইতেছে, একই সাধারণ উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য সকলে সকলের সহায়তা করিতেছে। নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত সকলই একই দেহের অংশ এবং এই একই দেহের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য পরস্পরের সহায়তা করে। উদরকে কেবলই নিষ্কর্ম্মা পেটুক মনে করিয়া হাত পা যদি তার সহায়তা করিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে ক্ষতি যে কেবল উদরেরই হয় না, একথা পড়িয়া শিখিতে হয় না। আহার হেন একটী নিত্য ব্যাপারে যে কত অঙ্গের সহায়তা দরকার হয়, একটী প্রাচীন হেঁয়ালি তাহা বলিয়া রাখিয়াছে—"পাঁচ মর্দ্দে তুলে দেয় বত্রিশ মর্দ্দের ঘাড়ে, এক বুড়ী নেড়ে চেড়ে থোয় নিয়া ঘরে।' আহারের গ্রাসটী প্রথম হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি বত্রিশ দাঁতের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়; বৃদ্ধা জিহ্বা তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া পাকস্থলীতে প্রেরণ করে। সকলের এই সমবেত চেষ্টায়ই দেহের স্থিতি ও বৃদ্ধি।

এই বিশ্বেও তেমনই ক্ষুদ্র বলিয়া কেহ কাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না; সকলে সকলের সহায়তা করে বলিয়াই এই বিশ্ব। এই যে আজ এখানে বৃষ্টিপাত হইয়া গেল, বিশ্বের সমস্ত শক্তিনিচয় এই একটী সাধারণ ক্রিয়া সম্পাদনের সহায়তা যদি না করিত, তবে ইহা হইতে পারিত না। সূর্য্য যদি কিরণ দ্বারা বাষ্প আকর্ষণ না করিত, বায়ু যদি তাহার শক্তি নিয়োজিত না করিত, তাহা হইলে আমরা বৃষ্টি পাইতাম না। কাননে যে ক্ষুদ্র ফুলটী ফুটিয়া থাকে, তাহার সৃষ্টিতেও কি সমস্ত জগৎকে সহায়তা করিতে হয় নাই? মাটী রস দেয়, বাতাস ও আলো খাদ্য যোগায়; মাটী ও বাতাস আবার অন্য বহুবিধ শক্তির সমন্বিত চেষ্টায় অস্তিত্ব লাভ করে। এইরূপে এই বিশ্বটী একটী প্রকাণ্ড যৌথ কারবার;—সকলের চেষ্টায় সকলের জীবন এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় বিশ্বের জীবন।

বাহিরের বস্তুজাতের মধ্যেই যে কেবল এই সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান, এমন নহে। মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের ভিতরে, আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি, আমাদের বেদনা ও বাসনার মধ্যেও এমনই একটা অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে চিন্তা বা বাসনা আমাদের মনে উদিত হয়, তাহা যে পূর্ব্বের চিন্তা প্রভৃতির সহিত অসম্বদ্ধ, এমন নহে; এবং ইহা যে খসিয়া যাইবে, কোনই চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রবর্ত্তনে কোনও সহায়তা করিবে না, এমনও নহে। ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রকার ও প্রণালী আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা দ্বারা

নিয়মিত ; এবং বর্ত্তমান চিন্তার প্রকার এবং প্রণালী ও আবার তেমনই ভূতপূর্ব্ব চিন্তাদ্বারা নিয়মিত। শুধু চিন্তার বেলায়ই ইহা ঠিক, এমন নহে; বাসনা ও বেদনার বেলায়ও তেমনই ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেবল তাই নয়. চিন্তা, বেদনা ও বাসনা এ সকলের মধ্যেও পরস্পর ঐ একই সমবায় সম্বন্ধ। হিসাবের মাঝখানে পরিবর্ত্তন করিলে আগা এবং গোড়া উভয়ই বদলাইতে হয়; আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধেও তাই ;—মাঝখান হইতে যদি একটু কিছু সরাইয়া ফেলি, তাহা হইলে তার পূর্ব্বে এবং পরে উভয়ত্রই সেই অনুসারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ; কারণ, পূর্ব্বে যাহা যেরূপ ছিল, তাহা সেরূপ ছিল বলিয়াই বর্ত্তমানে এই বিশেষ চিন্তা বা বাসনার জন্ম ; এবং এই চিন্তা বা বাসনা আসিয়াছিল বলিয়াই পরে যাহা হইবে, তাহার এক বিশেষ প্রকার দেখা যাইবে।

সুতরাং জাগতিক এবং মানসিক ব্যাপারে কোথাও কিছুই কাহারও সহিত সম্বন্ধ বিহীন নহে। কিন্তু উভয়ত্রই আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা হেতু সব সময় আমরা সকলটার যথাযথ সম্বন্ধ ও উপযোগিতা নির্ণয় করিতে পারি না। অথচ এরূপ সম্বন্ধ যে আছে, তাহা মনে করিবার প্রবল হেতু এই যে, যেখানেই আমরা জানিতে পারিয়াছি, সেই খানেই এই অন্যোন্য সম্বন্ধের অস্তিত্ব দেখা যায় ; এবং মানবের জ্ঞানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সত্বেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না।

মনস্তত্ব মনে এবং বিজ্ঞান জড় পদার্থে এই যে এক সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, ইহাকেই মূল করিয়া ইউরোপীয় দর্শনে এক বিশাল আধ্যাত্মিক সত্য শাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। দার্শনিকদের কেহ ২ মনে করেন, শুধু জড় জগতে নয়, শুধু মানুষের মনে নয়, সমস্ত সৃষ্টি প্রপঞ্চে, আমাদের ভিতর বাহির সমস্ত ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে যাহা কিছু হইয়াছে, হইবে কিংবা হইতেছে—সকলই এক মূলস্থিত "সূত্রে মণিগণা-ইব" সংনিবিষ্ট ; কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না, কোনটাই নিষ্ক্রিয় নিরর্থক নয়—সকলটা এমনই ভাবে একত্র মিলিয়াছে বলিয়াই এই সৃষ্টি। এক বিরাট্ ভাবুক এই বিশ্বের শিল্পী ; আমাদের মনে যেমন এক রাশি চিন্তা, বেদনা ও বাসনা একত্র হইয়া আমাদিগকে প্রকাশ করিতেছে ; এই বিশ্বসংসারও তেমনই এক অসীম, অনাদি, অচিন্তনীয়, অপরিমেয় বিরাট্ পুরুষের মানস সৃষ্টি—তাহার মনের বিচিত্র বিকাশ। আমরা যাহাকে জড় বলিয়া মনে করিয়া থাকি, লৌকিক ব্যবহারে তাহার সত্তা থাকিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই।

এই সর্ব্বব্যাপী সত্যের এক শাখা হইয়াছে—ব্যক্তির অবিনাশিত্ব। তুমি আমি এই বিরাট্ সৃষ্টি প্রপঞ্চে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও এক একটা স্থান অধিকার করিয়া আছি, এক একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিতেছি, বিরাট্ পুরুষের মনের এক একটী চিন্তার স্ফুট অভিব্যক্তি যে চিন্তা-প্রপঞ্চ ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহাতে এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছি ; সুতরাং আমাদের একান্ত লোপ অসম্ভব। আমাদের লোপ হইলে এই পরিপূর্ণ, পূর্ণবিকশিত সৃষ্টির ও অঙ্গহানি হইবে। সুতরাং মানবাত্মার বিনাশ হইতে পারে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই অমর ; অমর পরমাত্মা জীবাত্মাতে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছেন বলিয়াই জীবাত্মাও অমর। এবং এই দুই ছাড়া আর কিছুই অমর নহে, আর কিছুই সত্য নহে—অধ্যাস হেতু আমরা সেগুলিকে সত্য মনে করি মাত্র। ইউরোপীয় এই দ্বৈতবাদ মূলতঃ ভারতীয় দ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ নহে।

কিন্তু জীবাত্মার অমরত্বের পক্ষে ইহা অকাট্য যুক্তি নহে। আমাদের মনে চিন্তা বেদনা বা বাসনার জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আছে। যে চিন্তার লোপ হয়, তাহারও পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং বিশ্ব শিল্পে আমরা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ আছি বলিয়া এবং কোনও এক বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করি বলিয়াই আমাদের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হয় না। আমরা জন্ম গ্রহণ করি, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সৃষ্টিদেহে কোনও এক ক্রিয়া নিষ্পাদন করি ; কিন্তু এই ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে আমাদের আর আবশ্যক কি ?

তখন আমাদের লোপ না হইবে কেন? আর আমরা যেমন এক এক ক্রিয়া নিষ্পাদনে সহায়, তেমনই অন্যান্য বস্তুজাতও ত সহায়; বস্তুর জড়ত্ব না হয় অস্বীকার করিলাম কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ত অস্বীকার করিতে পারি না; বিরাট্ পুরুষের মানস সৃষ্টি, সুতরাং তার মনে ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে। আমরা যেমন বিশ্বদেহে কোনও এক ক্রিয়া নিষ্পাদন করি বলিয়া অমরত্বের দাবী করি, তথাকথিত জড় বস্তুর সেই দাবী আমরা উপেক্ষা করিব কি বলিয়া? তথা কথিত জড়ের বেলায় যদি এই নিয়ম হয় যে তার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সে প্রকারান্তর গ্রহণ করে, তবে মানবাত্মার বেলায়ও এই বিধান না হইবে কেন? সুতরাং অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত করিবেন, সৃষ্টিতে যে মহীয়সী শক্তি ব্যক্ত রহিয়াছে, তাহাই অমর; "অবিনাশি তু তৎ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং"; তা ছাড়া ইহার বহুধা অভিব্যক্তির সকলই সাময়িক; সুতরাং বিনাশি। ইহাদের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ অস্বীকার করা হইতেছে না। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটীই একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়; প্রত্যেকেরই ঠিকা কাজ। যাহার যে কাজ এবং যতদিন দরকার সেই কাজ করিবার জন্য সে ততদিন থাকিবে; কাজ হইয়া গেলেই তাহার বিদায়। শৈশবের বস্ত্র আমরা যৌবনে পরিধান করি না; বিদ্যা শিক্ষা হইয়া গেলেই আমরা গুরুমহাশয়কে বিদায় দেই। বিশ্ব শিল্পীর কারখানায়ও এই নিয়ম।

ইউরোপীয়, বিশেষতঃ জর্ম্মাণ চিন্তার এই একটী বিখ্যাত প্রণালী। ইহার সবটুকু সত্য কিনা সে বিচার আমরা এখানে করিতে চাই না। কিন্তু ইহাতে অনেক গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে। বিশেষতঃ জাতির উত্থান পতন সামাজিক বিপ্লব ও সংস্কার প্রভৃতির সম্বন্ধে যখন ইতিহাসের সাক্ষ্য লওয়া হয়, তখন ইহার সত্যতা উপলব্ধি না হইয়া পারে না। এক একটা সময় আসে, যখন মানুষের মনে এক একটা বিশিষ্ট ভাব জাগিয়া উঠে; তখন সে সেই অনুসারেই কাজ করে। আবার সময়ান্তরে অন্য ভাবের উদ্রেক আবশ্যক হইয়া পড়ে; তখন কোথা হইতে কোন্ শক্তি আসিয়া মানুষের মনে সেই ভাব জাগাইয়া দেয়। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বৈদিক পশুঘাতনের রক্ত প্লাবনে যখন ভারতবর্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, ঠিক তখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূত সলিল দেশটাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করিয়া দিল। তাহার ঐ নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল, সেই কাজ যেই নিষ্পন্ন হইয়া গেল তখনই বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ আরম্ভ হইল-শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ইহাকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিল। খৃষ্ট ধর্ম্মের গ্রাস হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা বিধাতার নির্দ্দিষ্ট কাজ; ব্রাহ্ম সমাজ এই কাজ করিয়াছে এবং ঠিক এই কাজ করার সময়ই তাহার আবির্ভাব হইয়াছে। এবং তাহার ক্রিয়া যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার অস্তিত্ব। এবং পরে ক্রিয়ান্তর যদি ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে, তবে লোপ অসম্ভব নহে। মোসেস যখন ইহুদী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, যখন নিয়মের শাসনে তাঁহার স্বজাতিকে আবদ্ধ করেন, তখন ঐ ক্রিয়ার জন্য তাঁহার আবশ্যক ছিল বলিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর ঐ অংশে একটা ধর্ম্মের বন্ধন আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়াই ইহুদী ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। পরে, জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার পরিবর্ত্তন ও আংশিক বিনাশ আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখনই যীশুর আবির্ভাব।

আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমরা সব সময় জানিতে পারি না, কোনটী দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। কোনও ধর্ম্ম বিশেষ দ্বারা সমাজে কি কাজ সাধিত হইতেছে, মানব চিত্তের কোন্ ২ প্রবৃত্তির পরিপোষক বা নিয়ামকরূপে কোন্ ধর্ম্ম কখন উত্থিত হয়, সব সময় যে আমরা তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি, এমন নয়। কিন্তু ইতিহাস হইতে যত টুকু জানা যায়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ধর্ম্মের যখন অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখনই তাহার ঠিক প্রয়োজন ছিল; "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং'; এবং যখনই কোন ধর্ম্মের পতন বা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ঠিক তখন উহা না হইয়া পারিত না।

শুধু ধর্ম্মের বেলায় নয়, সামাজিক জীবনেও দেখা যায়, যখনই কোনও প্রাচীন পদ্ধতি দুরাচারের সৃষ্টি করে,

তখনই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য লোকের জন্ম হয়; আবার, আর একটু দূরে দৃষ্টি করিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, যে প্রাচীনকে নিহত করিবার জন্য নূতনের আবির্ভাব, এক সময়ে তাহারও উপকারিতা ছিল, এক সময়ে সেও এক প্রাচীনতরের শ্মশানেই আপন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বিলাতে 'পিউরিটান' সম্প্রদায় যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের উপযোগিতা ছিল; আবার তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ার পর তাহাদেরও লোপ হইয়াছে।

জাতি বিশেষের বেলায়ও তাহাই। অস্থানে এবং অসময়ে কাহারও আবির্ভাব হইতে পারে না। বিশ্ব নিয়ন্তার কোন্ দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কোন্ জাতির কখন আবির্ভাব হয়, সব সময় আমরা তাহা না ও জানিতে পারি; কিন্তু জাতির ইতিহাসটী সমাপ্ত হইয়া গেলে প্রায়ই দেখা যায়, সে একটা কাজ করিয়াছে এবং এই কাজ করিবার সময়ই তাহার অভ্যুত্থান হইয়াছে, সুতরাং ইহাই তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ; এবং কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়াই তাহার পতন হইয়াছে। ম্যাসিডোনিয়ার সাম্রাজ্য এখন লোপ পাইয়াছে; কিন্তু ঐতিহাসিক জানেন, যখন আলেক্‌জেণ্ডার সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করেন, গ্রীক চিন্তা তখন পূর্ণ বিকসিত; এই চিন্তার ফল জগতে ছড়াইয়া দিবার ঐ প্রকৃষ্ট সময় ছিল। আলেকজেণ্ডারের সাম্রাজ্য সে কাজ করিয়াছে এবং কার্য্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লুপ্ত হইয়াছে। অশোকের সাম্রাজ্য এখন লুপ্ত, তাহার ক্রিয়াও লুপ্ত। কিন্তু জগতে একটা গভীর ধর্ম্ম ও উদার নীতি দান করা যখন আবশ্যক হইয়াছিল, 'দেবানাং পিয়দসি' ঠিক সেই সময়ই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে দেখা যায়, জাতি বিশেষের কিংবা রাজ্য বিশেষের উত্থান পতনের সঙ্গে জগতের কোন না কোন গূঢ় উদ্দেশ্য জড়িত থাকে। ক্রমবিকাশ যদি মানি, তাহা হইলে আরও দেখিতে পাই যে—শুধু মানবের ইতিহাসে নয়, সমস্ত প্রাণিজগতেই ঐ একই নিয়ম।—কত জাতি জীব পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছিল,—অথচ ইহাদের অনেকই এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। একটা উদ্দেশ্য তারা সিদ্ধ করিয়াছে;—একটা নিম্নতর জাতিকে উন্নততর জাতিতে উন্নীত করিবার সোপান ছিল তারা। বর্ত্তমান অনুকরণপটু, লাঙ্গুলবিহীন বানরজাতি ও অসভ্যতম মানুষ, এ উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী অনেক উচ্চাবচ বানর শ্রেণী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদের নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, বানর হইতে মানুষকে ফুটাইয়া তোলা; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া দিয়া কার্য্যসমাপনান্তে মজুরের মত তারা বিশ্বের শিল্পাগার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন ভূগর্ভ প্রোথিত কঙ্কাল তাহাদের ভূতপূর্ব্ব অস্তিত্বের সাক্ষ্যদেয় মাত্র।

মানব সমাজেও যে কত নিম্নতর মানব শ্রেণীর অন্তর্ধান হইতেছে, আমাদের সম-সাময়িক ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা লুপ্তপ্রায়। অন্য এক উপযুক্ত জাতির স্থান করিয়া দিবার জন্য তাহাদের লোপ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখনও যারা বাঁচিয়া আছে, বৈজ্ঞানিকের কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই তারা রক্ষিত হইতেছে। বন্য পশুর সংখ্যা যেমন মানুষ ক্রমেই কমাইয়া আনিতেছে, ইহাদের সম্বন্ধেও তেমনই। জগতের ইতিহাসে ইহারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় আমরা জানিনা; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের আর কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, সুতরাং ইহাদের লোপও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

এই সাধারণ নিয়ম মানিলে, বিশেষ কোন প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভারতের জাতি-সকল যে এতকাল টিকিয়া রহিয়াছে, তার মানে—ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর কোনও একটা কাজ সিদ্ধ হইতেছে; এবং ভবিষ্যতে যদি ইহারা টিকে, তবে কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্যের সাধক রূপেই টিকিতে পারিবে। জাতির ভবিষ্যৎ যাঁরা ভাবেন, তাঁদের মনে রাখিতে হইবে যে, আফিসে কেরাণীগিরি করা একটা জাতির পক্ষে বড় মহান্ উদ্দেশ্য নয়; কেবল এই করিয়া কোনও জাতি, জাতি-হিসাবে রক্ষিত হইবে না। আমরা যদি একটা জাতি হই, এবং যদি একটা জাতিরূপে পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিতে চাই, তাহা হইলে, বিশাল মানব সমাজের বিবিধ-বৈচিত্র্যময়

কর্ম্ম-শালায় একটা বিশিষ্ট কার্য্যের জন্ম আমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইবে। তা না হইলে, আমাদের যে লোপ হইবে এই অবশ্যম্ভাবী সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই। কত রকম ক্রিয়ায়, চিন্তায় ও ভাবে মানুষ আজ আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে ;— ইহার কোনও একটা বিশেষ ধারা কি আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিবে না ? কত রকমে, কতদিক হইতে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া মানুষ আজ আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে ,— ইহার একটা দিকেও কি আমরা সাহায্য করিতে পারিব না ? যদি না পারি, তা হইলে ঠিকা মজুর আমরা, আমাদের সময় ত ফুরাইবেই। ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা, প্রেমের কথা, কত রকমে মানুষ আজ ঘোষণা করিতেছে ;—ইহার কিছুরই জন্য কি আমরা উপযুক্ত নই ? যদি না হই, তবে অন্যের কাজে বাধা জন্মাইবার জন্য, অন্যের পথে কণ্টক হইবার জন্ম, অনাবশ্যক ভার-স্বরূপ আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে ? এই ভয়ঙ্কর লোক ক্ষয়-কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও জর্ম্মেণী বলিতেছে যদি জয়ী হই, ফরাসী-শক্তিকে ধ্বংস করিব না —পৃথিবীর সভ্যতা ইহার নিকট ঋণী। জর্ম্মেণীর নিকটও সভ্য সমাজ বহুধা ঋণে আবদ্ধ ; সুতরাং পরাজিত হইলেও একান্ত বিনাশ হইতে সে রক্ষা পাইবে , -ঋণী পৃথিবী তাহার আয়ু কামনা না করিয়া পারিবে না। আমরা যদি এই বিশাল পৃথিবীতে কাহাকেও কোন ঋণ না দিতে পারি যদি কোনও রূপে মানব-সমাজের উপকার ও সহায়তা না করিতে পারি, তবে কাঠ চিড়িবার জন্য এবং জল টানিবার জন্য যত দিন দরকার, তার বেশী কে আমাদের দীর্ঘায়ু কামনা করিবে? অথবা,ধ্বংসের নিম্নবর্ত্মে যখন পা দিব, তখন কে আমাদের জন্য কাঁদিবে ?

তবে, একটা জাগরণের চিহ্ন যেন প্রভাতের ক্ষীণ আলোকরেখার মত প্রাচীর আকাশ কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জানিনা, ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তিকার শেষ কিরণ দান কিনা। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, কলাবিদ্যায় একটা বিশেষ ধারা, একটা নিতান্তই স্বকীয় পদ্ধতি যেন আমরা প্রকাশ করিতে চাহিতেছি ;—একটা নিতান্তই নিজস্ব পথ যেন আমরা কাটিয়া নিতে চেষ্টা করিতেছি ;—এই বহুধা অভিব্যক্ত অথচ অপূর্ণ বিশ্ব-শিল্পে একটা নূতন সামগ্রী দান করিবার চেষ্টা যেন করিতেছি। অতীতের দোহাই অর্থহীন ; অতীতের কাজ যদি সম্পন্ন হইয়া গিয়া থাকে, তবে বর্ত্তমানে আমাদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক। এখনও যদি আমরা বিশ্ব-শিল্পে কোনও সহায়তা করিতে পারি,তবেই আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইবে। না হইলে. আমাদের শ্মশানে কেহই রোদন করিবে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তিব্বত অভিযান।

তিব্বতের বিবাহ প্রথা।

বিবাহের সময় পাত্র এবং পাত্রীর বয়স যথাক্রমে নয় হইতে ষোল এবং ষোল হইতে কুড়ি বৎসর। এ প্রকার বাল্য বিবাহ-প্রথা পৃথিবীর আর কোনও বৌদ্ধ দেশে নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে কয়েক ভাই মিলিয়া এক রমণীর পাণি গ্রহণ করে। নীচ শ্রেণীর মধ্যে পিতা এবং পুত্র উভয়ে এক স্ত্রী গ্রহণ করিবার প্রথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কথাটা এ প্রকার বীভৎস যে সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।

এ দেশে স্বয়ম্বর প্রথা (Courtship) নাই। পুত্র কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ আত্মীয় গুরুজনেরাই করিয়া থাকেন। এই বিবাহের কথাবার্ত্তা এ প্রকার সঙ্গোপনে চলিতে থাকে যে, পাত্র ও পাত্রী ইহার কোনও প্রকার সংবাদ জানিতে পারে না। কখনও ২ বরকর্ত্তা এবং কখনও ২ কন্যাকর্ত্তা বিবাহের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব কর্ত্তাকে প্রথমে অপর পক্ষের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপর পাদচারণা করিতে হয়। ঐ বাড়ীর যে কেহ বাহিরে আসে. তাহাকে প্রস্তাব কর্ত্তার বিশেষ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়, ততদিন এই প্রকার করিতে হয়। সম্বন্ধ স্থির হইবার পর, উভয় পক্ষ কোনও জ্যোতির্ব্বিদের নিকট উপস্থিত হইয়া বর কন্যা সম্বন্ধে

নানাপ্রকার বিষয়ের প্রশ্ন করেন। তাঁহার উত্তর সন্তোষ জনক হইলে বিবাহ স্থির হইয়া যায়। তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু পাত্র ও পাত্রীকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা জ্ঞাপন করা হয় না।

সুখের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে যৌতুক দানের প্রথা একবারে নাই। কন্যার পিতার সামর্থ্য থাকিলে "ঘর বসতের' সময় কন্যার সহিত সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাও তাঁহার ইচ্ছাধীন। বরের পিতা কন্যার মাতাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে বাধ্য। ইহার নাম 'দুগ্ধমূল্য' অর্থাৎ

লামা বরকে মন্ত্র পড়াইতেছে।

কন্যাকে লালন পালন করিবার বিনিময়ে এই অর্থ তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ তাঁহাকে দেওয়া হয়। ইহার পর কন্যার উপর তাঁহার আর কোনও অধিকার থাকে না।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে বরের বাড়ী হইতে কন্যার বেশ বিন্যাসের নানাপ্রকার দ্রব্য কন্যার বাড়ীতে (কন্যার সম্পূর্ণ অগোচরে) প্রেরিত হয়। ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সাজাইয়া মাতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবালয়ে পূজা দানের অভিপ্রায়ে ঘর হইতে বাহির হয়েন। সঙ্গে কন্যার দুই একটি সঙ্গিনী ভিন্ন আর কেহই থাকে না। মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইবার পর হইতে কন্যার বাড়ীতে উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসব অবস্থা বিশেষে দুই হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। যেদিন উৎসব শেষ হইবে, সেইদিন বর সদল বলে কন্যার আলয়ে উপস্থিত হয়েন।

বিবাহের মন্ত্রাদি খুব সামান্য। উহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয়। তাহার পর বর মহাশয় (একাধিক হইলে সকলেই) কন্যার কর স্পর্শ করেন। তাহার পর কন্যা স্বামী গৃহে গমন করে। অনেক সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতারা নববিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া গ্রামান্তরে প্রস্থান করে।

আমরা লাসায় অবস্থান কালীন এক বিবাহে যোগ দিবার জন্য আহুত হইয়াছিলাম। বিশেষ আহ্লাদের সহিত আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আমরা বরের সহিত বেলা ৯ টার সময় কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমরা উপস্থিত হইবামাত্র আহারের আয়োজন আরম্ভ হইল। আমি ঐ সকল তামাসা দেখিতেছি, এমন সময় আমার পরিচিত একজন লামা আসিয়া বলিলেন যে, বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম। অনুমানে বোধ হইল, কোনও প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। বর ও কন্যা একাসনে উপবিষ্ট। যজ্ঞের পর পুরোহিত মহাশয় একটী মন্ত্র পাঠ করিলেন। উহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—"হে কন্যে এতদিন তুমি পিতা মাতার ছিলে। এখন তুমি স্বামীর হইলে। স্বামীর পিতা তোমার পিতা, তাহার ভাই ভগিনী তোমার ভাই ভগিনী। এখন তোমার উচিত, তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করা। এখন স্বামীই তোমার সর্ব্বস্ব। তোমার সমস্ত ভার এখন ইঁহার উপর।" ইত্যাদি। এই মন্ত্র কন্যার পিতা

মাতা এবং অপরাপর সমস্ত আত্মীয়কে পাঠ করিতে হয়।

বিবাহের পর বর এবং কন্যা দুইটী ঘোটকে আরোহণ করিয়া বরের বাড়ীর দিকে গমন করিল। কন্যা ঐ সময়ে খুব উচ্চৈস্বরে কাঁদিতেছিল। ইহা লোক দেখান না স্বাভাবিক, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বর যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে বর কনের সহিত অশ্বারোহনে গমন করিতে লাগিল। শুনিলাম, এদেশের ইহাই প্রথা। আমিও একজন বরযাত্রী; সুতরাং আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল। খানিকদুর গমন করিবার পর আমরা সকলে এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে পানাহারাদির বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ঐ স্থানে খানিকক্ষণ আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইবার পর, আমরা আবার রওনা হইলাম। কিয়দ্দুর যাইয়া আবার আমাদিগকে চন্দ্রাতপের নীচে পানাহার করিতে হইল। এই ভাবে তিন স্থানে আমোদ আহ্লাদ করিবার পর আমরা বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম বরের বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। তখন বর কন্যা, বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীর দল ঐ বাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। দুই চারি মিনিট পরে সহসা এক খানা তরবারি আসিয়া কন্যার মুখের উপর পতিত হইল, এবং সাত আট খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। পরে শুনিলাম যে কন্যার দেহ শুদ্ধির জন্য এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে। ময়দা এবং মাখন মিলাইয়া এই তরবারি প্রস্তুত হয়। ইহা মন্ত্রপূত থাকে। কন্যার শরীরে যদি কোন পীড়া বা অপর কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে ঐ তরবারি স্পর্শে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। এই তরবারি তিব্বতীয় ভাষায় 'ভোরমা' নামে প্রসিদ্ধ।

যাহা হউক, ইহার পর বাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। প্রথমেই বরের মা ময়দা মাখন এবং চিনি মিশ্রিত একপ্রকার মিষ্টান্ন আমাদের সকলের হাতে কিছু কিছু দিলেন। সকলে উহা পরম আদরের সহিত খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর আমরা সকলে বরের মাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আবার পানাহারের বন্দোবস্ত। উহা সমাপ্ত হইবার পর বরের আত্মীয় ও বন্ধু সকলে বরকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করিলেন। আমি এই ব্যাপারের জন্য একবারে প্রস্তুত ছিলাম না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম।

মৃতদেহ সৎকারের কথা।

মৃত্যুর পর একজন লামাকে সংবাদ দেওয়া হয়। এ দেশের লোকের বিশ্বাস. কাহারও মৃত্যুর সময় নানা প্রকার অপদেবতা আসিয়া তাহার আত্মাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। লামা মহাশয় আসিয়া মন্ত্রাদি পাঠ না করিলে তাহারা মৃতের আত্মাকে সঙ্গে লইয়া যায় এবং তাঁহার কর্ম্মফল খুব ভাল হইলেও, তাঁহার আত্মাকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, এবং শেষে উহাকে নিজেদের গোলাম করিয়া রাখে। লামা মহাশয় আসিয়াই মৃতের কক্ষ হইতে সকলকে বাহির করিয়া দেন। তাহার পর, ঘরের দরজা, জানালা, প্রভৃতি স্বহস্তে বেশ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর তিনি মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা উহার মস্তকের কেশ সকল সজোরে উপড়াইতে থাকেন। ইহাঁদের ধারণা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়, মৃতের আত্মা দেহ হইতে ততক্ষণ সম্পূর্ণ ভাবে বাহির হইতে পারেনা। ঘরের সমস্ত বহির্গমন পথ উত্তম ভাবে বন্ধ থাকাতে ঐ মুক্ত আত্মা ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না, এবং অপদেবতারাও বাহির হইতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর লামা মহাশয় ঐ মুক্ত আত্মার উদ্দেশে নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। কি প্রকার পথ অবলম্বন করিলে আত্মা আপন কর্ম্মফল অনুসারে অন্য যোনিতে গমন করিবে, তাহা লামা মহাশয় বলিয়া দেন।

এই ঘটনার পর দৈবজ্ঞ মহাশয় উপস্থিত হ'ন। কি ভাবে মৃতদেহ ভূমিসাৎ করা হইবে। তাহা ইনি বলিয়া দেন। কোন্ ২ ব্যক্তি ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবে, এবং তাহারা কোন্ পথে কবর স্থানে গমন করিবে, তাহা সমস্ত ইনি গণনা দ্বারা স্থির করেন। অনেক সময় এমন হয় যে, মৃত ব্যক্তি একা পরলোকে

থাকিতে পারে না। এইজন্য সে তাহার আত্মীয়ের মধ্যে অন্য আর একজনকে নিজের নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। দৈবজ্ঞ মহাশয় এ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারেন এবং যাহাতে মৃত ব্যক্তি অপর কাহারও মৃত্যু না ঘটায়, তাহার জন্য উপযুক্ত মন্ত্রপাঠ করেন।

এইবার প্রথমোক্ত লামা মহাশয় মৃত দেহকে ঐ ঘরের এক কোণে বসাইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে ২ তাহার আত্মীয়দিগকে আহ্বান করেন। তাঁহারা মৃতের কক্ষে উহার দেহের সম্মুখে বসিয়া আহারাদি করেন। মৃতের সম্মুখেও তাহার অংশ রক্ষিত হয়। তামাক, পান, মদ্য, চা প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যের উপযুক্ত অংশ মৃতদেহ পাইয়া থাকে। উনপঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত এইভাবে আহার্য্যের অংশ মৃত পাইয়া থাকে। ইহারা মনে করে যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত মৃতের আত্মা স্বাধীন ভাবে চারিদিকে যাইতে আসিতে পারে। অবশ্য মৃত দেহ ততদিন পর্য্যন্ত রাখা হয় না। এইজন্য কবর হইবার পর মৃতের খাদ্য কোনও নদী হ্রদ বা সরোবরের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।

কবর না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত লামা প্রতিদিন মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। মৃতদেহ বাড়ী হইতে বাহির করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নানা প্রকার মুখপ্রিয় খাদ্যদ্রব্য উহার সম্মুখে রাখা হয়। তাহার পর একখানা নূতন চাদরের এক প্রান্ত মৃতদেহে জড়াইয়া অপর প্রান্ত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া লামা মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। অগ্রে অগ্রে ঢোল এবং শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে দুইজন লোক যাইতে থাকে। এই বাদক দ্বয় মধ্যে মধ্যে পশ্চাতে চাহিয়া দেখে এবং মৃতের আত্মাকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ আত্মা যেন পথ ভুলিয়া অন্য পথে চলিয়া না যায়।

তিব্বতে তিন প্রকার উপায়ে মৃত দেহের শেষ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, (১) হিন্দু দিগের ন্যায় দাহ। ইহার সংখ্যা খুব কম। (২) কবর দেওয়া। অধিকাংশ লোক এই প্রথা অবলম্বন করে। (৩) কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মৃত দেহ নিক্ষেপ করা। শৃগাল, কুকুর, শকুনি প্রভৃতি উহার মাংস ভক্ষণ করে। অনেকে আবার হ্রদ বা নদীর মধ্যেও মৃত দেহ নিক্ষেপ করে। এই প্রথাও বহুতর লোকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা বলে, "আমা-

মৃতদেহ সৎকার।

দের সামান্য দেহ দ্বারা যদি কতকগুলি জীবের উপকার হয় (উদর পূরণ হয়) তবে তাহা কেন না করিব? মৃত্যুর পর এই সামান্য উপকারটুকু ও যদি না করিলাম, তবে আমরা মানুষ কিসে?" অনেকেই হয় ত জ্ঞাত আছেন যে, আমাদের দেশের পার্শী জাতিরা এই উপায়ে মৃতের সৎকার করিয়া থাকেন।

শাসন প্রণালী।

তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা দলাইলামা। ইহাঁর অধীনে চারিজন মন্ত্রী আছেন। ইহাঁদিগকে 'তুঙ্গিক্ চেন্‌পো' নামে অভিহিত করা হয়। এই মন্ত্রী সভার নাম 'দেপা ঙ্গং'। এই চারিজনের মধ্যে তিন জন গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং একজন লামা। প্রধান অমাত্য ইহাঁদিগকে মনোনীত করেন। রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী এই মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়েন। প্রদেশীয় এবং জেলার শাসন কর্ত্তারা সচরাচর লাসা হইতে প্রেরিত হয়। তিন বৎসর এই সকল শাসন কর্ত্তারা মন্ত্রী সভার সম্মুখে আসিয়া আপনাপন কার্য্য বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য। যদি তাঁহাদের কার্য্য সন্তোষ জনক হয়, তবে তাঁহারা আবার স্ব ২ কার্য্যে ফিরিয়া যান,—কিন্তু পুরাতন স্থানে তাঁহাদিগকে আর পাঠান হয় না। কাহারও কাজ যদি সন্তোষ জনক

না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি ভাল কৈফিয়ত দিতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন।

কখনও কোনও বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইলে, বহুতর কর্ম্মচারী ও সহরবাসী এক মহাসভা আহ্বান করেন। তথায় যাহা স্থির হয়, তাহা মন্ত্রী সভার নিকট উপস্থিত করা হয়। উহা রক্ষা করা না করা, মন্ত্রীদিগের ইচ্ছা।

আয় ব্যয় বিভাগ চারিজন কর্ম্মচারীর হাতে। ইহাদের উপাধি—সিপন্। রাজকোষ দুইজন কর্ম্মচারীর হাতে। এদেশে অনেকে রাজকর প্রদানের সময় নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে শস্যাদি প্রদান করে। এই শস্য দুইজন কর্ম্মচারীর হস্তে রক্ষিত থাকে। বিচারের জন্য চারিজন জজ আছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন লামা ও দুইজন গৃহস্থ। দেশের চারিদিকে ৭১ জন মাজিষ্ট্রেট আছেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ১৩ জন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত আছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন খাদ্য পরীক্ষক তিন জন চিকিৎসা বিভাগের, দুইজন জঙ্গল বিভাগের, একজন সরকারি অশ্বাদির ঘাস পরীক্ষার, দুইজন আবকারী বিভাগের,ও তিন জন পালিত জন্তু পরিদর্শনের ইন্‌স্পেক্টার।

শাসন কার্য্যের জন্য তিব্বতকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে বা প্রদেশে দুইজন করিয়া গভর্ণর নিযুক্ত আছেন। প্রদেশ সকলকে জেলায় এবং জেলাকে তহশীলে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রদেশ. জেলা এবং তহশীলের কর্ম্মচারীরা লাসা হইতে প্রেরিত হয়। এই সকল শাসন কর্ত্তার আপনাপন স্থানে অপ্রতিহত ক্ষমতা। ইঁহারা যাহা হুকুম দেন, তাহার আর আপীল হয় না। এদেশের শাস্তি বড় ভীষণ। সামান্য ২ অপরাধে নাসিকা, কর্ণ, হস্ত বা চক্ষু উৎপাটিত করিয়া লওয়া হয়। চরম দণ্ড প্রাপ্ত ব্যাক্তিকে প্রায়ই নদী বা হ্রদের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থানে অনররি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ২ অপরাধের বিচার করিয়া থাকেন।

স্থানীয় শাসন কর্ত্তারা রাজস্বসংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই সকল কর্ম্মচারীকে বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া নিযুক্ত হইতে হয়। এবং পদরক্ষার জন্য মধ্যে ২ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী দিগকে নানা প্রকার উপহার দিতে হয়। এই জন্য তাহারা নানাপ্রকার উপায়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়া থাকেন। অসহায় প্রজারা নীরবে তাঁহাদের অত্যাচার সহ্য করে, কারণ তাহাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করে না.

এদেশে ডাকের বন্দোবস্ত আছে। চিঠিপত্র প্রভৃতি দুই উপায়ে গমনাগমন করিয়া থাকে (১) রণারের দ্বারা। এক এক জন রণার নির্দ্দিষ্ট গ্রামের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইয়া শিঙ্গা ধ্বনি করিতে থাকে। আর একজন রণার প্রথমের নিকট হইতে ডাক গ্রহণ করে এবং তাহার হস্তে নিজের ডাক প্রদান করে তাহার পর প্রথম রণার নিজের স্থানে ফিরিয়া আসে এবং তথায় উপস্থিত তৃতীয় রণারের সহিত ডাক বদল করে। ইহার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রণার আপনাপন নির্দ্দিষ্ট হলকার প্রান্তে গমন করিয়া ঐ ভাবে ডাক বদল করে। (২) অশ্বের সাহায্যে। ইহাও পূর্ব্বের মত গমনাগমন করে। তবে ইহাতে ডাক শীঘ্র গমনাগমন করে বলিয়া ইহার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অনেক সময় পথি মধ্যে দস্যু দ্বারা ডাক লুণ্ঠিত হয়। আমাদের নিজেদের ডাক সর্ব্বদা উপযুক্ত প্রহরী দ্বারা রক্ষিত থাকিত বলিয়া কখন ও কোন বিপদে পড়ে নাই।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

পরিণাম।

সুখ তরে বিঘ্ন-বাধা নাশি
স্তূপীকৃত করিয়াছি দুঃখ;
জীবনের তটপ্রান্তে আসি,
আজ দেখি, সকলি বিমুখ।

যেথা শুধু আকাশ-কুসুম
কল্পনায় করিয়াছি চাষ!
আজ সেথা দেখি মরুভূম!
অদৃষ্টের এ কি পরিহাস!

এ সংসারে আমার ভাবিয়া
যারে নিয়া বাঁধিয়াছি ঘর,
আজ তারা চাহেনা ফিরিয়া,
মনে হয়,—সবি যেন পর।

কে আমার, কি আছে সংসারে,
বুঝিয়াছি; এপারের খেলা।
—যদি কেহ থাকে অইপারে,
দিছি তাই ভাসাইয়া ভেলা।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

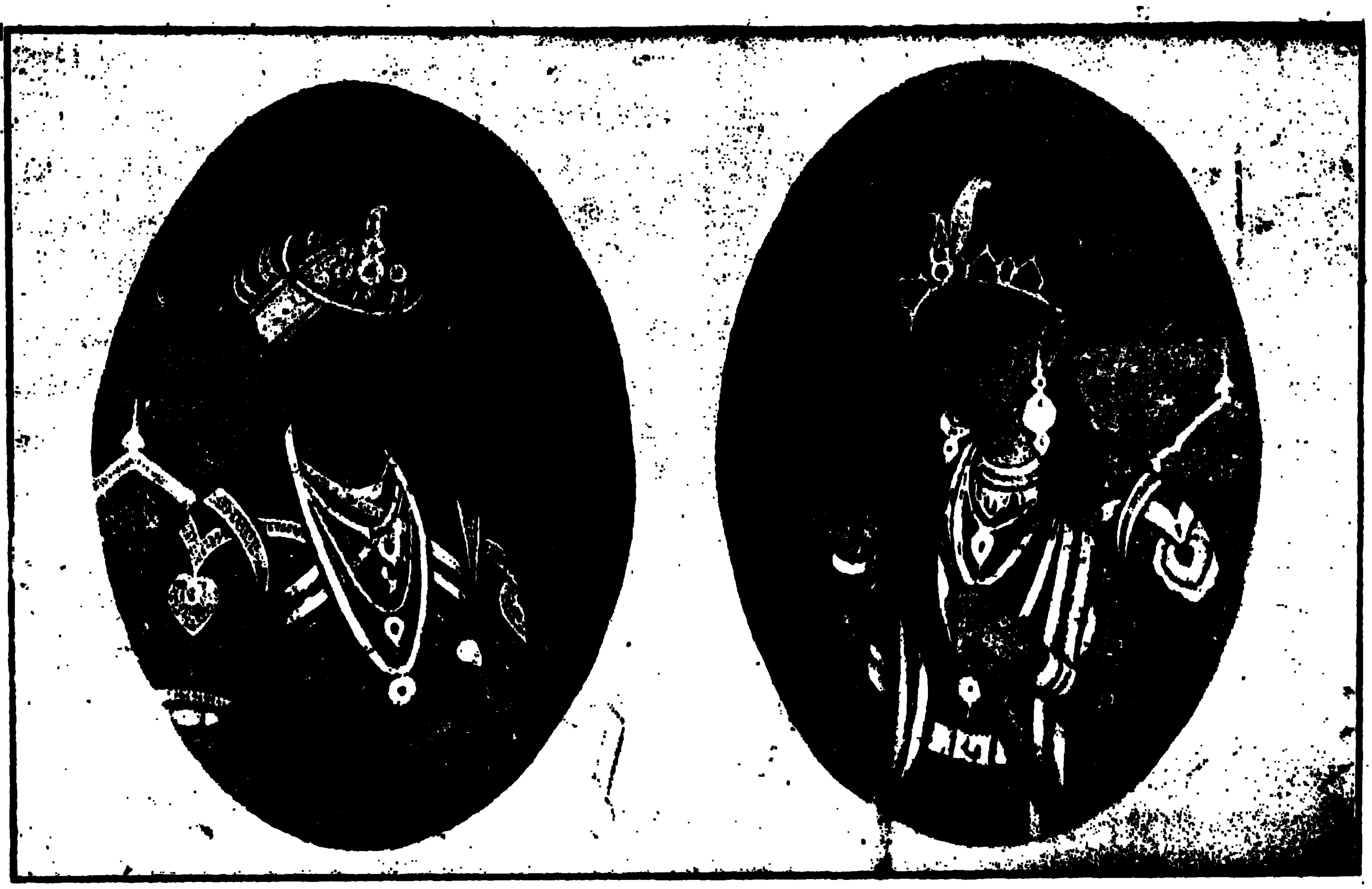

জাহাঙ্গীর বাদসাহ। যোধপুরী বেগম।

জাহাঙ্গীরের আত্ম জীবনচরিত।

খসরুর বিদ্রোহ।

(মূল পার্শি হইতে)

"যৌবনের প্রারম্ভে মানব হৃদয়ে যে সকল উদ্দাম প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বুদ্ধি এবং বহুদর্শিতার অভাবে কতকগুলি স্বার্থপর, কুচক্রীর পরামর্শে (আমার প্রিয়তম পুত্র) খসরুর হৃদয়ে বিদ্রোহের ভাব উদয় হয়। আমার পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যু শয্যায় কতকগুলি নির্ব্বোধ লোক স্বীয় স্বীয় কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভয়ে এবং পরিণামে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় খসরুকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া রাজ্য শাসনের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের মনে কখনও উদয় হয় নাই যে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন ও রাজ্যশাসন করা অল্প-বুদ্ধি লোকের দ্বারা সম্ভবেনা। এই বিশাল বিশ্বের সর্ব্বনিয়ন্তা নিজের অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই এই উচ্চ পদে অভিষিক্ত করেন। রাজপোষাক পরিধান করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে। কথিত আছে:—

"কাহারও অদৃষ্ট হইতে কেহ কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না কিম্বা কেহ মূল্য দ্বারা সিংহাসন ও রাজকীয় ক্ষমতা কিনিতে পারে না। ঈশ্বর যে মস্তক রাজমুকুট দ্বারা শোভিত করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে কেহ সেই মুকুট লইতে পারেনা।"

"খসরু এবং তাহার কুপরামর্শ-দাতাদিগের চেষ্টা আকাশ কুসুমে পরিণত হওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে; সুতরাং ঈশ্বর এই রাজত্বের ভার তাঁহার এই দীন দাসানুদাসের উপর ন্যস্ত করিলেন। খসরু এইজন্য সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকিত এবং আমা হইতে পৃথক থাকিতে চেষ্টা করিত। সুতরাং ভালবাসার বন্ধন এবং সহানুভূতির দ্বারা তাহাকে আপনার করিবার চেষ্টা আমার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। তাহার হৃদয় হইতে সিংহাসনে অধিরোহনের ভাব দূর করিতে আমি কখনও সক্ষম হই নাই। ১০১৪ হিজরার ৮ই জিহিজ্জা

রবিবার রাত্রে সে তাহার ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রকাশ করিল যে, সে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের পবিত্র সমাধি মন্দির দর্শন করিতে গমন করিবে। তাহার পক্ষাবলম্বী ৩৫০ জন অশ্বারোহী আগ্রার দুর্গ হইতে তাহার সঙ্গে গমন করিল। কিছু ক্ষণ পরে উজির-উল-মুলুকের চিরাগচি বন্ধুদের মধ্যে একজন সংবাদ আনিল যে খসরু পলায়ন করিয়াছে। উজির-উল-মুলুক তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমীর-উল-মুলুকের সমীপে আনয়ন করিলে তিনি তাহার নিকট সমস্ত সংবাদ যথাযথ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আমার খাস মহলের দরজায় আসিয়া একজন খোজা দ্বারা আমাকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। আমি তখন এবিষয়ে কিছুমাত্র অবগত না থাকায় মনে করিয়াছিলাম যে দাক্ষিণাত্য অথবা গুজরাট হইতে হয়ত কোনও সংবাদ আসিয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে; আমিই অশ্বারোহণে তাহাকে অনুসরণ করিব অথবা খুররামকে পাঠাইব?" আমির-উল্-মুলুক বলিলেন যে অনুমতি পাইলে তিনিই যাইতে প্রস্তুত আছেন। তাহাতে আমি সম্মতি দিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন —"খসরুকে সহজে ফিরিতে বাধ্য না করিতে পারিলে যদি বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি করা যাইবে।" আমি বলিলাম—"যদি কোনও রকমে কাহারও দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে সে কার্য্য সাধন কল্পে যাহা করিতে হইবে, তাহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। কেননা কথিত আছে—"রাজা কাহাকেও আত্মীয় বিবেচনা করিবেন না।"

"এই সমস্ত কথা বলিয়া এবং অন্যান্য বিষয় স্থির করিয়া আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। ইহার পর আমার স্মরণ হইল যে খসরু ইঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। আমীর-উল-ওমরাকে তাঁহার উচ্চপদ ও মান-সম্ভ্রমের জন্য অনেক পদস্থব্যক্তি ও তাঁহার সমকক্ষ লোকে হিংসা করে। ঈশ্বর না করুন আমীর-উল-ওমরা বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া যদি খসরুকে বিনষ্ট না করেন। সেকারণে আমির-উল-উমরাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি মু-আজ্জল-মুলুককে পাঠাইলাম। আমি ফরিদ বোখারি বেগকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিয়া যত আহাদী ও মনসবদার সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা সঙ্গে লইবার আদেশ করিলাম, এবং এসম্বন্ধে যে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য খাঁ কোতোয়ালকে নিযুক্ত করিলাম। আমি নিজেও স্থির করিলাম যে সূর্য্যোদয় হইলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও অনুমতিতে খসরুর অনুসরণে যাত্রা করিব। মু-আজ্জল-মুলুক আমীর-উল-মুলুককে ফিরাইয়া আনিল।

"সংবাদ আসিল খসরু পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু আমার মনে হইল যে আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার অভিপ্রায়েই সে এ কথা প্রচার করিয়া প্রকৃত পক্ষে অন্য পথে ধাবমান হইতেছে। খসরুর মাতুল রাজা মানসিংহ তখন সুবে বাঙ্গালায়। অনেকেই মনে করিয়াছিল যে খসরু সেইদিকে অগ্রসর হইবে। কিন্তু যে সমস্ত লোক চতুর্দ্দিকে খসরুর অনুসরণ করিতে প্রেরিত হইয়াছিল, সকলেই খসরুর পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার বিষয় সমর্থন করিল।

"পর দিন প্রত্যূষে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কাহারও বাধা বিঘ্ন না মানিয়া অশ্বারোহণে আগ্রা হইতে যাত্রা করিলাম। আগ্রা হইতে ৩ ক্রোশ দূরে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের সমাধিমন্দির তথায় পিতৃদেবের স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। এই সময়ে সাহরুখ মির্জ্জার পুত্র মির্জ্জাহোসেন কে আমার সম্মুখে আনয়ন করা হইল। এই মির্জ্জাহোসেন খসরুর সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল। আমি তাহার উপর এই দোষারোপ করায়, সে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। তাহাকে হস্তপদ বন্ধন করতঃ হস্তীর উপর করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। বিদ্রোহী দিগের মধ্যে প্রথমই একজনকে ধরিতে কৃত কার্য্য হওয়ায় আমি আমার পিতার স্বর্গীয় আত্মার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহা সুফল প্রসব করিল বলিয়া মনে হইল।

"দিবা দ্বিপ্রহরে আতপ তাপে অতিশয় তাপিত হইয়া এক বৃক্ষমূলে বিশ্রামার্থে উপবেশন করিলে আমি খাঁন-ই-আজিম কে বলিয়াছিলাম—আমি এই ব্যাপারে নিজকে এতই চিন্তিত ও বিব্রত বোধ করিতেছি যে আমি প্রাতঃকালে যে অহিফেন সেবন করিয়া থাকি, তাহা পর্য্যন্ত সেবন করিতে ভুল করিয়াছি।

"খসরুকে নিজ বশে আনিতে কৃত সংকল্প হইয়া অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আগ্রার ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মথুরা পরগণা হইতে রওনা হইয়া ২১৩ ক্রোশ গমনের পর একটী পুষ্করিণী বিশিষ্ট গ্রাম দেখিয়া সকলকে বিশ্রাম জন্য আদেশ করিলাম।

"যখন খসরু মথুরাতে পৌছিয়াছিল, তখন হাসান-বেগ খাঁন বদখসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই হাসান বেগ খাঁন আমার পিতার নিকট হইতে অনেক অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং আমাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য কাবুল হইতে আগমন করিতেছিল। বদখসীরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত কলহ প্রিয় এবং অত্যাচারী। হাসান খাঁ খসরুর সহিত তাহার ২১৩ শত বদখসানের আইখাককে রাস্তা ঘাট দেখাইবার জন্য এই সর্ত্তে ছাড়িয়াদিয়াছিল যে, তাহারা রাস্তায় যাহাদিগকে দেখিবে তাহাদিগেরই মাল পত্র লুণ্ঠন করিতে পারিবে। এই রূপে পথিক ও বণিক সম্প্রদায়ের জিনিষাদি অবাধে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং যেখানেই ইহারা গমন করিতে লাগিল, তথাকার বাসিন্দাদিগেরই ধন রত্ন স্ত্রী পুত্রাদি নিরাপদে রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। খসরু তাহার পৈত্রিক রাজ্য এই রূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রপীড়িত হইতে দেখিয়া বদখসাহিগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছিল। প্রকৃত পক্ষে এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির কুকুর দিগকে তোষামোদ করা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় ছিল না। যাঁহার নিকট হৃদয়ের গুহ্যতম সংবাদও গোপন রাখা যায় না, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর জানেন, আমি খসরুর দোষ সমস্ত কিরূপ ভাবে ক্ষমা করিয়াছিলাম, এবং পাছে তাহার মনে কোনও সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে সেই জন্য কত আদর ও যত্নের সহিত তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যখন কুচক্রী লোকের চক্রান্তে সে এইরূপ অসৎ অভিপ্রায় পোষণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তখন সে জানিত যে এই সংবাদ আমি অবগত হইয়াছি। কিন্তু সে পিতার আদর ও যত্নে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইল না।

"আমার যুবরাজ থাকিবার কালীন খসরুর মাতা (আমার স্ত্রী যোধাবাঈ) খসরুর অসৎ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া এবং খসরুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মধু সিংহের নির্দ্দয় ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বিষ ভক্ষণে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলী এবং রূপের প্রশংসা আমার বর্ণনার অতীত। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা এতদূর প্রগাঢ় ছিল যে, আমার সামান্য একগাছি চুলের জন্য তিনি হাজার পুত্র বা ভ্রাতা বিনিময় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। তিনি খসরুকে প্রায়ই পত্র লিখিতেন এবং তাহাতে খসরুর প্রতি আমার ভালবাসা এবং দয়া বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল; যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই ব্যাপার কতদূর যাইয়া গড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, তখন তাঁহার রাজপুত গরিমা উথলিয়া উঠিয়া ছিল এবং তিনি মৃত্যুই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বিবেচনা করিয়া মাঝে ২ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। এবিষয়ে সকলেই অবগত ছিলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং ভ্রাতৃগণ সকলেই একবার করিয়া পাগল হইয়া পরে আবার স্থির-চিত্ত হইয়াছিলেন। একদা ১০১৩ হিজরির ২৬শে জিহিজ্জা তারিখে আমি শীকারে বহির্গত হইলে তিনি মানসিক বিকৃত অবস্থায় অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রের এই লজ্জাজনক ব্যবহার পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াই এরূপ করিয়াছিলেন।

"তিনি আমার প্রথমা পত্নী। আমার যৌবন অবস্থায় তাঁহার সহিত আমার পরিণয় হয়। খসরু জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আমি সাহ বেগম উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলাম। আমার প্রতি তাহার প্রিয়তম পুত্র এবং স্নেহময় ভ্রাতার ব্যবহার সহ্য করিতে অক্ষম

হইয়া এবং তাঁহাকে ভবিষ্যতে দুঃখময় জীবন বহন করিতে হইবে ভাবিয়াই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমি এতদূর বিচলিত হইয়াছিলাম যে কিছু দিন পর্য্যন্ত আমি আমার জীবনকে বড়ই ভারবহ বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। চারি দিন চারি রাত্র (অর্থাৎ ৩২ প্রহর) আমি অনাহারে এবং জল পর্য্যন্ত পান না করিয়া কাটাইয়াছিলাম। এই সংবাদ আমার গুরু স্থানীয় পূজনীয় পিতৃদেবের নিকট পৌছিলে তিনি অত্যন্ত স্নেহ এবং সহানুভূতি সূচক একখানি পত্র তাঁহার এই বিনীত শিশুকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। সেই পত্রের সহিত একটি সম্মান সূচক পোষাক এবং তিনি নিজে যে উষ্ণীষ পরিধান করিতেন তাহাও পাঠাইয়া ছিলেন। অভাবনীয় ভালবাসা আমার সেই অনন্ত অগ্নিবৎদুঃখের উপর জলের ফোয়ারার ন্যায় পতিত হইয়া আমাকে শান্তি দিয়াছিল এবং সুখী করিয়াছিল।

"উল্লিখিত ঘটনাবলি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে—যে পুত্র বিনা কারণে শুধু নিজের উদ্দাম বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার পিতা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হয় এবং অন্যায় এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারে নিজের মাতার মৃত্যু ঘটায় পিতার স্নেহ তাহাকেও দেখিবার জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম এমনই সুন্দর যে প্রত্যেককেই নিজের কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। সুতরাং খসরুর এই কার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ তাঁহাকে আমার স্নেহ হইতে বিচ্যুত এবং নিজ স্বাধীনতা হইতে চির বঞ্চিত হইয়া কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এরূপ বিষয় সম্বন্ধে মহাজন বাক্য এই যে—যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাগলের ন্যায় কাজ করে, তখন সে তাহার নিজের পা ও মাথা জালে আবদ্ধ করে।

"১০ জিহিজ্জা মঙ্গলবারে ইদাক নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া সেখ ফরিদ বোখারিকে কতকগুলি ভাল ভাল সৈন্যের সহিত খসরুর অনুসরণে পাঠাইয়াছিলাম এবং রাজকীয় সৈন্যের অগ্রভাগ পরিচালনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলাম। দোস্ত মহম্মদ আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহার বৃদ্ধ বয়স এবং জীবনের গত কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাহাকে আগ্রার দুর্গ এবং রাজকীয় প্রাসাদাবলী এবং কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া ফেরত পাঠাইলাম। আমি আগ্রা পরিত্যাগ কালীন সেই সহর ইত-মাদ-উদ-দৌলা এবং উজির উল মুলুকের অধীনে রাখিয়া আসি। আমি দোস্ত মহাম্মদকে বলিলাম যে, আমি এখন পঞ্জাবে যাইতেছি, এই পঞ্জাব ইত-মাদ-উদ-দৌলার দেওয়ানীর অধীন সুতরাং তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে. এবং মির্জ্জা মহাম্মদ হাকিমের পুত্রগণ যাহারা এখন আগ্রায় আছে, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। কেননা আমার নিজের পুত্রই যদি আমার সহিত এই রূপ ব্যবহার করিতে পারিল, তখন আমি আমার ভ্রাতা এবং পিতৃব্যের পুত্রগণ হইতে কি আশা করিতে পারি? দোস্ত মহাম্মদ চলিয়া গেলে মিয়া উজির-উল-মুলুককে বখসী পদ প্রদান করিলাম। বুধবার পলোলে এবং বৃহস্পতিবার ফরিদাবাদে থাকিয়া ১৩ই শুক্রবার দিল্লীতে পৌছিলাম। তখন সেই পর্য্যটনের পরিশ্রমে কাতর না হইয়া এবং ধূলায় সর্ব্ব অঙ্গ জড়িত হইলেও সর্ব্বাগ্রে আমার পিতামহ হুমায়ুন বাদসাহের সমাধিস্থানে গমন করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম এবং স্বহস্তে তথায় ফকির এবং দরবেশদিগকে স্বর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিলাম। তথা হইতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিস্থান দর্শন করিয়া সেখানেও যথারীতি প্রার্থনা সমাপন করিয়া মীর জামালউদ্দিন হোসেন আঞ্জু এবং হাকিম মুজাফরের নিকট গরীব দুঃখী এবং ফকির দরবেশদিগকে দান করিবার জন্য অনেক স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া ১৪ই শনিবার আমি নারিলা নামক স্থানে বিশ্রাম করিলাম। দেখিলাম খসরু তথাকার সরাই গুলিতে অগ্নি প্রদান করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

"আসফ খাঁর ভ্রাতা আকা মলাই আমার নিকট সদা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবার সম্মান প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার পূর্ব্ব মনসবীর সহিত এক হাজারী মনসবী যোগ হইয়া তিন হাজারীতে উন্নীত হইয়াছিল। এই অভিযানে সে আমার বিশেষ উপকার করিয়াছিল। একদল আইমাক্

বাদসাহী ফৌজের সহিত একত্রে চলিতে ছিল। আইমাক বের অনেক সৈন্য খসরুর সহিত যোগ দেওয়ায় আমার সন্দেহ হইয়াছিল—পাছে ইহারা ও অবিশ্বাসী এবং অস্থির চিত্ত হইয়া আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। সেইজন্য আমি তাহাদিগের দলপতিকে দুই সহস্র মুদ্রা তাহার সৈন্যদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে প্রদান করিলাম, যেন তাহারা আমার ভালবাসা পাইবার জন্য ভবিষ্যতে উৎসুক থাকে। এবং বিরুদ্ধ আচরণ না করে। সেখ ফজিল উল্যা এবং রাজা ডাহির দুহারকে ফকির এবং ব্রাহ্মণদের দান করিবার জন্য স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। আমি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম যে আজমীঢ়ের রাণা লঙ্করকে তিন হাজার টাকা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হউক।

"সোমবার ১৬ই তারিখে আমি পাণি পথে বিশ্রাম করিলাম। এই পাণিপথ আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের পক্ষে অতিশয় শুভকর স্থান। এই স্থানে ভাগ্যলক্ষী দুইবার তাঁহাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েন। ১মটী ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে—যাহা পরম পূজনীয় বাবরের অসীম ক্ষমতাশালী সৈন্য দ্বারা সংঘটন হইয়াছিল। অন্যটী- নীচাশয় হেমুর পরাজয়ে -যাহা আমার মাননীয় পিতৃদেবের রাজ্যের প্রথম অবস্থায় তাঁহার অসীম সাহসিকতার পরিচায়ক এবং যাহাতে দেশ সমুহ অধর্ম্মের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ধর্ম্মের কিরণে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল।

যখন খসরু দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া পাণিপথে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঘটনাক্রমে দিলওয়ার খাঁও তথায় উপস্থিত হয়। সে খসরুর আগমনের বিষয় কিছু পূর্ব্বে অবগত হইয়া নিজ পুত্রগণকে যমুনার অপর পারে প্রেরণ করিয়া নিজে খসরুর আসিবার পূর্ব্বে লাহোর দুর্গে আশ্রয় লইবার জন্য অতি দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। ইতি মধ্যে আবদুল রহিমও লাহোর হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দিলওয়ার খাঁ রহমানকে তাঁহার পুত্র সকলের সহিত যমুনার অপর পারে মিলিত হইতে পরামর্শ দিয়া আমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে আদেশ দিল। কিন্তু আবদুর রহমান অত্যন্ত ভীরু এবং দুর্ব্বল চিত্তের লোক বলিয়া এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিয়া দেরী করিতে লাগিল। ইত্যবসরে খসরু আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। খসরুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে ঘটনা চক্রে বাধ্য হইয়া খসরুর সৈন্যের সহিত সে যোগদান করিল। খসরু তাহাকে মালেক আনোয়ার রায় উপাধি প্রদান করিয়া তাহার সৈন্য মধ্যে একজন ক্ষমতা পন্ন ব্যক্তি বলিয়া গন্য করিয়া লইল।

'দিলওয়ার খাঁ সাহসীকতার সহিত লাহোর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যাইবার কালীন পথিমধ্যে যত সওদাগর বাদসাহের চাকর ও অন্যান্য যাহার সহিত দেখা হইয়াছিল তাহাকেই খসরুর বিদ্রোহের বিষয় অবগত করাইয়া গিয়াছিলেন। এবং তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলিকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ছিলেন ও কতক গুলিকে খসরুর পথের বাহিরে থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতেই সেই সমস্ত লোক ও পথি পার্শ্বের অন্যান্য লোক বিদ্রোহী দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। দিলওয়ার খাঁ বিনা বিশ্রামে দিবা রাত্রি চলিয়া খসরুর পূর্ব্বেই লাহোরে পৌঁছিয়া এরূপ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত কাজ করিয়াছিল যে তাহাতে তাহার পূর্ব্ব দোষ ক্ষালন হইয়া গেল। সৈয়দ কামাল খসরুর সহিত পরবর্ত্তী যুদ্ধে অত্যন্ত তেজস্বিতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিল।

"খসরু ধৃত হইলে বিদ্রোহী দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ১০১৫ হিজিরার ২৬ সফর আমি হতভাগ্য পুত্র খসরুকে দিলওয়ার খাঁর হস্তে রাখিয়া আগ্রায় রওয়ানা হই। এই স্থানে আমি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না যে- আমার হতভাগ্য পুত্র ধৃত হওয়ার পর তিন দিন তিন রাত্রি পান আহার পরিত্যাগ করিয়া তাহার কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য কেবল অশ্রু ত্যাগ করিয়াছিল।" *

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

---

* ১৬২২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে খসরুর জীবন লীলা শেষ হয়। সেখান হইতে তাহার মৃতদেহ এলাহাবাদ আনিয়া কবর দেওয়া হইয়াছিল। এলাহাবাদের খসরুবাগে হতভাগ্য খসরুর সুদৃশ্য সমাধি এখনও ভ্রমণকারিগণের কৌতুহলী দৃষ্টি চরিতার্থ করিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাদেশিকতা।

মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা তাহার মনের গতি নিয়মিত হয়। মনের গতি হইতে ভাব, ও ভাব হইতে ভাষা। কথিত ভাষা বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করে। কথিত ভাষা নানা কারণে সর্ব্বদাই রূপান্তরিত হইতে থাকে। তদনুসারে প্রচলিত সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজী, ফরাসী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা ক্রমে পরিপুষ্ট ও রূপান্তরিত হইতেছে। ভাষা নদীর মত আপনার গন্তব্য পথ সৃষ্টি করিয়া নেয়। এস্পেরাণ্টোর ন্যায় কোনও একটী ভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল, এখন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সংস্কৃত, গ্রীক ও লাটিন ভাষা, মৃত প্রাচীন সাহিত্য ও ব্যাকরণের গণ্ডিতে আবদ্ধ। প্রচলিত ভাষা সজীব ও ব্যাকরণ তাহার অনুগামী। শব্দ সম্ভারও অভিধানে আবদ্ধ নহে। রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও প্রাচীন সাহিত্যের (classic) মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা যে কোথায় যাইয়া পৌঁছিবে, তাহা অনুমান করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণ হিন্দুসমাজকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-রথিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে চিরদিনের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট আকার দিতে সমর্থ হইবেন না।

বট বৃক্ষ শিকড় ছড়াইয়া বহুদূর হইতে রস সংগ্রহ করে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল অবলম্বন সংস্কৃত। সংস্কৃত নাটক-লেখকগণ সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃত ব্যবহার করেন নাই। সাধারণ লোকের ও স্ত্রীলোকদিগের কথা-বার্ত্তায় প্রাকৃত ব্যবহার করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটকে বিদূষক ও জালুকের মুখে কখনই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শোভা পাইত না। ভাব প্রকাশ সম্বন্ধেও তাহা হইলে সম্ভবতঃ বৈলক্ষণ্য ঘটিত। প্রাকৃতের নিকট বাঙ্গালা অনেক অংশে ঋণী। মুসলমান বিজয়ের পর পার্শি ততোধিক উর্দ্দু হইতে বাঙ্গালায় অনেক ভাব ও ভাষা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বহু স্থলে কথিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কবিত্ব-অংশে অথবা উচ্চ ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিতে কোনও বাধা জন্মে নাই। "দে'মা, আমায় তফিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।" এই উর্দ্দু মিশ্রিত ভাষা বাঙ্গালীর প্রাণস্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইংরেজ অধিকারের পর বাঙ্গালীর কথা ও বাঙ্গালা রচনা যে কি পরিমাণে ইংরেজী ভাষার অনুসরণ করিতেছে, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

মোটামুটি ধরিতে গেলে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক মুসলমান ও অর্দ্ধেক হিন্দু। পূর্ব্ববাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় অনেক বেশী। মুসলমানেরা সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকে তাহা উর্দ্দু-মিশ্রিত। উর্দ্দু-মিশ্রিত-মুসলমান-সাহিত্য বাঙ্গালায় পুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন লেখক অধিক জন্মে নাই; অথবা মুসলমান দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। এবং মুসলমানগণ হিন্দুর লিখিত সংস্কৃত মূলক-ভাষা শিক্ষা করিয়া উর্দ্দু-মিশ্রিত বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিতে অগ্রসর হন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা-সম্পন্ন যে কয়জন মুসলমান লেখক আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত মূলক-বাঙ্গালা অবলম্বন করিয়াই প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদিগের মধ্যে দ্রুত গতিতে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। এখন মুসলমান পদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ চলিত মুসলমানী ভাষা সাহিত্য হইতে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহেন। রবিবাবু-প্রমুখ লেখক-গণের গদ্যে পদ্যে, সংবাদ পত্রের প্রবন্ধাদিতে মুসলমানী শব্দের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। এই সকল লেখায় মুসলমানী ভাব ও ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুসলমানী ভাষা স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে বলা যায় না। বঙ্গবিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট খাটি মুসলমানী ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মুসলমানগণও তাহা সমর্থন করেন নাই; কেননা তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের পার্শ্বে স্বতন্ত্র একটী

সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কিন্তু সাহিত্যকে যদি শুধু উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে না হয় পরন্তু যদি জন সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, তবে মুসলমানও হিন্দুর কথিত ভাষা সাহিত্যে আরও অধিকাংশে ব্যবহার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

আসামী ভাষায় 'কবার নোয়ারো" প্রভৃতি কথার প্রয়োগ হইতে অনেকেই বুঝিতে পারেন যে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের সাধারণ লোকের ভাষা ও আসামী সাহিত্যের ভাষায় সবিশেষ প্রভেদ নাই। অথচ আসামী সাহিত্য বাঙ্গলার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামী সাহিত্য কালে পূর্ণাঙ্গ হইয়া অতি উচ্চস্থানও অধিকার করিতে পারে।

রোমীয় সাধারণ সৈনিকদিগের কদর্য্য লাটিন ভাষা হইতে ফরাশী ভাষার সৃষ্টি। ফরাশী বর্ত্তমানে পৃথিবীর ভাষা সমূহের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রাদেশিক বলিয়া মুসলমানী ভাষাকে বর্জ্জন করিলে কালে স্বতন্ত্র একটী সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। মুসলমান ও হিন্দু মিলিয়া এক জাতি গঠনের পক্ষে তদ্রূপ সাহিত্যের সৃষ্টি বিশেষ অনিষ্টকর, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাঙ্গলা সাহিত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের বহুল প্রচার হইতেছে। কোন গ্রাম্য মুসলমান পরিবারের কথা লিখিতে হইলে সংস্কৃত মূলক ভাব ও ভাষা তাহাদের মুখে দেওয়া যাইতে পারে না। তাহাতে সাহিত্য-পক্ষেও রচনার অঙ্গ-হানি হইবে, সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য প্রতিভাবান অনেক লেখক প্রাদেশিকতা পরিহার করেন নাই। কবি বার্ন্‌স্ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। তৎকালীন সাহিত্যরথিগণ তাঁহার লেখা পড়িবেন কি না, সমালোচকগণ কি ভাবে তাঁহার সমালোচনা করিবেন, তাহা তাঁহার ভাবিবার সুযোগ, অবসর, অথবা প্রয়োজন হয় নাই। তিনি যে ভাষায় কথা বলিতেন, সেই ভাষায়ই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা বুঝিবার জন্য এখন সাহিত্যিকদিগকে তাঁহার ব্যবহৃত প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত আল্‌ভো ফ্রেডারিক মেস্ত্রাল্ ফরাশী প্রভেন্স্যাল (প্রাদেশিক) ভাষায় তাঁহার সমস্ত উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তিনি ফরাশী সাহিত্যের ভাষায় লিখিলেন না; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার মা আমার বইগুলি পড়িবেন। তিনি যে ভাষায় কথা কহেন ও যে ভাষা বুঝেন, আমি তাহাই ব্যবহার করিয়াছি। অন্যের জন্য লিখি নাই।" ফরাশী সাহিত্যিকদিগকে এখন তাঁহার গ্রন্থ বুঝিতে প্রভেন্স্যাল ভাষা শিখিয়া লইতে হইতেছে। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ লেখক মার্ক্ টৌয়েন্‌হাক্‌লবেরী ফিন্, প্রভৃতি গল্পের বই প্রাদেশিক ভাষায় লিখিয়াছেন। সম্প্রতি সারজন উইলশন তাঁহার নিজের স্কচ্ প্রাদেশিক ভাষা সজীব রাখিবার জন্য একখানি অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য দ্বারা নিরক্ষরকে স্পর্শ করিতে হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেও প্রাদেশিকতা বিদূরিত করিলে চলিবে না।

অপর দিকে মাইকেল মধুসূদন সংস্কৃত মূলক বাঙ্গলাকে অমর কোষ হইতে শব্দ বাছিয়া নিয়া নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। তিনি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। "পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীরে।" কাকোদর শব্দ, বোধ হয়, তাঁহার রচনারও অন্যত্র নাই। মধুসূদনের পূর্ব্বে কাশীরাম দাসও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। "কম্বুগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।" সংস্কৃত অভিধান না খুলিলে অনেকের নিকটই ইহার অর্থ বোধ হইবেনা। প্রতিভাবান লেখক যে স্তরে দাঁড়াইয়া গ্রন্থ লেখেন ভাষাও তাহার অনুসরণ করে। প্রতিভার উপরই এ বিষয়ে কৃতিত্ব নির্ভর করে। জনসাধারণের অনুভূতি ও মনের গতি প্রকাশ করিতে যাইয়া যদি প্রতিভাবান লেখক প্রাদেশিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে তাহা উচ্চসাহিত্যের একাঙ্গ-স্বরূপ হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

চাষা।

চারি দিকে চারি ঘর, ছোট্ট উঠান খানা।
চালে আছে লাউ গাছ, ভরি আধ খানা।
রয়েছে নলের বেড়া, বাড়ীটী ঘিরিয়া।
তার মাঝে পুঁইশাক, উঠেছে ঝাপিয়া।
চাটায়েতে কিছু ধান দিয়েছে মেলিয়া;
বৈকালে তা বৌ ঝিরা, আনিবে ভানিয়া।
এক কোণে গরু বাঁধা, খড়ের পালায়;
ছেলেরা তা "দেখে শুনে", পাছে বা পালায়।
পেছনেতে তরকারি, কত কিছু বোনা;
জল সেঁচে মাছমারে, রহিয়াছে দোনা।
একপাশে কলাগাছ, কতগুলি আছে;
কলা, মোচা, যাহা হয়, খায় আর বেচে।
অদূরে শিমুল গাছ, ফুল পড়ে তলে;
কচি কচি খোকা খুকী, তাই নিয়ে খেলে।
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, ছোট কাজ করে;
বসিয়া রহেনা কেহ "গৃহস্থের" ঘরে।
ওরা করে "চাষবাস" তাই খাই মোরা;
মনে করি-মোরা বড়, নীচ চাষা ওরা।

শ্রীহৈমবতী দেবী।

ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

ব্রাহ্ম সব হচ্ছেন ব্রহ্মার নায়েব।
খানা পিনায় তাঁদের কিছু নাইকো আয়েব॥

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সময়ে সাধারণ লোকে ব্রাহ্মদিগকে সর্ব্বভক্ষ হুতাশন মনে করিয়া 'কেরেস্তান' আখ্যা দিয়াছিল। মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মদিগকে লোকে মুসলমান বলিত না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যখন "প্রিসেপ্ টস্ অব্ জিজস্" (ঈশার উপদেশ) নামে এক পুস্তক প্রচার করেন তখন হিন্দুগণ মনে করিয়াছিলেন, রাজা, ঈশার দিকে হেলিয়া পড়িয়াছেন। ঈশার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি খৃষ্টান ছিলেন না। তাঁহার উপদেশে খৃষ্টমিশনারী মিঃ এডামস্ একেশ্বরবাদী হইয়া যান। ইহাতে বরং প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি রাজার অনাস্থাই ব্যক্ত করে। ১৮২৮ সনে তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, উহাতে দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। ঐ সমাজের কার্য্য প্রতি শনিবারে হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজের পত্তন হিন্দু সাঁচে হইয়াছিল; ইহাতে খৃষ্ট ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় নাই।

রাজার পরবর্ত্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্ট ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠেন। এখানে আমরা ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্ট সমাজের কোনরূপ ছায়া দেখিতে পাই না। মহর্ষির সমাজে সাপ্তাহিক উপসনার দিন সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্রাম দিন রবিবার নয়।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্ট ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়। যদিও তিনি প্রচলিত খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বক্তৃতাযুদ্ধে রেভারেণ্ড ডাইসন ও লালবিহারী দেকে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত খৃষ্টের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে তাঁহার সমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কেশবে খৃষ্ট প্রভাবের আধিক্য দেখিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কারণেই হউক, কেশবচন্দ্রকে তিনি ঐ সম্পাদক পদ হইতে অবসর দিয়াছিলেন। মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রে মত-ভেদের ফলে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহর্ষিকে তাঁহার সমাজে একদিন উপাসনা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। মহর্ষি ঐ দিন উপদেশ দান কালে ঈশার প্রতি এবং কেশবচন্দ্রের প্রতি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কেশবের ঈশা-প্রীতি আরও প্রবল হইয়া উঠে। ১৮৮১ সনের ৬ই জুন কেশবচন্দ্র জর্ডানজলে দীক্ষার অনুকরণে তাঁহার সমাজে জলমন্ত্রে-দীক্ষা প্রতিষ্ঠা করেন। নববিধান-সমাজ ঈশার প্রভাব প্রবল, বহু ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ এরূপও বলিতেছেন—নববিধান-সমাজের কেন্দ্র স্থলে

কেশবচন্দ্র নহেন কিন্তু যিশু খৃষ্ট। কেশবচন্দ্রের সমাজ রবিবারের সমাজ। অনেকে তাঁহার মন্দিরকে "কেশব সেনের গির্জ্জা" বলিয়া থাকে।

খৃষ্ট গির্জ্জার এক প্রধান চিহ্ন—"পুল্‌পিট্‌।" ব্রাহ্মগণের ভজনালয়ে পুল্‌পিট্‌ (বেদি) বিশেষ ভাবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে তেলেগু ব্রাহ্মণেরা কিরূপ আসনে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেন তাহা অবগত নই। যে কক্ষে বেদ পাঠ হইত ব্রাহ্মণেতর জাতির তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না; যবনিকার অন্তরালে বসিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বেদ পাঠ করিতেন। মহর্ষির সমাজের বেদিতে একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় বা নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদি গির্জ্জার পুল্‌পিটের আকারে গঠিত। এই বেদি হইতে বহু বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল প্রধানতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপবীতধারী ব্রাহ্মণের অধিকার লইয়া। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হইল প্রধানতঃ কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনে একদল ব্রাহ্ম কর্তৃক আচার্য্যপদ হইতে চ্যুত কেশবচন্দ্রের বেদির অধিকার উপলক্ষে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বেদির উপর তাঁহার আসনে কোন আচার্য্যের বসিবার অধিকার নাই। ইহাতেও বক্র সমালোচনার পথ পড়িয়াছে। মফস্বলেও সময়ে সময়ে এইরূপ বেদি-বিভ্রাট ঘটিতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস, অলক্ষিতে এই পুল্‌পিটের অন্তরালে কোন অপদেবতা লুকাইয়া থাকিয়া নানা অনিষ্টের সূত্রপাত করে। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ব্যক্তি, জানি না এই আশঙ্কায় কিনা, নিশাযোগে উহার ইষ্টক নির্ম্মিত বেদি চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে দারুময় সচল বেদিকা স্থাপন করিয়াছেন। বার ও বেদি এদিকে ব্রাহ্মসমাজকে খৃষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছে।

আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে প্রচার-পদ্ধতির প্রসার অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ এবং নববিধান সমাজে প্রচার পদ্ধতির প্রসার আছে এবং উহা বহু পরিমাণে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার-পদ্ধতির অনুকরণে। বক্তৃতা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারের এক প্রধান সাধন। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা বাহুল্য খৃষ্টান পদ্ধতির প্রাধান্যই প্রতিপন্ন করে।

ব্রহ্মমন্দিরের বহির্ভাগ শিবের মঠের মতনই করা হউক কিম্বা মসজিদের মতনই গড়া হউক, উহার প্রকৃতি গির্জ্জার। ব্রহ্মমন্দিরে আসন উপবেশন গির্জ্জার ভাবে। বহু স্থানে খৃষ্টান গির্জ্জার ন্যায়ই সপ্তাহান্তে রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে বাতি জ্বলে; অপর ছয় দিন উহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। সাধনার পর সাধনার দ্বারা, তপস্যার পর তপস্যা দ্বারা একটী স্থানকে সিদ্ধভূমি করিয়া লইতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ভগবৎ-সাধনার পবিত্র ধূলিতে বহু ব্রহ্মমন্দিরই সিদ্ধভূমির প্রকট ভাব এবং আবেশ আবির্ভাবের গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারে নাই। সেন্টপল এবং মিলান প্রভৃতি গির্জ্জার বাহ্য-সম্পদ বহু পুরাতন স্মৃতি বহন করে বটে কিন্তু ঐ সমস্ত স্থানে তপস্যা করিয়া কেহ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং তপোবল সেখানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহা বলে না।

খৃষ্টানের পার্শনেল গড্‌। ব্রাহ্মেরও তাহাই। অপরদিকে ইশার "আমি এবং আমার পিতা এক" উক্তিতে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ আস্থাবান না হইলেও অনেক ব্রাহ্ম উহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় উহার আভাস আছে। অনেক ব্রাহ্মকে অদ্বৈত বাদে উল্লাস প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

প্রেরিত মণ্ডলী এবং ভোট দ্বারা গঠিত মণ্ডলী উভয়ই খৃষ্ট সমাজের অনুকরণে।

রেজেষ্টারী কৃত বিবাহ—উহাও খৃষ্ট সমাজকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

কথ্য বাঙ্গলা ভাষায় পুল্‌পিট্‌, মিনিষ্টার, সার্ম্মন্‌, প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের অভিধান খৃষ্ট অভিধান বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। মোল্লা, মসজিদ্‌, নমাজ, আল্লা, রসুল, ওয়াজ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ মুসলমান সমাজের গন্ধ বহন করিত।

আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে খৃষ্ট ভাবের ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি আদি-সমাজ ধনীজন-সেবিত পোষিত এবং পূজিত হইলেও উহার একটী স্বতন্ত্র মন্দির

নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধন ভজনায় খৃষ্ট ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় না। কিন্তু উহার বাহিরের কতকগুলি লক্ষণ খৃষ্ট সমাজের। নববিধান এবং সাধারণ—উভয় সমাজ বৈষ্ণব ভাবে গঠিত হইলেও কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ ধরিয়া লোকে ব্রাহ্মসমাজকে খৃষ্ট সমাজের অনুকরণ বলিয়া মনে করে। আদি ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের আদি ভাব—খৃষ্ট ভাব।

১৮৮১ সনে বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সংখ্যা ৭৮৮; ১৮৯১ সনে ২৫৪৬; ১৯০১ সনে ৩১১৮; ১৯১১ সনে ২৬০৮। প্রথম দশ বৎসরে সংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পরবর্ত্তী-কালে সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯১১ সনে সংখ্যার বরং হ্রাস দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা সেন্সাসে ব্রাহ্ম বলিয়া লিখিতেন এখন তাঁহাদের অনেকে সে মতি ত্যাগ করিয়াছেন। সংখ্যা হ্রাস পাইবার ইহাও এক কারণ বটে। অন্যান্য কারণের মধ্যে খৃষ্ট-প্রভাবও হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার পরিপন্থী কিনা ভাবিবার বিষয়।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

গুরুগিরি।

(১)

মুখত্ব রূপ জীর্ণ তরণী আরোহণ করিয়া যখন এল্ এর দুর্ব্বাদলশ্যামল, নব পত্রপুষ্পরাজি শোভিত, বিহগ কণ্ঠ মুখরিত তীরে উপনীত হইলাম, তখন সহসা মানস-পটে ভাবী জজিয়তি বা ম্যাজিষ্ট্রেটীর উজ্জ্বল চিত্রটা প্রকটিত হইল। উল্লাসে জলদবর্ণ মুখমণ্ডল অধিকতর কৃষ্ণআভা ধারণ করিল, গজবিনিন্দিত দন্ত পংক্তি লজ্জাহীনা নারীর ন্যায় ওষ্ঠের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ধরাকে সরাজ্ঞান হইল।

কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে চারিবার এল্ এ ফেল করিলাম, তখন বায়স্কোপ দৃষ্ট মণি-মাণিক্য রচিত প্রাসাদমালার মত আমার সেই সকল আশা কল্পনা অন্তর্হিত হইল। বুঝিলাম স্বার্থপর হিংসুক বিশ্ববিদ্যালয়টা পাশ-তৈল বিনা আমার উন্নতি-বাতিটা নির্ব্বাপিত করিল; নতুবা আমি শ্রী গোবর্দ্ধন তালুকদার কালে মস্ত একটা লোক হইয়া দাঁড়াইতাম। হায়, হায়! হিংসুকের হিংসারবিষে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিল। নিজের অকৃতকার্য্যতার হেতুটা এইরূপে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া মনে মনে একটু সোয়াস্তি লাভ করিলাম। কিন্তু বাবা যখন আমার কর্ণ যুগলকে তাঁহার লৌহকরের কোমলস্পর্শ সুখ অনুভব করাইয়া, অভিধানের বাছা বাছা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া যথেচ্ছা গমনের অনুমতি দান করিলেন, তখন পিতৃভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের মত আমাকেও গৃহ ত্যাগ করিতে হইল।

তখন আষাঢ় মাস। কলিকাতা গেজেটে এণ্ট্রান্স্, এল্ এ, বি এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছিল, কাজেই লক্ষ্মণের মত দোসরের অভাব হইল না। সম-দশাপন্ন কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। পরামর্শ স্থির হইল —(১) সংসার অসার। (পরীক্ষায় ফেল করিলে মনে আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হয়।) (২) পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র সকলের সঙ্গে দুদিনের পরিচয়। (বলা বাহুল্য আমরা সকলেই অবিবাহিত ছিলাম) সুতরাং মিছামায়ায় অন্ধ না হইয়া যাহাতে পরকালের ধর্ম্ম অর্জ্জন করা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। (৩) অতএব বাল্য, কৌমার, যৌবন,—জীবনের তিনকাল পার হইয়া যখন প্রায় গেল, তখন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ সমর্পণ না করিলে আর করিব কবে? ভীষণ দর্শন মহাকাল যে পাশহস্তে শিয়রে দাঁড়াইয়া।

ইস্যু ধার্য্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশে অনেকের নাক চোখ হইতে বর্ষার বারিধারার মত জল ঝড়িতে লাগিল।

(২)

আমাদের ভিতর রতন নামে একটী ছেলে ছিল; সমপাঠীরা বলিত, তাহার বুদ্ধি নাকি ষ্ট্রপের ক্ষুরেরমতো তীক্ষ্ণধার। সে বলিল, "ধর্ম্ম অর্জ্জন নিশ্চয়ই করব; কিন্তু এখনোযে আমাদের বাসনার নিবৃত্তি হয় নাই। ভট্টিকাব্যে পড়েছি (রতন সায়েন্স্ পড়িত)—যতদিন জীবের (জিভের) বাসনার নিবৃত্তি না হয়, ততদিন তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। আমরাত

এ পর্য্যন্ত পড়লামই। ভোগস্পৃহা, যথা—পোলাউ, মাংস, আপেল, বেদানা, আঙ্গুর, পিঠে, পায়েস ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ভোজন করবার ইচ্ছাটা অপূর্ণ রয়েছে; যেহেতু ঐ ইলসে মাছের ঝোলের নদী আর পুঁই চচ্চরি খেয়েছি। এখন এ জন্মেও যদি এ স্পৃহাটা না মিটাই তবে ফের জন্মিতে হবে। কাজেই প্রাণের যত ইচ্ছা (বাসনা) সব এবারে মিটান ভাল; যেন ফের এই দুঃখময় সংসারে এসে দশটায় নাকে মুখে গুজে কলেজে যেতে না হয়। সকলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ভাই রে তোর কথা ত ঠিক; কিন্তু প্রাণের আকাঙ্খা মিটাব কি করে? দুনিয়ায় যাদের অর্থ নেই, তাদের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। আমাদের টাকা কে দিবে? টাকা ছাড়া প্রাণের আকাঙ্খা মিটাব কি করে? অবশ্য পিতাঠাকুর ইচ্ছা কর্‌লে যে আমাদের আকাঙ্খা মিটাতে না পারেন, তা নয়। কিন্তু তিনি কি তা করবেন? সন্তানের পরকালের মঙ্গলার্থে কি এটুকু সাহায্য করবেন? সে আশা বৃথা। সংসার ঘোর স্বার্থান্ধ। পিতা শুধু স্বার্থের বশ হয়ে ছেলেকে ভাল বাসেন। আমরা পাশ করি নাই, এখুনি চাক্‌রি করে তাকে খাওয়াতে পার্‌ব না, তাই আমাদের নিরপরাধ কর্ণদ্বয়কে নির্দ্দয়রূপে পীড়ন করেছেন। সংসার অসার, সংসার অসার।"

রতন বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমি এক পন্থা ঠাওরেছি।" সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। রতন বলিতে লাগিল—"বাপ যখন তাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন আর তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করব না। ভগবান উদর দিয়েছেন, আহার দিবেনই। এখন তোমাদের সাহায্য পেলেই আমার মৎলবটা কার্য্যে পরিণত করা যায় এবং পরে পিতাকে রোজগারের টাকা পাঠিয়ে দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি যে, পুত্র পিতার মত স্বার্থান্ধ নয়।" সকলে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলে রতন বলিল—"আজকাল দেশের স্রোত ফিরেচে। এখন সবাই সাধুসন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। গুরু প্রাপ্তির জন্য, সৎসঙ্গ লাভের জন্য, লোক এখন ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়। ফোটা তিলক কাটা, নাদুসনদুস চেহারাওয়ালা ভেকধারী সন্ন্যাসী দেখ্‌লে ধা করে লোকে তার শিষ্য হয়ে বসে। এ বড় মস্ত সুযোগ। চাক্‌রির বাজারেত মাথা কপাল কুটে ও একটা বিশ টাকার চাক্‌রি মিলে না। কিন্তু যদি ভেক ধরে, গম্ভীর হয়ে দুচারটা তত্ত্ববচন আওড়াতে পার, তা হলেই বাজীমাৎ। অমনি বড় বড় শিষ্য জুটবে। তারপর—এইধর, চব্যের ভিতর-পোলাও মাংস, ডিম; চোষ্যের ভিতর—মাখন, ছানা, কাব্‌লী ফল; পেয়র ভিতর—দুগ্ধ থেকে রোজ সিরাপ খেয়ে ২ ভুড়িটা দশহাত ফুলে উঠবে, গাল দুটা ভরে যাবে, কেমন গোলগাল নাদুসনদুস চেহারা হবে।" রতনের মৎলব শুনিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মুকুন্দ বলিল—"ঠিক ভাই, আমিও এ পন্থাটা বল্‌ব বল্‌ব ভাবছিলাম। এই দেখনা আমার এক জ্ঞাতিভাই রসিক বাড়ুয্যে ওবফে প্রেমানন্দস্বামী ফোর্থক্লাশ অবধি পড়ে একটা মেয়ের লভে (love) পড়ে যায়। টের পেয়ে ওর বাপ আচ্ছা কতক কাণমলা দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দেয়। বেচারা মনের দুঃখে বিরাগী হয়ে হিমালয়ে চলে যায়। সেখানে দুচার মাস থেকে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে, গেরুয়া বসন পরে, বাড়ী ফিরেছে। এখন সে মস্তসাধু। কত বড় ২ লোক তার শিষ্য, আর বাড়ীতে কত আদর! অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলীতরু পর্য্যন্ত তার শাস্ত্রের বিদ্যা; কিন্তু এই বিদ্যাতেই শিষ্যসমাজে তার কত কদর! আঃ! কি তার আহারের চোট, তা মনে হ'লেও জিভের জল ঝরে। তবু ত আমরা ভট্টির দু লাইন আর রঘুবংশের দুপাতা পড়েছি,—আমাদের ঢের শিষ্য জুটবে।" প্রভাত মাথা চুলকাইয়া বলিল "পন্থাটা মন্দ নয়। তবে কথাটা কি জানলে, হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস-ভক্তি জন্মান কিন্তু এক মস্তগুণ, সকলে তা পারে না। তা কর্‌তে হিপ্‌-নটিজম্‌ বা অন্য কোন প্রকার যোগ অভ্যাস করতে হয়। আজকাল চাক্‌রীর বাজারের মতো সাধুগিরিতে ও ভয়ানক কম্পিটিশন; কাজেই, নাম করা সহজ নয়। আর দু এক যায়গায় চব্য চোষ্যের সঙ্গে অনেক ভেকধারী সাধুবাবার পিঠে বেশ দমাদম লগুড় বৃষ্টি হয়;—পন্থাটা খুব সহজ নয় হে! মিছে কেলেঙ্কারী করার চেয়ে মানে মানে অন্য পন্থা দেখা ভাল।"

রতন ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আরে দূর্, তুমিও যেমন। ক্লাশে প্রফেসরের চোখে ধূলাদিয়ে রোজ২ ক্লাশ পালিয়েছি, সময় ২ একাই দশ বিশজনের proxy চালিয়েছি, পরীক্ষার সময় হলের ভিতর বেমালুম নকল করেছি,—আর এ সামান্য কাজটা বাগিয়ে তুলতে পারব না! যে চাল চেলে মূর্খ রামা শ্যামা পাবলিককে দিন দুপুরে ঠকায়, আমরা কি সে চালে লোক ঠকিয়ে এতটুকু ও আমীরী করতে পারব না? বল কি হে! আর আজকাল ইংরেজী জানা সাধুর উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস।"

আমি বলিলাম—"তা ভাই তুমিই এসব বিষয়ে expert ; বুদ্ধি তুমি খাটাও, আমরা পেছনে আছি।"

রতন নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—"ত্যাখ, আমাদের ভেতর একজন সাধু সাজ্‌বে। ভস্ম মেখে—তারও দরকার নেই, চেরিব্লসম পাউডার মেখেই চলবে, তাতে গা দিয়ে বেশ সুগন্ধ বেরুবে, লোকে ভাববে, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কি সৌরভ! সর্ব্বাঙ্গে গোলাপী রঙ্গের আলখেল্লা পরে মাথায় পাগড়ী, পায়ে নাগড়া জুতা. হাতে চিমটা নিয়ে যেখানে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী—কারণ তাদের ভক্তি বেশী—এইরূপ এক স্থানে বটগাছের নীচে চক্ষু বুজে বস্‌বে। সঙ্গে একটি চেলা, সে দু একটা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করে সাধুর গুণ গেয়ে লোক জড় করবে। সাধু হবেন মৌনী, কারণ তাতে লোকের বিশ্বাস বাড়ে। তারপর আমাদের এই কজন পরামর্শমত একে একে সেখানে এসে প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে নানাদেশের নাম করে বলবে, 'প্রভো আমি অমুক দেশ থেকে স্বপ্ন দেখেছি, নারায়ণ মানব মূর্ত্তি ধরে এই বটগাছ তলে অবতীর্ণ হয়েছেন।' এ রকম করে সবাই বলবে, কেঁদে বুক ভাসাবে, আর ঝন্ ঝন্ করে প্রভুর পায়ে টাকা ঢাল্‌বে। প্রভু ইঙ্গিতে টাকা ফিরিয়ে নিতে বল্‌বেন ; কিন্তু তাতে সকলে হাপুস নয়নে কেঁদে বল্‌বে, 'প্রভো পাপী বলে কি আমাদের ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করবেন না? এদান না নিলে আমরা এখানে অনাহারে মরব।' তখন প্রভু চেলাকে ইঙ্গিত করবেন। চেলা এই টাকা কুড়িয়ে নিয়ে আট আনার মিষ্টান্ন কিনে প্রভুর কাছে নিবেদন করে সকলকে প্রসাদ বিলাবে। প্রভু সারাদিন উপোস থাক্‌বেন, অবশ্য সেটা লোক দেখান,—সুযোগ মত লুকিয়ে ২ খাবেন, অবশ্য প্রথম ২ একটু কষ্ট করতে হবে, কিন্তু কিছুদিন পর প্রভুকে আর পায় কে?"

রতনের বুদ্ধি দেখিয়া আমরা সকলে বাহ্‌বা দিলাম। অতঃপর প্রশ্ন উঠিল "সাধু সাজে কে?" রতন বলিল, "সাধু সাজ্‌তে আমার আপত্তি ছিল না। তবে কি জান, সাধুর চেহারাটা শিবঠাকুরের মতো গোলগাল মোটা সোটা হওয়া চাই। আমার চেহারা'ত দেখ্‌ছই—তালপাতার সেপাই। গোবর্দ্ধন সাধু সাজুক। ওর চেহারাটা দিব্যি নাদুসনদুস, বেশ মানাবে"

সকলেই এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। অনেক কথা কাটাকাটির পর আমাকে স্বীকৃত হইতে হইল।

(৩)

যথা সময়ে সাধুর উপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নোয়াখালীর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে বৃহৎ এক বট গাছের নীচে রতনকে চেলারূপে লইয়া অবতীর্ণ হইলাম। নিজমুখে বলা সাজেনা. কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার নূতন চেহারাটা ভোলা মহেশ্বরের দ্বিতীয় সংস্করণের মতই দেখাইল। রতনের বক্তৃতার গোটেই হউক বা আমার চেহারার আকর্ষণেই হউক, অনেক লোক সেই বটগাছ ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরা ও পূর্ব্বশিক্ষামত কেহ কলিকাতা, কেহ দিল্লী, কেহ লাক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া সাশ্রু নয়নে আমার পদতলে পড়িয়া তাহাদের অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিল, এবং ঝন্ ঝন্ শব্দে চক্ চকে মুদ্রা ছড়াইল। আমি ইঙ্গিতে মুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি জানাইলাম. তাহারা অধিকতর ক্রন্দন আরম্ভ করিল। অর্থে এইরূপ অনাশক্তি দেখিয়া ও বিভিন্ন দেশের লোকের মুখে অদ্ভুত স্বপ্নের কথা শুনিয়া উপস্থিত জন মণ্ডলীর অত্যন্ত ভক্তি জন্মিল। বাতাসের মত আমার নাম (শ্রীভক্তানন্দ স্বামী) চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আমাকে দেখিতে আসিয়া অগণিত অর্ঘ আমার পদতলে ঢালিতে লাগিল।

স্থানীয় এক ধনবান ব্যক্তি কাঁদিয়া কাটিয়া আমাকে. সশিষ্য তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে সুকো-

মল, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অলস ভাবে দেহভার হেলাইয়া শুইয়া থাকিতাম। ভক্তবর্গ কেহ পদসেবা করিত, কেহ ব্যজন করিত,—আরামে আমার চক্ষু বুজিয়া আসিত। চেলাগণ বলিত "প্রভু সমাধিস্থ হয়েছেন।"

ভক্তদের অনুরোধে ক্রমে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। ননী, ছানা, মাখন, সন্দেশ, কাব্‌লী ফল, আম, আনারস—খাইতে খাইতে অরুচি জন্মিল। রতন, মুকুন্দ, প্রভাত প্রভৃতি আমার প্রসাদ পাইত। উপাদেয় আহার্য্যগুলি আমি একাই শেষ করিতাম; নিরুপায় রতন প্রভৃতি অলক্ষিতে ভ্রুকুটি করিয়া ক্ষান্ত হইত। রাজলক্ষী উপন্যাসের 'শেয়াল মারা' ও 'সনাতন দাসের' কথা মনে পড়িয়া আমার পেট ফাটিয়া হাসি আসিত।

দেখিতে দেখিতে ভক্তদের কৃপায় উপাদেয় আহার্য্য বস্তু এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসিতে আরম্ভ করিল যে প্রভুর চেলাদেরও বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিল না।

এইরূপে আমাদের গুরু গিরিতে যথেষ্ট পশার ও প্রতি পত্তি হইল। আনন্দে ভোগ স্পৃহা মিটাইতে লাগিলাম।

কিছুদিন পর প্রভাত, মুকুন্দ প্রভৃতির এই এক ঘেয়ে সুখ, আর ভাল লাগিল না। জিভের লোভ তাহাদের মিটীয়াছিল। ঐ সকল নীরস ভক্তের মেলে কেবল শ্রীচৈতন্য দেবের কথা, অহোরাত্র নাম সংকীর্ত্তন ও কথায় কথায় ভাবোচ্ছাসে তাহাদের প্রাণ আই ঢাই করিতে লাগিল। নাটক নভেল পড়া নাই, বায়স্কোপ থিয়েটার দেখানাই, টেনিস্‌ বেডমিন্টন্‌ খেলা নাই, পোলাউ মাংস খাওয়া নাই, ষ্টেট এক্‌সপ্রেস্‌ সিগারেট ফুঁকা নাই,—কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, আর ভক্তমাল পাঠ, দশায় পড়া, ডবাহুকায় তামাক খাওয়া! বেগতিক দেখিয়া প্রভাত মুকুন্দ প্রভৃতি পটল তুলিল। রহিলাম কেবল রতন ও আমি,—দুইজনেই চারিবার এল্‌ এ ফেল করিয়াছিলাম, কাজেই চেনা লোকের কাছে মুখ দেখাইবার ইচ্ছা ছিল না।

প্রধান ব্যক্তি দ্বয় রহিলাম,—গুরুগিরি ব্যবসায় পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। শিষ্যদের অনুরোধে এখন শ্রীঅঙ্গে রেশমী পরিচ্ছদ, পায়ে মখমলের জুতা স্নানের সময় ফ্লোরেল অয়েল, স্নানান্তে ভস্মের স্থলে পাউডার ও চন্দনের বদলে এসেন্স ব্যবহার করিতাম। বাহিরের লোকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সৌরভে পুলকিত হইত, ভাবিত ইহা স্বর্গ-সৌরভ! তাহারা কেহ পদ সেবা করিত, কেহ ব্যজন করিত, কেহ শ্রীঅঙ্গ ফুলে সাজাইত।

সময়টা যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটিতে লাগিল। আহা! কলমজীবী বাঙ্গালীর কপালে এত সুখ!

(৪)

ইহার ভিতরে একটী কাণ্ড ঘটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ভজন গৃহে মকমল আসনে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলাম। আমাকে সমধীস্থ ভাবিয়া শিষ্যরা কেহ কাছে ছিল না। ঘরের ভিতর একটা মোমবাতি কাচাধারের ভিতর মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। বাহিরে নিলাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল। ফুট্‌ ফুটে জ্যোৎস্নায় বহির্জগৎ আলোকিত। প্রকৃতি মুগ্ধভাবে সেই শোভা দেখিতেছিল। সহসা সেই জ্যোৎস্না প্লাবিত বায়ুস্তরে অর্গেনের সহযোগে একটা উদাস-করুণ সুর জাগিয়া উঠিল। আমার প্রাণের ভিতর একটা তড়িত প্রবাহ খেলিয়া গেল। আজ যেন হৃদয়ের ভিতর কেমন একটু অভাব, কেমন একটু মধুর আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিল। যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের এক সুখ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে দেখিলাম, পাশের বাড়িতে কৌমুদীস্নাত মুক্ত বারান্দায় বসিয়া এক বালিকা অর্গেন বাজাইয়া গাহিতেছে। তাহার গোলাপী আননে স্বর্ণ কিরণ প্রতিফলিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সন্ধ্যার মলয় হিল্লোলে অবেনীসম্বদ্ধ অলকদাম উড়িয়া উড়িয়া তাহার গণ্ডে, স্কন্ধে, বক্ষে পড়িতেছে। বালিকা তন্ময় হইয়া গাহিতেছিল। জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কোরকের মত এই তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পরীক্ষার বিফলতায় ও পিতার তিরস্কারে সংসারের উপর যে বিরাগ জন্মিয়াছিল, কোন অদৃশ্য শক্তি বলে তাহা দূর হইল। সংসারে আশক্তি জন্মিল; মনে হইল, সংসারে কত সুখ, কত আকাঙ্খা!

সমস্ত রাত্রি সেই কিন্নরী-কণ্ঠ আমার কানে বাজিতে লাগিল,—সেই অপরোপম রূপরাশি আমার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। নভেল অনেক পড়িয়াছিলাম,

কিন্তু মানস-প্রতিমাকে মূর্ত্তিমতী রূপে দেখি নাই। এই মুহূর্ত্তের দর্শনে আমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন। ঘটিল; ভক্তের স্তুতি সেবা, বিষের মত বোধ হইতে লাগিল, রসনা তৃপ্তিকর আহার্য্য গুলির সুস্বাদ যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এসেন্স ও ফুলগুলি যেন সুবাস বিহীন হইয়াছিল।

রতন আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া গোপনে বলিল "কিরে গোবরা, তোর মুখ এমন পাণ্ডুবর্ণ দেখায় কেন রে! চোখের নীচে কাল দাগ, ঠোট রক্তহীন. ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস!—বলি ব্যাপার খানা কি? লভে (love) পড়িস্ নাইত? আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। রতন সব শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া আমার গভীর প্রেমটাকে একেবারে লঘু করিয়া দিল। হায় প্রেমিক ছাড়া প্রেমের মর্ম্ম কেউ বুঝে না!

রতন সমস্ত দন্তপাটি বিকশিত করিয়া, বিকৃতকণ্ঠে বলিল "আঁ্যা, প্রভুজী, আপনি নারায়ণের অংশ; আপনার অঙ্কলক্ষ্মী যে স্বয়ং বৈকুণ্ঠবাসিনী কমলা! ঐ সামান্যা বালিকার প্রতি আপনার অনুরাগ; একি অসম্ভব কথা!"

আমার তখন অবস্থা অন্যরূপ; হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

রতন কৌতুকপ্রিয় হইলেও আমার প্রাণের বন্ধু। আমার গভীর ব্যথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল; আশ্বাস দিয়া বলিল "এর জন্য ভেবে ২ দেহপাত করিস্ না। তোর বরাত ভাল। লক্ষ্মী ঠাঁকুরাণীর বাপও কায়স্থ, নাম যতীন্দ্র ঘোষ, ধাম বিক্রমপুর, পেশা ডাক্তারী। যদিও তুই এল্.এ রূপ সাগর পার হতে পারিস্ নাই, তবু ডেপুটির ছেলে তো! আর এহেন কর্ণধার জুটলে, কাণ ধরে অনায়াসে তোমায় পরীক্ষা সাগর পার কর্‌বে।"

রতনের এইরূপ আশ্বাসে অকূল সাগরে কূল পাইলাম। গদ্‌গদস্বরে বলিলাম—"ভাই রতন, তোমার এ উপকার জীবনেও ভুল্‌ব না।" রতন কাঁদকাঁদ ভাব দেখাইয়া বলিল "তাতে আর বিশেষ লাভ কি ভাই। লোক্‌সানের ভাগটাই বেশী হ'ল—এমন আমীরী আহার আর মিল্‌বে না।" আমি কষ্টে হাসিয়া বলিলাম, "তা স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যখন তোমাদের নারায়ণ ঠাকুরের ঘর উজ্জল করবেন, তখন সে ভাবনা তোমাদের ভাব্‌তে হ'বে না।"

পরদিন হইতে রতনকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। রতন আমাদের বাড়ী যাইয়া সমস্ত ব্যাপার মাকে জানাইয়া বলিল—"এবিবাহ না হলে গোবর্দ্ধন আর বাড়ী ফিরবে না, আজীবন সন্ন্যাসী হ'য়ে ফির্‌বে।" আমার গৃহত্যাগের পর মা আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বাবা ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। আমি কুশলে এবং ধর্ম্মপথে আছি শুনিয়া উভয়ে পুলকিত হইলেন এবং বিবাহে মত দিলেন।

যতীন বাবু বাবার পত্র পাইয়া আনন্দে আটখানা হইলেন। বিনা পয়সায় ডেপুটির পুত্রের সহিত মেয়ের সম্বন্ধ করা আজ কালকার দিনে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এরপর একদিন আমিও পটল তুলিলাম।

(৫)

বিবাহ আসরে শ্বশুর বাড়ীর সকলে জামাতা ও তাহার পার্শ্বে রতনকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। একি অদ্ভুত কাণ্ড! এযে 'ভক্তানন্দ স্বামী' ও তাহার চেলা।

বিবাহ বাসরে রতন আমার গুরুগিরির কথা প্রকাশ করিয়া দিল। রমণীরা পরিহাসের চোটে আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। লজ্জায় আমার গণ্ডদ্বয় কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করিল। আঃ কি করিয়া এই সকল নারী-সৈন্যের পরিহাস-গোলা-বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়! শ্যালক শ্যালিকারা আমাকে বিবাহের উপহার দিয়াছিল—গেরুয়া বসন, আলখেল্লা, রুদ্রাক্ষের মালা, চিম্‌টা, ভিক্ষার ঝুলি ইত্যাদি। বাসর ঘরে সকলে হাসিয়া মাটীতে লুটাইতে লাগিল, এমন কি নববধূ ও সেই হাস্য রোলে যোগ দিয়াছিল। আমি নীরবে হেটমুখে বসিয়া রহিলাম, 'বোবার শত্রু নাই!'

রাত্রিকালে হেনা আধঘোমটার ভিতর হইতে প্রফুল্ল কমলদল সদৃশ আঁখি দুটির কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "প্রভো! হঠাৎ ঐ রূপ গুরুগিরির সখ্ হইয়াছিল কেন?" আমি তাহাকে সস্নেহে নিকটে টানিয়া বলিলাম, "সে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, নতুবা এরূপ শিষ্যা মিলিবে কি করিয়া?" হেনা লজ্জায় মুখ অবনত করিল।

বলা বাহুল্য, আবার কলেজে ভর্ত্তী হইলাম; এবং যথা সময়ে এল এ, বি এ ও এম্ এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃ পুণ্যফলে ডিপুটিগিরি লইয়া নোয়াখলী সেই, বৃক্ষতলেই কেম্প খাটাইয়া ১১০ ধারার বিচার করিতে গেলাম। হেনা সঙ্গে ছিল, তাহাকে বলিলাম—"এইখানেই ভণ্ডামীর পত্তন, আবার এইখানেই ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট।" হেনা হাসিয়া বলিল—"শেষটা শিষ্যার পুণ্যের ফলে।" প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

তান্ত্রিক উপাসনা।

তান্ত্রিক উপাসনা বলিতে অনেকেই পঞ্চ ম কার দ্বারা কালী-তারা প্রভৃতি দেবতার উপাসনা এবং শ্মশান-সাধন প্রভৃতি ক্রিয়া বুঝিয়া থাকেন। শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি উপাসকগণও যে তান্ত্রিক উপাসনাই করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহারা ধারণাই করিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রায় সকল হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ই তন্ত্রমতে উপাসনা করিয়া থাকেন, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন সম্প্রদায়ে সাক্ষাৎ ভাবে, কোন সম্প্রদায়ে বা পরোক্ষভাবে তন্ত্রমত গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রে সকল দেবতারই উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। শিব বিষ্ণু শক্তি সূর্য্য ও গণপতি এই পঞ্চদেবতার উপাসনা মুখ্যভাবে উক্ত হইয়াছে; অন্যান্য দেবতাগণ ইহাদেরই অন্তর্গত। শঙ্কর দিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান শঙ্করাচার্য্য 'অদ্বৈতজ্ঞানে অনধিকারী শিষ্যদিগকে পঞ্চ-দেবতা উপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চ দেবতার উপাসনায় চিত্তনির্ম্মল হইলে অদ্বৈতজ্ঞানে অধিকার হয়। শিবের উপাসকগণ শৈব, বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব, শক্তির উপাসকগণ শাক্ত, সূর্য্যের উপাসকগণ সৌর এবং গণপতির উপাসকগণ গাণপত্য নামে অভিহিত, ইঁহারা সকলেই তান্ত্রিক। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শৈবগণের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক তান্ত্রিক চূড়ামণি অভিনব গুপ্ত * তন্ত্রশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই বিখ্যাত শৈবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তৎপ্রণীত পরমার্থসার প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মেও তন্ত্রপ্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়; এই সম্প্রদায়ে দীক্ষা ও পূজা প্রভৃতি এখনও তন্ত্রমতেই হইয়া থাকে। সৌর ও গাণপত্য এখন আর বড় বেশী দেখিতে যায় না। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয়ে রক্ষিত বরেন্দ্রদেশ হইতে সংগৃহীত সূর্য্য ও গণেশ মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া অনুমিত হয়, পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশেও সৌর ও গাণপত্য অল্প ছিল না।

তন্ত্রে উপাসনার বহু প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ক্ষুদ্রতম প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অসম্ভব। কেবল শক্ত্যুপাসকগণই পঞ্চ ম কার সাধনা ও শ্মশান সাধনা প্রভৃতির অধিকারী। তন্ত্রে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব এই ত্রিবিধ ভাব ভেদে উপাসনার পার্থক্য কথিত হইয়াছে। মানসিক অবস্থার নাম ভাব। দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থায় যথাক্রমে পশু, বীর ও দিব্যভাবে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। মানুষ প্রথমেই অদ্বৈতজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারে না; কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে অদ্বৈত জ্ঞানে অধিকার লাভ করে। প্রথমতঃ দ্বৈতাবস্থায় পশুভাবে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এই সময়ে পঞ্চ ম কার স্পর্শও করিবে না "মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্‌গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ" "ঋতুকালং বিনা নৈব স্বস্ত্রিয়মপি সংস্পৃশেৎ" এই সকল বাক্য পশুভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে। পশুভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন, ইন্দ্রিয় সংযম, নিরামিষাহার, ত্রিসন্ধ্য-স্নান, বৈদিক সন্ধ্যোপাসনা ও শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। পশুভাবে সর্ব্বদা অতি-পূতভাবে থাকিতে হয়। বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতার উপাসনা পশুভাবেই করিতে হয়। এই প্রকার উপাসনা দ্বারা মনের দ্বৈতভাব কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলে অন্তঃকরণে বীরভাবের উদয় হয়। পাশ [বন্ধন রজ্জু] দ্বারা পশুকে বন্ধন করিতে হয়; মানুষ—সংসাররূপ পাশ-দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় পশু এবং জ্ঞানরূপ অসিধারা বীরের মত সংসার পাশ ছেদন করিলে বীরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

---

* অভিনবগুপ্ত কাশ্মীরদেশ বাসী ছিলেন বলিয়া তন্ত্রসাহিত্যে ইনি কাশ্মীর ভট্টনামে পরিচিত।

বীরভাবে বাহ্য পঞ্চ ম কার দ্বারা * উপাসনা এবং শ্মশান সাধন প্রভৃতি করিতে হয়। অদ্বৈতাবস্থায় দিব্যভাবে আধ্যাত্মিক পঞ্চ ম কার সাধনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত এই ত্রিবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়ার সাদৃশ্য স্পষ্টই অনুভূত হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সহিত পশু ভাব বিহিত ক্রিয়ার, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রমের সহিত বীর ভাব বিহিত ক্রিয়ার এবং প্রব্রজ্যাশ্রমের দিব্যভাব বিহিত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বাহ্যভাবে এবং তান্ত্রিক ত্রিবিধ ভাব আভ্যন্তর ভাবে বিহিত হইয়াছে, এইটুকু পার্থক্য। মনে রাখিতে হইবে, তান্ত্রিক উপাসনাতেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। বেদে ও তন্ত্রে উদ্দেশ্য গত কোন পার্থক্য নাই, কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে আচার গত পার্থক্য অনুভূত হয়; বস্তুগত্যা এই পার্থক্যের মধ্যেও অঙ্গাঙ্গী ভাব আছে। উভয় মতেই প্রথমতঃ সংযম দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিয়া পরে বিষয়োপভোগ করিতে হয়। অনাসক্ত ভাবে বিষয়োপভোগ করিলেই ক্রমে অদ্বৈত জ্ঞানে অধিকার জন্মে। প্রথমেই চিত্ত সংযম শিক্ষা না করিলে অনাশক্ততা আয়ত্ব হয় না, এই জন্য উভয় মতেই প্রথমে চিত্ত সংযম বিহিত হইয়াছে।

তন্ত্রমতে শক্তির উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। বেদান্তোক্ত মায়া, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এবং তন্ত্রোক্ত শক্তি অভিন্ন। বেদান্ত মতে মায়া ও সাংখ্য মতে প্রকৃতি জড়া, কিন্তু তন্ত্র মতে শক্তি চিন্ময়ী। ব্রহ্মজ্ঞানের বহু উপায় থাকিলেও প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বলিয়া তন্ত্র প্রকৃতি উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। †

* তন্ত্রে বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ পঞ্চ ম কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য অনেকেই ধাঁধাঁয় পড়িয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে অধিকার ভেদে দ্বিবিধ পঞ্চ ম কারেরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

† উপায়াঃ সন্তি বহুধা জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তথাপি প্রকৃতের্য্যোগাৎ ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ॥
[শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি]

বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব, সিদ্ধান্ত, বাম, দক্ষিণ ও কৌল এই সপ্ত আচার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে; * তন্মধ্যে বাম, দক্ষিণ ও কৌল এই ত্রিবিধ আচারে এক মাত্র শক্তির উপাসনাই বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার অনুষ্ঠিত না হইলে পরবর্ত্তী আচার অবলম্বিত হইতে পারে না। কৌলাচারে প্রকৃতির উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে; তখন আর জীবের কোন কর্ত্তব্য থাকে না। বিষ্ণু শিব প্রভৃতির উপাসনা শক্ত্যুপাসনারই অঙ্গ।

এই প্রবন্ধে প্রকৃতি, উপাসনা, ত্রিবিধ ভাব, সপ্তবিধ আচার—এই সকল বিষয়ের আভাস মাত্র প্রদত্ত হইল; পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য দেখিলে বারান্তরে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

শ্রাবণে।

তপ্ত ধরণী সিক্ত করিয়া বহিছে শ্রাবণ ধারা,
আর্দ্র বসনে বর্ষার রাণী এসেছে পাগল পারা।
অর্ঘ্য তাহার সরিৎ সাগর স্বচ্ছ সলিল ঘেরা,
পল্লব ঘন শ্যামল বন আসন আকুল করা।
কুসুম গন্ধে মধুর ছন্দে ভুবন উঠেছে ভরি,
ভক্ত তাহার নমে বার বার ক্ষেত্রে ধানের সারি;
কুঞ্জে তাহার মুকুতার হার কদম্ব করেছে দান,
বন্দনা গানে বল্লী বিতানে ঝিল্লী ধরেছে তান।
সন্ধ্যা তিমির পুঞ্জ মাঝারে গাভীগণ ফেরে ঘর
কাকলি আকুল নীরব বকুল স্তব্ধ সকল স্বর।
পঙ্কিল পথে পল্লীরমণী চলেছে কলসী কক্ষে।
সিক্ত আঁচল মুক্ত করিয়া সমীর মরিছে বক্ষে।
মুগ্ধ মধুর গর্জ্জ মুখর শান্ত উদার নীলিমা।
চেতনা হারা বেদনা ভরা নীরব নিথর জ্যোছনা।
বিরহ দাহ অবশ হিয়া সমাধি সুপ্ত জীবনে,
মরমে গাথা তোমারি ব্যথা সাড়া দেয় আজি শ্রাবণে।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী, বি, এ,

* সর্ব্বেভ্য শ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মতম্
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ সিদ্ধান্ত মুত্তমম্॥
সিদ্ধান্তাদুত্তমং বামং বামাদ্ দক্ষিণ মুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি।

ঘাটু গান।

বর্ষণ-ঘন শ্রাবণ মাসটা আমাদের দেশের বিশ্রামের মাস বলিলেও তেমন দোষের হয় না। তখন মাঠ ঘাট চারিদিক একাকার।

"শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী
সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি।"

এমন দিনে একটু আয়েস করাইত স্বাভাবিক এবং আবশ্যক। এই সময় কৃষকেরা আশু ধানের খেতের দিকে চাহিয়া, আর আকাশের পানে তাকাইয়া, আশায় ও আশঙ্কায় কাল কাটায়। ফাঁক পাইলে ধান কাটিয়া মাড়াইয়া লয়। হাওরে মাঠে তখন বাওয়া ধান যোঁপাইয়া বাড়িতে থাকে। এমন অবসর কৃষকের জীবনে বিরল।

খালি খালি বসিয়া ত আর রামগিরির নির্ব্বাসিত যক্ষের মতন 'প্রিয়া মুখ চন্দ্র' চিন্তা করিলে দিন চলে না। বিশেষতঃ গ্রাম্য কৃষক প্রিয়া সন্নিধানেই বাস করে। সুতরাং একটা কিছু কাজ কর্ম্ম চাই। একটু আমোদ আহ্লাদ চাই। হা ডু ডু খেলার মাঠে, খালে বিলে, পথে ঘাটে, জল থৈ থৈ করিতেছে; তার উপর সব নৌকা ছোট বড় ডিঙ্গি, সরঙ্গা, পান্সী, উথার ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। হিন্দুদের বাড়ীতে বিকাল বেলা পদ্মাপুরাণ পাঠ ও গান চলিতেছে; আবাল বৃদ্ধবনিতা একমন প্রাণে তাহা শুনিতেছেন। হিন্দু, মুসলমান সকল জাতিতে মিলিয়া এই দিনে 'ঘাটু' গান জুড়িয়া দেয়। এই সময় ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া বাড়ী বাড়ী হইতে গায়ক ও নৌকাবাহক সংগ্রহ করা হইত বলিয়া এই গান 'ঘাটু' নামে পরিচিত।

ঘাটু গানে জাতিগত কোনও বিদ্বেষ নাই, পদ মর্য্যাদার গর্ব্ব নাই—আসন বসনের ইতর বিশেষ নাই—পণ্ডিত মূর্খের পার্থক্য নাই। তবে কথা এই—সর্ব্বজাতি সমন্বয় থাকায় এই ক্ষেত্রে শিক্ষিত জনগণের সমাগম অতি বিরল।

ঘাটু গান আগাগোড়া কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক। ভোর, গোষ্ঠ, পূর্ব্বরাগ, প্রেম, মান, মানভঞ্জন, মিলন, বিহার ইত্যাদি ঘাটু গানের অঙ্গ। কখন কখন দলাদলিতে গালাগালির আবির্ভাব হয়। কবির মত কবিতা বাঁধিয়াই গানের উত্তরে গানের গালির জবাব দেওয়া হইয়া থাকে।

ঘাটু গানে এদেশের বহু অবস্থাপন্ন লোক পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। ঘাটুগানের 'ছোক্‌রা' প্রতি পালন প্রায় 'হাতী' পালনের মত। এক একটা ছেলের বেতন মাসে ৩০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সেই ছেলের নবাবের মত আমীরী চাল। খেয়ালে বিভোর সৌখিন যুবকগণের কোলে বা কাঁধে তাহার উপবেশন স্থান, মুখরোচক বিবিধ খাদ্য তাহার ভোগ্য, দুগ্ধফেন নিভ শয্যা ব্যতীত তাহার নিদ্রা হয় না। অবশ্য দুই এক মাসের জন্যই তাহার এই বাবুয়ানা নবাবী চাল থাকে। তার পর যে তিমিরে সে তিমিরে!

ঘাটুর 'ছোক্‌রা' নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতেই প্রায়শঃ গৃহীত হয়। ছোকরা মাথায় লম্বা চুল রাখে, হাতে বাউটী পরে। গানের সময় তাহাকে ঘাগরী ও পায়ে ঘুঙুর পরাইয়া সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারাদিতে সাজান হয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে সে তালে তালে নাচে—আর হাতে সেই গান 'বাতায়'। (গানের মর্ম্ম হাত, চক্ষু ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করণের নাম 'বাতান')। এই গানবাতানের শক্তি অনুসারে ছোকরার মাহিয়ানা ঠিক হয়। বাস্তবিকই কোনও কোনও ছোকরা এমন সুন্দর ভাবে করুণরসের গান বাতাইতে পারে, যে চক্ষের জলসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বিরহ, মান, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি গান বাতানেও খুব ওস্তাদী পরিলক্ষিত হয়। এই বাতানের সময়ই গায়কেরা হুঙ্কার দিয়া গান ধরে এবং প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে।

ঢোলকের বাদ্যের সহিত মন্দিরার বাজনা মিশিয়া গায়ক দলের গগনভেদী চীৎকারের অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। ছোক্‌রা কখন কখন তার মধ্যে সুর সপ্তকে দুই একটা টান দেয়। যেন স্বর্গরাজ্যের কোন হুরী আসিয়া সেই গানের মধ্যে রসান দিয়া যায়। ছোক্‌রার সেই রাগিণী সকলের সমবেত সুর ছাড়াইয়া অনেক উচ্চগ্রামে আরোহণ করে এবং উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

ঘাটু দুই প্রকার। স্থল ঘাটু ও জল ঘাটু। জল ঘাটুই আদি। স্থল ঘাটু তাহার সহজ সংস্করণ। গানের মধ্যে বড় কিছু পার্থক্য নাই।

ঘাটুর ছোক্‌রার ভবিষৎ প্রায়ই কষ্টকর হয়। কারণ ৭।৮ বৎসর বয়স হইতেই ছোক্‌রা বেয়াদপি ও বাবুগিরি শিখিতে থাকে। গানের জন্য সে কিছু দাদন পায়। এবং উপরিও পাইয়া থাকে। এই অর্থ যথেচ্ছা খরচ করিয়া ছেলেটী ক্রমে ক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' হইয়া উঠে। অনেক ছেলে ১২।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত "ছোক্‌রার" কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার উত্তর কালটা প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। তবে কোনও কোনও বুদ্ধিমান ছেলে ইচ্ছা করিয়া বাদ্যযন্ত্রে হাত দেয়। এবং ক্রমে গানের সঙ্গে বাজনা শিখিয়া লয়। ভবিষ্যতে সে বাদক হইয়া যাত্রাওয়ালার দলে, বা কীর্ত্তনের দলে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়।

ঘাটুর ছোক্‌রার টক খাইতে নাই; তাহাতে স্বর বিকৃত হইবার আশঙ্কা থাকে। বৃষ্টিতে ভিজিলে বা জল কাদা মাড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে; সুতরাং অনেক সময় জল কাদা ডিঙ্গাইতে সে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া থাকে।

ঘাটুগানের মরশুম লাগিলে গায়কদিগকে ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়িতে আটকান যায় না। ঘাটুর মৌতাত ঠিক আফিং এরই মতন।

আমরা নিম্নে দুইটী মাত্র ঘাটু গান প্রদান করিতেছি।

(১) বংশী।

আরে বংশী বাজে কোন্ বনে।
শুনিয়া বন্‌শীর তান, উদাস হৈয়াছে প্রাণ
চিতে আমার ধৈরয না মানে॥
আরে সখীরে—
দাঁড়ায়ে কদম তলা, বাঁশী বাজায় চিকণ কালা,
গলায় শোভে বনমালা।
বাজায় বন্‌শী সুতানে, ধৈর্য্য নাহিমানে॥

(২)

সোণার গাগরী লৈয়া রাধা যায় জলে।
যায় গো রাধা জলে একা যায় গো রাধা জলে॥
যমুনাতে জল ভরিতে, দেখে রাধা আচম্বিতে,
জলের মাঝে চিকণকালা দোলে।
কলসী লইয়া কাঁখে, রাধা নেহালিয়া দেখে,
কানাই বৈসা কদম্বেরি ডালে।

এই সকল সঙ্গীতের প্রায় সমুদয়ই নিম্ন বঙ্গের নিরক্ষর কবির রচনা। এই সকল সঙ্গীতে স্থায়ীভাব আছে কিনা পাঠক যথাকালে তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু গানের আসরে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে সমর্থ হন না। এই সঙ্গীতগুলি যদি সংগৃহীত হয়, তবে তাহা বঙ্গপল্লীর অমূল্য সম্পদরূপে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"নারায়ণে" রুচিবিকার।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি। লোক চক্ষুর অন্তরালে সাহিত্য ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন গঠন করিয়া থাকে। জাতীয় চরিত্রের উপর সাহিত্যের প্রভাব অসামান্য। সুতরাং সাহিত্য সেবকগণ জাতীয় চরিত্র বিকাশের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। যাহাতে লোকের মন সৎপথে পরিচালিত হয়, পুণ্যের প্রভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, পাপের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে, তদ্বিষয়ে সাহিত্যিকগণের সতর্কদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই গুরুতর দায়িত্ব সম্পাদনে যিনি অক্ষম অথবা উদাসীন তাহার সাহিত্য চর্চ্চা নিস্ফল-পণ্ড-শ্রম মাত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় এক শ্রেণীর কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন তথাকথিত সাহিত্য সেবকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহাদের আদর্শানুসারে সাহিত্য বিলাসিতারই অন্যতম উপকরণ মাত্র। তাস, দাবা, পাশা অথবা ততোধিক নিকৃষ্ট আমোদে যেমন চিত্ত-রঞ্জন হয়, তেমনি সাহিত্য পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য ও সাময়িক আমোদ লাভ! ইহার বেশী কিছু নয়। বঙ্গ সাহিত্যে এই শ্রেণীর 'সৌখিন্' লেখকই অধিক। যাহার ঘরে খাবার আছে এবং দশজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ এবং মজলিস্ দিবার শক্তি আছে সে-ই

এখন সাহিত্যিক। তাহার যশ সর্ব্বব্যাপী। এই জন্যই বাঙ্গলা সাহিত্যে এত ময়লা ও এত আবর্জ্জনা দিন দিন পুঞ্জীভূত হইতেছে। সাহিত্যকুঞ্জ উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাভূমি হইয়াছে।

অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে শিক্ষিত ও শক্তিশালী স্বদেশ হিতৈষী ব্যাক্তিগণও কুরুচি সম্পন্ন নির্লজ্জ উদ্দাম লেখকদিগের কলুষিত পৈশাচিক অভিনয় দমন করিবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া বরং তাহাদিগকে প্রকারান্তরে উৎসাহ দিতেছেন। আজ আমাদের কথার সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

সম্প্রতি নব প্রকাশিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বাবু সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত নামক একজন অজ্ঞাত লেখক অতিশয় নিকৃষ্ট-রুচি ও অমার্জ্জনীয় উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। সংবাদ পত্রিকায় এই লেখকের উদ্দাম ভাব ও অপবিত্র রুচির তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও উপর্য্যুপরি তিন সংখ্যা "নারায়ণে" তাহার অঙ্কিত পূতিগন্ধময় কাম-লীলার ঘৃণিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় পত্রিকার প্রতিবাদ গ্রাহ্যও করেন নাই। সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্তচিত্তরঞ্জন দাস "নারায়ণে" সম্পাদক। চিত্তরঞ্জন বাবুর বিজ্ঞতা, স্বদেশ-প্রেম ও সাধুতার দৃষ্টান্ত আমরা বহুঘটনায় প্রাপ্ত হইয়াছি। বলিতে দুঃখ হয় তাঁহারই সম্পাদিত "নারায়ণ" কতগুলি নগ্ন পাপ-চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া বাঙ্গলার ঘরে ঘরে কামের তীব্র পূতিগন্ধ ছড়াইতেছে!

"নারায়ণে" প্রকাশিত গল্পই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এমন উদ্দাম লালসার আলেখ্য ইতঃপূর্ব্বে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সে সংবাদ আমরা রাখিনা। মদ্য, বারবণিতা, রঙ্গালয় ইত্যাদি ভোগের উপকরণ ব্যতীত "নারায়ণে"র সেবা চলে না। উপর্য্যোপরি চার পাঁচটী গল্পেই এই সকল উপচারের প্রাবল্য দেখিলাম।

প্রতিভাবান্ লেখকগণ নাটকে ও উপন্যাসে পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন বটে কিন্তু পাপ-চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে। ভোগের পথে শান্তি নাই, পাপের অনিবার্য্য পরিণাম কেবল দুঃসহ জ্বালাময় অনুশোচনা, ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের চরমলক্ষ্য। এবং তৎসঙ্গে পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা ধর্ম্মের দিকে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেন। কিন্তু নারায়ণের এই উদ্ভট গল্প-লেখক উচ্চ আদর্শ কিম্বা উদ্দেশ্যের কোন ধার ধারেন না। অথবা তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই। উদ্দাম লালসার ঘৃণিত চিত্র প্রদর্শন করিয়া নর-নারীর চিত্ত কলুষিত করাই যেন লেখক মহাশয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। পাপ কাহিনী রাখিয়া ঢাকিয়া বলিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। লজ্জার ক্ষীণ আবরণ ও তাহার অসহ্য। এমন উলঙ্গ কাম-চিত্র 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়াছি।

'নারায়ণে' ইতঃপূর্ব্বে 'মৃণালের পত্র' 'ডালিম' ও 'কল্যানী' শীর্ষক তিনটী গল্প বাহির হইয়াছে। এই তিনটী গল্পেও প্রবল কামনা স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত। কিন্তু গল্প তিনটীর ভিতর একটা ভাল উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য কতকটা মার্জ্জনীয়। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু আসিয়া নারায়ণের গল্প লেখকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। Eat drink and be mery ইহাই বোধ হয় তাহার জীবনের motto। পাছে কেহ মনে করেন আমরা নারায়ণের লেখক ও পরিচালকগণের উপর অন্যায় অভিযোগ করিতেছি সেই ভয়ে নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বাবুর প্রবৃত্তির সামান্য আভাস প্রদান করিতেছি।

"মরণে জয়" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নারায়ণে প্রকাশিত হইয়াছে। রমেন্দ্র মাতাল, বেশ্যাসক্ত। "আঙ্গুর" নাম্নী বারবণিতা গৃহে সে দিবা রাত্রি পড়িয়া থাকে। পতির দুর্ব্ব্যবহারে অসহ্য হইয়া রমেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে। রমেন্দ্র দ্বিতীয় বার বিবাহ করিল। কিন্তু চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইলনা। মদ ও 'আঙ্গুর" ছাড়া সে সংসারে আর কিছুই বুঝেনা। তাহার দ্বিতীয়া পত্নী নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। রমেন্দ্র কুলীন; তাহার তৃতীয়বার বিবাহ করিতে কষ্ট হইল না। তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী শোভনা পরিস্ফুট যৌবনা লাবণ্যময়ী-যুবতী। কিন্তু রমেন্দ্র এখনও "আঙ্গুর" ভিন্ন

কিছু বুঝেনা। শোভনা তাহার রূপ-যৌবন স্বামীর চরণে উপহার দিয়াও যখন তাহার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিল না, তখন এক দিন সে গায়ে কেরোসিন মাখিয়া আগুণ ধরাইয়া আত্মহত্যা করিল। শোভনার পিতাও আগুণ নিবাইতে গিয়া পুড়িয়া মরিলেন।

এদিকে বারবণিতা "আঙ্গুর"ও জীবনে বিতশ্রদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগিনী হইল। এই খানেই গল্প শেষ যে রমেন্দ্রের লালসানলে তিনটী নিরপরাধা সাধ্বী রমণী পুড়িয়া মরিল তাহার কি শাস্তি হইল? তাহার পাপময় জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিলেও আমরা কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতাম। আর হিন্দু রমণী স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইয়া কেরোসিন তেল গায় মাখিয়া আত্মহত্যা করিবে এই দৃষ্টান্ত ত বড়ই ভীষণ। এক "স্নেহলতা" আত্মহত্যায় বাহবা দেওয়ায় কত স্ফুটনোন্মুখ কুসুম কলিকা অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহাও কি লেখক পাঠ করেন নাই। আরও নারী হত্যার প্রয়োজন আছে কি?

দ্বিতীয় গল্প "আঁধার ঘরে" আষাঢ় সংখ্যা "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক সেই শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। 'বিদ্যাসুন্দর' ব্যতীত এরূপ নগ্ন অশ্লীলতার চিত্র অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই গল্পে তিনি প্রাণ খুলিয়া কাম-লীলার সকল কথা অকুণ্ঠিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন অধ্যায়ই বাদ পরে নাই। দণ্ডবিধি আইনের ২৯৩ ধারার আমলে আসিবার আশঙ্কায় যাহা খুলিয়া বলা যায় না, লেখক তাহাও ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। এই গল্পের বিকট আরম্ভ ও উৎকট উপসংহার পাঠ করিলে নারায়ণ সম্পাদক শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে দোষ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লেখক নির্লজ্জ, কাণ্ডজ্ঞানহীন; তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া কোন ফল পাওয়ার আশা নাই। চিত্তরঞ্জন বাবু শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি তাঁহার কাগজে এরূপ অশ্লীল গল্প বাহির হইতে দিয়া কুরুচির প্রশ্রয় দিতেছেন কেন?

"আঁধার ঘরে" গল্পটীর যে কেবল ভাবই কলুষিত তাহা নহে। ইহার ভাষা কদর্য্য। উপাখ্যান (plot) অস্বাভাবিক অতিরঞ্জিত। কোন্ গুণে এই গল্পটী সম্পাদক মহাশয়ের চিত্ত-রঞ্জন করিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না! এই গল্পের উপাখ্যানটী কিরূপ উদ্ভট্ এবং তরল অপরিপক্ক মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কল্পনা তাহার ক্ষীণ আভাস দিতেছি।

কাদম্বিনী বাইশ বছরের সুন্দরী যুবতী। তাহার স্বামী রাজচন্দ্র অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গমন করিয়াছিল। আজ ছয় বৎসর যাবত নিরুদ্দেশ। গৃহে অন্য কেহ নাই। কাদম্বিনী চরকা দিয়া সুতা কাটিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। একদিন ভাদ্র মাসের আঁধার রাত্রে বাল্য সহচর শেখর কাদম্বিনীর গৃহে আসিয়া তাহার নিকট পাপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। কাদম্বিনী অতি সহজেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সতী ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিল। সে রাত্রি হইতে উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে কামানলে ইন্ধন দিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন রাজচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ফিরিয়া আসিয়া রাজচন্দ্র যে দৃশ্য দেখিল তাহা দেখিয়া শেখর-কাদম্বিনী উভয়কে খুন করিলেও রাজদ্বারে কি বিধাতার নিকট তাহার দণ্ড পাইবার কোনই আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু রাজচন্দ্রকে অপরিপক্ক লেখক অতিশয় অস্বাভাবিক কাপুরুষ করিয়াছেন। রাজচন্দ্রের গৃহে তাহারই স্ত্রী পাপাভিনয় করিতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও রাজচন্দ্র বলিতেছে—"আমি ভুল করিয়াছি, আমার ভুল হয়ে গেছে; শেখর-কাদম্বিনীর মিলন হয়েছে এক বোটায় দুটো ফুল ফুটতে যাচ্ছিল আমি ভুলে ছিড়ে ফেলেছি।"

ঈশ্বর না করুন লেখক যদি কোথাও এ অবস্থা দেখেন, তাহা হইলে বোধ করি না তিনি রাজচন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। যদি পারেন, তবে মনুষ্যেতর প্রাণীর পংক্তিতে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না।

রাজচন্দ্র বাড়ী আসাতে পাপের পথে বিঘ্ন পড়িবে আশঙ্কায় শেখর কাদম্বিনীকে ধরিয়া বসিল—রাজচন্দ্রকে খুন করিয়া ভালবাসার পরিচয় দিতে হইবে। কাদম্বিনী স্বামীর বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিতে স্বীকার করিল এবং অঞ্চলে প্রদীপ নিভাইয়া দৃঢ় পদে রাজচন্দ্রের সমীপবর্ত্তিনী হইল। রাজচন্দ্র উদ্যত কৃপাণ পত্নীকে দেখিয়া গভীরতর দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় মনোনি-

বেশ করিল। সে ভাবিতে লাগিল "আমায় খুন করবে, করুক, জীবন পাবার সময় ও নিজের হাত ছিল না, মৃত্যুর সময় ও বুঝি হাত থাকে না, তবে কেন? আমার জীবন পেলে যদি কাদম্বিনীর সুখ হয় হোক্‌…এ জীবনের মূল্য কি?"

Bravo গল্প-লেখক! কি স্বাভাবিক চিত্র! ধৈর্য্যের কি অপূর্ব্ব আদর্শ! লেখক কোন্‌ বিদ্যালয়ে নীতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়াছেন জানিতে আমাদের অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে!

তারপর কাদম্বিনী স্বামীর বক্ষে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়া শেখরের নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করিল, "শেখর! একটা × × × দাও! শেখর একটা × × × দাও!"

পাঠক আপনারা এই জঘন্য লেখকের সমুচিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন।

খুনের অব্যবহিত পরেই শেখরের উচ্চ হৃদয়ে উৎকট বৈরাগ্যের উদয় হইল, সে কাদম্বিনীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রস্থান করিল। কাদম্বিনী "একটা × × খাও শেখর, একটা × × খাও" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহার পেছনে ছুটিল। পরিশেষে নিরাশ হইয়া নিজের বুকে অস্ত্রাঘাত করিয়া পাপ জীবন-লীলা শেষ করিল। এই খানেই গল্পের বিকট উপসংহার হইয়াছে। সতীত্বাপহারক নরাধম শেখরের পরিণাম কি হইল, লেখক মহাশয় তাহা বলেন নাই। বোধ হয় সে এখন "নারায়ণ' পত্রিকার জন্য তাহার অতীত জীবনের গৌরব-কাহিনী লিখিতে বিব্রত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন বাবু যখন 'নারায়ণ' বাহির করেন, তখন আমাদের আশা হইয়াছিল ইহা একখানি আদর্শ পত্রিকা হইবে। ভাবিয়াছিলাম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কল্পে নারায়ণ সমাজের সহায় হইবে। সূচনায় সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে সেইরূপ আশ্বাসই দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা নিরাশ হইয়াছি।

কেহ কেহ বলিতেছেন চিত্তরঞ্জন বাবুর সময় কোথায় যে তিনি নারায়ণের সেবা করিবেন? তাঁহার প্রচুর অর্থ আছে তিনি অর্থ ব্যয় করিতেছেন। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ই নারায়ণের পূজারী। তিনিই 'নারায়ণের' তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু লোকে একথা শুনিবে কেন? উচ্ছৃঙ্খল জঘন্য লেখার জন্য সম্পাদককেই সকলে দায়ী করিবে। আর বিপিন বাবু কর্ণধার থাকিতে এই শ্রেণীর গল্প ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে ইহা ও অতিশয় দুঃখের কথা। বিপিন বাবুকে মদ্য নিবারণী সভায় অনেক বার বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি। "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের" যে ফোঁটা তিলক বিপিন বাবু নারায়ণের গায় পরাইতেছেন তাহা প্রবল মদ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। বিপিন বাবুর প্রতিভা অসাধারণ। আমরা বিশ্বাস করি তিনি ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত গল্প গুলির ও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু যে কালকূট নীলকণ্ঠ পরিপাক করিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণ মানুষের জীবন হানি অনিবার্য্য। সমাজ আপনার গতিতেই পাপের পথে চলিয়াছে। সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ঐ পথে সাহায্য অনাবশ্যক।

হে নারায়ণ! তোমার নামে যাহারা অপবিত্রতা ও কুরুচির হলাহল সমাজের হৃদয়ে ঢালিতেছে তাহাদিগকে সুমতি দাও।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

মুদ্রার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া যায় কিনা?

মুদ্রার আবশ্যক অনুভূত হয় বিনিময়ে। ক চাউল বিক্রেতা, খ বস্ত্র, গ তৈল ও ঘ লবণ বিক্রেতা। ক বস্ত্র তৈল ও লবন চায়—তার চাউলের বিনিময়ে। খ চায় চাউল—তার বস্ত্রের বিনিময়ে। এক্ষণে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভাব দূর করিতে হইলে, তাহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় করিলেই অভাব দূর হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাবে সর্ব্বদা একত্র সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব পর নয়; কারণ তাহা হইলে প্রত্যেককেই তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই মুদ্রার ব্যবহার। ক এর বস্ত্র, তৈল ও লবণের আবশ্যক। সে চাউল

বিক্রয় করিয়া মুদ্রা লইল এবং আবশ্যক মত সেই মুদ্রা দ্বারা তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিল। এইরূপে সে বস্ত্র-বিক্রয়-লব্ধ মুদ্রাদ্বারা চাউল খরিদ করিল।

এতদ্ব্যতীত মুদ্রা পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করে। মনে করুন এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় পাঁচটি রজত মুদ্রা, আবার একমণ দাইলের পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় দশটী রজত মুদ্রা। ইহাদ্বারা দাইলের মূল্য চাউলের দ্বিগুণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মুদ্রা হাতে থাকা অর্থই সমস্ত পণ্য দ্রব্যের অভাব পূরণ করিবার উপাদান হাতে থাকা। কারণ তোমার যখনই যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, তুমি অনায়াসে মুদ্রার সাহায্যে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে। এইজন্য মুদ্রাকে 'ক্রয়কারী শক্তি' (purchasing power) বলা হইয়া থাকে। এই ক্রয়কারী শক্তি আছে, বলিয়াই মুদ্রার মূল্য আছে, সার্থকতা আছে।

প্রাচীন কালে অর্থাৎ যখন হইতে মুদ্রা ব্যবহার প্রণালী আরম্ভ হয়,— ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। চীন দেশে চা; স্পার্টায় লৌহ, আরবে পশু, রোমে তাম্র ও অন্যদেশে কড়ি বিনিময় কার্য্যে প্রচলিত ছিল; কিন্তু প্রাগুক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা মুদ্রার কার্য্য অর্থাৎ বিনিময় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত না। গুরু ওজনের দ্রব্যাদি সহজে বহনীয় নয় সুতরাং মুদ্রার উদ্দেশ্য আদৌ সাধিত হয় না; তাই স্বর্ণ ও রৌপ্যই মুদ্রার জন্য সমস্ত সভ্য দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। স্বর্ণ ও রজতের আরও বিশেষত্ব এই যে (১) ধাতু হিসাবে মূল্যবান্, (২) সহজে বহন করা যায়. (৩) সহজে ক্ষয় শীল নহে (৪) সহজে বিভাগ করা যায় (৫) সহজ-জ্ঞেয়।

সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধাতব মুদ্রার সহিত কাগজ-মুদ্রা (paper money) ও বহুল পরিমাণে চলিতেছে। ধাতব মুদ্রা বলার অর্থ এই যে কাগজ-মুদ্রাকেওঅর্থনীতিজ্ঞেরা মুদ্রা সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন; কারণ কাগজ-মুদ্রা দ্বারা ধাতব মুদ্রার ন্যায় প্রায় সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা চলে;—বিশেষতঃ কাগজ-মুদ্রার ভিত্তিই ধাতব মুদ্রা। যত টাকা মূল্যের কাগজ মুদ্রার প্রচলন হয়, তত টাকা নগদ জমা রাখা হয় এবং যখন ইচ্ছা তখনই জনসাধারণ কাগজ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে নগদ ধাতব মুদ্রা পাইয়া থাকে;—সুতরাং ইহাকেও ধাতব মুদ্রার ন্যায়ই মনে করিয়া থাকে। কাগজ-মুদ্রা নোট, চেক, হুণ্ডি কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি নামে আমাদের দেশে পরিচিত।

নোট প্রভৃতি দেশের আভ্যন্তরীক ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধাতব মুদ্রাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তথায় কোনও দেশের প্রচলিত নোট চলে না। কিন্তু নোট না চলিলেও নিম্ন-লিখিত উপায়ে ধাতব মুদ্রার পরিবর্ত্তেও বহির্বিনিময় (foreign exchange) সম্পন্ন হয়। মনে করুন. আমাদের দেশ হইতে বিলাতে একলক্ষ টাকার পাট বিক্রয় হইল এবং বিলাত হইতে আমাদের দেশে একলক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করা হইল। এক্ষণে নগদ একলক্ষ টাকা পাঠাইতে হইলে উভয় দেশেরই টাকা পাঠাইতে বহু খরচ হইবে; হয়তঃ পথে জাহাজ ডুবি হইয়া টাকা মারা যাইতেও পারে সুতরাং এমতাবস্থায় বিলাত হইতে ভারত-বর্ষের উপর একলক্ষ টাকার জন্য একটা 'বিল' (Bill of exchange) করিবে এবং আমাদের দেশ হইতে বিলাতে একলক্ষ টাকার জন্য 'বিল' করিবে। তৎপর উভয় দেশের ব্যাঙ্ক উহা বিনিময় করিয়া বিনা মুদ্রা প্রেরণে উভয় দেশের দেনা পাওনা পরিশোধ করিবে। আমাদের সুবিধার জন্য এখানে এই সরল বিনিময়ের উদাহরণ প্রদত্ত হইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমদানী রপ্তানী প্রায়ই অসমান হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে 'বিল' দ্বারা যে টুকু ঋণ পরিশোধ হয়, তাহা করিয়া বাকী নগদ মুদ্রা প্রেরণ করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা হইল না।

বিনিময়ের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে নগদ মুদ্রা (Specie money) শুধু নোট প্রভৃতি ঋণ পরিচায়ক নিদর্শন পত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং বহির্বাণিজ্যে 'বিলে' যে টাকা অপরিশোধ্য থাকে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্যই বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং টাকার অর্থাৎ ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ছোট ছোট বিনিময় ব্যতীত আভ্যন্তরীক ব্যবসায়ে

একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। বহির্বাণিজ্য ও প্রায় বিলেই সম্পন্ন হয়। তাই এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, আদৌ মুদ্রা ধাতব ও কাগজ ব্যবহার তুলিয়া দেওয়া চলে কি না?

অতি প্রাচীন কালের ন্যায় জিনিবের পরিবর্ত্তে জিনিষের বিনিময় ও সহজ সাধ্য নয়। তবে কিরূপে মুদ্রা ব্যতীত চলিতে পারে? যদি এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, যাহাতে মুদ্রা কিম্বা 'জিনিষের পরিবর্ত্তে জিনিষ' ব্যতিরেকেও বিনিময় ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে মুদ্রার ব্যবহার অনায়াসে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমান অর্থনীতি বিশারদগণ বলিতেছেন যে 'জমা খরচ' (Book credit ও Book debt) প্রণালী স্থাপন করিলে, মুদ্রা ছাড়াও চলিতে পারে। মনে করুন, কলিকাতায় একটা প্রধান ব্যাঙ্ক আছে এবং তাহার বহু শাখা ব্যাঙ্ক প্রতি জেলায়, প্রতি থানায় ও প্রতি গ্রামে আছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই একটা করিয়া জমা খরচের হিসাব থাকিবে। প্রতিদিন গ্রামে যে লেনা দেনা হয়, তাহা উক্ত গ্রামিক ব্যাঙ্কে লিখাইতে হইবে। উক্ত ব্যাঙ্কে গ্রামের প্রত্যেকের নামে জমা ও খরচ, এই দুইটা হিসাব থাকিবে। মাসান্তে প্রত্যেকের নামে জমা ও খরচ কত হইল তাহা খতিয়ান করিতে হইবে। অবশ্য এজন্য ব্যাঙ্ক কিছু কমিশন পাইবে। সহজে উপলব্ধির জন্য একটি সরল উদাহরণ দেওয়া যাউক।

ক, খ এর নিকট হইতে বস্ত্র খরিদ করিয়া "আমি খ এর নিকট এত ধারি" এই মর্ম্মে একটা অঙ্গীকার পত্র দিবে। খ ব্যাঙ্কে উহা প্রদান করিলে ব্যাঙ্কে ক এর নামে খরচ ও খ এর নামে জমা লিখা হইল। ক, খ এর নিকট যত খ, গ এর নিকট এবং গ, ক এর নিকট ঠিক তত ধারে। মাসান্তে ব্যাঙ্কে খতিয়ান করিয়া দেখা হইল যে ক খ গ কাহারই কাহাকেও কিছু দিতে হইবে না। গ্রাম্য ব্যাঙ্ক গ্রামীক হিসাব করিয়া মাসান্তে উহা থানার ব্যাঙ্কে পাঠাইবে, তথা হইতে জিলার ব্যাঙ্কে যাইবে।

এই নিয়মে সমগ্র দেশ এবং ক্রমে সমস্ত জগতে বাণিজ্য ও বিনিময় চলিতে পারে। সময়ের গতি যে দিকে চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বুঝি বা অচিরেই মুদ্রার ব্যবহার উঠিয়া যায়।

শ্রীমুনীন্দ্রকুমার চৌধুরী।

মন্তব্য।

সময়ের গতি যে দিকেই চালিত হউক না কেন, কালে ধাতু-মুদ্রার ব্যবহার যে উঠিয়া যাইবে, তাহা আমাদের মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না।

ধাতব মুদ্রার ব্যবহার সম্বন্ধীয় অর্থনীতির চাল পাশ্চাত্য জগতে প্রায় চরম সীমায় পঁহুছিয়াছে। সে সমস্ত উন্নত দেশেও খুচরা কারবারের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতু-মুদ্রার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেইজন্য সমস্ত সভ্য দেশেই অল্প মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা ও ব্রঞ্জ মুদ্রা (Small Silver Coins & Bronz Coins) প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশেই যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমাদের প্রাচ্য দেশ সমূহের—ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতির পক্ষে তাহা কতদূর সম্ভব পর, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। মোট কথা এই যে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার সম্বন্ধীয় নীতি (Econony in the use of metalic coins) প্রকৃত প্রস্তাবে তিনটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ কারবারে বিশ্বস্ততা (Bu-iness Confidence), দ্বিতীয়তঃ—প্রচলিত মুদ্রার অবস্থা ও দেশের অবস্থা (Character of monetary and Banking System) তৃতীয়তঃ—ঐ ব্যাঙ্কের কারবার সম্বন্ধে জন সাধারণের অভ্যাস ও প্রকৃতি (Habit and tendency of people utilising that System.)

ব্যাঙ্কের গঠন এবং উন্নতি (formation & development of Banking System) প্রধানতঃ পারিপার্শ্বিক জাতীয় রীতি নীতি এবং রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তারপর ব্যাঙ্কের ব্যবহার (Utilisation of the Banking System), লোকের অভ্যাস এবং প্রকৃতি উপর নির্ভর করে।

ফরাসী দেশের বড় বড় সহর গুলি বাদে প্রায় সর্ব্বত্রই লোক সাধারণতঃ ধাতু মুদ্রা কিম্বা নোট ব্যবহার করিতে পসন্দ করে; কিন্তু ইংলণ্ডের সকল স্থানের লোকেই Book of credit ও cheque ব্যবহারে ফরাসী জাতি অপেক্ষা অধিক অভ্যস্ত। আমাদের দেশে পল্লী গ্রামের লোকে গবর্ণমেণ্টের নোটই নিতে চাহে না; কাজেই লেখক মহাশয় যে হিসাব বই রাখিবার কথা লিখিয়াছেন, আমাদের দেশের মত দেশে খুচরা কারবারে এবং দৈনিক খরচে কোন দিন তাহা চলিবে, এমন আমরা কল্পনা করিতে পারিতেছি না।

সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

৩য় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩২২। { ১২শ সংখ্যা।

বানর তত্ত্ব।

(শারদীয় সংখ্যা সৌরভের জন্য লিখিত।)

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "নাঃ, এ বাড়ীতে আর থাকা হবে না; শীগ্‌গির, যেখানেই হয় আর একটা বাড়ী দেখ।" ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কি হয়েছে?" কুটিল ভ্রূ কুটিলতর করিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, স্বর আরও একটু চড়াইয়া আমার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী কহিলেন, "হবে আবার কি? যেখানে বনের পশুর এত অত্যাচার, সেখানে ভদ্রলোকে বাস্তব্য করে কেমন করিয়া, তাত আমি জানি না। ছেলের হাতে একটু মিষ্টি কিম্বা একটু ফল দিতে পারি না, কোথা হইতে এগুলি এসে তেড়ে মেরে কেড়ে নেয়, আমি ত আর কচি খুকি নই, আমাকেও তেড়ে কামড়াতে আসে, যা সামনে পায়, তাই লুটে খায়; এমন অবস্থায় তুমি থাকিতে পার থাক, আমি ত কিছুতেই থাকিতে রাজী নই।" এই বলিয়া আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র যুগল বিস্তারিত করিয়া, রক্ত গণ্ডের লোহিতাভা দ্বিগুণিত করিয়া, চণ্ডীরূপিণী আমার আরও একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাপার খানা কি, বুঝিতে আমার সময় লাগিল।

অনেক প্রশ্ন তত্বের নথীপত্র ঘাঁটিয়া, গৃহিণীকে অনেক জেরা করিয়া, নিজের স্মৃতিকেও অনেক নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বানরে গৃহিণীর উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছে।—তিনি যখন রান্নাঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভাজা মাছ উল্টাইতে ছিলেন, তখন তাকের উপর যে একটা তরমুজ ছিল, তাহাই নিবার জন্য একটা বানর কয়েকবার দরজা ঠেলিয়া তাড়া খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। এইরূপে কয়েকবার কেল্লা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায়, আর একবার দলবৃদ্ধি করিয়া আক্রমণ করে। কবাট খুলিয়াই এক লাফে গৃহিণীর সামনে পড়িয়া দাঁত খিচুনি দ্বারা তাঁহাকে ত্রস্ত করিয়া তুলে, এবং সেই সুযোগে সঙ্গের বানরটি তাহার লুণ্ঠন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ফেলে। এবং পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ যাওয়ার সময় ছেলের হাতে গিন্নি যে একটী সন্দেশ দিয়াছিলেন, এক থাবড়ে তাহা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া ছেলের দুঃখ ও ভয় চীৎকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা আবার পাদপ বিহারী হইয়া পড়ে।

বিষয়টী সামান্য নয়। আমি হেন ব্যক্তি, স্বয়ং সশরীরে সুস্থ ও সজ্ঞান অবস্থায় গৃহে বর্ত্তমান;—তা সত্বেও দিনে দুপুরে, প্রকাণ্ড লোকালয়ের মধ্যে, সহর কোতোয়ালী হইতে আধমাইলের ভিতরে, আমার পরিবারের উপর আক্রমণ,—আমার দ্রব্য লুট! ইংরেজ রাজত্বে ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই? অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে গবেষণা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে উকীলের পরামর্শ নেওয়াই ঠিক হইল। আমার বাল্যবন্ধু প্রবীণ উকীল সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা একখানা ঠিকাগাড়ী আমাকে নিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুবর অন্য মকেল সেদিনকার মত বিদায় দিয়া আমার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। আমার কথা

যতই উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, বন্ধুর ধূমোদ্‌গিরণের মাত্রা ততই বাড়িতে লাগিল. এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত আস্তে আস্তে একটা অতিকায় কেতাবের দিকে চলিতে লাগিল। আমার বক্তব্য শেষ করিয়া দেখি, সমরেন্দ্র বাবু একেবারে দণ্ডবিধি খুলিয়া ফেলিয়াছেন , এবং তার মসীকৃষ্ণ পত্রগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার অঙ্গুলিগুলি কামিনীকুন্তল দামের ভিতরে চম্পক-কলির মত বিচরণ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিন্তার পর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঠিক জানেন, এ গুর্খা নয়, বানর?" তখন সহরে অনেক গুর্খা বাস করিতেছিল। আমি বলিলাম, শপথ করিয়া বলা আমার পক্ষে একটু কঠিন; কারণ, আমি নিজের চক্ষে দেখি নাই; তবে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বানরই। গুর্খা শব্দের ব্যুৎপত্তি উজ্জ্বল দত্ত কিংবা যাস্ক কেহই দেন নাই; কিন্তু ইহাদের ল্যাজ আছে বলিয়া ইতিহাসে কোথাও লেখা নাই। অথচ যে জন্তুটা এসেছিল, তার ল্যাজের বাড়িটা গিন্নি স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ে সন্দেহ অসম্ভব।"

"হুঁ, তাই ত; বড়ই যে মুস্কিল দেখ্‌ছি!"—আরও কিছু ধূমপান, আরও কিছু অবাক্ চিন্তা, আরও কিছু মুখ ভঙ্গী, আরও কিছু শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিয়া সমরেন্দ্র বলিলেন, 'বড়ই যে মুস্কিল দেখ্‌ছি। বানর যাহা করিয়াছে তাহাতে দণ্ডবিধির বড় ২ কয়টা ধারায়ই উহাকে অভিযুক্ত করা যাইতে পারিত; কিন্তু একটা যে মুস্কিল রয়েছে। দণ্ডবিধি অনুসারে নরেতে নারী আছেন, অর্থাৎ পুরুষ বলিলে মেয়েও বুঝায়, অর্থাৎ যেখানে পুংলিঙ্গ আছে সেখানে স্ত্রীলিঙ্গও আছে, অর্থাৎ, কথাটা বাংলায় ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না। দণ্ডবিধির অনেক জায়গায় কেবল পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সে অপরাধ যদি স্ত্রীজাতির কেহ করে, তাহারও ঐ শাস্তি হইবে। সুতরাং নর হইতে নারী পাই; কিন্তু বানর ত পাই না।"

কৃত কর্ম্ম ও লব্ধ জ্ঞানের সংস্কার লোপ পায় না। আমারও অধীত বিদ্যার সংস্কার জাগিয়া উঠিল; বলিলাম, কেন, ডারুইন যে বলিয়াছেন নর মাত্রেই বানর বংশজাত, তার কি? আর, নরবানর যে একই সমাজের লোক, রামায়ণেও তার প্রমাণ আছে। পূর্ব্ব পশ্চিমের একমত সাক্ষ্য যেখানে বর্ত্তমান, বানর কিছুতেই সেখানে নরের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমাদের সহিত তাদের যে সম্বন্ধ সে ত কেবল দেহের নয়;—আত্মা ও মন, এবং মনের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, সমস্তই ত আমাদের পৈতৃক; আমরা যে কর্ম্ম করিলে শাস্তি পাই, তার প্রবৃত্তিও ত আমরা বানরের নিকট হইতেই পাইয়াছি। আমাদের তাতে শাস্তি হইবে, আর যাদের নিকট হইতে আমরা এই প্রবৃত্তি পাইয়াছি, যারা মূল, তাদের কিছুই হইবে না, এ কেমন আইন? নরের সঙ্গে নারীর যেমন সম্বন্ধ, নরনারী উভয়েরই বানরের সঙ্গে তার চেয়ে নিকট সম্বন্ধ, নর বলিতে নারীও বুঝিব, অথচ বানর বুঝিব না, এ কেমন বুঝিবার প্রণালী?" এত বড় একটা গভীর দার্শনিক বক্তৃতা বার টাকা মাসিক বেতন দিয়া কলেজে যারা পড়ে তাদের ভাগ্যেও কদাচিৎ জুটে। অনর্গল আমি এই বক্তৃতা টা করিয়া ফেলিলাম দেখিয়া উকীল বন্ধু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

"কিন্তু—কিন্তু—আরও যে একটা কথা আছে;—বানরটার বয়স যে সাত বৎসরের নীচে নয়, তা প্রমাণ করিবার মত কোন ঠিকুজি কিংবা অন্য কোন দলীল পাইবেন কি?"—এই খানে আমি ঠেকিলাম এবং বানরের বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। বানরেরা জন্ম মৃত্যু রেজেষ্টরী করে না, ঠিকুজী কোষ্ঠী রাখে না, এবং রাখে না বলিয়াই কোন অপরাধের শাস্তি তারা পায় না। ভারতবর্ষের বাহিরে জন্মিলে অপরাধের মাত্রা কম, শাস্তিও প্রায় হয়ই না; ভারতবর্ষের ভিতরে জন্মিয়াও শাস্তি এড়াইবার নূতন ফন্দী বানরই আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই প্রাধান্যের অনুভূতি ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি আমার এই অপমান ও অপচয়ের কোন প্রতীকার নাই?' "আইনের বর্ত্তমান অবস্থায় ত নয়। তবে, আমার মনে হয় এ বিষয়ে দেশের লোকের চোখ ফুটান দরকার; আইন সভায় এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করার

আবশ্যকতা আমি উপলব্ধি করিতেছি। মানুষ এত সব আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করিতেছে আর, বানর হইতে আত্মরক্ষা করিবে না, এ কেমন কথা? কিন্তু, ভাল, এতক্ষণ আমরা এই বিষয় নিয়া গবেষণা করিতেছি, একটা সহজ উপায় আমাদের মাথায় খেলে নাই; বানর মারিলে মানুষের শাস্তি হয় এমন ত আইনে কোথাও লেখে নাই! বানর কি আপনি কোনরূপে দুই চার টা মারিয়া ফেলিতে পারেন না? তা হইলে ত এরা ভয়ে আর আসিবে না।' উকীলের এই সামান্য বৈষয়িক জ্ঞান নাই দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, "এটাও আপনার জানা নাই যে মানুষে বানর মারিতে পারে না? প্রাচ্যমতে বানর যে দেবাংশে জাত, মানুষের উপাস্য। মনুর মতে ব্রাহ্মণের প্রাণ দণ্ড হইতে পারে না; প্রাচীনদের মতে বানরের ও তাই।' "তা হইলে ত আর উপায় দেখি না। তবে, আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যথা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিবেন, একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া দেখিব, কি হয়।"

সেই অবধি আমি বানর তত্ত্বের গভীর আবর্ত্তে ডুবিয়া আছি। প্রথম ২ মনে করিয়াছিলাম, ইহাকে একটা গভীর দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত করিব, সৃষ্টি রহস্যের কূট সত্য ইহা হইতে উদ্ঘাটন করিব, এবং হয় ত বা চিন্তার চোটে বানরের অস্তিত্বটাই একেবারে লোপ করিয়া দিব। ইহাতে তেমন পরিশ্রমের দরকার দেখি নাই এবং খরচও বিশেষ ছিল না.—কয়েক সের তামাক ও কয়েক পেয়ালা চা খাইতে খাইতে বুঝিয়া ফেলিব, এ জগৎ মিথ্যা,—রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, আমি নাই, গিন্নি নাই, কিছুই নাই;—রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সুতরাং সর্পও নাই, রজ্জুও নাই;—বানর নাই, তার খামচি নাই; কেবল, এত সব 'নাই' একত্র যোগ করিলে যে একটা প্রকাণ্ড আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই আছে। তা হইলে বেশ মজা হইত, শ্রুতিও রচিত 'মজা হি খল্বিদং সর্ব্বং।' কিন্তু একটা দায়ে পড়িয়া সে দিকে চিন্তার গতি চালিত করিতে পারি নাই। কপি নষ্ট করিতে গিয়া কবি হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই; অথচ এরূপ গবেষণায় কবি হইবার সম্ভাবনা সাড়ে ষোল আনা। অধিকন্তু দেশ এখন চিন্তার চেয়ে জ্ঞান চায় বেশী, কাব্যের চেয়ে বস্তুর আদর করে বেশী। তাই আমি প্রত্নতত্ত্বের পন্থা অবলম্বন করিয়াছি।

প্রত্নতত্ত্বে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। আমি যে কত জায়গায় ঘুরিয়াছি, কত নোট লিখিয়াছি, কত পুরাণ সমাধিস্থল খনন করিয়াছি, কত সহরের আবর্জ্জনা ঘাটিয়াছি, কত খেজুর বাগান, আমবাগান, কলাবাগান তন্ন ২ করিয়া খুঁজিয়াছি, সে সমস্ত কহিয়া বাহবা নিতে চাই না; ধার করিয়া বা চুরি করিয়া কত বই যে পড়িয়াছি, তাহা বলিয়া নিজের দারিদ্র্য ঘোষণাও করিতে চাই না। লিখিয়া যে কাগজের দাম বাড়াইয়া দিয়াছি, তাহা বলিয়া ও খেতাব বা সম্মানের প্রত্যাশা করি না; কিন্তু যে নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাই দেশের লোকের নিকট বলিবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে।

বানরের অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, শিরা এ সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মুখস্থ; বানরের বুদ্ধিও তাঁরা জানেন। কিন্তু ধর্ম্ম, জাতি ইত্যাদি বিষয় ভারতবাসীর একান্ত নিজস্ব; এ সমস্ত বিষয়ে আমরা যেমন খোঁজ করিতে পারি, অন্যে তেমন পারে না। কেবল অস্থি মজ্জার ঐক্য হইতে সম্বন্ধ নির্ণয় হয় না; হয় না বলিয়াই আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াও বানর এখনও শাস্তি পায় নাই। আমি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহা দ্বারা নর বানরের সম্বন্ধের নৈকট্য আরও পরিস্ফুট হইবে। সুধীগণ একটু অবধান করিলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বানর বৃন্দাবনের গৌরব কি বাংলার গৌরব কিংবা কাশীর গৌরব, সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবনে বানর মারিলে বৈষ্ণবেরা ফাঁসি দিতে চায়; বাংলায় ফাঁসির ব্যবস্থা কোথাও শুনি নাই, কিন্তু বাংলায়ও বানর-হত্যা প্রায়শ্চিত্তার্হ। বৃন্দাবন ও বাংলার চেয়ে পুণ্যস্থান পৃথিবীতে কোথাও আছে, একথা হেরোডোটাস্ কোথাও লিখেন নাই; সুতরাং প্রমাণিত হইল—শ্রেষ্ঠ নর মাত্রেই বানরের পূজা করিয়া থাকে। আর, ফ্যান্ ফিন্ সিয়াং এর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে আর্য্যবংশীয়েরা পিতৃপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন; সুতরাং বানর পূজার অর্থ পিতৃ তর্পণ।

আর, বানর যে আর্য্যবংশের শুড়া তার আর এক বিশেষ প্রমাণ এই যে বানরদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। কোন কোন দেশবাসীর মধ্যে দেখা যায়, কুকুর তাদের অপত্যস্নেহের অনেকটার অধিকারী; বিশেষতঃ গ্রিনল্যাণ্ডের একখানা নূতন আবিষ্কৃত, অপ্রকাশিত হস্তলিখিত ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় যে তাহাদের সহিত কুকুর রক্তের সম্বন্ধ আছে; সুতরাং কুকুর ম্লেচ্ছ। বানর কুকুরী বিবাহ করে না, সুতরাং বানর আর্য্য।

শ্লোকের নম্বর দেওয়া অনাবশ্যক, যার খেয়াল হয়, খুঁজিয়া নিতে পারেন, কিন্তু রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পাওয়া যায় যে রাম যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে দক্ষিণে গিয়াছিলেন, তখন বানরেরা সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে। এবং বালীর কনিষ্ঠ সহোদর, কিস্কিন্ধ্যার পঞ্চম বানরপতি, তারার দ্বিতীয় পতি, রামের দ্বিতীয় বন্ধু, সুগ্রীব বানরদের প্রথম পোপ্ হন। ইহার পূর্ব্বে বানরদের ধর্ম্ম কি ছিল, সে বিষয়ে অবিসংবাদিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাহারও ২ মতে ইহারা সূর্য্যোপাসক ছিল, কারণ, এখনও দেখা যায়, সূর্য্য উঠিবার আগেই বানরেরা শয্যাত্যাগ করিয়া থাকে; আবার, কাহারও মতে ইহারা বনস্পতির উপাসনা করিত, কারণ, অমরসিংহের মতে, ইহাদের অন্য নাম শাখামৃগ; কিন্তু এ উভয়ের চেয়ে সমীচীন মত এই যে, ইহারা রম্ভার উপাসনা করিত, কারণ ইহাদের পরবংশীয়দের সাহিত্যে 'রম্ভোরু' একটা প্রশংসাবাচক বিশেষণ;– স্বর্গে রম্ভার প্রতিষ্ঠা ইহারাই করিয়াছিল বলিয়া শ্রুতিও আছে।

কিছুকাল পরে, শাক্যমুনির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বানরদের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; তাহার আংশিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়;—ইহাদের সঙ্ঘ আছে, অর্থাৎ ইহারা দলে দলে বিচরণ করে। এবং জৈন ধর্ম্মের মধ্যাহ্ন-কিরণ যখন চারিদিকে ছড়াইতে থাকে, তখন ইহাদেরও মতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়;—সেই অবধি ইহারা দিগম্বর। জিন দত্ত সূরির গ্রন্থেও দেখা যায়,—'শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃ নিঃসঙ্গাঃ জৈন সাধবঃ', এই একটা শ্লোকার্দ্ধ আছে; ইহার কচিৎ পাঠান্তর পাওয়া যায়,—'দিগম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃ বানরা জৈনসাধবঃ।' এই পাঠান্তর হইতে প্রমাণিত হয় যে বানরেরাই জৈনদের মধ্যে সাধু ছিল।

বানরদের ধর্ম্মমতের এই পরিবর্ত্তন কিন্তু স্থায়ী হয় নাই; মূলতঃ ইহারা বৈষ্ণবই থাকিয়া যায়, এখনও ইহারা প্রায়ই নিরামিষাশী, সুতরাং বৈষ্ণব। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবের পর হইতে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার এক বন্ধু স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে ইহারা হংস ডিম্ব কেবল স্পর্শ করে এমন নহে, তাহা ভাঙ্গিয়াও ফেলে; কেবল তাও নয়, ইহারা ঘ্রাণও লয়। 'ঘ্রাণেনার্দ্ধ ভোজনং'— সুতরাং অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল, বানরদের কেহ কেহ আধখান ডিম খায়। যেখানে স্পর্শে জাতিভ্রংশ হয়, সেখানে আধখান খাওয়ায় খ্রীষ্টানত্ব ভিন্ন আর কি বুঝাইতে পারে? ইহারা হংসেতর পক্ষীর ডিম্ব ভক্ষণ করে কি না, আমার বন্ধু সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে রাজী নন;—তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসাও করা যায় না, কারণ, আইনের একটা ধারায় বলে যে, সাক্ষীকে এমন প্রশ্ন করা যায় না, যাহাতে তাহার সুখ্যাতির উপর কলঙ্ক আসিতে পারে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বানরের দেহতত্ত্ব মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন; বানরের জাতি ও ধর্ম্মের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমরা বানর-তত্ত্ব সমাপ্ত করিবার সুযোগ দেখাইয়া দিলাম। এই সমস্ত দ্বারাই নরের সহিত বানরের সাম্য প্রকটিত হইতেছে। কেবল একটী বিষয়ে ইউরোপীয়দের সহিত আমার মতান্তর ঘটিয়াছে;—সেটী হইতেছে, বানরের ল্যাজ সম্বন্ধে। উঁরা বলেন, মাছি তাড়াইবার জন্য ল্যাজ। কিন্তু অতি মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থকার কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন 'নিজ মূর্ত্তি ধরে হনু প্রাচীর উপরে;'—প্রাচীর উপরে হনুমান্ নিজমূর্ত্তি ধরে,—কি প্রকারে? না, ল্যাজের উপর দাঁড়াইয়া! প্রাচীর উপরে ল্যাজ কুণ্ডলীকৃত করিয়া দাঁড়াইলেই সকলে তাহাকে দেখিতে পায়। সুতরাং আমার মতে ল্যাজের সার্থকতা নিজমূর্ত্তি ধরিবার বেলায়। আর একটী বিশেষ প্রমাণ আমার মতের পোষকতা করে;—আমরা নরেরাও

ল্যাজের উপর ভর না দিয়া ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারি না,—নিজের মূর্ত্তি দেখাইতে পারি না। আমাদের বেলায় ল্যাজ বিবিধ, যথা, জাতি, বংশ, খেতাব ইত্যাদি। নামের পিছনে যাহার ল্যাজ যত বড়, সে তত বড় হনুমান। আর এই যে আমি অন্য সব কাজ ফেলিয়া বানর তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছি, সেও ত একটা ল্যাজের জন্য। আমাকে যদি কোন সুধীমণ্ডলী তাঁহাদের পরিষদের সভ্য করিয়া নেন, তবেই আমার ভর দিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিবার মত একটী ল্যাজ হইবে!

তবে, নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করাই আমার গুরুর উপদেশ। আমার কামনা থাকে কার্য্যের পিছনে অর্থাৎ মূলে, সাম্‌নে অর্থাৎ লোক-বুদ্ধির-গোচরে নয়। আমি যে সত্যের আহ্বানে এত পরিশ্রম করিয়াছি, এত স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছি, আজ সাধারণের উপকারার্থ নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তাহা লোকে প্রচার করিলাম। নর ও বানরে কোন প্রভেদ নাই—এই আমার চরম সিদ্ধান্ত। আশা রহিল, অদূর ভবিষ্যতে বানর আইনের আমলে আসিবে, নর বলিলে বানর বানরীকেও বুঝাইবে। আমার বিনীত নিবেদন, ভবিষ্যৎ বিচারকেরা যেন অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখেন যে আমিই এই তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা; আর, আমার মোকদ্দমাটী যেন তামাদি দোষে বারিত না হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রহস্য-ভেদ।

(গল্প)

(১)

সিমনের না ছিল জমা জমি, না ছিল নিজের থাক্‌বার একখানি ঘর। সে থাকৃত এক কৃষকের বাড়ীতে। জাতে ছিল মুচি। জুতা তৈয়ার ও মেরামত করিয়া যা' তা'র আয় হইত, তা'তে কোন মতে পরিবারের খরচ চলিয়া যাইত। সেবার যেমন রুটির দাম বাড়িল, মজুরীও তেমনি সস্তা হইল। এই দুই কারণে তাহার অতি কষ্টে দিন যাইতে লাগিল। শীত ও পড়িল বেজায়! ওদের স্বামী-স্ত্রী দুই জনের মধ্যে একটী মাত্র পশমি জামা ছিল। তা'ও জীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সিমন্ মনে করিল, এবার ভেড়ার ছালের একটা কুর্ত্তা কিনিতে হইবে। শীতের আগে কিছু অর্থ হাতে আসিয়াছিল আর পাড়ার কয়েকজন কৃষকের নিকট কিছু পাওনা ও ছিল; এতে একটা ভেড়ার ছালের কুর্ত্তা কোন রকমে হয়।

হাতে যা' ছিল তা'ই নিয়া একদিন সিমন্ তাগাদায় বাহির হইল। প্রথমে এক কৃষকের বাড়ীতে গেল, সে ঘরে নাই। তাহার স্ত্রী বলিল—"আগামী সপ্তাহে আমার স্বামীকে পাঠাইয়া দেনা চুকাইয়া দিব।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বাড়ীতে পাইল কিন্তু সে শপথ করিয়া কহিল—তাহার হাত শূন্য। সে কেবল জুতা মেরামতের জন্য কুড়ি 'কপেক'* দিল। তখন সিমন্ মনে ভাবিল জামা ধারেই কিনিব। কিন্তু দোকানদার ধারে জামা দিল না।

সিমন্ মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইল। খুচ্‌রা যা কিছু পাইয়াছিল, তা দিয়া সে মদ খাইয়া ফেলিল। তারপর এক হাতে এক জোরা বুট্ ঝুলাইয়া আর একহাতে লাঠি দিয়া রাস্তার জমাট বরফের টুকরা গুলি টুকতে টুকতে বাড়ীর দিকে চলিল। মনে ভাবিল, "বাঃ শরীরটা ত বেশ গরম হইয়াছে, আর জামার দরকার কি? আর কিসের চিন্তা? জামা কিন্‌বই না! তবে ঘরে গেলে বুড়ী খুব চট্‌বে। বল্‌বে কিনা, তুমি ওদের জন্য কাজ কর আর ওরা তোমার মজুরী না দিয়া নাকে ধরিয়া ঘুরায়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মুচি বাড়ীর দিকে চলিল।

কতদূর গিয়া পথের ধারে একটা গিরজার কাছে দপ্‌ দপে সাদা একটা কি তার চখে পড়িল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সিমন্ খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল, কিন্তু বুঝিতে পারিল না। "এমন সাদা পাথর এখানে থাক্‌বার ত কোন কথা নাই! তবে কি এটা একটা গরু! তা ও নয়। মানুষের মাথার মত যেন দেখা

* রুষদেশীয় মুদ্রা, এক কপেক্ প্রায় এক পয়সা।

যায়! মানুষ এ সময়ে এখানে আসিবে কেন?" সে আরও নিকটে গিয়া দেখিল, সত্যই একটা মানুষ বসিয়া আছে। লোকটা উলঙ্গ! গিরজার প্রাচীরে হেলান্ দিয়া আছে। জীবিত কি মৃত বুঝিবার সাধ্য নাই। সিমন্ ভাবিল বোধ হয় লোকটাকে খুন করিয়া উহার যথা সর্ব্বস্ব কেহ আত্মসাৎ করিয়াছে। এখানে থাকিয়া প্রয়োজন নাই, কোন্ বিপদে পড়ি। সে গিরজাটা ছাড়াইয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি হাটিয়া চলিল। কতদূর গিয়া আবার পিছনে ফিরিল। সিমনের বোধ হইল ঐ লোকটা যেন তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে। তখন তাহার মনে ভয় হইল। এই লোকটা যদি গলা চাপিয়া ধরে তবেই ত কর্ম্ম শেষ। সে খুব দ্রুতবেগে ছুটিল। যখন গিরজা হইতে কিছু দূরে আসিল তখন তাহার হৃদয় মধ্যে কে যেন তাহাকে বলিল—"সিমন্ তোমার সম্মুখে একটা বিপদগ্রস্ত লোক যন্ত্রণায় মারা যায়, আর তুমি অনায়াসে তাহাকে ফেলিয়া যাইতেছ? তুমি কি বড় ধনী হইয়াছ যে তোমার ধনরত্ন এ ব্যক্তি কাড়িয়া লইবে আশঙ্কায় তুমি পালাইতেছ? ফির, সিমন্ ফির।

(২)

সিমন্ সেই লোকটার নিকটে গেল। তাহার শরীর খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, গায় কোন জখম নাই। কিন্তু শীতে ও ভয়ে সে মৃতপ্রায় হইয়াছে। সিমন্ নিকটে গেলে সে চোক্ তুলিয়া চাহিল। যেন সে সহসা ঘুম হইতে জাগিয়াছে।

লোকটার করুণ দৃষ্টিতে সিমনের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সে হস্তস্থিত জুতা জোড়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের জামাটা খুলিল এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি হইয়াছে বলিতে পার?" যখন কোনই উত্তর পাইলনা, তখন বলিল —"আচ্ছা থাক্। এই জামাটা তোমার গায় দাও।" সিমন্ তাহাকে দুই হাত ধরিয়া তুলিল। লোকটা যুবক, বেশ সুন্দর শরীরের গঠন; মুখখানি অতিশয় কোমলতা মাখা। সিমন্ জামাটা তাহার গায় ফেলিয়া দিল কিন্তু তবু সে পরিতে পারিলনা। তখন সিমনই পরাইয়া দিল। সিমন্ নিজের মাথার টুপিটা ও তাহার মাথায় দিবে বলিয়া খুলিয়াছিল তারপর ভাবিল যুবকের মাথায় প্রচুর লম্বা চুল আছে কিন্তু তাহার মাথা কেশশূন্য—শীতও বেশ পড়িয়াছে; তাই টুপিটা আবার নিজেই পরিল। কিন্তু বুট জোড়া খুলিয়া যুবককে পরাইয়া দিল। এবং সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে কহিল—

"ভাই, এখন চল। শীঘ্রই তুমি সুস্থ হইতে পারিবে। হাটিয়া যাইতে পারবে কি?" যুবকটী উঠিল। কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারিল না।

"উত্তর দাও না কেন? এই খোলা যায়গায় এই শীতের রাত্রি কাটান অসম্ভব। তোমাকে কোন স্থানে আশ্রয় নিতেই হইবে। এই নেও, আমার লাঠিতে ভর করিয়া কোন রকমে চল।"

যুবক সিমনের সহিত অনায়াসে হাটিয়া চলিল।

সিমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

"আমি এদেশের লোক নই।"

"তাইত, এখানের অধিকাংশ লোকই আমার পরিচিত। আচ্ছা, কি করিয়া তুমি গিরজার কাছে আসিলে?

"এই কথা আমি বলিব না!"

"কেহ কি তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে?"

"না, ভাই ভগবানই আমাকে শাস্তি দিয়াছেন।"

"ভগবানই সকলের কর্ত্তা তাতে আর ভুল কি? তুমি কোথায় যাইবে?"

"আমার পক্ষে সকল স্থানই সমান।"

সিমন্ অতিশয় বিস্মিত হইল! লোকটা চেহারায় বেশ ভাল বলিয়াই বোধ হয়, কথাবার্ত্তাও বেশ কোমল, তবে এমন ভাবে সে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে কেন? "থাক্, মানুষের অজানা কত বিষয়ই আছে।"

সিমন্ বলিল—'এস ভাই, আমার ঘরে, একটু বিশ্রাম করিয়া যাও।'

উভয়ে পথ চলিল। তখন প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। সিমন্ অনাবৃত দেহে শীতে কাঁপিতে ও হাঁচিতে লাগিল। সে মনে ভাবিল "মেষের চামড়ার গরম কুর্ত্তা কিনিব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম, যে জামাটী ছিল সেইটাও গেল; তার উপর একটা উলঙ্গ অপরিচিত লোককে নিয়া ঘরে ফিরিতেছি। মেট্রিনা আজ আমাকে

যোগ্য পুরস্কারই দিবে!" মেট্রিনা সিমনের পত্নী!

মেট্রিনার কথা মনে হইতেই তাহার মাথা ঘুরিল। কিন্তু যখন অসহায় বিপন্ন ব্যক্তির মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল এবং কিরূপ করুণভাবে সে তাহার দিকে তাকাইয়াছিল স্মরণ হইল, তখন হৃদয়ে আবার সাহস আসিল।

(৩)

মেট্রিনা স্বামীর জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনেকটা সময় উত্তীর্ণ হইল, তবু সিমন্ প্রত্যাগমন করিল না। তখন মেট্রিনা স্বামীর একটা জীর্ণ জামায় 'তালি' দিতে বসিয়া গেল। সেলাই দিতে দিতে তাহার মনে হইতেছিল কেবল সিমনের কথা। "সিমন্ বুড়া মানুষ। তাহাতে সে অতিশয় সরল। দোকানদার ত তাহাকে ঠকাইয়া দিবে না? ফাঁকি কাহাকে বলে সিমন্ তাহা জানে না। এক জন ছেলে মানুষও ইচ্ছা করিলে তাহাকে ঠকাইতে পারে। আটটা রোবল * তাহার সঙ্গে। এতে একটা চলন সই জামা হইতে পারে। এখনও তার না আসবার কারণ কি? পথ হারাইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।"

মেট্রিনা যখন ঐরূপ ভাবিতেছিল, তখন সিঁড়িতে পদধ্বনি শ্রুত হইল। সে তখন সূঁচটী জামায় গাথিয়া রাখিয়া দরজার নিকট গেল। গিয়া দেখিল সিমন্ ও একজন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিতেছে। সিমনের গায় জামা নাই। কুর্ত্তা ও কিনিয়া আনে নাই! সিমন নীরব। মেট্রিনা লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিল তাহার স্বামী সমস্ত অর্থ মদ খাইয়া উড়াইয়া আসিয়াছে। একটা মাতালকে আবার সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিয়াছে। আগন্তুককে মাতাল বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহার মাথায় টুপি নাই, গায় যে জামা তাহাও সিমনের; সে চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেন ভয়ে আড়ষ্ট। লোকটা ভাল হইলে এরূপ শঙ্কিত হইবার কথা কি? ক্রোধে মেট্রিনার আপাদ মস্তক জলিতেছিল। সে রাগে গড়্গড়্ করিতে করিতে উনুনের নিকট গিয়া বসিল এবং সেখান হইতে উহারা কি করে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সিমন্ নিরুদ্বেগ চিত্তে একখানি বেঞ্চের উপর বসিল, যেন কিছুই হয় নাই। তারপর মেট্রিনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আমাদের খাবার দাও।" মেট্রিনা হুকুম শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইল। সে একবার স্বামীর প্রতি এবং একবার আগন্তুকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপার খানা বুঝিতে সিমনের অধিক সময় লাগিল না। কিন্তু তবুও সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই এরূপ ভান্ করিল। যুবকের হাত ধরিয়া কহিল—'এই খানে ভাই বস, এখন কিছু খেতে হবে। ওগো, আমাদের খাবার দাও।'

মেট্রিনার ক্রোধ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। সে কহিল "তুমিত মদই খাইয়াছ আর খাবে কি? গেলে জামা কিনিতে গায়ের পুরাণ জামাটাও খোয়াইয়া আসিলে, তারপর সঙ্গে করে আনিলে এক উলঙ্গ বদমাইসকে। একজোড়া মাতালের উপযোগী খাদ্য আমি প্রস্তুত করি নাই।"

মেট্রিনা তুমি অকারণ গালাগালি করিতেছ। এ কিরূপ লোক আগে জানিয়া পরে তোমার বলা উচিত ছিল।"

"তুমিই আগে বল, রোব্ল্ গুলি কি করিয়াছ।"

সিমন্ রোব্ল্ গুলি খুলিয়া স্ত্রীর সম্মুখে রাখিল। এই তোমার রোব্ল্ নেও। কাহারও নিকট হইতে পাওনা আদায় করিতে পারি নাই।"

মেট্রিনা বুঝিল, সিমন্ তাহার জন্য জামা আনে নাই। অধিকন্তু পুরাতন জামাটী এক মাতালকে দিয়া আগ্রহ করিয়া তাহাকে আবার বাড়ী আনিয়াছে। মেট্রিনা রোব্ল্গুলি ক্ষিপ্র হস্তে তুলিয়া লইয়া উগ্র স্বরে কহিল—"আমার নিকট তুমি খাবার টাবার কিছু পাবে না। রাস্তা থেকে তুমি খুজে খুজে সব মাতাল ধরে আন।"

"মেট্রিনা, তোমার মুখ বন্ধ কর।"

"মাতালের নিকট আবার উপদেশ নিব! এইজন্যই তোমার সহিত বিবাহে প্রথম হইতেই আমার আপত্তি ছিল! আমার মা যত জামা জ্যাকেট্ দিয়াছিলেন, সব তুমি মদ খাইয়া উড়াইয়াছ। জামা কিনিতে গেলে, হাতে যা ছিল শুড়ীর দোকানে রাখিয়া আসিলে।"

* এক রোবল্ এক টাকার কিছু বেশী।

আগন্তুক ব্যক্তিকে কিরূপ বিপন্ন অবস্থায় পাইয়া গৃহে আনিয়াছে এবং সে যে অতি সামান্য অর্থই মদ খাইয়া নষ্ট করিয়াছে ইত্যাদি কথা সিমন্ খুলিয়া বলিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু মেট্রিনা তাহাকে সে সুযোগ দিতেছিল না। মেট্রিনা দশ বছরের পুরাণ কথা তুলিয়া স্বামীর উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। এখানেই ব্যাপার শেষ হইল না। সিমন্ মেট্রিনার একটা জামা গায় দিয়াছিল, মেট্রিনা সেইটা কাড়িয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল।

(৪)

মেট্রিনা ঐ আগন্তুক যুবকটীর কথা মনে মনে ভাবিতেছিল আর তাহার অন্তরে প্রবল ক্রোধের বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। সে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"যদি এ ভাল লোকই হবে তবে আর সে এমন লাংটা থাক্‌ত না। অন্ততঃ গায় একটা জামা থাক্‌ত। ভিতরে কোন গুপ্ত রহস্য আছে, নতুবা তুমি অবশ্যই সব কথা খুলিয়া বলিতে।"

"তবে বলি শুন—আমি যখন সন্ধ্যার সময় গিরজার কাছ দিয়া আসি, তখন এই লোকটা উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে দেখিলাম। আমি কি তাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে পারি? ভগবান্ আমাকে সেখানে না নিলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইত। আমি তাহাকে তুলিয়া আমার গায়ের জামাটা পরাইয়া দিলাম। তারপর বাড়ী নিয়া আসিয়াছি। এখন ত জান্‌লে, তবে একটু স্থির হও। অকারণ কাহাকেও গালি দেওয়া দোষ। আমাদেরও একদিন মর্‌তে হবে।"

মেট্রিনা গালি দিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু অপরিচিত যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নীরব হইল। যুবক প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল, একখানি বেঞ্চের কোণে উপবিষ্ট, তাহার বাহুদ্বয় উরুতে ন্যস্ত, মস্তক বক্ষে আনত, নয়নযুগল মুদ্রিত, বদন মণ্ডল বেদনা ব্যঞ্জক।

'মেট্রিনা, এক বিন্দু দয়াও তোমার প্রাণে ঈশ্বর দেন নাই?'

মেট্রিনা আবার যুবকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, এবার যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার শুষ্ক হৃদয়ে করুণার উৎস প্রবাহিত হইল। সে উঠিয়া উনুনের নিকট গেল এবং তাড়াতাড়ি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিল। যে কয়েকখানা রুটির টুক্‌রা ছিল, সকলই টেবিলের উপর আনিয়া রাখিল, একটা পাত্রে কিছু মদও ঢালিল। তারপর একখানি ছুরী ও দুইটী চাম্‌চে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া মেট্রিনা যুবককে কহিল—

"আপনি কিছু খান্।"

সিমন্ আগন্তুককে ডাকিল—এস, কাছে এসে বস।

উভয়ে আহার করিতে আরম্ভ করিল। মেট্রিনা টেবিলের এক কোণে বসিয়া নিবিষ্টভাবে যুবককে লক্ষ্য করিতেছিল। আগন্তুকের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণে তখন যথার্থই দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। হৃদয়ে যেন সে কি একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। যুবকও তখন বেশ প্রফুল্ল হইল, তাহার বদন মণ্ডল হইতে বিষাদ কালিমা দূরীভূত হইল। সে নয়নযুগল তুলিয়া একবার মেট্রিনার মুখপানে চাহিল; তাহার অধর প্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

আহার শেষ হইলে মেট্রিনা তাড়াতাড়ি পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়া যুবকের নিকট আসিয়া বসিল এবং কৌতুহলোদ্দীপ্ত চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি কোথা হইতে আসিলেন?"

"আমি এ জায়গার লোক নই।"

"তবে এ পথে কোথায় যাইতেছিলেন?"

"আমি বলিতে পারি না।"

"আপনি কি দস্যুর হাতে পড়িয়াছিলেন?"

"ঈশ্বরই আমায় শাস্তি দিয়াছেন।"

"এইরূপ উলঙ্গ অবস্থায়ই আপনি পথের ধারে পড়িয়াছিলেন?"

"হাঁ, হিমে আমার রক্ত জমিয়া যাইতেছিল, সিমন্ আমাকে ঐ অবস্থায় পাইয়া নিজের গায়ের জামাটা খুলিয়া দিল, আর দয়া করিয়া বাড়ী নিয়া আসিল। বাড়ী আসিলে আপনিও কত যত্ন করিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন। ভগবান্ আপনার দয়ার পুরস্কার দিবেন।"

মেট্রিনা উঠিয়া আল্না হইতে তাহার স্বামীর রিপু করা জামাটী আনিয়া যুবককে দিল, তারপর খুজিয়া এক জোড়া মোজাও আনিয়া হাজির করিল।

"এই জামা ও মোজা পরিয়া এখন আপনি ঘুমান। এই বেঞ্চের উপরে অথবা 'ষ্টোভের' নিকটে যেখানে ইচ্ছা আপনি শুইতে পারেন।"

যুবক জামা ও মোজা পরিয়া বেঞ্চের উপর শয়ন করিল। মেট্রিনা প্রদীপটী নিবাইয়া নিজ কক্ষে গমন করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা হইল না। অপরিচিত যুবকের কথা তাহার বারংবার স্মরণ হইতে লাগিল। যুবক রুটির টুকরাগুলি সব খাইয়া ফেলিয়াছে, কালের জন্য আর কিছুই নাই। তারপর এক জোড়া মোজা ও একটা সার্ট তাহাকে দেওয়া হইয়াছে! মেট্রিনা এই সকল কথা ভাবিয়া একটু ক্ষুব্ধ হইল। তখন যুবকের স্বর্গীয় হাসিটুক তাহার মনে পড়িল। কঠিন হৃদয় যেন আবার দয়ায় সিক্ত হইল।

মেট্রিনা ডাকিল—'সিমন্'!

'কেন?'

"আমাদের রুটি একবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। রুটি আর তৈয়ারও করি নাই। কালের উপায় কি? আমাদের প্রতিবেশিনী 'মেলিনার' নিকট হইতে রুটি ধার করিতে হইবে।"

"বেশ ত, তবে আর চিন্তা কি?"

মেট্রিনা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার বলিল—"লোকটি ভাল বলিয়াই বোধ হয়, ত্বে কি জন্য সে আত্ম গোপন করিতেছে?"

"বোধ হয় কোন উদ্দেশ্য আছে।"

"কি উদ্দেশ্য হইতে পারে?"

"থাক এখন।"

"আমাদের যাহা ছিল আমরা ত দিয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে কেহ কিছু দেয় না কেন?"

সিমন্ এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাইতেছিল না। সে বলিল—"এখন চুপ কর।" সিমন নিদ্রা গেল।

(৫)

সকাল বেলা সিমন্ ঘুম হইতে উঠিল। ছেলেপিলে জাগিবার পূর্ব্বেই মেট্রিনা প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে রুটি ধার করিবার জন্য গেল। আগন্তকটী পুরাতন মোজা ও জামা পরিয়া 'বেঞ্চের' উপর উপবিষ্ট হইল। যুবকের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে। তাহার বদন-মণ্ডল প্রভাতে অধিকতর প্রফুল্ল ও উজ্জলতর বোধ হইতে লাগিল।

সিমন্ বলিল—"দেখ ভাই, ক্ষুধা দূর করিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং শরীরের আবরণের জন্য বস্ত্রেরও আবশ্যক। না খাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। তুমি কি কাজ জান?"

"আমি কোন কাজই জানি না!"

সিমন্ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কহিল—"ইচ্ছা থাকিলে মানুষ যে কোন কাজ শিখিতে পারে।"

"সকলেই কাজ করে, আমিও করিব।"

"তোমার নাম কি?"

"মাইকেল।"

"আচ্ছা, মাইকেল, তুমি ত নিজের কথা কিছুই বলিবে না। সে যাক। কিন্তু তোমার খাওয়ার আবশ্যক হইবে ত? আমার কথা মত কাজ কর, আমি তোমাকে খাইতে দিব।"

"বেশ কথা, কি কাজ করিতে হইবে বল, আমি শিখিব।"

কিরূপে সূতা কাটিতে হয়, চাম্‌রা কাটিয়া টুকরাগুলি সেলাই দিতে হয় এবং উহাদিগকে চাপা দিয়া সোজা করিতে হয় ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষা মাইকেল সিমনের নিকট অতি সহজেই আয়ত্ত করিল। তারপর যাহা সিমন্ দেখাইল সকলই যুবক অতি সহজে অভ্যাস করিয়া লইল। তিন দিন পর মাইকেল এমন নিপুণ হইল যে লোকে কাজ দেখিয়া বুঝিত সে আজীবন এই ব্যবসাই করিতেছে। তাহার কাজে কোন দিন ভুল হইত না। সে অকারণ একটী কথাও বলিত না; কখনও রাস্তায় বাহির হইত না। সে হাস্য করিত না, কাহাকে ব্যঙ্গও করিত না!

(৬)

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল। মাইকেল সিমনের বাড়ীতেই আছে। ব্যবসায় তাহার

বেশ যশঃ হইল। সকলই বলিতে লাগিল মাইকেলের মত এমন সুন্দর ও 'মজবুৎ' জুতা আর কেহ তৈয়ার করিতে পারেনা। সিমনের 'খরিদ্দার' দিন দিনই বাড়িতে লাগিল।

শীতকালে একদিন সিমন্ ও মাইকেল কাজ করিতেছে, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড গাড়ী আসিয়া কুটিরের দ্বারে থামিল। একটী বালক গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, গরম 'ওভারকোট' আবৃত একজন ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিয়া সিমনের গৃহে প্রবেশ করিল। লোকটী কিছু অসাধারণ। তাহার উন্নত মস্তক কুটিরের প্রায় ছাত স্পর্শ করিল, বিরাট বপু গৃহের প্রায় এক চতুর্থস্থান অধিকার করিয়া লইল। সিমন্ এই বৃষস্কন্ধ অতিকায় ব্যক্তিকে নিজ গৃহে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! এই শ্রেণীর লোক পূর্ব্বে কখনও তাহার কুটিরে পদার্পণ করে নাই। সে আনত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ভদ্রলোকটী বেঞ্চে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দোকানের মালীক কে?"

সিমন্ অগ্রসর হইয়া কহিল—"আমি, হুজুর।"

লোকটী সঙ্গীয় বালককে ডাকিয়া কহিল—"ফেড্কা, চাম্ড়াগুলি এখানে আন।"

বালকটী চামড়ার বস্তাটী আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

"খোল"; বালক খুলিল।

"এই চামড়া দেখ্ছ ত?"

"হাঁ! হুজুর।"

"এইগুলি কেমন বল্তে পার?"

সিমন্ একটা চাম্ড়া হাতে স্পর্শ করিয়া কহিল—"বেশ ভাল।"

"ভাল! মূর্খ! জীবনে তুমি কখন এরূপ চাম্ড়া দেখ নাই। এ আমি জর্ম্মানী হইতে কুড়ি রব্ল্ দিয়া কিনিয়াছি।"

সিমন্ অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"এই জিনিষ আমরা কোথায় দেখিব?"

"ঠিক কথা; এই চামড়া দিয়া আমার এক জোড়া 'বুট' তৈয়ার করিয়া দিতে পারবে?

"পারি হুজুর।"

"পার? সত্যি পার? ভাল করিয়া বুঝিয়া বল। চামড়াটা দেখ্ছ ত? আমার জুতা এক বছর টেকা চাই। চাম্ড়া কোঁকড়াইতে পারিবেনা, পঁচ্‌কেও না। বুঝে শুনে চাম্ড়া কাট্‌বে। আমি আগেই সাবধান করিয়া দিতেছি। যদি জুতা এক বছরের আগে ছিঁড়িয়া যায়, কি চামড়া কোঁকড়ায় তাহা হইলে তোমাকে জেলে দিব। তা' না হইলে তোমাকে দশ রব্ল মজুরী দিব।"

সিমন্ ভীত হইল। সে কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া মাইকেলের মুখের দিকে তাকাইল—"কি বল ভাই?"

মাইকেল সাহস দিয়া কহিল—"কাজটা কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়।"

সিমন্ স্বীকার করিল। ভদ্রলোক তাহার সঙ্গীয় বালকটীকে ডাকিয়া বাঁ'পা'র জুতাটা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তারপর পা টা উচু করিয়া ধরিয়া মাপ লইতে কহিলেন। সিমন্ দুই টুকরা কাগজ সিলাই করিয়া লইল, হাটু গাড়িয়া বসিল; ময়লা লাগিয়া পাছে ভদ্র লোকের মোজা নষ্ট হয় এই ভয়ে হাত দুইটী কাপড়ে ভাল করিয়া মুছিল। তারপর সুন্দররূপে মাপ লইল।

ততক্ষণ ভদ্র লোকটী কুটিরের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সহসা মাইকেলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটী কে?

সিমন কহিল—"আমার সহকারী; এ ব্যক্তিই জুতা সেলাই করিবে।"

ভদ্র লোকটী মাইকেলকে কহিল—"দেখ বাপু, জুতা জোড়টা একটু সাবধানে সিলাই করিও এক বছর টেকা চাই।"

সিমন্ মাইকেলের দিকে তাকাইল। তাহার চক্ষু ভদ্র লোকটীর উপরে নহে। সে আগন্তুকের পশ্চাতে গৃহকোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ উজ্জ্বল, অধরে হাসির রেখা। ভদ্রলোকটী তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইল এবং রুক্ষস্বরে কহিল:—"হতভাগা! হা করে আমায়

দাঁত দেখাইতেছিস্! কাজটী যাতে ঠিক সময়ে হয় আগে সেই চিন্তা কর।"

মাইকেল—"কোন চিন্তা নাই। যখন দরকার হইবে তখনই পাইবেন।"

৭

সিমন্ কহিল—মাইকেল, কাজ ত রাখলে, কিন্তু কোন বিপদে না জানি শেষটায় পড়ি! চামড়া গুলি খুব দামী আর ঐ লোকটা ও দেখলাম বড় কড়া। দৈবাৎ যদি ভুল হইয়া যায় তবেইত মুস্কিল। দেখ ভাই তোমার দৃষ্টি শক্তি আমার চেয়ে ভাল আর তোমার হাত ও বেশ পরিষ্কার তুমিই চামড়া কাট; আমি বুতামের ঘর সিলাই করিয়া দিব।

মাইকেল তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। সে চামড়া গুলি খুলিয়া টেবিলের উপর ফেলিল, দুই ভাঁজ করিল তারপর কাটিতে আরম্ভ করিল। মেট্রিনা দেখিল মাইকেল চামড়া গুলি গোল করিয়া কাটিতেছে। মেট্রিনা সিমন্ কে প্রায়ই জুতার চামড়া কাটিতে দেখে কিন্তু সে কখনও এরূপ ভাবে কাটে না। মেট্রিনা ভাবিল বড় লোকের জুতার চামড়া বুঝি এরূপ করিয়াই কাটিতে হয়। সে প্রতিবাদ করিল না। তারপর মাইকেল জুতা সেলাই করিতে আরম্ভ করিল। সেলাইর নমুনা দেখিয়াও মেট্রিনা বিস্মিত হইল। কিন্তু তবু সে কিছু কহিল না। সন্ধ্যার সময় সিমন্ উঠিয়া দেখিল মাইকেল এক জোড়া "বছোবিকি" (Bosoviki) * প্রস্তুত করিয়াছে। সিমনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "মাইকেল একবৎসর যাবৎ কাজ করিতেছে, কোন দিন তাহার ভুল হয় না, আজ সে এমন গুরুতর ভুল করিল! ভদ্রলোকটীকে আমি কি বলিব? এই চামড়া ও এখানে পাওয়া অসম্ভব।"

সিমন্ মাইকেলকে কহিল "ভাই তুমি এইটা কি করিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! ভদ্রলোকটী 'বুটের' ফরমাইস্ দিয়াছেন আর তুমি তৈয়ার করিতেছ কি!"

যখন সিমন্ মাইকেলকে তিরস্কার করিতেছিল ঠিক তখনই দরজায় আঘাতের শব্দ শোনা গেল। তাহারা জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল একব্যক্তি অশ্বহইতে অবতরণ করিয়া দরজার নিকট অপেক্ষা করিতেছে। দরজা খুলিয়া দিলে একটী বালক গৃহে প্রবেশ করিল। এই বালকটীই ভদ্রলোকটীর সহিত-আসিয়াছিল।

বালক কহিল—'আমার কর্ত্রী জুতার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।'

সিমন্—'বুটের' জন্য?

বা—বুটের আর প্রয়োজন নাই। আমার মুনিবের মৃত্যু হইয়াছে।

সি—তিনি যে অল্পক্ষণ হইল তোমার সঙ্গে গেলেন!

বা— বাড়ী পর্য্যন্ত ও পঁহুছিতে পারেন নাই। গাড়ীতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। গাড়ী যখন দরজায় গিয়া থামিল তখন তাহাকে নামিবার সাহায্য করিতে গিয়া দেখি তাহার শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আমার কর্ত্রী বলিয়া পাঠাইয়াছেন আর বুটের দরকার নাই। মৃত ব্যক্তির জন্য এক জোড়া "বছোবিকি" তৈয়ার করিতে হইবে। আমি এখানে অপেক্ষা করিয়া ঐ জুতা লইয়া যাইব।"

মাইকেল ইহার মধ্যে মৃতের জুতা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। সে ভাল করিয়া জুতা জোড়া বুরুশ করিয়া বালকের হাতে দিল। বালক ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিল।

৮

একটী একটী করিয়া ক্রমে ছয় বছর অতীত হইয়া গেল। মাইকেল সিমনের গৃহেই আছে। তাহার চলাফেরার কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সে ঘর হইতে কোন দিন বাহির হয় না। কোন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ ও করে নাই। আর ছয় বছরের মধ্যে দুইবার তাহার মুখে হাসি দেখা গিয়াছে। যখন প্রথম দিন সিমনের স্ত্রী তাহাকে আহার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল তখন সে একবার হাসিয়াছিল আর বুটের জন্য যে ভদ্র লোকটী আসিয়াছিল তাহাকে দেখিয়া দ্বিতীয় বার তাহার মুখে হাসি দেখাদিয়াছিল। মাইকেল

* মৃত ব্যক্তিকে সমাধির পূর্ব্বে এই জুতা পরাণ হয়।

পাছে চলিয়া যায় এই ভয়ে সিমন্ আর তাহাকে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

সে দিন ছেলেপিলেরা খেলা করিতেছে, মেট্রিনা 'ষ্টোভে একটা লোহার পাত্র চড়াইয়াছে, সিমন্ একটা জানালার পাশে বসিয়া জুতা সেলাই কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে আর মাইকেল অপর জানালার কাছে বসিয়া একটা বুটের তলায় হাতুড়ি মারিতেছে। সিমনের একটী ছেলে বেঞ্চে বসিয়া মাইকেলের কাঁদে ভরদিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কাকা, এক সদাগরের স্ত্রী দুইটী মেয়ে নিয়া আমাদের বাড়ী আসিতেছে। একটী মেয়ে খোঁড়া।" এই কথা বলিতেই মাইকেল্ তাড়াতাড়ি কাজ ফেলিয়া উঠিল এবং জানালা দিয়া রাস্তায় দৃষ্টিপাত করিল। সিমন্ মাইকেলকে বাহিরের দিকে তাকাইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। এ পর্য্যন্ত কোন দিন মাইকেল জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই! সিমন্ ও বাহিরে চাহিয়া দেখিল, একটী স্ত্রীলোক তাহার দরজার দিকে আসিতেছে। স্ত্রীলোকটীর পোষাক অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে দুই হাতে দুইটী বালিকার হাত ধরিয়া আসিতেছে। মেয়ে দুইটীর গায় পশমী জামা, মাথাটী এক একখানি রুমালে আবৃত। মেয়ে দুইটীর চেহারা সর্ব্বাংশে এক প্রকার। কেবল একটী মেয়ে একটু খোঁড়া।

মেয়ে দুইটীকে নিয়া স্ত্রী লোকটী গৃহে প্রবেশ করিল এবং গৃহ স্বামীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল—"আপনারা আমার মেয়ে দুইটীর জন্য গরম দিনের উপযোগী জুতা তৈয়ার করিয়া দিতে পারিবেন?"

সি—"আমরা সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জুতা তৈয়ার করি না। তবে তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। ছোট জুতা প্রস্তুত করিতে মাইকেল একজন 'ওস্তাদ। সিমন্ ফিরিয়া দেখিল, মাইকেল কাজ রাখিয়া মেয়ে দুইটীর দিকে এক ধ্যানে তাকাইয়া আছে। তাহার নয়ন—যুগল যেন সে আর ফিরাইতে পারিতেছে না। সিমন্ কিছু বিস্মিত হইল। মেয়ে দুইটী সুন্দরী সন্দেহ নাই; ভ্রমর কৃষ্ণ চক্ষু, সুকোমল কপোল, আরক্তিম বদন মণ্ডল আর পোষাক পরিচ্ছদ ও বেশ পরিপাটি। কিন্তু তথাপি মাইকেল চির পরিচিতের ন্যায় মেয়ে দুইটীর দিকে এমন ভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে কেন? সিমনের নিকট ইহা অতিশয় রহস্যময় বোধ হইল।

সিমন্ স্ত্রীলোকটীর সহিত দাম দস্তর ঠিক করিয়া মেয়ে দুইটীর পায়ের মাপ লইতে গেল। স্ত্রী লোকটী কহিল—"এই মেয়েটীর বা' পায়ের জুতা একটু ভিন্ন রকমের, নতুবা দুজনার পা'ই এক মাপের। এরা যমজ বোন্। দুইটী বোন্ এক বৃন্তে ফোটা গোলাপ কলির মত।

সিমন্ ক্ষুদ্র পা দুখানির মাপ নিল এবং সহৃদয় চিত্তে বালিকাটীকে কহিল—"কি সুন্দর তোমার চেহারা। পা' খানা কি করে এমন হইল? জন্ম হইতেই খোঁড়া?"

স্ত্রীলোক—"না, ওর মায়ই এমন করিয়াছে।"

মেট্রিনা তখন উহাদের নিকটে গেল। ইহারা কে এবং উহাদের মা'ই বা কে জানিবার জন্য তাহার মনে কৌতুহল জন্মিল।

"তবে আপনি এদের মা নন্?'

"আমি এদের মা নই। এরা আমার আত্মীয়ও নয়। এরা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এখন আমিই ওদের মাতৃস্থানীয়া।"

"এরা আপনার সন্তান নয়, তবু আপনি এদের কত ভালবাসেন, কত যত্ন করেন!"

"কেন ভালবাসব না? কেন যত্ন নিব না? আমার বুকের দুধ দিয়া উহাদের বাঁচাইয়াছি। আমার একটী সন্তান ছিল। ভগবান্ তাহাকে নিয়া গিয়াছেন। আর সে থাক্‌লেও ওকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসিতাম না।"

"ওরা তবে কার সন্তান?"

স্ত্রীলোকটী সংক্ষেপে কহিল:—আজ ছয় বৎসর হইল এই মেয়ে দুইটীর পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা বুধবার দিন মারা যান আর মা সেই সপ্তাহের শুক্রবার দিনই স্বামীর অনুসরণ করিলেন। এই মেয়েদের পিতা কাঠের ব্যবসা করিতেন। একদিন তিনি একটা বড় গাছ কাটিতেছিলেন। গাছের গোড়াটা যখন কাটা প্রায় শেষ হইয়াছে তখন হঠাৎ গাছটা তাহার উপর পড়িয়া যায়। তাহাতে তাহার পেটের

নাড়ী ভুড়ী বাহির হইয়া পরে। বাড়ীতে আনিবা মাত্র তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময়েই তাহার স্ত্রী এই যমজ সন্তান দুইটী প্রসব করিলেন। ইহাদের সাংসারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। মেয়েদের লালন পালন করিবে এরূপ লোক তাহাদের কেহই ছিল না। আমি স্ত্রীলোকটীকে প্রাতে দেখিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি তাহার শরীর হিম হইয়া আসিতেছে। মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে এই মেয়েটীর উপরে পড়িয়া যান। তাহাতেই ইহার পা খানি খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। এদের মার মৃত্যু হইলে পাড়ার লোকেরা আসিয়া তাহাকে সমাধি দিল। কচি শিশু দুইটী নিঃসহায় হইল। ইহাদের ভার কে লইবে? পাড়ার লোকেরা নবজাত শিশু দুইটীর লালন পালনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে আমার বুকেই দুধ ছিল। আমি দুই মাস পূর্ব্বে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম। সকলই আমাকে কহিল 'মেরিয়া' তুমিই এখন শিশু দুইটীর ভার লও। ইহার মধ্যে আমরা অন্য সুবিধা করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখি। আমি শিশু দুইটীকে নিয়া গৃহে ফিরিলাম। প্রথমে আমি কেবল সুস্থ ও সবল মেয়েটীকেই স্তন্য দিতাম; খোঁড়া মেয়েটীকে বড় যত্ন করিতাম না। আমার ধারণা ছিল সে বাঁচিবে না। একদিন মনে হইল কচি শিশুটী অনাহারে শুখাইয়া মরিবে আমি কিরূপ চাহিয়া দেখিব? তখন হইতে তাহাকে যত্ন করিতে ও আহার দিতে লাগিলাম। তিনটী শিশুর লালন পালন ভার আমার উপরে। আমি তখন যুবতী; ঈশ্বরের কৃপায় আমার বুকে প্রচুর দুধ ছিল। দুইজনকে একবার স্তন পান করাইতাম, তৃতীয় শিশুটী অপেক্ষা করিত। তারপর একজনকে সরাইয়া তৃতীয়টীকে খাওয়াইতাম। তিনটী শিশুকেই আমি সমান ভাবে যত্ন করিতে পারিতাম। দ্বিতীয় বৎসর আমার নিজের ছেলেটী অকালে মারা গেল। ভগবান আমাকে আর সন্তান দেন নাই। কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহে ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমরা এখন কারখানার কাজ করি; বেতন প্রচুর। কিন্তু আমাদের কোন সন্তান নাই। যদি এই মেয়ে দুইটীকে না পাইতাম তবে আমাদের জীবন দুর্ব্বহ হইত। আমি এদেরে কত ভালবাসি। এদের দেহ আমারই রক্তমাংসে গঠিত।"

স্ত্রীলোকটী একহাতে খোঁড়া মেয়েটীকে বুকে চাপিয়া ধরিল, অপর হস্তে বিগলিত অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

মিট্রিনা কহিল—'প্রবাদ আছে—"পিতামাতা না থাকিলেও মানুষ বাঁচিতে পারে কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া বাঁচা অসম্ভব।" ইহা মিথ্যা নয়।'

কিছুকাল গল্পসল্পের পর আগন্তুক স্ত্রীলোকটী গমনোদ্যতা হইলেন। গৃহস্বামী তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। মাইকেল এতক্ষণ জোড় হাত হাটুর উপর ন্যস্ত করিয়া সাহাস্য বদনে উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল।

(১০)

সিমন্‌ মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করিল—"মাইকেল আজ তোমাকে এমন দেখা যাইতেছে কেন?"

মাইকেল সিমনের কথার কোন উত্তর দিল না। সে কাজ রাখিয়া উঠিল, গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিল এবং সিমন্‌ ও মেট্রিনাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"আজ বিদায় হইলাম। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, আপনারা ও আমাকে ক্ষমা করুন।

সিমন্‌ ও মেট্রিনা দেখিতে পাইল মাইকেলের দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। সিমন্‌ দণ্ডায়মান হইয়া মাইকেলকে নমস্কার করিয়া কহিল—"মাইকেল তুমি যে সামান্য মানুষ নও এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে এখানে রাখতে পারবনা তাও জানি। যাহা হউক আমার একটী কথার উত্তর দিতে হইবে।

"আমি যেদিন তোমাকে গিরজার নিকট হইতে পাইয়া আনিয়াছিলাম সে দিন তুমি অতিশয় বিষন্ন ছিলে কিন্তু যখন আমার স্ত্রী তোমাকে খাইতে দিলেন তখন তোমার মুখে হাসি দেখা দিল। তারপর একটী ভদ্রলোক যখন বুটের ফরমাইস্‌ দিতে আসিয়াছিলেন সে দিন তুমি আবার হাসিলে এবং দিন দিনই প্রফুল্ল হইতে লাগিলে। আজ এই স্ত্রীলোকটী দুইটী মেয়ে নিয়া যখন আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল তখন তোমার মুখে আবার হাসি

দেখা দিল এবং তোমার শরীর ও অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই জ্যোতিই কোথা হইতে আসিল। আর এই তিনবার হাস্য করিবারই বা কারণ কি?"

মাইকেল কহিল—"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়াছিলেন তাই আমার শরীর হইতে দিব্যজ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমি তিন দিনে ভগবানের তিনটী রহস্য বুঝিয়াছি, তাই আমি তিনবার হাস্য করিয়াছি। যখন আপনার স্ত্রী দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয়ও আহার দিয়াছিলেন তখন ভগবানের একটী রহস্য বুঝিতে পারিয়া আমি হাসিয়াছিলাম। ভদ্রলোকটী যে দিন 'বুট' প্রস্তুত করিতে দিয়া যান্ সেই দিন দ্বিতীয় রহস্যটী বুঝিতে পারিয়া হাস্য করি। এখন ক্ষুদ্র মেয়ে দুইটীকে দেখিয়া তৃতীয় রহস্যটী আমার বোধগম্য। হইল তাই তৃতীয় বার হাসিলাম।

সিমন্ অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিল—"মাইকেল ভগবান্ তোমাকে কেন শাস্তি দিলেন আর কি রহস্যই বা তুমি বুঝিলে আমাকে বলিতে হইবে।"

মাইকেল কহিল—"আমি ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। আমি স্বর্গের দেবদূত ছিলাম। ভগবান্ একটী স্ত্রীলোকের আত্মাকে স্বর্গে নিবার ভার আমার উপর দিয়া ছিলেন। আমি পৃথিবীতে আসিয়া দেখি স্ত্রীলোকটী কিছুক্ষণ আগে দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। সদ্যোজাত মেয়ে দুইটী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! মা তাহাদিগকে তুলিয়া স্তন্য পান করাইতে পারিতেছে না। স্ত্রীলোকটী আমাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল আমি তাহার আত্মাকে লইবার জন্যই আসিয়াছি। সে তখন সজল নয়নে ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে কহিল—"দেব দূত! এইমাত্র প্রতিবেশীরা আমার স্বামীকে সমাধি দিয়া আসিয়াছে! আমার বোন্ নাই, জেঠী, খুড়ী কি অন্য কোন আত্মীয় স্বজন নাই। কে মাতৃপিতৃ হীন যমজ সন্তানকে লালন পালন করিবে? আমার আত্মাকে রাখিয়া যান। আমার মেয়ে দুইটী একটু বড় হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে সময় দিন্। মাতৃপিতৃহীন সন্তান কি অন্যের সাহায্যে বাঁচিতে পারে? জননীর কথায় আমার অতিশয় দয়া হইল। আমি একটী মেয়েকে মায়ের বুকে ও অন্য মেয়েটিকে বাহুতে স্থাপন করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেলাম এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বিবৃত করিলাম। ভগবান্ কহিলেন "আবার যাও; সেই প্রসূতীর আত্মাকে এখানে লইয়া আইস। তিনটী নিগূঢ় রহস্য তুমি জানিতে পারিবে। "মানুষকে আমি কি দিয়াছি, কি দেই নাই আর কিরূপে তাহারা সংসারে বাঁচিয়া আছে"—এই তিনটী রহস্য যখন তুমি বুঝিতে পারিবে তখন আবার স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

আমি আবার পৃথিবীতে আসিলাম এবং সেই হতভাগিনী জননীর আত্মাকে লইয়া স্বর্গেরদিকে যাত্রা করিলাম। অসহায় সন্তান দুইটি মায়ের বক্ষ চ্যুত হইল। মায়ের দেহের চাপে একটী সন্তানের একখানা পা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি যখন আত্মাকে লইয়া গ্রামের উর্দ্ধে উঠিলাম, তখন হঠাৎ একটা প্রবল বাতাস ছুটিল, তাহাতে আমার পাখা দুইটী খুলিয়া গেল এবং আমি পৃথিবীর উপর একটা পথের ধারে পড়িয়া গেলাম। মুক্ত আত্মা একাকী ভগবানের নিকট পৌছিল।"

সিমন্ এবং মেট্রিনা এখন বুঝিতে পারিল তাহারা কাহাকে আশ্রয় দিয়াছে এবং আহার ও বস্ত্রাদি দিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছে। উভয়ে যুগপৎ ভয়ে ও আহ্লাদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। দেব-দূত কহিল:—"আমি একাকী উন্মুক্ত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। মানুষের যে কি অভাব আমি জানিতাম না। শীত কি ক্ষুধার যন্ত্রণা আমি কখনও পাই নাই। সেই খোলা যায়গায় পড়িয়া শীতে ও ক্ষুধায় ক্রমেই আমি অধিকতর কাতর হইতে লাগিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে গিরজার নিকট গেলাম। ভাবিলাম রাত্রিটা ইহার ভিতরই কাটাইব। কিন্তু গিরজার দ্বার রুদ্ধ। ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। প্রবল বাতাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গিরজার প্রাচীর ঘেসিয়া বসিলাম। রাত্রি গভীরতর হইতে লাগিল, শীতে ও ক্ষুধায় অধীর হইয়া পড়িলাম। সহসা একটী লোক 'বুট' হাতে করিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। লোকটী পথ চলিতেছে আর কিরূপে আপন স্ত্রী ও

নিজকে শীত হইতে রক্ষা করিবে তৎসম্বন্ধে অনুচ্চস্বরে আলোচনা করিতেছে। সেই প্রথম আমি মানবের বিষাদ-মলিন মুখ প্রত্যক্ষ করিলাম এবং অভাব কি বুঝিতে পারিলাম। আমি সেই লোকটীর কথা শুনিয়া ভাবিলাম—এই ব্যক্তি নিজের খাদ্য, নিজের পোষাকের চিন্তায়ই ব্যস্ত; ইহার নিকট হইতে কোন সাহায্য প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র! লোকটী আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া চিন্তিত হইল কিন্তু ভয়ে নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না আবার পথ চলিতে লাগিল। আমিও নিরাশ হইলাম। সহসা লোকটী কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে পূর্ব্বের ন্যায় মলিনতা নাই। পবিত্র আত্মার অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকসিত হইয়াছে। আমি তাহার বদনে ভগবানের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। লোকটী আমার নিকটে আসিয়া তাহার জামাটী আমায় পরাইয়া দিল এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেই লোকটীর স্ত্রী আরও ভয়ানক। সে আমাকে রাত্রিতেই প্রবল শীতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল! কিন্তু তাহার স্বামী তাহাকে মৃত্যু ও ভগবানের কথা মনে করিয়া দিল। অমনি স্ত্রীলোকটির হৃদয়ে পরিবর্ত্তন আসিল। সে তাড়াতাড়ি আমাকে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন আমি তাহার দিকে চাহিলাম সেও আমার দিকে চাহিল। দেখিলাম মলিনতা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটী জীবন্ত আত্মা বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বয়ং ঈশ্বরের সত্তা তাহার ভিতর আমি প্রত্যক্ষ করিলাম! তখন ভগবানের প্রথম কথা আমার স্মরণ হইল—"মানুষকে কি দিয়াছি তুমি জানিতে পারিবে।" আমি বুঝিলাম মানুষের প্রাণে ভগবান্ ভালবাসা দিয়াছেন। তখন আমার আনন্দ হইল, ভগবান্ যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। তাই আমি সর্ব্বপ্রথম হাস্য করিলাম।"

আমি পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। এক বছর চলিয়া গেল। একদিন একটী ভদ্রলোক আসিয়া বুটের ফরমাইস দিল। তাহাকে এরূপ বুট প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে যাহা এক বছরের মধ্যে পঁচিবে না, চামড়াও কোঁকড়াইবে না। আমি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম মৃত্যু তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। আমি ছাড়া আর কেহ মৃত্যুকে দেখিতে পাইল না। আমি জানিতাম সেই দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সেই ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইবে। আমার মনে হইল লোকটী এক বছরের জন্য জুতার বন্দোবস্ত করিতেছে কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহার পরমায়ু শেষ হইবে। ভগবানের দ্বিতীয় রহস্য বুঝিলাম—মানুষকে তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দেন নাই। তাই আমি দ্বিতীয়বার হাস্য করিলাম।

ভগবানের তৃতীয় রহস্যটী বুঝিবার আশায় আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ষষ্ঠ বৎসরে একটি স্ত্রীলোক দুইটী যমজ সন্তান লইয়া এই গৃহে প্রবেশ করিল। আমি মেয়ে দুইটীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। ইহারা আজ পর্য্যন্তও জীবিত আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এদের মাতা মৃত্যুর পূর্ব্বে করযোড়ে আমার নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আমি মনে করিতাম মাতাপিতা না থাকিলে সন্তান কখনও বাঁচিতে পারে না; আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল অসহায়া সন্তান দুইটী অকালে প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতে এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া ইহাদের লালন পালনের ভার লইল এবং প্রাণপণে যত্ন ও অকৃত্রিম স্নেহে শিশু দুইটীকে বাঁচাইয়া তুলিল। যখন এই গৃহে বসিয়া দয়াশীলা স্ত্রীলোকটী পরের মেয়ের সুখে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল তখন তাহার মধ্যে আমি ভগবানের প্রেমময় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমি বুঝিতে পারিলাম কিরূপে মানুষ জীবিত আছে। ভগবানই সকলের পিতা। তিনিই সকলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই সকলের প্রতিপালনের উপায় করেন। তৃতীয় রহস্য বিধাতার অনুগ্রহে আমার নিকট ব্যক্ত হইল। আমি বুঝিলাম—ভগবানই রক্ষাকর্ত্তা মানুষ উপলক্ষ মাত্র। তাই তৃতীয়বার আমি হাস্য করিলাম।

(১২)

দেবদূতের দেহ তখন দিব্য জ্যোতিসমাচ্ছন্ন হইল, জ্যোতির প্রভাবে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যাইতে লাগিল।

সে অধিকতর গম্ভীর ও মর্ম্মভেদী স্বরে বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর যেন দেহ হইতে নির্গত হইতে ছিল না, – স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিল। দেবদূত কহিল:—"মানুষ আপনার সতর্ক যত্ন ও চেষ্টায় জীবিত থাকে না। অন্যের ভালবাসাই তাহার অবলম্বন। মাতা জানিতেন না তাহার সন্তানের জন্য কি আবশ্যক। আর ধনী ভদ্রলোকটীও জানিত না সন্ধ্যাকালে সে 'বুট্'ই পরিবে কি 'বছোভিকি'ই তাহার পায় পরাইয়া দিবে। আমি যত দিন এই সংসারে থাকিয়া গেলাম, আমার নিজ যত্ন চেষ্টায় কখনও বাঁচি নাই। দুইটী দরিদ্র নরনারীর ভালবাসাই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পিতৃমাতৃহীন যমজ সন্তান দুইটীও নিজ চেষ্টায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই. একটি অপরিচিতা মহিলার দয়া ও স্নেহই তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে পৃথিবীর সকল লোকই অন্যের অনুগ্রহ ও ভালবাসায়ই সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। বিধাতার ইচ্ছা সকলে মিলিত হইয়া পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। ভগবান্ তাই আমাকে দেখাইয়াছেন, নিজ সুখ শান্তির জন্য প্রত্যেকেরই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আত্মসুখ লইয়া ব্যস্ত, সে প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যা করিতেছে। যে পরকে ভালবাসিতেছে সেই যথার্থ জীবন্ত মানুষ। প্রেমই জীবন, প্রেমই ভগবান্।"

'দেবদূত ভগবৎ প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল, তাহার সুমধুর ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হইল, দেহ নিঃসৃত জ্যোতিতে দিগন্ত প্লাবিত হইল। তাহার স্কন্ধদেশে আবার পক্ষ নির্গত হইল। তখন সে ধীরে ধীরে স্বর্গে উঠিতে লাগিল। সিমন্ ও মেট্রিনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পর চৈতন্য হইলে তাহারা দেখিল, মাইকেল অদৃশ্য হইয়াছে! গৃহ শূন্য! *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

* টল্‌ষ্টয় হইতে।

শহুরে ভদ্রতা।

[ব্র্যাকেটের ভিতরের কথা গুলি স্বগতোক্তি।]

আসুন, আসুন; নমস্কার; ওঃ, অনেক দিনের পরে!
(চিঠি লেখা শেষ হ'ল না—হতভাগার তরে;)
দেহ খানি এত কাহিল কেমন ক'রে হ'ল?
(চেয়ার খানা দখল ক'রে বসে,— আরে ম'ল!)
চাকরি বজায় রাখ্‌তে গেলে এম্‌নি দশাই হয়?
(এ সব বাজে কথার এটা মোটেই সময় নয়।)
ফুটফুটে এ ছেলেটি কে? মহাশয়ের নাতি?
(যেমন কালো তেম্‌নি মোটা;— ভালুক কিংবা হাতী!)
বেজায় লক্ষ্মী, শান্ত শিষ্ট, নাতিটি আপনার;
(দফা বুঝি সারে আমার Onoto Pen টার!)
পান তামাক চাই? চাকর ফিরুক,—বাজারে সে গেছে।
(ভয় হচ্ছে ঘোর, রামা বেটা বেরিয়ে পড়ে পাছে!)
চুরুট হ'লেও চলে বুঝি? নেই তা' আমার কাছে।
('সিগার কেস্' টা আল্‌মারিতে বন্ধ করাই আছে।)
কাজ আছে তাই আপনাকে আজ যেতে হ'বে দূরে?
(চেয়ার ছেড়ে উঠল এবার'— প্রাণটা এল ধড়ে!)
আর খানিকক্ষণ থাকলে আমি বড়ই হতেম সুখী!
(বাঁচা গেল; এখন বাঁকি চিঠি টুকু লিখি।)

শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

যাত্রা।

(গল্প)

তিন বছরের ছেলে দুখীরাম যখন মা হারা হইল, তখন হইতেই সে তাহার কাকীমা নিত্যকালীর একমাত্র স্নেহের অধিকারী হইয়া পড়িল। আজ পর্য্যন্ত বিধাতার নিগ্রহে পড়িয়া নিত্যকালীর বন্ধ্যা নাম ঘুচে নাই,—সুতরাং তাহার আদর ও যত্নে দুখীরাম, মায়ের অভাব বুঝিয়া উঠিবার বড় একটা অবকাশ পায় নাই।

কথাটা এই—বিলাসপুরের রামহরি রায় ও শ্যামহরি রায় দুই সহোদর। শৈশবকাল হইতেই দুই ভাই এক

প্রাণ—এক মন। ভ্রাতৃদ্বন্দ কথাটি তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এবম্বিধ অন্তরঙ্গতা ও এক-প্রাণতা বশতঃ তাঁহারা চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজে আদর্শ ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তাহার পর আজ পর্য্যন্ত কত দিন, কত দিনের মত এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। রামহরি এখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করেন। শ্যামহরি তিন তিন বার বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশোন্মুখী হইতেই মা সরস্বতী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া—সে আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চিত্র বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন। এখনও জীবনের এই মধ্যাহ্ন সময়েও ভ্রাতৃদ্বয়ের সে ভাব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উভয় ভ্রাতাই বিবাহ করিয়াছেন। রামহরি মা ষষ্ঠীর কৃপায় এক সুকুমার পুত্রলাভ করিয়াছেন;—শ্যামহরি দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত।

পত্নীবিয়োগের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই রামহরি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে "চেলীপরা" এক ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা আসিয়া তাঁহাদের গৃহ আলোকিত করিল।

(২)

রামহরি বিবাহ উপলক্ষে যে বাড়ী আসিয়াছিলেন—তাহার পর আজ ছ' মাস যাবৎ বাড়ীতেই আছেন। একবার লোককণ্ঠ মুখরিত নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়দ্দিবস—স্বদেশের শান্তিচ্ছায়ায় দেহ শীতল করাই—দীর্ঘকাল বাটি অবস্থান করার উদ্দেশ্য।

একদিন গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়া, রামহরি রায়ের নবপরিণীতা পত্নী, সুকুমারীর দিদিমা "নাতজামাই" গৃহে আবির্ভূতা হইলেন।

পরদিন প্রভাতে সুকুমারীর দিদিমা, তাহার গায় ও মাথায় হাত বুলাইয়া অতি করুণ স্বরে কহিলেন,—"আহা সোণার অঙ্গ কালী হ'য়েছে। তোমার বুঝি বা রোজ রোজ রান্না করতে হয়, সুকু ?"

সুকুমারী নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিল—"না দিদিমা, সবই আমার জা ক'রে থাকেন।"

"তা'হলে বুঝি সেই-ই সংসারের কর্ত্রী হ'য়ে বসেছে ?"—দিদিমা গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

উভয় দিকেই বিপদ। দিদিমার সে মূর্ত্তি দেখিয়া সরলা বালিকার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। গুরু অপরাধীর মত কাতর নয়নে দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাক্সের চাবী কা'র কাছে ?"

সুকুমারী আর প্রত্যুত্তর করিতে সাহস করিল না। দিদিমা আরও করুণ ও উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"যা' ভেবেছি তাই হ'য়েছে।—ডাইনীর ওষুদ ধরেছে গো ধরেছে; আমার সুকুর ভাগ্যে এই ছিল ?"

দিদিমা কাঁদিয়া বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

সে দিন রাত্রিতে দিদিমা ও নাতজামাইয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

(৩)

পূর্ব্ব ঘটনার পর এক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। একদিন রামহরি কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—"ভাই ব'সে খেলে ক'দিন চলবে। আমি ব্যবসায় ছেড়ে দিব মনে করেছি। যা' হক বিষয় আশয় যা' কিছু আছে, ভাগ করে নাও 'খন।—আর নিজের পথ দেখ। সেটাও—"

কথা শুনিয়া শ্যামহরির মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল;—পায়ের তল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল।

ভ্রাতৃদ্বয় পৃথকান্ন হইলেন। কুটীল সংসার নিত্য কালীর বক্ষঃস্থল হইতে দুর্ব্বারামকে ছিনিয়া লইল।

(৪)

সন্ধ্যাকাল। প্রকৃতির একনিষ্ঠ সেবক শ্যামহরি এক খানি কাঁচখণ্ডে একটী প্রাকৃতিক আলেখ্য লেখিতেছিলেন। সে এক অজ্ঞাত সামুদ্রিক চিত্র। সমুদ্রের জলরাশিতে যেন এক মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রলয় পয়োধি জলের উপর উদার—বিস্তৃত—অনন্ত আকাশ। দূরে অতিদূরে এক অনন্তমিলনের স্থলে অনন্ত জলরাশি—অনন্ত আকাশের গায় মিশিয়াছে। সেখানে—সে সন্ধিস্থলে রেখা নাই—চিহ্ন নাই।—তবুও যেন কি এক অজ্ঞাত অদৃশ্য বস্তু অবস্থান করিয়া উভয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল। দিনমণি রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়া সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে ডুবিয়াও ডুবিতেছেন না। নভোমণ্ডলে শ্বেতবর্ণ মেঘমালা উধাও উড়িতেছে। কিন্তু ঘনঘটার চিহ্নমাত্র নাই।

শ্যামহরির ব্যথিত হৃদয়ও যেন তীব্র জ্বালা লইয়া সেই শূন্যাকাশে দিগ্বিদিক হারা হইয়া উড়িতেছিল—তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিলনা।

এমন সময় দুখীরাম ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কাকা বাবু যাত্রা করবে?"

শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বাক্যগুলি যাহা শ্যামহরির কত আনন্দ-শ্রব্য ছিল—আজ মানসিক চঞ্চলতা বশতঃ তাঁহার কর্ণ পর্য্যন্ত পৌঁছিল কিনা সন্দেহ।

আজ রামহরি সস্ত্রীক সপুত্র কলিকাতায় যাইবার জন্য যাত্রা করিবেন।—তাই শিশুও তাহার কাকাবাবুকে যাত্রা করিতে বলিতেছে। কাকাবাবুকে নীরব দেখিয়া শিশু তাঁহার ক্রোড়ে যাইতেই হঠাৎ তাঁহার স্পর্শে কাঁচ খণ্ড পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। শ্যামহরির ধ্যান ভঙ্গ হইল; ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই সে অনর্থের মূলে দুখীরামকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন—"তুমি আমার ছবি ভেঙ্গেছ, তোমায় মারব।"

অবোধ শিশু অপরাধীর ন্যায় ছল ছল নেত্রে কহিল—"মার।"

শ্যামহরি হাসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন—"না তোমায় কি মারতে পারি—আমি যে তোমায় ভালবাসি।"

শিশু প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"আমি তোমায় ভালবাসি।"

শ্যামহরির নয়ন প্রান্ত অজ্ঞাতসারে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

দূরে রামহরি বসিয়াছিলেন; আজ শ্যামহরির ব্যবহার তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইল। চিত্র ভঙ্গের দোষ দিয়া—উত্তম মধ্যম প্রহার পূর্ব্বক দুখীরামকে শ্যাম হরির নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

রামহরির হীনপ্রাণতা দেখিয়াই বুঝি সূর্য্যদেব ঘৃণায় লজ্জায় লালমুখ হইয়া সেদিনকারমত সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৫)

সেদিন রাত্রিতে দুখীরামের জ্বর হইল। জ্বর ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তিন দিন যায়, তবু সে একজ্বরী ভাব দূর হইল না।

চিকিৎসক দেখিয়া বলিলেন—"আজ রোগীর অবস্থা বড় খারাপ।"

শ্যামহরি বালকের শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বদা বসিয়া আছেন। তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে অবিরল পূত মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়া সে স্থান পবিত্র করিতেছিল।

দুখীরাম বিকারে অতি ক্ষীণ বুকভাঙ্গা স্বরে ডাকিল—"কাকা বাবু!"

শ্যামহরি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"বাবা, এই আমি।"

দুখীরাম বিকারাবস্থায়ই নয়ন দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "কাকা বাবু,—আমি যাত্রা করিব—তুমি যাবে না?"

দীপ নির্ব্বাপিত হইল। বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দুখী-রামের পবিত্র আত্মা কুটীল সংসার ত্যাগ করিয়া চিরশান্তি নিকেতনে অনন্ত যাত্রা করিল। শ্যামহরি মূর্চ্ছিত হইয়া পাষাণের উপর পড়িয়া গেলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার তত্ত্বনিধি।

'ি' কার ও 'ে' কারের বেয়াদবি।

স্বর বর্ণের সাহায্য না পাইলে আমাদের এত প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনের আস্বাদন লাভ করা যায় না। ব্যঞ্জন জমিদারী চালে বহাল তবিয়তে, আরাম কেদারায় শুইয়া থাকেন, আর অকারাদি স্বরবর্ণ আপন আপন আকার দিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করে—দরবার কারবারে হাজির করিয়া দেয়, লাটবেলাটের মজলিসে সম্মান ভাজন করিয়া আনে।

খিদমৎকার চিরদিনই হুকুমের অপেক্ষা করে এবং অত্যন্ত সুশীল ও সুবোধের মত কর্ত্তার অনুচর রূপে চলিয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য স্বরের-আকারগুলি চিরকালই "তব অনুগামী দাস" বলিয়া ব্যঞ্জনের সম্মান রক্ষণ ও বর্দ্ধন

করিয়া আসিতেছে। ভাষা জননী সংস্কৃতেও তাহাই আছে। বঙ্গভাষায়ও আমরা সংস্কৃতের অনুসরণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; কারণ সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ প্রভৃতি স্বরবর্ণের আকার বা অবয়বগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত ব্যঞ্জনের অধীনতা স্বীকার করিয়াই জীবন যাপন করিতেছে।

ক্+অ=ক

ক+া=কা

ক+ী=কী

রূপে স্বরবর্ণের অবয়বগুলি কেহ ব্যঞ্জনের প্রসাধনে লিপ্ত, কেহ বা তাহার পঙ্গুত্ব নিবারণে যষ্টিরূপে ব্যবহৃত, কেহ বা 'ধরে ছত্র ছত্রধর'। উ ঊ ঋ ৠ পদ সেবায় চির ব্যাপৃত। সংস্কৃতে এ ঐ ও ঔ এর অবয়বগুলি পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনের অনুগামী। ইহারা নান্‌কার প্রাপ্ত চিরভৃত্যের মত প্রভুভক্ত, সুতরাং প্রভুর সেবায় তৎপর।

কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। আমাদের আত্ম সম্মান বোধ যেমন অত্যন্ত অল্প, আমাদের হাতে পড়িয়া বঙ্গীয় ব্যঞ্জন গুলিরও তেমনি মানহানির যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। কোন কোন স্বরের অবয়ব বেয়াদব বেহায়া হইয়া মনিবের অসম্মান করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। 'ে' কার সংস্কৃতে শিরস্ত্রাণ পরাইত; বাঙ্গালা দেশের জল-বায়ুর গুণে সেও স্পর্দ্ধা পাইয়া বঙ্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ৈ (ঐ কার) ত বিজয় বৈজয়ন্তী তুলিয়া অগ্রে অগ্রেই চলিয়াছে। ে া (ওকার) এবং ে ৗ কার আপন প্রভুকে কতকটা নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

অন্ধকারে পথ চলিবার সময় বর্ত্তিকাধারী ভৃত্য মহারাজের অগ্রে অগ্রেই পথ দেখাইয়া যায়; তাহাতে রাজসম্মানের হানি হয় না; ক্ষৌরকার মস্তক স্পর্শ করিবার অধিকার রাখে এবং কর্ণ পরিষ্কার করিবার আবশ্যক হইলে যে সে উক্ত স্থানে হস্ত প্রদান করিলে তাহা মানহানির বিষয়ীভূত হয়না বটে, কিন্তু ঐ ঐ কার্য্যকে তাহারা আপন কায়েম এবং চিরস্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিলেই মুস্কিল। বাঙ্গালী আমরা ভৃত্যকে যথেষ্ট "নাই" দিয়া ঘাড়ে তুলিয়া লই—তার পর সে সিন্ধুবাদ নাবিকের অবস্থায় আমাদিগকে ফেলিয়া রাখে। বাঙ্গালা ব্যঞ্জন বর্ণও এখন এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরবর্ণের অবয়বগুলির সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পর্দ্ধা ি (হ্রস্বই কারের) সে সংস্কৃতে আপন প্রভুর অগ্রগামী রূপে চলিয়াছে। সুতরাং বঙ্গদেশে তাহার গায় হাত দেয়, এত বড় গায়ের জোর কাহার আছে?

সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই ি (ই কারের) এই অপ্রতিহত প্রভাবের কায়েমী সনন্দ কবে, কি হেতু, কোন্ সম্রাট্ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা জানি না কিন্তু বর্ত্তমান সার্ব্বজনীন উন্নতির উৎকণ্ঠার দিনে অন্যান্য স্বরবর্ণ ই কারকে কেন ব্যঞ্জনের পেছনে স্থাপন করা হইবে না,—এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে; এবং ইহাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয়গণকে সাহিত্যের আদালতে উপস্থিত করিবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

ক্+ই (ক্+ ি)='কি' হইল কেন? অর্থাৎ ি কারটী ক এর পূর্ব্বে গেল কেন, আমরা তাহা বুঝিতে অসমর্থ।

কোনও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষার্থী বালক প্রবীণ গুরু মহাশয়ের নিকট ি কারের এই পূর্ব্বগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর পাইবে? প্রবীণ গুরু-মহাশয়গণের জন্য তেমন অশুভ (?) দিন আসিবে না—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সে কথা বলা যায় না।

বঙ্গের বর্ণমালা সমূহে একটা প্রবল ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে। "ঙ" এবং "ং" স্বর্গলাভ করিয়াছে, "ঞ" গতাসু প্রায়। ঃ বেচারীর চির নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাই হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের দিনে আমরাও ি, ে, ো, ৌ কার প্রভৃতি স্বরের আকার বা অবয়বগুলিকে ব্যঞ্জন বর্ণের পরে স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত স্বরের অবয়বগুলি ব্যঞ্জনের পশ্চাতে নিম্নলিখিত আকৃতিতে দাড়াইতে পারে। যথা:—

ক্+ই=কী
ক্+এ=কঁ
ক্+ঐ=কঁ
ক্+ও=কা
ক্+ঔ=কা

অথবা অন্য যে বিজ্ঞান সম্মত আকার হইতে পারে।

অবশ্য এই প্রস্তাবটী আপাততঃ অত্যন্ত উদ্ভট বিবেচিত হইবে। কিন্তু আশা করা যায়, বন্ধন মুক্ত ব্যঞ্জনের আশীর্ব্বাদে কালে বাঙ্গালীর ধাতে ইহা সহিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উক্ত কতিপয় স্বরের আকার ও ব্যঞ্জনের দখল সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া দিবেন, আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গদাধর মাষ্টার।

(১)

সে ৪০।৫০ বৎসরের কথা। বাবু গদাধর হালদার স্কুল মাষ্টারী করিতেন। তৎকালে গদাধর বাবু ও তাহার মনোযোগের কাঠি চিনিত না, এমন ছাত্র বিরল ছিল। গদাধর বাবু নিজে ছয় ফুট লম্বা ছিলেন। যাহার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার নাই, তাহাকে রেখা বলে; জ্যামিতির এই তত্ত্বটী প্রত্যক্ষ এবং জীবন্তভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য বিধাতা গদাধর বাবুকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

গদাধর বাবুর কপাল হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত কেশ কলাপ দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ মনে করিত ভিতরে সার ভাগের অভাব হওয়ায়, চুলগুলি ঝড়িয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু গদাধর বাবু মনে করিতেন, ইহা তাহার অসাধারণ মস্তিষ্ক পরিচালনার ফল।

তাহার ধারণা ছিল যে শুভঙ্করের তিরোভাব ও তাহার আবির্ভাব এই দুই এর মধ্যবর্ত্তী সময়ে তেমন গণিত শাস্ত্র বেত্তা আর কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। এইরূপ গণিতজ্ঞ বলিয়া সাহিত্যে তাহার অধিকার একেবারে ছিল না। তাহার প্রথমোক্ত ধারণা সত্য না হইলে ও শেষোক্ত ধারণা অত্যন্ত সত্য ছিল। ছাত্রগণের মধ্যে তাহার বিদ্যা প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইলে তাহার মনোযোগের কাঠিই ছিল একমাত্র যন্ত্র।

মনোযোগের কাঠি দ্বিবিধ। এক—স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহার্য্য শ্লেটের পার্শ্বের (ফ্রেমের) কাঠ, দ্বিতীয়—পাকা বাঁশের এক হস্ত পরমিত লম্বা ও আধ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটী দণ্ড।

প্রথমোক্ত কাঠি বা কাঠ সর্ব্বদা গদাধরের হস্তে গদা স্বরূপ বিরাজ করিত। নমস্কার, সেলাম, good morning ইত্যাদি সম্বোধনের ন্যায় কোন ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথম সম্ভাষণেই এই কাঠি ছাত্রদিগের বাহুতে পতিত হইত! তাহাতে বাহুর কতকাংশ স্ফীত হইয়া উঠিত; তাহা গদাধর বাবু ছাত্রকে বাজু পড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। তাহার পার্শ্ব দিয়া যে কোন ছাত্রের, যে কোন সময় যাতায়াত করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই তাহার কোন অঙ্গে এই কাঠি সংযুক্ত হইত এবং তাহাতে যে শব্দ উৎপন্ন হইত, তাহা গদাধর বাবুর বিশেষ আহ্লাদ উৎপাদন করিত। গদাধরের গদা সর্ব্বদাই ঘূর্ণায়মান থাকিত। এই গদার বিঘূর্ণনে ষষ্ঠী সহস্র হস্তী ঘূর্ণিত না হইলেও দ্বিতীয় কৃতান্তমিব এই গদাধর দর্শন করিয়া লঘুচিত্ত বালকগণ লঘু পতনকসদৃশ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। মনোযোগের কাঠি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যে শিক্ষা হইতে পারে তাহা গদাধরের কেশবিহীন মস্তকাভ্যন্তরস্থিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া উঠিত না। লাঠি বাঁচাইলে ছেলে নষ্ট হইবে, এই ধ্রুব সত্য গদাধরের নীতি শাস্ত্রের মূল মন্ত্র ছিল।

গদাধরের গদাভিন্ন অপর একটী বংশ নির্ম্মিত দণ্ড ছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ দণ্ড আটপৌরে নহে। পোষাকী গদারূপে গদাধর ব্যবহার করিতেন।

গদাধরের তাল বৃক্ষ সদৃশ সুদীর্ঘ বপুর উপর কেশহীন মস্তক ও সম্মুখে সুদীর্ঘ্য নাসা ও দুই পার্শ্বস্থিত লম্বমান কর্ণ দেখিয়া অনেক বালকের হাসি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া পড়িত। কেহবা গদাধর বাবুর অদ্ভুত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িত। ঐ সকল বিশিষ্টাপরাধীর জন্য গদাধরের বংশদণ্ড ডেস্ক

হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ ঐ সকল গুরু অপরাধীর হস্তের তালুকায় তৎপর ক্রমশঃ পৃষ্ঠে পার্শ্বে বাহু উরু জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানে চটাপট শব্দে পতিত হইতে থাকিত। ছাত্রগণ যন্ত্রনায় অধীর হইয়া চিৎকার করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিত। কখনও বা রক্তপাতও হইত; তখন অন্যান্য ক্লাসের মাষ্টার, হেড-মাষ্টার ঘটনার স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবসের জন্য যথেষ্ট হইয়াছে জ্ঞাপন করিলে গদাধরের ক্রোধাবেগ কথঞ্চিৎ উপশম হইত। হেড মাষ্টার হইতে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র পর্য্যন্ত সকলেই দুর্ব্বাসা কল্প গদাধরের কোপন স্বভাবকে ভয় করিত। স্থূলকথা গদাধর বাবু সমস্ত ইস্কুলের আতঙ্কের কারন ছিলেন।

(২)

সেখ রহম্মৎ নীচের ক্লাসে পড়িত। বয়স তাহার অধিক ছিল। সে পড়াশুনা একদাই করিত না। রহম্মৎ সেখের শ্বশুর সব রেজেষ্টরী আফিসের একজন কেরাণী ছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল যে জামাতাকে সামান্য লেখা পড়া শিখাইয়া তাহার নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু রহম্মৎ বয়সাধিক্য বশতঃই হউক অথবা এক ক্লাসে উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর থাকিয়া একই পুস্তক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে নারাজ হওয়া নিবন্ধনই হউক, পাঠে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিল।

ভাটিয়ালখানা রূপ হোটেলে রহম্মতের কুশিক্ষার দ্বার খোলা ছিল। সে ক্রমে একেবারেই পাঠ করিবে না বলিয়া কৃত সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। এ হেন রহম্মতকে দেখিলেই গদাধর বাবুর তাণ্ডব আস্ফালন ও হস্ত স্থিত গদা বিঘূর্ণন আরম্ভ হইত। বস্তুতঃ রহম্মৎ গদাধর বাবুর গদার বিশেষ পরিচিত বন্ধুছিল। গদাধর বাবু ক্লাসে আসিয়াই রহম্মতের পৃষ্ঠে দুই চার ঘা দিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিতেন। রহম্মতের ন্যায় গদার আহার্য্য আর দুইটী ছিল না। সেও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কখনও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত না। তাহাকে নীরব দেখিলেই গদাধর তাহার মনোযোগের কাঠি তদীয় পৃষ্ঠে আন্দোলন করিতে থাকিতেন।

একদিন রহম্মতকে গদাধর বাবু একটী প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর দুই ক্লাস নিম্নের যে কোন ছাত্র শুদ্ধ রূপে দিতে পারিত। রহম্মতের কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল, সে কথা কহিল ও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল; কিন্তু এমন একটী উত্তর দিল, যাহাতে ক্লাসের সমগ্র ছাত্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে যে একটী নিতান্ত অসঙ্গত উত্তর দিয়াছে, তাহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এইরূপ অসংলগ্ন উত্তর দিয়া সে একটু ভীত হইল। গদাধর বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার পোষাকী গদা বাহির করতঃ আস্ফালন পূর্ব্বক রহম্মতের দিকে ধাবিত হইলেন। সে কোন উপায় না দেখিয়া ক্লাসের বেঞ্চের নীচে প্রবেশ করিল। ক্রোধে জ্ঞান শূন্য গদাধর বেঞ্চের নীচে তাহার শরীরের কতকাংশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রহম্মৎকে দুর্জ্জয় বেগে আক্রমণ করিলেন। তখন রহম্মৎ অনন্যোপায় হইয়া পড়িল। বেঞ্চের নীচ হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইতে চেষ্টা করিল।

গুরু-ভার ডেস্ক ও বেঞ্চ কাৎ হইয়া গদাধরের উপর পড়িয়া গেল। দুর্ব্বল শরীর গদাধর চিৎপাত হইয়া পড়িলেন। ক্লাশের ছেলেদের হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইল। সকলের হাসি হঠাৎ গদাধর বাবুর আর্ত্তনাদে ভয়ে পরিণত হইল। ছাত্রগণ বিশেষতঃ বলিষ্ঠ দেহ রহম্মৎ তাড়াতাড়ি বেঞ্চ খানা উঠাইয়া ধরিল, কিন্তু তাহাতেও গদাধর বাবু উঠিতে পারিলেন না।

স্কুলের সকল শিক্ষক ছাত্র একত্র হইল। ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত কলেবর গদাধর বাবুকে ধরাধরি করিয়া উঠাইল। এক অদ্ভুত বীভৎস দৃশ্য সকলের নয়ন পথে পতিত হইল। বেঞ্চের গুরু-ভারে গদাধর বাবুর উপরের পাটির দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ কর্ণের কতকাংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রগণ তাড়াতাড়ি জল আনিয়া গদাধরের ক্ষতস্থান গুলি ধুইয়া দিল। মুখে ও মাথায় জল দিয়া গদাধর বাবুর চৈতন্য সঞ্চার করাইল।

হেড মাষ্টর জিজ্ঞাসা করিলেন কে এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। সকল ছাত্র নীরব হইয়া রইল। রহম্মৎ ভয়ে ভয়ে বলিল—"আমার অপরাধ হইয়াছে।"

তখন গদাধর বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন—"কাহারও কোন দোষ নাই। ভগবান স্বয়ং আমার শাস্তি দিয়াছেন।"

শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যায় দিন চলরে মোকাম!

(বাঙ্গালা সাধু ভাষা এবং প্রচলিত মুসলমানী বাঙ্গালার রচিত।)

যায় দিন চলরে মোকাম!
আসমানের কিনারায়
রাঙ্গা রবি ডুবে যায়;
উড়ে যায় চিড়িয়া তামাম।
তিলে তিলে ধীরে ধীরে
আঁধার আসিছে ঘিরে
নভে নূর রোস্‌নাই মশাল;
গাভী যায় জুড়ে বাট
ছাড়িয়া সে কত মাঠ;
পাছে পাছে ছুটিছে রাখাল।
অই ডেরা দেখা যায়;
আহ্লাদে দ্বিগুণ ধায়;
অই খানে সকল আরাম!
যায় দিন চলরে মোকাম!

যায় দিন চলরে মোকাম!
হিঙ্গুল মাখিয়া গায়
ঢেউ নাচে দরিয়ায়;
সিন্ধু পানে গতি অবিরাম।
যায় দিন হ'ল রাতি;
অবিরাম কাল গতি;
নীরবে ফুরায় আয়ু কাল।
দেহে প্রবেশিছে জরা;
নাই শব্দ, নাই সাড়া;
ঘোষণা করিছে সুরৎহাল।
এ জিন্দিগি মোসাফেরি,
আসক্ত দুনিয়াদারি
সাচ্চা, নহে খোয়াব তামাম।
আখেরি আঁধার পথে
নেকি বদি ফিরে সাথে,
যায় দিন চলরে মোকাম!

যায় দিন চলরে মোকাম!
মস্‌জিদের উচ্চ চুড়ে
আজান আসমান জুড়ে
জাহির করিছে কার নাম?
মরণের পরপারে,
জীবনের মুক্ত দ্বারে
নীরবে প্রাণেতে প্রাণারাম।—
খোলাসা দেলাসা বাণী,
পরিব্যক্ত প্রতিধ্বনি,
যায় দিন চলরে মোকাম!

শ্রীরেবতীমোহন রায় মৌলিক।

---

৩ এর রাজত্ব।
বা
RULE OF THREE.

(শারদীয় সংখ্যা সৌরভের জন্য লিখিত।)

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল; এখন সুখ দিতে জীবগণে সুখের শরৎ আসিয়াছে। আচ্ছা, বল দেখি ভাই, মা দুর্গা সম্বৎসরে কেবল তিন দিনের জন্য মর্ত্তে আগমন করেন কেন? ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করিলে পাঁচ সাত দশ দিনের জন্যওতো আসিতে পারেন। চাকুরে বাবুদেরও বছরে পূরা একমাস প্রিভিলেজ লিভ পাওনা হয়। তবে তাঁহার ক্যাজুয়াল লিভের মত, শুধু তিনটা দিনের ছুটি নেওয়া কেন? ত্রিনয়না তারার ৩ এর উপর এত অনুগ্রহ কেন?

ছেলে বেলা গ্রাম্য পাঠশালায় বর্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেই কায়ক্লেশে শিশুবোধক মুখস্থ করিতাম। কিন্তু হৃদয়স্থ হইত না; কেবল তোতা পাখীর মত "কহ কহ কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ" প্রভৃত উচ্চারণ করিতাম। মস্তকে আর্কফলা সমন্বিত যণ্ডামার্ক শর্ম্মা গুরু মহাশয় যখন করোদ্ধৃত সুদীর্ঘ রেফরূপী বেত্র কর্ত্তৃক আমাদের কূর্ম্ম পৃষ্ঠে মুহুর্মুহু রেফের কর্কশ মার্কা বসাইয়া (রক্ত) বর্ণের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াদিতেন, তখন গুরুর নির্দ্দয় ব্যবহারে তাঁহার হস্তস্থিত নির্জ্জীব রেফটাও লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিত। এইরূপে দুই হস্তেই তিনি অকাতরে শিক্ষা ধন বিতরণ করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে আমরা শিশুবোধক

বর্ণিত দাতা কর্ণ বলিতাম, এবং দাতাকর্ণের রেফের প্রতি আমাদের নিদারুণ মাখামাখি ভাব বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। শারদীয়া পূজার শেষরাত্রে যখন সানাইয়ের করুণ আর্ত্ত-নাদ "নবমী নিশি তুমি আর পোহাইয়ো না" গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত, তখন আমরাও আকুল হৃদয়ে কামনা করিতাম, আহা মা দুর্গা যদি তাঁহার রেফটি সম্বরণ করিয়া আরও "দুগা" (দুটা) দিন থাকিয়া যাইতেন, তবে তিনিও অনায়াসে আর কয়েকটা পাঁঠা ও মেষ লাভ করিতে পারিতেন এবং আমরাও গুরু-মহাশয়ের রেফ নামক বেত্রটাকে আরও কিছু কাল রম্ভা সম্ভারে পূজা করিবার অবসর পাইতাম। কিন্তু সানাইয়ের কাকুতি মিনতি এবং আমাদের শৈশব জল্পনা কল্পনা ও আকুল কামনা ব্যর্থ করিয়া নবমী নিশি যথা সময়েই পোহাইয়া যাইত। হায়, মা তিন দিনের বেশী কিছুতেই থাকিতে চাহেন না।

ভায়া, দেখিতেছি তুমিও এক মূর্খ পণ্ডিত, সর্ব্ববিদ্যা মহার্ণব। আর্কফলা আছে; এজন্য মূর্খ দেখিলেই একটু ভয় হয়। কিছুতেই রেফ ছাড়িবে না, তাই তর্ক করিয়া বলিতেছ, জগজ্জননী ভক্তগৃহে অতিথি মাত্র। অতিথিরা কোনও স্থানে একতিথি বা একদিনের বেশী থাকেন না; করুণাময়ী কৃপা করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অভি-প্রায়েই দুটা দিন বেশী থাকিতে সম্মত হইয়াছেন; এবং সেই কারণেই তিনি সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথি বা দিনত্রয় অবস্থান করেন।

আমি তোমার এ যুক্তি মানি না। এখন আমাদের শিশুবোধক অতিক্রমের পর বোধোদয় হইয়াছে। জ্ঞান নেত্রে দেখিতেছি, ত্রিনয়নার দিনত্রয় অবস্থানের ভিতর শাস্ত্র সম্মত গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য লুকায়িত আছে।

এই যে অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহা ত্রিনীতি বা ত্রিতত্ত্বে পরিপূর্ণ। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে ভগবান বিরাজমান। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত কথা। সাহেবরাও ত্রিনীতি মানিয়া থাকেন। The Father, the Son and the Holy Ghost এই Trinity. আমাদের বৈষ্ণবগণ বলেন:—

রাম জন্মে ধনুর্ব্বাণ, কৃষ্ণ জন্মে বাঁশী।
গৌরাঙ্গ জন্মে কমণ্ডলু, হলেন সন্ন্যাসী॥

স্বনামধন্য রামকৃষ্ণ পরমহংস এই ত্রিনীতি-সাধক ছিলেন। সন্ন্যাসীও যা, পরমহংসও তা। তিনি মধ্যস্থ হইয়া এই তিন অবতার বাদীদের বাদানুবাদ সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বহু ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁহারা —রাম ও নহে, কৃষ্ণও নয় এবং গৌরাঙ্গও নহে তাঁহারা রামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের শিষ্য ছিলেন।

ত্রিলোকের দিঙ্মণ্ডল ওঁকার ধ্বনিতে শব্দায়মান। ওঁ কি, না তিনটা ৩ এর একত্র সন্নিবেশ। তিন (৩) আর ত এক। দুইটা ৩, অর্থাৎ দ্বিত্ব ত (ত্ত) এর উপর আর একটা ৩ দিলেই অপরূপ ওঁ সৃষ্ট হয়। উপর আকাশে স্বর্গ, তাহাতে তৃতীয়ার চন্দ্র বিরাজমান, আর নিম্নে মর্ত্ত্য ও পাতাল একত্র সংলগ্ন। এই ত্র্যক্ষর ওঁকার 'ধ্বনিই' শব্দ ব্রহ্ম। যাঁহারা সবিস্তার তথ্য জানিতে চাহেন তাঁহারা মহা সন্দীপন তন্ত্রোক্ত বামণরূপ শ্রীবি-ক্রমের বিক্রম পর্ব্ব নামক তৃতীয় অধ্যায় দেখিবেন।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিদিবের ত্রিদশালয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাতালের তলস্থিত তমসাচ্ছন্ন বিবর পর্য্যন্ত সমস্ত জল স্থল ও অন্তরীক্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে ও যাবৎ রবিশশী তারা আছেন তাবৎ থাকিবে, একথা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অপর পক্ষে সত্ব কিনা স্বর্ণ বা মোহর, রজঃ কিনা রজত মুদ্রা বা টাকা, তমঃ কিনা তামা অর্থাৎ তাম্র মুদ্রা বা পয়সা, ইহা বৎসরের ফলাফল কথন কালে হর পার্ব্বতীকে সঙ্গোপনে বলিয়া দিয়াছেন।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব আলোচনা করিলেও ৩ এর মর্য্যাদা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই ধর প্রথমতঃ সৃষ্টির কথা। পৃথিবীতে যত জীব আছে, তাহারা স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। প্রধান জীবেরা তিন গণ; দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। এই ত্রিগণ তত্ত্ব জানা না থাকা হেতু বিবাহে রাজযোটক মিলন না হইতে পারিয়া অহরহ সৃষ্টি বিভ্রাট ঘটিতেছে। অর্থাৎ যিনি পুত্র চাহেন তাঁহার কন্যা হয়; আর যাঁহার কন্যা হয়, তাঁহার কেবল কন্যাই হয়। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি যে বাঙ্গালী তাঁহারাও প্রধানতঃ তিনজাতি। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। বাঙ্গালীদের নামও তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, দুর্গা চরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন সেন, চন্দ্র নাথ ঘোষ। এখনকার দিনে দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে এই তিনটি হইলেই যথেষ্ট। ততোধিক দারিদ্র্যায়। একথা অধুনা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশ কাল পাত্র ভেদ নাই। উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টিতত্ব মূল কাণ্ড শাখা, মুল ফল বীজ ও উহাদের স্পন্দন, গুম্ভণ ও স্ফুরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহাশয় যে আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।

সৃষ্টি ছাড়িয়া স্থিতির দিকটাও দেখ। স্থিতির তিন ক্রম। প্রথম, মধ্যম ও চরম। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু; তারিখ মাস সন একথা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। জীবন ধারণ কিম্বা আরাম কারণ যে যে বস্তু আমাদের প্রয়োজন হয়, তাহা সমস্তই প্রধানতঃ তিন সাধু উপায়ে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। চাকরী, বাণিজ্য ও চাষবাস। চাকরী খচমচ হইলেও সকলেই চাকরীর উমেদার। উহা একান্তই না মিলিলে, হাতের পাঁচ ওকালতি। বঙ্গে ওকালতীই একমাত্র বাণিজ্য বটে। কথার ক্রয় বিক্রয়। মূলধন আবশ্যক হয় না। তবে কাছারী যাতায়াতের জন্য ঘড়ী চেন এবং গোড়া হইতেই একখানি ঘোড়ার গাড়ীর জোগাড় রাখিতে পারিলে ব্যবসায় জমে ভাল। গাউন পরিয়া শামলা মাথায় দিয়া দ্বিচক্রযানে আরোহণ করিলে সুষুপ্তিমগ্ন ফটোগ্রাফার লম্ফ দিয়া উঠিয়া ক্যামেরা লইয়া ছুটিবে।

তারপর প্রলয় বা মৃত্যু। বায়ু পিত্ত কফের বিকারেই প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। ত্রিবিধ চিকিৎসা প্রচলিত। ডাক্তারী, হোমিও, কবিরাজী। কবিরাজী মতে এক রোগীকে দেখিতে তিন বৈদ্যের একত্র যাত্রা নিষিদ্ধ। আর ঃ—

যেমন তেমন জ্বর।
তিনটি উপোস কর॥

তিন উপবাসে না সারিলে ত্রিকটু মিশ্রিত ত্রিফলার রস ব্যবস্থা। তারপর অগত্যা মৃত্যুঞ্জয়ের ত্রিশূল ভরসা। মৃত্যুঞ্জয় জবাব দিলে ত্রিস্রোতা বা ত্রিবেণী তীরে "গয়া গঙ্গা গদাধর" ইতিপিণ্ডদান।

ধর্ম্মেরদিকও দেখ। ত্রিনীতি জানা থাকাতেই শৈব-সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল ভজনা করে। শাক্তদের পশুবৎ আচার বীরেও স্থায় আচার এবং সুমিষ্ট কুলের আচার। বৈষ্ণবেরা ত্রিবিধ তিলক ধারণ করেন, যথা রসকলি, হরিণ শৃঙ্গ ও বাঘ থাবা।

আদালতে ব্যারিষ্টার, উকীল ও মোক্তার। দেওয়ানী হাকিমেরা জজ, সবজজ ও মুন্সেফ। ক্ষমতানুসারে ফৌজদারীর ও তিন শ্রেণী। উহাঁদের বিচার বিধি ও তিন প্রকার,—সমন, ওয়ারেণ্ট ও সামারি। দণ্ড ও ত্রিবিধ জরিমানা জেল ও ত্রিভুজ বন্ধন বেত। মুন্সেফ মহাশয়গণ কদাচিৎ তিনমাসের প্রিভিলেজ লিভ একত্র গ্রহণ করেন। এ কারণ ৩ এর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য উহাঁদের ৩ বৎসর পর বদলীর ব্যবস্থা।

সর্ব্বত্রই ৩ এর প্রতাপ। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া বাস করিতে গেলে কেবল টাকা আনা পয়সা নয় উত্তম মধ্যম অধম সব রকমের জিনিস সংগ্রহ করিয়াও রাখিতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই আবার good, better, best অথবা bad, worse, worst তিন ক্রম বিদ্যমান।

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু এই তিন ঘটনার তারিখ-মাস-সন লিখিলেই বহু মানব পুঙ্গবের জীবন লীলা সম্পূর্ণ বিবৃত হইতে পারে।

৩ টা পাশ দিলে একটা ডিগ্রিলাভ এই পাশের জন্য ত্রিযামা যামিনী যোগে শয়নে স্বপনে পাঠ অভ্যাস ও মনঃযোগ সাধন করিতে হয়। কলম কালী কাগজ, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া, যাত্রা খেমটা কবিগান, থিয়েটার বায়স্কোপ সার্কাস। ঘরে-তাস, পাশা দাবা, বাহিরে-ক্রিকেট ফুটবল টেনিস ইত্যাদি রাম শ্যাম যদু সকলেই জানে। সাহেবদের দৃষ্টান্ত না দিলে তোমাদের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এজন্য বলছি। কাঁটা চামচ ছুরী। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্যতে উহাই যথেষ্ট।' পেয়তে গ্লাস লাগে বটে।

তুমি হয়তো ৩ এর মর্য্যাদা হানির জন্য, ৪ বেদ, ৫ বাণ, পঞ্চ ম কার, আর চাই কি পাঁচ আইনের কথাটা পর্য্যন্ত তুলিয়া পাথরে পাঁচ কীল বসাইয়া দিবে। অথবা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া চৌদ্দ ভুবন পর্য্যন্ত

শুনাইয়া দিবে। কিন্তু বাপু, ৩ এর উপর টেক্কা দেওয়া সোজা কথা নয়। অসার সংসার মাঝে খলু সার যে টাকা, পৃথিবীটা যার একান্ত বশ, তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর সাহায্যে বাজাইয়া জিজ্ঞেস কর দেখি, কি উত্তর দেয়? ঐ শুন, "তিন"! যে টা উত্তর দেয় দুই, চৌদ্দ বা আর কিছু, সে টাকে তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ কর, কিম্বা অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উহাকে আগুনে পোড়াও যাবৎ খাঁটি জবাব 'তিন' উচ্চারণ না করে।

তবু তুমি কথা বলচো! তিনের উপর যে আর কথা নাই। বিশ্বাস হয় না? নীলামদার ডাক হাঁক করিয়া ক্রমান্বয়ে "এক" "দুই" হাঁকিয়া অবশেষে "তিন" বলিয়া ফেলিলেই বস্, শেষ হইয়া গেল, আর কথা নাই।

ওহো, তুমি তো সাধারণ পণ্ডিত নও হে; একেবারে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ রেফ-ওয়ালা পণ্ডিত! তিন তিনটা বৎসর কায়মনোবাক্যে বেতমারা বিদ্যা শিক্ষা করিলে, আর ৩ এর পিঠে ৩ দিলে আমাদের ৩৩ কোটী দেবতার সংখ্যা পূরণ হয়, তবু তোমার ৩ এর প্রতি বিরুক্তি বিরক্তি ও অভক্তি!

কি? ৩৩ কোটি দেবতা মান না! বেশ পণ্ডিত যা হোক! তুমি অন্ততঃ গণিত শাস্ত্র মানিতে বাধ্য। এই ধর ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা। সংসারে একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি জমি। জমিদারী রক্ষা করিতে হইলে জরিপের প্রয়োজন। আমীনেরা যেরূপ ক্ষেত্র রচনা করুক না কেন, উহাকে ত্রিভুজে বিভক্ত না করিতে পারিলে পরিমিতিশাস্ত্রসম্মত কালি নির্ণয় হইতে পারে না। প্লেন টেবল সার্ভেতেও ত্রিভুজ নির্ম্মাণ অপরিহার্য্য! ত্রিকোণমিতি শাস্ত্র ও ত্রিতত্বের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। সমকোণের ডিগ্রি ৩ এর সমষ্টি। পাটীগণিতেও অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। ৩৲ টাকায় যদি ৭॥ মণ জিনিস পাওয়া যায়, তবে এক মণের দাম কত? গৃহস্থ ও বাজার হিসাবিগণ যাবতীয় দৈনন্দিন আয় ব্যয় কর্ম্মে Rule of Three এর কাছে মাথা নোওয়াইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহাই ৩ এর রাজত্ব।

এই ৩ এর গৌরব রক্ষার অভিপ্রায়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ ত্রিনয়না তারা বৎসরের তৃতীয় ঋতুতে তিন দিনের জন্য ভক্ত গৃহে শুভাগমন করেন। এবং এই নিমিত্তই তিনি এক বৃন্তে ত্রিপত্র সমন্বিত বিল্বপত্রের পূজায় বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর এই কারণেই কংগ্রেস ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন তিন দিবস ব্যাপী হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম মাহাত্ম্যে ও বর্ণিত আছে যে এই ত্রিতত্ব ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে পারিলে 'পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।' কেবল ত্র্যহস্পর্শের দিনে পাঁজি দেখিয়া জপতপ কর্ত্তব্য। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীপরমেশ প্রসন্ন রায়।

নব্য জামাতা।

(নক্সা)

প্রথম অধ্যায়।

তাঁর নামটি ছিল,—প্রাণেশ। জাতিতে জামাই, কুলে নব্য, শীলে হাকিম। সৌরভ—মাসিক চারিশত টাকা। স্বভাব—শ্বশুরবাড়ী আসা, বিশেষত্ব—সবছে হাম বড়া। কাজেই পাঠকগণ আমাদের এ হেন নায়কের চেহারা, মেজাজ ও দর অনুমান করিয়া লইবেন। অনেক বিজ্ঞ-লেখকের মতে এরূপ নব্যের চেহারার বিশেষত্ব—"এক-জোড়া দিগন্ত স্পর্শী গুম্ফ।" এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ ২ বলেন "নব্যদের দাড়ি গোঁফ নাই।" কেহ ২ প্রশ্ন করিতে পারেন "তবে কি নব্যরা স্ত্রীলোক?" উত্তরদাতা রাগিয়া বলিবেন—"কেন, স্ত্রীলোকেরা কম কিসে? হোক্ নব্যরা স্ত্রীলোক,—দোষ কি তাতে?" বস্, প্রশ্নকর্ত্তা লেজ গুটাইয়া কোণে সরিয়া গেলেন, আমি ও খালাস। মাঝখানে পড়িয়া গরিব মারা যাই কেন।

নব্যদের স্বভাবের বিশেষত্ব—একজোড়া চশ্‌মা আটা চোখের বিজ্ঞ চাহনী। হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি, মুখে চুরুট, ঘাড়ের কাছে, কানের কাছে চামছাটা চুল, পায়ে ডার্ব্বি সু ও ডোরাদার মোজা। অলমতি বিস্তারেণ। একে নব্য, তায় ডেপুটি,—একেবারে সোণায় সোহাগা।

কিন্তু,—অনেক নব্য রাগিয়া, চোখ রাঙাইয়া বলিবেন—"আবার কিন্তু কি মশায়? নব্য—বস্! সে ত

সেরা লোক। ৪০০৲ মাইনে, তারপর আর কিন্তু টিন্তু নেই। ও সকল "কিন্তু" তোমাদের 'ওল্ড্ ফুল্সদের' পেছনে লাগাও।" কি করিব, ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ টাট্‌কা মিথ্যা কথা সহিবে না। সত্যের খাতিরে কহিতে হইল —"কিন্তু"টা ডেপুটি বাবুর নিজস্ব না হইলেও তাঁহার শ্বশুর কুলের। নব্য সাহেব দল, কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করুন,—একটা ভীষণ লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিবার জন্য কোমল হৃদয়কে প্রস্তুত করুন,—"আমাদের ডেপুটি বাবুর শ্বশুর কুল হিন্দু, আর তাঁহার স্ত্রী কোনও কলেজে বিদ্যা-শিক্ষা করেন নাই।" নব্যবাবুরা ভীষণ উত্তেজিত হইলেন। এরূপ উত্তেজনা সেপাই বিদ্রোহেও দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন "ডাইভোর্স করুন মশায়, divorce করুন। এরূপ unequal match অসম্ভব, হ'তে পারে না। একজন বিশিষ্ট নব্য, তায় হাকিম, তার marriage কিনা একটা silly village girl এর সঙ্গে! That's অসহ্য মশায়। Oh me! how cruel, how repulsive idea. Oh mother India একবার eye lids খুলে দেখ, তোমার একজন learned son আজ কি প্রকারে ruined হতে যাচ্ছেন। হায়, হায়!!"

সহানুভূতি ও করুণায় অনেক নব্য কাঁদিয়া ফেলিলেন, তৎপর বা' হাতের কোটের আস্তিন হইতে এসেন্স মাখা রুমাল বাহির করিয়া নাক ফোঁত ২ করিতে লাগিলেন। আহো-হো! কি ভ্রাতৃপ্রেম!

প্রস্তাবটা ডেপুটি বাবুর কর্ণমূল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তিনি করুণার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তা' আমরাইত mother Indiaর মুখ উজ্জল করব। যা একটু self sacrifice করা উচিত, তার আমরাই example set করব; যা দেখে future generation অবাক হ'য়ে gaping mouth এ বসে থাক্‌বে। একটা সামান্য rustic girlএর জন্য নিজকে sacrifice কর্ত্তে যাচ্ছি ওঃ এ ত কত সুখের, কত আনন্দের! পরের জন্য self sacrifice, এ তো পৃথিবীতে Godএর finest blessing. তোমরা সবাই আমার example follow কর।"

ঘন ঘন হাত তালিতে Mother India কাঁপিয়া উঠিলেন, আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তের ফলে নব্যদলে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বাধিয়া গেল; বোধহয় পদ্মিনীর জহরব্রতও এই তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! তবে দুষ্ট লোকে বলে ডেপুটির স্ত্রীটি নাকি খুব সুন্দরী। যাক্ বড় ঘরের বড় কথায় আমাদের কাজ কি! পরদিন সকলের চোখে তাক্ লাগাইয়া ডেপুটি self sacrificeএর জন্য শ্বশুর বাড়ী চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাণেশ বাবু কথা বলিতেন অর্দ্ধেক ইংরেজী অর্দ্ধেক বাঙ্গ্লায়,—যেমন সকল নব্য বাবুরা বলিয়া থাকেন। শ্বশুর বাড়ী আসিয়া শ্যালক দীনেনকে বলিলেন"—I say দীনেন তোমার Sisterকে ইংরেজী শেখাও না কেন? English না শিখ্‌লে সব বিষয়ে Understanding power খুলে না। তোমার Sister English না জান্‌লে চল্‌বে কি করে? তাঁর English জানাটা যে essential. দেখ না আমার friends সব সুবৃহৎ লোক,—I mean great men—বড় মুস্কিল তোমাদের বাঙ্গ্লাটায় proper synonyms পাওয়া দুস্কর! I mean, দেখ, আমার absence এ আমার friends দের receive চাচ্ছিত কর্‌বে। তাঁরা তো আর তোমাদের friends দের মত যে সে লোক নয়!

দীনেন বলিল—"তা মশায়, ইংরেজী শেখাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ যে বাঙ্গালীর মেয়ে একটা বিতিগিচ্ছে ধরণে স্বামীর বন্ধুকে আপ্যায়িত কর্‌বার জন্য নির্লজ্জের মতো পর্দা ছেড়ে যাবে, তা' আমি পছন্দ করি না।"

প্রাণেশ। (মাথা নাড়িতে ২) "There you are mistaken দীনেন। Ideaটা কি জান, স্ত্রীলোকদের independence দাও। আর এই educated ageএ screenএর গণ্ডীর ভিতর রেখ ন তারা যার সঙ্গে খুসী যাক্, যার সঙ্গে খুসী আলাপ করুক। কেন, আমরা কি যার সঙ্গে খুসী বেড়াই না, আলাপ করি না,—কে বাধা দেয় তাতে? তবে ওরা ও freely অন্যের সঙ্গে mix করুক না? আপত্তি কি তাতে? ওটা আমাদের weakness কিন্তু। কেবল আমাদের কাজে interfere

না কর্‌লেই হ'ল। এই ধর আমার friends—J. T. Wood fox কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট, R. X. Flockstone ভাগলপুরের পুলিশ সাহেব, A. Rockvalley পাঞ্জাবের কমিশনার—এদের মেমরা কেমন freely mix করে আমাদের সঙ্গে! সে দিন একটা case পর্য্যন্ত হ'লো, যা'তে তোমাদের ভেতর হ'লে blood shed না হ'য়ে যে'ত না,—কিন্তু সব চুপ্‌ চাপ্‌। সুধু divorce করে যে যার জোড়া মিলিয়ে নিল, টু শব্দটুকু হ'ল না। কি civilised! সবইযে—"

ইহার উপর আর তর্ক চলে না দেখিয়া দীনেন উঠিয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণেশ ভাবিয়াছিলেন তাঁহার আগমনে শ্বশুরালয়ে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে; কিন্তু কিছুর ভিতরই একটা বিস্ময়ের ভাব নাই, সব চুপ চাপ। "একটা সেকেলে হিন্দু পরিবার, মেয়েরা পাক করে, কাপড় পরে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে—তাতেই মজে আছে। তার একজন নব্য, তায় ডেপুটি—দেখিয়া অবাক হইল না!—"প্রাণেশ নিজেই অবাক হইলেন। "What matter হ'তে পারে এটা? কি bigfools এরা যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাড়ীতে দেখেও অবাক হ'ল না। না, fool গুলো ডেপুটি কি তা' appreciate কত্তেই পারেনি।" গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া ডেপুটি সিদ্ধান্ত করিলেন "হাঁ, I mean, তাই ঠিক। এরা totally fools" পরে সন্তোষের সহিত ভাবিতে লাগিলেন "যাক্‌ কাল খুব চাল চেলেছি। দীনেনের কাছে যে সব সাহেব সুবোর নাম ঝেরেছি, তারা আমার friends বলে নিশ্চয় আজ একটা হৈ চৈ পড়বে।"

একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতে ২ ডেপুটি এরূপ ভাবিতেছিলেন। সহসা একজন বৃদ্ধের আগমনে তাঁহার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল। বৃদ্ধের ললাটে চন্দনের ছাপ, মাথায় ছোট্ট একটি টিকি, চেহারা বেশ প্রসন্নতা ব্যঞ্জক। ডেপুটি বক্রভাবে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া মনে ২ বলিলেন, "ডেম্‌ন্‌ ইউ টিকিধারী ওল্ড ফুল্‌স্‌, তোমাদের জন্যই তো মাদার ভারতবর্ষের এ অবনতি; জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা সব তোমরাই স্পয়েল কোচ্ছ।"

বৃদ্ধ কাছে আসিয়া জামাতার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তুমি রমণের জামাতা। তা বেশ, বেশ; অল্প বয়সে হাকিমী পেয়েছ বাবা, একটু সাবধান হ'য়ে চ'লো। খেটে খেটে জীবনী শক্তি নষ্ট করে, তবে এখন এই বৈতরণীর তীরে এসে চার শো টাকা পেন্সন পে'তে পেরেছি। এত খানি কি আর তোমরা পারবে।"

"আ সর্ব্বনাশ; বৃদ্ধটা চারশো টাকা পেন্সন পায় তা হ'লে কোন স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ ছিল।" বিস্ময়ে, ভয়ে ডেপুটির হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গেল, ডেপুটি দাঁড়াইয়া উঠিলেন! "তা বাবা বোস বোস, ব্যস্ত হ'য়ো না; আমি তোমার জ্যাঠা শ্বশুর, আমার কাছে লজ্জা কি। ওরে মাধা বাবাজীকে আর এক পেয়ালা চা দে'যাতো।" জামাতার মুখে আর কথা সরিল না। হেঁট মাথায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ ভাবিলেন—বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈকাল বেলা প্রাণেশ একটা সোফায় হেলান দিয়া রেনল্ডের একখানা নভেলে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতেছিলেন, উঃ বৃদ্ধটা প্রায় হাজার টাকা মাইনে পে'ত। হা-জা-র টা-কা! ওঃ অসম্ভব! এরূপ রেফ যার মাথায়, চন্দনের ট্রেড মার্ক যার সর্ব্বাঙ্গে, সে হাজার টাকা কেন,একশো টাকাও পে'তে পারে না। গভরন্‌মেণ্ট কি এত ফুল, আই মিন্‌ এত সোজা যে একটা টিকটিকিকে দেবে এত মাইনে! ও ডেম লায়ার মিথ্যা বলিয়াছে, আর আমি বিশ্বাস করেছি—আঃ কি সরল আমি! এই সান্ত্বনায় ডিপুটির ক্ষুণ্ণ মনটা একটু হৃষ্ট হইল।

তিনি একটা ইংরেজী গৎ শীশে বাজাইতে লাগিলেন।

এমন সময় কয়েকটি যুবক আসিয়া বলিল "প্রাণেশ বাবু, (উঃ কি মূর্খ, মিষ্টার না বলিয়া বাবু বলিল!) একা বসে কেন? চলুন আমাদের হরিসভায় কীর্ত্তন আছে, যাবেন, চলুন।"

অবাক হইয়া প্রাণেশ বলিলেন "হরিসভা, হরি সংকৃতন্‌, আই মিন্‌—কি হয় তাতে?"

সকলে হাসি চাপিয়া বলিল, "তাতে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও উপদেশ দেওয়া হয়, পরে হরিনাম গান হয়।"

প্রাণেশ আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন,"বাই জোভ, আই আণ্ডারষ্টেণ্ড্ নাও, আপনারা এসব ট্রাইফ্লিং মেটার্সে ও সময় উড়ান! কেন, হাতে আর কোন কাজ নেই! আই মিন্, ভেলুয়েবল টাইম গুলো কোনও ইমপরটেণ্ট কাজে স্পেণ্ড্ করুন না কেন, যাতে মাদার ইণ্ডিয়ার কোন বেনিফিট হোতে পারে। আপনাদের সবাইকেই ত বেশ এনারজেটিক দেখায়, বিশেষ হরি সভা সম্বন্ধে (পরিহাস-জনক হাস্য)। কেন, বিলেত গিয়ে আপনারা কোন একটা বিষয় বেশ ষ্টাডি কোত্তে পাত্তেন, কত 'বেনিফিট' হোত দেশের।" তৎপর অবজ্ঞাভরে পার্শ্ববর্ত্তী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেন আপনি মহাশয়?' পার্শ্ববর্ত্তী অন্যএকটী যুবক উত্তর করিল "ইনি এবার 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্' পাশ করে রংপুরে কাজ নিয়ে এসেছেন। যে ক'দিন কাজে যোগ না দিবেন সে কদিন গ্রামের ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য খাটছেন। সবাই মিলে হরিসভা ও একটা হিন্দু-স্কুল স্থাপন করেছি, যাতে গ্রামের দরিদ্র ছেলেরা নিজেদের ভাষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কোত্তে পারে। উঠুন আপনিও আমাদের উৎসাহ দিন।" নেহাৎ সরল ভাবে যুবকটী কথাগুলি বলিল।

তন্মুহূর্ত্তে সহস্র বজ্রপাত হইলেও প্রাণেশ অধিক চমকিত হইতেন না। স্তম্ভিত হইয়া সেই যুবকের স্নিগ্ধ সরল গর্ব্বহীন মুখের দিকে সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

"শরীর ভাল নয়" কম্পিত কণ্ঠে এ ক'টি কথা বলিয়া প্রাণেশ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতে প্রাণেশ নদীর ধারে বেড়াইতেছিলেন। মুখে চুরুট, হাতে ষ্টিক, সাথে শ্যালক দীনেন। প্রাণেশ পায়চারি করিতে করিতে গত দিবসের কথা গুলি পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ক্রমে তাহারা একটা সুন্দর বাঙ্গালোর নিকট আসিলেন। প্রাণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটা কাহার বাঙ্গালো?" রগড় জমাইবার জন্য দীনেন বলিল—"ম্যাজিষ্টেট উডফক্সের, ইনি পূর্ব্বে কটকে ছিলেন।" দীনেনের যেন সে দিনের কথা কিছুই মনে নাই। "এঁঃ উডফক্স্ এখানে—তা ত জানিনা।" সেত আমার ফ্রেণ্ড; চাই তো তাকে দিয়ে তোমার নমিনেশন টা পাইয়ে দিতে পারি। দাঁড়াও তুমি, তার সঙ্গে দেখা করে আসি।" প্রাণেশ শ্যালকের সমক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে যাইয়া মাই ডিয়ার উডফক্স্ সম্বোধনে এক স্লিপ পাঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিকই কটকে উডফক্সের সহিত প্রাণেশের একটু বেশী খাতিরই হইয়াছিল।

কিন্তু এই ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম উইলসন, উডফক্স্ নয়। উডফক্স্ প্রাণেশের বন্ধু, তাই রগড় বাধাইবার জন্য দীনেন উডফক্সের নাম বলিয়াছিল। রগড় জমিল; কিন্তু দীনেন যেরূপ ভাবিয়াছিল, তাহা হইতে অনেক খানি সাংঘাতিক ভাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"জামাতা বাবাজিউ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে বেজায় অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন।" শাখা পল্লবের সহিত এই কথা বাতাসের অগ্রে রাষ্ট্র হইয়া গেল। অভিমানে অপমানে প্রাণেশ শয়ন ঘরে শয্যায় মুখ লুকাইলেন। এখন কি করিয়া এ বাড়ী ত্যাগ করিবেন। কি করিয়া শ্যালকদের এড়াইয়া পলাইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। রাস্তার ধারে দুটা লোক ফুস্ ফুস করিয়া কথা কহিতেছিল; প্রাণেশ ভাবিলেন, তাহারই কথা হইতেছে। কলহ করিয়া একজন আর একজনকে প্রহার করিল; প্রহৃত ব্যক্তি বলিল "এরূপ অপমান অসহ্য। এ ভাবে অপমানিত হওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা ভাল।" প্রাণেশ ভাবিলেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ সব বলা হইতেছে।

রাত্রি হইয়াছে; তবু অন্ধকার হইল না। পোড়া চাঁদ কি জ্যোৎস্না ছড়াইবার আর দিন পাইল না। হায়, আকাশে একখণ্ড মেঘ নাই যে নচ্ছার চাঁদের হাসি মুখটা ঢাকিয়া দিবে। কিরূপে এ বাটী ত্যাগ করা যায়। ডেপুটি ভাবিয়া ভাবিয়া কাতর হইলেন।

পত্নী শৈলজা তাহার আহার্য্য নিয়া আসিল। নৈশ ভোজনে অক্ষুধা শুনিয়া বুদ্ধিমতী পত্নী ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন—"এজন্যইত সবাই তোমাকে ঠাট্টা

করে। কেন এ সব ঠাট্টা তুমি গা পেতে নাও। ঠাট্টাকে ঠাট্টা বোলে উড়িয়ে দিলেইত সব চুকে যায়।"

পত্নীও পরিহাস করে। প্রাণেশ এবার রাগিয়া বলিলেন—"তোমরা এডুকেশন না পেয়ে একেবারে বয়ে গেছ। হাজবেণ্ড এণ্ড ওয়াইফে কি কনেকশন্ তোমরা ফিল্ কোত্তে পার না। এই সে দিন ইয়ুরোপে একজন সাহেব একলাখ টাকা কারবারে লস দিয়ে একবারে ষ্ট্রীট বেগার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার স্ত্রীর নামে একটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফার্ম ছিল, তাতে স্বামীকে রোজ সিকস্ ডলারস্ মাইনেতে এমপ্লয় করল। একটা অর্ডিনারী লেবারারের মাইনে থ্রি ডলার্স্. সেখানে স্বামী বোলে লেডিটি ডাবল্ মাইনে দিল। কি আশ্চর্য্য লভ। সে রকম প্রত্যেক ওয়াইফেরই হাজবেণ্ডের পোভার্টি ও ইন্‌সাল্টে, আই মিন্—দারিদ্র্য ও অপমানে ভাগ নিতে হয়।"

স্ত্রী হাসি চাপিয়া বলিল—"তা তুমি কি বল আমার প্রাপ্য ভাগের জন্য আমি ও সাহেবের কাছে গলা ধাক্কা খেয়ে আস্‌ব? এতে তোমার শাস্তি না হয়ে বরং দ্বিগুণ কষ্টই যে হবে। তবু ও যদি বল, তবে চল।"

"কি তুমি ও ঠাট্টা আরম্ভ কর্‌লে।" প্রাণেশ এবার সত্যি সত্যি কাঁদিয়া ফেলিলেন। "ওয়েষ্টার্‌ন্ কান্‌ট্রিতে হাজবেণ্ড ওয়াইফে কি সুন্দর কনেক্‌শন্, আর এখানকার ওয়াইফ গুলো কি রাবিশ, এখানে এক মুহূর্ত্ত ও থাক্‌তে নেই।" প্রাণেশ উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কলার, নেক্‌টাই, হ্যাট্, ষ্টিক্ খুজিতে লাগিলেন।

এবার পত্নী যাইয়া হাত ধরিয়া মিনতি সুরে বলিল—"ওগো ঠাট্টা করেছি আমি, তাতে কি কাঁদতে আছে।" তারপর অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছাইয়া বলিল—তুমি রাগ করো না। দীনেনের কি আক্কেল আছে, না বুদ্ধি আছে। ও কে তো সকলেই দোষ দিচ্ছে। এখন এসে চারটি খাও; আহা মুকখানা শুকিয়ে গেছে গো।"

কে বলে দুঃখের আগুণ বেশী, পেটের আগুণের চেয়ে! কখনও নয়। সুতরাং কাজেকাজেই—প্রাণেশ চন্দ্র ভাতের থালার নিকট বসিয়া গেলেন। তখন হাত, মুখ, রসনা দশন ও উদর এই পঞ্চেন্দ্রিয় যে যার কাজে লাগিয়া গেল। জনশ্রুতি এরূপ—পেট-বহ্নি নিবিলে পর. আবার নাকি শোক-বহ্নি জলিয়াছিল; কিন্তু পত্নীর অঞ্চল-ব্যজন সেই বহ্নিকে দাবানলের আকার ধারণ করিতে দেয় নাই।

পরদিন শ্যালকগণ ঘুম হইতে উঠিয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে গিয়া—দেখিল, জামাতা বাবু নিশাযোগেই আত্ম-রক্ষার পথ দেখিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

ঘুম্ ঘুম্ কে

দুনিয়া কা সুরৎ দেখ্‌না।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসের এক সন্ধ্যায় চতুর্দ্দশীর চাঁদ অতি উজ্জ্বল আলোক ছড়াইয়া উঠিতেছিল। জ্যোৎস্না ফুটিলে মানুষের মনে যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি হয়; চলা, বলা, জটলার তখন একটা ধুম পড়িয়া যায়। নদীর পারের পথে লোকজনের যাতায়াত জলের স্রোতের মতনই খরতর বহিতে থাকে। নদীর ধারে কোথাও বৈঠকের আসর থাকিলে উহা গল্প, গুজব, গান বাজনায় উথলিয়া পড়ে।

সে সময়ের ব্রাহ্মদোকান ময়মনসিংহ নগরবাসিগণের বাঁধা আসর ছিল। কত লোক আসিত, যাইত, বসিত, গান গাহিত, কথার কাটাকাটি করিত; হাস্য পরিহাসে দোকান প্রমোদ-ভবন বলিয়া মনে হইত। কথার কাটাকাটি যেন ঘুড়ী খেলা—গোত খাইতেছে, কাণ্ট দিয়া যাইতেছে, ঐ পেঁচ বাঁধিয়া গেল, ঐ সূতা কাটিয়া ঘুড়ী আশ্রয়হীন হইয়া উড়িয়া চলিল। তখন হাততালি ও হো হোতে মহাহট্টগোল; কাণ পাতা দায়!

শরতের সন্ধ্যা। ব্রহ্মপুত্রের গা ঘেসিয়া ব্রাহ্মদোকান। জলের স্রোতে সোণার তবক মুড়িয়া চাঁদ উঠিয়াছে। পূবের দিকের বারান্দায় লোকের বড় ভিড়। দোকানের প্রাণপুরুষ শরচ্চন্দ্র সকলের আদর আপ্যায়নে নিযুক্ত। বারান্দার ভিতর আসিয়া চাঁদের আলো পড়িয়াছে। কেমন করিয়া কোন্ সূত্রে কাহার মুখে যে সন্ন্যাসীর কথা উঠিল তাহা মনে নাই। কিন্তু জ্যোৎস্নার মতনই যে সন্ন্যাসীদের কথা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সে কথা

খুব মনে আছে। জলের ঢেউ আছে, কথারও ঢেউ আছে, বিশেষতঃ অদ্ভুত কথার। সন্ন্যাসিগণ সংসারীর নিকট জগতের এক অপূর্ব্ব জীব! হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে আসাম পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী-জীবনের অলৌকিক কথার ফেণিল তরঙ্গের অবধি থাকিল না। এ জীবনে অলৌকিক শক্তির কাহিনী কতই তো শুনিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীর মতন সন্ন্যাসীতো দেখিলাম না। কি জানি, সেদিন কোন্ টানে ঐ বাঁধা বৈঠক ছাড়িয়া বারান্দা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ব্রাহ্মদোকান হইতে রাজপথে দক্ষিণ দিকে কতদূর চলিয়া বাঁ দিকে লক্ষ্মী দেব্যার ঘাট, দাইনে শিবের মঠ। সদাশিবের শান্ত এবং অদ্বৈত ভাব বুঝাইবার জন্য যেন মঠের সূক্ষ্ম চূড়া আকাশ চুমিয়া রহিয়াছে। আনমনে চলিয়াছি; হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মুখা মুখী ধাক্কা লাগিয়া গেল। যেন চাঁদের আলোর সঙ্গে টকর খাইয়া ঠিকরিয়া পড়িবার মধ্যে। সদানন্দ সন্ন্যাসী, গৌর তার বরণ, গৈরিক তাঁর বসন, বয়স পঁয়ত্রিশের অধিক হইবে না। নবীন সন্ন্যাসী চারিদিকে কাহাকে যেন খুঁজিয়া চলিয়াছেন। তবে কি এতদিনে সাচ্চা সন্ন্যাসী মিলাইল বিধি!

এই সময়ে বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস উপস্থিত! সন্ন্যাসী দেখিয়া তিনিও সঙ্গ লইলেন। সন্ন্যাসী উত্তর দিকে আসিতেছিলেন। আমরা দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর না হইয়া সন্ন্যাসীর পদানুসরণ করিলাম। বহুলোক তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে যে খানে সন্ন্যাসী-কথার আরম্ভ হইয়াছিল এই সন্ন্যাসীকে সেই ব্রাহ্মদোকানে লইয়া আসিলাম।

ব্রাহ্মদোকানের পূবের বারান্দায় তখনও বহুলোক বসিয়া আছেন। স্কুলের ছাত্র অনেক। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সকলেই সম্মান ও অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু তিনি বারান্দায় তিষ্ঠিলেন না, তিনি বারান্দা এবং নদীর কিণার উহার মধ্যে যে খোলা জমি ছিল, সেই জমির সবুজ আসনে বসিয়া পড়িলেন। মুক্ত আকাশ তলে যেন আনন্দময় পুরুষের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীকে আমরা কিঞ্চিৎ আহার করিতে বলিলাম। কিন্তু আহারে তাহার তেমন মন ছিল না। কিসের ক্ষুধা যেন তাঁহার চক্ষে। এই ভরা নদী, ঐ নদীর ওপারে। নৌকায় নৌকায় ফুল জলিতেছে, আকাশ জুড়িয়া চাঁদের আলোক, এই সবে তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু তিনি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণের দোকান হইতে কিছু লুচী ও কিছু মিঠাই আনাইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। তিনি মিষ্টি ছুঁইলেন না, একখানা লুচী পাটীসপটার মতন মুড়িয়া দাইন হাতের মুঠায় ধরিলেন, মুঠ হইতে দুদিকে যে টুকু বাহির হইয়া পড়িল, তাহা ফেলিয়া দিলেন, ভিতরে যাহা থাকিল তাহা মুখে দিয়া এক ঘটি জল খাইলেন।

ইহার পর তাঁহার সঙ্গে কথা আরম্ভ হইল। তাঁহার নাম কি, তিনি তাহা বলিলেন না। মহাজনের লবণের নৌকার আমার নাম কি? বলিলেন—তিনি পশ্চিম হইতে আসিতেছেন, কামাখ্যা চলিয়াছেন, গুরুর আদেশ —দুই বৎসর কাল "ঘুম্ ঘুম্ কে দুনিয়াকা সুরৎ দেখ্ না", তারপর ফিরিয়া গেলে গুরু তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিবেন। সুরুৎ দেখবার মতনই তাঁহার চক্ষু—সার্চ্চ লাইটের মতন চারিদিকে যেন আলো ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সেখানে বসিয়া ছিলেন, যাঁহারা পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সকলেই যেন মনে করিলেন, সন্ন্যাসী স্বর্গরাজ্যের টেলিগ্রাফ অফিস, ব্রহ্মপুত্রের তীরে ব্রাহ্মদোকানে অফিস এই মাত্র খোলা হইয়াছে। প্রশ্নের বিরাম নাই কিন্তু তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই; একমাত্র কথা "ঘুম্ ঘুম্ কে দুনিয়াকে সুরৎ দেখ্ না।"

প্রথম রাত্রে বহুলোকের ভিড়ের মধ্যে কোন সঙ্গোপন কথা হইতে পারিল না। পশ্চিমের বারান্দায় তাঁহার জন্য শয্যা করিয়া দিলাম। কথা থাকিল শেষ রাত্রে নিগম কথার প্রসঙ্গ হইবে।

আমরা আহার করিয়া শুইলাম, ভাল নিদ্রা হইল না। যখন রাত্রি ৩টা তখন সন্ন্যাসীর শয্যার নিকট যাইলাম। শয্যা তেমনি আছে কিন্তু সন্ন্যাসী নাই। তখন চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, আকাশে জ্যোৎস্না নিরলে নিদ্রা যাইতেছে। সন্ন্যাসী এত সৌন্দর্য্য বাহিরে রাখিয়া ঘরে ঘুমাইতে পারেন নাই, 'ঘুম্ ঘুম্ কে দুনিয়াকা সুরৎ দেখ্ না' বলিয়া হয়ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর

ঘরে যাইতে মন চলে নাই। খোঁজ,খোঁজ। সদর ঘাট, লক্ষ্মী দেব্যার ঘাট, নদীর পারের সকল পথ, কোথাও আর সন্ন্যাসীর সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা অনেকে তল্লাসে বাহির হইয়াছিলাম, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর নিদ্রা হইল না, কাণের ভিতর প্রাণের পরতে পরতে সেই সদানন্দ সন্ন্যাসীর সেই কথাই প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল--ঘুম্ ঘুমকে ছুনিয়াকা সুরৎ দেখ্ না।

আর তোমার ছুনিয়া! আর তোমার ছুনিয়াকা সুরৎ দেখ্ না! সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইবার পর আজ এক কুড়ি পনর বছর চলিয়া গেল - ঘুম্ ঘুমকে ছুনিয়া তো কম দেখা হয় নাই। পাহাড় পর্ব্বতের সুরৎ, নদ নদীর সুরৎ, সাগর মহাসাগরের সুরৎ। কত খোপসুরৎ ফুল তুলিলাম, কত খোপসুরৎ মালা গাঁথিলাম, কত খোপসুরৎ ফুল ও মালা জনে জনে বিলাইলাম। রমণীর রূপ, পুরুষের প্রতিভা—সে তো ছুনিয়ার আওয়াল সুরৎ। তাও তো বহুৎ দেখা হইল। যে উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীর গুরুদেব, সন্ন্যাসীকে ঘুম্ ঘুম্ কে ছুনিয়ার সুরৎ দেখিতে বলিয়া ছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য হয়ত সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী হয়ত এতদিন কিম্বা ইহার কত আগে হয়ত আসল সুরতে ডুবিয়া আত্মারাম হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৃথায় গেল আমার সব সুরতের অন্বেষণ! যদি ভব নদীর ওপারে এইরূপ ছুনিয়া থাকে, যদি দেল দরিয়ায় আমার মেজাজ সরিফ থাকে, তবে ঘুম্ ঘুমকে ওখানে একবার দেখা যাইবে—যাঁ'হতে সকল সুরতের পয়দা, তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কিনা? এপারে তো হলো না, ওপারে হবে কিনা কে জানে?

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

হোটেল বাস।

'বিশুদ্ধ' দেখিয়ে শুদ্ধ বিশ্বাসে
যখনি পশিনু অন্দরে,
তখনি নাসায়, কেমন বোট্‌কা
পশিল একটা গন্ধরে!

'সাম্য' ঘোষণা, করিছে ডাকিয়া
এস কে প্রসাদ লইবে,
"পাকা পায়খানা", "তিন তরকারী",
"একেবারে সব হইবে।"

'মৈত্রী'র হিসাব, অতি চমৎকার,
সবাই মিশিয়া খায়,
আমি শুধু একা, একেবারে বোকা
কিছুই বুঝি না হায়!

'স্বাধীনতা' হেথা, সমান সবার,
হুকুমে সমান সব,
"দাও ডাল ভাত, দাও জল নুন্
দাও দাও" শুধু রব।

'সত্য' এখানে, নিত্য বিরাজে
মিথ্যার নাইকো লেশ,
সাড়ে তিন আনা, পয়সা নগদে
ভোজন হইবে বেশ।

'প্রেম' এখানের, অতীব অদ্ভুত,
ঠাকুর ও চাকর জানে,
রাস্তা হইতে, কথায় ভুলা'য়ে,
কাপড় ধরিয়া আনে।

'পবিত্রতা' হেথা অতি পুরাতন
কিই বা বলিব আর?
ভাতের টুক্‌রী, সক্‌ড়ী বহিয়া
ঘোষণা করিছে তার।

একসের ডাল, জল আধমণ,
ডালে জলে নাহি মিশে,
চোখ ছুটী বুঁজি দিনে করি তল,
রে'তে নাহি রাখি দিশে।

বত্রিশে আটাশে, পাচনের বাঁধ,
"ঘাসকাটা" তরকারী,
ডালের পশ্চাতে, পড়ে এসে পাতে
ভোজনে চিনিতে পারি।

অমৃত বলিয়া, ছানিয়া মাখিয়া
যতনে উদরে ভরি

চাহি আরবার, "দেওগো ঠাকুর
আর একটুকু করি।"
মরিচের জলে, মাছটুকু দিয়ে
চামচে বিলায় পাতে
আঁশ্‌টে গন্ধে, বমি যদি আসে
নাসিকা ধরি বাঁ হাতে।
আর এক দেখি, অদ্ভুত একি,
—অফুরন্ত সেই ভাণ্ড,
দেখিয়া শুনিয়া, হইনু অবাক্
যেন দ্রৌপদীর কাণ্ড!
ঠাকুর!
বসন তোমার, রজকের পাট
জন্মে যদিও দেখেনি,
মাজিতে দন্ত, ধুইতে মুখ
যদিও শাস্ত্রে লেখেনি—
তবু ঘাম গায়ে, কাদা মাখা পায়ে
পৈতে ঝুলায়ে আসিয়ে,
শুভদৃষ্টি কর, আমার উপর
শুধু একটুকু হাসিয়ে।
মাহিক উপায়, গতিরন্যথা
এ হট্ট মন্দির ছাড়া
তবুওত আছি, ইহার কল্যাণে
—রেখেছি দেহটি খাড়া।
তোমার দুয়ারে, লিখে দাসখত
দিয়েছি মৌরশী পাট্টা।
যত দিন বাঁচি, খাই বা না খাই
পায় দিব টাকা আট্টা।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-সংবাদ।

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁহার বাম উরুতে একটা দুরারোগ্য বিস্ফোটক হইয়াছিল। রুগ্ন শয্যায় থাকিয়া কবি বাঙ্গালা সরল পদ্যে গীতার অনুবাদ করিতেছেন। এই অনুবাদ তোষভাণ্ডারের রাণীর ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে।

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের অন্ধ কবি ভবানী দাসের "দুর্গামঙ্গল" সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবি ভবানী দাস প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। জন্মান্ধ কবি তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

"কাটালিয়া গ্রামে কর বংশেতে উৎপত্তি।
নয়ন কৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি॥
জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে
অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে॥

(ময়মনসিংহের বিবরণ।)

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জে, এন, দাস মহাশয় মহারাষ্ট্র পুরাণের আলোচনা করিতেছেন। এই গ্রন্থ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ধারিশ্বর গ্রামের গঙ্গানারায়ণ দেব কর্ত্তৃক বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে লিখিত। কবি হিসাব নিকাশ দিতে যাইয়া মুর্শিদাবাদ্ বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। তখন মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর বাঙ্গালা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। কবি সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহবাসী শ্রীমান সুধাংশুকুমার চৌধুরী সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক মার্কটোয়েনের কতিপয় কৌতুক চিত্র ও গল্প লইয়া "ভিনাসচিত্র" প্রকাশ করিয়াছেন।

দরিরামপুর হাইস্কুলের এঃ হেড্‌মাষ্টার শ্রীমান বিমলানাথ চাকলাদার বি, এ, ইলিয়ট কৃত ভারত ইতিহাসের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতেছেন।

শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "শৈব্যা"র তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন যশোহরে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতি আগামী বড়দিনের ছুটীতে সম্মিলনের দিন স্থির করিয়াছেন।